মহারাষ্ট্র-বীর ছত্রপতি শিবাজী।

[illegible] যে তারিখে ভারতের সর্বত্র এই শক্তি সাধকের [illegible]

[illegible] বার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠান হইয়াছে।

[illegible]

DOUBLE COLOUR PAGE—

স্বাস্থ্য সমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৬শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৩৪ সাল { ১ম সংখ্যা

বর্ষ-আবাহন।

স্বাগত, নবারুণরাগরঞ্জিত, পুঞ্জিত-বেদনার সকরুণ সীমা, মহা মহীয়ান্ নূতন বর্ষ! এস মহাকালের অগ্নিগর্ভ তেজঃপুঞ্জকায় প্রতীক্, এস জীব-জীবন-যজ্ঞের সাত্ত্বিক ঋত্বিক, এস নটনাথের অভিরাম অভিনয়-লীলার নবাঙ্ক-পাত, আজ তোমায় আমাদের মাঝে বরণ করি—প্রণাম করি!

নূতন অতিথি তুমি, আজ আসিয়াছ আমাদের দ্বারে—তোমার নূতনতার ডালি সাজাইয়া; নবীন আশা, নবীন ভাষা, অভিনব সাধনা, অভিনব দ্যোতনা, নব অভিজ্ঞতা, নব অভ্যুদয়, নব কর্ম্মবীজ, নব মর্ম্মব্যথার ভাণ্ডার আপনার উত্তরীয়-অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া, কাল বৈশাখীর ঝঞ্ঝার রথে চড়িয়া, নিদাঘের রৌদ্রদগ্ধ নির্ম্মম নভে তোমার পিঙ্গল ধূলি-জটাজাল এলাইয়া, রুদ্র সন্ন্যাসীর বেশে আসিয়া, তোমার ভৈরব পিনাকে ফুঁ দিয়া ডাকিতেছ—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

হে শিব, তোমার প্রাণভেদী আহ্বানে শবেরও প্রাণে উদ্দীপনা জাগে। আমাদেরও জাগিয়াছে; তাই তন্দ্রা-জড়িত চক্ষু দুটি মুছিয়া, দেঁতো হাসি হাসিয়া আমাদের শীর্ণ ছেলেমেয়েরা চির প্রথামত গাহিতেছে—

প্রভাতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দ-গান গা রে হৃদয়
আনন্দ-গান গা রে!

কিন্তু এ আনন্দ প্রাণ-সঞ্জাত নহে, এ বরণ নীরস—নির্জ্জীব, এ জাগরণ বুঝি মুহূর্ত্তের চেষ্টা, এ উদ্দীপনা বুঝি ক্ষণিকের সাফল্য! হে কাল-নিযুক্ত দুর্ব্বার শাসক, আজ আমরা তোমার আত্মার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, তোমার প্রকাশানুকূল আবেষ্টনীর সহিত জীবন মিশাইয়া, তোমার বীর-বিকম্পিনী শঙ্খধ্বনির তালে তালে পা ফেলিয়া যাত্রাপথে যাহাতে চলিতে পারি—তাহাই কর।

আমাদের বাহুতে আজ বল নাই, হৃদয়ে আজ ভক্তি নাই, গৃহে আজ শ্রী নাই, দেহে আজ স্বাস্থ্য নাই, সমাজে আজ শৃঙ্খলা নাই, দেশে আজ নেতা নাই, সংগ্রামে আজ জেতা নাই, বিপদে আজ ত্রাতা নাই, ধর্ম্মে আজ উদারতা নাই, কর্ম্মে আজ ঐকান্তিকতা নাই; আজ সর্ব্বত্র দলাদলি, অরাজকতা, ভণ্ডামী ধাপ্পাবাজী, আত্ম-প্রাধান্য-লাভেচ্ছা, পর-মত-অসহিষ্ণুতা, পরশ্রীকাতরতা; আজ শ্রমিকের প্রতি ধনিকের অত্যাচার, প্রজার প্রতি রাজার অত্যাচার, নারীর প্রতি নরের অত্যাচার, দুর্ব্বলের প্রতি ধনীর অত্যাচার!

দাও দেখি স্বয়ম্ভূ সময়াধিপ্, এই অত্যাচারের পাঁজর ভাঙ্গিয়া, এই অন্যায়ের টুঁটি টিপিয়া, এই সঙ্কীর্ণতার বেড়াজাল ছিঁড়িয়া, মুক্ত আকাশ তলে গলাগলি হাত-ধরাধরি করিয়া সবাইকে এক সারে দাঁড় করাইয়া—যেমনভাবে তাহারা শ্মশানে শোয়, বুঝিয়া লইতে দাও তাহাদের নিজ নিজ অধিকার, প্রবেশ করাইয়া দাও তাহাদের কাণে তোমার অভয় অমৃত বাণী—

পিছু হতে' ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ি চলে' যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হবে রে প্রাণের সাধন,
মিছে নয়নের জল ভাই।
আগে চল্—আগে চল্ ভাই ॥.....

আমাদের রাজনীতির ক্ষুধাতুর প্রীতি ভুলাইয়া অন্নময় প্রজানীতিতে মতি দাও, লাট-সভায় ঊর্দ্ধবাহু হওয়ার মোহ ভুলাইয়া প্রকৃতির স্নিগ্ধ উদার বন-সভার শুদ্ধাচারী সাধক হইতে শিখাও, শূন্যগর্ভ শুক্তির মোহ ছাড়াইয়া সাম্য-প্রতিষ্ঠিত সত্যকার মুক্তি-মুক্তার সন্ধানী হইতে শিখাও, রুধির-পণের-বিনিময়ে-যোজ্য উপাধি-লাঙ্গুলের উন্মাদনা নিভাইয়া লাঙ্গলের ফলে বিদ্যুৎ-বীর্য্য সংগ্রহ করিতে শিখাও, ন্যায়ের কচকচি—দাম্ভিকতার দামামা—বক্তৃতার বহ্বাস্ফোটন্ পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া, সকলের মধ্যে দেশ-মায়ের সেই অখণ্ড মূর্ত্তি উপলব্ধি করিতে শিখাও, যাহাতে, হে শুভদ বরদ সম্মানিত প্রভু-প্রতিভূ, এই 'সমুদ্র বলয়াঙ্কিতা হিমাদ্রিকৃত-শেখরা' ভারত-ভূমির সুকোমল কোলে বসিয়া আমরা চিদানন্দ-ঘন প্রাণে সমোদাত্ত স্বরে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে গাহিতে পারি—

যস্যে মে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যে মাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম!"

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

পুরাতন স্বাস্থ্য-সমাচার

[ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি]

পুরাতন স্বাস্থ্যের সমাচার আজকালকার অনেকের পক্ষে নূতন। বহুদিন পূর্ব্বে ছাত্রেরা যখন পদব্রজে বাগবাজার হইতে কাশীপুর কিম্বা শ্যামবাজার হইতে মানিকতলা যাইতে আপত্তি করিতেছিল, আমি বলিয়াছিলাম—"আমাদের সময় ট্রাম ছিল না। আমরা হাঁটিয়া পটলডাঙ্গা হইতে বাগবাজার, হুগলী, ফরাস-ডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে গিয়াছি, দেশে মাথায় রেড পায়ে কাদা লইয়া দুই ক্রোশ চারি ক্রোশ চলিয়াছি। তোমরা এত বাবু হইয়াছ কেন?"

প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিয়াছিল 'আপনাদের সময় ঘি দুধ সস্তা ছিল; ঘি দুধ খেয়ে আপনাদের শরীর সবল; আমরা না খেতে পেয়ে ক্ষীণজীবি।"

তখন তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম—তাহাদের ধারণা ভ্রান্ত। আমি পূর্ব্বে ক্ষীণজীবি ছিলাম। এমন কি আমি জন্ম হইতেই ক্ষীণজীবি। সপ্তম মাসের প্রথম ভাগেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম।

বার্দ্ধক্যের একটী লক্ষণ গল্পপ্রিয়তা। তাহারা আমার এই বরবপু দেখিয়া জন্মগত ক্ষীণতার কথা যখন বিশ্বাস করিল না, তখন জন্মগত কৃশতা এবং অর্জ্জিত সবলতার সমর্থনসূচক গল্প করিয়াছিলাম।

চিরস্মরণীয় ১৮৫৭ সালের শেষভাগে "কালা সিপাহীরা" আগরতলার রাজকোষ লুট করিয়া যখন শ্রীহট্টের দিকে আসিতেছিল, অনেকে তখন ভয়ে সহর ছাড়িয়া গ্রামে পলায়ন করিল। পিতাঠাকুর কালেক্টরীর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহাকে সহরে থাকিতেই হইবে। মাতা ঠাকুরাণী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। তাঁহাকে এক বজরায় রাখা হইয়াছিল; "কালা"রা আসিলেই বজরা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

সংবাদ আসিল "কালা"রা সেনাপতি মেজর বেন্‌কে গুলি করিয়াছে। মাতা ঠাকুরাণীর বজরার পার্শ্বেই মেমদের বজরা ছিল। সংবাদ শুনিয়া মেমেরা ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। ভয়ে মাতা ঠাকুরাণীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল। বাড়ীতে আসিবামাত্র যখন আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম, আমার চোক যোড়া ছিল। মা বলিতেন, আমি ছিলাম—যেন একটা টিকটিকির ছানা।

কলিকাতার মেসে আমা অপেক্ষা বলিষ্ঠ ছাত্র অনেক ছিলেন। ১৮৭৬ সালে যখন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হই, এক বন্ধু আমাকে ৺নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের আখড়ায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

সেদিন মানিকতলা স্পারের মাঠে বীরাষ্টমী উপলক্ষে যখন লাঠি তলোয়ার প্রভৃতি খেলা হইতেছিল, কর্পোরেশনের চিফ্ এক্সিকিউটিব অফিসার আমাকে বলিয়াছিলেন—"দশ বৎসর আগে কি আর এই রকমটা হ'তে পারত?" তিনি জানিতেন না, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ৺নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের আখড়ায় লাঠি, গদকা, তলোয়ার, কুস্তি, মুগুর, প্যারেলেল বার, হরাইজণ্টেল বার প্রভৃতি সব রকম খেলা হইত। কেবল খেলাই হইত না; দেশের জন্য খাটিতে হইলে কি প্রকারে শরীর সবল রাখিতে হয় সে বিষয় উপদেশ দেওয়া হইত। নির্ভীকতা শিক্ষা দিবার জন্য আমাদিগকে তরবারি দ্বারা বুক চিরাইয়া সেই রক্তে দেশ-উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করান হইত।

অল্প সময়ের মধ্যে আমার বাহু দৃঢ় ও মাংসল হইল; উন্নত ও প্রশস্ত বক্ষ, বড় বড় গুলি, বজ্র মুষ্টি প্রভৃতি প্রকৃত স্বাস্থ্য ও সবলতার পরিচয় দিতে লাগিল। আহার যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা নহে। ছাত্রাবাসের রান্না। তখন ঘি দু'এক ফোঁটা তরকারীতে পড়িত বটে। কিন্তু মৎস্যখণ্ড ঝোলের জলে ডুব দিয়া তুলিতে হইত। মাংস একদিন অন্তর পাওয়া যাইত। দুধ রোজ একপোয়া বরাদ্দ। তন্মধ্যে গোয়ালা, পাচক

এবং ঝি নিজ নিজ পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া দয়া করিয়া যতটুক খাঁটি দুগ্ধ রাখিতেন তাহাই উদরসাৎ হইয়া রক্তবৃদ্ধি করিত। সুতরাং কেবল আহারের উপর যে বলবৃদ্ধি নির্ভর করে, তাহা নয়। ব্যায়াম ও মানসিক বল চাই।

আমি যদি সর্ব্বদা মনে করি—"আমি ভাত-ডাল চচ্চড়ি-খেকো বাঙ্গালী, আমি কি আবার পালোয়ান হতে পারি?"—আমি কখনই পালোয়ান হইতে পারি না। কিন্তু দাল চচ্চড়ি খাইয়া ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা কাপ্তান জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দিন ইউনিহ্বার্সিটি হলের বারান্দায় ইংরাজ ছাত্রদিগকে একা ঘুসিযুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন, আমরা তখন প্রত্যেকেই আপনাকে এক একজন বীর মনে করিয়াছিলাম।

আজ—আমরা চির দুর্ব্বল—এই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। তাই গোবর বাবুর মতন বিশ্ববিজয়ী বীর বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। তাই আজ এত ব্যায়াম চর্চ্চা হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার আধুনিক ব্যায়ামচর্চ্চা যে শরীরকে সবল করে তাহা নয়। অনেক সময় কৌশল প্রদর্শন করিয়া বাহবা নিবার জন্য ব্যায়াম শিক্ষা হয়। মাথা নীচু করিয়া জলে ঝাঁপ দেওয়া, সার্কাসে এক পা তুলিয়া ঘোড়দৌড় করা ইত্যাদি বল ও স্বাস্থ্য আনয়ন করে না। গড়ের মাঠে রৌদ্র বৃষ্টি ও সার্জেন্টের বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া ম্যাচ্ দর্শন করিতে কিম্বা ট্রামে বাদুড়ের মতন ঝুলিয়া হৈ হৈ করাতে স্বাস্থ্য ও বল-লাভের সাহায্য হয় না।

দেশীয় কসরত ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। আর এক প্রকার কসরত আছে, তাহা ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ থাকাতে তাহা গুরুর সাহায্য ভিন্ন শিক্ষা হয় না। তাহার নাম—প্রাণায়াম। এ যে কেবল শ্বাসের কসরত তাহা নয়; সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা করিলে ইহাতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে পৃথিবীর কোন আনন্দের তুলনা হয় না। ইহার ফল স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং আত্মানন্দ।

কেবল ব্যায়াম ও আহারের পরিমাণের উপর স্বাস্থ্য ও বল নির্ভর করে না। "যুক্তাহার-বিহার" চাই। আজকাল যুবকদিগকে যে সব ভোজনালয়ে (Restaurant, cabin &c.) জটলা পাকাইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, তাহার প্রত্যেক খাদ্য-পরমাণুতে এবং খাদ্যপাত্রে অসংখ্য রোগবীজ লুক্কায়িত আছে।

একটী গল্প বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ১৯২৬ সালে যখন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (আমেরিকা ফেরত, সুতরাং সন্দেহের পাত্র বলিয়া বর্ম্মা হইতে) ধরিয়া আনিয়া কিড্ ষ্ট্রীটে রাখা হয়, সেই সময়ে আমি তাহার আহারের জন্য শীঘ্র ব্যবস্থা করিতে এক সাহেবী হোটেলে গিয়াছিলাম। বসিয়া বসিয়া দেখিলাম একটী কাঁচের গেলাস খানসামা পরিষ্কার করিতেছে। একস্থানে বোধ হয় একটু দাগ ছিল, তাহা থুথু দিয়া পরিষ্কার করিয়া ঝাড়ন দিয়া পুছিয়া রাখিল। যিনি সেই গ্লাসে জল পান করিলেন, তিনি গরমি প্রভৃতি কত প্রকার মারাত্মক রোগের বীজাণু যে সেবন করিলেন, তাহা কে বলিতে পারে!

হোটেলে বা সাধারণ ভোজনালয়ে ভোজন করা আর রোগ ডাকিয়া আনা একই কথা। বিশেষতঃ আজকাল আষাঢ়ে গল্প ও পরচর্চ্চার সহিত বারম্বার কড়া চা পান করিবার নেশা ঐসব স্থানে বেশ জমে। ইহাতে অজীর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়া গিয়াছেন—যুক্তাহার বিহার স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

আগামী সংখ্যা হইতে পৃথিবী-বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পালোয়ান্ **গোবর গুহ** উপন্যাসের ন্যায় সরস মনোজ্ঞ ভাষায় ক্রমপ্রকাশ্যভাবে বৈদেশিক পালোয়ানদের সহিত নিজের কুস্তি-লড়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবেন।

জীবন-কল্যাণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রকুমার দাস—M. B., M. C. P. & S. (C. P. S.), M. D. (H), M. R. I. P. H. (Eng) "ভিষগরত্ন"।]

(৪) পাণের অপকারিতা

ভারতবাসীদের মধ্যে তাম্বুল (পাণ) চর্ব্বণ বহুকাল হইতেই প্রচলিত। অতি প্রাচীনকালে অবশ্য কেহই এই অস্বাস্থ্যকর কদভ্যাসটীর বশীভূত ছিলেন না। যে যুগকে আমরা অসভ্য যুগ বলিয়া উপহাস করি, সেই অসভ্য যুগের মানুষেরা এই কদভ্যাসের বশবর্ত্তী আদৌ ছিলনা। ক্রমশঃ সভ্যতার আলোক-প্রাপ্ত হইয়া এই অসভ্য ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসটী ভারতবাসীদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে অধিকাংশ ভারতবাসীই এই তাম্বুল চর্ব্বণ অভ্যাসের একান্ত বশবর্ত্তী এবং ইহা এক প্রকার মজ্জাগত অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

পানে এদেশে যে ব্যয় হয়, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ে যুগপৎ নির্ব্বাক হইতে হয়। প্রায় প্রতি গৃহে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহার এত সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা এক প্রকার শিষ্টাচার-সঙ্গত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে পাণের ডিবা না লইয়া বাহির হ'ন্ না। নিমন্ত্রণাদির শেষে পাণ না দিলে ভোজন অঙ্গহীন থাকে। কাহারও বাড়ীতে বেড়াইতে গেলে অথবা দুষ্ট শিশুর ঘুম-পাড়ানী মাসীকে বাটাভরা পাণ দিয়া অভ্যর্থনা না করিলে, তাহা একান্ত শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বা বেমানান্ হয়। নব-বিবাহিতা বধূকে শাশুড়ী পাণ সাজাইয়া বিরাদানে পূর্ণ করিয়া পুত্রের গৃহে পাঠাইয়া দেন; সুতরাং যে যুবক পাণ খাইতে অভ্যস্ত নহে, সে-ও বিবাহের পর নব পরিণীতা বধূর হাতের পাণ খাইতে খাইতে পাণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। নব-বধূর হাতের পাণ উপেক্ষা করিবার মত সৎসাহস কোনও যুবকের আছে কি না সন্দেহ! পক্ষান্তরে প্রবাদ আছে না-কি যে, নব-বধূর হাতের পান উপেক্ষা করা অশুভ। সুতরাং এই অজ্ঞাত অমূলক অমঙ্গলের আশঙ্কা-জনক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনভ্যস্ত যুবকও তাম্বুল-রাক্ষসীর দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

অনেকের বিশ্বাস, পান খাওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী; বিশেষতঃ আহারান্তে পাণ না চিবাইলে ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ হয় না, ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ এবং আদৌ বিজ্ঞানসম্মত নহে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই ভারতবাসীরা এই কদভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। কেহ কেহ বলেন যে ইহা চর্ব্বণে এক প্রকার লালা নিঃসৃত হয়, তাহাতে পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি করে এবং জ্বরের আক্রমণ হইতে মানুষকে রক্ষা করে। পাণ ব্যবহারের পক্ষে এই যুক্তি সম্বন্ধে আমরা পরিশেষে আলোচনা করিব।

পান—একপ্রকার পত্র বিশেষ। ইহা খাইতে হইলে কিছু কাটাসুপারী ও তৎসহ কিঞ্চিত চুণ, খয়ের ও নানাবিধ মসলা এবং সময় সময় ইহার সহিত দোক্তা বা জরদা মিশ্রিত করিয়া একত্রে চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া হয়।

সুপারী—একপ্রকার খর্জ্জুর বা তালজাতীয় ফল বিশেষ। ইহা তন্তুময় একটী বীজযুক্ত এবং ইহার বহির্ভাগ তন্তুময় ছাল দ্বারা আবৃত। এই সুপারীতে দুই প্রকার উত্তেজক ও মাদক পদার্থ পাওয়া যায়:—

(১) এরিকেডিন্—Arecaidine.

(২) এরিকোলিন্—Arecoline.

Arecaidine একপ্রকার স্বচ্ছ পদার্থ আর Arecoline এক প্রকার তৈলাক্ত তরল পদার্থ।

পানের মধ্যেও Piperine (পাইপেরিন্) নামক একপ্রকার উত্তেজক পদার্থ বর্ত্তমান থাকে।

এক্ষণে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের উপর এই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ফল কি তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

'পাইপেরিন্' খুব উত্তেজক। ইহা খাইলে এক প্রকার যন্ত্রনাদায়ক উদ্দীপনা অনুভূত হয়। শরীরের কোনও স্থানে চর্ম্মের উপর লাগিলে ফোস্কা উৎপাদন করে, এমন কি অনেকক্ষণ ধরিয়া ত্বকের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে বিশেষ ক্ষতিজনক হইয়া উঠে। ইহা বেশী পরিমাণে খাইলে পাকস্থলীর মধ্যে এক প্রকার যন্ত্রণা আনয়ন করে, রক্ত চলাচল ও রক্তের সঞ্চাপ (blood pressure) অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করে এবং এক প্রকার বিষাক্ত উত্তেজক পদার্থ উৎপাদন করে।

'পাইপেরিন্' লঙ্কা জাতীয় পদার্থ। লঙ্কার ন্যায় ইহা পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যস্থিত রস ক্ষণিকের জন্য বৃদ্ধি করে বলিয়া অনেকে ইহা আদরের সহিত গ্রহণ করে; কিন্তু ইহা স্থায়ীভাবে পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে না, বরং পরিণামে ইহাতে পাকস্থলীর পাচকরস নির্গমণ হ্রাস-প্রাপ্ত হয় এবং পাকাশয়ের মধ্যস্থ নাড়ীসমূহের অসাড়তা আনয়ন করে। ইহা দেহযন্ত্রের রক্তোৎপাদনকারী-শক্তি হ্রাস করে, এবং হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর অসাড়তা আনয়ন করে। ইহা পরিপাক সংক্রান্ত স্থানের—এমন কি দেহের অন্যান্য স্থানের শিরা-সমূহেরও অসাড়তা উৎপাদন করিয়া থাকে।

সুপারীর মধ্যে যে 'এরিকেডিন্' পাওয়া যায় – ইহা অতিশয় উত্তেজক এক প্রকার বিষ বিশেষ। যাহারা উহা ব্যবহারে অভ্যস্ত নহে– উহা খাইলে তাহাদের বমনোদ্বেগ হয়, মাথা ঘুরিতে থাকে, মুখ দিয়া জল নির্গত হয়, দুর্ব্বলতা এবং অসুস্থতা উপস্থিত হয়। আর যদি বেশী পরিমাণে খাওয়া যায়—তাহা হইলে পাকস্থলীর ভিতরে তীব্র যন্ত্রনা আনয়ন করে। ভেদ হইতে থাকে, প্রস্রাবের মাত্রা বৃদ্ধি হয়, অত্যন্ত শিরোঘূর্ণন এবং তৎসঙ্গে বুদ্ধিভ্রম লক্ষিত হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত এবং অবশেষে ক্ষীণ হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ; পৈশিকশক্তির সম্পূর্ণ হীনতা; ত্বক চটচটে ও শীতল; এবং অবশেষে সর্ব্বশরীর অসাড় হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। চক্ষুতে এই বিষের লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। ইহা চক্ষের রূপগ্রাহী নাড়ীমণ্ডলের অসাড়তা আনয়ন করিয়া চক্ষুতারকার সঙ্কোচ সাধন করে।

যাহারা অধিক পাণ-সুপারী সেবনে অভ্যস্ত, তাহারা অতি অল্প বয়সেই দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া থাকে—ইহা আমরা বহু স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

পানের সহিত আমরা যে চূণ ব্যবহার করি, তাহা অতিশয় প্রদাহজনক। ইহার দাহক শক্তি এত অধিক যে, ইহা দীর্ঘকাল সেবনে শরীরের মাংস-পেশী এবং অস্থি পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দেয়।

অন্নবহা নালীর (Alimentary canal) অভ্যন্তরস্থ সুকোমল স্থানে এই তীব্র পদার্থের প্রয়োগ অধিক দিন ধরিয়া হইলে যে কি ভীষণ ফল উৎপাদন করে—তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যাহাতে অস্থি ও পেশীসমূহ এবং গাত্র-চর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাতে যে সুকোমল পরিপাক যন্ত্রসমূহ অত্যল্প সময় মধ্যেই ক্রিয়াহীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

খয়েরকে ভাল কথায় 'খদির' বলে; ইহা এক প্রকার বৃক্ষের পত্র ও নরম পল্লবের ক্বাথ হইতে প্রস্তুত। শিঙ্গাপুরে এই বৃক্ষ বহু জন্মিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে "ক্যাটে-সু" (catechu) বলা হয়। ইহা এক প্রকার কষায় পদার্থ বিশেষ। ইহা মুখের, পাকস্থলীর এবং অন্ত্রের ঝিল্লীর শুষ্কতা আনয়ন করে। অল্প মাত্রায় ব্যবহারে ইহা উপকারী। পরিমিত মাত্রায় ব্যবহারে উদরাময় ইত্যাদিতে সঙ্কোচন-ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া ভেদ বন্ধ হয়। স্পঞ্জের ন্যায় দন্ত-মাড়ী, ষ্টোমাটাইটীস্ ইত্যাদিতে ইহা উষদীয় মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং সুন্দর ফল দানও করে। নানাবিধ দন্তমাড়ীর পীড়ায়, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহা অল্প মাত্রায় আহারান্তে মুখশুদ্ধি রূপে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সদা সর্ব্বদা ব্যবহারে কখনও কখনও উদরাময় হইতেও দেখা যায়। অধিক পরিমাণে ব্যবহারে পেটে বেদনা, বমনেচ্ছা এবং স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়।

পানের সহিত খদিরের, ব্যবহার মুখ্যতঃ জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্ত লাল করিবার জন্য। খয়ের চূণের সহিত মিশ্রিত হইলেই ঘোর লোহিতবর্ণ হইয়া থাকে। খয়ের চূণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ পানের সহিত চর্ব্বণ করায়—কোনও উপকার তো হয়ই না, অধিকন্তু নানাবিধ দন্তমাড়ী ও পাকস্থলীর পীড়া আনয়ন করিয়া অকালেই দন্তসমূহের ধ্বংশসাধন করে।

এতক্ষণ আমরা পাণের বিভিন্ন উপাদানের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা এই কদভ্যাসের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পাণ ব্যবহারে—দন্তের ফাঁকের মধ্যে ও মাড়ীর স্থানে স্থানে চর্ব্বিত পানের খণ্ড লাগিয়া থাকে এবং উহা ক্রমশঃ পচিয়া একপ্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সৃষ্টি করে—যাহা পরে "ষ্টোমাটাইটীস্," "পাইওরিয়া" ইত্যাদি নানাবিধ পীড়ার উৎপাদন করিয়া অকালে দন্তপাটীর ধ্বংস সাধন করে এবং নানাবিধ পাকস্থলীর পীড়া—এমন কি দুরারোগ্য হাঁপানি উৎপাদনে সাহায্য করে। ইহা ব্যবহারে দন্তপাটী কাল হইয়া যায়, দন্তের "এনামেল" নষ্ট হয় এবং দন্তমূলের দৃঢ়তা লোপ পায়। ইহার ফলে সাধারণতঃ ২০—৩০ বৎসর বয়সেই তম্বাল-চর্ব্বণকারী দন্ত হইতে বঞ্চিত হইতে সুরু করে।

জিহ্বার আস্বাদন-শক্তিরও হ্রাস হয়; সুতরাং পাণ-ব্যবহারকারীরা মুখের স্বাভাবিক আস্বাদনের মধুরতা হারায়। স্ত্রীলোকেরা অতিরিক্ত পাণ ও দোক্তা বা জর্দ্দা ইত্যাদি চর্ব্বণ করিয়া কুড়িতেই বুড়ি হইয়া পড়েন—ভরা যৌবনেই তাঁহারা প্রৌঢ়াদের মত অকালেই যৌবনশ্রী হারাইয়া ফেলেন। ইহাতে যুবতীদের সুকোমল ওষ্ঠ-পটের প্রাকৃতিক লালিমা নষ্ট হইয়া সুকোমল, স্বাভাবিক রক্তিম ওষ্ঠপুট কর্কশ ও কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যায়, অসময়েই দন্তসমূহ নড়িতে থাকে ও পড়িয়া যায়, সুপুষ্ট গণ্ডদ্বয় বসিয়া যায়, বদনমণ্ডলের চর্ম্ম লোল হয়, কপালে রেখা দেখা দেয় এবং সমস্ত মুখের কোমল ত্বক কুঞ্চিত হইয়া কেমন এক বিশ্রী রকমের হইয়া উঠে! সুতরাং যুবতীর যৌবনশ্রী অসময়েই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; যুবকের যুবাভাব অকালে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, বালকগণ ইঁচোড়ে-পক্ক কাঁঠালের ন্যায় হইয়া উঠে!! জানি না—এই তাম্বুল-রাক্ষসীর দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গজননীর পুত্র-কন্যাগণ কত দিনে মুক্তি পাইবে!

সদা সর্ব্বদা পাণ ব্যবহারে পাকস্থলী ও অন্ত্রের অন্তর্গত ঝিল্লীর পাচক-রসস্রাবী গ্রন্থিসমূহ নষ্ট হইয়া যায়; এই পাচক রস হ্রাস হইয়া যাওয়ায় অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশীসমূহ তাহাদের শক্তি হারায়; সুতরাং ভুক্ত দ্রব্য ভালরূপে জীর্ণ হয় না। ফলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা উদরাময় আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ শিরঃপীড়া, ক্ষুধামান্দ্য, অনিদ্রা, পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যস্থ প্রদাহ, উদ্গার, মানসিক অবসন্নতা ও আরও নানাপ্রকার অসুস্থতা অনুভূত হয়।

তাম্বুল-চর্ব্বণকারী মনে করেন যে, এই অভ্যাসটী জীবনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। কারন তিনি দেখেন যে, কিছুদিন পাণ চর্ব্বণে অভ্যস্ত হইবার পর ইহা পরিত্যাগ করিলে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইহাতে তিনি স্থির করেন যে, পাণ ব্যবহার তাঁহার পক্ষে উপকারী। কিন্তু এইরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তি-জনক। যে সময়ে ইহার ব্যবহার তিনি ভাল বলিয়া মনে করেন, তখনও কিন্তু ইহা তাঁহার দেহের ধ্বংস সাধন করিতে থাকে। উত্তেজক দ্রব্যদ্বারা মানব-শরীর বজায় রাখার চেষ্টা করা আর বালুকা-ভূমির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করার চেষ্টা করা—একই কথা।

উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার প্রথমতঃ নিরাপদ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু কয়েক বৎসর ব্যবহারে শরীরে

যে কুফল আনয়ন করে, তাহা দূর করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য কোন প্রকার মাদক বা উদ্দীপক দ্রব্য ব্যবহারের আবশ্যকতা আদৌ হয় না। ইহাতে প্রথমতঃ কথঞ্চিৎ বাহ্যিক আরাম বোধ হইলেও অদূর ভবিষ্যতে দেহ, স্বাস্থ্য ও মন একেবারেই নষ্ট করিয়া দেয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মাদক ও উত্তেজক দ্রব্যের সাহায্য গ্রহণ করার ন্যায় বাতুলতা ও মূর্খতা আর আছে কিনা সন্দেহ। ইহাতে ক্ষণিক উত্তেজনা আসে বলিয়াই মানুষ ইহার বশীভূত এত অধিক হয়। কিন্তু এই ক্ষণিক উত্তেজনার হ্রাস হইবামাত্র চরম অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন পুনরায় উত্তেজনা লাভের আশায় মাদক ও উত্তেজক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, ফলে মানুষ ক্রমশঃ ইহাতে এত অধিক অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তখন আর এই কদভ্যাস ত্যাগ করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে।

মস্‌লাদির ভিতরে (বিশেষতঃ লঙ্কা ও গোল মরিচের মধ্যে) জ্বর-জীবাণু-বিনাশের যে ক্ষমতা আছে—ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই এক বাক্যে স্বীকার করেন, কিন্তু এই জ্বর নাশ করিবার জন্য কোন তীব্র পদার্থের ব্যবহার অধিক দিন হইলে—ইহাতে শরীরে নানাবিধ ক্ষতিকর উপসর্গাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে—পক্ষান্তরে ইহা পীড়া-প্রতিরোধের স্বভাবজ শক্তিরও অত্যন্ত হ্রাস করিয়া দেয়। কুইনাইন—ম্যালেরিয়া জ্বরনাশ করিতে অদ্বিতীয় সত্য ; কিন্তু সুস্থদেহে প্রতিষেধকরূপে যদি দীর্ঘকাল কুইনাইন সেবন করা যায়, তাহা হইলে পীড়া-প্রতিরোধের স্বাভাবিক ক্ষমতার লাঘব হওয়ায়, কোনো অবকাশে জ্বর-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলেই তাহা ভীষণ হইয়া উঠে এবং অবশেষে জ্বরকালীন ইহা অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহারেও জ্বরের পর্য্যায় রোধ করিতে পারে না।

জর্দ্দা, দোক্তা, প্রভৃতির ব্যবহারে ধমনী শক্ত হইয়া যায়, "আর্টেরিঅস্ স্ক্লেরোসিস্" পীড়া হইতে পারে, নাড়ীর দৌর্ব্বল্য দেখা দেয়, এবং কামেচ্ছা প্রবলতর হইলেও জননেন্দ্রিয়ের শক্তি কমিয়া যায়। ইহা ব্যতীত আরও নানাবিধ কুফল ও উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়।

দৃষ্টিশক্তি-হীনতা, অন্ধতা ও চক্ষুতে ছানি হওয়ার সহিত দোক্তা ব্যবহারের কতদূর সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইলেও এই সকল চক্ষুপীড়ার সহিত যে ইহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাড়ীমণ্ডল, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় (Pancreas), মূত্রাশয় ও মাংসপেশীর উপর ইহা বিষময় ফল আনয়ন করিয়া রক্তো-দোষ, বহুমূত্র বা মধুমূত্র পীড়ার কতদূর সাহায্য করে, তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না, তবে কোন কোন বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করেন।

পাণ ব্যবহার একটী ক্ষতিকর অভ্যাস। তদ্ভিন্ন ইহা সময় ও অর্থনাশক। এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে—ইহাতে ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া নানা-বিধ পীড়াকে ক্রয় করিয়া আনা হয়। অনেক পরিবারে দেখা যায় যে, তাহাদের দুটী ভাল আহার জুটে না, কিন্তু সোপকরণ তাম্বুল ঋণ করিয়াও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। পণ্ডিত চার্ব্বাক বলিয়া গিয়াছেন "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অর্থাৎ ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করতঃও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবে, আর সনাতন সভ্য আমরা, আমাদের আধুনিক নীতি—ঋণ করিয়াও তাম্বুল, দোক্তা, তামাক ইত্যাদি নানাবিধ মাদক ও নেশার দ্রব্য সেবন করতঃ দেহ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করা ! হায় রে আমাদের আধুনিক রুচি ও প্রবৃত্তি ! !

আগেকার লোক স্বাস্থ্যকে সম্পদ্ মনে করিতেন—খাটিয়া উপার্জ্জন করাতে আত্ম-শ্লাঘা বোধ করিতেন ; এখনও পাশ্চাত্য জগতে তাহার মূর্ত্তিমান অনুস্মৃতি দেখা যায়। আর আধুনিক শিক্ষায় উন্নত আমরা, স্বাস্থ্য-দেহ-মন সমস্তই নিজের ইচ্ছায় মাদক ও বিষ দ্রব্যের পদতলে উৎসর্গ করিয়া সর্ব্বতোভাবে দাসত্ব-জীবন বরণ করিয়া লইয়াছি ; আর পরদোষান্বেষী আমরা, সমস্ত দোষ বিধাতা আর পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার উপর ফেলিয়া দিয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। কিসে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি কি না সন্দেহ !

স্বাধীনতা লইয়া দেশে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ; কিন্তু যে জাতির নিজের স্বাস্থ্য-রক্ষার মূল তথ্যটুকুও জানা নাই - যাহারা হীন প্রবৃত্তির দাস - মাদক-বিষের পদতলে যাহারা আজীবন বিক্রীত - তাহাদের আবার স্বাধীনতা কি ? স্বাধীনতা কি তাহারা কিছু বুঝে কি ? দেশের প্রকৃত শত্রু যে কে তাহা দেশবাসী জানেন কি ? স্বাস্থ্যই যে প্রকৃত সম্পদ, সুখ, শান্তি ও স্বাধীনতার মূলে তাহা আমরা বুঝি কি ? স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য—স্বাধীনতা, স্বাধীনতা—খুব হাঁকা-হাঁকি করি বটে ; কিন্তু স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতার (Definition) আমরা জানি কি ?

আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, যাঁহারা এই মন্দ অভ্যাসে রত হইয়াছেন—তাঁহারা যেন নিজের স্বাস্থ্যের ও সন্তানের মঙ্গল, দেশ ও দশের কল্যাণার্থ এই কদভ্যাসটী সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগকে নানাবিধ ইচ্ছাকৃত রোগে কষ্ট পাইতে হইবে না, এবং অনর্থক টাকাও ব্যয় হইবে না—অনেক অযথা চিন্তা ও অশান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। আমাদের আরও বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা যেন সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য এই মঙ্গল-বাণী তাঁহাদের আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবের মধ্যেও বিশেষ ভাবে প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহাতে দেশের অনেক পয়সা বাঁচিয়া যাইবে - মানুষ পেট ভরিয়া আহার করিতে পারিবে এবং ক্রমশঃ এই কদভ্যাসটী ভারত হইতে চিরলুপ্ত হইয়া যাইবে।

এক ভারতবর্ষ ছাড়া এই কদভ্যাস আর কোনও দেশে প্রচলিত আছে কি না তাহা জানি না - সম্ভবতঃ নাই। ভারতবাসী যতটা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আত্মঘাতী—এতটা আর কেহই নহে ; এমন কি ৺হেমবাবু তাঁহার কবিতায় বলিয়া গিয়াছেন -"অসভ্য চীন—অসভ্য জাপান, তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান"...। আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই "অসভ্য" শব্দটী প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইত। "স্বাস্থ্যে", "সম্পদে," "শক্তিতে" "গৌরবে"—আজ জাপান-চীন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির মধ্যে অন্যতম হইয়া উঠিয়াছে ; আর এখনও "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়" ! তাহার কারণ - ভারত স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া রোগ-পর্য্যঙ্কের উপর প্রবৃত্তি ও বিলাসিতার দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় চিরসুপ্ত ; জানি না - এ সুপ্তির অবসান কত দিনে হইবে — জানি না, এদেশে প্রদীপ্ত কিরণে স্বাস্থ্য-সূর্য্যের উদয় কত যুগ পরে হইবে !!

(ক্রমশঃ)

পৃথিবীর জানিত জীবিত লোকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচান ব্যক্তি—জোরা আগা, কয়েক মাস পূর্ব্বে কন্‌স্তান্তিনোপলে তাঁহার দেড় শত জন্ম-বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। জন্ম-শার্টিফিকেট দেখিয়া তাঁহার দেড় শত বৎসর বয়স সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং তিনি নিজেও গত ১২০ বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি পর্য্যায়ক্রমে বেশ বলিয়া যাইতে পারেন। তিনি আজীবন কখনও পাণ-তামাক স্পর্শ করেন নাই। অতি দরিদ্র ছিলেন বলিয়া মাংস খাওয়া তাহার ভাগ্যে প্রায়ই জুটে নাই ; তিনি প্রচুর পরিমাণে চিনি, মধু, দুধ, কিস্‌মিশ্ ও অন্যান্য টাট্কা ফল খাইতেন। এতাবৎকাল তিনি পাঁচটি স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন ; শেষেরটির বয়স ৬৫ বৎসর।

ডিস্পেপ্টিকের ডায়েরী।

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দোপাধ্যায় বি, এ,]

ভাল ক'রে সর্ব্ব অঙ্গে মাখিনি গো তেল ;
রাগে জ্বলে' উঠিতাম দেখে নারিকেল।
কেন এত স্বাদু সুধা দেছেন ঈশ্বর—
কাঠিমুঠি সার এক গাছের উপর ;
যৌবনের মদে কিছু বুঝিনি তলায়ে,
এবে তলপেটে হাত দিতেছি বুলায়ে।
তপন শোষিছে রস প্রখর কিরণে,
প্রভু পুনঃ পালিছেন কৃপা বিতরণে।
বৈশাখের রোদে কাঠ-মাঠ ফেটে যায়,
ডাবের সলিল জীব এ কালেই পায়।
তাপে জ্বলে' পুড়ে মরি ঘরের ভিতর,—
সদা গাত্রদাহ—পাখা করি নিরন্তর ;
পরম করুণাময় জীবের লাগিয়া,
প্রাঙ্গনে রাখেন সুধা-ভাণ্ড সাজাইয়া।
পটোল কেন গো হয় বুঝেছি এখন,
কেন কচি নিমপাতা করি দরশন।
কেন গো করেলা উচ্ছে মাঠেতে জন্মায়,
কেন ঠাণ্ডা শাঁক আলু প্রাণটা জুড়ায়।
কেন মুগ ছোলা ভিজে নিবেদি ঠাকুরে ;
শুশুনি কলম্বী হিঞ্চে কেন গো পুকুরে।
কেন বেল পেঁপে পাকা এত সুমধুর,
আম জাম লিচু তাল কাঁটাল প্রচুর।
তর্মুজ, খর্বুজ, শশা, কাঁকুড় ও ফুটি—
কেন রোদে মাঠে শুয়ে খায় লুটোপুটি।
মোরা মরি ঘরে তাপে, - বাহিরে না যাই,
(আর) ফুটি ফাটে হেসে মাঠে—বলিহারি যাই !
তাঁর লীলা খেলা শুধু জানে সেই জন,
আর যারে কৃপা করে ভক্ত-প্রাণধন।
ধন্য ধন্য ভগবান্ ! মহিমা তোমার—
কে পারে বুঝিতে ? মোরা নির্বোধ অসার।

বাবা বলিতেন "খাঁটি সরিষার তেলে
শশিকলা সম বাড়ে বাঙ্গালীর ছেলে।
দু'পাতা ইংরাজী পড়ে' হ'ল একি হাল !
সকলি করিস্ উল্টা - ঘোর কলিকাল !"
বুড়ো বাবা জানে বা কি ? সেকেলে সে fool,—
নকল করিব সর্ব্বদিকে John Bull.
পানাহার বেশভূষা সকল ব্যাপারে,
পাশ্চাত্য পদ্ধতি রীতি-নীতি ব্যবহারে,
চলিব প্রতীচ্য মতে, তবে সভ্য নর—
দিবে উচ্চাশন শীঘ্র তাদের ভিতর।
এই ভাবি তৈল ত্যজি' মেখেছি সাবান,—
বুঝিনিক তাহে ক্ষতি কত পরিমাণ !
ঘৃত হ'তে অষ্টগুণ তেলে উপকার,
বাবা মোরে বলেছেন কত শত বার।
কিন্তু আমি শুনিনি ত সে শাস্ত্র-বচন ;
এবে প্রায়শ্চিত্ত - শুষ্ক চর্ম্মের দাহন।
কপালের লেখা বল কে করে খণ্ডন,
কে ঘুচাবে কর্ম্মফল জীবের প্রাক্তন।
ঠেকেছি ঠকেছি কত শিখেছি দেখিয়া,
তবে জ্ঞান-আঁখি গেছে চল্লিশে খুলিয়া।
তাই এবে ভাবি "প্রভো ! করুণানিধান,
সকল বিপদে জ্ঞান কর তুমি দান।
অশুভ ঘটিছে শুধু মঙ্গলের তরে,
মূঢ় অন্ধ স্বল্পবুদ্ধি হায় হায় করে।
সত্য শিব দয়াময় তুমি গো সুন্দর,—
তোমার করুণাধারা ঝরে নিরন্তর।
তুমি কি করিতে পার কভু অমঙ্গল ?
পদ্মহস্ত বুলাইয়ে কর সুশীতল।
আজিকার তপ্ত ধরা অশান্তি অনলে
দাউ দাউ দশদিকে পুড়ে ম'ল জ্বলে'।"

*　*　*　*

রোগের জ্বালায় প্রাণ ছটফট করে,
মনে হয় ডুবে থাকি তেলের সাগরে।
কেন ধোঁয়া খেয়ে পেট করেছি গরম,
কেন ডাব তাল-শাঁস খাইনি নরম।
কেন ঘোল খেতে হয় ভোজনের শেষে,
কেন তিক্ত শুক্ত আগে খাওয়া রীতি দেশে।
ধীরে ধীরে শান্তমনে মধ্যাহ্ন ভোজন
কেন ঋষি করেছিল হেথা প্রচলন।
প্রকৃতির সঙ্গে দেহ-প্রকৃতি মিলায়ে,
হাঁচি-মল-মূত্র-ত্যাগ, তৈল মাখা গায়ে,
স্নানাহার, নিদ্রা, কর্ম্ম, মৈথুন, ব্যায়াম,
হাসি, নাচ, গান, স্ফূর্ত্তি, উৎসব, আরাম—
সকল বিষয়ে স্বাস্থ্য দীর্ঘায়ুর প্রতি
রেখেছিলা তত্ত্বদর্শী লক্ষ্য তীক্ষ্ণ অতি।
তাই তারা সুস্থদেহে বড় বড় কাজ
করেছিল, ভাবি যবে—পাই মনে লাজ।
মোরাও তাদেরি বংশধর গুণধর—
কালধর্ম্মে কর্ম্মফলে রোগের কিঙ্কর।
গাড়ী গাড়ী বই, শিশি, ঔষধ, বোতল,—
তবু স্নিগ্ধ নহে স্নায়ু শরীর শীতল।
কত জানি কত বুঝি কত অভিমান,
দেহতত্ত্বে কিন্তু মোরা অতীব অজ্ঞান।
বিদ্যা শিখি নিজে করি অর্থ-উপার্জ্জন,
কিন্তু পরে রেঁধে দেয়—অদ্ভুত জীবন !
উকীল ডাক্তার বাবু বড় সুচতুর,
রোজগার করে নিত্য অর্থ সুপ্রচুর।
বাহিরে বৈঠকে আসে মক্কেল মশাই,—
কি সুন্দর ছবি আর্শী জামা নেটক্বাই !
পরিচ্ছন্ন সব ঘর, ময়লা বালাই—
কোনদিকে এককুচি ধূলি-রেখা নাই।
কিন্তু সে রন্ধনশালে জঞ্জালের রাশ—
জমিতেছে, রাঁধে নোংরা উড়ে বারমাস।
চাকরের যাহা যাহা ভাল লাগে প্রাণে,
তাই সে প্রত্যহ হাট হ'তে কিনে আনে।
রান্না-দেখা হাট-করা বড় অসভ্যতা—
কত আর ক'ব ভায়া দুখের বারতা !
বুকের মাঝারে জ্বলে ভুলের আগুন,
মনে হ'লে দপ্ ক'রে উঠে চতুর্গুণ।
শিখিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা হ'নু ধুরন্ধর,
অথচ রোগের ডিপো সর্ব্ব নারী-নর।

*　*　*　*

একটা নীরোগ জীব চোখে নাহি পড়ে,
এঁড়েলাগা, কুঁজো, কানা, বুক-ভাঙ্গা ঝড়ে।
অসংখ্য ঠেক্‌নো খুঁটি দিয়া জোড়া তালি,
কোনক্রমে মাগ ছেলে পোষে বনমালী।
হায় হায় ! কেন লোকে গাভী-গ্রাসে খায় !
শঙ্কিত চাকুরে ব্যস্ত মোটে না চিবায়।
কোঁৎ কোঁৎ গেলে ভাত মেখে চুণো-ঝোল,—
ডাল কে হজম করে ? হরি হরি বোল !
সব দিকে হাল্কা লঘু মিহি সরু অতি,—
তবে কেন এই হাড়ে এত জায়া-রতি ?
একটী পয়সা ব্যয়ে কত কষ্ট ভয়,—
অথচ অবাধে কেন এত শুক্রক্ষয় ?
বাল্যকাল হ'তে হস্ত-মৈথুনে সবার
কাঁচা বাঁশে লাগি' ঘুণ—করে ছারখার।
পরে বিয়ে হ'লে অতিরিক্ত রেতঃপাত—
ঘটায় অসংখ্য ব্যাধি, শেষে প্রাণপাত।
দেশে নাই ঘৃতদুগ্ধ শ্রেষ্ঠ রসায়ন,—
কিসে হবে এ ক্ষতির আংশিক পূরণ ?
কাজেই ধ্বংশের পথে তীরবেগে জাতি,
যাইছে আপাত শুভ বিলাসেতে মাতি'।
শুক্রই দেহের রাজা—এ রাজা অভাবে,
রক্ষিবে শৃঙ্খলা-শান্তি কে সুন্দরভাবে ?
সৌচ সদাচার সত্য সংযম বিহনে,
পাপ-তাপ-আধি-ব্যাধি এই দেহে মনে।
ধাতুরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব সার,
শুক্রক্ষয় মহাপাপ শিখাও আবার।
মাদুলি, মোদক, আংটি—নানা বিজ্ঞাপন
বাড়িছে, জানিও এটা অশুভ লক্ষণ।
মাদুলি কবচে কত হবে রে মঙ্গল ?
যক্ষ্মা অর্শ মূত্র এতে সারে কি অম্বল ?
বায়ু-পিত্ত-প্রকোপের সমগ্র নিদান
ত্যজ আগে, স্নিগ্ধ হবে কায় মনঃ প্রাণ।
গ্রীষ্মদেশে লিভারের দোষে লোক মরে,
প্রতীচ্য ভূভাগে শীতে কফ বৃদ্ধি করে।
গ্রীষ্মেতে গরম কফি শীতে দার্জিলিঙ,
সেবিয়া মরিছে যত বাঙ্গালী সৌখীন্।
আহারে-বিহারে শুধু অনলের আঁচ,
গরম মশলা-দেওয়া চলে মাংস-মাছ।
ঠাণ্ডা হও ঠাণ্ডা হও—গরমে মরিবে,
ভারত-প্রকৃতিবশে অবশ্য চলিবে। (ক্রমশঃ)

রাজ-যক্ষ্মা :—(২)

(চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্।]

(২) লক্ষণাবলী।

এ ব্যারাম কখন ধরে, কতদিন যাপ্য থাকে, কিসে প্রকাশ পায় বা কত দিনে উপ্ত হয়, এ সকল কথাই অনিশ্চিত। এই জন্য, কোনও রোগী পাইলে, তাহার শৈশবকাল হইতে সকল তথ্য সংগ্রহে মন দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহার সংসারে কে কোথায় এ ব্যারামে ভুগিয়াছেন, তাহার পিতামাতা বা ভাইবোনের এ ব্যারাম ছিল বা থাকার আশঙ্কা কিনা, সে যে-যে বাড়ীতে ছিল সেখানে কস্মিন্‌কালে কোনও ক্ষয়কাশ রোগী ছিল কিনা...ইত্যাদি খুটি নাটি পুংখানুপুংখরূপে সন্ধান করা উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই টি, বি,-গ্রস্ত হইয়াও লোকেরা বহুকাল সুস্থ থাকিতে পারে। কাযেই এই ব্যারামের সূত্রপাতটি কখন ও কি ভাবে হয় তাহা বলা কঠিন। এমন অনেক সময়ে ঘটিয়াছে যে, অপর ব্যারামের চিকিৎসা করাইতে আসিয়া রোগীর এই রোগ ধরা পড়িয়াছে; আবার এমনও বিরল নয় যে, সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা হইতে অকস্মাৎ এই ব্যারাম রীতিমত ধরিয়া পড়িয়াছে। তবে বেশীর ভাগ লোকই অনেক দিন ধরিয়া কোনও-না-কোন ব্যারামে ভোগার সময়ে এই ব্যারামের অস্তিত্ব জানিতে পারে। সাধারণতঃ যে-যে ভাবে বা আকারে এই ব্যারাম দেখা দেয়, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) স্বাস্থ্যভঙ্গ।—সাধারণভাবে কিছুদিন ধরিয়া দৌর্ব্বল্য ভোগ করিয়া (হয়ত বিশেষ পরিশ্রম না করিয়াও) রোগীরা সন্ধ্যার ঝোঁকে কাবু হইয়া পড়ে। কাযে মন লাগে না, শরীরে সামর্থ্য কম বোধ হয় এবং মনের স্ফূর্ত্তি কমিয়া আসে। দুইবেলা তেমন ক্ষুধা হয় না এবং শরীর ক্রমশঃ কৃশও হয়। এই ভাবে কয়েক সপ্তাহ বা মাস গেলে পরে, রোগী জ্বরম হইয়া পড়ে।

(২) বারোমেসে সর্দ্দিকাসি।—একবার ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সর্দ্দিকাসি ধরার পরে রোগীর সর্দ্দি আর সারিতে চায় না। হয় ত কাহারো সকালের দিকে ২।৪ বার কাসি হইয়া সামান্য গয়ার উঠে; কাহারো বা তাহাও হয় না—সুধু গলার ভিতরে পুঁটুলির মত বোধ হয় এবং রোগী অনবরত গলা খাঁকারি দেয়, খুক্‌খুক্ শব্দ করে। একটু বর্ষা বাদল পড়িলে, একটু শীতের হাওয়া লাগিলেই এই অবস্থার বিকাশ ঘটে। এমনিই ভাবে বহুকাল কাটিয়া যায়। একটু বুকের মালিশ বা গলার ভিতরে লাগাইবার ঔষধ অথবা একটা মিকশ্চার দিলে সাময়িক উপকার হয় বটে, কিন্তু ব্যারাম যায় না। এ ব্যারাম কষ্টদায়কও নহে এবং ইহার সঙ্গে জ্বর থাকে না—কাযেই না-রোগীর না-চিকিৎসকের উদ্বেগের কারণ ঘটে। অথচ এমন অবস্থায় গয়ার পরীক্ষা করাইলে টি. বি. পাওয়া যায়। এবং সেই নির্দ্ধারণ হইতেই সকলে সতর্ক ও অবহিত হন।

(৩) কাহারো গলার দুপাশে বীচি (গ্ল্যাণ্ড) ফোলে, ব্যথা হয়, জ্বর হয়। এই বীচি পাকে বহুকাল ধরিয়া পূঁয ও রস বাহির হয় এবং অবশেষে সারিয়া যায়—সারিবার কালে বিশ্রী দাগ থাকিয়া যায়।

(৪) ভগন্দর (ফিষ্টুলা-ইন্-এনো)।—বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে যাহাদের বহুদিনের ভগন্দর থাকে অথবা যাহাদিগের বারংবার "ইস্কিয়ো-রেক্‌টাল" স্ফোটক হয়, প্রায়ই পরে তাহাদিগকে ক্ষয়কাশ ধরিয়া থাকে।

(৫) প্লুরিসি (ফুস্‌ফুসাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ)।—অনেক সময়ে, সামান্য বুকে ব্যথা হইতে বুকের ভিতর (প্লুরিটিক্ এফিউজন্) বা পূঁয (এম্পাইমা) হইয়া এই ক্ষয়কাশ ব্যাধির সূত্রপাত হয়। কাহারো কাহারো অতি সামান্যভাবে প্লুরিসি হইবার বহু বর্ষ পরে ক্ষয়কাশ দেখা দেয়। এই প্লুরিসি ও ক্ষয়কাশ ব্যারামের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ট যে, কেহ কেহ বলেন—প্লুরিসি মাত্রেই টি বি-দ্যোতক।

(৬) মুখদিয়া রক্ত উঠা।—অনেক স্থলে এই ঘটনায়ই ব্যারামের সূত্রপাত হইয়া থাকে।

(৭) জ্বর।—কচি ছেলেদের বেলায়, ঘুষঘুষে জ্বরই অনেক সময়ে এই ব্যারামের আরম্ভ বলিয়া গণিত হয়।

(৮) যুবতীদিগের নিরক্ত অবস্থা—এবং যদি তাহার সঙ্গে রজোকৃচ্ছ, বা রজাধিক্য থাকে অথবা রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে, তবে খুব সাবধানে তাহাদের বুক পরীক্ষা করিলে প্রায়ই এই ব্যারামের সূত্রপাত ধরিতে পারা যায়।

(৯) টাইফয়েড জ্বরের মত আকার লইয়া অনেক সময়ে এই ব্যারাম ধরে। সত্যকার টাইফয়েড্ জ্বর হইতে সারিবার মুখেও এই টি. বি. দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে; তবে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-রোগীদের সমস্ত বাহ্যিক লক্ষণ টাইফয়েড্ জ্বরের ন্যায় হইলেও, বারম্বার রক্ত পরীক্ষা করিয়া টাইফয়েডের অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং যাহাদের জ্বর একবারে ছাড়ে না এবং কাসিও থাকে—তাহাদের সেইগুলি টি বিরই রকম-ফের মূর্ত্তি।

(১০) যে ক্ষয়কাশগুলি "গ্যালপিং থাইসিস্" (ক্ষিপ্র ক্ষয়) আকার ধারণ করে, সেগুলি সাধারণতঃ লোবার নিউমোনিয়ার চেহারা ও লক্ষণ লইয়া আরম্ভ হয়।

(১১) সাধারণতঃ, ক্ষয়কাশ ব্যারামের শেষ দিকে গলা ধরিয়া যাওয়া, গলায় ব্যথা, গলা খুস্‌খুস্ করা হয় বটে; কিন্তু দৈবাৎ কখনো ঠিক্ উল্টা দেখা যায়। অর্থাৎ, প্রথমে গলায় ব্যথা, গলা খুস্‌খুসানি, স্বরভঙ্গ হইয়া বহুদিন আসল ব্যারামের দিকে (বুকের ক্ষয়ের দিকে) দৃষ্টি পড়িতেই দেয় না।

(১২) আগে পেটের গোলযোগ হইয়া পরে ক্ষয়-কাশের লক্ষণ কখনো কখনো দেখা দেয়। গা বমি, আহারে অরুচি বা উদরাময় হইয়া রোগীকে এত বিব্রত করে যে, লোকরা তখন কাসির কারণ-ভূমি—বুকের দিকে আদৌ দৃষ্টি দিবার অবসর পায় না; অথচ এই তথাকথিত "পেট গরম" দেহের মধ্যে টি বির বাসা বাঁধিবার ফল—ইহাকে পেট গরমের কাসি না বলিয়া টি. বি.-ঘটিত শরীর-বিষাক্ত হওনের ফলই বলা উচিত। কিন্তু তখন টি. বি'র কথা কি মনে আসে?

(১৩) কাহারো কাহারো সর্দ্দি, কাসি, জ্বর প্রভৃতি দেখা দিবার বহু পূর্ব্বে, রোগীর মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। রাতদিন দুর্ভাবনা, খিট্‌খিটে মেজাজ, মনের চঞ্চলতা, একটুতে দুরপনেয় অভিমান, অজানা বা অসম্ভাব্য আশঙ্কায় বিচলিত হওয়া, গায়ে পড়িয়া অপমান লওয়া প্রভৃতি লক্ষণসকল দেখা যায়; এইরূপ "নিউর‍্যাস্‌থিনিয়া"-রূপী রোগী কিছু দিন পরে প্রকাশ্যভাবে ক্ষয়ের রোগীতে পরিণত হয়।

(১৪) ম্যালেরিয়ার দেশে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণের সময়ে যেমন কখনো শীত বোধ, কখনো ঘাম হয়—অনেক সময়ে এই ভাবে ক্ষয়রোগের সূত্রপাত ঘটিলেও, আমরা প্রথম প্রথম ম্যালেরিয়া বলিয়াই তাহাদিগকে ভুল করিয়া বসি।

বাহ্য লক্ষণাবলী।—সুচিকিৎসক মাত্রেই জানেন যে, যে-কোনও ব্যারামের প্রধান লক্ষণ দেহের স্থল-বিশেষে প্রকটিত হইলেও, সেই ব্যারামের সমগ্রদেহের উপরে ফলাফলের উপরই বেশী দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যেমন, টাইফয়েডে পেটে ঘা, প্লেগে কুঁচকিতে ফোড়া, নিউমোনিয়ায় বুকে প্রদাহ ঘটে বটে; কিন্তু এই স্থানিক লক্ষণগুলি ধরিতে গেলে কিছুই নয়। অর্থাৎ, পেটের ঘা, কুঁচকির ফোড়া বা বুকের মধ্যে প্রদাহ—ইহাদের কোনটিও প্রাণান্তকর নয়। কিন্তু ঐ তুচ্ছ স্থানিক প্রদাহ বা ক্ষত হইতে যে তৎ জীবাণুজাত বিষ সমগ্র দেহকে জর্জ্জরিত করে—সেইটাই বড় কথা এবং

সেইটার উপরেই প্রখরতর দৃষ্টি রাখিতে হয়। কাযেই, কোনও ব্যক্তি টি. বি-গ্রস্ত হইয়াছেন কি না তাহা জানিবার জন্য তাহার বুকটিকে যত যত্ন করিয়া পরীক্ষা করা উচিত, ততোহধিক যত্ন করিয়া তাহার আপাদমস্তক পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। এই জন্য আমরা সমগ্র দেহের কথা এই প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য।

(১) **চেহারা**।—"বৃঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজঃ"- এমন লোকেরও বুকে ঘুণ ধরে। কিন্তু সাধারণতঃ যে যুবকদের ছিপ্‌ছিপে কোমর-ভাঙা গড়ন, যাহাদের রং ফরসা, চামড়া এত সাদাটে ও পাতলা যে তাহার ভিতর দিয়া নীল শিরাগুলিকে দেখা যায়, যাহাদের ঠোঁট দুখানি পাতলা, চক্ষের পাতার লোম বড় বড় এবং চক্ষের রং নীল যাহাদের বুক খুব চ্যাপ্টা ও পাতলা, যাহাদের কাঁধটা কতকটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং পিঠের হাড় দুইখানি (স্ক্যাপুলাদ্বয়) "পাখনা" বাহির হওয়ার মত দেখায়, প্রায় সেই যুবকরাই ক্ষয়কাশে ভোগে।

(২) **চর্ম্ম**।—ব্যারামের সূত্রপাতে চর্ম্মের কোনও দোষ ঘটে না। কিন্তু ব্যারাম ভাল করিয়া ধরিলে, গায়ে ছুলি বাহির হয়, চামড়া পাতলা, মলিন ও কোঁচকান হইয়া পড়ে। আহারের পরে, বা সামান্য শারীরিক বা মানসিক উত্তেজনার ফলে, মুখ লাল হইয়া উঠে—বুকের যেইদিকে ক্ষয় ধরিয়াছে প্রায় মুখমণ্ডলের সেই দিকটাই লাল হয়। ভ্যাসো-মোটার (vaso-motor অর্থাৎ রক্ত-সঞ্চালক) নাড়ীমণ্ডলীর দৌর্ব্বল্য বশতঃ রোগীর মুখখানি তথাকথিত স্বাস্থ্যব্যঞ্জক গোলাপী আভা ধারণ করে। ইহাকে ইংরাজীতে "হেক্‌টিক্ ফ্লাস্" কহে। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, সুধু ক্ষয়কাশ রোগেই ইহাকে দেখা যায়। এখন জানা গিয়াছে যে, যে-কোনও জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে ইহা দেখা যাইতে পারে। "ভ্যাসো-মোটার" দৌর্ব্বল্য বশতঃ কথায় কথায় প্রচুর ঘাম হয়। শেষ অবস্থায় পা ফোলে, হাতের চেটো ফোলে।

(৩) **চুল**।—ব্যারামের প্রকোপের সঙ্গে সঙ্গে চুল পাতলা ও ভগ্নপ্রবণ হয় এবং সহজেই উঠিয়া যাইতে থাকে।

(৪) **হাতের ও পায়ের নখ**—লম্বা ডোরা কাটার মত দেখায় এবং সহজেই ভাঙিয়া যায়। কোনও কোনও স্থলে লম্বালম্বিভাবে নখগুলি বাঁকিয়া ডোঙ্গার মত দেখায় ও সেই সেই স্থলে আঙ্গুলের মাথাগুলি বড় ও মোটা দেখায়—শেষ পর্ব্বটি বেঁটে ও অপেক্ষাকৃত স্থূল দেখায়।

(৫) **গলায় বা বগলে বীচি** (গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থিস্ফীতি) প্রায়ই পাওয়া যায়।

(৬) যেদিকের বুকে দোষ ধরে, সেইদিকের ও **কাঁধের মাংসপেশীগুলি** অপেক্ষাকৃত স-টান ও শক্ত হইয়া থাকে; এই জন্য সেই দিকের বুকট ভাল করিয়া উঠিতে-পড়িতে পারেনা। পরে এই মাংসপেশীগুলি দুর্ব্বল ও পাতলা হইয়া পড়ে।

(৭) **চক্ষের মণি**।—বুকের যেদিকটার উপরিভাগে প্লুরিসি বা বুকের ভিতরের গ্লাণ্ডের দোষ জন্মায়, সেইদিকের চক্ষের মণিটা অপেক্ষাকৃত বড় দেখায়।

(৮) **নখের নীলাভা**।—ক্ষয়কাশের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের প্রশ্বাস বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার ক্ষমতার হ্রাস হয়। এ কারণ রক্তে কার্ব্বনিক অ্যাসিড নামক গ্যাসের আধিক্য হয়। সেই আধিক্য নখের নীলাভা হইতে সূচিত হয়।

(৯) **হৃৎপিণ্ড** (Heart)।—এই ব্যারামের ফলে, হৃৎ-পিণ্ডের দক্ষিণাংশ বিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এমন কি সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা কতক পরিমাণে স্থানভ্রষ্টও হইতে পারে। প্রথমাবধি হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত দ্রুত হইয়া পড়ে। জ্বরের অবস্থা হইতে যেমন আমরা এই ব্যাধির অবস্থা ও ভাবীফল কতকটা নির্ণয় করিতে পারি, তেমনি হৃৎপিণ্ডের গতি হইতেও তাহা অনুমান করা সহজ। রক্তের চাপ (Blood-pressure) লইলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে-যে পরিমাণে শরীর জীবাণু-বিষে জর্জ্জরিত হয়, সেই অনুপাতে রক্তের চাপ কমিয়া যায়।

(১০) **পরিপাক শক্তির**—ব্যতিক্রম সকল রোগীতেই পাওয়া যায়; ব্যারামের পূর্ণ প্রকাশের সঙ্গে কতকটা অজীর্ণ আসিয়া দাঁড়ায় এবং সেই সময়ে জিহ্বা লাল বর্ণের ও কতকটা মসৃণ দেখায়।

(১১) **মূত্রযন্ত্রের** দোষ অনেক স্থলেই দাঁড়ায়। বৃক্ক বা "কিড্‌নী"র দোষ জন্মানর ফলে, বিবমিষা, নিদ্রালুতা, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও ঘটিয়া থাকে। শেষাবস্থায় প্রস্রাব-ধারণের ক্ষমতা কমিয়া আইসে।

(১২) **দেহের ক্ষয়**।- উদরাময়ের ফলে দেহ হইতে মেদ গলিয়া বহিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে। গয়ারের সঙ্গে প্রোটীন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য বাহির হইয়া যায়; সারা দিনরাতে ৬০।৭০ গ্রামের বেশী প্রোটীন দিলে অনিষ্ট হয়, কারণ উহার আধিক্য ঘটিলে জোর জোর নিশ্বাস পড়িতে থাকিবে। রক্ত হইতে ক্যালসিয়াম লবণের ক্ষয় হয় বলিয়া যে কথা আছে, তাহা বিচারসহ নহে। সিলিকা, ফস্‌ফরাস সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

খাদ্যের মধ্যে **শ্বেতসার** জাতীয় খাদ্যই (আটা, ময়দা, ভাত, চিনি, আলু, কচু ইত্যাদি) বেশী করিয়া দেওয়া ভাল।

আন্তরিক লক্ষণাবলী

(Subjective Symptoms)

(১) **কাসি**।- খুব গোড়া থেকেই কাসি দেখা দেয়। ল্যারিঞ্জাইটিস্ (স্বরযান্ত্রিক্ প্রদাহ) বা এপেক্সে প্লুরিসি বা ব্রংকিয়ার উত্তেজনা- যে কোনও কারণে হউক না কেন, খুব গোড়া থেকেই কাসি থাকে। এই কাসির সঙ্গে প্রথম প্রথম কিছুই উঠে না এবং শয়নকালে ও ঘুম ভাঙিলেই কাসির আরম্ভ হয়। এ কাসি শুষ্ক বা ভিজা, সশব্দে বা আস্তে, ঘনঘন বা বহুক্ষণ অন্তর প্রভৃতি নানা ভাবে হইতে পারে কাসির রকমের স্থিরতা তা বিশিষ্টতা কিছু নাই। ক্রমে যখন ব্যারাম বাড়ে, এবং বুকে ক্ষত ও গর্ত্ত হইয়া যায়, তখন কাসিটা ঘং ঘং করিয়া হয় এবং কাসির চোটে বমিও হইয়া যাইতে পারে। জোরে কাসার ফলে ফুস্‌ফুসের মধ্যে ব্যারামটা আরো ছড়াইয়া পড়ে।

(২) **গয়ার**।—ব্যারামের প্রথমাবস্থায় গয়ার (কফ-মিশ্রিত নিষ্ঠীবন) থাকে না; ক্রমশঃ যত ব্যারাম বাড়ে ততই গয়ার বাড়ে। অনেকে ভুল করিয়া, অনেকে ইচ্ছা করিয়া, গয়ারকে গিলিয়া ফেলে; তাহার ফলে তাহাদের অন্ত্রে (Intestines) এই ব্যারাম বিসর্পিত হয়। রোগী যখন অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন তাহার গয়ার উঠাইবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত থাকে না—ফলে সেই গয়ার তাহার "গায়ে বসিয়া" তাহার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ করে। গয়ারটি প্রথম প্রথম কম ও থুথু-মিশ্রিত হয়। পরে যখন বুকের ভিতরে ঝাঁঝরা বা গর্ত্ত হইয়া পড়ে, তখন আঠালু হরিদ্রাভ বা নীলাভ নিভাঁজ পূযই বাহির হয়। রোগী সারিয়া গেলেও বহুকাল ধরিয়া প্রাতঃকালে তাহার ঘন চট্‌চটে গয়ার উঠার অভ্যাস ত্যাগ হয় না।

(৩) **রক্তোৎকাশ**।—সকল ক্ষয়কাশ রোগীর রক্ত উঠে না। যে রোগীর সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ স্বরূপ রক্তোৎকাশ হয়, তাহারা প্রায় ক্ষেত্রে কতকটা ভালই থাকিয়া যায়। এই রক্ত কখন উঠে বা কতটা উঠে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। তবে এটা ঠিক্ যে, বাহিরে যতটা রক্ত দেখা যায়, ফুসফুসের ভিতরে প্রায় ততটা রক্ত থাকিয়া যায় এক রকম বলিতে গেলে ফুস্‌ফুসটি রক্তে রসগোল্লা হইয়া পড়ে।

বুকে ব্যথা।—প্লুরার (ফুস্‌ফুস্-আবরক পাতলা ঝিল্লীর) কোনও কিছু হইলেই সুধু যে সেইদিকের বুকে বেদনা অনুভূত হয় তাহা নহে—অধিকাংশ সময়ে দুই দিকের বুকেই বেদনা বোধ হয়। স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে এই বেদনা কোনও যায়গা বিশেষে বোধ হইতে পারে, অথবা সমস্ত বুক জুড়িয়া হইতে পারে। প্লুরার প্রদাহ, বুকে গর্ত্ত হওয়ার দরুণ পারিপার্শ্বিক প্লুরার উত্তেজনা, কোনও স্থানটি বুকের প্রাচীরের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়া, প্রভৃতি নানা কারণেই ব্যথা উঠিতে পারে। ব্রঙ্কিয়াল গ্ল্যাণ্ড (শ্বাস-নালীর অভ্যন্তরস্থ গ্রন্থি)-গুলি বড় হইলে,

হয় বুকের মাঝখানটা নতুবা পিঠের শিরদাঁড়ার নিচেটা কন্ কন্ করিতে থাকে। অকস্মাৎ দারুণ যন্ত্রনার সঙ্গে হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইয়া শ্বাসকষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, "নিউমোথোর‍্যাক্স্" হইয়াছে। তবে এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিউমোথোর‍্যাক্স্ হইলেই যে এই কষ্টকর ও ভয়াবহ লক্ষণ-ত্রয় থাকিবেই এমন কিছুই কথা নাই।

স্বরভঙ্গ।—প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। ইহা কখনো ল্যারিঞ্জাইটিসের ফল, কখনো দুর্ব্বলতার ফল এবং কখনো রিকারেণ্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নাড়ীর (nerve) উপরে ব্রংকিয়াল গ্ল্যাণ্ডের চাপ পড়ার ফল।

শ্বাসকষ্ট। দ্রুত ভাবে এই ব্যারাম বাড়িলে শ্বাসকষ্ট সহজেই উপস্থিত হয়; কিন্তু যদি ব্যারামটি বহু কাল ব্যাপিয়া ধীরে ধীরে বাড়িয়া ফুসফুসের অনেকটা অংশকেও নষ্ট করিয়া দেয়, তাহাহইলে ক্বচিৎ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। তাহা হইলে বেশ বুঝা গেল যে, শ্বাসকষ্ট সকল ক্ষেত্রেই ফুসফুসের অকর্ম্মণ্য অংশের পরিজ্ঞাপক বা পরিমাপক নয়।—প্রায়শঃ শ্বাসকষ্ট টি, বি-র দ্বারা শরীর বিষাক্ত হওয়ার ফল বটে। যদি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশ বিবৃদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহারও ফলে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইবার কথা। তবে অযথা পরিশ্রমের অথবা জ্বর বৃদ্ধির ফলে, কিম্বা মানসিক উদ্বেগের জন্যও এই ব্যারামের শেষ দিকে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়। যাহারা সারিয়া উঠে, তাহাদিগের রোগমুক্ত অংশে ফাইব্রোসিস (নব-গঠিত পেশীতন্তু-জালের অনাবশ্যক বৃদ্ধি) উদ্ভূত হওয়ায় অথবা ফুসফুসের অপরাংশে 'এমফিসিমা' হওয়ায় (বায়ুকোষগুলির দেওয়াল ছিঁড়িয়া পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায়) সামান্য শ্রমেতেই অল্প-বিস্তর শ্বাসকষ্ট হইবার কথা।

জ্বর।—সাধারণতঃ, এ দেশের সুস্থলোকের বগলে থার্ম্মোমিটার বা তাপমান-যন্ত্র দিলে, ৯৬°৪ হইতে ৯৮°২ ডিগ্রি উত্তাপ দেখায়। আমাদের দেশে, বগলে ৯৮°৪ উত্তাপ উঠিলে আমরা তাহাকে ঈষৎ অস্বাভাবিক অবস্থা বলিব। অত্যন্ত রুগ্ন লোকদের বগলে থার্ম্মোমিটারটিকে ঠিক করিয়া বসান যায় না বলিয়া, বগলে তাহাদিগের উত্তাপ দেখা ঠিক নয়। মুখের উত্তাপ বগলের উত্তাপের চেয়ে ½ ডিগ্রি বেশী এবং মলদ্বারের উত্তাপ মুখের উত্তাপের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশী। রোগী যদি বরাবর শায়িত থাকে, তবে মলদ্বারেই উত্তাপ লওয়া উচিত; কারণ ইহার কোনও বালাই নাই অর্থাৎ কোনও কারণে এখানকার উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

মুখের উত্তাপ লইতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক না হইলে ভুল হইবার সম্ভাবনা। প্রথম কথা ঠাণ্ডা বা গরম কিছু খাইবার পরে, অন্যূন পনর মিনিটকাল মুখ বন্ধ করিয়া থাকার পর তবে মুখের মধ্যে থার্ম্মোমিটার দেওয়া উচিত। যাহারা "হাঁ করা," অর্থাৎ যাহারা দিনরাত মুখ খুলিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস লয়, তাহাদের বেলাও ঐ নিয়ম। ধূমপান করিলে অথবা বাহিরে শীতকালে বসিয়া থাকিলেও ঐ রূপ পনর-বিশ মিনিট মুখ বন্ধ রাখিয়া তবে থার্ম্মোমিটারকে মুখের মধ্যে লইতে হয়। মুখের ভিতরে থার্ম্মোমিটার দিতে গেলে, যাহাতে উহার পারাময় প্রান্তটি জিবের নিচের সুতালির ন্যায় মাংসতন্তুর (ফ্রিনামের) সঙ্গে ঠেকিয়া থাকে, তাহা করিতে হয়- এবং অন্ততঃ পাঁচ মিনিটকাল দুইটি ঠোঁট একত্রিত করিয়া রাখিতে হয়। প্রত্যহ জ্বর লইবার সময় অন্ততঃ চারিটি হওয়া উচিত। প্রাতঃকালে—ঘুম ভাঙিলেই একবার, দুপুরে একবার, বৈকালে ৪।৫ টার সময় একবার এবং রাত্রি ৮।৯ টায় শেষবার জ্বর দেখিয়া লিখিয়া রাখা উচিত। ক্ষয়কাশে জ্বর দুই তিনটি কারণে হয়; ব্যারাম যখন ক্রমাগতই বাড়িতে থাকে তখন জ্বর হয়; কিন্তু এমনও রোগী দেখা গিয়াছে যে, সম্পূর্ণ বিজ্বর অবস্থাতেই তাহার ব্যারাম উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। অপর কারণ, টি-বি ও তাহার "বরযাত্র"-রূপ অপর জীবাণুদের বিষ দেহে সজাগ হওয়ার ফল। সাধারণতঃ, যেখানেই টি, বি, বেশ করিয়া বাসা বাঁধিয়া লয়, সেইখানেই পূঁযোৎপাদক নানা জাতীয় জীবাণু তাহার সঙ্গে আসিয়া যোগ দেয়। শারীরিক বা মানসিক এতটুকু চাঞ্চল্য ঘটিলেই জ্বর দেখা দেয়—কিছু দিন স্থাণুবৎ পড়িয়া থাকিলে জ্বর আপনিই আস্তে আস্তে

পলায়। সাধারণতঃ ক্ষয়কাশ রোগীর প্রাতঃকালীন উত্তাপ সুস্থ ব্যক্তির অপেক্ষা এক-দেড় ডিগ্রী কম-বিশেষ করিয়া শীতকালে। যদি অপরাপর লক্ষণের সঙ্গে এই প্রাতঃকালীন উত্তাপ সুস্থ ব্যক্তির স্বাভাবিক উত্তাপের সমান হইয়া দাঁড়ায়, তবে সেটিকে শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। সাধারণতঃ, ক্ষয়কাশ রোগীর প্রাতঃকালীন উত্তাপ খুব কমই থাকে, বৈকালে জ্বর হয়, এবং মধ্য বা শেষ রাত্রে জ্বর ত্যাগের পর অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তাপ কমই দেখায়; এই 'সাব্‌নরম্যাল' বা স্বাভাবিক অপেক্ষা কম উত্তাপ দুর্ব্বলতা-জ্ঞাপক। মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসিলে, তখন এই সাব্‌নরম্যাল-উত্তাপই প্রায়ই থাকে। যদি কোনও ক্ষয়কাশ রোগীর জ্বরের সময় উল্টাইয়া যায়, অর্থাৎ যদি প্রাতঃকালের দিকে জ্বর হয় ও বৈকালের দিকে বিজ্বর থাকে বা কম জ্বর থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে, সে রোগীর অবস্থা ভাল নয়। যদি কোনও ক্ষয়কাশ রোগীর জ্বর গোড়া হইতে বরাবর লিখিয়া রাখা যায়, তবে দেখা যায়, যে, মাঝে মাঝে জ্বরটা একটু প্রবল হয়; কোথাও পুরার প্রদাহ বা ক্ষুদ্রাকারে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া বা রক্তস্রাব বা গর্ত্ত হইয়া যাওয়া অথবা ভিতরে জল জমা (প্লুরিসি ও এফিউজান) প্রভৃতি একটা-না-একটা কিছু হইলেই তৎকালিক জ্বর বৃদ্ধি হয়; কিন্তু জ্বর বৃদ্ধির এই রূপ সঠিক কারণ ঠিক্ সময়ে ধরা কঠিন; বরং ১৫।২০দিন বাদে—যখন জ্বর কমিয়া আসে, তখন ঐ ব্যারামগুলির স্থানিক পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘাম।—এক ঘুমের পরে ঘাম, বিশেষ করিয়া ভোরের দিকে অত্যন্ত ঘাম এই ব্যারামের যত দিন যায় ততই দেখা দেয়। রোগী ঘুমাইয়াছে কি ঘামিয়াছে; কি দিনে, কি রাত্রে, কি শীত কি গ্রীষ্মে, এইরূপ দেখা যায়। পরিশ্রম করিলে ঘাম, মনে মনে চঞ্চল হইলে ঘাম; জ্বর হইলে ঘাম, জ্বর ছাড়িলে ঘাম, জ্বর না থাকিলেও ঘাম! এমন ঘামের সৃষ্টি সুধু সেপ্টিসিমিয়াতে (রক্তদুষ্টিতে) ও ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ছাড়া আর বড় একটা দেখা যায় না।

দুর্ব্বলতা।—দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান হইলেও যাহার দেহে টি. বি. বাসা বাঁধিয়াছে, তাহার দেহে ঐ ব্যারামের কোনও লক্ষণ স্পষ্ট হইবার পূর্ব্বে এই দুর্ব্বলতা দেখা দেয়। সকালে তাহারা শয্যা ত্যাগ করিতে চাহে না; বৈকালে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অলস ভাবেই থাকিতেই চায় এবং যদিও সন্ধ্যার ঝোঁকে কতকটা আলস্য কমিয়া যায়, তথাপি সাধারণভাবে তাহারা ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। খায় দায় অথচ কেন যে দুর্ব্বল হয় তা তাহারা নিজেরাই বুঝিতেই পারেনা—এবং তখন তাহাদের বুক পরীক্ষা করিলে হয়ত কিছুই ধরা যায় না।

নিদ্রার ব্যাঘাত:—কাসি বা অত্যধিক ঘামের জন্যই হউক বা অপর যে কোনও কারণে হউক, ক্ষয়কাশ রোগীরা একটানা সারারাত স্বপ্নহীন নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে পায় না। ভোরের দিকেই তাহাদের ঘুম গাঢ় হইয়া আসে। দৈবাৎ কোনও কানও রোগী আবার খুব বেশী ঘুমায়; কিন্তু সে ঘুম অগভীর—স্বপ্নময়।

রোগা হওয়া।—অনেকের ধারণা আছে যে খুব রোগা লোক না হইলে এ ব্যারাম ধরে না; অধিকাংশ স্থলে কথাটা খাটিলেও, বাহ্যতঃ অতীব হৃষ্টপুষ্ট লোককেও এই ব্যারাম ধরিয়াছে—এমন বহু সংখ্যক রোগী দেখা গিয়াছে। যাহার শরীরে এই ব্যারাম ধরিয়াছে, তাহার ব্যারাম যদি ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়, তবে সে বাহ্যিক ক্রমশঃই রোগা হইয়া যায়। যাহার সারিবার মত হয়, সে ক্রমশঃই অল্পে অল্পে গায়ে সারে, এমন কি শেষকালে স্থূলকায় হইয়া যায়। দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে চিকিৎসকরা মনে করিতেন যে, জবরদস্তি করিয়া খুব দুধ ঘি খাওয়াইয়া রোগীকে মোটা করিতে পারিলেই বুঝি এ ব্যারাম সারে; কিন্তু এখন আমরা বেশ বুঝি যে, যে-রোগী মরিবেই, সেও হয়ত হঠাৎ মাঝে মাঝে গায়ে সারে, এবং জোর করিয়া খাওয়াইয়া মোটা করার চেষ্টায় বরং তাহার অনিষ্ট হয়।

অরুচি।—ব্যারাম যত বাড়ে অরুচি ততই বাড়ে। তেল ঘিয়ে অরুচি অথবা খাদ্য বিশেষে অরুচি বড় একটা হয় না। খাবার মাত্রেই অরুচি হয়। কখনো রোগীর খাইবার প্রবল ইচ্ছা থাকে; কিন্তু খাদ্য দেখিলেই অথবা দু-এক গ্রাস খাইলেই আর খাইতে চায় না। যাহাদের

DOUBLE COLOUR PAGE

পেটের মধ্যে ক্ষয়ের ব্যারাম ধরে, তাহাদের কাহারো কাহারো অসম্ভব ক্ষুধা হয়। কোনও কোনও ক্ষয়কাশ রোগীর আদৌ অরুচি হয় না এবং তাহারা বিছানায় পড়িয়াও বেশ খাইতে পারে। কাসিতে গেলেই বমি আসে বলিয়া রোগী অনেক সময়ে, বিশেষ করিয়া সকালের দিকে, খাইতে চায় না।

মলত্যাগ।—সাধারণতঃ কোষ্ঠকাঠিন্যই দৃষ্ট হয়। কিন্তু, স্থলবিশেষে, জীবাণুদের বিষ গায়ে বসার জন্য, অথবা টি. বি'র আন্ত্রিক আক্রমণের ফলে, উদরাময় হইয়া থাকে। অনেকেরই দুধ একেবারে সহে না।

মাথার যন্ত্রণা—যদি প্রবলভাবে ও বহুদিন ধরিয়া চলে, তবে মেনিন্‌জাইটিসের সম্ভাবনা কল্পনা করিতে হয়।

যৌন সম্বন্ধ—এই ব্যারামে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নানা রকমের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার ফলে, কামবৃত্তির উদ্দীপনা হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু সাধারণতঃ রজের অল্পতা, বা আধিক্য বা কৃচ্ছ্রতা এই ব্যারামে দেখা যায়। এই ব্যারাম যতই বাড়িতে থাকে, ততই ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া আসে। এই ব্যারামের ফলে ঋতুর নানা গোলযোগ ঘটে; কিন্তু যদি কোনও স্ত্রীলোকের এই সকল আর্ত্তব-সম্পর্কিত গোলযোগ ঘটিয়া আবার সুস্থাবস্থার মত ঠিক্ হইয়া আসে, তবে সেটি রোগিণীর পক্ষে আশার কথা বটে।

মানসিক অবস্থা।—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রোগীর আশা থাকে যে, সে সারিয়া উঠিবে। বুকের দোষগ্রস্ত রোগীর যেমন প্রফুল্ল চিত্ত হয়, উদরের দোষ ঘটিলে রোগীরা তেমনিই বিমর্ষ ও হতাশ হইয়া পড়ে।

বুড়ো তোতার ইতিহাস

লণ্ডন, ফিল্‌বীচ্ গার্ডেন্সে, বৃদ্ধ কর্ণেল ডবলিউ, বি, ফেরিসের বাড়ীতে একটি তোতা পাখী দেখা যায়, ইহার বয়স নাকি ১৬২ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। ইহার বুকে, পিঠে ও ঘাড়ে একটিও লোম নাই, কিন্তু এখনও সুন্দর লালিমা-মাখানো পুচ্ছটি অব্যাহত আছে। এই অবিশ্বাস্য বৃদ্ধ বয়সেও সে সারাদিন একটি সরু দড়ীর উপর বসিয়া নৃত্য করে ও উপর হইতে ঝুলানো একটি বল লইয়া খেলা করে। উহার মালিক বৃদ্ধ ফেরিস বলেন যে, তিনি গত ৫০ বৎসর যাবৎ পাখীটিকে নিজের কাছে রাখিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে উহা কোল্‌হাপুরের মহারাজের নিকট ছিল এবং তাহার আগে সাতারার রাজার পেয়ারের চিড়িয়া ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সাতারার রাজার সঙ্গে ইংরাজের একটা যুদ্ধের সময় জনৈক বৃটিশ সৈন্য দ্বারা তোতাটি ধৃত হয়; পরে রাজার অনুরোধে তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কর্ণেল ফেরিস্ যখন এডেনের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন এই তোতাপাখীটি একটা আন্তর্জাতিক কাণ্ড বাধাইবার চেষ্টায় ছিল। মারাঠি, ইংরাজী, আরবী প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষার বহু শব্দ তোতা বেশ চমৎকার উচ্চারণ করিতে পারিত। একদিন এক রুসীয় নৌ সেনাধ্যক্ষ ফেরিসের সহিত সরকারী কাযে দেখা করিতে আসিয়া, উহাকে আদর করিয়া ডাকিলে পর, তোতা তাঁহাকে চোপরাও নারকী বেল্লিক্' বলিয়া গালি পাড়ে।...শেষে তাঁহার ক্রোধ উপশম করিতে কর্ণেলকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

BLANK PAGE(S)

DOUBLE COLOUR PAGE

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ বিদ্যাপীঠে গত কার্ত্তিকের গোষ্ঠাষ্টমী দিবসে গো-পূজার পর
সম্পাদক নিজ হস্তে গাভী পরিচর্য্যা করিতেছেন

DOUBLE COLOUR PAGE

“গাবস্ত্রৈলোক্য-মাতরঃ”

নমি জীবন-তোষিনী দেবী ত্রিলোক-পূজিতা,
নমি মাতা মহেশ্বরী দক্ষের দুহিতা !
স্বলোক - সাধক-বাঞ্ছা, ভুবলোক আর ;
সত্য হোক্ কিংবা সৃষ্টি ঋষি-কল্পনার ;
যাইনি তথায় কভু, গেলেও তাহার
স্মৃতি-কথা—বিন্দু মাত্র জাগে না আমার ।

জানি না তথায় শুদ্ধ দুগ্ধপায়ী ঋষি,
তোমারি হবিতে যজ্ঞ জ্বালে দিবানিশি !
জনমি’ এ তথা-উক্ত অনৃত ভূলোকে,
হেরিতেছি নিত্য যাহা এই চর্ম্ম-চ’খে ;—
বিশ্বের সভার মাঝে যত গীতি উঠে
সুরলক্ষ্মীরূপে তুমি রহিয়াছ ফুটে ।

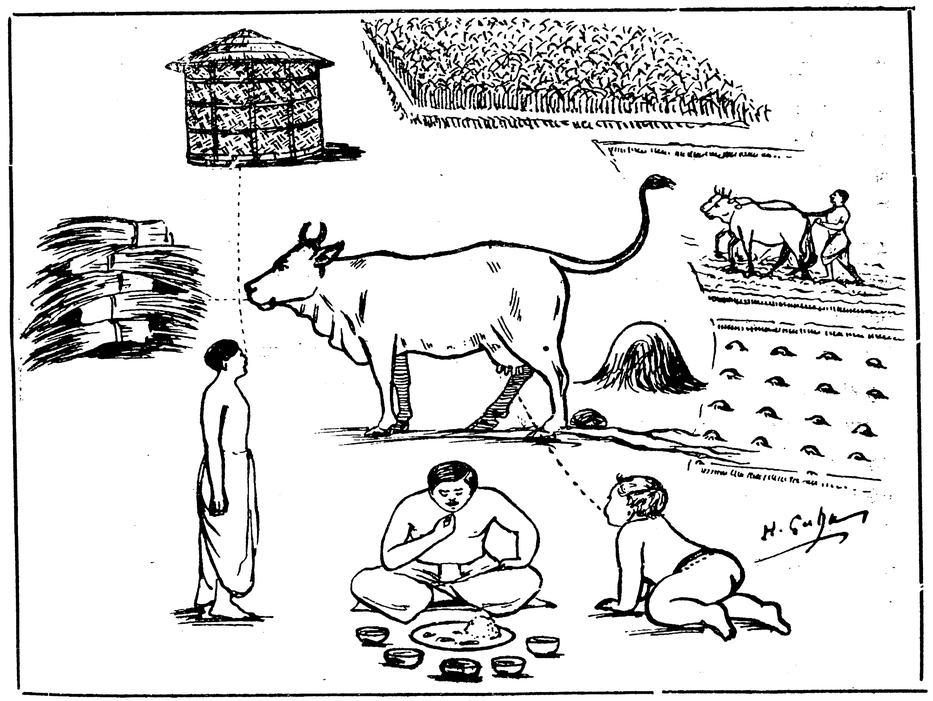

মানবের জীবনের যত কর্ম্ম-জ্যোতি,
কেন্দ্রে তার দীপরূপে তোমার বসতি !
সপ্ত মাতা-মধ্যে তুমি আদি সবাকার :
হে গাভী গায়ত্রী-সমা, লহ নমস্কার !
হিন্দুবরে সুপবিত্র—বিষ্ঠামূত্র তব ;
গোময় বিহনে নহে সুচিতা সম্ভব ।
জীবাণু-নাশক গুণ বিজ্ঞানের মতে—
নাহি থাক্, তব শ্রেষ্ঠ অন্য বিষ্ঠা হ’তে !

তব মল-মূত্র হয় জমির আহার,
সুলভে কৃষক তাহে ক্ষেত্রে দেয় সার ।
তব অস্থিচূর্ণ সার আরও চমৎকার,—
অন্য দেশে সুপ্রচুর হয় ব্যবহার ।
ক্লেদ-অস্থি মিশে গিয়ে মাটির অঙ্গেতে,
কর্ষিত হইয়া মাটি হলের ফালেতে,
চতুর্গুণ হেম-ধান্য—নাতকর প্রায়,
ধূলির মলিন বুকে পুলকে জাগায় ।

সেই ধান্য কাটা হয়ে' রহে গোলাজাত ;
শুষ্ক নাড়া-খড় হয় তব খাদ্য মাতঃ !
আপনার খাদ্য তুমি আপনি যোগাও,
বিষ্ঠা ত্যজি' ভোজ্য সৃজি' খাও ও খাওয়াও।
ধান্য যাহে তৃপ্ত ক্ষুধা, দীপ্ত আয়ু-বল ;
অপ্রত্যক্ষ সে যে দান তোমারি কেবল।
বিদুরের খুদে যাচি' মিল ভগবান ;
শস্য দিয়া, তুঁষে তুষ্ট কে তব সমান ?
আহারের তরে কারো ধার নাকো ধার ;
সোনা দিয়া, খাদ্ রাখ খাদ্য আপনার।
হৃদ্য মানি' ব্রীহি-চর্ম্ম, পর্ণ-ঘাস-পাতা,
খাইয়া, কি মন্ত্র-বলে—নাহি জানি মাতা,
উৎসারিত কর মধু-পীযুষের ধারা,
এ মর ধরায় যাহা অমৃতের পারা।
শুষ্ক খড়ে করি' যোগ অন্য উপাদান,
চিনি ও সুরার সৃষ্টি করিছে বিজ্ঞান ;
কিন্তু হেন বিশ্বকর্ম্মা কোথা খুঁজে পাই,
খড় হ'তে ক্ষীর-নদী বহায় সদাই ?
তব স্তন্যে হৃষ্ট পুষ্ট শিশু মনোরম,
সপ্ত ধাতু সুগঠিত, ক্ষুধা উপশম।
গলিত করুণা তব বাঁচায় পরাণ ;
নিজের বঞ্চিয়া পাল' পরের সন্তান।
অতিথি কুটুম্ব আদি গৃহে এলে পর,
ওগো মূর্ত্ত কল্পতরু, যাচি তব বর।
তব দান—দধি, ক্ষীর, সর, ছানা, ঘৃত,
মাখন, রাবড়ী, দধি, আর নবনীত,—
নাহি দিলে অঙ্গহীন অতিথি-সৎকার ;
যতই করি না সব্জী-মৎস্যের বাহার।
যার ছেলে যত পায়, সেই তত চায়,
তাই তোমা করিতেছি "স্বর্ণডিম্ব" প্রায়।
শুষ্ক ঘাস খৈল ভূষি না দিয়া প্রচুর,
স্তন্য ভূরি নিতে চাহে মানব নিঠুর।
খর গ্রীষ্মতাপে দগ্ধ প্রান্তর-ললাট,
তৃণহীন মাঠ আর বারিশূন্য ঘাট।
কোথা গোষ্ঠ, গোচারণ ?— ক্ষুধা-পিপাসায়
প্রাণ যায়; তবু নর দুগ্ধ তব চায় !
বরষার বারিধারা সহি' শির-পর
বন্যার বুকেতে ভাসি' অষ্টম প্রহর—
অনাহারে অনিদ্রায় আশঙ্কায় ভবে;
স্বার্থপর নরে তবু স্তন্য দিতে হবে !
শীতে কাঁপি থর থর বিনা আচ্ছাদনে,
নিত্যই যোগাবে দুগ্ধ নরের সদনে।
কত ভৃগু পদ-চিহ্ন নিত্য আঁকে বুকে ;
তবু ছুটে স্নেহ-ক্ষীর তারই অভিমুখে।
মাতৃ-অভিগামী সম পাপী দুরাচার—
আভীর দিতেছে ফুঁকা বরাঙ্গে তোমার।
সে দুগ্ধ দোহন নহে, শোণিত-মোক্ষণ ;
বিশ্বের কল্যাণে কর নিজেরে অর্পণ !
ঘরে ঘরে ভূত-যজ্ঞ—লুপ্ত তব সেবা,
সারমেয় পায় পূজা—তোমা' ভজে কেবা ?
গোষ্টহীন গোষ্ঠিপতি—ওষ্ঠে নাহি দুধ।
প্রত্যহ বধিছে তোমা কসাই-আয়ুধ।
খাদ্য যত হ্রস্ব হয়, দুগ্ধ তত কমে,
কচি শিশু-প্রাণ নিয়ে টানে তত যমে !
দুধে মিশে পচা জল, ঘৃতেতে ভেজাল ;
মাখনে, মিষ্টান্নে নিত্য মিশিছে জঞ্জাল।
"দুধেতে আঁচায় আর ঘোলেতে শোচায়"—
বচনে দেশের সুখ সূচিত যেথায়,
তথা নাহি মিলে দুধ এক ফোটা খাঁটি ;
শোভিছে গৃহস্থ-ঘরে "ফুড"-ভরা বাটি।
সপ্ত মাতা অনুর্ব্বরা, সপ্ত ধাতু ক্ষীণ ;
পঞ্চভূতে জাতি বুঝি হইবে বিলীন !
আয়ুরে বাড়াতে হ'লে এই মর ভবে,
ঘরে ঘরে পূজা তব জীয়াবারে হবে।
তোমারে বাঁচালে জাতি আপনি বাঁচিবে ;
শিরায় উজল রক্ত আবার নাচিবে।
গুরু—দানে হরিশের, ত্যাগে দধিচীর ;
প্রণাম টানিয়া লহ ভ্রান্ত পৃথিবীর !

শিশু ও মাতৃ-মঙ্গল

[ডাঃ শ্রীপঞ্চানন বসু এম্ ডি (বার্লিন্]

গত তিন চার বৎসর যাবৎ আমাদের দেশের অস্বাভাবিক শিশু-মৃত্যু নিবারণের জন্য ও প্রসূতিদের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দেশের মধ্যে নানা প্রকার চেষ্টা চলিতেছে। গত ১৯২২ সালে ভারতের ভূতপূর্ব্ব ভাইসেরয়-পত্নী লেডি রেডিং এই কার্যে উদ্যোগী হন এবং তাঁহার উদ্যোগে দিল্লীতে শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের অনুষ্ঠান হয়। পর বৎসর হইতে কলিকাতা ও ভারতের প্রধান প্রধান সহরে এই শুভকর অনুষ্ঠানের অনুস্থিতি হয়। তাছাড়া স্থানে স্থানে শিশু ও মাতৃ-মঙ্গল কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে লোকের মধ্যে শিশুপালন ও প্রসূতিচর্য্যা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানবিস্তার করা এবং শিশুদিগের জন্য বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ করা ও মাতাদিগের প্রসবকালে উপযুক্ত ধাত্রী নিয়োগ করা প্রভৃতি অনেক কাজ করা হইতেছে।

দিল্লীর অনুকরণে প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট হইতে স্থানে স্থানে শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে এই সকল প্রদর্শনীর সাহায্যে জনসাধারণের ভিতর শিশুর ও মাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞানবিস্তার করা যায়, তাহাই এ সকল প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, প্রদর্শনীর কমিটিতে বেশীর ভাগই ইংরাজ ও সরকারী লোক। আমাদের দেশের যথার্থ হিতকাঙ্খী বে-সরকারী লোক দিয়া যদি ও কাজ হইত, তাহা হইলে জিনিসটি আরও লোকপ্রিয় হইত বলিয়া মনে হয়। প্রদর্শনীতে নানাবিধ চিত্র, মডেল, আলোকচিত্র, বায়স্কোপ ও বক্তৃতার সাহায্যে, যাহাতে নিরক্ষর লোকেরাও ও-সব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতায় যে শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শিশুদিগের মৃত্যুর ও স্বাস্থ্য-হানির কারণ এবং তাছাড়া আমাদের সাধারণ স্বাস্থ্যহানির নানাপ্রকার কারণ ও তাহার প্রতীকারের উপায় জনসাধারণকে দেখান হইয়াছে। এই সকল প্রদর্শনী অনেক পরিমাণে লোকশিক্ষার সহায়তা করে এবং যাঁহারা ও-সকল প্রদর্শনী দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারো হয়ত অনেক বিষয়েই চোখ ফুটিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় প্রদর্শনী কেবল তামাসার মত দেখিতে গিয়াছিলেন। কেহ কেহ বা ও-সম্বন্ধে সামান্য চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন, তাইত, এটা আমাদের জানা ছিল না, ঠিক কথা।... কিন্তু যদি, ঠিক কথা বলিয়াই প্রদর্শনী দেখার উদ্দেশ্য থামিয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, প্রদর্শনী হইতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা প্রদর্শনীতে যে সকল জ্ঞান লাভ করিলাম, সেই জ্ঞান অনুসারে আমরা বাস্তবিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছি কি না। সে সম্বন্ধে যে চিন্তাশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আত্মদর্শন করা দরকার।

আমি পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে শিশু-মৃত্যুর কারণ ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে বলিয়াছি যে, কতকগুলি দোষ আমাদের ব্যক্তিগত ও কতকগুলি সমাজগত। তবে অজ্ঞতা যে শিশু-মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতির ভিতর হইতে এই অজ্ঞতা দূর করিবার আমরা কি চেষ্টা করিতেছি! বঙ্গদেশে শতকরা মাত্র দুইটি স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে। মুসলমানদের ভিতর দুই শতের মধ্যে প্রায় একটি। যতদিন না আমরা চেষ্টা করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি করিতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত শিশু-মৃত্যুর হার বিশেষরূপে কমান অসম্ভব। অবশ্য নিরক্ষতার সহিত শিশুর নির্জীবতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল নিরক্ষর স্ত্রীলোকদিগের ভিতর অনেক কুসংস্কার দেখা যায় এবং তাহাদের ভিতর হইতে

এ সকল কুসংস্কার দূর করা শক্ত। তাছাড়া যে-সকল স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে, তাহাদের ভিতর পুস্তক-পুস্তিকা সাহায্যে জ্ঞান বিতরণ করা সহজসাধ্য।

মেয়েদের শিক্ষা না হইলে আমাদের ভাবী বংশ-ধরদের স্বাস্থ্য এবং সুশিক্ষার কোনরূপ সদ্ব্যবস্থা হইতে পারে না—একথা হয়ত আজকাল অনেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন আমাদের ভগিনী, স্ত্রী বা কন্যার শিক্ষার জন্য তৎপর হই? পুরুষরা যদি যত্নবান হন, তাহা হইলে অন্ততঃ শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের শিক্ষাদান করা সহজ ব্যাপার হয়। অবশ্য যেখানে পিতা কিম্বা স্বামী নিরক্ষর, সেখানে যতদিন সার্ব্বজনীন্ শিক্ষা লাভের বাধ্যতামূলক প্রথা প্রচলিত না হইতেছে, ততদিন স্ত্রীশিক্ষার কোন উন্নতি হইবে না। আজকাল স্ত্রীলোকেরা নিজেদের ভিতর যাহাতে শিক্ষা বিস্তার হয়, সেজন্য আগ্রহান্বিতা হইয়াছেন। কিছুদিন হইল, কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিতা বঙ্গ মহিলা একটী মহিলা-শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় ও গ্রহনীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। অনেক পর্দ্দানশীল মুসলমান মহিলাও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই সব দেখিয়া মনে হয় যে, আমাদের দেশে মহিলাদের ভিতর নবভাবের জাগরণ হইয়াছে। এখন যদি পুরুষেরা এবং দেশের কর্ম্মী যুবকেরা মহিলাদের এই প্রচেষ্টার কায়মনোবাক্যে সহায়তা করেন, তাহা হইলে স্ত্রী-শিক্ষার অনেক উন্নতি হইতে পারে। সেজন্য আবার বলিতেছি, স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক পাঠিকাগণ প্রত্যেকে নিজের পরিবারের ভিতর মেয়েদের ভালরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করুন্।

স্ত্রীলোকদিগের ভিতর নিরক্ষরতা দূর না হইলে শিশু-মঙ্গল সম্বন্ধে কোনরূপ সৎকার্য্য করা কিরূপ শক্ত, তাহা আমি একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। ভিয়েনা সহরের একটি শিশুমঙ্গল-কেন্দ্রের কার্য্য আমি দেখিতে যাই। এখানে মাতারা তাহাদের শিশুদের

লইয়া মাঝে মাঝে পরামর্শ লইবার জন্য আসেন।
একটি মহিলা নার্স এই সকল শিশুদের ওজন লইয়া এব
তাহাদের খাদ্যাদির বিবরণ এবং শারীরিক অবস্থার সম্বন্ধে
জ্ঞাতব্য তথ্য একটি কার্ডে লিখিয়া রাখেন। তাহার পরে
শিশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন ডাক্তার প্রত্যেক
শিশুটিকে পরীক্ষা করেন এবং দেখেন তাহার বৃদ্ধির ও
শরীরের গঠনের কোন দোষ আছে কি না। এই সকল
পরীক্ষার পর তিনি শিশুদের খাদ্য ও পথ্য সম্বন্ধে
একটি ছাপানো ব্যবস্থা-পত্র দেন। এইরূপ অনেক
রকমের ব্যবস্থা-পত্র ছাপানো আছে। কোন্ শিশু
পক্ষে কিরূপ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত হইবে তাহা ডাক্তা
স্থির করেন। এই ব্যবস্থাপত্র পড়িয়া মাতা শিশু
খাদ্য কিরূপভাবে তৈরী করিতে হইবে, কত পরিমা
প্রত্যেক বারে শিশুকে খাইতে দিতে হইবে এব
দিনের মধ্যে কয়বার খাইতে দিতে হইবে—তাহা ঠি
বুঝিতে পারেন এবং সেই মত কার্য্য করায় তাঁহা
কোন অসুবিধা হয় না।
আমাদের দেশের মাতারা যদি নিরক্ষর হন, তাহ
হইলে ডাক্তার কিম্বা নার্স ব্যবস্থা-বিবরণটি সংক্ষেপে এক
বার তাহাদের মুখে বলিয়া দিতে পারেন; কিন্তু মাতা-
সে-সব কথা মনে রাখিবেন ও সেই মত কার্য্য করিতে
পারিবেন তাহা আশা করা বড় শক্ত। লিখিত বা ছাপা
ব্যবস্থা-পত্র যদি মাতা পড়িতে পারেন, তাহা হইলে
আবশ্যক মত মাতা তাহা দেখিয়া ভ্রম-সংশোধ
করিতে পারেন। অবশ্য এই সকল নিরক্ষর মাতাদে
ভিতর যদি শিশু-মঙ্গল কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে
তাহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে শিশু-পালন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ
নার্স পাঠানো দরকার হয়। পুরুষদের দ্বারা এস
কাজ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব বস্তির ভিতর গিয়া
উপযুক্তরূপ শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের এসব কার্য্য কর
দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের বস্তির লোকেদে
শিক্ষা ও নীতিজ্ঞান এত কম যে, তাহাদের ভিত
একা কোন বর্ষিয়সী মহিলা পাঠানোও নিরাপদ নয়।
জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিলে এবং নিরক্ষরতা

দূর করিবার জন্য সাধারণের ভিতর শিক্ষা বিস্তার
করিতে পারিলে, শুধু যে দেশের লোকের ভিতর
শিশু-মঙ্গল সম্বন্ধে কার্য্য করা সহজ হইবে—তাহা নহে,
আমাদের দেশের যত নিবার্য্য ব্যাধি এবং মহামারি
হয়, তাহাও সহজে নিবারণ করা যাইতে পারিবে।
প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত লোকই এ সম্বন্ধে একমত, কিন্তু
শিক্ষা বিস্তারের উপায় আমরা কি করিতেছি? আমরা
সকলেই গভর্ণমেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি;
গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা-বিভাগের প্রায়টুকুই দেশী মন্ত্রীর
হাতে ছাড়িয়া দিয়া বলিতেছেন এখন দেশের লোকই
এ সম্বন্ধে দায়ী। মন্ত্রী মহাশয়—টাকার অভাব—এই
অজুহাতে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছেন। এমন ক্ষেত্রে
কোনরূপ শিক্ষার উন্নতি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে
আশা করা যায় না। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য,
যেখানে আমাদের ক্ষমতা আছে, যথা মিউনিসিপ্যালিটি,
ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি, তাহাদের
সাহায্যে স্থানে স্থানে যতদূর সম্ভব অবৈতনিক বিদ্যালয়
বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করা উচিত। দেশের শিক্ষিত যুবক-
দল এই সকল বিদ্যালয়ে অল্প বেতনে বা বিনা বেতনে
শিক্ষকতা করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল করিতে পারেন।
পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছি যে, মাতা এবং
শিশুদের স্বাস্থ্যহানির একটি প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ।
এ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত লোকেদের ভিতরও
যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে এখনও
বিশ্বাস করেন যে, মেয়েদের যদি বেশী বয়সে বিবাহ
দেওয়া যায়, তাহাতে মেয়েদের নৈতিক চরিত্রের দোষ
ঘটিতে পারে। কিন্তু এই যুক্তি একেবারে অমূলক।
কারণ পিতামাতা যদি নীতি ও ধর্ম্মের সহিত যোগ
রাখিয়া তাহাদের মেয়েদের ভালরূপ শিক্ষা দেন, তা'
হইলে সে শিক্ষার গুণে মেয়েরা তাহাদের চরিত্র ঠিক
রাখিতে পারিবে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা আমাদেরই
বেদ-পুরাণের পাতা উল্টাইলে যথেষ্ট সংখ্যক দেখিতে
পাইব।
অনেকে ইয়োরোপীয় সমাজের যে সকল দুর্নীতি

দেখিতে পান, তাহার দোহাই দিয়া আমাদের আধুনিক সংরক্ষিত সামাজিক অবস্থার সমর্থন করেন; কিন্তু এই সকল লোক সাধারণতঃ নাটক-নভেল হইতে পরকীয়া প্রেম কিংবা খবরের কাগজে ডাইভোস কেসের বিবরণ পড়িয়া ইয়োরোপীয় সমাজের ধারণা করেন; এবং যাঁহারা ইয়োরোপে আসিয়াছেন তাঁহাদের অনেকে যেরূপভাবে ইয়োরোপে থাকেন, তাহাতে তাঁহারা ইয়োরোপের মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের মধ্যে আলাপ-পরিচয়-মেশামেশি করিতে খুব কমই সুযোগ পান। কেহ কেহ উচ্চবংশীয় সমাজের বা চাকর-চাকরাণী ও মজুর প্রভৃতিদের ভিতর দুর্নীতির প্রভাব দেখিয়া সমস্ত জাতিকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া আখ্যা দেন। তাঁহারাও যদি আমাদের অনেক উচ্চ ধনী-বংশের পুরুষের ও কুলি মজুর প্রভৃতিদের নৈতিক চরিত্রের অনুসন্ধান করেন, তবে দেখিতে পাইবেন সকল দেশে তাহা সমান। সাধারণতঃ সমস্ত জাতির ভিতর মধ্যবিত্ত পরিবার-মধ্য হইতেই জাতির প্রকৃত কর্ম্মী, জ্ঞানী, সাধক এবং সমাজসেবীগণ বাহির হন। কয়েক বৎসর কাল যাবৎ আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারিতেছি যে, ইয়োরোপেও এই মধ্যবিত্ত পরিবারের ভিতর নৈতিক বন্ধন আমাদের দেশ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

অপরপক্ষে দেখিতে গেলে, এই বাল্য-বিবাহ হইতে আমাদের দেশের মেয়েদের যে কিরূপ স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, তাহা প্রত্যেকে যদি নিজেদের পরিবারের মেয়েদের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে হিসাব-নিকাশ করেন, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেক পরিবারে ভাল করিয়া দেখিলে, মনে হয়, যেন দিন দিন অল্পে অল্পে মেয়েরা ক্ষীণজীবি হইয়া পড়িতেছে। বিবাহের অব্যবহিত পর হইতে বার বার সন্তান প্রসব করিয়া মেয়েরা ক্ষীণকায়া ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তা ছাড়া কাহারও অগ্নিমান্দ্য, কাহারও বা অম্লশূল, কাহারও সূতিকা বা কোন জরায়ু-ঘটিত ব্যাধি, কাহারও বা রক্তাল্পতা ও শেষে যক্ষ্মারোগ প্রকাশ পায়।

ইহার উপর পুরুষদিগের মধ্যে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয় প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাধি নিত্ত-নৈমিত্তিকভাবে আছে, তাহার হাত হইতেও মেয়েদের নিস্তার নাই।

এই সকল দুর্ব্বল রোগ-ক্লিষ্টা মাতারা যে কিরূপ বলিষ্ঠ বংশধরের জন্ম দিতে পারেন, তাহা নিজেদের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিক চাহিয়া সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। একটি বৃহৎ পরিবারে এমন দিন যায় না, যে-দিন কাহারও না কাহারও অসুখ লাগিয়া আছে। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারে ততগুলি শিশুর ভালরূপ খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা গৃহকর্ত্তার পক্ষে বড়ই দুঃসাধ্য বা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই বাল্য-বিবাহ হইতে আমাদের পরিবারের ভিতর কতরূপ অনিষ্ট হইতেছে। এই বালিকা-মাতাদিগের ভালরূপ শিক্ষাও হয় না। এই সকল অশিক্ষিতা কুসংস্কারাচ্ছন্না মাতারা ভালরূপে সন্তান পালন করিতে জানে না। ইহাদের নির্জ্জীব শিশুগণ যে অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের ভিতর এখনও এগারো বারো তেরো বৎসর বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। এত অল্প বয়সে মেয়েদের সম্পূর্ণ দায়ীত্বজ্ঞান হয় বলিয়া বুদ্ধিমান্ কেহ স্বীকার করিবেন না নিশ্চয়। দেশের শিক্ষিত মহিলাগণ এ বিষয়ে ভালরূপে বুঝিতেছেন। গত জানুয়ারী মাসে পুণা সহরে যে নিখিল-ভারতীয় স্ত্রী-সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।—

This conference deplores the effect of early marriage on education and urges the Government to pass legislation to make marriage below the age of sixteen a penal offence. It demands that the age of consent be raised to sixteen. It wholeheartedly supports Sir Hari Singh Gour's Bill which is to come before the Legislative Assembly this month, as a step towards raising the age of consent to 16 and sends a deputation to convey to the legislative assembly the demand of this conference on this vital subject."

(*From Modern Review* Feb. 1927).

ভাবার্থ: বাল্য বিবাহের জন্য যে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষতি হইতেছে, এ সভা তাহার জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন; এবং যাহাতে ষোল বৎসরের নীচে বালিকার বিবাহ দেওয়া আইনতঃ দণ্ডণীয় হয়, সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে আইন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। বিবাহিত বালিকার সহবাসে সম্মতি-দানের বয়স ষোল বৎসর করিবার জন্য দাবী করিতেছেন। এ মাসে এ সম্বন্ধে সার হরি সিং গৌর এ সম্বন্ধে যে বিল উত্থাপন করিবেন, তাহা দ্বারা সম্মতিদানের বয়স ষোল বৎসর করিবার পক্ষে সহায়তা করা হইতেছে, সেজন্য এই সভা ব্যবস্থাপক সভার এ সম্বন্ধে তাহাদের দাবী জানাইবার জন্য একটি ডেপুটেশন প্রেরণ করিতেছেন।

আধুনিক আইনমতে সম্মতিদানের বয়স এখন তেরো বৎসর।

এই প্রস্তাব হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে এখন আমাদের দেশে মেয়েরা নিজেরাই সমাজের অযুক্তিকর ও নিষ্পেষক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহিতেছেন। এ বিষয় আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত পুরুষদের কি মত—তাহা সম্প্রতি দিল্লী সহরে যে শিশু ও মাতৃ-মঙ্গল-কর্ম্মীদের কংগ্রেস হয়, তাহাতে বিশেষভাবে বোঝা গিয়াছে। এই কংগ্রেসে সমস্ত ভারতবর্ষ, বর্ম্মা ও সিংহল হইতে বিভিন্ন প্রদেশের পুরুষ ও স্ত্রী-কর্ম্মীগণ সমবেত হইয়াছিলেন; ইহাতে স্ত্রীলোকদের ভোটের আধিক্যবশতঃ সম্মতির বয়স যে বৎসরে করা হউক বলিয়া যে প্রস্তাব পেশ করা হয়, তাহা গৃহীত হয়। অনেক পুরুষ এই প্রস্তাবে অমত করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নারীদিগের ভি

শিক্ষাবিস্তার এবং নারীদিগের বেশী বয়সে বিবাহ দেওয়া উভয় বিষয়ই এখনও পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত পুরুষেরা বাধা প্রদান করিতেছেন। বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে এ বিষয়ে বড়ই গোঁড়ামি দেখা যায়। মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা এবং স্ত্রীলোকদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে, বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতির সভানেত্রী মিসেস্ আর হোসেন যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা পড়িলে বড়ই দুঃখ হয়। অথচ বাঙ্গালা দেশে মুসলমান সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা কয়েক লক্ষ বেশী; পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যা অনেক বেশী। বঙ্গদেশে শিশু-মৃত্যুর হার কমাইতে হইলে মুসলমান সমাজের স্ত্রীলোকদের ভিতর শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা দরকার।

বাংলার হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত যুবকেরা এই জাতীয় জাগরণের দিনে কি নারী জাতির নব উন্মেষণায় সহায়তা করিবেন, না তাহার প্রতিবন্ধক হইবেন?

পূর্ব্বে যে পারিবারিক শোচনীয় অবস্থার কথা বলিয়াছি, তাহার মূলে কেবল শিক্ষাহীনতা এবং বাল্য-বিবাহ নয়, তাহার একটি প্রধান কারণ অত্যধিক সন্তান-উৎপাদন। এ বিষয়ে এখনও পর্য্যন্ত কোন শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনীতে বা মাতৃমঙ্গল-সপ্তাহে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয় নাই। অত্যধিক পুত্র-কন্যা হইলে তাহাদের লালন-পালন করা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষের বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে। বিবাহ হইলেই যে পুত্র উৎপাদন করিতে হইবে এমন কিছু নয়। যাহারা আমাদের শাস্ত্রের বড়াই করেন, তাহারা যদি শাস্ত্র-সঙ্গত বিধি অনুযায়ী স্ত্রী-সঙ্গ করেন এবং সংযম পালন করেন, তাহা হইলে অত্যধিক সন্তান জন্মের আশঙ্কা থাকে না। অবশ্য সংযমী এবং সুস্থ স্ত্রী ও পুরুষ হইতেই সুস্থ বংশধর লাভ হয়। শাস্ত্র অনুযায়ী সংযম করিয়া বংশধর উৎপন্ন খুব কম লোকই করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে যেরূপ আর্থিক অবস্থা, তাহাতে জন্ম-সংরোধ (Birth Control) করা প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের আবশ্যক। জন্ম-সংরোধ সম্বন্ধে অন্যান্য মতামত স্বাস্থ্য-সমাচারে শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমি শুধু এই বলিতে চাই যে, জন্ম-সংরক্ষণের ফলে শুধু যে মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহা নয়, মাতা কিম্বা পিতা ইচ্ছামত বলিষ্ঠ ও সতেজ সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন। চার পাঁচ বৎসর যদি মাতা সন্তান প্রসব না করেন এবং তাহার পরে যদি তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে মাতার শরীরের পুঞ্জীভূত জীবনীশক্তি গর্ভস্থ সন্তানে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে সতেজ করে। এবং এই সুস্থ ও বলিষ্ঠ শিশুগণ ক্ষীণপ্রায় শিশু অপেক্ষা ভালরূপ জীবন-সংগ্রাম করিতে পারে। চার পাঁচ বৎসর অন্তর যদি মাতার একটি করিয়া নবজাত শিশু হয়, তাহা হইলে তাহাদের লালন-পালন করিতে পিতামাতার বেশী চেষ্টা পাইতে হয় না।

ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেমন বড় বড় সহরে শিশু ও মাতৃ-মঙ্গল-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে জন্ম-সংরক্ষণের ব্যবস্থা দিবার কেন্দ্রও নানা-স্থানে হইয়াছে। বিশেষতঃ সহরের কুলি মজুরদের ভিতর এই জন্ম-শাসন প্রথা যাহাতে বেশ প্রচলিত হয়, তাহার নানারূপ চেষ্টা করা হইতেছে। এ সম্বন্ধে যতরূপ উপায় ঠিক করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, Check Pessary (জরায়ুর মুখে আঁটিবার রবারের টুপি) সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও সস্তা। তাহাতে স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও স্বাস্থ্যের হানি ঘটে বলিয়া মনে হয় না। তবে যাহাদের স্ত্রী একটু শিক্ষিতা ও এবিষয়ে স্বতঃ-প্রণোদিতা, তাঁহারাই ইহার যথোচিত ও যথানিয়ম ব্যবহার সর্ব্বদা আশা করিতে পারেন। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এ বিষয় আমাদের দেশে জনসাধারণের ভিতর জ্ঞানবিস্তার করা বিশেষ দরকার। মেয়েদের এই সমস্ত টুপি লাগাইবার ধরণ দেখাইবার জন্য শিক্ষিতা ধাত্রী ও স্ত্রী-চিকিৎসকের প্রয়োজন। একবার দেখাইয়া দিলে, যে কোন

গৃহস্থের মেয়ে বা পুরুষ সহজেই এই উপায় অবলম্বন করিতে বা করাইতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আলোচিত প্রদর্শনীতে শিশুর স্বাস্থ্যের সহিত মুক্ত বাতাস ও সূর্য্য কিরণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে নানা বিষয় দেখানো হইয়াছিল। যখনই মুক্ত বাতাস ও সূর্য্য কিরণের কথা বলা হয়, তখনই আমাদের সহরের আলোক-বাতাসের সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত বাসস্থান-গুলির কথা মনে হয়। আর মনে হয়, দরিদ্রপল্লীর খোলার ঘরের ভিতর একসঙ্গে ১০।১২ জন লোক এক ঘরে বাস করে। এই সকল দরিদ্রপল্লীর ঘরের হয়ত কোথাও একটী দরজা ব্যতীত আর কোন অন্যরূপ বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; তাছাড়া যে ঘরে শয়ন, সেই ঘরে উনান জ্বালাইয়া রান্না করা হয়। এইরূপ ভীষণ অবস্থার ভিতর লোকে যে কিরূপে বাস করিতে পারে তাহা অনেক সময় অনুমান করা যায় না। সহর যত বাড়িতে থাকে এবং সহরের আশেপাশে যত কল-কারখানা স্থাপিত হয়, ততই নানাস্থান হইতে শ্রমিক জাতীয় জন-মানুষের সমাবেশ সহরতলীতে হইতে থাকে। সহরে বাসস্থানের জায়গা দুর্মূল্য বলিয়া আলো-বাতাসের জন্য যতটা খোলা জায়গা প্রত্যেক বাড়ীর আশপাশে থাকা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-মতে দরকার, তাহা প্রায়ই দেখা যায় না। আধুনিক সভ্যতায় যতই কল-কারখানার বিস্তার হইতেছে, ততই যেন মনে হইতেছে যে, দিন দিন শ্রমিকদের ও তাহাদের পরিবারের কর্ম্মঠ দেহ এই কল-দৈত্যের গ্রাসে পতিত হইয়া পেষিত ও চূর্ণিত হইতেছে।

সহরে বাসস্থানের অকুলান যে শুধু ভারতবর্ষেই আছে এমন নহে, ইউরোপেও নানা বড় বড় সহরে এই সমস্যা বড়ই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ইউরোপ হইতে কলকারখানার সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছি, কারণ তাহা না করিলে তখন আমাদের পক্ষে ইউরোপের সহিত জীবন-সংগ্রাম করা শক্ত হইয়া উঠিবে; কিন্তু এই কলকারখানার সভ্যতা হইতে দেশে যে অনিষ্ট সাধিত হইতেছে—তাহা দূর করিবার জন্য শ্রমিক ও মালিকদের তরফ হইতে ইউরোপে যে অসামান্য চেষ্টা চলিতেছে, তাহা আমাদের ভিতর নাই। প্রত্যেক বড় বড় মিউনিস্যাপিলিটি ভাল ভাল নগর গঠনের বিশেষজ্ঞ ও ইঞ্জিনিয়ার রাখিয়া, শ্রমিকদিগের জন্য নূতন ধরণের বাড়ীঘর তৈয়ারী করিতেছেন। এই সববাড়ীঘর তৈয়ারীর প্ল্যান্ এইরূপ করিয়া করা হইতেছে, যাহাতে সহজে প্রত্যেক ঘরে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে এবং যথেষ্ট বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। গত বৎসর ভিয়েনার সোসিয়ালিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি ৩৫ হাজার শ্রমিকদিগের পরিবার সুস্থভাবে থাকিবার মত অনেক বাড়ী তৈরী করিয়া দিয়াছেন; এবং আগামী পাঁচ বৎসরের ভিতর আরও ত্রিশ হাজার পরিবারের বাসোপযোগী নূতন ধরণের বাড়ী তৈরী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সহরে রাস্তা বা বাড়ী প্রভৃতি তৈরী করিবার ভার মিউনিসিপ্যালিটির উপর। অবশ্য পুরাতন সহর ভাঙ্গিয়া একেবারে নূতন সহর তৈরী করা অসম্ভব। তবে মিউনিসিপ্যালিটি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সহরতলীর স্থানে স্থানে তাঁহারা এইরূপ স্বাস্থ্যকর বাড়ী তৈরী করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন এবং বস্তিগুলি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মতভাবে পুনর্গঠন করিবার দণ্ডনৈতিক্ আদেশ মালিকদের উপর জারী করিতে পারেন।

আমাদের সহরের ধোঁওয়া-সমস্যা সম্বন্ধে মিউনিসি-প্যালিটি একেবারে উদাসীন বলিলেই হয়। ইয়োরোপে প্রত্যেক উনানের সঙ্গে একটি করিয়া চিম্‌নী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে উনানগুলির সহিত যদি এরূপ চিমনী রাখিবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ বাড়ীর ভিতর অতটা ধোঁওয়া হয় না। মিউ-নিসিপ্যালিটি আইন করিয়া এই নিয়ম চালাইতে পারেন। এই গেল মিউনিসিপ্যালিটির কথা।

তা'ছাড়া প্রতীচ্যদেশে যাহারা কলকারখানার অধিকারী, তাহারা শ্রমিকদের জন্য ভাল ভাল থাকিবার স্থান তৈরী করেন। আমাদের দেশে পাট-কল এবং সুতা-কলের শ্রমিকদের জন্য থাকিবার আড্ডা আছে বটে; কিন্তু তথাকার শ্রমিকদের ঘরগুলি

এত অস্বাস্থ্যকর যে তাহার মধ্যে নীরোগ থাকা অসম্ভব। গভর্ণমেণ্টের শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধার জন্য ফ্যাক্টরী-আইন তৈরী করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার বিধিগুলি শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার পক্ষে যথেষ্ট নয়। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে, শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাড়ী তৈয়ারী করিতে কলকারখানার মালিকদের বাধ্য করিতে পারেন। অনেক জায়গায় প্রতীচ্যদেশে কলকারখানার মালিকেরা তাহাদের কুলিমজুরদের শিশুসন্তানদের জন্য বিশেষ রক্ষণাগার তৈরী করিয়াছেন। সকলবেলা কাজে আসিবার সময় মজুর-মাতারা তাহাদের শিশুসন্তানদের এখানে ছাড়িয়া যায় এবং বিকালে বাড়ী ফিরিবার সময় লইয়া যায়। তাই সকল রক্ষণাগারে উপযুক্ত ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ করা, বর্ণপরিচয় করানো এবং সময়মত আহার দি দিবার ব্যবস্থা আছে। বার্লিন সহরের নিকটে প্রসিদ্ধ সিমেন্‌স্ ওয়ার্কস্‌প্ দেখিতে গিয়া এরূপ একটি শিশুরক্ষণাগার লক্ষ্য করি মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। দুগ্ধপোষ্য শিশুরা নিয়মমত খাইতে পায় এবং খেলা করে, গ্রীষ্মকাল হইলে রৌদ্রকিরণে শুইয়া থাকে। তাছাড়া অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের জন্য Kindergarten প্রণালীর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কলের মালিকেরা বেশ বোঝেন যে, মাতারা যদি তাহাদের ছেলেমেয়েদের এরূপ রক্ষণাগারে রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চিন্তমনে আগ্রহের সহিত কাজ করিতে পারে। এই চিত্রের পাশে যখন টিটাগড়, খড়দহ, আমেদাবাদ বা বোম্বাই সহরে কুলীমজুরদের শিশুর কথা মনে হয়, তখন বাস্তবিক মনে বড় দুঃখ হয়।

পৃথিবীর সমস্ত সহরের ভিতর বোম্বাই সহরেই বাসগৃহের বিশেষ অকুলান। এখানের কলিঙ্গাতিরা এক একটি ছোট ছোট ঘরে আট দশটি করিয়া ছেলে-মেয়েকে একসঙ্গে বন্ধ করিয়া রাখিয়া যায়।

আলো ও সূর্য্যকিরণ এবং মুক্ত বায়ু শিশুর শরীরের বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রয়োজন। সূর্য্যকিরণের ভিতর যে ultra-violet rays আছে, তাহা শিশুর অস্থিগঠনের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। যে সকল শিশু বেশীদিন অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ থাকে, কিংবা সর্ব্বদাই পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া থাকে, সে সব শিশু শীঘ্রই এই রিকেটস্ (অপুষ্টাস্থি) রোগে আক্রান্ত হয়। রিকেট্‌স্ রোগ হইতে শিশুদের রোগ-প্রবণতা বাড়িয়া যায়, এবং এই রোগাক্রান্ত শিশুরা সহজেই উদরাময়, ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শুধু ছোট শিশুদের অস্থির বৃদ্ধির জন্য যে সূর্য্যকিরণের প্রয়োজন তাহা নহে, যতদিন পর্য্যন্ত শরীরের সমস্ত অস্থি ভালরূপ পাকা না হয়, ততদিন (প্রায় পাঁচিশ বৎসর) পর্য্যন্ত, যে কোন রকমেই হোক না কেন, সূর্য্যকিরণ না পাইলে শরীরের অস্থিসকল সরু ও নরম থাকিয়া যায়। 'লেট্-রিকেট্‌স' বা বড় বয়সের রিকেট্‌স বলিয়া ব্যাধি মুসলমান সমাজে এবং হিন্দু সমাজে যে সকল স্থানে পর্দ্দার খুব প্রচলন, সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়; তাছাড়া মেয়েদের হাড় নরম হইয়া Osteomalasia বলিয়া যে ব্যাধি দেখা যায় তাহাও অনেক স্থানে এই সূর্য্যকিরণের অভাব হইতে জাত হয়। এই osteomalasia-রোগাক্রান্ত মাতাদের নীচের কোমর ও পাছার হাড় (Pelvis) এইরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে, সাধারণভাবে তাহাদের সন্তান-প্রসব অসম্ভব হয়। জীবিত সন্তান লাভ করিতে হইলে তাহাদের জরায়ু কাটিয়া (Cæserian section) সন্তান বাহির করিতে হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ও কাশ্মিরের মুসলমান্ সমাজে ৯।১০ বৎসর হইতে মেয়েদের যেরূপ কঠিন পর্দ্দার ভিতর রাখা হয়, তাহাতে তাহাদের ভিতর অনেকেরই osteomalasia রোগ দেখা যায়। কাশ্মির ষ্টেট্ হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লেডি ডাক্তার ভন্, এরূপ অনেক স্ত্রীলোকের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া সন্তান বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল স্ত্রীলোকদের খোলাগায়ে রৌদ্র সেবন করাইলে তাহাদের রোগ অনেকটা সারিয়া যাইতে দেখা যায়।

ডাক্তার ভন্ রোগ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, যেখানে অবরোধ-প্রথার বাড়াবাড়ি আছে, সেইখানে নারীদের ভিতর এই রোগ বেশী পরিমাণে হয়। পার্শী মহিলাদের দেখিতে ছিপছিপে হইলেও তাহাদের ভিতর রোগ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। উচ্চ বংশীয় মুসলমান পরিবারে পর্দ্দায় আটকের জন্য এই রোগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পর্দ্দা-প্রথা হইতে নারীজাতির স্বাস্থ্যের যে কি অবনতি হইতেছে, সে বিষয়ে কলিকাতার স্বাস্থ্য-কর্ত্তা মহাশয় সহরে স্ত্রীলোকদিগের ভিতর যক্ষ্মার প্রসার আলোচনা করিতে গিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অবশ্য সহরের নারীদের স্বাস্থ্য-হানির কারণ একমাত্র পর্দ্দাপ্রথা নয়। কারণ এমনও দেখা যায়, যেখানে নারীদের জন্য আলোবাতাসপূর্ণ ভাল বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে, সেখানেও অনেক সময় নারীদের স্বাস্থ্যহানি হয়। তাহার আর একটি প্রধান কারণ সহরের ভেজাল খাদ্যদ্রব্য। কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যে-রকম বাসস্থানে বাস করে, সেখানে কড়া অবরোধ-প্রথা থাকার জন্য, নারীরা ও শিশুরা প্রায় মুক্তবায়ু ও সূর্য্যকিরণ সেবন করিতে পারে না বলিলেই হয়।

তা'ছাড়া পরিবারের লোকাধিক্য বশতঃ এক ঘরে এত লোক একসঙ্গে নিদ্রা যায় যে, সহজেই যক্ষ্মাবীজ পরিবারের লোকদের আক্রমণ করিতে পারে। অনেক সময় কাহার যে যক্ষ্মারোগ আছে তাহাই নির্দ্ধারিত হয় না এবং যে ক্ষেত্রে রোগ ধরা পড়ে, সে ক্ষেত্রেও অজ্ঞতা-বশতঃ গৃহস্থ রোগ-প্রতিষেধের জন্য সাবধান হয় না। আলো হাওয়া নাই, এরূপ গৃহে যক্ষ্মাবীজ অন্ততঃ মাসাবধি কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আমাদের গৃহিণীরা ও ছেলেমেয়েরা সেই কলুষিত বাতাস নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করেন। তাহাতে যে তাহারা সহজে রোগের বীজ দ্বারা আক্রান্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য যক্ষ্মাবীজ দ্বারা আক্রান্ত হইলেই যে যক্ষ্মা-রোগ হইবে এমন কথা নহে। তবে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যে-সকল লোক বদ্ধ ঘরে বাস করে, তাহাদের রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং সেইজন্য আমাদের গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকেরা যক্ষ্মাবীজ দ্বারা আক্রান্ত হইয় অতি শীঘ্রই রুগ্না ও মরণাপন্না হইয়া পড়ে।

চিড়িয়াখানায় বানরগণ যথেষ্ট সূর্য্য-কিরণ পায় না বলিয়া তাহারা সহজেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া মারা পড়ে। সে জন্য আজকাল বার্লিনের চিড়িয়াখানায় বানর ও অন্যান্য জন্তুদের খাঁচায় প্রত্যহ কিছুক্ষণের জন্য Ultra-viloet কিরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সার্সি বন্ধ করিলে কাচের ভিতর দিয়া যে রৌদ্র আসে তাহাতে Ultra-vio'et ray থাকে না। আজকাল Vita-glass নামক একরকম কাঁচ তৈরী হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া ultra violet রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে। ইংলণ্ডের স্কুলগৃহসমূহে এই কাঁচের সার্সি করা হইতেছে। এবং লণ্ডনে চিড়িয়াখানায় বানরদের থাকিবার যেসব ঘর আছে, সেখানকার উচ্চ জানালাগুলিতে ভাইটাগ্লাস লাগানো হইয়াছে।

প্রতীচ্য দেশে জীবজন্তুর জন্য লোকে এত ভাবে আমাদের দেশে এম্নি নিষ্ঠুর উদাসীন্ সমাজ যে দুর্ভাগা নারী ও শিশুদের জন্য কেহই ভাবে না। শকুন্তলা মেমোরিয়াল বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পড়িলে পুরুষদের চোখ খুলিবে মনে হয়—"আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন? সে জীব ভারতনারী। এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধি অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন, স্বয়ং লার্ড ক্লা... গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া দরিদ্র ভ্রমনকারীদের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন! পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, তাই যত্রতত্র পশু-ক্লেশ-নিবারণী সমিতি দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে তাহার জন্য

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাই; কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধবন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটী লোকও ভূ-ভারতে নাই।"

অবরোধ-প্রথায় যে শুধু নারীজাতির স্বাস্থ্যহানি হয় তাহা নহে, তাহা নারীজাতির শিক্ষা ও মানসিক বিকাশেরও প্রতিবন্ধক। বাস্তবিক যেখানে কঠিন পর্দ্দপ্রথা আছে, যেখানে স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্বামী পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি নিকট-আত্মীয় ছাড়া আর কোনও পুরুষের সহিত মিশিতে পারে না। তাহাতে তাহারা বাহিরের জগতের বিশেষ কোন খোঁজই রাখিতে পারে না। নারীকে দাবাইয়া রাখিয়া পুরুষেরা কখনই সমাজ বা জাতির উন্নতি করিতে পারিবে না।

আলিগড়ের প্রসিদ্ধ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী সেখ মহম্মদ আবদুল্লা সাহেব, পর্দ্দাকে সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রনাদায়ক ক্ষত বলিয়াছেন। মিসেস হোসেন এ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "পর্দ্দা যন্ত্রনাদায়ক হইলে অবলাগণ, 'বাপ্ রে, মারে, গেলুম্‌রে' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেন। অবরোধ-প্রথাকে প্রাণ-ঘাতী কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়, যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্ব্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না; অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনাক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।"

আমি পর্দ্দাপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া, মুসলমান সমাজের এক বিদুষী নারীর উক্তি ব্যবহার করিলাম, তাহার কারণ, মুসলমান সমাজেই পর্দ্দাপ্রথার প্রভাব বেশী। হিন্দু-সমাজেও এমনও কতকগুলি তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষেরা পর্দ্দাপ্রথার পক্ষপাতী। মান্দ্রাজ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দুদের ভিতর পর্দ্দাপ্রথা নাই। এবং সে দেশের স্ত্রীলোকেরা অবাধে পুরুষদের সহিত মেলামেশা করে বলিয়া যে তাহাদের ভিতর অসৎ চরিত্রতা বেশী এ কথা বলা চলে না। বরং আমার মনে হয়, মেয়েরা যদি পুরুষদের সহিত অবাধে মেলামেশা করে এবং পথে-ঘাটে মুক্ত বায়ুতে যাইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে তাহাদের শারিরীক ও মানসিক বল খুব বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সূর্য্যকিরণের সহিত অস্থি-বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। আমাদের দেশে কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক উভয়ের ভিতর যে এত ক্ষীণাস্থি, দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রকায় লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অন্যতম কারণ, আমাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ পর্দ্দাপ্রথা।

শিশু ও মাতৃ-মঙ্গলের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এ বিষয়ে যদি আমরা বাস্তবিক অন্তরের সহিত কিছু কাজ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে বদ্ধ-পরিকর হইয়া সমাজের কতক-গুলি বাঁধনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। রোগক্লিষ্টা স্ত্রী এবং শীর্ণকায় ও অসুস্থ সন্তান-সন্ততিদের দিকে তাকাইয়া কোন্ পুরুষের না চিত্ত বিচলিত হয়! তবে উপায় কি? যে দোষ হইয়া গিয়াছে, এবং যাহার সংশোধন করা এখন অসম্ভব, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে আবার সেই দোষ আমরা না করি, আবার যাহাতে আমরা দশ বারো বৎসরে একটী অশিক্ষিতা বালিকার বিবাহ না দিই এবং যাহাতে বিবাহের পর তাহাদের চিরকালের জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া বৃহৎ সংসারের চাপে মারিয়া না ফেলি, তাহার জন্য আজ প্রত্যেক স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক-পাঠিকাকে নিবেদন করিতেছি যে, আপনারা কৃত-সংকল্প হউন।

চাই মেয়েদের সুশিক্ষা, চাই বাল্য-বিবাহ ও পর্দ্দা-প্রথা রোধ করা, চাই শিশুপালন সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিস্তার, চাই প্রকৃত দরিদ্র দরিদ্রের জনন-সংরোধ করিয়া সংসারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা, চাই ভগবানের মুক্ত আলো বাতাস! তাহা হইলে আবার বাংলার ঘরে ঘরে সোনার সংসার ফিরিয়া আসিবে, বলিষ্ঠ এবং সতেজ শিশুর মধুর হাস্য চারিদিকে শোনা যাইবে এবং নারী—সমাজের মধ্যে তাহার প্রকৃত স্থান অধিকার করিয়া, জাতির নবজাগরণে সহায়তা করিবে।

পারস্পরিক হরণ

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু]

কোন্ দ্বাপরে হয়েছিল দ্রুপদ-সুতার বস্ত্রহরণ ;—
ইস্তক্ লাগাৎ আস্‌ছে হয়ে সেই ভাবেরই অনুকরণ।
হরণ এখন পারস্পরিক হচ্ছে বটে দুই দলেতে ;
কচ্ছে সাধন যে যার হরণ, ছলে বলে কৌশলেতে।
হচ্ছিল হায় হৃত যাদের চড়া সুদ আর ফসল্-খাজনা ;
আজ্‌কে তারাই কচ্ছে হরণ মুক্তি, বধূ, পূজোর বাজ্‌না।
একদিন যারা বসন হরণ কর্ত্ত তাঁতির আঙুল কেটে ;
হচ্ছে তাদের শাসন-হরণ চর্‌কা-কেটে, জেল্‌টি খেটে !

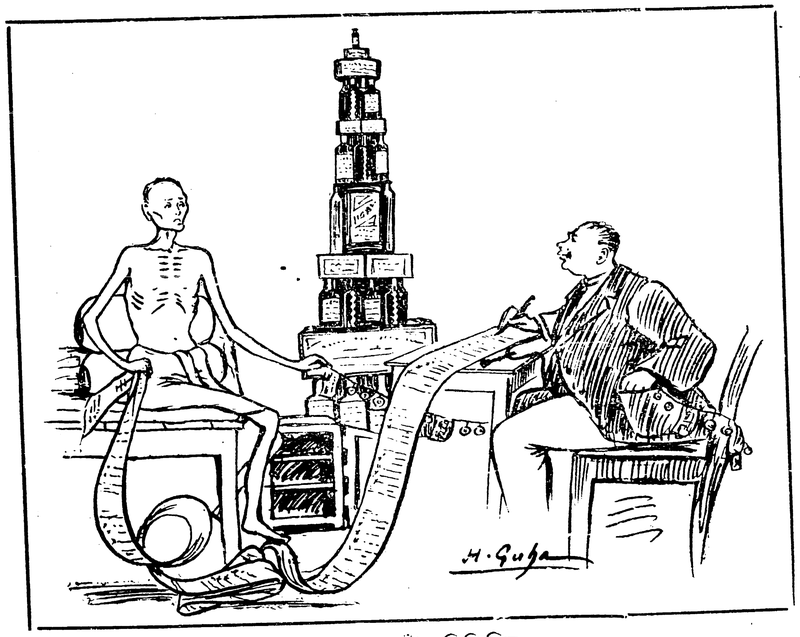

নামজাদা ডাক্তার—ডাক তাঁর নিশিদিন ;
তুষ দিয়ে শাঁস্ খায়—বরবপু নহে ক্ষীণ।
একদিকে রোগী বসে' হরে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন ;
বিপরীতে সমাসীন্ নিদানের কিং জন্।
ওষুধের চার্টার' লিখে চলে অবিরল্ ;
হরিছেন্ রোগীটির ঘটি-বেচা সম্‌বল্ !
হাড়মাস্ হয় সার—ডাক্ দেয় পরপার ;
মনুমেণ্ট্ তুলে ঘরে পেটেণ্ট্ ও মিক্‌শ্চার।

মন্বন্তরে নেতা

সর্ব্ব বিলাস্ ভোগ করে' যে ত্যাগ করে' তা' এক নিমেষে –
পরের কাযে লাগ্‌তে পারে, সেই ত সত্য নেতা দেশে।
ভোগের প্রতি পূর্ণ তৃষা, সিন্ধুকে নেই কাণা কড়ি,
মর্‌তে হ'লে ধার করে' হায় কিন্‌বে যারা কল্‌সী দড়ী,
বিদ্যা যাদের অষ্ট রম্ভা, জগদম্বা বিরূপ বেজায় ;
থলি-ঝাড়া এ সব নেতাই আজ্‌কে যেথা সেথা গজায়।
খদ্দরে হয় তোলা পোষাক্, বক্তৃতাতে Burkeএ হারায় ;
মার্কা-মারা নেতার পেটে দস্যু-ক্ষুধা জিহ্বা নাচায়।

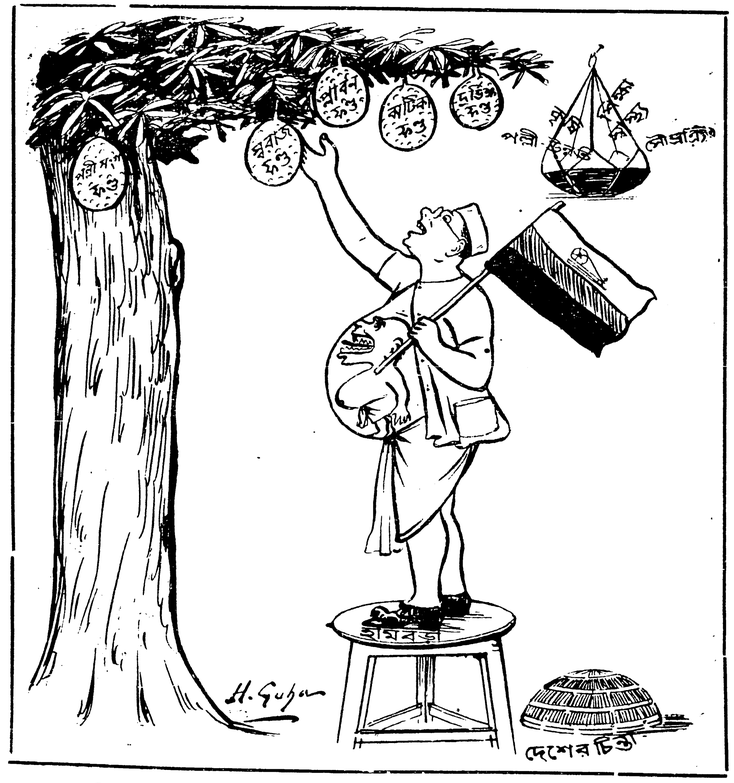

পরের সঙ্গে দেশের চিন্তা ধামা চাপা পড়ে' থাকে,
মক্ষিকা হন্ মুন্সীপাল্ আর জিলা-বোর্ডের মধুর চাকে।
ফণ্ড-গাছের পক্ক কাঁঠাল—'হামবড়া' রূপ টুলে চড়ে'
পাড়্‌ছে মত ভণ্ড ষণ্ড, রইল স্বরাজ কোণে পড়ে'।
একদিনেতে ট্যাক্সি-ভাড়া হাজার টাকা—পরের নিয়ে ;
ক্যান্‌ভাসিংও জবর চলে বোতল্ এবং বাইজী দিয়ে।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পল্লী, কৃষি—শিকার পরে রইল তোলা ;
চর্কা রইল ধ্বজায় আঁকা, পাঁচ্ ইয়ারের মিট্‌ছে নোলা !

কলিকাতা দীপালি সঙ্ঘ।

[শ্রীমতী শ্যামামোহিনী দেবী।]

দেখা যায় যে, এদেশের অধিকাংশ মেয়েই স্বাস্থ্য রক্ষায় অমনোযোগী। ইহাতে বুঝা যায় যে, এদেশের নারী-জীবন সুখের নয় বলিয়া মেয়েরা নিজেদের সকল বিষয়ই উদাসীন। অনেকেই বলেন, মেয়েদের সহজে রোগ হয় না এবং হইলেও মৃত্যু হয় না। কেহ বা বলেন ভারতবর্ষে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী ইত্যাদি। অথচ সেন্সাস রিপোর্ট পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বরং

অপেক্ষাকৃত কম। যে সব কারণে এদেশের নারীর মৃত্যু-সংখ্যা বেশী, তাহার মধ্যে প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। দেশে গড় পড়তায় পুরুষ শতকরা ৫ জন এবং নারী ২ শতে দেড়জন শিক্ষিতা।

যে দেশে শিক্ষার অবস্থা এইরূপ, সে দেশের স্বাস্থ্য কখনই ভাল হইতে পারে না। অশিক্ষিতা মেয়েরা স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম সম্যক অবগত নহেন বলিয়াই দেশে শিশু-মৃত্যু, নর-নারীর মৃত্যু ও সংক্রামক রোগের প্রসার এত বেশী। নারীদের মৃত্যু-সংখ্যা বেশী হওয়ার আরও কারণ আছে। আনন্দের অভাব, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত আলো-বাতাসের অভাব, অকাল মাতৃত্ব এবং প্রতি দিন নিয়মিত ব্যায়াম না করা প্রাণ শক্তির অভাব···ইত্যাদি।

এ সকল অভাবে যে মৃত্যু তাহাও বরং শ্লাঘনীয় কি বর্ত্তমানে নারীগণ সর্ব্ব প্রকারে দুর্ব্বলা হওয়াতে প্রকারে যে মৃত্যু হইতেছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষ পল্লীগ্রামে অহরহঃ অসহায়া দুর্ব্বলা নারীগণের প্র দুর্ব্বৃত্তগণ যে অত্যাচার করিতেছে, ইহার কোন প্রতীক হইতেছে না। এই প্রতীকারের জন্য পরের মুখের দি চাহিয়া থাকিলে চলিবে না, মেয়েদের নিজেদেরই এ

লক্ষ্য করিয়া প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। একা কোন কাজই সুসিদ্ধ করা সম্ভবপর নয়, সম্মিলিত-ভাবে চেষ্টা করিলে অবশ্যই সফলকাম হওয়া যায়। এই জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। "সঙ্ঘশক্তি কলৌযুগে"; অতএব সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যেই ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতা দীপালি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—ইহার মধ্য দিয়া মেয়েদের এরূপে শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা কি শারীরিক কি মানসিক সকল প্রকার বলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে - যেন তাহারা জগতের সকলপ্রকার দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে ও নারীসমাজের উন্নতি-কল্পে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর কর্ম্মে অবাধে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারে। যদিও এই প্রতিষ্ঠানটী ক্ষুদ্র, তথাপি সাহস ও আশা ইহার অসীম। দীপালির কাজ যদিও ৫ ভাগে বিভক্ত, যথা জ্ঞান ও শিল্পচর্চ্চা, আমোদ-প্রমোদ, ব্যায়াম, সঙ্গীত ও সমাজ-সেবা; কিন্তু ইহার মধ্যে ডিসেম্বর মাস হইতে বহু ব্যয়সাধ্য সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ত্তমানে দীপালির সভ্যা সংখ্যা ৭০ জন। চাঁদা অতি সামান্য। ছাত্রীদের চারি আনা এবং অন্য মেয়েদের ॥০ করিয়া মাসে দিতে হয়। প্রতি দিন স্বনামখ্যাত শ্রীযুত পুলিনচন্দ্র দাস মহাশয় ৫½ টা হইতে ৬½ টা পর্য্যন্ত লাঠি ও অসি শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই ৭০ জন সভ্যার মধ্যে অধিকাংশেরই আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা পল্লীগ্রামে শিক্ষয়িত্রী হইবেন এবং প্রত্যেকে মেয়েদের ব্যায়াম শিক্ষা ও নীতি, শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষা দিবেন। প্রতি শনিবারে সমিতির অধিবেশন হয়। সেই সময় জ্ঞান চর্চ্চা, শিল্প চর্চ্চা, সঙ্গীত, লাঠি ও অসি-খেলা প্রভৃতি হয়। সকল জাতির সকল শ্রেণীর মেয়েই ইহাতে যোগ দিতে পারেন। দীপালি অফিসের ঠিকানা ৩৯।৩ বি সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সহৃদয়া নারীগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা দলে দলে ইহাতে যোগ দিন এবং অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া সকল প্রকারে ইহাকে সাহায্য করিয়া দেশের নারী-শক্তিকে জয়যুক্ত করুন। এদেশের নারীর লুপ্ত গৌরব আবার ফিরাইয়া আনিবার ভার এদেশের নারীগণের হাতে, তাঁহারা ইহা মনে করিয়া কাজ করুন—এই প্রার্থনা।

গো-সেবা

[রায়সাহেব ডাঃ শ্রীদিবাকর সে, জি, সি, ভি, সি, কলিকাতা ভেটারিনারি কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল।

মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া এবং বহুদিন মানুষের সেবায় বাঁচিয়া গোজাতি এখন সম্পূর্ণই আমাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। বন্য পশু নিজেদের আহার সংগ্রহ করিয়া স্বেচ্ছা বিচরণে সুস্থ শরীরে থাকিতে সক্ষম হয়, কিন্তু যাহারা কেবলমাত্র পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এবং আমাদের প্রাণধারণের প্রধান উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া দিতেছে, তাহাদের প্রতি আমাদেরও একটী কর্ত্তব্য আছে। কেবলমাত্র দিনে দুইবার "খড় দেখাইয়া" রাখিলে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল না। তদ্ব্যতিরেকে তাহাতে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হই। সামান্য অযত্নও গরুতে বুঝিতে পারে। তাহাদের কি হইলে কষ্ট দূর হইয়া তাহারা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে পারে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিৎ। কেবল মাত্র মনে মনে ভগবতী জ্ঞান করিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, ভগবতীর ন্যায় বাস্তব পূজারও ব্যবস্থা করিতে হয়।

পালিত পশুটার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিও। মানুষের ন্যায় ইহাদেরও পীড়া হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে; যাহাদের সম্পূর্ণরূপে অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছে, তাহারা রোগে চিকিৎসার দাবী করিতে পারে। সামান্য সামান্য রোগে সামান্য সামান্য ঔষধ প্রত্যেকেরই জানা উচিত।

পালিত পশুটীর দেহের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। গায়ে এঁটুলি ধরিয়া অনেক সময় বড়ই কষ্ট দেয়, সময় সময় গরুকে মারিয়া ফেলে; ইহারা কালাজ্বরের ন্যায় একপ্রকার রোগ উৎপন্ন করিতেও সক্ষম। অনেকেরই শরীরে হয়ত একটী মাত্র এঁটুলি ধরার যন্ত্রণার জ্ঞান আছে। ইহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা ঘটায়, সে বিষয় মনে রাখিয়া পশুর দেহ হইতে এই উপদ্রব দূর করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাহাদের শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। গায়ে এবং গলকম্বলে হাত বুলাইয়া দিলে, তাহারা বিশেষ আরাম অনুভব করে এবং সেই লোককে বিশেষভাবে চিনিয়া রাখে। যখনই দূর হইতে দেখিতে পায়, তখনই নিকটে আসিয়া আনন্দ দান করে।

গোরুর দেহের কোন স্থানে ময়লা জমিয়া থাকিতে দিতে নাই, তাহারা বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করে। সাধারণতঃ দেখা যায়—গোশালা অপরিষ্কার থাকা হেতু, মল ও মূত্রের উপর শয়ন করিতে হয় বলিয়া শরীরে ময়লা লাগিয়া শুকাইয়া থাকে। ইহাতে কেবল মাত্র যে স্বাস্থ্যের হানি করে তাহা নহে, গাভীর দোহনকালে বাঁট হইতে ময়লা পড়িয়া দুধ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে, উপরন্তু বহু রোগের বিস্তারেরও সুবিধা করিয়া দেয়।

গরুর ক্ষুরের ভিতর ময়লা জমিয়া পায়ে নানারূপ রোগের সৃষ্টি করে, সেজন্য, বেশী কাদাতে কাজ করিতে হইলে বা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলে, তাহার পর তাহাদের ক্ষুরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিৎ।

নিয়মিত ভাবে স্নান করান একান্ত প্রয়োজন, মাসে অন্ততঃ দুইবার যেন হয়। স্নানের পূর্ব্বে শৃঙ্গ দুইটী ও তাহার মধ্যে কপালে সরিষা তৈল দিয়া স্নান করাই উহাদের শরীর বেশ ভাল থাকে।

গরুর সেবার একটী প্রধান অঙ্গ—তাহার আহারে বিষয় লক্ষ্য রাখা। জাব দিবার একটী নিয়মিত সম থাকা ভাল। সকালে ও সন্ধ্যার জাব বেশী মাত্রায় হও দরকার। ইহার মধ্যে আরও দুইবার অল্প মাত্রায় জা দেওয়া ভাল। যে সকল গরু সমস্ত দিন ছাড়া থাকে তাহাদের দুইবার ভাল করিয়া জাব দিলে চলে।

একটী কথা আছে "গরুর মুখে দুধ।" গা যাহাতে সমস্ত দিন কোন না কোন রকম আহা পাইয়া, এবং বিশ্রাম কালে সেই আহার রোমন্থ ব্যবহার করিয়া মুখ নাড়িতে পারে, সে বিষয়ে ল লওয়া আবশ্যক। যতই তাহারা চর্ব্বণ করে এব মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইয়া উদরে যায়, দুগ্ধে পরিমাণ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

দুই বেলা দোহনের পূর্ব্বে জাব দেওয়া ভাল, তাহা কেবল মাত্র যে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা নহে গাভী স্বচ্ছন্দে দোহন করিতে দেয়। দোহনের সম যদি কেহ গলকম্বলে হাত বুলাইয়া দেয় তাহা হইলে অনেক "দুধচোরা" গাভীও দুধ ছাড়িয়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে আরও দু'একটী কথা বলিয়া রা প্রয়োজন মনে করি। যদি গাভী নিতান্ত চঞ্চল হয় এবং দোহন করিতে দিতে না চাহে, তাহাকে শা করিয়া তবে দোহনের চেষ্টা করা উচিৎ। তাড় করিলে ও ভয় দেখাইলে দুধ কমিয়া যাইবে। দোহনে সময় যাহাতে বাঁটে নখ না লাগে—সে বিষয়ে লক্ষ রাখিও।

গরু যতই ছাড়া রাখিতে পারা যায় ততই মঙ্গ গাভীর পক্ষে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রা ভিন্ন গোশালায় গাভী বন্ধ রাখা একেবারেই উচিৎ নহে ছাড়া থাকিতে পাইলে পশুগুলির স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহার দুধের গুণ বৃদ্ধি পায়। রৌদ্রে শীতে বা বর্ষা যাহাতে কোন রকম আশ্রয় পায়, সে বিষয়ে কো

প্রকার উপায় নিকটে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে যে সময় আশ্রয় গ্রহণ করা উচিৎ, সে সময় তাহারা আশ্রয় লইবে। মাঠের মধ্যে, বট বৃক্ষের ন্যায় বৃক্ষের তলদেশ, অথবা খড়ের ছাউনী দেওয়া দো-চালা স্থান সাময়িক আশ্রয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

ব্যস্তবাগীশের ব্যায়াম

[জনৈক ব্যস্তবাগীশ ডাক্তার-লিখিত।]

ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে সেই ১৯০৫ সাল থেকে অনেকেই অনুভব করেন; কিন্তু কাযের বেলায় এই ব্যাপারটার অনুশীলন কর্ত্তে বড় একটা কাউকে দেখি না। অনেকেরই মস্ত অছিলা—"মশাই, ব্যায়াম কর্ত্তে ত খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু সময় পাই না!"

সময়ের অছিলায় লোকের কিন্তু নিয়মিত দাড়ী

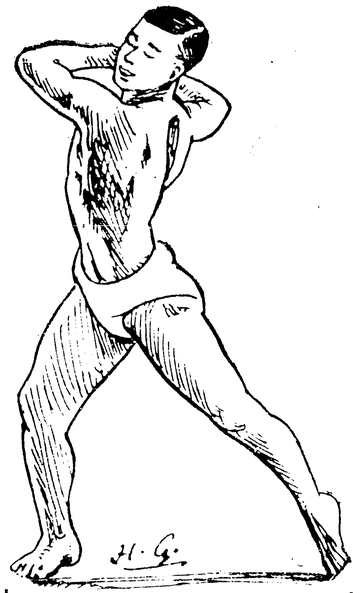

[চিত্র নং ১]

এই ব্যায়ামটি কাঠুরিয়াদের কাঠ কাটার সর্ব্বপ্রাথমিক অবস্থার ন্যায়। দুই হস্তের অঙ্গুলি পরস্পর দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকিবে। ক্রমান্বয়ে একদিকের পা ও বিপরীত দিকের বাহু অগ্রবর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে।

[চিত্র ২]

এই ব্যায়ামটি প্রথম ব্যায়ামটিরই বিপরীত দিক্। এই দুইটি ব্যায়ামে দেহকাণ্ডের প্রায় সব বড় বড় পেশী-গুলিই পুষ্ট হয়; পদদ্বয় ও হস্তদ্বয়ের পেশীরও রীতিমত ব্যায়াম হয়।

কামানো, চুল ছাঁটা, টেরী বাগানো, কোঁচা দিয়ে ফর্সা কাপড় পরা, জুতো-ব্রুস্ করিয়ে নেওয়া, তাস খেলা, থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখা, বন্ধুদের সঙ্গে বড় বড় রাজনীতির শ্রাদ্ধ করা—কিছুই বাদ যায় না। যেটা এসব গুলোর চেয়ে বেশী দরকারী, যেটার অভাবে চিনির পুতুল—দেহখানা একটু রোগের বারিপাতে গলে যেতে পারে, যেটার চর্চ্চায় চুলকাটা বা টেরী কাটার চেয়ে কম সময় লাগ্‌তে পারে, সেইটার বেলায় 'সময় পাই না'!

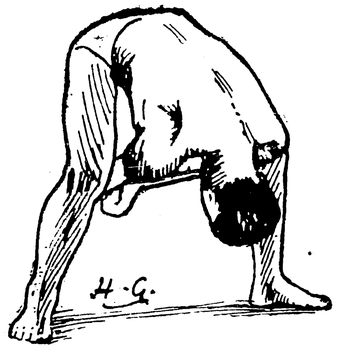

[চিত্র নং ৩]

এই ব্যায়ামটি অনেকটা কাঠুরিয়াদিগের কাঠ-কাটার দ্বিতীয় অবস্থার মত; তবে পরস্পর বদ্ধ করাঙ্গুলি সমেত বাহুদ্বয় টান্-টান্ করিয়া উরুদ্বয় মধ্যবর্ত্তী ফাঁক্ দিয়া প্রসারিত হইবে। ইহাতে মেরুদণ্ড শক্ত হয়, যকৃৎ ও পাকস্থলী প্রভৃতির যথেষ্ট ব্যায়াম হয় এবং সহজে কোষ্ঠ পরিষ্কারেও সাহায্য করে।

বস্তুত, একটু চিন্তা করে' দেখ্‌লেই আমরা বেশ বুঝ্‌তে পারি যে, প্রত্যহ কিছুক্ষণের জন্য একনিষ্ঠভাবে ব্যায়াম করায় শরীরে যে লাবণ্য ফুটে উঠে, ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীরে ফ্যাকাসে চাম্‌ড়া-ঢাকা তোব্‌ড়া গাল কামিয়ে তার চেয়ে অনেক কম লাবণ্যের বিকাশ হয়। শিখেদের একগাল দাড়ী, অথচ দেখ্‌তে—কি জ্যোতিস্মর মনোহর! আর অনেক বাঙালী বাবু গোঁফ্ দাড়ি কামিয়ে "গোবিন্দ অধিকারী" সেজে যেন শ্মশানের প্রেত-মূর্ত্তি!

বাঙালী জাতটা আজ ভীরু, দুর্ব্বল, অলস...আগে তাদের পূর্ব্ব পুরুষরা দিগ্বিজয় করে' এসেছে...আজ তাদের শক্তি-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কেন ...ইত্যাকার আলোচনা ও কবিদের উন্মাদনাময়ী উক্তি

[চিত্র নং ৪]

চিত্র নং ৪ হইতে ৮ পর্য্যন্ত একটি ব্যায়ামেরই বিভিন্ন অংশ বা অবস্থা মাত্র। পদদ্বয় ফাঁক্ রাখিয়া মুষ্টিবদ্ধ বাহুদ্বয় প্রসারিত কর। পা দুইটি ঠিক রাখিয়া, হস্তদ্বয় ও মস্তক সমেত দেহকাণ্ডটি ৯০ ডিগ্রী দক্ষিণে বা বামে ঘুরাও। তারপর.....

দিয়ে বর্ত্তমান্ প্রবন্ধের পাতা ভরাবার প্রয়োজন নে না; তার উপর আমার সে সময়ও নেই, কারণ আ একজন ব্যস্তবাগীশ ডাক্তার। ছেলেবেলা থে আমারও ব্যায়াম-চর্চ্চার দিকে মস্ত একটা টান্ ছি

যেমন পতির প্রতি সতীর টান্ থাকে। তখন স্বদেশী আমলের হুজুকে পড়ে' কিছুদিন ডন্-বৈঠক আর লাঠিখেলার কসরৎ প্রবল উৎসাহে মক্স করেছিলুম। তারপর যখন স্বদেশী আন্দোলনের হাওয়া জুড়িয়ে গেল, বাবা বইয়ের বস্তা গলায় বেঁধে কলেজের কুম্ভীপাকে জুড়ে দিলেন, তখন দ্বিচারিণীর মতো ব্যায়ামের নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেলুম। তদবধি ঐ সময়াভাবের ওজরটি সমান্ টানে চলে' আস্‌ছিল।

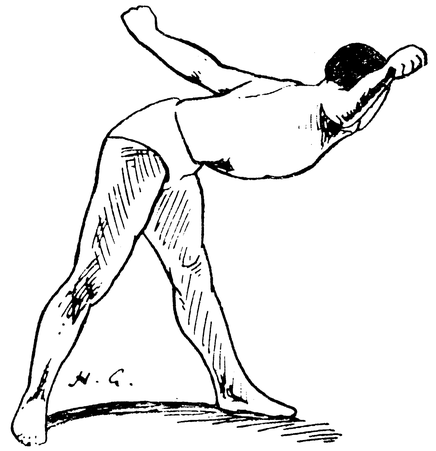

[চিত্র নং ৫]

...তারপর পাখী উড়িবার সময় যেমন করিয়া ডানা মেলে, ঠিক সেইভাবে হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া দেহকাণ্ডটি নীচু করিয়া দাও। এই দুইটি ব্যায়াম বক্ষ পৃষ্ঠদেশ ও বাহুর পশ্চাদ্দিকের পেশীগুলি বর্দ্ধনে সহায়তা করে।

কিন্তু কিছুদিন আগে যখন যৌবনের মাঝামাঝি, প্রাক্‌টিসের খর-সূর্য্যের দ্রুত উদয়ে, স্বাস্থ্যের পৌরোহিত্য কর্‌তে দিবা রাত্র মটরে চড়ে', অসময়ে মানাহার করে' ও নিদ্রা গিয়ে, শরীর ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হইতে লাগ্‌ল—একটু প্রস্রাবের দোষ—একটু বাতের আমেজ—একটু অম্বের উদ্গার উঠ্‌তে লাগ্‌ল, তখন প্রমাদ গণ্‌লুম—পুরাতন বিস্মৃত পতির কথা মনে পড়ে' গেল। কিন্তু সেই সনাতন 'সময়ের অভাব',—কি করি? এমন একটা পদ্ধতি খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম, যাতে ব্যায়ামের ফলটা পুরামাত্রায় পাওয়া যায়, অথচ সময় খুব কম লাগে। আপনারা জানেন বোধ হয় যে, পাঁচ আনার দক্ষিণায়

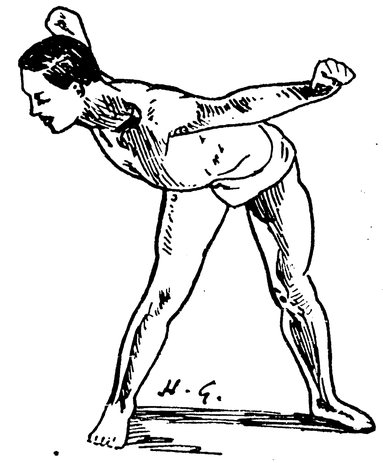

[চিত্র নং ৬]

এই ব্যায়ামটি ৫ নং ব্যায়ামটির বিপরীত দিক।

পুরোহিত পারলৌকিক শ্রাদ্ধ বা শ্যামাপূজা পাঁচ মিনিটে সেরে দেন, আবার পাঁচ টাকা দক্ষিণায় পাঁচ ঘণ্টাও সময় লাগে; পুরোহিতেরা বলেন—ফল কিন্তু প্রত্যেকটাতেই সমান।

দেশী-বিদেশী অনেক স্বাস্থ্যার্চ্চকদের সঙ্গে দেখা ও পত্র-বিনিময় কর্‌লুম; বিদেশী অনেক স্বাস্থ্য ও শক্তি-বিষয়ক পুস্তক-পত্রিকাদি পাঠ কর্‌তে লাগ্‌লুম। প্রায় সকলেরই কিন্তু লম্বা বৃষোৎসর্গের ফর্দ্দ। তারপর এই সব দর্শন, শ্রবণ ও পঠন থেকে যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হ'ল, সেই টুকুকে নিংড়িয়ে "সহজিয়া প্রেমের" মতো একটা ব্যায়ামের সোজা সংক্ষিপ্ত সড়ক বা'র করে' ফেল্লুম। প্রায় আড়াই বৎসরকাল এই ব্যায়ামগুলির চর্চ্চা করে' আমি অনেক উপকার পেয়েছি, আমার শরীর-ভাঙনের উপক্রম থেমে গেছে; মানাহারের

অনিয়মটা বাধ্য হয়ে' প্রায় পূর্ব্বের মতোই বজায় রেখেও এই ব্যায়াম পদ্ধতি দ্বারা যতটা মঙ্গল পেয়েছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ বিষয়ে একটু বেশী নিয়মনিষ্ঠার অনুসরণ কর্‌লে এর দ্বারা অনেক বেশী মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে। সম্প্রতি আমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব

চিত্র নং ৭।

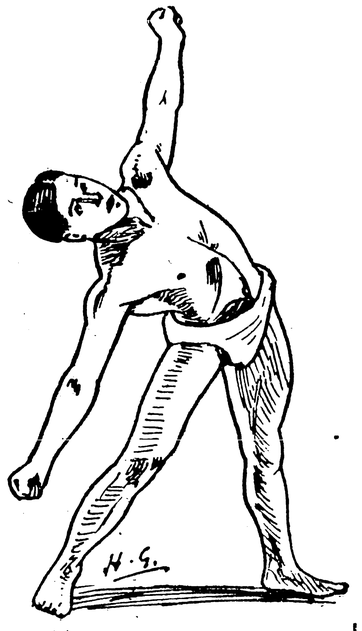

তারপর ৫ বা ৬ নং ব্যায়ামের অবস্থা হইতে দেহ কাণ্ডটিকে স্বাভাবিক ভাবে আনিয়া, একদিকের কোমর ভাঙিয়া উরুর সহিত সমান্তরালে ঐ দিকের মুষ্টিবদ্ধ হাতখানি ঝুলাইয়া, অন্য হাতখানি উর্দ্ধে তুলিয়া দাও।

এটা অভ্যাস করে' বেশ-একটু সুফল পাচ্ছেন্। উকীল, ব্যারিষ্টার, ছাত্র, কেরানী, ডাক্তার প্রভৃতি আমার মতো ব্যস্তবাগীশ্ যাঁরা—তাঁরা বেশ সুবিধার সঙ্গে নিম্ন প্রদর্শিত ব্যায়ামগুলির অভ্যাস কর্‌তে পারেন।

দুরারোগ্য রোগে দৈব মাদুলী ধারণ করবার মতো এতে তেমন কিছু বাছ-বিচার বা নিয়মের কড়া-কড়ি নেই। প্রভাতে শয্যা থেকে উঠেই এই ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করে' নেওয়া অভিপ্রেত। প্রদর্শিত আটটি ভঙ্গির এক একটিতে এক মিনিট নিয়োগ কর্‌লেই যথেষ্ট। এক একটি অবস্থা নিয়ে পেশীগুলি যথা সম্ভব শক্ত করে' মিনিটখানেক নিঃশ্বাস বন্ধ করে' রাখ্‌তে হয়; এবং তারপর এক মিনিট পরে পেশী শ্লথ করে' প্রশ্বাস নাক

চিত্র নং ৮।

তারপর পুনরায় স্বাভাবিক দাঁড়াইবার অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া, এক এক পার্শ্বে দেহকাণ্ড বাঁকাইয়া বাহুদ্বয় মেলিয়া বুক চিতাইয়া পশ্চাৎ-ভাগটিকে ধনুকাকারে স্থাপন কর।

দিয়ে ফেলে দিতে ও পুনরায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে আর একটি অবস্থা গ্রহণ কর্ত্তে হয়। ব্যায়ামের সময় মনকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত রাখ্‌তে হবে এবং মনে মনে suggest করতে হবে যে, এতে পেশী সকলও পুষ্ট হচ্ছে, দেহে প্রচুর প্রাণশক্তির সঞ্চার হচ্ছে।...খাওয়া দাওয়ার আড়ম্বরের দরকার নেই। সব জিনিষ ঠিক সময়মত ও সাধ্য অনুযায়ী হওয়া উচিত।

আলোচনা

বঙ্গদেশে বসন্ত।—

কলিকাতায় এবার বসন্তের প্রকোপ খুব বেশী। বসন্ত কলিকাতায় আগেকার সিদ্ধান্ত মত পাঁচ বৎসর অন্তর প্রবল হয় না। প্রতি বৎসরই এমনি সময়ে মার মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে। তা-ছাড়া সমগ্র বঙ্গদেশে বসন্ত রোগের প্রবল প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। বসন্ত নিবার্য্য ব্যাধি। অন্যান্য দেশে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করায় বসন্ত ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ দেশে বসন্ত প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিতেছে। পূর্ব্বে যখন গো-বীজের এবং মনুষ্য-বীজের টিকা প্রচলিত ছিল—টিকাদারেরা বসন্তের টিকা-যুক্ত একটী গো-বৎস বা নিম্ন শ্রেণীর শিশু আনিয়া তাহার বীজ হইতে টিকা দিত। তখন টাটকা বীজ পাওয়া যাইত বলিয়া, টিকা যেমন সফল হইত, টিকা যাহাকে দেওয়া হইত, সেও তদ্রূপ বসন্তের আক্রমণ প্রতিষেধ করিবার উপযোগী যথোচিত শক্তি লাভ করিত। কিন্তু টিকাবীজের ব্যবসায় আরম্ভ হওয়া অবধি—টিউবের ভিতর গ্লিসারিণে রক্ষিত বীজ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি—টিকা তেমন সফল হইতেছে না। এই ব্যবসাদারী টিকাবীজ তেমন শক্তিশালী বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই প্রতি বৎসর টিকা লওয়া দরকার হইয়া পড়ে, এবং লোকও বেশী বেশী মরে। টিকাবীজ ব্যবসায়ের পণ্য হইয়া পড়াতে টিকা দেওয়ার ব্যাপারে আগেকার সেই নিষ্ঠার অভাব হইয়াছে। তা'ছাড়া, টিউবের টিকা বীজকে সতেজ ও শক্তিশালী রাখিতে হইলে উহাকে বরফের ভিতর (below freezing point) রাখিতে হয়। এই গরম দেশে তাহা সকল সময়ে তত সুবিধাজনক বা সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না। টিকাবীজকে যেরূপ যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে হয়, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা সেরূপ যত্ন লওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, টিউবের টিকা এই গরম দেশের তাদৃশ উপযোগী নহে। এ দেশে আগেকার মতন গো-বীজ বা মনুষ্যবীজ হইতে টাটকা বীজ লইয়া টিকা দেওয়ার প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। তাহা হইলেই টিকা দেওয়ার যথার্থ ফল পাওয়া যায়, লোকেও অকাল মৃত্যুর হাত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পায়।

বাতরোগ কি সংক্রামক ?—

মানব-শরীরে যে সকল রোগের আক্রমণ হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি সংক্রামক, আর কতকগুলি তাহা নয়। সুস্থ লোকে রুগ্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে যে সকল রোগ রুগ্ন ব্যক্তির দেহ হইতে সুস্থ দেহে সংক্রামিত হয়, তাহাদেরই সংক্রামক রোগ বলা হয়। বাকী সকল রোগই সংক্রামক নয়। বাত রোগ এ যাবৎ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়াই সর্ব্ব সাধারণের ধারণা ছিল। কিন্তু সংপ্রতি স্থির হইয়াছে—বাত রোগ সংক্রামক। ইংল্যাণ্ডের মেডিক্যাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট সংপ্রতি ১৭২১টি পরিবারকে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাত রোগ সংক্রামক। এই পরীক্ষার ফলাফলের বিস্তৃত বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই; সেই জন্য, কেমন করিয়া রুগ্ন দেহ হইতে এই রোগ সুস্থ দেহে সংক্রামিত হয় তাহা জানা যায় না। এবং বিস্তৃত বিবরণ না পাইলে এ সম্বন্ধে কোন মতামতও প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। তবে এ দেশেও বাত রোগীর অভাব নাই। এ সম্বন্ধে এ দেশেও পরীক্ষার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। বাত রোগ সংক্রামক কি না, কোন মধ্যবর্ত্তীর সহায়তায় ইহা সংক্রামিত হয় কি না, অথবা অন্য কোন উপায়ে সংক্রামিত হয়, তাহা রীতিমত পরীক্ষা করিয়া স্থির করা আবশ্যক। বাত রোগের যে সকল কারণ এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে, বাত রোগকে সহসা সংক্রামক বলিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়। যদি পরীক্ষার ফলে বাত রোগ সংক্রামক বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক হইতে পারে।

সম্পাদকের ডাকবাক্স

পত্র নং ১।—...(ক) "গত ১০।১২ দিন হইল আমাদের বাড়ীতে একটা বিড়াল আন্দাজ ২-২৷৷০ হাত একটা ছোট জাতীয় সর্পকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাকে মধ্যস্থলে কাম্‌ড়াইয়া ধরে এবং মারিবার চেষ্টা করিতে থাকে। সর্পটিও বিড়ালটিকে অনবরত দংশন করিতে থাকে। এইরূপ প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধের পর বিড়াল সর্পটিকে মারিল। অতঃপর বিড়ালটি সর্পটিকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া নিকটেই তুলসী গাছের জঙ্গল ছিল, তাহার ভিতর প্রবেশ করিল এবং কতকগুলি তুলসী পাতা চর্ব্বণ করিয়া খাইল ও প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ তুলসী গাছের সহিত গা ঘর্ষণ করিতে লাগিল। তারপর হইতে বিড়ালটি এখনও জীবিত আছে। তুলসী গাছের কি বিষ নিবারণী শক্তি আছে? বিড়ালটির ঐরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি? তুলসী গাছের বৈজ্ঞানিক ও আপনাদের মতে গুণ কি? (খ) গাছ গাছড়ার যে দেশ-ভেদে নানাপ্রকার নাম হয়, সেই প্রকার পুস্তক কোথায় এবং কি মূল্যে পাওয়া যায়?"—শ্রীগৌর কিশোর কুণ্ডু, বিশ্বনাথঘাট (আসাম)।

উত্তর নং ১।—(ক) শাস্ত্রে তুলসী পাঁচ প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে কুঠেরক ও ফণিজ্জক নামক তুলসী আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই; প্রথমটির বাংলা নাম কৃষ্ণ তুলসী ও শেষেরটির নাম রাম তুলসী। মহর্ষি চক্রদত্ত—কৃষ্ণ তুলসীর মূল চূর্ণ করিয়া বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে সঞ্চালিত করিলে বিষ ক্ষয় হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গসেন—রামতুলসীর রস লেপন করিলে বোল্‌তা-ভীমরুলের বিষ প্রশমিত হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞই তুলসী দ্বারা সর্প বিষ বিনষ্ট হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। রামতুলসীর 'ফণিজ্জক' প্রতিশব্দটি শুনিলে কিন্তু ইহার ঐ গুণটি সম্বন্ধে একটি ধারণা জন্মে। যাহা হউক এ বিষয়ে নব্য চিকিৎসাশাস্ত্র কিছুই অনুসন্ধান করেন নাই, সুতরাং মত প্রকাশ করিতে অক্ষম। কথিত তুলসী গাছের জঙ্গলের মধ্যে অন্য কিছু গাছ ছিল কি না অনুসন্ধান করিবেন। (খ) ২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ উপেন্দ্রনাথ সেন ও দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত "দ্রব্যগুণ" অথবা ১৮ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতাস্থ নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ প্রণীত দ্রব্যগুণাভিধান নামক পুস্তক সম্ভবতঃ আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে। মূল্য খুব সম্ভবতঃ দেড় টাকা।

পত্র নং ২।—(ঘ) আমার পিতাঠাকুর মহাশয় বাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।...বাতে বেশী গা-হাত-পা কন্‌কন্ করিলে একটু আফিং খাইলে কিছু আরাম উপভোগ করেন। ইহার প্রতিকারের উপায় কি? প্রকৃত পক্ষে আফিং খাওয়া উচিত কি না?—শ্রীচুনিলাল নায়েক, মেদিনীপুর।

উত্তর নং ২।—আপনার ক ও খ নং প্রশ্ন বিষয়ে আমরা 'মাধবী' পত্রিকার সহিত একমত নহি। ঐ বিষয়ে আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গ নং প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আনন্দ মনের জিনিস—উহা বাহিরের কোনে কার্য্যকারক দিতে পারে না। ব্যায়ামের সময় মন সংযোগ করিয়া থাকিবেন এবং একটু পরিশ্রম বো করিলে ত্যাগ করিবেন। অজীর্ণের প্রতিকার সম্বন্ধে গত চৈত্র "স্বাস্থ্য সমাচার" মাসের পত্রিকা দেখুন।...(ঘ বাতের তৈল নিয়মিত মালিস্ করুন ও মাছ মাংস প্রভৃতি আমিষ খাদ্য একেবারে বন্ধ করুন্। যন্ত্রণা বে হইলে আলুর খোসা-সিদ্ধ ঈষদুষ্ণ গরম জল দিয়া পা-হা অল্পে অল্পে ধুইয়া দিবেন। প্রত্যহ ভাত খাওয়ার প এক কলি রসুন্ বাটিয়া সামান্য জলের সহিত গিলি ফেলিতে দিবেন; গন্ধ অসহ্য বোধ হইলে কিছু নর খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া দিবেন। নিয়মিত আফি খাওয়ার অভ্যাস করা অভিপ্রেত নহে।

BLANK PAGE(S)

DOUBLE COLOUR PAGE

বাঙ্গালার গৌরব স্বদেশ-প্রত্যাগত মহাবীর

শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ গুহ (ওরফে গোবর)।

DOUBLE COLOUR PAGE

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৬শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল | ২য় সংখ্যা

বসন্ত-রোগ ও টিকা

বসন্তরোগে এদেশে প্রতি বৎসর বহু লোকের প্রাণ নষ্ট হইতেছে। আগে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, কলিকাতায় প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর বসন্তরোগ প্রবল আকার ধারণ করে। এখন দেখা যাইতেছে, সে ধারণা ভুল—প্রতি বৎসরই শীতের শেষে কলিকাতায় বসন্ত রোগ খুব প্রবলভাবে দেখা দেয়।

বসন্তরোগ সম্পূর্ণ নিবার্য্য ব্যাধি। অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বসন্তের প্রকোপ দিন দিন কমিতেছে। এদেশে কিন্তু সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

বসন্তরোগ নিবারণের জন্য টিকাই একমাত্র ব্যবস্থা। ইহার কোন ঔষধ বা অপর কোন চিকিৎসা নাই। টিকা লইলে যে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইবার ভয় অনেকটা কমিয়া যায়, তাহা এ দেশের আপামর সাধারণ সকলেই জানে। সেকালে এদেশে বাঙ্গালা টিকার প্রচলন ছিল। সেই টিকা যাহারা লইত, এবং টিকা সফল হইত, তাহাদের আর বসন্তরোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকিত না। তাহার পর গো-বীজ বা মনুষ্য-বীজ হইতে ইংরাজী টিকা লইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহা টট্‌কা হইত বলিয়া বেশ সফলও হইত, বসন্তরোগে লোকে কম আক্রান্ত হইত। তার পর টিকার culture অর্থাৎ কাচের টিউবের (সরু নলের) মধ্যে গ্লিসারিণে রক্ষিত টিকার প্রচলন হইল। তাহার পর হইতেই টিকার সফলতা কমিয়া আসিল, রোগও প্রবল হইতে লাগিল।

ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, টিকায় বসন্ত-প্রতিষেধের থিয়োরীটা ভুল। তাহা নয়। টিকার বসন্ত-প্রতিষেধের শক্তি সম্বন্ধে কোন ভুল নাই। কেবল

টিকার ঠিকমত ব্যবহার না হওয়াতেই টিকা আজ কাল আর তেমন সফল হইতেছে না। এইজন্য টিকা ও তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

সম্প্রতি আমেরিকার জনসাধারণের স্বাস্থ্য-বিবরণীতে টিকার সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরের আকারে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। তাহা হইতে পাঠকেরা বুঝিবেন, কেন এ দেশে টিকা সফল হইতেছে না, এবং আমেরিকাতেই বা বসন্তরোগ টিকা ব্যবহারের ফলে কেন দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। তবে এখানে উল্লেখ থাকা ভাল যে, আমেরিকায় ইহাই টিকা সম্বন্ধে চূড়ান্ত মত নহে। বসন্তরোগ ও তাহার প্রতিষেধের উপায় সম্বন্ধে সেখানে আরও গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধান চলিতেছে। তাহার ফলে আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে; এবং বর্ত্তমান আলোচনার অনেক সংশোধন, পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন আবশ্যক হইতে পারে।

টিকা দিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি কি—এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চর্ম্মের নিম্নে বিদ্ধ করিয়া টিকা দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। যেখানে টিকা দিতে হইবে, সেই যায়গার চামড়া পরিষ্কার করিয়া টিকা দিতে হইবে। পরিষ্কার করিবার সময় যেন এমন ভাবে ঘর্ষণ করা না হয় যাহাতে চামড়া জ্বালা করে। পরে একটী ছুঁচ লইয়া সেই যায়গায় বিদ্ধ করিয়া এক ফোঁটা টিকার বীজ ঢুকাইয়া দিতে হইবে। টিকার আয়তন এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগের বেশী হইবে না। চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য acetone বেশ উপযোগী। এলকোহল অপেক্ষা ইহা অধিক ফলপ্রদ, এবং শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। ছুঁচটি নূতন ও তীক্ষ্নাগ্র হওয়া চাই: টিকা ব্যবহারের পূর্ব্বে ছুঁচের মুখ শোধন করিয়া লইতে হইবে। ছুঁচ ঠিক লম্বভাবে সোজাসুজি চামড়ায় বিঁধিতে হইবে না। ছুঁচটিকে কাত করিয়া, যেখানে টিকা দিতে হইবে, সেইখানে কোণাকৃণি অর্থাৎ সমান্তরাল ভাবে ধরিয়া আগে এক ফোঁটা টিকার বীজ তথায় ঢালিয়া, তাড়াতাড়ি বিঁধিয়া দিতে হইবে। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী উপরে ও বৃদ্ধাঙ্গুলী নিম্নে, রাখিয়া ছুঁচটিকে ধরিতে হইবে। ছুঁচের মুখ টিকাদারের বাম দিকে থাকিবে। এই ভাবে ছুঁচ ধরিয়া টিকাবীজের মধ্য দিয়া ছুঁচ চালাইয়া ৩০ বার চামড়ার নিম্নে বিঁধিতে হইবে। প্রত্যেকবার বিঁধিবার পর ছুঁচ চামড়ার ভিতর হইতে সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া লইয়া পরবর্ত্তীবার বিঁধিতে হইবে। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে তিরিশবার বেঁধা চাই। এইভাবে যথেষ্ট পরিমাণ টিকাবীজ ছুঁচের মুখে লাগিয়া চামড়ার ভিতর ঢুকিয়া যাইবে। ইহাতে রক্তপাত হইবে না, অথচ টিকা তাহার কাজ করিবে; ছয় ঘণ্টার মধ্যে টিকার দাগও মিলাইয়া যাইবে। টিকা দিবার অব্যবহিত পরে শোধিত তুলা দ্বারা অতিরিক্ত টিকাবীজ মুছিয়া লইতে হইবে। টিকা দেওয়া হইতে মুছিয়া লওয়া পর্য্যন্ত সব কাজ দশ সেকেণ্ডের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। টিকা বীজ যদি খুব সতেজ হয়, তবে, একবার বিঁধিলেই টিকা সফল হয়। পূর্ব্বে ছয়বার বেঁধা হইত। কিন্তু তাহাতে সব সময়ে টিকা সফল হইত না দেখিয়া, ৩০বার বিঁধিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে টিকা নিশ্চয়ই সফল হইয়া থাকে। যাহাকে প্রথমবার টিকা দিতে হইবে, তাহার টিকার কাজ খুব মৃদু হওয়া আবশ্যক। এরূপ ক্ষেত্রে দশবার বিদ্ধ করিলেই হয়। এমন কি, যদি টিকাবীজ যদি খুব সতেজ হয় তবে একবার বিদ্ধ করিলেই যথেষ্ট।

এই প্রণালীতে টিকা দেওয়ার একটা অসুবিধা আছে। খুব দক্ষ লোক বিলক্ষণ অভ্যাস না করিয়া এই প্রণালীতে টিকা দিতে পারে না। একটু অসাবধান হইলেই টিকা খুব বড় হইয়া ঘা হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে টিকা দিয়া শেষ করিতে হয় বলিয়া, দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাস অত্যন্ত আবশ্যক। নচেৎ টিকা দেওয়ার

অনেক ত্রুটি থাকিয়া যায়, এবং তাহার ফলও ভাল হয় না। তবে ইহাতে সুবিধাও যথেষ্ট আছে। এই টিকা যথেষ্ট পরিমাণে মৃদু। টিকা দিবার সময় টিকা গৃহীতার কোন কষ্ট হয় না। আর খুব শীঘ্রই কাজ শেষ হইয়া যায়।

ইহার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে—টিকা দিবার পর কি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। তাহার উত্তর এই যে, কোন ঔষধের প্রয়োজন নাই। কেবল টিকা দিবার যায়গাটী ঠাণ্ডা ও শুষ্ক রাখা আবশ্যক। তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র টিকা উঠে। তবে টিকা যাহাতে ঘর্ষণের ফলে ছিঁড়িয়া না যায়, সেজন্য একটু সাবধান থাকিতে হয়। খুব ভারি কিম্বা আঁটসাঁট কাপড় জামা পরিলে টিকার ফোস্কা ছিঁড়িয়া যায়। ঘর্ম্ম হইলে শীঘ্র ফোস্কা শুকায় না। এলকোহল দিয়া বার বার ধৌত করিলেও মামড়ি ভিজা থাকে শুকায় না। টিকার রস লাগিয়া কাপড় চোপড়ে যাহাতে দাগ না হয় সেজন্য জামার হাতার ভিতরের দিকে শোধিত তুলা বাঁধিয়া রাখা চলে, কিন্তু টিকার উপর কোন কিছুই বাঁধিবার প্রয়োজন নাই। তবে টিকার ঘা যদি খুব বড় হয়, তবে কিছু শোধিত তুলা দিয়া টিকা ঢাকিয়া রাখা যাইতে পারে। প্রথম টিকা চৌদ্দ দিন পরে পরিদর্শন করিতে হইবে।

পায়ে টিকা দেওয়া চলে কি না এইরূপ প্রশ্ন উঠিলে, তাহার উত্তর—না, চলে না। পায়ে প্রায় সর্ব্বদা জল লাগে। ধুলা লাগিয়া টিকা বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তিরা পায়ে প্রথমবার টিকা লইলে রক্ত দূষিত হইয়া পড়ে, টিকার চারিদিক লাল হইয়া উঠে, টিকা বড় হইয়া যায়, আর খুব ধীরে ধীরে শুষ্ক হয়। ইহার দরুণ টিকা গৃহীতা কাজকর্ম্ম করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে হাতে টিকা লইলে টিকা বিবর্ণ হয় না, টিকার দাগ বেশ স্পষ্ট উঠে, অথচ, হঠাৎ কাহারও নজরে পড়ে না।

আর কোন রকম প্রণালী উপযোগী কি না এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে। অন্য প্রণালীও চলিতে পারে যদি টিকা বীজ চামড়ার নীচে গভীর স্তরে ঢুকাইয়া দিতে পারা যায়। তবে টিকার আয়তন খুব বড় না হয়, এবং অন্য কোন অসুবিধা বা ক্ষতি না হয়। টিকার ঘা যেন বিকট না হইয়া পড়ে।

টিকা দিবার দুই দিন পর হইতে টিকা পরীক্ষা করা আবশ্যক। টিকার পূর্ণ পরিণত কতদিনে হয় তাহা দেখিতে হইবে। টিকা লইবার পর ৮ ঘণ্টা হইতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টিকার পূর্ণ বৃদ্ধি ঘটে। ঐ সময়ের মধ্যে টিকাটী বিলক্ষণ লাল হইয়া উঠিয়া ক্রমে ফিকে হইতে থাকে। লাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে মামড়িটী পার্শ্ববর্ত্তী চামড়া হইতে অল্প উঁচু হইয়া উঠে। ইহা চোখে দেখা যায়, কিম্বা ইহার উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইলেও টের পাওয়া যায়।

টিকা লইলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে কি না, এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। সাবধানে টিকা লইলে কোন আশঙ্কা নাই। টীকা বিশুদ্ধ হইলে, টিকার আয়তন যথোচিত হইলে, টিকা শুষ্ক ও ঠাণ্ডা রাখিলে, এবং কাঁচা মামড়ী ছিঁড়িয়া না গেলে, অধিকাংশ স্থলেই টিকা যথাসময়ে শুকাইয়া মামড়ী উঠিয়া যায়। টিকায় যথোচিত হাওয়া লাগাইলে, হাল্‌কা জামা গায়ে থাকিলে এবং সামান্য ঘর্ষণ লাগিলে টিকা স্বভাবতঃই দৃঢ় হইয়া শীঘ্রই মামড়ী শুকাইয়া যায়। প্রথমবার টিকা লইবার সময় খুব সাবধানে থাকিতে হইবে।

পূর্ব্ব হইতে চর্ম্মরোগ থাকিলে, চামড়া ধৌত করিয়া ঐ রোগের বীজ সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় না। এরূপ স্থলে, টিকা লইলে, ঐ টিকা পূর্ব্বোক্ত রোগের বীজাণু দ্বারা দূষিত হইতে পারে। ফলে টিকার আয়তন বাড়িয়া যায়। এরূপ হইলে টিকা শুকাইতে বিলম্ব ঘটে। টিকা এইভাবে বিকৃত হইয়া গেলে mercury bichloride solution প্রভৃতি তীব্র বিশোধক ঔষধের দ্বারা ঘা ধৌত করা যাইতে পারে। টিকার আয়তন যথেষ্ট বড় হইলে, বিশোধক ঔষধাদি দ্বারা ধৌত করিলেও টিকা ব্যর্থ হইবে না—তাহার

বসন্ত-প্রতিষেধক গুণ অব্যাহত থাকিবে। চূর্ণ ঔষধ বা মলম ব্যবহার করা অপেক্ষা ধৌত করা সমধিক ফলপ্রদ। কখনও কখনও টিকা ছিঁড়িয়া গিয়া ঘা ভয়ানক হইয়া উঠে। তখনও বিশোধক ঔষধের দ্বারা টিকা ধৌত করা উচিত। কচি ছেলে মেয়েদের টিকা দেওয়া হইলে বাড়ের মুখে টিকা বড় শুড় শুড় করে। তখন শিশুরা চুলকাইয়া আঁচড়াইয়া কাঁচা মাংড়ী ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঘা অত্যন্ত বিশ্রী করিয়া ফেলে। তাহারা যাহাতে নখ লাগাইয়া আঁচড়াইয়া টিকা ছিঁড়িয়া ফেলিতে না পারে সে পক্ষে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

টিকা দিবার পূর্ব্বে চামড়া ধৌত করিবার সময় অনেক টিকাদার এমন সজোরে ঘর্ষণ করে যে, চামড়ার উপরকার পাতলা পর্দ্দা উঠিয়া যায়। তাহার উপর টিকা দেওয়া হইলে টিকা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ভয়ানক ঘা হয়। আবার শরীরের অন্যান্য স্থানে ঘা থাকিলে টিকার রস লাগিয়া ঐ সকল স্থানেও বিশ্রী ঘা হয়।

যে কৃত্রিম বসন্ত রোগ উৎপাদন করা টিকা দেওয়ার উদ্দেশ্য, প্রকৃত পক্ষে সাধারণভাবে সে রকম বসন্ত রোগে গুটি সর্ব্বদেহে বাহির হয় না। তবে যখন টিকার পূর্ণ পরিণতি ঘটে, তখন গায়ে কিছু কিছু গুটি বাহির হয়, কিম্বা তাহার পরেও বাহির হইতে পারে। গোড়ায় যদি বাহির হয় তবে সেগুলা হামের মত দেখিতে হয়। পরে বাহির হইলে গুটিগুলি সংখ্যায় কিছু বেশী হয়। এই সকল গুটি বা হাম শীঘ্রই মিলাইয়া যায়, এবং কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় না, বা চিকিৎসারও প্রয়োজন হয় না।

টিকার বীজ সতেজ না হইলে টিকা নিষ্ফল হয়। টিকা যাহাতে নিষ্ফল না হয়, সেজন্য টাট্‌কা সতেজ বীজ ব্যবহার করা উচিত। বীজ সতেজ না হইলে টিকা হয় উঠে না, না হয় সামান্য মাত্র দাগ পড়ে। টিকার বীজ টাট্‌কা হওয়া চাই, তাহা খুব শীতল স্থানে রক্ষিত হওয়া চাই। টিকা বীজের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে, একাধিক স্থানে টিকা দেওয়া উচিত তাহা হইলে একটা নিষ্ফল হইলেও অন্যটা সফল হইতে পারে।

টিকা যে শক্তিশালী তাহা বুঝা যায় কিরূপে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। এই বীজের দ্বারা, আগে যাহার কখনও টিকা দেওয়া হয় নাই এমন, একশত জনকে টিকা দিলে শতকরা একশতজনেরই টিকা উঠিবে, একটীও নিষ্ফল হইবে না। যাহাদের একবার টিকা দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের বসন্ত হইয়াছিল, এমন এক শত লোককে এই বীজের দ্বারা টিকা দেওয়া হইলে শতকরা ৫০ জনের অধিক টিকা সফল হইবে।

টিকাবীজ রক্ষা করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় কি?— যত ঠাণ্ডায় রাখা যাইবে ততই ভাল। যে শৈত্যে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, তদপেক্ষা ঠাণ্ডায় রাখিতে হইবে। কেবল বরফের বাক্সে রাখিলেই যথেষ্ট হয় না। ঠাণ্ডা অন্যান্য সেরাম কিম্বা টিকার ন্যায় বসন্তের টীকাবীজের কোন ক্ষতি হয় না। কারখানা হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার সময় এক দিন মাত্র বরফের ভিতর হইতে বাহির করিলে বসন্তের টিকাবীজের শক্তি কমিয়া যায়। বরফের ভিতর হইতে বাহির করা টিকাবীজের দ্বারা পূর্ব্বে যাহাদের একবারও টিকা দেওয়া হয় নাই, এমন ব্যক্তিদের টিকা দিলে, যদি শতকরা ৮০।৯০ জনের টিকা সফল হয়, তাহা হইলে সাধারণ বসন্তের প্রকোপের সময় উহার দ্বারা কাজ চলিতে পারে; কিন্তু বসন্তের প্রবল প্রকোপের সময় তাহা অচল। এরূপ স্থলে বীজ কারখানা হইতে সদ্য সদ্য আনিয়া বরফের ভিতর রাখিয়া দিতে হইবে। যে ঘরে বরফ তৈয়ার করা হয়, সেইখানে টিকাবীজ রক্ষা করা ভাল কিম্বা কোন ধাতুময় বা কাচের পাত্রে বীজ রক্ষা করিয়া তাহা বরফের ভিতর রক্ষা করিতে হইবে বীজ স্থানান্তর করিবার সময়ও বরফের ভিতর স্থাপন করিয়া চালান দিতে হইবে। সাধারণতঃ শীতকালে বসন্তের প্রকোপ বেশী হওয়ায় ঐ সময়েই বেশী বীজের

দরকার হয়; এবং তাহা কারখানার ল্যাবরেটারী হইতে আমদানী করিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করা হয়, তাহাতে কোন অসুবিধা হয় না। বসন্তের প্রবল প্রকোপের সময় টিকা বীজের শক্তিশালিতা সন্দেহজনক হইলে একাধিক স্থলে টিকা দিতে হইবে, এবং ভিন্ন ভিন্ন কারখানার বীজ ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথম এক জায়গায় টিকা দিয়া তাহার অন্ততঃ এক ইঞ্চি তফাতে অন্য টিকা দিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত বীজের শক্তি বিভিন্ন প্রকার। তবে ইদানীং প্রায় সকল কারখানাতেই একই ধরণে একই প্রকার শক্তিশালী বীজ প্রস্তুত হইতেছে।

টিকা দিবার পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে টিকার স্থানটা সামান্য ফুলিয়া লাল হইলে, লোকটিকে নিরাপদ বলা যায় কি না—তাহার বসন্তের দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে কি না? না, তাহা বলা যায় না। তাহার কারণ তিনটী। টিকার শক্তি কম হইতে পারে। কেবল ফুলিয়া লাল হইলেই তাহার শক্তিশালিতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যায় না। পুরাতন বীজ বরফের ভিতর হইতে বাহির করিয়া রাখা হইলেও, তদ্দ্বারা ঐরূপ টিকা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা শক্তির পরিচায়ক নয়। সেইজন্য পঞ্চম কিম্বা সপ্তম দিনে আবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য— টিকা ঠিকমত পরিণতি লাভ করিতেছে কি না। তবেই বুঝা যাইবে—লোকটী নিরাপদ হইল কি না। ভাল বীজ হইলে তিন দিনের মধ্যেই টিকার স্থান সম্পূর্ণ লাল হইয়া উঠে। প্রথমেই যে প্রণালীতে টিকা দেওয়ার বর্ণনা করা হইয়াছে, অন্যান্য প্রণালী অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্টতর বলিয়া, এই প্রণালীতে শীঘ্র শীঘ্র টিকা উঠে। এই টিকাকেই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলা চলে। বীজের শক্তির দরুণও টিকা লাল হইতে পারে, আবার চামড়া বিদ্ধ করার দরুণও স্থানটা লাল হইতে পারে। যে লালিমা টিকার শক্তির ফল, তাহাই আকাঙ্ক্ষনীয়। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়—লালিমার প্রকৃত কারণ কি—চামড়া বিদ্ধ করা অথবা টিকার শক্তি। এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইবার জন্য প্রথম টিকার নিকটে অপর এক স্থানে ছুঁচের দ্বারা টিকার আকারে চর্ম্ম বিদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু বীজ দিবার দরকার নাই। এবং পরে এই দুইটীর বিভিন্নতা লক্ষ্য করিতে হয়। ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই বিভিন্নতা বেশ টের পাওয়া যায়। বীজশূন্য টিকার স্থানে কোন প্রদাহ, লালিমা বা অপর কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না।

খুব শীঘ্র ফুলিয়া উঠিলেও তাহাকে টিকার লক্ষণ বলা যায় যদি টিকাবীজ বিশুদ্ধ, টাটকা ও প্রচুর শক্তিশালী হয়।

টিকার আয়তন অপেক্ষা টিকা উঠিবার সময়ের তারতম্যের উপর টিকার সাফল্য ও শক্তি নির্ভর করে। যত শীঘ্র টিকা ফুলিয়া লাল হইয়া পরে কমিতে আরম্ভ করে, টিকা গৃহীতা ততই নিরাপদ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে টিকা বাহির হইল, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাহার পূর্ণ পরিণতি হইবে, এবং লোকটীও ততই নিরাপদ হইবে।

বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইতে হইলে কতবার টিকা লওয়া উচিত?—সাধারণতঃ পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া টিকা লইতে হয়। শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই তাহার টিকা দেওয়া উচিত। শীত ও বসন্তকাল টিকা দিবার প্রশস্ত সময়। একবার টিকা লইবার পর কতদিন পর্য্যন্ত তাহার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। বিভিন্ন লোকের দেহে এই শক্তির তারতম্য ঘটে। একই বীজের দ্বারা একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে টিকা দিলেও, উভয়ের দেহেই ঐ টিকা একই নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত শক্তিশালী নাও থাকিতে পারে। মনে কর, দুইজন লোক একটা বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতেছে। তাহাদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা অনুসারে কেহ উহা শীঘ্র শিখিবে, কাহারও বিলম্ব ঘটিবে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পর, কিছুদিন যদি আর উহার চর্চ্চা না করা হয়, তাহা হইলে

উভয়েই তাহা ভুলিতে আরম্ভ করিবে। ভুলিবার ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে ভুলিতে দুই জনের বিভিন্ন সময় লাগিবে—কাহারও কম সময়, কাহারও বেশী সময়। টিকার শক্তি সম্বন্ধেও এই একই অবস্থা কাজ করে। কাহারও পাঁচ বছরের মধ্যে একবার, কাহারও একাধিকবার টিকা লওয়া আবশ্যক হইতে পারে। কাহারও বা ২০ বৎসরের মধ্যে একাধিকবার টিকা লইবার দরকার হয় না। তবে নিশ্চিতভাবে নিরাপদ থাকিবার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, উৎকৃষ্ট বীজ জুটিলেই একবার করিয়া টিকা লওয়া।

বসন্তরোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অন্যান্য অবস্থার উপরও নির্ভর করে। কোথাও বসন্তরোগ প্রবল হইলে সেই স্থানের অধিবাসীদের অবস্থা, স্থানীয় অবস্থা, প্রকোপের প্রাবল্য প্রভৃতির দরুণ লোকের কম-বেশী আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। যে সকল স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীকে বসন্ত রোগের বিস্তৃতি ও রোগীদের অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতে হয়, তাহাদের আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী। সেইজন্য সাধারণের অপেক্ষা তাহাদেরই বেশী ঘন ঘন টিকা লওয়া দরকার।

টিকার আয়তন ও সংখ্যার উপর নিরাপদতার পরিমাণ কিম্বা নিরাপদ থাকিবার কালের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে কি না?—সামান্য পরিমাণেই করিয়া থাকে। তবে তাহা এত যৎসামান্য যে, সেজন্য খুব বড় বড় ও অনেকগুলা টিকা লইবার দরকার নাই। নিরাপদতা প্রধানতঃ নির্ভর করে বীজের শক্তি, তাহার টাট্‌কা অবস্থা ও যত অল্প দিন মাত্র কা লওয়া হইয়াছে—তাহার উপর।

কোন্ সময়ে টিকা লওয়া উচিত নয়?—চর্ম্ম রোগ, বিশেষতঃ একজেমা থাকিলে টিকা লওয়া উচিত নয়। কারণ টিকার বীজ ইহাতে সংক্রামিত হইতে পারে। যক্ষ্মা রোগীর বসন্তের টিকা লইতে কোন বাধা নাই। পুরাতন ছোঁয়াচে রোগ শরীরে থাকিলে, এমন অবস্থায় বসন্ত রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকিলে টিকা লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই টিকা উঠিতে বিলম্ব হয়।

টিকা লইয়া নিরাপদ হয় নাই এমন লোকের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয়ত কিছুই নাই। মৃদু বসন্তের প্রকোপের সময় টিকা না লইয়াও অনেক লোক রোগে আক্রান্ত হয় নাই এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তাই বলিয়া তাহাদে সম্পূর্ণ নিরাপদও বলা যায় না।

টিকা না উঠিলে, কোন ব্যক্তিকে নিরাপদ বল চলে না। খুব কচি ছেলে-মেয়েদের টিকা সহজে উঠে না, একটু বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের টিকা অপেক্ষাকৃ সহজে উঠে। তাই বলিয়া কচি শিশুরা নিরাপদ নয় বরং তাহারাই বেশী পরিমাণে আক্রান্ত হয়। অনে বয়স্ক লোকেরও টিকা উঠে না, অথচ, সেই টিকা অন্য লোকের দেহে সফল হয়। তথাপি তাহা নিরাপদ নয় স্বচ্ছন্দে বসন্তে আক্রান্ত হইতে পারে কেবল তাই নয়—এক জাতীয় বীজ নিষ্ফল হইলে অন্য শক্তিশালী বীজ হইতে তাহাদের দেহে টিক উঠে।

বসন্তরোগের সংস্রবে আসিবার কতদিন পর পর্য্যন্ত বসন্তের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ টিকা লও হইবামাত্র প্রত্যেক লোককে টিকা দেওয়া হয়। দিন লোকে বসন্তে আক্রান্ত হয়, সেই দিনই টিকা লওয়া হইলে এবং তাহা সফল হইলে লোকে নিরাপ হইতে পারে। আক্রান্ত হইবার পর কয়েক দিনে মধ্যে টিকা লইলেও আক্রমণ মৃদু হইতে পারে। করিতে পারে—দেহ কাহারও উপর প্রভাব বিস্তা করিতে পারে না।

বসন্তের গুটি বাহির হইবার পর টিকা লইলে তা যদি সফল হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ লোকে ম করে যে, ঐ গুটি বসন্ত রোগের নয়। সাধারণ লোকে বিশ্বাস, যথার্থ বসন্তরোগের গুটি বাহির হওয়া তৎসত্ত্বে টিকা সফল হওয়া—এই দুইটা বিষয় পরস্পরে মধ্যে খাপ খায় না। কাজেই বসন্তের গুটি বা

হইবার পর টিকা সফল হইতে পারে না। তবে কখনও কখনও, সাধারণের এই বিশ্বাস ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়া -- গুটি বাহির হইবার পর চতুর্থ দিনে টিকা লইলেও তাহা সফল হইতে দেখা যায়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বসন্ত বাহির হইবার বা টিকা লইবার পরও কোন কোন ব্যক্তির দেহে দ্বিতীয়বার টিকা সফল হইতে দেখা যায়। বসন্তরোগ ও তাহার টিকার মধ্যে এই গোলযোগ তিন অবস্থায় ঘটিতে পারে। বসন্ত নিবারণার্থ উপযুক্ত সময়ে টিকা লইলেও, সে টিকা বীজ হয় ত সতেজ, শক্তিশালী নয় বলিয়া টিকা উঠিতে অযথা বিলম্ব ঘটে, এবং বসন্ত রোগের বীজ তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া টিকা বীজের সাড়া জাগাইয়া দেওয়ায় টিকার গুটি উঠে এবং বসন্তের গুটিও উঠে। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, টিকাবীজ একেবারেই শক্তিহীন। সেরূপ ক্ষেত্রে টিকা দেওয়া যায়গায় প্রথমে টিকার ন্যায় বসন্তের গুটি বাহির হইতে পারে; এবং তাহাই টিকা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বিলম্বে টিকা লইলেও বসন্ত রোগের গুটি টিকার আকারে প্রথমে টিকা দেওয়া যায়গায় বাহির হইতে পারে।

এইরূপ অবস্থা প্রথম টিকা দেওয়ার সময়েই ঘটিতে পারে। যদি কারও আগে টিকা লওয়া হইয়া থাকে, এবং তাহার শক্তি তখনও তাহার শরীরে থাকে, তবে বসন্তের বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরও টিকা লইলে তাহা সফল হইতে পারে টিকা বসন্তের প্রতিষেধক হইতে পারে।

বসন্ত রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে কোন্ কোন্ লক্ষণ প্রধান? ইহার উত্তর সোজা নয়। বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও রোগ নির্ণয়ে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। তবে বসন্তের গুটি সর্ব্বদেহব্যাপী, ক্ষতগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র, রোগের গতি, প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ আছে। তা ছাড়া টিকা দিয়াও বসন্ত রোগ পরীক্ষা করা যায়। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি লক্ষণই প্রধান; কারণ, রোগীকে দেখিবা-মাত্র তাহা বুঝা যায়। বসন্ত রোগ অত্যন্ত সংক্রামক বলিয়া যত শীঘ্র সম্ভব নিশ্চিত রূপে রোগ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। বসন্ত রোগের গুটি সর্ব্বদেহ ব্যাপী ত বটেই, তাহার মধ্যেই আবার তাহার বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের বলেই নিশ্চিত রূপে বসন্ত রোগ নির্ণয় করা যাইতে পারে। রোগের প্রকোপ খুব মৃদু হইলেও গুটির সংখ্যা খুব কম হইলেও, চর্ম্মের প্রত্যেক অংশের গুটির সংখ্যা গণনা করিলেই, সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয়ের সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। এই সঙ্গে এ কথাটি বিশেষ করিয়া মনে করিতে হইবে যে, বসন্ত রোগ সর্ব্বদেহ-ব্যাপী দেহের কোন একটা বিশেষ অংশে আবদ্ধ নয়। ইচ্ছা বসন্ত ও পানবসন্তের পার্থক্যগুলি বেশ স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। ইচ্ছা বসন্তের গুটি শরীরের যে সকল অংশ উঁচু সেই সব স্থানে, শরীরের যে সকল অংশ বিস্তৃত করা যায় সেই সব স্থলের চর্ম্মের উপর, যে সব যায়গা চুলকায়, সেই সব যায়গায় বেশীর ভাগ বাহির হয়। যে সব যায়গা নীচু, আবৃত বা রক্ষিত, সেখানে গুটি কম বাহির হয়।

ইচ্ছা বসন্ত

১। বাহুর উপরিভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগে ইচ্ছা বসন্ত বেশী বাহির হয়।

২। ইচ্ছা বসন্তের গুটি মুখমণ্ডলে বেশী এবং বুকে ও পেটে কম দেখা যায়।

৩। পেট অপেক্ষা পিঠেই ইহার প্রকোপ বেশী।

৪। কাঁধে বেশী, কোমরে কম; বুকে বেশী, পেটে কম।

৫। হাত-পায়ে বেশী; মুখের কাছা-কাছি বাহুর অংশে বেশী।

৬। ক্ষত-গুলি সাধারণতঃ গভীর। উহারা শরীরের ভিতর দিক হইতে আসে।

৭। শরীরের যে সব যায়গায় দুই একটা করিয়া গুটি বাহির হয়, সেই যায়গার গুটিগুলি গোলাকার।

৮। এক সময়ের সকল গুটিই প্রায় দেখিতে একই প্রকার। যদি বিভিন্ন আকৃতিরও হয় তবে যে গুটি যত ছোট এবং মুখের যত কাছাকাছি, সে গুলি তত

বেশী পরিণত। মৃদু প্রকোপের বসন্তে গুটির আকারের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়।

পান বসন্ত

১। সাধারণতঃ বিশৃঙ্খলভাবে বাহির হয়। তবে সময়ে সময়ে চর্ম্মের কোন কোন স্থলে বেশী পরিমাণে চুলকণা হইয়া সেইখানে পানবসন্ত ঘনভাবে বাহির হইতে পারে।

২। হস্ত পদাদির সন্নিহিত স্থানগুলিতে দূরবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা বেশী পরিমাণে পানবসন্ত বাহির হয়।

৩। পেট ও বুকে মুখের সমান কিম্বা ততোধিক গুটি বাহির হইয়া থাকে।

৪। পিঠে যত পেটেও তত ক্ষত বাহির হয়।

৫। এই সকল স্থলে গুটির বিন্যাস বিশৃঙ্খল।

৬। হাতে পায়ে প্রায় হয় না।

৭। দেহের সুরক্ষিত অংশগুলিতে যে সব গুটি বাহির হইয়া ক্ষত হয়, সেগুলি বসন্ত বীজ দুষ্ট না হইলে ক্ষত অগভীর থাকে, ফোস্কা চামড়ার উপর উঁচু হইয়া থাকে এবং একটু চাপ লাগিলেই ফাটিয়া যায়।

৮। ক্ষতগুলির আকার বিভিন্ন রকমের হয়। অর্থাৎ কোথাও বা ডিম্বাকৃতি, কোথাও বা লম্বা।

৯। ক্ষত যত বড় হইতে থাকে—তাহাদের অবস্থিতি যেখানেই হউক না কেন, সর্ব্বত্র একই সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ব্বোক্ত বিবরণ কেবলমাত্র বসন্ত রোগের ক্ষত সম্বন্ধে প্রযুজ্য। এই সকল ক্ষত ধীরে ধীরে বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত হয়।

যে ক্ষেত্রে জ্বরের সঙ্গে চর্ম্ম দিয়া রক্তপাত হয় তাহাই বসন্ত। সেই রোগীকে তৎক্ষণাৎ স্বতন্ত্র করিতে হইবে এবং টিকা দিতে হইবে। বসন্তের নিশ্চিত লক্ষণ স্বরূপ স্ফোটক বাহির হইবার পূর্ব্বে অনুমানে রোগনির্ণয় করা তখনই সম্ভব যখন দেখা যায় যে রোগী বসন্ত রোগের সংস্রবে আসিবার পর ১২ দিন অতীত হইয়াছে, এবং প্রবল জ্বর হইতেছে। রোগ খুব কঠিন হইলে ক্ষত সম্পূর্ণরূপে ভর্ত্তি হইবার আশা থাকে না। প্রত্যেক

গুটির ক্রম পরিণতির সঙ্গে রোগের গতি লক্ষ্য করা
বসন্ত রোগ নির্ণয়ের সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায়। তবে
ইহা দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। শরীরে রোগবীজ প্রবে
করিবার পর ৮ হইতে ১৮ দিন পর্য্যন্ত শরীরের মধ্যে
পুষ্টিলাভ করে; তৎপরে বাহিরে রোগের লক্ষ
প্রকাশ পায়। রোগ যদি মৃদু হয় তবে তাহা
বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরও বেশী সময় লাগিতে
পারে। গুটি বাহির হইবার পূর্ব্বে ১ হইতে ৫ দি
জ্বর ভোগ হইতে পারে। ফলে দেহে রোগ প্রবে
হইতে বাহ্য লক্ষণ গুটি বাহির হওয়া পর্য্যন্ত অন্তত ১
দিন সময় লাগে। গুটিগুলি প্রথম চার দিন লালবর্ণে
ঘামাচির মত, পরবর্ত্তী চার দিন ফোস্কার আকা
থাকে। তারপর ২ হইতে ৬দিনে পাকিয়া পূঁয জমে
অবশেষে তাহা শুকাইয়া মামড়ী উঠিয়া যায়। রো
লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পর হইতে মামড়ী ওঠা পর্য্য
১৪দিন সময় লাগে। মামড়ী উঠিয়া যাইবার প
একটা লাল দাগ থাকিয়া যায়। তাহা ক্রমে সা
হইয়া যায়। সাদা হইতে কয়েক মাস, কিম্বা বৎসর
ধিক সময় লাগে। শরীরের যে সব অংশ উন্মু
থাকে যেমন মুখ হাত কপাল প্রভৃতি, সেই সব যায়গ
প্রথমে গুটি বাহির হয়। এবং সর্ব্বশেষে দে
নিম্ন ভাগে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে অনেক দিন স
লাগে। সাধারণতঃ রোগ যত প্রবল; ক্ষত তত ধী
ধীরে বাহির হয়। রোগ মৃদু হইলে শীঘ্র শীঘ্র
হইয়া যায়, এবং ক্ষতের দাগ প্রায় থাকেই না।

ল্যাবরেটারীতে শশকের দেহে বসন্তের ফো
রস চালিত করিয়া ৬০ হইতে ৭২ ঘণ্টা পরে Pau
Test পদ্ধতি অনুসারে শ্বেতবর্ণের গুটির সন্ধান
হয়, এবং আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা Guarni
রোগ বীজের সন্ধান করা হয়। ইহাতে বসন্তের নি
জানা গেলেও এই পরীক্ষা দীর্ঘকালসাপেক্ষ
বিপজ্জনকও বটে। সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল স
জনক হয় না, এবং ইহা তত সুবিধাজনক নহে।

যাহাদের আদৌ টিকা হয় নাই, তাহাদের ম

যে সাধারণতঃ বেশীর ভাগ লোক বসন্তে আক্রান্ত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাদের অপেক্ষা এমন কি যাহাদের একবারও অন্ততঃ টিকা হইয়াছে তাহারা কতকটা নিরাপদ। তথাপি, ইহাদের যে বসন্ত হইবে না, এ বিষয়ে নিশ্চয়তা কিছুই নাই। টিকা লওয়া হইয়াছে, টিকার চিহ্নও রহিয়াছে, অতএব এ ব্যক্তির বসন্ত হইবে না, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ নিশ্চিন্ত থাকিবার যে আদৌ অবসর থাকে না,তাহা বসন্ত রোগের প্রবল প্রাদুর্ভাবের সময় নিত্যই প্রত্যক্ষ করা যায়।

পূর্ব্বে টিকা লওয়া হইয়া থাকিলে বসন্ত রোগের উপর তাহার প্রভাব কিরূপ ?

যদি টিকা অল্প দিন মাত্র লওয়া হইয়া থাকে ও তাহা সফল হইয়া থাকে, তবে টিকা রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধ করিতে পারিবে। যদি অতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে টিকা লওয়ার দরুণ সম্পূর্ণ প্রতিষেধের সম্ভাবনা কম থাকে, তবে লোকে বসন্তে আক্রান্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার প্রভাব খুব মৃদু এবং অল্পদিনস্থায়ী হয়। দুই তিন দিন প্রবল জ্বর হইলেও পরে গুটি অল্পই বাহির হয়। তবে টিকা লওয়া সত্ত্বেও স্থল বিশেষে বসন্ত রোগ যে মারাত্মক হইতে দেখা যায় না এমন নহে। এই আক্রমণ তিনটি অবস্থার উপর নির্ভর করে—পুরুষ-পরম্পরাগত রোগপ্রবণতা, বসন্তের তীব্র প্রকোপ, এবং টিকার বহু পুরাতন অবস্থা।

যদি টিকার রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতা কমও হয়, বসন্তের গুটির সংখ্যা কমাইবার শক্তি যদি তাহার নাও থাকে তথাপি, যে সকল গুটি বাহির হয়, সেগুলা দীর্ঘকাল পূর্ব্বে টিকা লওয়া হইয়া থাকিলেও, মৃদু হয়। এরূপ স্থলে গুটিগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র, বিভিন্ন আকারের ও গঠনের হইয়া থাকে, তাহা তত গভীর কিম্বা তীব্র হয় না। মোট কথা, টিকা লওয়ার ফলে বসন্তে মৃত্যু সংখ্যা বহু পরিমাণে কমিয়া থাকে।

পান বসন্ত ও ইচ্ছা বসন্তের মাঝামাঝি কোন রোগ আছে কিনা ?

না, সেরূপ কোন মাঝামাঝি রোগ নাই। সাধারণ লোকের মনে এরূপ ধারণা আছে, এবং তাহারা উহার কয়েকটা নামকরণও করিয়াছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা কোন স্বতন্ত্র রোগ নয়, বসন্ত রোগেরই একটা অবস্থা মাত্র।

একমাত্র টিকাই কি বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ?

না, তা নয়। রোগ হইলেই চট্ করিয়া তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া, রোগীকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা দরকার। কিরূপে কোন সূত্রে রোগীর দেহে বসন্তের বীজ সংক্রামিত হইল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। কোথাও বসন্তের প্রকোপ যদি খুব মৃদু হয়, সেই সকল স্থল ছাড়া অন্যত্র, এইরূপ অনুসন্ধান ও রোগীকে স্বতন্ত্র করিবার ব্যবস্থা করিলে রোগের বিস্তার কতকটা কমানো যায়।

বিবাহ

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত এম্-বি, এম্-আর্-এ-এস্।

বিবাহ হিন্দুদিগের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে অধুনা সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। এই সংস্কার সম্পাদিত না হইলে স্ত্রী বা পুরুষের হাতের জল শুদ্ধ হয় না। স্ত্রীলোকের শুধু বিবাহ কেন, পুত্রবতী না হইলে, তাহার হাতে ভিক্ষা পর্য্যন্ত সাধু সন্ন্যাসীরা গ্রহণ করেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে হিন্দুরা বিবাহকে অত্যাবশ্যক সংস্কার রূপে গণ্য করেন। যদিও মহামতি ভীষ্ম প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তির মধ্যে মধ্যে চিরকৌমার্য্যের কথা শোনা যায়, কিন্তু গার্হস্থ্য আশ্রমে উহা এখন প্রচলিত নাই। উহা এক্ষণে কেবল সন্ন্যাসীর জন্য। গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইলে বিবাহ

DOUBLE COLOUR PAGE

ভিন্ন অন্য ব্যবস্থা নাই। এই বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে পুরুষ মনোমত স্ত্রী এবং বয়স্থা নারী মনোমত স্বামী বাছিয়া লইয়া বিবাহ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী ও পুরুষের পিতামাতারাই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন। যৌবনে কি স্ত্রী কি পুরুষ অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হইয়া থাকেন; তাই স্ত্রীলোকের স্বামী মনোনয়ন বা পুরুষের স্ত্রী মনোনয়ন কার্য্য স্বয়ং না করাই ভাল। ভাবের বশে ভুল হইলে উভয়কেই চিরকাল অশান্তি ভোগ করিতে হয়। সংসারে পিতামাতা অপেক্ষা অধিক শুভাকাঙ্ক্ষী কেহই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুত্র কন্যার মঙ্গলের জন্য তাঁহারা যাহা ব্যবস্থা করেন, তাহাতে আমাদের জীবনে সুখশান্তি আনয়ন করে। কখনও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু সময়ের গুণে বা আমাদের কপালের দোষে কন্যার পিতামাতা বি-এ, এম-এ পাশের মোহে এবং পাত্রের পিতামাতা পয়সার মোহে মোহিত হইয়া সব দিক বিবেচনা না করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন বলিয়া আজকাল আমাদের সংসারেও অশান্তি ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে বিবাহ একটা চুক্তিমাত্র। পরস্পরের অসুবিধা হইলে উহা ছেদ (Divorce) করা চলে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহার উপায় নাই। আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ উভয়ের জীবনাবধি, এমন কি পরকালে পর্য্যন্ত অচ্ছেদ্য থাকে। কাজেই একবার ভুল হইলে চিরকাল কষ্ট পাইতে হয়। পুত্র কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পিতামাতাকে অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। সেই সকল বিষয় আমাদের আলোচ্য নয়; আমরা এই প্রবন্ধে কেবল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কথাগুলির আলোচনা করিব।

১। **বিবাহের বয়স।**—কোন্ বয়সে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত, তাহা লইয়া অধুনা অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। পাশ্চাত্য দেশে যৌবন বিবাহ প্রচলিত। আমাদের দেশেও বৈদিক যুগে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগেও স্বয়ম্বর সভার উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের সমাজে বাল্য-বিবাহই নিয়ম। যদিও ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া আসিতেছে সত্য, এবং আজকাল ৭।৮ বৎসরের শিশু কন্যার বিবাহ ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে, তথাপি, এখনও দশ বার বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহ প্রায়ই দেখা যায়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলেন যতদিন দেহের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ বা পরিপুষ্টি না হয়, তত দিন কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও বিবাহ হওয়া উচিত নয়। বিজ্ঞানের মতে রমণীর ১৬ বৎসর এবং পুরুষের ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে প্রায় সর্ব্ব দেহের পূর্ণ বিকাশ বা পূর্ণায়তন লাভ হয় না। যদিও স্ত্রীলোকের ১৪ ও পুরুষের ১৭ বৎসর বয়সেই গঠন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু সেগুলি সুপুষ্ট ও জননেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিকভাবে কার্য্যক্ষম হইতে আরও ২।৩ বৎসর লাগে।

১৬ বৎসরের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের বস্তি দেশের অস্থিগুলি পরিপুষ্ট না হওয়ায় সন্তান প্রসবের পথ সঙ্কীর্ণ থাকে। তাই অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিতে প্রসূতির নিদারুণ কষ্ট হয় এবং অতি কষ্টে সন্তান প্রসূত হইলেও তাহা কখনও বা মৃত কখনও বা অপুষ্টাঙ্গ হইয়া থাকে। আমাদের সমাজের নিয়মানুসারে কন্যা রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দিতে হয়। এই প্রথার এক সময়ে সার্থকতা থাকিলেও এখন উহার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। আমার বোধ হয় যখন মুসলমানেরা এদেশে রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, তখন তাহাদের রাজ্য বিস্তার ব্যতীত সুশাসনের দিকে তত নজর ছিল না। তখন ঘরে সুন্দরী যুবতী কন্যা অবিবাহিত রাখা বিপদসঙ্কুল ছিল বলিয়া উক্ত নিয়ম করা হইয়াছিল এবং কন্যা রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দিয়া অন্দরে আবদ্ধ রাখা হইত। আমার বোধ হয় অবরোধ প্রথা সেই সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে। এখন সকলেরই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যত দিন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সম্পূর্ণ দৈহিক পরিপুষ্টি লাভ না করে, তত দিন গর্ভাধান আদৌ হওয়া উচিত নহে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয়-সেবা

স্বাস্থ্যহানি হয় এবং তাহাতে অকালবার্দ্ধক্য ঘটে ও আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে।

২। **বয়সের প্রভেদ।**—আমাদের দেশে অধিক বয়স্ক বিপত্নীক পুরুষের সহিত ১০।১১ বৎসরের বালিকার বিবাহ হইতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজে বর্ষীয়সী রমণীর সহিত অল্পবয়স্ক যুবকেরও বিবাহ হইয়া থাকে। মনে রাখা উচিত জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মানব মাত্রেরই মতি গতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তখন বালিকার সহিত বৃদ্ধের বা নব যুবকের সহিত বয়োবৃদ্ধার বিবাহ কখনই সুখকর হইতে পারে না। আমাদের মতে কন্যার অপেক্ষা বরের বয়স ৭।৮ বৎসরের অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

৩। **গোত্র।**—সগোত্রে বিবাহ হওয়া উচিত নয়। অত্যন্ত নিকট সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ হওয়া স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। এই জন্যই আমাদের সমাজে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং পিতামহ বা মাতামহ বংশের সাত পুরুষের মধ্যে কখনও বিবাহ হয় না। নিকট আত্মীয়দের বিবাহের ফলে অনেক বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মিতে দেখা যায়।

৪। **মানসিক প্রকৃতি**—(Temperament).—সমমানসিক প্রকৃতি-সম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষের মিলন সুখকর হয় না। যেমন সমপোল চুম্বক পরস্পরকে আকর্ষণ করে না, যেমন দুই পজেটিভ বা নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটি-সম্পন্ন বস্তু পরস্পর আকর্ষণ করে না সেইরূপ সমান মানসিক প্রকৃতিসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষের মিলনে প্রেমের আদান প্রদান না হইয়া বরং কলহাদি অশান্তির উদ্ভব হয়। যেমন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই যদি উগ্র প্রকৃতির হয়, তাহা হইলে উভয়ের মিলন তো দূরের কথা—তাহারা সর্ব্বদাই কলহ করে। তাহাতে তাহাদের মানসিক শান্তির অভাবে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এবং তাহাদের সন্তানেরাও স্বাস্থ্যবান হয় না। আমাদের সমাজে তাই কোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

৫। **কন্যার স্বাস্থ্য।**—কন্যার কোন প্রকার অসাধ্য বা চিরস্থায়ী যান্ত্রিক (organic) ব্যাধি থাকিলে তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। এরূপ কন্যার বিবাহ দিলে অনেক স্থলে দম্পতির স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে এবং অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যু অবধি সংঘটিত হইতে পারে। এরূপ স্থলে সন্তান সন্ততি জন্মিলে, উহারা রুগ্ন ও জীর্ণ-শীর্ণ হয়। কন্যার সংক্রামক রোগ (Syphilis বা Pthysis) থাকিলে একত্র বাস জন্য উহা ক্রমে স্বামীতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, এরূপ বিবাহ নিবারণ বাঞ্ছনীয় হইলেও বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মে তাহার সম্ভাবনা নাই। আমাদের সমাজের নেতাদের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। বর্ত্তমান কালে এদিকে অনেকেরই দৃষ্টি নাই, এবং দরিদ্র স্বাস্থ্যবান পরিবারের সবল ও সুস্থ কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া ধনবানের স্বাস্থ্যহীনা গৌরবর্ণা কন্যার সহিত অনেককেই পুত্রের বিবাহ দিতে দেখা যায়। কন্যার স্বাস্থ্যের দিকে যেমন নজর রাখা দরকার, তেমনি তাহার পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়বর্গের স্বাস্থ্যের বিষয়ও সবিশেষ অনুসন্ধান করা বিধেয়। কারণ, ব্যক্তিগত রোগ যেমন অনিষ্টকর, কৌলিক রোগ তদপেক্ষা কম অনিষ্টকর নহে। অতএব কন্যা সুরূপা ও সুন্দরী কি না দেখিবার পূর্ব্বে তাহার ও তাহার বংশের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা অতীব আবশ্যক। বংশের কেহ যদি উপদংশ, যক্ষ্মা, ক্যানসার বা তদ্রূপ কোন দুঃসাধ্য ব্যাধি প্রপীড়িত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ সম্বন্ধ না করাই উচিত। স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত পিতামাতা বা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত মাতার কন্যারও ঐ সকল রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা।

বরের স্বাস্থ্য।—কন্যার পিতামাতার রুগ্ন বা অত্যন্ত দুর্ব্বল বরকে বা কোন প্রকার অসাধ্য চিরস্থায়ী পীড়াগ্রস্ত পিতামাতার পুত্রকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করা উচিত নয়। যক্ষ্মাকাসগ্রস্ত বা ঔদোগ-বিশিষ্ট বরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া অনেককে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কন্যার বৈধব্যের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইতে হয়। উপদংশ রোগ বংশানুক্রমে পিতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত হয়। কন্যা মরিয়া গেলে বর আবার বিবাহ

করিতে পারে; কিন্তু কন্যা বিধবা হইলে তাহাকে তাঁহারা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহার উপর চিরকাল পিতামাতার বা আত্মীয়-স্বজনের গলগ্রহ বালিকার চিরজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিবে, ইহা থাকিতে হয়। তাই বরের পিতামাতা অপেক্ষা এই কথা সম্যক স্মরণ রাখিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির কন্যার পিতামাতার এ বিষয়ে দায়িত্ব অধিক। কর সকলেরই কর্ত্তব্য।

গো-সেবা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[রায়সাহেব ডাঃ শ্রীদিবাকর দে, জে-বি-ভি-সি, কলিকাতা ভেটারিনারি কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল]

গাভীর খাদ্য।

যন্ত্র চালাইবার জন্য অগ্নির তাপ প্রয়োজন এবং অগ্নির তাপের জন্য ইন্ধনের প্রয়োজন। রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করিয়া হাল টানিয়া, যাহাকে আমাদের অন্ন উৎপাদন করিতে হয়, দেহের রক্ত হইতে দুগ্ধ উৎপন্ন করিয়া আমাদের শরীর রক্ষার্থ যাহাকে দান করিতে হয়, তাহার দেহ-যন্ত্র চলিবার জন্য ইন্ধনের দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্ত্তব্য।

দেহের শক্তি ও সামর্থ্য আহারের উপরেই নির্ভর করে। প্রত্যেক দেহেরই কার্য্যানুসারে খাদ্যের তারতম্য হয়। অনাহার, অর্দ্ধাহার ও অনুপযুক্ত আহারে তাহার বিপরীত ফল ফলিতে বাধ্য। সকল যন্ত্রের ন্যায় দেহ-যন্ত্রেরও অযত্নে ক্ষতি হয়, ক্রমশঃ তাহা ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ তাহার জাতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করিলেও, আহারের উপরও বহু পরিমাণে নির্ভর করে। সেবা যত্ন ও উপযুক্ত আহার তাহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

উপযুক্ত আহার প্রাপ্ত ও যত্নে পালিত পশুর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার দৈহিক শক্তি ও দুগ্ধের পরিমাণ সমান রাখা বিশেষ শক্ত নহে। সকল দিকে সমান দৃষ্টি রাখিতে হয়, তাহাতেই অনেক কাস করা হইল।

গুণভেদে ও কার্য্যভেদে পশুর খাদ্যের তারতম্য হওয়া উচিত। ষণ্ড বা বলদের জন্য যেমন নাইট্রোজন-বহুল অর্থাৎ কড়াই জাতীয় আহার অধিক প্রয়োজন, সেইরূপ গাভীর ক্ষেত্রে তৈল-বহুল অর্থাৎ তিসির বা সরিষার খৈল ভূষি বা নানা রকম কড়াই চূর্ণ খাদ্য অধিক প্রয়োজন।

কচি দূর্ব্বাঘাস গোজাতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কেবলমাত্র কচি ঘাস দ্বারাই, তাহাদের শরীরের বহু প্রকার অভাব দূর হয়। ইহাতে দুগ্ধের রং ও গুণ বৃদ্ধি করে।

আমাদের দেশে শুক্‌না খড় গোজাতির একটি বিশেষ চলিত খাদ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র খড় গোজাতির শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকার করে না; জীবন ধারণের সহায়তা করে মাত্র। কিন্তু খৈল, ভূষি প্রভৃতি সংযোগে ইহা বিশেষ উপকার করে।

কলাই জাতীয় খাদ্য দেহ পুষ্ট করিবার পক্ষে উপযোগী, কিন্তু তাহা যদি গরুর পরিপাক-শক্তির ব্যতিক্রম ঘটায়, তাহা হইলে তাহা বন্ধ করা উচিত। যে সকল পশু অল্প আহার করে, তাহাদের খাদ্য-তালিকা হইতে খড় প্রভৃতি খাদ্য কমাইয়া দেওয়া ভাল। যাহাতে দেহ পুষ্ট করে, যথা ভূষি, যব প্রভৃতি খাদ্য, তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। কলাই জাতীয় আহারে দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণ উভয়ই বৃদ্ধি করে। যব চূর্ণ গরুর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। তিসি, সরিষা ও নারিকেলের খৈলের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটীই অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও অধিক পরিমাণ খৈল ভাল নহে। দেখা গিয়াছে, গর্ভাবস্থায় গাভী অত্যধিক খৈল ভক্ষণ হেতু, প্রসবের পর অকালে বৎসটীকে হারাইয়াছে।

আস্ত ছোলা দুগ্ধবতী গাভীকে দেওয়া উচিত নহে। যদি ছোলা খাওয়ান প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে।

প্রত্যেক জাবের সহিত লবণ মিশাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহা দেহের পক্ষে একটী অতি উপকারী বস্তু।

বাটীর সমস্ত তরীতরকারির খোসা অতি যত্নে সংগ্রহ করিবে। কাঁচা তরকারীর খোসা গাভীর খাদ্যের অত্যন্ত উপযোগী। ভাতের মাড় সকল দেহির পক্ষেই অতি সুন্দর খাদ্য; গরুর পক্ষেও তাহাই বহুস্থলে দেখা যায়। গৃহস্থেরা একটু পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য ভাতের মাড় ফেলিয়া দেন। তাহা একেবারেই উচিত নহে। উঠানের মধ্যে ফেন রাখিবার জন্য একটী পাত্র থাকা চাই, এবং সেই পাত্র হইতে গরুকে নিয়মিত ভাবে ফেন খাওয়াইয়া লওয়া দরকার। ফেন শীঘ্র পচিয়া দুর্গন্ধ উৎপন্ন করে, সেজন্য পাত্রটী প্রত্যহই ধুইয়া ফেলা দরকার। ভাতের মাড়ে যে কেবল মাত্র শরীর পুষ্ট করে তাহা নহে, ইহাতে দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণ বৃদ্ধি করে, ও অন্য খাদ্য বাঁচাইয়া দেয়।

জল, জাবের একটী অঙ্গ হইলেও, তাহা স্বতন্ত্র পাত্রে দিবে। কেবল মাত্র খড় ভিজাইয়া দিলে জলের অভাব মোচন হয় না। অনেক সময় কেবল মাত্র উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবে দুগ্ধ কম হইয়া যায়।

জাব একেবারে বেশী ভিজাইয়া দিতে নাই। ভিজা জাব শীঘ্র পচিয়া উঠে। ভাঙ্গা গুঁড়া কলাই প্রভৃতি মিশাইয়া উপরে জল ছিটাইয়া দিবে। স্বতন্ত্র পাত্রে জল দিতে ভুলিবে না। একটী ছোট পাত্রে পূর্ণবয়স্ক গরুর জন্য এক ছটাক আন্দাজ লবণ দিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়।

খড়, ভূষি, খৈল, দানা লবণ ইহাতেই মোটামুটী গোজাতির খাদ্য ভাণ্ডার সম্পূর্ণ হইল। ভারবাহী পশুর পক্ষে দানা এবং দুগ্ধবতীর পক্ষে যব ও কলাই প্রশস্ত। কাপাসের বীজ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারিলে, অন্ততঃ ৮ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবার পর, খাওয়াইতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়।

গাভীকে কদাচ খেঁসারি দিবে না। ইহাতে দুগ্ধের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। অধিক মাত্রায় খাওয়াইলে পশুর পক্ষাঘাত আনয়ন করিতে পারে।

আমাদের দেশীয় প্রচলিত খাদ্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু দেখা যায়, গোজাতির আরও কয়েক প্রকার অতি সুলভ ও সহজ, প্রাপ্য খাদ্য উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দুর্ম্মূল্যের দিনে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে গরুর যত্নের আধিক্যে আমরা যেন গোপালনের ব্যয় গোজাত দ্রব্যের মূল্য হইতে অধিক করিয়া না ফেলি। খাদ্য সুলভ হয়, অথচ দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণের কোন হানি না করে, উপরন্তু দুইটীই বৃদ্ধি করিতে পারে, এরূপ কয়েকটী খাদ্যের কথা পরে দিতেছি।

শীতকালে জৈ, বার্লি ও গাজর বর্ষার জোয়ার ও ভুট্টা উৎপন্ন করিয়া লইলে বিশেষ সাশ্রয় হয়। যে সকল জমিতে চাষ আবাদ হইয়া গিয়াছে, বা চাষ করার বহু অসুবিধা, যে সকল স্থানে ইহাদের কোনকোনটী উৎপন্ন করিয়া লইবার বিশেষ সুবিধা। যতদিন জোয়ার প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, ততদিন অন্য প্রকার খাদ্য স্বচ্ছন্দে কমাইয়া দেওয়া যায়, কারণ এই সকল খাদ্যে গো-জাতির উপযুক্ত খাদ্যের সকল উপাদান বর্ত্তমান থাকে। জোয়ারের দানা পোস্তা হইতে একবার সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলে বরাবর চলে।

গিনি ও দূর্ব্বাঘাস উৎপন্ন করিয়া লইলে অতি উপাদেয় খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইল। ইহারা বৎসরের সকল সময়েই বাঁচিয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে কাটিয়া লইলে ইহারা ক্রমশঃই ঝাড় হইয়া গজাইয়া উঠে। গিনি ঘাসের মূল বর্ষার প্রারম্ভে Bengal Veterinary

College, বেলগাছিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়; কোন মূল্য লাগিবে না।

দূর্ব্বা চাষ করিয়া লওয়া ভাল, ইহ'তে ঘাসের পরিমাণ সাধারণ ঘাস অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। দূর্ব্বার বীজ কিনিতে পাওয়া যায়, এবং চাষ করা জমিতে ছড়াইয়া দিলে, সুন্দরভাবে গজাইয়া উঠে।

ডিস্‌পেপ্‌টিকের ডায়েরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ]

স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভুগিতেছি আমি,—
খোঁচা দিয়া লিখাইছে প্রভু অন্তর্যামী।
মোর জ্বালা পোড়া হ'তে পর-উপকার
হউক—লিখিব যথাসাধ্য সত্য সার।

* * * * *

ভাজা পোড়া বড় বেশী করেছি ভক্ষণ,
লবণ, মধুর, ঝালে ছিল আকর্ষণ।
আলু, কলা, মূলা, বড়াবড়ী আর শাক,
পটোল বেগুন উচ্ছে নারিকেল পাক
করিয়া আগুনে ভেজে সর্ষপ তেলেতে
খেয়েছি প্রত্যহ—এবে বুঝেছি দাহেতে :—
ভাজাপোড়া শরীরের করে অপকার,—
লুচি হ'তে রুটি ভাল বলিছে ডাক্তার।
অধিক উত্তাপে সার পদার্থের নাশ
করি মোরা পাকপ্রিয় বাবু বার মাস।
ঠেকে ঠ'কে বুদ্ধিমান হয়েছে মানব,—
কৃত্রিম রন্ধন বিদ্যা অশুভ ও সব।
সভ্যতায় কতটা যে করিয়াছে ক্ষতি,
এখন বুঝেছে স্থির ভদ্র মহামতি।
ঊনবিংশ শতাব্দীর রীতি নীতি বিধি
দূষিছে রোগের চোটে সভ্যগুণনিধি।
(ছিল) একদিন সাদা অটা বাজারের রাজা,
উপাদেয় তেলে ঘিয়ে সব দ্রব্য ভাজা।
প্রাণভরে খেয়েছিল মিষ্ট খাজাগজা,
এখনো চলিছে জের—উহু বড় মজা!
বাজারু সংস্কৃত (Refined) চিনি তরে কত দম
ছিল গো লোকের—আহা! ছিল না সংযম!!
গুড়সেবা অসভ্যতা বলেছে সেদিন,—
ছি ছি কৃষ্ণকায় গুড় দুর্গন্ধ মলিন!
ভাতের সুসার কলে ছাঁটিয়া ফেলেছে,
তাই লোকে বাধ্য হ'য়ে ব্যঞ্জনে মজেছে।
এখনো গরীব ঘরে খায় ফেনভাতে,
শ্রমিক মজুর পান্তা প্রত্যহ প্রভাতে।
ঢেঁকি ছাঁটা চাউলের কি মধুর স্বাদ!—
কুঁড়া ভূষি লাল পদ্দা কেন দেয় বাদ?
নুন দিয়া খায়—নাহি কোন প্রয়োজন
মসল্লা মিশ্রিত অতি বিদাহী ব্যঞ্জন।
মাড় গেলে ফেলে দিলে ছিবড়ে যে থাই,
(তাই) বঙ্গে এত তরকারী-পরিপাটা ভাই।

* * * * *

ভারতের বহু স্থান দেখেছি ঘুরিয়া,
কেহ কোথা এত নাই আহারে মজিয়া।
অহিত ভোজনে প্রাণ ঢেলেছে বাঙ্গালী,—
অথচ হজম-বলে বড় সে কাঙ্গালী!
পশ্চিমে পাঞ্জাবী সুস্থ দৃঢ় বীর্য্যবান,
সাদাসিধা মিতাহারে করে বলাধান।

বিহারের জলবায়ু এখনো ত ভাল,
তা'রা খায় হাতে গড়া চাপাটী ও ডাল।
কুস্তিগীর পালোয়ান পশ্চিমারা সব,
অনায়াসে বাঙ্গালীকে করে পরাভব
সহরে নগরে গ্রামে পশ্চিমা—উড়িয়া
শ্রমসাধ্য কর্ম্মে অর্থ লয় গো লুটিয়া।
শ্রমিক মজুর বেশী অন্যদেশবাসী,
অথবা মুসলমান একতা-বিশ্বাসী।
বাঙ্গালী হিন্দুর নাই দেহে মনে বল,
চাকুরী দাসত্ব মাত্র জীবিকা সম্বল।
ভাবভূয়িষ্ঠতা শুধু গায়ে নাহি জোর,
এরাই ইন্দ্রিয়সেবী অসংযত ঘোর।
জিহ্বার লাগাম ছেড়ে দেছে বহু দিন,
উপস্থ-সম্ভোগে বঙ্গ হতেছে প্রক্ষীণ।
শিশ্নোদরপরায়ণ করিবে কি কাজ?
জীবনসংগ্রামে ভোগী দাঁড়াবে না আজ।
বিপুল আনন্দে পূর্ণ আছে পালোয়ান,
তুচ্ছ রূপরস ভোগে নাহি তা'র টান।
উৎকৃষ্ট বিমল নন্দে পেয়েছে সন্ধান,
মজিবে নিকৃষ্ট সুখে কেন তা'র প্রাণ।
হজম শকতিহীনে ভোজনের সাধ
ঘটাইবে পদে পদে বিষম প্রমাদ।
বহুমূত্রী অগ্নিশূলী চাকুরে দুর্ব্বল,—
জিহ্বার লালসা ভোগবাসনা প্রবল।
অসংখ্য ব্যঞ্জন রাঁধে বাঙ্গালীর মেয়ে,—
কখনো খায় না শাকভাত একঘেয়ে।
দুগ্ধের বিকার ছানা অতি পুষ্টিকর,—
এই ছানা তৈলে ভেজে রোগের আকর
করিয়া বাঙ্গালী খায় নুনঝালে বিষ—
তাই সোডা-লেমনেড কাটে অহর্নিশ।
রমণীরা পাকপটু ঘুমায় না রাতে,
কালিয়া পোলাও, স্বপ্ন দেখে 'ডিমভাতে'।
পরদিন কি রাঁধিবে স্বাদু তরকারী,
এ চিন্তা ব্যাকুল ব্যস্তবড় বঙ্গনারী।
ঝোল ভাত খেয়ে খেয়ে ন'রে গেছে নাড়ী,
আফিসে কলম পিষে লিখে গাড়ী গাড়ী ;—
মাথার খাটুনি দৈন্য বেড়েছে গো তা'র,
কেমনে সে সামলাবে অমিত-আহার।
ছয় দিন লঘুপথ্য যাহার অভ্যাস,
কেমনে সে রবিবারে সহিবে বিলাস?
সোমবারে তাই অম্লে বুক পেট জ্বলে,
কেবল সোডার শ্রাদ্ধ করে কুতুহলে।
ভেজালে মরিল জীব- কেবা দিবে বাধা!
পশুরাও ভাল খায় ছাগ মেষ গাধা!
আহার বিহারে নাই শৌচ সদাচার,
অসংযত শুক্র ক্ষয়ে ধ্বংস অনিবার।
অপ্রিয় সত্যের তরে ক্ষমা ভিক্ষা মাগি,
কহি হিতকথা ব্যক্তি জাতি শুভ লাগি'।

* * *

যা'হোক অশুভ হ'তে ফলেছে মঙ্গল—
গুড়, আটা, মোটা ভাত প্রশংসা কেবল
করিছে অভিজ্ঞ নর বুঝে স্বীয় ভুল,—
'ঢেঁকি-ছাঁটা খুব ভাল সেকেলে চাউল।'
জড়বাদী বৈজ্ঞানিক নবঅনুরাগে।
ধরাখানা সরাজ্ঞান করেছিল আগে।
মনে ভেবেছিল দর্প দম্ভ অভিমানে,
মানিব না কোন বিধি - উড়িব বিমানে,
দেখিয়া হাসিছে কিন্তু প্রভু দয়াময়,—
"করুক করুক খেলা শিশু বৈ ত নয়।
"বয়সে প্রবীণ হ'লে আসিবে রে জ্ঞান,
"ছুটে যাবে যৌবনের ভাদুরে সে বান ;
"তখন সে নিজ হিত বুঝিবে সম্যক্,—
"কেন অম্ল, মূত্র, বাত, কাসি খক্ খক্।"
যেখানে যথেচ্ছাচার, স্বৈরিতা উঠুক,
অবশ্য পড়িবে পিঠে কালের চাবুক ;
তবে সে সংযত সাধু হবে হুঁশিয়ার,
স্নানাহার কোন বিধি ভাঙ্গিবে না আর।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-লাভের পথে—

[শ্রীহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

সুখের বিষয় যে সুরটা ফিরিয়াছে। এ জীবন নশ্বর, এ সংসার অনিত্য এই ভাবটা যে একটু শিথিল হইয়াছে, ইহাকে জাতীয় নবজীবনের পূর্ব্বরাগ বলা যাইতে পারে। অর এ জীবন ও পরজীবন এক-পা এ দিক ও-দিক মাত্র। আমাদের আমিত্ব এ জীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের মধ্যে যেরূপ অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে—পরজীবনও সেইরূপই থাকিবে। যাহাদের ইহজীবনে সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা নাই, তাহাদের মৃত্যুর পরেও নাই, ইহা একপ্রকার অবধারিত সত্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া সুখময় ভবিষ্যৎকে পাইবার আশা আকাশ-কুসুম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২। ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলেও নিজ নিজ জীবন—নিজ অস্তিত্বের সহিত বিশ্বের আদান-প্রদান—প্রত্যেকের কাছে কতই না প্রিয়! কি যোগী, কি ভোগী, কি ধনী কি দরিদ্র, কি সবল কি দুর্ব্বল, সকলেই সর্ব্বদা এই প্রিয়তম জিনিষটির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক যত্নে সমাধা করিতেছেন। এমন কি জীবন এতই প্রিয় যে, গলিত-নখদন্ত পলিতকেশ বৃদ্ধ, স্পন্দহীন গলিত কুষ্ঠ, চিররোগী, পরান্নভোজী, পরাধীন মানবগণও অনন্ত দুঃখরাশির মধ্যে নিজেকে সুখী বলিয়া মনে করে। কেহই যেন মরিতে চায় না। পরন্তু মৃত্যু ও মৃতের কথা ভাবিতে বিমর্ষ হইয়া থাকে। জীবনে প্রীতি প্রত্যেক মানবেরই অন্তরতম সত্য বা অনাহত ধর্ম্ম। কাজেই জীবনটা কিছুই না বলিয়া আর ঠেলিয়া ফেলিবার যো নাই। দুঃখের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই হউক, কি সুখেই হউক ইহার মধ্যেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; এবং যিনি যতটা ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন বা পারিবেন, তিনি সংসারের মানবমণ্ডলীর কোটী নয়নের সম্মুখে ততোধিক পরম রমণীয়—অনবদ্য সুন্দর আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন ও হইবেন।

৩। সমস্ত জগৎই কর্ম্মশীল। দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া জড়ের ন্যায় নয়ন মুদিয়া থাকিলে সুসার কিছুই নাই, বরং মুদিত নয়নে অনন্ত মৃত্যুর উপাসনা না করাই মঙ্গলদায়িনী প্রকৃতির ইঙ্গিত বলিয়া বোধ হয়! যাহাতে এই পৃথিবীকেই শান্তি সুধা পরিপ্লুত করা যায়, যাহাতে ধরাতেই অমরার সৃষ্টি করা যায়, তজ্জন্য প্রত্যেকেরই বদ্ধ-পরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। জীবনে আমরা সুখী হইব, শান্তি আনিব,—পৃথিবীর প্রত্যেক স্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করিব, শৃঙ্খলা বিধান করিয়া দুঃখ দারিদ্র্য ও অকাল মৃত্যু হইতে দূরে অবস্থান করিব, এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রত্যেকেরই কার্য্য-ক্ষেত্রে পদার্পণ করা শ্রেয়ঃ। এই পৃথিবীতে যত প্রকার দুঃখ ও বিড়ম্বনা বিদ্যমান আছে, স্বাস্থ্যহীনতা তাহার মধ্যে প্রধান ও উন্নতির পরিপন্থী। স্বাস্থ্যরক্ষা বা নিজের আমিত্ব সমাকরূপে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা প্রত্যেক সৃষ্ট প্রাণীরই প্রধান ধর্ম্ম। এই স্বাস্থ্য শরীরে—চক্ষু তাহাতে আত্মার স্পন্দনও অতি মন্দ। তাই ঋষি "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং" এই মহাসত্য কতই না উল্লাসের সহিত গাহিয়াছেন।

৪। জীব-সৃষ্টি-কৌশল জন্ম-মৃত্যু জড়ের সহিত চৈতন্যের সংযোগ-বিয়োগের নিগূঢ় তত্ত্ব অদ্যাপি মানব-বুদ্ধির অগম্য হইলেও দেহ-রক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য এক প্রকার সকল সুসভ্য মানব-সমাজেই অবগত আছে। যাহাতে সর্ব্ব সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তৎ সম্বন্ধে সকলকেই শিক্ষা দেওয়া ঠিক। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ বিষয়গুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গীভূত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৫। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এ দেশবাসী সকলেই কতকটা উদাসীন। তজ্জন্যই এ দেশ প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যমানুচরগণের নিত্য লীলা-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। ব্যায়ামে ভোগা—চিকিৎসার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মূল্যবান স্বাস্থ্য হারাইয়া, শূন্য-মনে মর্ম্মান্তিক বিলাপে দিক্ দেশ পূর্ণ করা যেন এ দেশে একটা অভ্যস্ত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। দেশবাসিগণ যাহাতে ব্যায়াম না আইসে, সেজন্য পূর্ব্ব হইতে ততটা মনোযোগ দিতে চাহে না। তাহাদের মৃত্যুর পর শেষ প্রবোধ "নিয়তি কেন বাধ্যতে"। যেন নিয়তির সংহার-দণ্ড একমাত্র দেশী লোকের উপরই ঘুরিতেছে।

৬। কংগ্রেসই বল, কনফারেন্সই বল, বিজ্ঞান ইনসটিটিউটই বল, ধর্ম্ম-সভাই বল, স্বদেশী আন্দোলনই বল দেশ হইতে অকাল-মৃত্যুর সহচর প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি রোগগুলিকে একেবারে, নির্ম্মূল করিতে না পারিলে, বোধ হয় দেশে এমন দিন আসিবে যে বিজ্ঞান থাকিবে কিন্তু বিজ্ঞ আর থাকিবে না, ধর্ম্ম থাকিবে কিন্তু ধার্ম্মিক আর থাকিবে না, আন্দোলন থাকিবে কিন্তু অন্দোলক থাকিবে না, দেশ থাকিবে কিন্তু স্বদেশী আর থাকিবে না; সকলই শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। পরন্তু যাহারা স্বদেশী বলিয়া গৌরব করেন, মাতৃ-সেবক বলিয়া আত্মশ্লাঘা করেন, জাতীয়তা রক্ষার জন্য যাহাতে দেশে স্বাস্থ্যোন্নতির বিশিষ্ট বিধি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া বিধেয়। এই জন্য সভা সমিতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা, ধনী লোকদের অর্থ সাহায্যের ব্যাপকতা ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীরদের জীবনোৎসর্গরূপ মহৎ ব্রতের প্রাচুর্য্যের তীব্র অভাব উপলব্ধ হইতেছে।

৭। সুস্থতার অরুণ রাগ দেশে ফুটাইতে হইলে, যতবিধ সুশৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে,—সংযমকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সুসঙ্গত উপায়ে পরিমিত পবিত্র খাদ্য, পানীয়, বস্ত্রাদির বন্দোবস্ত ও ব্যায়াম (শ্রম) প্রথা প্রচলন করা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। দেশের দুর্দ্দিনে "মাত্রয়াং সত্যমপ্রিয়ম" নীতিকে একটু ঘরের বাহির করিয়া দিলেই আমরা দেখিব- দেশের অবস্থা কি শোচনীয়। ধনীরা চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্যপেয়াদি সুখসেব্য মূল্যবান সামগ্রী আবশ্যক হইতে প্রচুর পরিমাণে উদরস্থ করিতেছেন; আর ব্যায়ামের অভাবে উদরাময় বাত ইত্যাদি নানা ব্যাধিসহ কোনমতে দিন-গুলি কাটাইতেছেন। পক্ষান্তরে দেশের দশ—মুটিয়া-মজুর-কৃষক যাহাদিগকে দিন-মজুরী করিয়া—গতর খাটাইয়া দিন কাটাইতে ও জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে কৃৎসিত আহারে দিনের দিন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ধীর ভাবে ভাবিতে গেলে ইহা কতই না ভয়াবহ শোচনীয় পরিণামের বিষয়। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের দুইটা দিকই নাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে ধনী ও গরীব উভয় শ্রেণীই অতিরিক্ত আহারে ও অনাহারে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। যাহাতে দেশের সাধারণ লোক, শ্রমজীবী সম্প্রদায়, কৃষককুল স্বাস্থ্যকর আবাসে থাকিতে পারে, পেট ভরিয়া দুমুটা খাইতে পারে, এবং পবিত্র জল বায়ুর উপকারিতা শরীরের উপর উপলব্ধি করিতে পারে, তজ্জন্য প্রচুর কাজের সৃষ্টি, আয়ের পন্থা আবিষ্কার ও কোন সঙ্গত উপায়ে শিক্ষার বিশিষ্ট ব্যবস্থার প্রয়োজন। যাহাতে তাহাদের শুষ্ক ও ম্লান ওষ্ঠাধর ও অনশন-ক্লিষ্ট নয়ন-কোটর হইতে কালিমার রেখা চিরদিনের জন্য অপনীত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বিশুদ্ধ জল বায়ুর উপকারিতা ও দূষিত জল বায়ুর অপকারিতা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে সভা, সমিতি ও প্রধান প্রধান সহরে সজ্ঞ স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে দেশের ভিক্ষুকগণ ভিক্ষার জন্য যেরূপ গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, দেশের উন্নতিকামী লোক-দিগকেও সেইরূপ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 'গাথা'—স্বাস্থ্য লাভের উপায়—নিরুপায় ও নিরক্ষর স্ত্রীপুরুষদের নিকট গাহিয়া

ফেরা ঠিক। স্বাস্থ্যের সহিত জন্মমৃত্যু ও জীবনের কি নিকট সম্বন্ধ তাহা প্রত্যেকে যাহাতে সুন্দররূপে আয়ত্ত ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তৎপ্রতি যত্ন লওয়া উচিত। আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লোকদের ঔদাসীন্য যাহাতে লোপ পায়, স্বাস্থ্যকে সুখের আকর বলিয়া যাহাতে তাহারা জানিতে পারে, তাহাও গভীরভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ঠিক। কার্য্য ব্যপদেশে ধনীদের অকাতর অর্থদান, দেশশুদ্ধ লোকের সহানুভূতি, অকাতর পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞান নিরতিশয় আবশ্যক।

৮। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্বাস্থ্য শরীরে মনে ও আত্মায়। স্বাস্থ্য লাভের জন্য সকলকেই যে শ্যাম কান্ত, পার্শ্বনাথ, গোবর, ভীমভবানী, রামমূর্ত্তি, গোলাম কি কিঙ্করসিং হইতে হইবে তাহা নহে; তবে প্রত্যেকেরই শরীরটি এমন বলশালী ও কর্ম্মপটু হওয়া আবশ্যক যে, যেন তাহার কর্ম্ম-বহুল জীবনে বিরক্তি জন্মিবার পরিবর্ত্তে প্রতি কাজেই স্ফূর্ত্তি, তেজঃ ও ক্ষিপ্রতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সে জন্য যে কোন উপায়ে দৈনিক ব্যায়াম বা দেহ-সঞ্চালন আবশ্যক। অধুনা নানা প্রকার বলব্যঞ্জক ব্যায়াম বা খেলা প্রচলিত আছে — যথা ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস্, বেডমিন্টন, ইত্যাদি বিদেশী খেলা। কিন্তু এই সকল গরীব দেশবাসীর পক্ষে তাহা অতীব ব্যয়বহুল। দেশী এমন সব খেলা বিদ্যমান আছে যাহা ভদ্রোপযোগী অথচ সহজ-সাধ্য। বিদেশী খেলা যে কেবল ব্যয়সাধ্য তাহাও নহে, পরন্তু কোন কোনটি বিপদসঙ্কুল বটে। ফুটবলে অনেকে অনেক সময় মারাত্মকরূপে আহত হইয়া থাকেন। ক্রিকেটের বলেও আহত হইবার বিশেষ আশঙ্কা অনেক সময় বিদ্যমান থাকে। বিশেষতঃ ফুটবল যাহা আমাদের মফস্বলেও আজকাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাতে সত্যই অতিরিক্ত পরিশ্রম হইয়া থাকে। যদিও প্রত্যেক বিষয়েরই অনুকূলে ও প্রতিকূলে বলিবার কিছু-না-কিছু সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, তথাপি এই গরীব দেশের পক্ষে স্বদেশী খেলার প্রবর্ত্তনই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় এবং স্বদেশপ্রীতিরও পরিচায়ক বটে।

৯। দেশী খেলার মধ্যে—কুস্তি, কস্‌রত, লাঠিখেলা, অশ্বচালন, ডন, মুগুর ভাঁজা, হাডুডু বা কপাটি, দাঁড়িয়া-বাধা, সন্তরণ, নৌ-বাইছ ভ্রমণ ইত্যাদিই প্রধান। অশ্বচালন উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হইলেও, যে দেশের লোক অর্থাভাবে গোমাতার সেবা করিতে পারে না, তাহাদের মুখে আর তাহা শোভা পায় কৈ? ভ্রমণ নিরতিশয় সহজ ও আড়ম্বরশূন্য হইলেও যে পর্য্যন্ত দেশের রাস্তা ঘাট দি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইয়া দাঁড়ায় ও বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যাপ্ত পরিবর্ত্তন না হয়, সে পর্য্যন্ত পাড়াগাঁয়ে ভ্রমণে বাহির হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। দাঁড়িয়াবাধাও বেশ খেলা সামান্য এক টুকরা জমি হইলেই চলিতে পারে। এ সব সহজসাধ্য হইলেও, যে পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য ও শারীরিক বল আমাদের জীবনের কত বড় একটা আনন্দের উৎস তাহা আমরা সম্যকরূপে না বুঝি ও কর্ত্তব্য জ্ঞানে নিষ্ঠার সহিত তাহার দৈনিক সেবা না করি, সে পর্য্যন্ত উপায় থাকা না থাকা সকলই এক। দেশী ব্যায়াম বা কস্‌রত শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে আখড়া খোলা আবশ্যক। আর যাহাতে গ্রাম্য যুবকগণ রীতিমত উপস্থিত হইয়া শরীর সেবায় মনোযোগী হয় তৎপ্রতি গ্রাম্য মাতব্বরগণের বিশেষ যত্ন লওয়া বিধেয়। এই সকল আখড়ায় ব্যায়াম ও অন্যান্য ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য বার্ষিক কোন কোন নির্দ্দিষ্ট তেহার বা পর্ব্বোপলক্ষে প্রদর্শনী খোলা ঠিক ও যুবকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য যথারীতি পারিতোষিক বিতরণের বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক।

১০। কিন্তু ইহা অতীব পরিতাপের বিষয় যে, গ্রাম্য মাতব্বর বা অভিভাবকগণ অনেকেই এই বিষয়টী এতই ঔদাস্যের সহিত দেখেন যে, শারীরিক ব্যায়াম মানুষ মাত্রেরই যে একটী প্রাত্যহিক করণীয় বিষয়, ইহা তাঁহারা যেন ভুলিয়া গিয়াছেন। "অবসাদ হিমে ডুবিয়া ডুবিয়া" দৈন্য-নিগড়ে আবদ্ধ মানব ইহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, শরীর শক্তিশালী না হইলে জীবনের ঐহিক কি পারত্রিক কোন কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এমন কি কোন

বয়স্থ ভদ্র ব্যক্তিকে কোন শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত দেখিলে দেশে এক প্রকার পরিহাসের বন্যা বহিতে থাকে। শৌর্য্য, বীর্য্য দেশে আর কোথায়! বাজিছে তাথৈ তাথৈ রবে অনন্ত মৃত্যুর ভীষণ দুন্দুভি!! এই ঔদাস্য যে সুধু আমাদের দেহ-রক্ষা ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহা নহে। ইহাতে আমাদের সমাজ-দেহের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত পরিপ্লুত। আমাদের আর আহার বিহারে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, আমোদ প্রমোদে, ক্রীড়া কৌতুকে—কোন বিষয়েই সজীবতা নাই। এই দুরপনেয় জাড্য কোথা হইতে আসিল, ইহার মূল ভিত্তি কোথায়, কোথা হইতে এই সর্ব্বনাশকারী বিষ সমাজ-মহীরুহকে দিন দিন ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইতেছে তাহা অবশ্যই ধীরভাবে ভাবিবার বিষয় ও তাহার সংশোধনের জন্য প্রত্যেকেরই যত্নশীল হওয়া ঠিক।

১১। আমাদের ব্যক্তিগত শরীর যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবরাজ্যের বহিঃস্ফুরণ বা মূর্ত্ত প্রতিষ্ঠান সেইরূপ সমাজ ও দেশও সমাজ ও দেশভাবের প্রতিমা। এই যে অবসাদ যাহা আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকে, তিলে তিলে, দিনে দিনে ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইতেছে, তাহাও আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও দেশের মজ্জাগত ভাবের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মজ্জাগত ভাব সংশোধিত না হইলে, যে সকল ঔদাস্য আমাদিগকে অনন্ত মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইতেছে তাহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার আশা কোথায়? বলিতে কি এই ভাবগুলি আমাদের দৈনিক উপাসনার অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। উপাসনা বলিতে আমি ইহাই মনে করি - উপাসনা আমাদের একটা মানসিক ভাব যাহা আমাদের আমিত্বের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এতই এক হইয়া গিয়াছে যে, আমরা সর্ব্বদাই তাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও তাহা ছাড়িয়া উঠিতে বা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। ভূতে যেরূপ মানুষকে পায়, এই ভাবগুলিও আমাদিগকে সেইরূপই পাইয়াছে, এবং আমরা তাহা সহজে ছাড়িতে পারিতেছি না।

১২। এই মানসিক ভাবগুলি আমরা পাইয়াছি প্রধানতঃ দুইটী ভাব-ধারা হইতে (১) নির্ব্বাণবাদ (২) মায়াবাদ।

লেখক সাংসারিক অবস্থায় দীন, শাস্ত্রজ্ঞানেও হীন। তাহাকে উদরান্নের জন্য এমন একটা স্থানে থাকিতে হইতেছে, যাহাতে তাহার এই দৈন্য দূর করিবার কোন সুবিধাই ঘটিয়া উঠে নাই। কাজেই এই পূর্ব্বোক্ত মতবাদ কি প্রকারে, কি ভাবে আমাদের দেশে দৈনন্দিন উপাসনার অঙ্গীভূত হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক বিশ্লেষণেরও ক্ষমতা তাহার নাই। তাহার চিন্তাধারাও যে সম্যক ভ্রান্ত হইতে না পারে এমন একটা ধৃষ্টতাও সে মনে পোষণ না করিলেও বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও দেশীয় অবস্থায় সে তাহাকে অভ্রান্তই মনে করে।

১৩। এক্ষণে এমন একটা কথা উঠিতে পারে যে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা বলিতে এই সকল মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যানের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক কাজের বীজই আমাদের মনে সুপ্ত থাকে; কাজেই মানসিক ভাবগুলির পরিবর্ত্তন না হইলে আমাদের কার্য্যধারা পরিবর্ত্তিত হইবার আশা কোথায়? কেবল স্বাস্থ্যবিধি বিজ্ঞাপিত হইলেই আমরা স্বাস্থ্যবান হইতে পারিব না; পরন্তু আমাদের মনকে বিধি মানিয়া চলিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা চাই। মন কেন বিধি মানিয়া চলিতে অপারগতা দেখাইতেছে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

১৪। স্বাস্থ্যের বিপরীত ভাব—অসুস্থতা, ব্যাধি, বা রোগ প্রধানতঃ দুই প্রকারেই আমাদিগকে আক্রমণ করে—যাহার অভিব্যক্তি 'বাহির হইতে অভ্যন্তরে' ও 'অভ্যন্তর হইতে বাহিরে' হইয়া থাকে। 'বাহির হইতে অভ্যন্তরে' বলিতে—যে সকল রোগ আমরা নিজ অসতর্কতা বশতঃ বাহ্য প্রকৃতি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকি, আমি তাহাদের কথাই বলিতেছি। এই সকল রোগের বীজই জীবাণু মাইক্রোব, জার্ম, বেসিলাই ইত্যাদি অভিধায় "মেডিকেল সায়েন্সে" অভিহিত

হইয়াছে। যথা কলেরা, উপদংশ, বসন্ত, যক্ষ্মা ইত্যাদি নানাপ্রকার রোগের বীজাণু। আমরা বাহ্যিক সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই সকল বাহিরের প্রকোপ হইতে নিরাপদ হইতে পারি। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি বীজ আছে, যাহারা 'অভ্যন্তর হইতে বাহিরে' প্রকাশ পাইয়া থাকে—যাহারা আমাদের মনেই প্রথমতঃ উদ্ভূত হইয়া পরে বাহ্য শরীরে প্রকাশ পায়। যেমন কামের উত্তেজনা। ইহা আমাদের মনেই প্রথমতঃ উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে বহিরিন্দ্রিয়দিগকে উত্তেজিত করে। ক্রোধোন্মত্ততা—ইহার উদ্ভব প্রথমতঃ মনেই হইয়া আমাদের স্বর, চক্ষু ও অন্যান্য স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশিষ্ট বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এই প্রকার আরও অন্যান্য অনেক মানসিক বিষয় আছে, যাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ কুচিন্তা আখ্যা দিয়া থাকি। বহিঃশত্রু হইতে আত্মরক্ষা করা অপেক্ষা এই কুচিন্তা হইতে আত্মরক্ষা করা আরও কষ্টসাধ্য। এই জন্যই মানব-সমাজে সুশিক্ষার ও সংযম অভ্যাসের নানাপ্রকার পদ্ধতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৫। স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে, মনকে যতই সুচিন্তায়, মহৎ ও উচ্চ উদ্দেশ্য ও নিঃস্বার্থ প্রেমে অনুপ্রাণিত করা যায়, ততই মঙ্গল। সুচিন্তারাশি লইয়া থাকিতে হইলেই মানুষকে সর্ব্বদাই অনিন্দ্যসুন্দর পবিত্র ও মধুর আবহাওয়া ও ভাব-বিলাসের মধ্যে থাকিতে হইবে। মানুষ যখন প্রকৃত প্রস্তাবে (positively) সুচিন্তার অধিকারী হন, তখন সূর্য্যরশ্মি যে প্রকার অন্ধকারকে দূর করিয়া দেয়—তাঁহার মন হইতেও তদ্রূপ কুচিন্তা-কলাপ দূর হইয়া যায়। ইহা নিতান্তই অবিসংবাদিত সত্য যে, যেখানে ভগবানে জলন্ত বিশ্বাস ও অব্যভিচারিণী পবিত্রতা বিদ্যমান আছে, সেখানেই স্বাস্থ্য, কৃতকার্য্যতা ও শক্তি বিদ্যমান।

১৬। একই মুদ্রাযন্ত্রের দুইখানা পুস্তকের ন্যায়, এক কলের দুইটী পেয়ালার মত এক না হইয়া, একই মাতাপিতার দুইটী সন্তান একই জলবায়ু, একই খাদ্য ও শিক্ষা দীক্ষায়ও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, বাহ্য জগৎ হইতে তাহারা একই উপাদান গ্রহণের সুযোগ পাইয়া থাকিলেও, তাহাদের শরীরের মধ্যে মন নামক এমন একটা কিছু আছে, যাহা তাহাদের গৃহীত একই উপাদানগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন আকারে, ব্যাপারে, ভাবে ও অভিব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ আমাদের এই শরীরটা আমাদের মানসিক ভাব রাজ্যের স্থূল পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা প্রত্যহ যে সকল পাপতাপ, ব্যাধি ও সুখ দুঃখাদিতে ক্লিষ্ট হইতেছি, তাহার নিদান আমাদের মনের মধ্যেই বিদ্যমান। ভারতে এমন এক দিন ছিল, যখন কোন প্রকার রোগ মাত্রকেই পাপের চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইত; এবং রোগ উপশমের জন্য প্রায়শ্চিত্তাদির বিধিও শাস্ত্রাদি হইতে প্রদত্ত হইত। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী রোগাদি কতই ঘৃণার চক্ষে দেখিত। সে দিন চলিয়া গিয়াছে, মানুষ এখন আর ধীরভাবে তাহা ভাবিতে পারে না, সে শক্তি তাহারা হারাইয়াছে। তাই বিড়ম্বনা, অকাল-মৃত্যু, দিন দিন দুর্ভিক্ষ, মহামারী আমাদিগের অস্থি-মজ্জা পেষণ করিতেছে। ব্যক্তিগত মন যেমন ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ভিত্তি সেইরূপ সমাজের-দেশের লোকদিগের মন বা ভাব-সম্পদ সমাজ ও দেশের সুখ দুঃখের নিদান। কাজেই যে সকল চিন্তাধারা ছোটবেলা হইতে আমাদের মানসিক বিত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং যে সকল ভাব আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য—দৈন্যের জন্য গভীরভাবে দায়ী, তাহা দেখাইবার জন্যই এই মনস্তত্ত্বের আলোচনা।

১৭। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের জীবনে মরণে উদাসীন্য আমরা পুরুষানুক্রমিক ভাবে লাভ করিয়াছি, প্রধানতঃ দুইটী ভাব হইতে, যথা (১) নির্ব্বাণবাদ (২) মায়াবাদ। এই "বাদ" দুটি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরতম দেশ ও নিত্য নৈমিত্তিক ধ্যান ধারণা ও অন্যান্য কর্ম্ম প্রবাহের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কাজেই এই দুরন্তর বিষয় লইয়া আলোচনা করা যে বড়ই অপ্রীতিকর, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে

হইবে না। কিন্তু অপ্রীতির মধ্যে থাকিয়া আমরা দিন দিন আমাদের স্বাস্থ্য সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জাতীয়তা হারাইতে বসিয়াছি যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, শক্তিশালী ঔষধ প্রয়োগে তাহা বাহির করিলেই শক্তি পাইব, ধন্য হইব ও ঔষধের তীব্রতার কথা ভুলিতে পারিব।

১৮। এখন নির্ব্বাণ কি এবং উহা প্রবর্ত্তনের হেতু ও ফলাফলের বিষয় সংক্ষেপতঃ আলোচনা করা যাউক। নির্ব্বাণ এই কথাটী দ্বারা সাধারণতঃ নিভাইয়া ফেলা, লোপ, নিঃশেষ, সম্যক নাশ, মৃত্যু, লয় ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে। মানুষের সম্বন্ধে প্রকৃতিদত্ত শক্তিনিচয়কে বিকশিত হইতে না দিয়া নিঃশেষরূপে নিভাইয়া ফেলাই নির্ব্বাণ। তোমার যা আছে, বিন্দু বিন্দু করিয়া তিল তিল করিয়া তাহা নষ্ট করিতে চেষ্টা কর-সাধনে ভজন দিবানিশি এইরূপ করিতে করিতে তোমার অস্তিত্বের সম্যক বিলোপ সাধনের সফলতাই নির্ব্বাণ। ইহা কি প্রকারে প্রবর্ত্তিত হইল? ধীরভাবে ভাবিতে গেলে ইহাই সমীচীন বলিয়া প্রতীত হয় যে, আমরা স্বকীয় দুর্ব্বলতার দরুণ পরম সম্মানময় পরমেশ্বর তত্ত্ব ও বিধান এবং আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া যখন সংসারে বিচরণ করিতে থাকি, তখনই অজ্ঞানতা বশতঃ নানা প্রকার অশান্তি ও দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হই ও দুঃখ নিবৃত্তির কথা ভাবিতে বসি। দুঃখ কেন হইতেছে তাহা যখন ভাবিতে বসি, তখনই দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে একটী জিনিষ আছে, যাহা প্রতিনিয়তই নানা প্রকার বাহিরের বস্তু পাইবার জন্য ব্যগ্র। এইটী হচ্ছে "বাসনা"। মনে হয় এই বাসনা আছে বলিয়াই আমাদের যত প্রকার অশান্তি, উদ্বেগ, দৈন্য, কাতরতা, হাহাকার। কাজেই ইহার আত্যন্তিক বিনাশ সাধন,—সঙ্গে সঙ্গে যাহা হইতে বাসনা জাগে সেই সত্তা (অর্থাৎ নিজকে) দিনে দিনে ক্ষীণ করিয়া বিলোপ করাই—এই বাসনা বা বাসনা হইতে উৎপন্ন দুঃখরাশির হাত হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র পথ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। এই ভ্রান্তিই নির্ব্বাণের পথ-প্রদর্শক। অসংযত বাসনা যে অতীব ভয়াবহ ও দুঃখের কারণ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। আমরা যতই আমাদের বৈদিক রীতি নীতি হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি, যতই নব শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইতেছি, ততই আমাদের দুরাকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেছে ও অনাবশ্যক প্রয়োজনের সৃষ্টি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তামাক, চুরুট, মদ, সোডা, লিমনেড, চা, কাফি, বিস্কুট, এসেন্স ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আমাদের জীবন-ধারণের জন্য বা স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য ইহাদের কোনই প্রয়োজন নাই; এবং অভিজ্ঞ সুধিজন ইহাদের অপকারিতার কথাই প্রচার করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে বৌদ্ধ "শূন্যবাদ" হইতেই এই নির্ব্বাণবাদ হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই সময় হইতেই নির্ব্বাণ সমর্থক কতকগুলি শ্লোক ও গ্রন্থাদি হিন্দুদের শাস্ত্রাকারে রচিত হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, এই নির্ব্বাণবাদ কি প্রকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তাহা অতীব দুর্ব্বোধ্য হইলেও, নির্ব্বাণ বা অনন্ত মৃত্যুর উপাসনা যে দুর্ব্বলতা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। দুঃখে ও দুর্ব্বলতায় মানুষ আত্মহত্যা করে,—নির্ব্বাণও সেইরূপ এক প্রকার পরোক্ষভাবে আত্মহত্যা।

১৯। নির্ব্বাণবাদিগণ ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি-নিচয়কে ক্লিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের জীবনধারা, নিজনিজ কর্ম্ম-সাপেক্ষ বিধান ও কৌশল উপযোগী করিয়া তুলিবার আবশ্যকতায় অন্যান্য সাংসারিক লোক তাবতের জীবনধারা হইতে পৃথক করিয়া তুলিয়াছে। সংসারে সংসারী হইয়া মনুষ্যত্বের গণ্ডীতে থাকিবার জন্য যে সকল পুরুষকার বা সাধনা আবশ্যক, তাহা হইতে তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে। সংসারে প্রকৃত মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য শিক্ষা, দীক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য, বীর্য্য ও ধৈর্য্যাদি যে সকল গুণ আবশ্যক তাহাও তাহাদের নাই। কার্য্যতঃ তাহারা দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার আশায় অধ্যা-সুসেবিত সুসংস্কৃত বর্ণাশ্রমের সীমারেখা হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিবার উপায় অন্বেষণে ব্রতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহারই অভিব্যক্তি বর্ত্তমান সন্ন্যাসাশ্রম। যেথানে আজকাল সুধুই দেখা যায় পরমুখপ্রেক্ষিতা, কর্ম্মকুণ্ঠা ও উদ্দেশ্যহীন অলস জীবন যাপনের মূর্ত্তিমান গড্ডালিকা।

২০। বিশেষতঃ, কালক্রমে ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে ও অবশ্যম্ভাবী নানা বিপর্য্যয়ে বর্ত্তমানে শাস্ত্রাদি যে অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহাতে নিহিত বিচারশূন্যচিত্তে তাহাদের মৌলিকতা ও সত্যতা গ্রহণে স্বতঃই নানা সন্দেহের উদয় হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে ও বিচারশক্তি প্রভাবেই কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের গন্তব্য পথের অনুসন্ধান করা যৌক্তিক বলিয়া প্রতীত হয়। পরোপকার মহামন্ত্রপূত বর্ণাশ্রমভুক্ত সন্ন্যাস সমাজের পক্ষে যে হিতকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর ইহাও সত্য যে, জীবন ধারণোপযোগী আহার ও বিশ্রামাতিরিক্ত জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত যিনি পরোপকারে বা সত্যানুসন্ধানে ব্যয়িত করিতে পারেন তিনিই এই সন্ন্যাসের অধিকারী। পরন্তু বর্ণাশ্রম-অধ্যুষিত সন্ন্যাস বৃদ্ধদিগকে তাহাদের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা সমাজে প্রচার করিবার সুযোগ করিয়া দিত ও অন্যান্য সাংসারিক ব্যাকুলতা হইতে অব্যাহতি দিয়া তাঁহাদের জীবনের শেষ কয়টা দিনও সুখময় করিয়া রাখিত। সেই বর্ণাশ্রম এখন বিধ্বস্ত আর সেই সন্ন্যাসও এখন নাই। বর্ত্তমানে যে সকল যাযাবর দেখিতেছ, নির্ব্বাণে তাহাদের সাধনার চরমোৎকর্ষতা, মৌলিকতাবিহীন ও বিচারবিহীন অন্ধের ন্যায় গতানুগতিকতাই তাহাদের উপাস্য। অলসতাতেই তাহাদের অচল আসন। ঔদাস্য তাহাদের অন্তরতম মনোরাজ্যের অচলরাগ। এই সকল মত যদি সুধু কতকগুলি গৃহহীন ভিক্ষোপজীবী ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে এতটা পরিতাপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহা তোমার সমাজের প্রত্যেক অঙ্গেই বিষক্রিয়ার প্রসার করিয়াছে। এমন কি একজন সজ্জন, বিজ্ঞ, সাধুচরিত্র ভদ্রলোক কোন গ্রামে উপস্থিত হইলে গ্রামে যেরূপ কৌতূহলের সৃষ্টি না হয়, একজন কেবল বেশভূষায় সন্ন্যাসী আসিলে তদপেক্ষা একটা বৃহৎ সাড়া পড়িয়া যায়। সমস্ত গ্রাম উৎগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া উঠে ও সুধু সাধুজন-সেবিত বেশভূষার জন্য সাধুর দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং নিজেদের অন্তঃসার-বিহীনতার পরিচয় দেয়। বর্ত্তমানে হিন্দুদের আচার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলে ইহাই মনে হয়, যেন তাহারা ধর্ম্মকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট তীর্থ স্থানে ও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বেশভূষার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছে। পরন্তু তাহাদের এই মোহ এতই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে যে, তাহারা প্রতি পদেই এই সকল তীর্থস্থানে ও এবম্বিধ নামধেয় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক অনবরত বিড়ম্বিত প্রতারিত ও অবমানিত হইলেও তাহাদের সেবায় কোটি কোটি মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতেছে। সে যাহাই হউক, সে বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুধু নির্ব্বাণবাদী সন্ন্যাসীদের প্রভাব আমাদের সমাজের কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছে ও আমরা প্রাণে প্রাণে তাহার কতদূর দাস, তাহাই দেখাইবার জন্য এই কথাটীর উল্লেখ করা হইল।

২১। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে নির্ব্বাণবাদিগণ সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতে যে পুরুষকারের দরকার, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই সন্ন্যাস আশ্রম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। তাহাদের হৃদয়ের গভীর অবজ্ঞা ও শাসন দণ্ড 'ভীষণং ভীষণানাং' ভাবে 'কামিনী ও কাঞ্চনে'র উপর পরিচালিত হইয়াছে। তথাকথিত পুরাণাদি ও নবীন পরমহংসাদিও এই বিষয়ে কোন কার্পণ্য দেখান নাই। সংসারে যত কিছু কুকার্য্য আছে, তাহার সকলের জন্যই যেন কামিনীকুল কলঙ্কিত। কামিনী বা মাতৃজাতির প্রতি এমন গভীর অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব আর কোন জনপদে এমন কি পশুদের মধ্যেও বিদ্যমান আছে কি না, সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ। বলিতে কি শাস্ত্রাদিতে কামিনীদিগকে 'কান্তিরিণী' 'সর্পিনী,' 'নরকের দ্বার' 'বুহকিনী' 'মায়াবিনী' ইত্যাদি কত কি বিভীষিকাময়ী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যদিও এই কামিনী কক্ষি হইতেই

সর্ব্বপ্রকার ধার্ম্মিক, বিজ্ঞ, নীতিবিদ, সংস্কারক, ত্যাগী, যোগী, যোদ্ধা ও শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছে, তথাপি মাতৃকুলের প্রতি এই যে অবজ্ঞা তাহার কারণ এই নির্ব্বাণ সৃষ্ট দুষ্ট মনোবিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যবহারে ইহাই বোধ হয় পুরুষগুলি যেন মাতৃগর্ভ হইতে জন্মে নাই; পরন্তু পিতার উরুদেশ ভেদ করিয়াই বাহির হইয়াছে, আর তাহাদের জীবনের সহিত গর্ভধারিণীর কোন সম্বন্ধই নাই। এমন কি স্ত্রীলোকদের সামাজিক জীবন ও তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা পরীক্ষা করিলে স্বতঃই দেখিতে পাইবে যে, তাহাদিগকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই গভীর উপেক্ষার মন্দিরেই থাকিতে হয়। মেয়ে জন্মিলে যে উলুধ্বনি দেওয়া হয়, তাহার সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া—লালন পালন শিক্ষা দীক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার যে ঔদাস্যের মধ্যে তাহারা বাস করে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবেই গভীর পরিতাপের বিষয়। তাহারা না পায় ব্যারামে সু-চিকিৎসা, না পায় স্বাস্থ্যে সুখাদ্য। বৃক্ষের মূলে চ্ছেদ করিয়া তাহা হইতে সুফল পাওয়ার আশা যেমন ধৃষ্টতা মাতৃকুলের প্রতি এতাদৃশ অবজ্ঞা বা ঘৃণা পোষণ করিয়া তাহাদিগকে দিন দিন পেষণ করিয়া ফেলিয়া, তাহাদের কুক্ষি হইতে সমাজ ও দেশরক্ষক সুসন্তানের আশা করা কি তদ্রূপ বিড়ম্বনা নহে? মাতৃ জাতির উন্নতির বিষয় বলিতে আমি পিতৃস্থানীয় পুরুষদের দাসত্বের কথা কখন মনেও আনি না; কিন্তু সংসারের উন্নতির জন্য মাতৃকুলকে শিক্ষায় দীক্ষায় স্বাস্থ্যে জীবনে মনে ও আত্মীয় সজীব করিয়া তুলিবার কথাই বলিতেছি। ধীরভাবে ভাবিলে ইহাই দেখিতে পাইবে, আমাদের নির্ব্বাণে আকুতি ও কামিনী কাঞ্চনে তথাকথিত অবজ্ঞা সুধু ক্লৈব্য হইতেই উদ্ভূত। কারণ কামিনী কাঞ্চন লইয়া সংসার করিতে হইলে ব্যক্তি মাত্রেরই যে শক্তি সামর্থ্য শিক্ষাদির প্রয়োজন উলঙ্গ অবস্থায় সন্ন্যাসী সাজিয়া যে কোন গের নীচে বসিয়া থাকিতে সেই সকল সাধনার কোন ধার ধারিতে হয় না, আপাততঃ এই প্রকারই মনে হইয়া থাকে; আর সেই জন্যই সুধু ভারতে ষাটলক্ষ সন্ন্যাসীর বিদ্যমানতা পরিদৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে যে দুইচার জন প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী নাই এমন কথা বলিতেছি না। তাহা ছাড়া আর সকলেই ভিক্ষোপজীবী, অলস পরবিত্তাপহারক ও উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপক। তাহাদের না আছে কোন বিশিষ্ট সুশিক্ষা বা দীক্ষা না তাহাদের দ্বারা সমাজের কোন উপকার হইতেছে। পরন্তু তাহাদের দৃষ্টান্তে আরও শত শত নির্ব্বাণবাদী সন্ন্যাসীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বলিতে কি এই ষাটলক্ষ লোক যদি প্রকৃতই কর্ম্মী ও পূতচেতঃ হইত, তাহা হইলে সুধু তাহাদের কর্ম্ম-উন্মাদনা ও চিত্ত-বিত্ত বৈভব (thought-vibration) হইতেই ভারতের দৈন্য বিদূরিত হইয়া উৎসাহ ও অন্যান্য জীবনের স্নিগ্ধ রাগ প্রকটিত হইত।

২২। এই নির্ব্বাণবাদের সহিত "মায়াবাদের" যোগ হওয়াতে আমরা অবসাদের অতল সাগরে নিমজ্জিত। এই জগৎ মায়াময়; ইহার কিছুই স্থায়ী নয়। এ জীবন নিশার স্বপন! তোমার পুত্র কে? তোমার স্ত্রী কে? কায়ার প্রাণে নাই সম্বন্ধ; পৃথিবীর সকলই দু'দিনের; নলিনী-দলগতজলবৎ জীবন চঞ্চল; ইত্যাদি ভাবগুলি আমাদিগকে একেবারে অন্তঃসারবিহীন করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবগুলি এতই মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের প্রত্যেক কাজেই তাহার আভাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দার্শনিক ভাবে এই সকল তত্ত্ব কয়জনে বুঝিয়া থাকেন বা বুঝিবার চেষ্টা করেন? কেবল সংসার অসার সংসার অসার বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে আমরা অসারের অসার হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আমরা যে-কোন কাজই করি না কেন, তাহা দু'দিনের জন্য এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যেন-তেনপ্রকারে সকল কর্ত্তব্যই শেষ করিতে প্রয়াস পাই ও তৎসঙ্গে অপরিহার্য্য দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হই। মনে কর একখানা ঘর তুলিতে হইবে। মনে করিতেছি, আমি ত দু'দিন বই আর নই, ঘরখানাও দু'দিনের; কাজেই যাহাতে উহা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-অনুমোদিত সর্ব্বপ্রকার সুখ ও সুবিধার আধার হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক মনে করি না। এই প্রকারে আমাদের

জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই—খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা আহ্লাদ আমোদ সকলই যেন একটা ঔদাস্যের আবহাওয়ায় বিধূমিত।

২৩। এখন কর্ত্তব্য কি? আমাদিগকে আমাদের দুঃখের কারণ জানিতে হইবে এবং তাহা দূর করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত অনবরত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে হইবে। এই যুদ্ধই সাধনা বা যোগ। ধীরভাবে কার্য্য করিলে ইহার প্রভাবেই দিন দিন আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি—যাহা এখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিদ্রিত উজ্জ্বল হইবে। আমরা দুঃখের কারণ জানিতে পারিলে, এবং তাহা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিবার জন্য আমাদের কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত করিলে, দুঃখ ও দৈন্য আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না; আমরাও প্রতি কাজে অতুল আনন্দের অধিকারী হইব। অমৃতময় ভগবানের জগৎ-রচনায় দুঃখের নিদানীভূত কোন কারণই নাই, ইহা সুনিশ্চিত। পুনশ্চ যৌক্তিকতার দিক্ দিয়া দেখিলেও এই নির্ব্বাণ সিদ্ধান্তের অনুকূলে বিশেষ কিছুই যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহাও নহে। পরন্তু জগৎ রচনা যদি সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গলময় বিধান বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে নির্ব্বাণের পথে ধাওয়া আর সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করা একই কথা। যদি নির্ব্বাণই আকাঙ্ক্ষা হইত, তাহা হইলে ভগবানের জগৎরচনার সার্থকতাও কিছুই থাকিত না। ভগবান নিজেও নির্ব্বাণের সহিত পরিতুষ্ট না থাকিলেন কেন, তাহাও বুঝা যায় না। আমাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গুরুগণ, যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি দেবতা সকল বা কেন নির্ব্বাণের জন্য বিব্রত না থাকিয়া জগতে ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি কার্য্য দ্বারা নির্ব্বাণের ব্যর্থতাই সপ্রমাণ করিলেন, তাহাও বুঝা যায় না। আর যদি গুরুগণ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উপাসনায় এই লৌকিক জগতে শুভ ফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে কি না, ইত্যাদি নানা জটিল ও গুরুতর বিষয় আসিয়া মনে উদিত হয়। আর পুনঃ পুনঃই মনকে জানাইয়া দেয় যে, ইহা (নির্ব্বাণ) সুধু দুর্ব্বলতারই চিহ্ন, আর দুর্ব্বল লোকের দুঃখ মুক্তির এক ভ্রান্তি-বিজৃম্ভন। দুঃখ মুক্তির জন্য এই নির্ব্বাণ পরিকল্পনা আমাদের মনে স্থায়ী বাসা করিয়াছে বলিয়াই, আমরা জীবন যুদ্ধে ও প্রত্যেক কাজে উদীয়মান জগতের সম্মুখে উপহাস্য, নগণ্য—কাপুরুষ—বলিয়া প্রতীত হইতেছি। এই সকল ভাব আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের শক্তিনিচয়কে আমরা দিন দিন উন্নতির দিকে—বিকাশের দিকে—প্রেরণ না করিয়া অপধ্বংসের দিকে প্রেরণ করায়, আমরা প্রকারান্তরে অপমৃত্যুর ক্রোড়ে শুইয়া পড়িতেছি। কারণ, নির্ব্বাণই যাহাদের উপাস্য, তাহারা আর শক্তি-নিচয়ের উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতে পায় না। কাজেই দিনের দিন যে তাহারা নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় মৃতপ্রায় বলিয়া জগতের সম্মুখে বিড়ম্বিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে পর্য্যন্ত আমাদের এবম্বিধ মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন না হইবে, যে পর্য্যন্ত আমরা এই জগৎ নশ্বর, ইহার কিছুই স্থায়ী নহে ইত্যাদি ভাবে প্রমত্ত হইয়া থাকিব ও নির্ব্বাণই মানব-জীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য বলিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিব, সেই পর্য্যন্ত আমাদের জীবনে স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে আমরা যে মনোনিবেশ করিব তাহা বাতুলেই ভাবিতে পারে। যাহারা এই জীবন কিছুই নয়, এ দেহ দুদিনের ও স্বপ্ন মাত্র বলিয়া দিন রাত্রি ভাবিতে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের এই দেহের জন্য যত্ন বা স্বাস্থ্যান্বেষণের প্রয়োজন কিছুই নাই, আর থাকিতেও পারে না। কাজেই সুধু স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বলিয়া চীৎকার করিলেই, কার্য্যসিদ্ধি হইবার কোন আশা নাই। পরন্তু আমাদের এই প্রকার মানসিক ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

২৪। মঙ্গলময়ের সৃষ্টিও মঙ্গলময়। মধ্যে মধ্যে যে আমরা দুঃখ, দুর্দ্দশা ও দৈন্যে ম্রিয়মান হই, তাহা সুধু আমাদের অজ্ঞতার ও মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় বিধান না মানিয়া চলিবার অবশ্যম্ভাবী ফল। মানব! তুমি দুষ্ট ও অজ্ঞ বলিয়াই ঘরের আবর্জ্জনার কথা জান না ও তাহা দূর করিবার সন্ধান পাও নাই। যদি জানিতে—তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই আবর্জ্জনারাশি সরাইয়া আনন্দবাগের সৃষ্টি করিতে পারিতে।

২৫। আমাদের সাংসারিক দুঃখরাশির কারণ প্রধানতঃ রোগ, অকাল-মৃত্যু ও অভাব। স্থির ভাবে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সকলের নিদান আমাদের অজ্ঞতায় ও জীবনে ঔদাস্যে। এই অজ্ঞতা দূর করিয়া আমাদের দুঃখের কারণ জানিতে হইবে ও ঔদাস্য দূর করিয়া সেই কারণের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। সেই জন্য আমাদের অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের দরকার। বর্ত্তমান দুঃখের ধারা বদলাইবার জন্য—অন্য কথায় আমাদের অজ্ঞতা ও ঔদাস্য দূর করিবার জন্য, আমাদিগকে অতি পুরান, অতি মহাঢ্যা দেবিদ্যা প্রচারের জন্য ভূয়ঃ ভূয়ঃ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাতেই আমরা পাইব আমাদিগকে বীর্য্যবান করিবার প্রথম ও প্রধান মহৌষধি "ব্রহ্মচর্য্য"। আর আমরা যে অজ্ঞতার জন্য ক্লিষ্ট হইতেছি, তাহা দূর করিবার জন্য দিব্যজ্ঞান। এই জাতি যদি পুনরায় ব্রহ্মচর্য্য মন্ত্রে ও বেদবিদ্যায় জাগিয়া উঠে, তাহা হইলেই তাহার স্থিতি দৃঢ়া হইবে, ক্লৈব্য বিদূরীত হইবে—স্বাস্থ্য সম্পদ সকলই তাহার নিত্য সহচর হইবে; এবং সে জগতের অন্যান্য জাতির সহিত সমান আসন অধিকারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৬। মনু বলিয়াছেন "বেদবিদ্যার অভ্যাস না করিলে, সদাচার পরিত্যাগ করিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অলস হইলে ও কদন্ন ভোজন করিলে আমরা মৃত্যু মুখে পতিত হই (মনুসংহিতা ৫ম অঃ ৪র্থ শ্লোক)। এই শ্লোকটিতে মহামানব বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মচর্য্যাদি সদাচারের আশ্রয় লইলে, আমরা যে অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, তাহা স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন।

২৭। মানব! তুমি স্বতঃই প্রকাশমান। কাজেই নির্ব্বাণের দিকে ধাওয়া আর স্রোতের বিরুদ্ধে চলা একই কথা। সমস্ত জগৎ ক্রিয়াশীল। তুমি নির্ব্বাণের জন্য চেষ্টা করিয়া বৃথা বিড়ম্বিত হইতেছ ও তোমার শক্তি ও সময়ের অপচয় করিতেছ কেন? স্বভাব বা ধর্ম্ম কি পরিবর্ত্তিত হইবার বিষয়? শৈত্য জলের ধর্ম্ম বা স্বভাব। তুমি তাহা শত উত্তাপে উত্তপ্ত কর না কেন—পৃথিবীর সমস্ত কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করিলেও তাহা পুনরায় আকাশ হইতে শীতল হইয়াই ধরাতে পতিত হইবে। কাজেই নির্ব্বাণের জন্য আর পণ্ডশ্রম করিও না। মৃত্যুর দিক দিয়া অনন্ত জীবনকে লাভ করা যায় না। তাহাকে লাভ করিতে হইলে, তোমাকে জরা-মৃত্যু বিবর্জ্জিতের ন্যায় শরীরে, মনে ও আত্মায় পূর্ণ স্বাস্থ্যে জাগিয়া উঠিতে হইবে। যখন তোমার শরীর, মন ও আত্মা পূর্ণস্বাস্থ্য আতটপূর্ণ জলাশয়ের মত স্থির ধীর হইবে, তখনই তুমি পাইবে সেই সত্য-শিব-সুন্দরের পূর্ণের আভাস বা সহজ স্বাস্থ্য—মৃত্যু বা নির্ব্বাণের মধ্য দিয়া নহে।

২৮। দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া তুমি কেন মৃত্যু বা নির্ব্বাণের সন্ধানে চলিয়াছ। উঠ, জাগ। তুমি নিত্য, শাশ্বত, অমর। দেহের অবসানেও তোমার মৃত্যু নাই। তোমার যা আছে, তাহাই কুড়াইয়া লও। তোমার দুঃখের কারণ অনুসন্ধান ও তাহা দূর করিবার চেষ্টা কর। অবিলম্বেই আনন্দের বীণা বাজিয়া উঠিবে; বুঝিতে পারিবে, তুমি স্বতঃই প্রকাশমান—নির্ব্বাণের নও। পাইবে তাহাতেই অক্ষয় স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার।

আমার আমেরিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা*

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবর)]

ইয়োরোপের বহু দেশ বহু দিন ধরিয়া ভ্রমণ করিয়া ও ইংলণ্ডের হেভি-ওয়েট্ চ্যাম্পিয়ন্‌সিপ্ (গুরুভার উত্তোলনের নিখিল প্রতিযোগিতায়) জয়লাভ করিয়া, আমি ১৯১৫ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি। ১৯১৭ সাল অর্থাৎ আমার দেশে ফিরিবার দুই বৎসর পর হইতে আমেরিকার কুস্তিগীর দলের পরিচালকগণ আমাকে সেখানে গিয়া তাঁহাদের দেশের রথী-রথী পালোয়ান্‌দের সম্মুখীন্ হইবার জন্য নিমন্ত্রণ ও তৎসহিত বেশ প্রলোভনময় প্রস্তাব পাঠাইতে সুরু করিলেন। তাঁহারা আমার সহিত একটা পারস্পরিক চুক্তি করিতে চাহিলেন, যদ্দারা আমি ঐ দেশে অন্ততঃ দুই বৎসর কাল থাকিতে প্রতিশ্রুত থাকিব। তাঁহারা আমার যাতায়াত ও বারবরদারী-খরচ বহন করিবেন ও প্রত্যেক মরশুমের শেষে একটা মোটা রকমের লভ্যাংশ দিবেন। আমাদের মত খেলোয়াড় লোকেদের পক্ষে এরূপ লাভজনক প্রস্তাব পাওয়া কিছু বিচিত্র নহে; সুতরাং আমি বিভিন্ন জায়গা হইতে আগত বিভিন্ন প্রস্তাব-গুলি সম্বন্ধে ঐকান্তিকতার সহিত বিবেচনা করিতে লাগিলাম।

রাশি রাশি পত্র-বিনিময় ও দর-কষাকষি করিয়া অবশেষে আমি মিঃ এডোয়ার্ড ডেলমাক-এর (Edward Delmuk) প্রস্তাব সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণ করিলাম এবং ১৯২০ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে আমার শিষ্য শ্রীমান্ বনমালী ঘোষকে সঙ্গে লইয়া ভারত পরিত্যাগ করিলাম। আমাদের বিলাত হইয়া আমেরিকা যাইতে হইবে; ভারত হইতে আমেরিকা যাইবার ইহাই **হইল সর্ব্বজন-অনুসৃত** পন্থা। বিলাত হইতে আমেরিকায় পৃথক জাহাজে পৃথক স্থান ভাড়া করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের বিলাতগামী জাহাজখানি বিলাতে পহুছিবার অব্যবহিত পরেই, তথা হইতে আমেরিকা অভিমুখে যে জাহাজখানি ছাড়িবে, সেই জাহাজে আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখিবার জন্য টমাস্ কুকের লণ্ডন-আফিসে যথা সময়ে টেলিগ্রাম করিয়া ছিলাম। কিন্তু যখন হাওড়ায় আসিয়া আরামদায়ক পোষ্টাল এক্সপ্রেসে চড়িয়া বসিলাম, তখন কি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিলাম যে আমেরিকা-যাত্রার পথে আমাদের কপালে এত দুর্ভোগ লেখা আছে!

বিলাতে ঠিক কোন্ দিন গিয়া পহুছিলাম, তাহা মনে নাই; তবে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি কোনো একটা দিন বলিয়া ঠিক আছে। সেখানে নামিয়াই পরের শুক্রবার দিন্ টমাস কুক্ মহাশয়দের আফিসে আমাদের আমেরিকা-যাত্রার কি বিলি-বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার খোঁজ লইতে গেলাম; কিন্তু গিয়া শুনিলাম যে, দুইখানি ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট না কাটিলে আমাদের স্থান মিলা দুর্ঘট। আমাদের একখানি ফার্ষ্ট ক্লাসের আর একখানি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটা ছিল। একখানি সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ্ যোগাড় করিয়া দিতে তাঁহাদের কি আপত্তি কি জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহারা সোজাসুজি মুখের উপর জবাব দিয়া দিলেন, "মশাই, জানেন ত, এক একটা ক্যাবিনে দুইজনের জন্য স্থান থাকে। সঙ্গে কথা বলিতে কি—ইয়োরোপীয়ানরা ভারতবর্ষীয়দের সঙ্গে একত্র ভ্রমণ করিতে চাহেন্ না। সুতরাং যদি দুইখানি বার্থের জন্য অতিরিক্ত মাশুল দেন, তাহা হইলে আপনাদের দুই জনের জন্য একখানি ক্যাবি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।" এই নৃশংস উত্তরে আমার যে কতদূর রাগ হইল, তাহা সহজে অনুমান করিতে পারেন।

* All rights reserved to the Publishers.

আমি এই বিধানের জোর গলায় প্রতিবাদ করিলাম এবং আমাদের সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটখানি কোনো ক্রমেই ফার্ষ্ট্ ক্লাসে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইব না—সে কথাটাও বেশ ভালো করিয়া শুনাইয়া দিলাম। তাঁহারা আমাকে পরদিন আসিয়া দেখা করিতে বলিলেন্।

পরদিন তাঁহাদের আফিসে হাজীর হইবা মাত্র তাঁহারা বেশ গম্ভীরভাবে বলিয়া বসিলেন যে, সেকেণ্ড বা ফার্ষ্ট ক্লাসে একটি জায়গাও খালি নাই, তবে একখানা থার্ড ক্লাস ক্যাবিন পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা সবিনয়ে এ কথাটাও অবশ্য নিবেদন করিলেন যে থার্ড ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই, কেবল খাদ্যের গুণ ও পরিমাণে যাহা কিছু প্রভেদ, এবং তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আমাদিগকে ফার্ষ্ট ক্লাস 'খানা' পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হইবে। তার পর তাঁহারা হিসাব মত আমাদের অতিরিক্ত ভাড়ার টাকা এবং কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম পাঠাইবার খরচ ফিরাইয়া দিলেন্। তাঁহাদের এইটুকু ভদ্রতার জন্যই মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম এবং 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামাকে' এই আশ্বাসে ধরিয়া বসিলাম যে, এই জাহাজে গেলে ঠিক সময়মত আমেরিকায় পহুছিতে পারিব; কারণ কুস্তির মরশুম্ সেখানে আরম্ভ হয় ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে!

তল্পীতল্পা লইয়া রেলযোগে সাউথ্যাম্পটন্ বন্দরে পঁহুছিলে পর জেটির যে অংশটায় থার্ড ক্লাস্ প্যাসেঞ্জাররা যাত্রার জন্য অপেক্ষা করেন, সেই জায়গাটি আমাদের দেখাইয়া দেওয়া হইল। তথা-কথিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর যে সকল লোকেদের স্বদেশে শত চেষ্টায়ও অন্নের সংস্থান হয় নাই, বিদেশে গিয়া তাঁহারা যে করিয়া হোক্ গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া লইবেন—এই ভরসায় ইয়োরোপের নানাস্থান হইতে অনেকগুলি লোক এই স্থানে পুঁটলিপোঁটলা লইয়া গাদাগাদি করিয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া আছেন। জাহাজে চড়িবার পূর্ব্বে তাঁহাদের দেহে কোনোরূপ সংক্রামক বা মারাত্মক ব্যাধি আছে কি না তাহা কড়াকড়ি ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। তাঁহাদের মুখে দারিদ্র্যের দুঃসহ যাতনার সুস্পষ্ট চিহ্ন—তাঁহাদের নেত্র-প্রান্তে দুঃখের দুর্নিবার কালিমা আঁকা—তাঁহাদের মানস-গগনে আশার অরুণরাগ, পরনে মলিন দুর্গন্ধযুক্ত পরিচ্ছদ,—এই দৃশ্য দেখিয়া ভারতের কুলির আড়্কাটির কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহাদের গাত্র ও পরিচ্ছদের দুর্গন্ধময় আবেষ্টনী, ঠেলাঠেলি, উচ্চ কলরব, মুহুর্মুহু থুথু ফেলা ও কড়া তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। বাস্তবিক ইয়োরোপের কোনো স্থলে এ শোচনীয় দীনতার দৃশ্য দেখিবার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের ইয়োরোপীয় বন্ধুগণ অনেক সময় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আমাদিগকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালী আদৌ পবিত্রতা পূর্ণ বা স্বাস্থ্যকর নহে; কিন্তু এই মূঢ় ম্লান শুষ্ক দীন হীন বিশীর্ণ লোকদের পরিচ্ছদ ও আচার দেখিয়া আমার সিদ্ধান্ত করিতে বেশী দেরী হইল না যে, বর্ণ বা জাতি বিশেষে যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে—তাহা নহে, পরন্তু জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তির স্বচ্ছল আর্থিক অবস্থার উপর এই জ্ঞান প্রস্ফুরণের ভাব যথেষ্ট নির্ভর করে। এই প্রবাস-কামী লক্ষ্মীহীনের পল্টন সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিয়া, শুধু এইটুকু জানাইতে চাহি যে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই সোনালি স্বপ্নভরা আমেরিকা যাইবার একখানি টিকিট কাটিবার জন্য তাহাদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি এমন কি ঘাট-বাট পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছে—জীর্ণ বক্ষ-দেউলে শুধু এই আশার বাতিটুকু জ্বালাইয়া, যে, সেই "সব-পেয়েছির দেশে" গিয়া তাহারা সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অঙ্ক লাভ করিবে।

যাহা হউক, থার্ড ক্লাস ক্যাবিনে মাথা গুঁজিয়া হোয়াইট্ ষ্টার লাইনার এস্ এস্ "এড্রিয়াটিক" নামক জাহাজে চড়িয়া আমেরিকার পথে আমাদের যাত্রা সুরু হইল। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের

জাহাজ নিউ ইয়র্ক বন্দরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। খারাপ আবহাওয়ার জন্য অবশ্য আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে আসিয়া পঁহুছিলাম। সুদীর্ঘ পথ-শ্রমে আমরা যথেষ্ট ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম বটে, তবুও [illegible] রহস্যময়ী বিরাট নিউ ইয়র্ক নগরীতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রবেশ করিব—এই সুখ-চিন্তায় বিভোর হইয়া আমরা সকল অবসাদ ভুলিয়া গেলাম। একজন ডাক্তার আসিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া গেলেন; তার পর একখানা ষ্টীম্ লঞ্চে চড়াইয়া আমাদিকে মোট গাঁট্‌রী সমেত একটা ছোটোখাটো দ্বীপে আনিয়া হাজীর করা হইল।

তার সান্নিধ্যে কয়েকখানি বেশ বড় বড় বাড়ী, লোকজন, গাড়ী ঘোড়ার চলনসই ভিড় দেখিয়া, প্রথম দৃষ্টিতে এই দ্বীপটিকেই নিউ ইয়র্ক সহর ভাবিয়া লইয়াছিলাম; কিন্তু দ্বীপে পদার্পণ করিয়া ও চারিদিকে ভালো করিয়া চাহিয়া যখন নিউইয়র্কের পূর্ব্বশ্রুত সমৃদ্ধি, বিশালতা ও ব্যস্ততার বিন্দুমাত্র নয়নগোচর হইল না, তখন এক দিকে হতাশ ও অন্য দিকে বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। কাষ্টম্‌স্-অফিসারের মত একজন ভদ্রলোককে তীরে দেখিতে পাইয়া জায়গাটির নাম জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম যে, এই জায়গাটির নাম হফ্‌ম্যান দ্বীপ; যে জাহাজে কোনো সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, সে জাহাজকে বন্দরের কিনারায় দাঁড় করাইয়া, তাহার আরোহীদিগকে কিছু দিনের জন্য এখানে আনিয়া পৃথক রাখা হয় (Quarantine Station)। এই কর্ম্মচারীটি আরও বলিলেন যে, আমাদের জাহাজে কয়েকটি টাইফয়েড্ রোগী ছিল, [illegible] এই দ্বীপে তিন সপ্তাহের জন্য আটক [illegible] তিনি আমাদিগকে তাড়াতাড়ি একটা [illegible] জায়গা দেখিয়া লইতে [illegible] কারণ, অবতীর্ণ যাত্রী-সংখ্যার [illegible] হোটেলাদির সংখ্যা এখানে [illegible]

[illegible] বারান্দা ভাড়া পাওয়া গেল। সেইখানে আমার শিষ্য শ্রীমান্ ঘোষ, মিঃ ঠাণ্ডি নামক আর একটি ভারতীয় ভদ্রলোক, একজন ইংরাজ ছোক্‌রা ও আমি ডেরাডাণ্ডা বিছাইয়া আশ্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলাম। আমরা প্রত্যেকে একখানি করিয়া লোহার খাট্ ও চারিখানি করিয়া কম্বল পাইলাম; যো-সো করিয়া উনিশটা দিন এই তথা-কথিত দ্বীপান্তরে কাটাইয়া দিতে হইবে।

কিন্তু হফ্‌ম্যান্ দ্বীপে উদ্‌যাপিত এই প্রতীক্ষা কাল আমার নিকট মোটেই বিরক্তিকর বোধ হয় নাই। এই দ্বীপের ভিতর নানা জাতীয় বিভিন্ন পদস্থ লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় ও মেশামিশি করিয়া তাহাদের দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, সামাজিক আচার ব্যবহার, জীবনের সাধ-অসাধ-অভাব-অভিযোগ, ধর্ম্মবিশ্বাস ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ প্রভৃতি দেখিয়া-শুনিয়া আমার মনে হইতে লাগিল—আমি যেন নূতন করিয়া গুরুগৃহে বসিয়া নূতনতর শিক্ষা লাভ করিতেছি পরদেশী ভাগ্যান্বেষীগণ কিন্তু ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মান্ হইয়া আমাদের নিকট নিয়তই বর্ণনা করিতে লাগিল—কেমন করিয়া তাহারা আকাশের চাঁদ হাতে পাইবার আশায় যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া এদেশে আসিয়াছে। এরূপভাবে বেকার অবস্থায় গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাহাদের আর কয়দিন চলে! তাহাদের পয়সাকড়ি ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। নিরাশায় উন্মত্তবৎ হইয়া বেচারীরা দিবারাত্র ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। বাস্তবিক সে বড় মর্ম্মান্তিক দৃশ্য! এদিকে আমরা চারিজনে মিলিয়া এই উৎকণ্ঠিত কষ্টসাধ্য জীবনের মধ্য হইতে আনন্দের মধু যথাসাধ্য নিংড়াইয়া বাহির করিতে লাগিলাম; দিব্য সুখে নাচ, গান, হাসি, গল্প, কনসার্ট, দ্বীপের চতুর্দ্দিকে দুইবেলা বহুদূর ভ্রমণ প্রভৃতিতে মাতিয়া রহিলাম।

একদিন একজন রাসিয়ান্ ভদ্রলোক আমাদিগের নিকট আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি একটা বড় গোছের কনসার্ট ও নাচের মজলিসএর আয়োজন করিতেছেন এবং তিনি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে

নিমন্ত্রণ করিয়া আশা করেন যে, তাঁহারা সাধ্যানুযায়ী স্বজাতিসুলভ নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন। তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন' "প্রাচ্যের নৃত্য-কৌশল দেখাইবার ভার এ রাত্রে আপনার উপর ন্যাস্ত হইল।" আমি মনে মনে খুব একচোট্ না হাসিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, ভারতবর্ষে ভদ্রঘরের স্ত্রীপুরুষদিগের প্রকাশ্য মজলিসে নাচিবার প্রথা বর্ত্তমান নাই। রাসিয়ান্ ভদ্রলোকটি একথা শুনিয়া রীতিমত হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং শেষে আমাকে অন্ততঃপক্ষে একখানা গান গাহিতে হইবে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। আমি বড় সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া গেলাম,—কারণ, গানের 'গ'ও আমার কস্মিন্ কালে জানা ছিল না। অথচ এই বিদেশী ভদ্রলোকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ না রাখিলে চলে না। ভাগ্যক্রমে আমাদের সহবাসী ভারতীয় বন্ধুটির কথা মনে পড়িয়া গেল। মিঃ ঠাণ্ডির নিকট ছুটিয়া গিয়া আমার এই মজার বিপদের কথা বিবৃত করিলাম এবং উদ্ধারের ভার তাঁহাকে লইতে বলিলাম। তিনি খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে এ ভার গ্রহণ করিলেন এবং একখানি ভারতীয় গান গাহিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমোদের প্রবল-উৎসাহী রাসিয়ান্ বন্ধুটি এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে চলিয়া গেলেন।

সে সান্ধ্য সম্মিলনীতে যোগ দিয়া আমরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিলাম এবং জগতের বহু দেশ প্রচলিত নাচের নমুনা নিষ্পলক নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বেশ পাকা রকমের নিখুঁত নাচিয়ে ছিলেন। প্রথম কন্‌সার্টে আশাতিরিক্ত সাফল্যলাভ আমাদিগকে পর পর আরও কয়েকটি কনসার্টের আয়োজনে উৎসাহিত করিল। এমন ভাবে হফ্‌ম্যান্ দ্বীপে জীবনের কয়েকটা দিন নিবিড় আনন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রকৃত পক্ষে শেষে এই ক্ষণস্থায়ী প্রবাসটির মোহে আমরা এরূপ মজিয়া গিয়াছিলাম যে, কুড়ি দিন পরে যখন এই দ্বীপ ছাড়িতে হইল, তখন প্রাণের মধ্যে বেশ একটু ব্যথা অনুভব করিলাম। হফ্‌ম্যান্ দ্বীপে উপভুক্ত খাদ্য সম্বন্ধে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে বিবেচনা করিয়া, ঐ সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়া যাই। খাদ্যগুলি অত্যন্ত মোটামুটি ও একঘেয়ে এবং এত নোংরা যে, তাহা মনুষ্য-গ্রহণের একেবারে অনুপযুক্ত ছিল। বাসন-পত্র, পেয়ালা-পিরীচ্ সব টিনের পাতে তৈয়ারী এবং এত নোংরা ছিল যে, ঐ সব সম্বন্ধে যত কম বর্ণনা করা যায়, ততই মঙ্গল।

হফম্যান দ্বীপের আমোদ-প্রমোদের অবসরে আমি সর্ব্বদাই উদ্বিগ্নভাবে চিন্তা করিতাম কবে না আমরা নিউইয়র্কে পদার্পণ করিতে পারিব! কুড়ি দিন পরে আমাদের ছাড়পত্র বা 'পাস্‌পোর্ট'গুলি নির্দ্দিষ্ট আফিসে দেখাইয়া দ্বীপ ছাড়িবার আদেশ পাওয়া গেল। কিন্তু এমনই গ্রহের ফের যে, আমাদের ষ্টীম লঞ্চ্ আমাদিগকে নিউইয়র্কে না পঁহুছাইয়া এলিস্ দ্বীপ নামক আর এক দ্বীপে আনিয়া উপস্থিত করিল। এখানে যুক্তরাজ্যের 'এমিগ্রেসন ষ্টেসন্' স্থাপিত।

সেখানে অবতরণ করিয়া আমার ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি একজন ব্যবহারাজীব সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন—যাহাতে আমাদের শীঘ্র শীঘ্র পরীক্ষা করিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ম্যানেজার ও আইন্‌জীবী সমভিব্যাহারে আমরা দুইজন ত এমিগ্রেসন্ আফিসে গিয়া হাজির হইলাম। আফিসটি অনেকটা আদালতের কায়দায় সজ্জিত। এখানে নানারূপ মজার প্রশ্ন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল; যথা—"হিন্দুধর্ম্ম কাহাকে বলে?" "ভারতবর্ষে কি বহু বিবাহ চলে?" "আপনারা কি বল্‌শেভিক্‌বাদী?" "আপনারা কি অবিবাহিত, আমেরিকায় নামিয়া আপনারা কি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন"—ইত্যাদি। দুই ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ প্রশ্নোত্তরে আমরা বিরক্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম; তার পর কর্ত্তাদের রায় শুনিয়া ত চক্ষুস্থির! আমাকে বলা হইল যে, আমরা দুইজনে এসিয়ার 'নিষিদ্ধ মণ্ডল'

(Barred Zone) হইতে আসিয়াছি বলিয়া আপাতত আমাদিগকে আমেরিকায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না; ঐজন্য ওয়াশিংটনস্থ "লেবার ব্যুরো" হইতে বিশেষ হুকুম্ আনাইতে হইবে।

আমার রাগের পর্দ্দা সপ্তমে চড়িয়া গেল। আমি তাঁহাদের মুখের উপর চোট্‌পাট্ করিয়া বলিলাম, "এত অসঙ্গত কড়াকড়ির সর্ত্তে আপনাদের দেশে নামিতে আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। পরের জাহাজ ধরাইয়া দিয়া যদি আপনারা আমাদের দেশে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা নিজেরাও ধন্য হই, আপনাদিগকেও প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিই।" আমার ম্যানেজার মশাই ত অনেক করিয়া আমাকে শান্ত করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তিনি তখনই তাঁহার সঙ্গীয় উকীলকে অনুমতি-পত্র বাহির করিয়া আনিবার জন্য ওয়াশিংটনে প্রেরণ করিতেছেন— এবং আমরা এলিস দ্বীপে দুই চারিদিন থাকিতে থাকিতেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। কি করি, বাধ্য হইয়া এই প্রস্তাবেই 'এবমস্তু' বলিতে হইল!

তাঁহার এই আশ্বাস সত্ত্বেও এলিস্ দ্বীপে আমাদের আঠারো দিন থাকিতে হইল। ইতোমধ্যে লেবার ব্যুরোর বিশেষ হুকুম পাওয়া গেল। এই হুকুমনামা বাহির করিতে আমার ম্যানেজারকে ৫০০ ডলারের জামীন্ থাকিতে হইল। মাত্র এক বৎসর কাল আমরা আমেরিকায় থাকিবার অধিকার পাইলাম। হফ্‌ম্যান্ দ্বীপে দিনগুলি যেমন কাটিত, এখানেও সেইরূপ কাটিতেছিল; নূতনত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। তবে খাট-বিছানা একটু ভাল রকম পাওয়া গিয়াছিল। একটা জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করিবার ছিল, সেটা— ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড ও থার্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জারদিগের মধ্যে পার্থক্য-বিচার। প্রত্যেক শ্রেণীর মেলামেশার একটা নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র মণ্ডলী ছিল এবং শ্রেণী-নির্ব্বিচারে যাহাতে পরস্পরের মধ্যে অবাধে মেলামেশা না হয়, সেদিকে কোসাফিরখানার কর্ত্তাদের যথেষ্ট নজর ছিল। আমার ম্যানেজারের জোর তদ্বিরের ফলে আমরা দুইজন প্রথম শ্রেণীর বাসস্থান পাইয়াছিলাম বটে; কিন্তু খাদ্য-হফ্‌ম্যানের দ্বীপের মতই 'অদেয়মগ্রাহ্যম' ছিল। আঠারো দিনের দিন এলিস্ দ্বীপ ছাড়িবার অনুমতি পাওয়া গেল এবং আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া একখানি ফেরী নৌকাযোগে আমরা নিউইয়র্ক অভিমুখে পাড়ি দিলাম।

কিছুদিন পূর্ব্বে জেস্ উইলার্ডকে (Jes Willard) পরাজিত করিয়া জ্যাক্ ডেম্প্‌সী (Jack Dempsey) জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুরুভারোত্তোলনকারী ও মুষ্টিযোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। আমরা যেদিন নিউইয়র্ক পঁহুছিলাম, সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমেরিকার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা বিল্ ব্রেনন্ (Bill Brenon— সম্প্রতি মৃত) উইলার্ডের গৌরবময় আসন টলাইতে তাঁহাকে মুষ্টিযুদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া আমি আমার ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার ইঙ্গিতে আমি বেশ মনোহর ছাঁদে মাথায় একটি পাগড়ী বাঁধিলাম; বুঝিলাম—আমাকে সব চেয়ে আকর্ষণযোগ্য করিবার জন্যই ম্যানেজার এই বুদ্ধি বাত্‌লাইলেন।

চারিদিক আঁটা 'ম্যাডিসন্ স্কোয়ার গার্ডেন্' নামক মাঠে এই মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন হইয়াছিল। এখানে প্রায় ষোলো হাজার লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। সেদিন সন্ধ্যায় ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করিয়া ম্যাডিসন্ স্কোয়ারে লোক সমাগম হইয়াছে— একেবারে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ। এই বিরাট জন-সমুদ্রের নিকট আমাকে সর্ব্বপ্রথমে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। সে সন্ধ্যাটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন; কারণ সমাগত দর্শকবৃন্দ আমাকে অপ্রত্যাশিত উল্লাসের সহিত অভ্যর্থনা করিল। কোনো কোনো কুতূহলী ভদ্রলোক আমার মাথায় পাগ্‌ড়ী দেখিয়া একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাধিয়াছেন কেন? চোট লাগিয়াছে কি? কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমেরিকানদের আপনার কেমন লাগে?— ইত্যাদি।

আমার পরিচয় পর্ব্ব শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডেম্পসীর প্রতিদ্বন্দ্বী রণসজ্জায় মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বেশ মনোরমভাবে একটি ছোট বক্তৃতা দিলেন। তার পর দিগ্বিজয়-গর্ব্বোদ্ধত ডেম্প্‌সী দ্রুতগতিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নিবিড় জন-সমুদ্র যেন বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিত হইয়া উঠিল এবং প্রবল উৎসাহে কিছুক্ষণ ধরিয়া এমন চীৎকার ও করতালি সুরু করিয়া দিল যে, আমার মনে হইল, বুঝি ম্যাডিসন বাগানের ছাদ ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে! এমন বিকট গগন-বিদারী সমবেত চীৎকার আমি বোধ হয় জীবনে কখনও শুনি নাই—এমন কি মোহন-বাগান দল প্রতিপক্ষ দলকে গোল দিলেও নয়! ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া প্রেক্ষাস্থলে আসিয়া বসিবার পূর্ব্বে এই দুইজন বিখ্যাত মুষ্টিবীরের সহিত আমার সংক্ষেপে পরিচয় হইয়া গেল!

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর স্ব স্ব ম্যানেজারেরা তাঁর পর অল্পক্ষণের জন্য নিজেদের মধ্যে আসন্ন মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া উদ্যোগ পর্ব্ব শেষ করিলেন। তার পর মল্লভূমির মাথার উপরকার আর্ক্-লাইট প্রদীপ্ত কিরণে জ্বলিয়া উঠিল এবং ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান্ হইলেন। আমার বেশ মনে আছে— কেমন করিয়া ব্যাঘ্রের মত পাশব আক্রোশে যুদ্ধের সূত্রপাতেই ডেম্প্‌সী তাঁহার প্রতিপক্ষের প্রতি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। আমার পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই স্মরণীয় মল্লযুদ্ধের ও কেমন করিয়া আমেরিকায় আমার মল্লজীবনের যবনিকা উত্তোলিত হইল তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ

মন্ত্রীর সদনুষ্ঠান।—

যাঁহারা বর্ত্তমান রিফর্ম্মের একেবারেই বিরোধী— যাঁহারা ইহার মধ্যে ভাল কিছুই দেখিতে পান না,— তাঁহাদের কথা ধরি না; কিন্তু যাঁহারা রিফর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী নহেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, রিফর্ম্ম একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। রিফর্ম্মের প্রধান ফল—দেশের লোকের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ব্বাচিত মন্ত্রীত্রয় (অধুনা: মন্ত্রীদ্বয়)। দেশের লোকের হিতসাধন করিবার জন্য মন্ত্রীদের হাতে কিছু ক্ষমতা যথার্থই দেওয়া হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে, এই ক্ষমতার পরিচালন করিয়া, তাঁহারা দেশের কিছু কিছু মঙ্গল করিতে পারেন। এবং সে ইচ্ছা যে মন্ত্রীদের একেবারেই নাই, তাহাও বলা যায় না। ভূতপূর্ব্ব স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্বর্গীয় সার সুরেন্দ্রনাথ দেশের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে একটা স্কীম খাড়া করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়-বারে তিনি নির্ব্বাচিত হইতে পারিলে সেই স্কীম কতকটা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারিতেন,

এবং তাহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি কতকটা যে হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্ত্রীরা কাজ করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও অর্থ ভাবে বিশেষ কিছু করিতে পারেন না, এইরূপ একটা অভিযোগ যে শুনা যায়, সেটা একেবারে ভিত্তিহীন না হইলেও, এ অভিযোগের প্রতিকারের উপায় ত জনসাধারণের প্রতিনিধি কাউন্সিলের সদস্যদের হাতেই রহিয়াছে। তাঁহারা মোটা টাকা মঞ্জুর করিয়া মন্ত্রীদের সদনুষ্ঠানে কিছু সাহায্য করিতেও ত পারেন। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বাস্থ্য-বিভাগের ভার লইয়া মন্ত্রী হইয়াছেন। তিনিও স্বাস্থ্যোন্নতি-মূলক একটা স্কীম লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই স্কীম কার্য্যে পরিণত করিতে বারো লক্ষ টাকা খরচ বইবে। তিনি আগামী বৎসরের স্বাস্থ্য বিভাগীর কার্য্যের জন্য কাউন্সিলের কাছে ৩২৬৭০০০ টাকা ব্যয়ের মঞ্জুরী প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনার সময় তিনি বলেন, তিন বৎসর পূর্ব্বে ব্যবস্থাপক সভা ছয় বৎসরের জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ টাকা খরচ হয় নাই। খরচ না করার দরুণ মঞ্জুর করা টাকাটা বাজেয়াপ্ত হয় দেখিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টার ও অর্থ-বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্কীমটি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই স্কীম কার্য্যে পরিণত করিতে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে সরকার দিবেন ১২ লক্ষ, আর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডসমূহ দিবেন ছয় লাখ। টাকাটা ম্যালেরিয়া কালাজ্বর প্রভৃতি নিবারণ কল্পে ব্যয় করা হইবে। বাঙ্গালা দেশে যে ৬৭ শত থানা আছে, প্রত্যেক থানাকে ম্যালেরিয়া নিবারণ কেন্দ্রে পরিণত করা হইবে, প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া অভিজ্ঞ ডাক্তার নিযুক্ত করা হইবে, প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র, অস্ত্র-চিকিৎসার সরঞ্জাম প্রভৃতি সরবরাহ করা হইবে। মন্ত্রীরা যদি এরূপ ভাবে কাজ করেন, তাহা হইলে বিশ্বনিন্দক ভিন্ন তাঁহাদের কাজের নিন্দা অপর কেহ করিতে পারে না। স্বরাজ পাওয়া যায় ভালই। তাহা যত দিন না পাওয়া যায়, ততদিন নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল হিসাবে, এইরূপ কিছু কিছু কাজ হইলেও যে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। তাহাতে বাধা দেওয়া অর্ব্বাচিনতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তরুণের স্বাস্থ্যচর্য্যা।—

মন্ত্রী মহাশয় সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা ছাড়া সরকার স্কুল-কলেজের ছাত্র সমাজের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আর একটা স্কীম তৈয়ার করিয়াছেন। ব্যায়াম সম্পর্কীয় পরামর্শদাতার পরামর্শ অনুসারে স্কুল কলেজে ব্যায়াম ও ডাক্তারী পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে স্কুল কলেজের প্রত্যেক ছাত্রকে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং ব্যায়াম-চর্চ্চা করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হইবে। ছেলেদের স্বাস্থ্য, বয়স প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তাহাদের উপযোগী জিম্‌নাষ্টিক্ সন্তরণ, বল-ব্যঞ্জক খেল-ধুলার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেক বালকের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনার ও পুষ্টির উপযোগী ব্যায়াম পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রদের ব্যায়াম-চর্চ্চা ইতোমধ্যেই বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এজন্য যথেষ্ট সংখ্যক ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে, এবং আরও শিক্ষক তৈয়ার করা হইতেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কিন্তু আমাদের একটী কথা বলিবার আছে। এ দেশের ছাত্র সম্প্রদায় অত্যন্ত গরীব। তাহারা পেট ভরিয়া, পুষ্টিকর খাদ্য দূরের কথা,—সাধারণ খাদ্যই খাইতে পায় না। তাহার উপর তাহাদিগকে ব্যায়াম করিতে বাধ্য করা হইলে, তদুপযোগী পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে করা আবশ্যক। সেটা করা হইয়াছে কি? স্কীমের বিবরণীতে পুষ্টিকর খাদ্যের কোন ব্যবস্থার কথা দেখিলাম না। সেটা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ সকল বালককে ব্যায়াম করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে না। তবে যাহারা কিছু অবস্থাপন্ন,—নিজ ব্যয়ে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ, কেবল তাহাদিগকেই আপাততঃ ব্যায়াম করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। আর একটা কথা—ভেজাল। ব্যায়াম করিতে হইলে পুষ্টিকর খাদ্য যেমন চাই, বিশুদ্ধ খাদ্যও তেমনি দরকার। তাহার সরবরাহের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে না হইলে স্কীম কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইবে না। ব্যায়াম, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ খাদ্য—এই তিনটি বিষয় পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রথমটি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে অপর দুইটীর ব্যবস্থাও করিতেই হইবে। শেষোক্ত দুইটীকে বাদ দিয়া প্রথমটি কোন মতেই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য যে খারাপ হইয়া যাইতেছে, দেশবাসীর রোগ প্রতিষেধের শক্তি যে দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, তাহা এই ভেজাল খাদ্যের কল্যানেই। সুতরাং ছাত্র সমাজে ব্যায়াম শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে যে, খাদ্যে ভেজাল আগে বন্ধ করিতেই হইবে, তাহা বলা বাহুল্য

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্"

১৬শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩৪ সাল { ৩য় সংখ্যা

জ্বরের সময় গৃহস্থের জ্ঞাতব্য বিষয়

[ডাঃ শ্রীসরোজনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-বি।]

আজকাল ঘরে ঘরে রোগ। জ্বর জাড়ি নেই—এমন সংসার খুব কম। এ অবস্থায় গৃহস্থের কি করা উচিৎ, কখন চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে হইবে, চিকিৎসকের উপদেশ ঠিক কার্য্যে পরিণত হইতেছে কি না—এই সকল বিষয় একটু জ্ঞান থাকিলে অনেক সময় অনেক উপকার হয়। অনেক স্থলে দেখা যায়, লোকে ডাক্তার ডাকে, চিকিৎসাদি হয়, কিন্তু যদি ফল খারাপ হয়, তাহা হইলে দোষটা গিয়া পড়ে পুরাপুরি চিকিৎসকের উপর! বাড়ীর লোকেদের যেন কোন দায়িত্ব নাই। কিন্তু রোগের সুচিকিৎসার জন্য ডাক্তার যেমন দায়ী, গৃহস্থের দায়িত্ব তদপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। তাঁহাদের উপরই রোগীর সমস্ত শুশ্রূষার ভার থাকে (সকলের পক্ষে নার্স রাখা সম্ভব নহে); তাঁহারাই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবেন, তাঁহাদেরই রোগীর সমস্ত লক্ষণ, উপকারাদি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসকের গোচরে আনিতে হইবে এবং তাঁহাদেরই চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে।

অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়—"রোগ হ'লেই কি ডাক্তার ডাকে? ২।৩ দিন দেখ, তবে ত ডাক্তার ডাকিবে," কথাটা সকল সময় খাটে না। আজকাল এমন জ্বরও হয় যে, রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়—এ রকমের জ্বর খুব বিরল নহে; কিন্তু প্রথম হইতেই চিকিৎসা করাইতে পারিলে সুফল আশা করা যায়। সাধারণ জ্বরে সেকালের গিন্নীরা জ্বরের প্রথম অবস্থায় ডাক্তার ডাকিতে চাহিতেন না, কারণ বোধ হয় তাঁহাদের প্রবীণতার দরুণ একটা অভিজ্ঞতা জন্মিত, টোটকা ঔষধাদি সংগ্রহ থাকিত, সাধারণ রোগের

লক্ষণাদি ও মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু আজকাল সেইরূপ গিন্নীদের একেবারেই অভাব। টোটকা দ্রব্যাদি সংগ্রহের কথা ছাড়িয়া দিন, রোগের বিষয়েও অনেক বাড়ীর লোকেরা একেবারে অনভিজ্ঞ—ইহারা ডাক্তারের উপর সমস্ত ভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ডাক্তার বড় জোর দিনান্তে একবার রোগী দেখিতে আসিবেন; রোগীর সমস্ত ভার প্রকৃতপক্ষে থাকে বাড়ীর লোকেদের উপর। তজ্জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সাধারণ রোগের বিষয় একটা মোটামুটি ধারণা থাকিলে তাঁহারা সময় মত চিকিৎসার একটা সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন, নিজেদের বিব্রত হইতে হয় না, রোগীর সেবা প্রভৃতি চিকিৎসকের উপদেশানুযায়ী ঠিকমত সুন্দরভাবে হইতে পারে।

সাধারণ রোগ হিসাবে জ্বরের কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহাতে গৃহস্থের কত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

চলিত কথায় লোকে জ্বরকেই একটা আলাদা রোগ হিসাবে ধরিয়া লয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অন্য কোনো প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশমান্ রোগের লক্ষণ মাত্র। শরীরের কোন স্থানে প্রদাহ (inflammation) হইলে বা অন্য কোন অংশ বিষাক্ত বীজাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে শরীর স্বগত শক্তি দ্বারা সেই আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে এবং এই সংঘর্ষের ফলে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়—এই শারীরিক উত্তাপের বৃদ্ধিই জ্বর।

সুস্থ শরীরের নিজের একটা উত্তাপ আছে - গায়ে হাত দিয়া দেখিলে বুঝা যায় (অনেক প্রাণীর শরীরের উত্তাপ অন্য পক্ষে শীতল—যেমন জলজ প্রাণী, মৎস্য, ভেক প্রভৃতি); কিন্তু উত্তাপের মাত্রা ঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত করিবার জন্য এক প্রকার তাপমান যন্ত্র বিশেষ ব্যবহার হয়, ইহাকে থার্ম্মোমিটার (Thermometer) কহে।

থার্ম্মোমিটার আর কিছুই নয়, শুধু একটি কাঁচের সরু নল বিশেষ, ইহার একটা দিক পারদ দ্বারা পূর্ণ—ইহাকে bulb বলে, অন্যদিকটি bulb অপেক্ষা লম্বা, ইহার মধ্যদেশে খুব সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় সরু খালি স্থান আছে; এবং কাঁচের উপরে সমভাবে ভাগ করিয়া রেখা টানা আছে; একটি একটি অপেক্ষাকৃত বড় রেখাকে ডিগ্রি কহে। bulbএর পারদ উত্তাপিত হইলে ঐ সূক্ষ্ম স্থানের ভিতর বৃদ্ধি পাইয়া উর্দ্ধে গমন করে এবং নির্দ্দিষ্ট উত্তাপ ডিগ্রি ও পয়েন্টে জ্ঞাত হয়। ইহাতে এমন বন্দোবস্ত আছে যে, পারদ একবার উর্দ্ধ দিকে উঠিলে আবার তৎক্ষণাৎ bulbএ ফিরিয়া আসিতে পারে না। ইহা অনায়াস-লব্ধ, বাজারে অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটী একটি ভাল 'তাপমান নল' রাখা বিশেষ অবশ্যকীয়। ইহার সাহায্যে অনেক বিষয় জানা যায়, এবং ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকেরই ইহার ব্যবহার শিক্ষা করা দরকার।

ঐ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে দেখা যায়, স্থান-কাল পাত্র বিশেষে সুস্থ শরীরের উত্তাপ ৯৬°৪ হইতে ৯৮ ৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত অবস্থান্তর গ্রহণ করে। গড় ধরিয়া ঠিক করা হয় ৯৮°৪ normal; ইহারও তারতম্য সময় বিশেষে লক্ষিত হয়। প্রাতঃকালে সাধারণতঃ কম হয়; পূর্ব্বাহ্ণে কিছু বেশী। শিশুদের উত্তাপ বৃদ্ধ অপেক্ষা বেশী।

বাজারে সাধারণতঃ ১ মিনিট, অর্দ্ধমিনিট ও পাঁচ-মিনিটের Theromometer পাওয়া যায়। ইহার অর্থ যে, ১ মিনিটের Thermometer বগলে ১ মিনিট রাখিলে ঠিক উত্তাপ নির্দ্ধারিত করিবে বা অর্দ্ধ মিনিটের Thermometer অর্দ্ধমিনিট এবং ৫ মিনিটেরটি ৫ মিনিট বগলে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে ঠিক উত্তাপ উঠিবে। কার্য্যতঃ কিন্তু আমরা ১ মিনিটের গুলি ২ মিনিট, অর্দ্ধ মিনিটের গুলি ১॥০ মিনিট রাখিয়া দিয়া উত্তাপ নির্দ্ধারণ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হই। বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সব থার্ম্মোমিটার সমান হয় না, প্রায় ২।৪ পয়েন্টের বিভিন্নতা দেখা যায়। Thermometer ঠিক ভাবে ব্যবহার না করিলে শরীরের উত্তাপ ঠিক নির্ণয় হয় না।

ঠিক ভাবে জ্বর দেখিবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।

১। Thermometer ভাল হওয়া উচিৎ।

২। বগল ও মুখ-গহ্বর জ্বর দেখিবার প্রশস্ত স্থান। বগলে অনেকেই দেখিয়া থাকেন; তজ্জন্য তাপমান নল দিবার পূর্ব্বে বগল ঘামশূন্য করিতে হইবে। দেহকাণ্ডের সহিত বগলের চাপ মৃদু অথচ সমান ভাবে রাখিতে হইবে এবং পারদের দিকটা (bulb) ঠিক যেন বগলের মধ্যস্থলে থাকে (কখনো কখনো সুচতুর রোগী চিকিৎসকের কড়া হুকুমে উত্যক্ত হইয়া নিজেকে জ্বরশূন্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য bulটি ঠিক বগলের বাহিরে রাখিয়া Thermometerএর উর্দ্ধ অংশটি বগলে চাপিয়া রাখিয়া দেন, ইহাতে জ্বর উঠে না)। আরও দেখিতে হইবে—থার্ম্মোমিটার যেন কোনরূপ গাত্রাচ্ছদনের স্পর্শে না আসে।

৩। বগলে দেওয়া হইতে নিয়মিত সময় পর্য্যন্ত ঘড়ি ধরিয়া রাখিতে হইবে; আন্দাজে ঠিক সময় নির্দ্ধারণ করা যায় না।

৪। যতদূর সম্ভব একই Thermometer ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

উত্তাপ বিশেষে জ্বর কম কি বেশী বলা হয়। যথা—

৯৯° হইতে ১০০° পর্য্যন্ত কম জ্বর (Slight fever)

১০০° হইতে ১০১° বা ১০২° পর্য্যন্ত মাঝারী জ্বর (Moderate fever)

১০২° হইতে ১০৪° বা ১০৫ পর্য্যন্ত বেশী জ্বর (High fever)

তদূর্দ্ধেও জ্বর সময় সময় হয়; সাধারণতঃ মারাত্মক ম্যালেরিয়ার এই রকম দেখা যায়। ইহাতে ভয়ের কারণ বর্ত্তমান।

অল্প জ্বরে অধিক দিন ভুগিলে যত ক্ষতি না হউক, বেশী জ্বরে (১০৫° বা ১০৬°) অল্পকাল ভুগিলে বিশেষ আশঙ্কার কারণ।

জ্বর দেখিয়া, সময় ও জ্বরের পরিমাণ লিখিয়া রাখা আবশ্যক। ইহা চিকিৎসকের অনেক সাহায্য করে। তিনি সর্ব্বদা রোগীপার্শ্বে থাকিতে পারেন না; কিন্তু ঐ রকম অনুলিপি দেখিলে সমস্তদিনের জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব পাইতে পারেন এবং রোগ নির্ণয়ে ও ব্যবস্থা-প্রদানে সুবিধা হয়। এই record দেখিলে বাড়ীর লোকেরাও বুঝিতে পারিবেন—কি রকমের জ্বর। জ্বরকে সাধারণতঃ স্থিতি ও গতি হিসাবে ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা:-

(১) Intermittent (সবিরাম জ্বর)—যাহাতে জ্বর প্রায় প্রতিদিন একবার আসিয়া পরে ছাড়িয়া যায়। যথা—malaria রোগে, ইহাতে শীত করিয়া জ্বর আসে ১০৪° বা ১০৫° উঠিয়া ক্রমে জ্বর কমিয়া গিয়া ৯৭-৯৮° হইয়া যায়। পরে আবার জ্বর উঠে এবং কমিয়া যায়।

(২) Remittent (সন্তত বা স্বল্পবিরাম জ্বর)—যাহাতে জ্বর বাড়ে কিন্তু একেবারে ছাড়ে না; ১০৩° বা ১০৪° ডিগ্রি পর্য্যন্ত দিনে উঠিয়া ১০০° বা ১০১ পর্য্যন্ত নামে; আবার পরদিন উঠিতে থাকে।

(৩) Continuous (অবিরাম জ্বর বা একজরী)—এই রকম জ্বরে বৃদ্ধি ও হ্রাসের পার্থক্য দুই-এক ডিগ্রি মাত্র; যেমন ১০৩° বা ১০৪° উঠিয়া ১০২° বা ১০২॥০ পর্য্যন্ত কমিল। Typhoid জ্বরে এইরূপ দেখা যায়।

এই তিন রকম জ্বর দিনে একবার বৃদ্ধি পায় ও একবার কমে। যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২ বার উঠে বা কমে, তাহা হইলে তাহাকে সাধারণতঃ দ্বৈকালীন জ্বর বলা হয়। Typhoid fever এবং কালাজ্বর এই রকম প্রায়ই দেখা যায়।

কোন কোন জ্বরে বিভিন্ন জাতীয় বড় বা ছোট গুটিকা নির্গত হয় (Rash); যেমন ডেঙ্গু রোগে জ্বরের সহিত প্রথম দিনে, বসন্তরোগে জ্বর আরম্ভের পর তিনদিনে, হাম রোগে চতুর্থ দিবসে এবং টাইফয়েড রোগে প্রায়ই ৮ দিন ১০ দিন পরে গাত্রে লালবর্ণ গুটিকা দেখা যায়। ইহাও গৃহস্থের লক্ষ্যের বিষয়।

কোন কোন জ্বর ছোঁয়াচে বা সংক্রামক। একজনের হইলে বাড়ীর অন্য লোকের হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য এই সব রোগে গৃহস্থের খুব সাবধানে থাকা দরকার। ছোঁয়াচে জ্বরের মধ্যে প্রধান:—Typhoid fever (সান্নিপাতিক জ্বর) Typhus (এ দেশে প্রায় হয় না), হাম, বসন্ত, Diphtheria, Influenza, Dengue, প্রভৃতি।

যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহারা ছাড়া এসব রোগে অন্য লোক বা বিশেষভাবে ছেলেপুলেদের রোগীর সংস্পর্শে আসিতে দিতে নাই। রোগীর মল, মূত্র, থুথু প্রভৃতি খুব সাবধানে পরিষ্কার করিতে হয় এবং এমন স্থানে ফেলিতে হয় বা নষ্ট করিতে হয়, যাহাতে অন্যের কোন ক্ষতি করিতে না পারে। এই সব শ্রেণীর রোগীর আলাদা গামছা, বা তোয়ালে রাখিতে হয়। আলাদা ঘরে পৃথকভাবে রাখিতে হয়। রোগীর ব্যবহারের জন্য যে সব গেলাস, বাটী বা চামচে ব্যবহার হয়; তাহা অন্য কাহারও ব্যবহার করা উচিৎ নহে।

অনেক স্থলে যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদের গৃহস্থালী অন্যান্য কর্ম্মাদিও করিতে হয়। এই জন্য তাঁহাদের নিয়মিত Lynol কিংবা Carbolic সাবানে হাত-পা ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া অন্য কাজ করা উচিত; নচেৎ তাঁহারা রোগের বীজাণু চারিদিকে ছড়াইতে থাকিবেন, এবং ইহার ফলে বাড়ীর অন্যান্য লোকের ঐ রোগ হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

জ্বর হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুইচারিটি এমন লক্ষণ আসিয়া জোটে—যেগুলি জ্বরের সুবোধ্য সাধারণ লক্ষণ। যেমন:—হাত-পা কামড়ানি, কোমর ও মাথার যন্ত্রণা, মুখ থমথমে হওয়া, পিপাসা ইত্যাদি এবং একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায়—জিহ্বা শুষ্ক ময়লাযুক্ত হইয়াছে, ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে না, কোষ্ঠকাঠিন্য (কোন কোন জ্বরে পাতলা দাস্ত হয়), প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও রক্তবর্ণ। এগুলি জ্বর কমিয়া গেলে কমিয়া যায়।

ইহা ছাড়া অন্যান্য অশুভ উপসর্গ প্রায়ই হয়; তাহার যদি ঠিক সময়ে বা উপযুক্তরূপে ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইতে দেরী হয় না। যেমন বেশী জ্বর বাড়িলে (১০৪° বা তদূর্দ্ধে) মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, ছোট ছোট বালকদের তড়কা (convulsion) হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের (Heart) গতি খারাপ হইয়া ক্রিয়া বন্ধ (Heart fail) হইতে পারে। ইহার আশু প্রতীকার আবশ্যক।

এইরূপ ক্ষেত্রে ডাক্তার ডাকা হউক বা না হউক, তৎক্ষণাৎ মাথায় জলপটি, অডিকেলোনের পটি, মাথার ভিজা গামছা চাপা দেওয়া বা বরফ প্রয়োগ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। জ্বর বেশীক্ষণ ঐ ভাবে স্থায়ী হইলে জানালা দরজা বন্ধ করিয়া গা মুছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে এবং চিকিৎসকের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে। এই সব স্থানে "জ্বর সবে হয়েচে, ২।৪ দিন দেখা যাউক" বলিলে বিপদকে বরণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এই রকম জ্বর বেশীক্ষণ ভোগ করিলে; শরীরের প্রত্যেক কোমল যন্ত্র এমন জখম হইয়া যায় যে পরে চিকিৎসার বাহিরে গিয়া পড়ে।

সাধারণতঃ একরকম উৎকট ম্যালেরিয়া জ্বর আছে যাহাতে ঠিক ঐ ভাবের লক্ষণ হয়। শীত করিয়া জ্বর হইল, হু-হু করিয়া জ্বর ১০৫।১ ৬° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিল। বাড়ীর লোকেরা মনে করিলেন—নবজ্বর, তায় malaria—জ্বর এমনিই কমিয়া যাইবে।.. কোন বন্দোবস্ত হইল না। ফলে জ্বর কমিল না। ঐ জ্বর ভোগ করিতে করিতে রোগী প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে, ছটফট করে, তারপর বিঘোর অবস্থা; নাড়ী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে এবং হঠাৎ একদিনের জ্বরেই রোগী মারা যায়।

জ্বরের সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে তাহাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। যেমন, নিউমোনিয়া হইলে শ্বাস-কষ্ট হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস সাধারণ জ্বরের সময় মিনিটে ২০।২২ হয়। কিন্তু ফুসফুসের কোন পীড়া হইলে ঐ গতি ৪০।৫০ পর্য্যন্ত হয়; এই সঙ্গে বুকে বা পিঠে ব্যথা থাকে। জ্বরের ভোগ চলিতেছে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি সাধারণ থাকিতে থাকিতে হঠাৎ যদি ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় বা গতি খুব বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে ভয়ের কথা।

এই রকম অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে অত্যধিক পেটের ফাঁপ, তজ্জন্য রোগীর অস্বচ্ছন্দতা, অধিক দিন ধরিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিরিক্ত ভেদ বা বমন, হিক্কা প্রভৃতি লক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র চিকিৎসককে জানাইয়া তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

রোগের সময় রোগী যে কারণে হউক অত্যধিক যন্ত্রণা পাইলে বা অস্থিরতা প্রকাশ করিলে বা নিথর হইয়া কথা বন্ধ করিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের নিকট সংবাদ প্রেরণ আবশ্যক।

ঘাম হইয়া প্রায়ই অনেক জ্বর কমিয়া যায় এবং অনেক জ্বরে জ্বরের বৃদ্ধির সহিত ঘাম দেখা যায়। অতিরিক্ত ঘাম যে কোন সময়ই হউক না, কেন লক্ষ্য করিবার কথা।

জ্বর ঘাম দিয়া ছাড়িয়া গেলে, রোগী যদি নিজেকে সুস্থ মনে করে, তবে সে ঘামে ভাবিবার বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু যদি অস্থিরতা বাড়ে বা রোগীর কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, সে ঘামে ভয় হইবার কথা। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের প্রয়োজন। Malaria জ্বরে ও pneumoniaয় জ্বর ছাড়িবার সময় খুব ঘাম হয়। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী অবিচ্ছিন্ন জ্বরে (typhoid প্রভৃতি) যাহার সাধারণ ভোগ-কাল ২১ দিন বা ২৮ দিন, যদি মধ্যবর্ত্তী সময়ে হঠাৎ জ্বর কমিয়া যায় ও তৎসঙ্গে খুব ঘাম হয়, বুঝিতে হইবে কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত; তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে সংবাদ দিতে হইবে।

মাথায় বরফ প্রয়োগ গৃহস্থের একটি জ্ঞাতব্য বিষয়; অনেকে ঠিক সুচারুরূপে দিতে জানেন না। Ice-bag একটি রবারের থলি, মুখটি একটি ঢাক্‌নী দ্বারা আঁটা যায়—screwএর মত ঘুরাইবার ব্যবস্থা আছে; ঢাক্‌নীর সহিত একটি রবারের চাক্‌তি (washer) আছে, ইহা আবশ্যকীয়; ইহারই জন্য ঢাক্‌নীটি এমনভাবে আঁটা যায় যে, বরফ শীঘ্র গলে না কিংবা গলিত জল বাহির হইতে পারে না। অনেকে ঐ চাক্‌তীটি হারাইয়া ফেলেন ও ব্যাগটি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

বরফ মাঝারী রকমের টুকরা করিয়া, জলে ধুইয়া ঐ থলিটিতে ভরিতে হইবে। অনেক স্থলে দেখিয়াছি ২।৩টি টুকরা দিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন, বরফ ব্যাগের এককোণে গিয়া পড়িয়া থাকে—তাহাতে কোন ফল হয় না, শুধু মন ভুলানো হয়। ব্যাগটি পূর্ণ করিয়া উপরিভাগটি ভাল করিয়া মুছিয়া রোগীর মাথায় দিতে হয়। Ice-bag দিতে হইলে মাথার চুল ছোট করিয়া কাটিয়া দিলে ভাল হয় বা মাথা কামাইতে পারিলে আরও ভাল হয়। বরফের সঙ্গে একটু লবণ মিশাইয়া দিলে বরফ শীঘ্র গলে না। মাথার একস্থানে অধিকক্ষণ ব্যাগ ধরিয়া রাখিতে নাই। আস্তে আস্তে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া মাথার সব জায়গায় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বরফ দিতে হয়। ঘাড়, রগ প্রভৃতি স্থানে দেওয়া অপেক্ষাকৃত প্রীতিকর। স্ত্রীলোকদের মাথার চুল আলগা ও ফাঁক করিয়া বরফ দিতে হয়।

ব্যাগটি মাঝে মাঝে শুষ্ক নেক্‌ড়া দ্বারা মুছাইয়া লইতে হয়; কারণ ব্যাগের উপরটি ঠাণ্ডার সংস্পর্শে ঘামিয়া প্রায়ই রোগীর বালিস, মাথা, মুখ, কাঁধ ইত্যাদি ভিজিয়া যায়।

ছোট ছোট ছেলেরা অনেক স্থলে ঐরূপ ঠাণ্ডা মাথায় লাগাইতে চাহে না, অস্থিরতা প্রকাশ করে। সে সব স্থানে ব্যাগটি শুক্‌না নেকড়ায় মুড়িয়া মাথায় অল্প অল্প দিলে অত ঠাণ্ডা অনুভব করে না। নেক্‌ড়া ভিজিয়া গেলে অন্য শুষ্ক বস্ত্রাদি দ্বারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। অনেকক্ষণ Ice-bag ব্যবহারে ঢাক্‌নীটি খুব ঠাণ্ডা হইয়া গেলে যে ব্যক্তি ব্যাগ প্রয়োগ করিতেছেন তাঁহার হাত জ্বালা করে; ঐ স্থানটি কাপড় দিয়া মুড়িয়া দিলে শৈত্যের প্রাখর্য্য ততটা টের পাওয়া যায় না।

জ্বরের তারতম্য অনুসারে Ice-bagএর ব্যবহার:—অনেকে জিজ্ঞাসা করেন কতক্ষণ বরফ দিতে হইবে? ইহার উদ্দেশ্য জ্বর-বৃদ্ধি রোধ করা। যতক্ষণ জ্বর বেশী থাকিবে (১০৩° ডিগ্রির বেশী) ততক্ষণ ব্যাগ ব্যবহার করিতে হইবে এবং যতক্ষণ না জ্বর কমিয়া ১০২°এ নামে। অনেকে এক আধ ঘণ্টা বরফ দিয়া নিশ্চিন্ত হন জ্বরের হ্রাসের দিকে লক্ষ্য রাখেন না; ফলে অনেকস্থলে জ্বর যখন বেশী (১০৪ বা ১০৫°), তখন মাথার বরফ নাই; ইহাতে ক্ষতি হয়। অনেকে মাঝে মাঝে বরফ দেন, ইহাও ঠিক নয় বরফ দিতে হইলে জ্বরের তীব্রতা অনুযায়ী একাদিক্রমে প্রয়োগ হওয়া আবশ্যক—যতক্ষণ জ্বর না কমে।

অনেকের আবার ধারণা আছে বেশী বরফ ব্যবহারে বা অধিকক্ষণ Ice bag দিলে শ্লেষ্মার আধিক্য হয় বা অন্য কোন রকম উপসর্গ আনে ; ইহা ভুল বিশ্বাস। রোগের স্বধর্ম্মানুযায়ী এইরূপ জটিলতা (complications) হইতে পারে, বরফের দোষে কুত্রাপি নহে।

কম জ্বরেও অত্যধিক মাথার যন্ত্রণার দরুণ বা মস্তিষ্কের কোন উপসর্গের দরুণ কিছুক্ষণ বরফ প্রয়োগ আবশ্যকীয়।

সুস্থ শরীরে যেমন গাত্র মার্জ্জনার আবশ্যক, রুগ্নদেহেও সেইরূপ। বহুদিন জ্বরভোগে শরীরের লোমকূপগুলি ময়লা দ্বারা বন্ধ হইয়া থাকে। ঐ লোমকূপগুলি আমাদের শরীরের অনাবশ্যক (কখন কখন বিষাক্ত) আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দিবার অন্যতম উপকরণ ; রোগীর গা মুছাইয়া দিলে ঐ গুলি পরিষ্কার থাকে এবং দূষিত পদার্থ শরীরের মধ্য হইতে সহজে বাহির হইতে পারে। অধিকন্তু জ্বরের উত্তাপ কমাইতে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সবল রাখিতে, এবং নাড়ী-(nerves) মণ্ডলীকে কর্ম্মক্ষম সতেজ রাখিতে অমন আর (ঔষধের সাহায্য বিনা) কিছু নাই।

জ্বর হিসাবে জলের উষ্ণতা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। সাধারণতঃ ঈষদুষ্ণ, স্বাভাবিক ও ঠাণ্ডাজল এই তিন রকম জলে গা মুছান হয়। মোটামুটি হিসাবে যে ক্ষেত্রে অত্যধিক জ্বরের উত্তাপ কমাইতে হইবে, সে স্থলে জলের উষ্ণতা অন্ততঃ জ্বরের উত্তাপ হইতে ৫।৭ ডিগ্রি কম হওয়া আবশ্যক। এমন জল ব্যবহার যেন হয় যাহাতে রোগীর গাত্রে শীত বোধ না হয়, বা গায়ে জল দিবা মাত্র রোগী চমকাইয়া না উঠে।

আবশ্যক হইলে অনেক স্থলে, গরম জল সহ্যমত ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয় (ক্রমশ ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া দিতে হয়)। বেশী গরম জলে গামছা খুব নিংড়াইয়া অনেকে গা মুছান, তাহাতে শরীরের উত্তাপ কমে না। ঘাম হওয়া বা গাত্রের ময়লা পরিষ্কার করা আবশ্যক হইলে ঐ রকম চলিতে পারে।

বৃদ্ধ, অতিশিশু, বা দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে ঠাণ্ডা জল ব্যবহার নিষিদ্ধ। শুধু অল্প জলে শুক্‌না শুক্‌না গা মুছাইলে কাজ হয় না। গা মুছানর জন্য বড় Sponge, বা অভাবে ভাল Turkish Towl বা পরিষ্কার নরম কাপড়ের (নূতন নহে) টুকরা ২খানি আবশ্যক। ব্যবহার করা, তেল-লাগা ময়লা গামছা অথবা কর্‌করে নূতন গামছা হইলে চলিবে না। কারণ, প্রথমটিতে রোগীর লোমকূপগুলি আরও বন্ধ ও তৈলক্ত হইয়া যাইবে ; দ্বিতীয়টিতে রোগীর গায়ের ছাল কতকটা উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

২ প্রস্থ তোয়ালে বা নরম কাপড়, একটি বড় অয়েল ক্লথ বা রবার ক্লথ ও গরম বা ঠাণ্ডা জল—এই গুলি জোগাড় করিয়া গাত্র মুছাইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

ঘরের দরজা জানালা প্রভৃতি বন্ধ করিতে হয় ; কারণ ঐ অবস্থায় হঠাৎ দম্‌কা বা জলীয় হাওয়া লাগিয়া ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। রোগী সমস্ত গাত্রাচ্ছাদন যথা জামা, চাদর ইত্যাদি খুলিয়া প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি একটি একটি করিয়া জলে বেশ সপ্‌সপে করিয়া ধুইয়া দিতে হইবে। সময় প্রতি অঙ্গ ২।৩ মিনিট করিয়া লাগিবে (রোগী হাঁচিলে তৎক্ষণাৎ ধোয়ানো সংক্ষিপ্ত করিয়া ও দ্রুততর সারিয়া লইবেন)। পরে শুকনা তোয়ালে বা কাপড় দিয়া দ্রুত মুছিয়া সারা গাত্রে একটি চাদর ঢাকা দিতে হয়।

বেশী জ্বর থাকিলে গা মুছানর সময় মাথার বরফ প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক। পরে গা মুছান হইলে গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া, দোর জানালা সব খুলিয়া দিতে হইবে।

ফলে রোগী বেশ সুস্থ মনে করে, জ্বরের তাপ অন্ততঃ ২।৩ ডিগ্রি সাময়িকভাবে কমিয়া যায়।

কেহ কেহ জলের সহিত Toilet vinegar ইত্যাদি ব্যবহার করেন। ইহা সুগন্ধযুক্ত ; রোগীর অনেক সময় মনোরম মনে হয়।

আবশ্যক হইলে দিনে ২।৩ বার বা তাহারও বেশী গা মুছান যায় ; তবে সে সব চিকিৎসকের অনুমতি ক্রমে করিলে ভাল হয়। তিনি যদি আজ্ঞা দেন, তা

হইলে বরফ মিশ্রিত ঠাণ্ডা জলেও গা মুছাইতে পারা যায়।

পরিশেষে পথ্য-খাদ্যাদির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারও প্রতি বাড়ীর লোকের বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার।

জ্বর প্রভৃতি রোগে লঘুপাচ্য জলীয় অথচ পুষ্টিকর খাদ্য প্রশস্ত। খাদ্যাদি দ্রব্যের বাঁধাধরা নিয়ম Typhoid বা জটিল অবস্থাপ্রাপ্ত রোগেই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। Malaria প্রভৃতি রোগে একটু শক্ত জিনিষ দিলে ক্ষতি হয় না ; কিন্তু Typhoid রোগে উহা একেবারে নিষিদ্ধ।

দুগ্ধ।—পেট যদি ফাঁপা থাকে বা যে রোগেই হউক না কেন যদি বাহ্যে পাতলা হয় বা অজীর্ণতার লক্ষণ টের পাওয়া যায়, তাহা হইলে দুগ্ধাদি না দেওয়া ভাল। অনেক স্থলে দেখা যায় বাহ্যের সহিত সাদা সাদা অভুক্ত ছানা বাহির হইতেছে, এ ক্ষেত্রে দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিৎ। দুগ্ধকে বিশিষ্ট গুঁড়া দ্বারা Peptonise (কৃত্রিম উপায়ে পরিপাক করিয়া দেওয়া যায় বটে, তবে তাহা পল্লীর সাধারণ গৃহস্থের বাটীতে হইয়া উঠে না। Benger's food ঐ জাতীয় বটে ; কিন্তু ইহা তৈয়ারী অনেকে করিতে পারেন না এবং কেহ কেহ দুগ্ধের স্বাদ অন্য রকম হইয়া যায় বলিয়া খাইতে চাহেন না। Horlick's malted milk অনেক স্থলে সহ্য হয়, এবং পাতলা বাহ্যে থাকিলে খুব পাতলা করিয়া তৈয়ারী করিয়া নিরাপদে দেওয়া যাইতে পারে।

Condensed milk রোগীর পক্ষে ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত।

বার্লি, সাগু প্রভৃতি সুসিদ্ধ করিয়া রোগীকে পথ্য দেওয়া যায়। বেশী পেটের ফাঁপ থাকিলে বা Typhoid রোগের ন্যায় ক্রমাগত পাতলা বাহ্যে হইলে ছানার জল দেওয়া হয়। ইহা ঠিক ভাবে তৈয়ারী হওয়া দরকার। অনেক স্থলে ঘোলা দুধই থাকিয়া যায়। Citric acid বা সামান্য ফটকিরিতে দুধ বেশ ছানা কাটিয়া যায়, তবে টাট্‌কা লেবুর রসেই কাটান উত্তম।

আঙ্গুর, মিষ্ট কমলালেবু, বেদানা, আনারস প্রভৃতি ফলের রস রোগী পরিমিতভাবে খাইতে পারেন। অনেক স্থলে শুনিয়াছি, ডাক্তারেরা বলিয়াছেন—"ফলের রস খুব খেতে পারেন", তাই শুনিয়া অনেকে রোগীর জন্য নিত্য এক টাকা করিয়া ফল কিনিয়া খাওয়াইতে সুরু করেন। অধিক পরিমাণে খাইলে কাহারও কাহারও পেটের অসুখ, অম্ল বা অন্য কোন অজীর্ণতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছি। ডাক্তারের নিকট পরিমাণ জানিয়া লওয়া দরকার।

তালের মিশ্রি, Glucose বা আকের চিনি ইত্যাদি মাত্রা হিসাবে দেওয়া যায়।

বেশী দিনের জ্বর হইলে রোগীর ক্ষমতা রাখিবার জন্য একটু পুষ্টিকর আহারের আবশ্যক। সেইজন্য চিকিৎসকের নিকট কি দ্রব্য কত পরিমাণে খাইলে রোগী ঠিক থাকে—তাহা বাড়ীর লোকের জানিয়া লওয়া দরকার এবং তাঁহার অনুমতিবিনা খাদ্য দ্রব্যের কোন তারতম্য করা উচিত নহে।

আমার এক Typhoid রোগীর অবস্থা ঐ খাদ্য-দ্রব্যের তারতম্যে সঙ্গীন্ হয়। রোগীটি ৯ বৎসরের বালক; সে ১৮ দিন পর্য্যন্ত বেশ ভাল ছিল, পেটের ফাঁপও বেশী ছিল না এবং জ্বরও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ পেটের অত্যধিক ফাঁপ হওয়াতে তাহাকে দেখিতে গিয়া শুনিলাম, তাহার কোন নিকট আত্মীয়া 'বাছা শুধু জল খেয়ে আছে' শুনিয়া এবং 'খুব রোগা হ'য়ে গেছে' দেখিয়া আদর করিয়া প্রায় পোয়াটাক ঘন দুধ খাওয়াইয়াছেন। পেটের ফাঁপের দরুণ রোগীর কষ্ট বাড়িতে থাকিল, জ্বরও বাড়িয়া গেল। পরদিন গিয়া অবস্থা অত্যন্ত খারাপ দেখিলাম এবং perforationএর (অন্ত্র-নাড়ীতে ছিদ্র হওয়ার) চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। যাহা হউক আমার মনে হয় যদি ঐ অবস্থায় দুধ না দেওয়া হইত, তাহা হইলে বোধ হয় হঠাৎ পেট অত ফাঁপিত না এবং ঐ দুরারোগ্য লক্ষণও প্রকট হইত না।

এই জন্য গৃহস্থের খুব সাবধানে থাকা দরকার ; বিশেষ রোগের শেষাশেষি সময় এবং বাড়াবাড়ির কালে

চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতীত কোন খাদ্য দ্রব্যের তারতম্য করিতে নাই।

ডাবের জল বেশ ভাল খাদ্য ও পানীয়। প্রস্রাব বৃদ্ধি করিতে এবং শরীর স্নিগ্ধ করিতে ইহার তুলনা নাই। অনেকে বেশী জ্বরে ডাব দিতে ভয় করেন। ডাক্তারী মতে কোন বাধা নাই। স্থলবিশেষে দিনে (২৪ ঘণ্টায়) ৩।৪টি কচি ডাবের জল পর্য্যন্ত দেওয়া যায়।

ডিম্বের শ্বেতাংশ জলে গুলিয়া সরবতরূপে (Albumin water) অনেকে ব্যবহার করান। ইহা খাদ্য হিসাবে সুপাচ্য ও পুষ্টিকর, তবে অনেক চিকিৎসক ইহার ব্যবহার পছন্দ করেন না এবং যে প্রকার আমিষ জাতীয় খাদ্যের পক্ষপাতী নহেন। গৃহস্থ চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া ব্যবহার করিতে পারেন।

কি উপায়ে প্রফুল্লতা লাভ হয়

[শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল]

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভই মনুষ্যজীবনের একমাত্র ও চরম উদ্দেশ্য। বিশ্ব সংসারের যাবতীয় জীবই এই আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে অহরহ ছুটাছুটি করিতেছে। ইতরজীব হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই এই আনন্দলিপ্সা একান্ত স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান,—জীবমাত্রের ইহাই সাধারণ ধর্ম্ম এবং এক কথায় এই প্রচেষ্টাই প্রাণীর প্রাণসত্তা। আমরা যখন যেদিকে ধাবিত হইতেছি, যে কাজ যে সাধনাকে বরণ করিয়া লইয়া, ক্ষুদ্র হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিকে সেই দিকে প্রয়োগ করিতেছি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব সকলের মূলেই এই একমাত্র আনন্দলাভের চেষ্টা। তুচ্ছাদপি তুচ্ছ কাজ বা ক্ষীণতম শক্তিপ্রয়োগও এই উদ্দেশ্যের বাহিরে নহে। নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দ-লাভ হইলে মানুষের আর কিছুই আকাঙ্খার থাকে না। কেননা ইহাই সচ্চিদানন্দ অবস্থারূপী ভগবানের পরম গুণ।

যাহা হউক, এখন কি উপায়ে এই আনন্দময় অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে? নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আনন্দময় অবস্থার বিষয় প্রকৃত অর্থে বুঝিতে হইলে ধর্ম্ম ও দর্শনের জটিলতম সূত্রের আলোচনার অবতারণা করিতে হইবে। দর্শনের দিক দিয়া, ধর্ম্ম ও ব্যবহারিক জীবনের কোন্ স্তরে তাহা সম্ভবপর তাহা এখন আমরা ধারণা করিতেও অক্ষম। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। সাধারণভাবে আনন্দময় শক্তি-পূর্ণ অবস্থা কি উপায়ে আমরা লাভ করিতে পারি—অনাবশ্যকীয় দুঃখ বিড়ম্বনা যাহাতে আমাদের মনে অধিকার বিস্তার করিতে বা স্বাভাবিক মানসিক প্রফুল্লতাকে নষ্ট করিতে না পারে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যদিও মানব-মনের একটা প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য-শক্তি আছে, তবুও অনেক দার্শনিকের মতে Mind is a tabularasa—বাহ্যজগতের প্রভাব ইহার উপর এত বেশী যে, যখন যেরূপ নৈসর্গিক বিকাশ ইহাতে আঘাত করিবে, ঠিক তদনুযায়ী ইহার নিজস্ব প্রকৃতি ইহাকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহা অবশ্য সাধারণ নিয়ম। সুতরাং এইভাবে বাহ্য জড়-জগতের অধীন হইয়া আমাদের মানসিক প্রফুল্লতা বা আনন্দময় অবস্থা রক্ষা করা অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার এবং সময় সময় একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। বাহ্যজগতের নৈসর্গিক প্রভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর আমাদের কোনই হাত নাই। প্রফুল্লতা-লাভের পথে প্রধানতঃ ইহাদের অন্তরায় তাই বেশী; কারণ আনন্দলাভের অনুকূল অবস্থা অপেক্ষা প্রতিকূল অবস্থার আঘাতই বাহ্যজগৎ হইতে আমরা অধিক পরিমাণে পাইয়া থাকি। কি শারীরিক, কি মানসিক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতির সঙ্গেই এই মানসিক প্রফুল্লতার অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। মনের শান্তি ও প্রফুল্লতা না থাকিলে আমরা শারীরিক উন্নতি সাধন করিতে পারি না। পরন্তু মানসিক প্রফুল্লতার গুণে শারীরিক স্বাস্থ্য অতি আশ্চর্য্য-রূপে উন্নত হয়। এই প্রফুল্লতা না থাকিলে মানসিক উন্নতির কোন কাজেই স্ফূর্ত্তি ও শক্তি আসিতে পারে না। ধর্ম্মের ও নৈতিক অধঃপতন এবং তজ্জাতীয় দুর্ব্বলতা—মানসিক বিষণ্ণতার জন্যই অনেক সময় ঘটিয়া থাকে এবং মানসিক বিষণ্ণতার অবস্থায় উহাদের উন্নতিও অসম্ভব। এই মানসিক স্ফূর্ত্তিই আমাদের সকল কার্য্যের প্রাণ; ইহাতে আমাদের কার্য্যশক্তি শুধু নয়, আমাদের জীবনী-শক্তিকেও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যবহারিকভাবে কি উপায়ে আমরা সর্ব্বক্ষণের জন্য প্রফুল্লতা রক্ষা করিতে পারি, সকল-বিধ অশান্তি ও দুশ্চিন্তার হাত এড়াইয়া আনন্দময় সার্থক কর্ম্মজীবন পরিচালিত করিতে পারি, তাহাই বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা রক্ষা করিবার পথে প্রধান অন্তরায় কতকগুলি অভাব। এই অভাববোধ সাধারণতঃ দ্বিবিধ, এক সহজাত এবং অন্য উপার্জ্জিত। একটি প্রকৃতিগত ভাবে জন্মাবধি আমাদিগকে অধিকার করিয়া বসে এবং অন্যটি আমরা জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজগৎ হইতে লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু তবুও এক হিসাবে ধরিতে গেলে সকল অভাব-বোধই আমাদের স্বসৃষ্ট। এই অভাব-বোধের মাত্রা অনেক সময় অসঙ্গত এবং অসম্ভবভাবে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে; আমরা বিচারহীন ভাবে যা তা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে আমাদের আকাঙ্খা ও চেষ্টা নিয়োজিত করি। এই বিষয়ে আত্ম-সংযম একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, আমাদের পরমায়ু যত অধিকই হউক না কেন, উহা

সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। ইহারই মধ্যে এমন সমস্ত কাজ আমাদিগকে ধীরভাবে বিচার করিয়া করিতে হইবে, যাহাতে আমরা অনাবশ্যকীয় দুঃখ-বিড়ম্বনার হাত এড়াইয়া আত্মার প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারি। এজন্য সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, আমরা যেন আমাদের প্রয়োজনের মাত্রা অন্যায়ভাবে বৃদ্ধি না করি। একজন বিখ্যাত ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন—

Man wants but little here below
Nor wants that little long.

—এ জগতে মানুষের প্রকৃত অভাব অতি সামান্যই, এবং উহাও অধিকদিনের জন্য নহে। মনুষ্যত্বের সাধনা অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি-বিধানের জন্য আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় যে সব অভাব, তাহা বাস্তবিকই বড় বেশী নহে। এবং যিনি যে অবস্থার লোক হউন, প্রায় সকলেই তাহা পূরণ করিতে সমর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা রিপু ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া অত্যন্ত অসম্ভাবিতরূপে এই অভাবের মাত্রাকে বৃদ্ধি করি। এই সব অভাবপূরণ যতই ঐশ্বর্য্যবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হউক, কাহারও পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব নহে এবং এই অসংযত অভাব একটীর পর একটী যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে, নূতন নূতন অভাব-বোধ ততই অবশ্যম্ভাবীরূপে হৃদয়ে সৃষ্টি হইতে থাকিবে। এইজন্য গীতায় ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি,
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়োএবাভি বর্দ্ধতে।"

অর্থাৎ কামনার তৃপ্তিদ্বারা কখনও কামনার শান্তি হয় না; অগ্নির মধ্যে ঘৃতের আহুতির ন্যায় ইহা পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্যায় ও অসংযত অভাববোধই আমাদের যত কিছু দুঃখের মূল। ইহার সকলগুলির বোধ আবার আমাদের প্রত্যক্ষভাবে হয় না। যখন মনে হয় আমি স্থির নির্ব্বিকার, তখনও শত শত অভাব মনের মধ্যে অজ্ঞাতে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে

এবং অতীন্দ্রিয়ভাবে (subconsciously) প্রাণের চিন্তা তাহাদের বোধ জন্মাইয়া দিয়া আমাদের নির্ম্মল স্বাভাবিক শান্তিকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। সুতরাং সর্ব্বদা যদি এই বিষয়ে সতর্ক থাকি অনাবশ্যকীয় অভাব আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি না করিয়া প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা আমাদের চরম আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ঠিক তদনুযায়ী আমাদের সকল চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আমাদের বৃথা অশান্তি ও দুশ্চিন্তা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে এবং জীবন সার্থক ও শান্তিময় করিয়া তুলিতে পারি।

প্রফুল্লতা লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করা বা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের আস্তিক্যবোধ। আমিই তিনি বা তিনিই আমিরূপে আমার সকল কাজ সকল জীবনের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান এবং তাঁহারই অপরিশক্তি অনন্ত মঙ্গল আমার পশ্চাতে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে আমাকে পরিচালিত করিতেছে, এই সত্যটী সর্ব্বদা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের হতাশ অবস্থা ও বিষণ্ণতার বিষয় একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, স্বকীয় দুর্ব্বলতা ও সহায়হীনতা-বোধই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার প্রধানতম কারণ। অভিপ্রেত কোন কার্য্য সাধন করিতে গিয়া বা কোন উচ্চ আকাঙ্খার তৃপ্তি সাধনে ইচ্ছুক হইয়া অনেক সময় আমরা নিজকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অসহায় মনে করি। মনে হয় আমাদ্বারা বুঝি এ কাজ হইল না, এ তৃপ্তি এ সার্থকতা আমার ভাগ্যে জুটিল না।

অনেকের জীবনেই অনেক সময় এরূপ অবস্থা আইসে এবং দুশ্চিন্তা ও অশান্তিতে মন যেন তখন ভাঙ্গিয়া পড়ে। এ অবস্থাটী যখন একটু অধিক মাত্রায় হয় অর্থাৎ Consciousness বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্তরের মধ্যে আইসে, তখন আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে ঐ কারণটী উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু সামান্য অবস্থায় যখন Consciousness এর নিম্নস্তরে (অতীন্দ্রিয়ভাবে,) বিদ্যমান থাকে, তখন আমরা উহা বিশেষ কিছু উপলব্ধি করিতে পারি না; কিন্তু বিষণ্ণতা কিছু না কিছু প্রকৃতই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যদি আমরা সর্ব্বদা এই সত্যটী হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারি যে, পরম মঙ্গলময় অনন্তশক্তি ভগবান আমাদের আত্মশক্তির সহিত একই সূত্রে সংবদ্ধ, অথবা সেই অনন্ত অমৃতের সন্তান আমি, তিনিই আমিরূপে বিরাজিত হইয়া আমার মধ্যে থাকিয়া আমাদ্বারা সকল কাজ করাইয়া লইতেছেন, কে জানে কত অনন্তশক্তি—কত অনন্ত ঐশ্বর্য্য আমি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে কি সংসারের কোন অভাব, কোন অশান্তি-বিড়ম্বনা আমাদের স্পর্শ করিতেও পারে? ইহা শুধু কথায় উপদেশে বুঝাইবার জিনিষ নহে, প্রাণের পরতে পরতে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই সত্যটী আমাদের ভিতর প্রাণময় হইয়া উঠিলে, একটা অব্যক্ত তৃপ্তি ও প্রফুল্লতা আমাদের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে চির বিরাজিত থাকিবে। আমাদের অভাব-অতৃপ্তির সময় একবার তাঁহাকে প্রাণের ভিতর অনুভব করিতে পারিলে আর কোন দুঃখ অশান্তি থাকিবে না, পরন্তু একজাতীয় নির্ম্মলসুখ অনুভব করিতে পারিব।

দয়াময়ী মা আমাদের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত রহিয়াছেন। আমরা কিছু না চাহিতে প্রকৃতিরাজ্যে ভারে ভারে রত্নরাজি আমাদের জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং একবার যদি তাঁহাকে মর্ম্মস্পর্শীভাবে ভক্তি-গদগদপ্রাণে মা মা বলিয়া ডাকি, তাহা হইলে কোন অভাব অশান্তি আমাদের হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পাইতে পারে না। বিষণ্ণ ও বিপন্ন অবস্থায় ভগবানকে ডাকিলে তিনি সব সময় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বা প্রত্যক্ষভাবে অভাব মোচন না করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে শুধু প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ডাকার মধ্যেই এমন এক মাধুর্য্য—এমন এক সম্মোহন শক্তি আছে যাহাতে নিরপেক্ষভাবে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দময় অবস্থা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিব। এ বিষয়ে বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। কেন না উৎকট জড়বাদী ভিন্ন সকলেই ইহা নিজ নিজ জীবনে

অন্ততঃ একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা সর্ব্বদা কথা বা শ্লোক দ্বারা ভগবানকে ডাকিতে পারি না পারি, তাহাতে কিছু যায় আসে না—(ভগবানকে মুখে ডাকাই শুধু একমাত্র জিনিষ নহে) প্রাণের ভিতর তাঁহার ভালবাসা ও তাঁহার মহিমা চিন্তা করাই প্রধান জিনিষ। আমাদের সকল কাজ—সকল চিন্তার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে সর্ব্বদা যেন তাঁহার ভালবাসাতে প্রাণটী সরস থাকে এবং তাঁহারই অনন্ত শক্তি হৃদয়ে অনুভব করিয়া ঐকান্তিক নির্ভরতা অবলম্বন করিতে পারি।

আমাদের বিষণ্ণতার অন্যতম কারণ মানসিক জড়তা ও উচ্চলক্ষ্যহীনতা। নিশ্চেষ্টভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে গেলে সাধারণতঃ দুর্ব্বুদ্ধি ও দুশ্চিন্তাই মনকে অধিকার করিয়া বসে; "An Idle brain is Devil's work-shop". সুতরাং সর্ব্বদা আমাদের আদর্শ অনুযায়ী কোন-না-কোন কাজে লিপ্ত থাকিতে হইবে। প্রফুল্লতা সর্ব্বতোভাবে চিন্তার গুণাগুণের উপরই নির্ভর করে। সকল কাজে মনটি সর্ব্বদা সরস ও ভালবাসাপূর্ণ রাখিবে। Always think work as play—যখন কাজ করিতে হইবে, তখন ঐকান্তিক আগ্রহ ও ভালবাসার সহিতই সে কাজ করিবে। তাহাতে কাজও সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হইবে এবং কোন ক্লান্তি বা বিষণ্ণতাও বোধ হইবে না। কর্ত্তব্য কার্য্য অনেক সময় আমরা সহজসাধ্য হইলেও গুরুতর বলিয়া মনে করি, কিন্তু তখন যদি ভাবি এ কাজ ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের কারণ, "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"—হে জগৎমাত, আমি যাহা করিতেছি এসব তোমারই পূজা, তাহা হইলে আমাদের কাজ সকল খেলার অপেক্ষাও প্রিয় আনন্দদায়ক হইবে। বড় বড় মহাত্মারা এইভাবে তাঁহাদের জীবনের সমস্ত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহারা উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদের সকল কাজের মূল মন্ত্র ছিল। তারপর জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া মহৎ কার্য্যের সংকল্প মনে রাখিবে। তাহাতে উচ্চচিন্তা ও উচ্চভাব-জনিত আনন্দে প্রাণটী সর্ব্বদা সরস ও উৎসাহিত থাকিবে। মহৎ লক্ষ্য, মহৎ সাধনাই শ্রেষ্ঠতর আনন্দলাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং বাজে কাজ বা অলস চিন্তায় এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট না করিয়া, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইবে।

মানসিক শান্তি কিংবা প্রফুল্লতারও স্তর বা গুণের তারতম্য আছে। পবিত্র ও উন্নত রকমের শান্তিলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইতে হইবে। ইন্দ্রিয় ও রিপুপরতন্ত্রতাই আমাদের অশেষবিধ অশান্তির মূল। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে উহাদিগকে সংযত করিতে হইবে। হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিসমূহ মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে হইবে। উন্নত স্তরের প্রফুল্লতা কি জিনিষ তাহা সত্ত্বগুণ-প্রধান লোক ও সাধু মহাত্মাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"Chearefulnesse
Doeth expresse
A settled, pious mynde,
Which is not prone to grudging,
From murmuring refined!"

উচ্চ লক্ষ্যানুযায়ী কর্ত্তব্য যে অনেক সময় আমরা করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ঐ সব কুপ্রবৃত্তিসকল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মনকে অধিকার করিয়া বসে এবং আমাদের সম্পূর্ণ শক্তি ও উদ্যমকে কর্ত্তব্যের দিকে প্রয়োগ করিতে দেয় না। বিশেষ বিচার পূর্ব্বক ইহা বুঝিতে হইবে। প্রফুল্লতার গুণের তারতম্য নির্ণয় যদিও অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন—বিভিন্ন ক্ষেত্রভেদে ইহার মাত্রা ও আদর্শ ঠিক করিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার, তবুও অত্যন্ত ধীরভাবে সূক্ষ্ম বিবেচনার সহিত প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে দূরে ঠেলিয়া প্রকৃত আনন্দের মাত্রা ঠিক করিতে হইবে। সকল বিষয়েরই মাত্রা আছে, সুতরাং এই আনন্দ ও মাত্রার একটু বাহিরে গেলে তাহা সুখের না হইয়া দুঃখেরই হইয়া থাকে। মানসিক প্রফুল্লতা যে অবস্থায় নাড়ীসমূহের চাঞ্চল্য

(Nervous derangement) ও চিত্তের অস্থিরতা উৎপাদন করে, সেই অবস্থায় তাহাকে সংযত করিতে হইবে। মনকে অন্য দিকে ফিরাইতে হইবে, কর্ত্তব্য ও আদর্শের কথা ভাবিতে হইবে—যাহাতে মন শান্তভাব ধারণ করে। আবার সাধারণভাবে যখন আমরা সন্তুষ্ট থাকিয়া মনে করি যে, আমার মনে বেশ প্রফুল্লতা আছে, বেশ শান্তিতে আছি, তখনও দেখিবে—বাস্তবিক সেই প্রফুল্লতাই যথেষ্ট নহে; তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর আনন্দ ও শান্তি আছে, যাহা পূর্ব্বোক্তভাবে চেষ্টা করিলেই লাভ করা কঠিন হইবে না, এবং তখনই শুধু আমরা তাহার মাধুর্য্য নিবিড়তরভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব।

প্রফুল্লতাকে সর্ব্বদা অব্যাহতভাবে ধরিয়া রাখার পথে বাধাবিঘ্ন যথেষ্ট। প্রতিকূল অবস্থা ও দৈবদুর্ঘটনা, যাহার উপর আমাদের হাত নাই, তাহার মধ্যেও অনেক সময় আমাদের পতিত হইতে হয়। সুতরাং এরূপক্ষেত্রে মানসিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় কি? কোন অনাগত বিপদ বা প্রতিকূল অবস্থা আসিবার পূর্ব্বে আমরা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়ি। কিন্তু তখন আমাদিগকে বিখ্যাত মনীষীর উপদেশ মনে রাখিতে হইবে:—

"What does your anxiety do? It does not empty tomorrow, brother, of its sorrow; But oh! It empties to-day of its strength. It does not make you escape the evils, it makes you unfit to cope with it if it comes".

সমস্ত বিপদও যতক্ষণ না পরিপূর্ণভাবে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ কে জানে সর্ব্বশক্তিমানের কোন্ এক মঙ্গলময় ইচ্ছাতে এবং জাগতিক কারণ পরম্পরায় তাহা অসম্ভবরূপে কাটিয়া যাইবে কিনা? (এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইহা হাতে-হাতেও দেখিতে পাই।) সুতরাং পূর্ব্ব হইতে অধৈর্য্য হইয়া কেন আমরা বৃথা অশান্তির মাত্রা বাড়াইব ও কর্ম্মশক্তি হারাইব? বরং ধীরভাবে সকল শক্তি লইয়া সেই বিপদের সম্মুখীন হইব এবং সেই মঙ্গলময়ের পদে আত্মনির্ভর করিব—যাহাতে অনায়াসে সেই বিপদ-সাগর অতিক্রম করিতে পারি। তারপর যদি কখনও সত্যই কোন বিপদ-বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও হতাশ বা ভগ্নহৃদয় হওয়ার কোন কারণ নাই; তখন মনে রাখিতে হইবে:—

"Each cloud has a silver lining,
Though we may not see its light;
The sun has not ceased its shining
Though hidden awhile from our sight,
Be faithful, and active, and earnest;
In idleness never sit down:
The better the dark cross you carry,
The brighter will sparkle your crown."

পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নাই এবং প্রত্যেক দুঃখের পশ্চাতে তদনুপাতে সুখও বিদ্যমান আছে। পরম মঙ্গলময় ভগবান আমাদের মঙ্গলের জন্যই সব করিতেছেন। আমাদের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ তিনি ঠিক পরিমাণ করিয়াই আমাদিগকে দিতেছেন। আমাদের অল্পবুদ্ধি ও অদূরদর্শিতার জন্যই সে রহস্য আমরা কিছু বুঝিতে পারি না। দুঃখ ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়াই মানুষ, প্রকৃত মানুষরূপে তৈয়ারী হয় এবং এই সব পরীক্ষার ভিতর দিয়াই আমরা কতটুকু শক্তিমান হইয়াছি—তাহার অনুভূতি লইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারি।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত প্রাণ মিশাইয়া সকলের প্রতি পবিত্র ভালবাসায় প্রাণটীকে গড়িয়া তোলা বিমল শান্তি লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের প্রাণ যতই ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইবে, ততই আমরা নানা বিড়ম্বনা ও অশান্তিতে জড়িত হইব। আর যতই আমাদের প্রাণটি উদার ও ভালবাসাপূর্ণ হইবে, ততই আমরা বৃথা অশান্তি ও দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রভাত-রবির মত সমুজ্জ্বল হইব। ভালবাসাই একমাত্র আনন্দ।

যখন আমাদের মন বিষণ্ণ, উদাসীন; অথচ তাহার বিশেষ কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না, তখন আমরা যদি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারি, তাহা হইলে এই বাহ্যজগৎ এক নূতন রঙে আমাদের চোখে প্রতিভাত হইবে এবং এক চিরমধুর ভাব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিবে। তখন একটি সামান্য বৃক্ষ-পত্রের দিকে চাহিয়াও সমগ্র প্রাণ ঢালিয়া তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইবে। ঐ তুচ্ছ বৃক্ষপত্রেও তখন এমন এক নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইব, যাহা পূর্ব্বে কখন কল্পনাও করিতে পারি নাই।

তারপর, চিন্তা ও কল্পনা দ্বারাও কত অতুল শান্তি উপভোগ করা যায়। মন যখন উদাস ও অবসন্ন হয়, কোন মতেই যেন জোর করিয়াও প্রফুল্লতা আনিতে পারিতেছি না, তখন চিন্তা ও কল্পনা দ্বারা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক লোকই বাল্য যৌবনের বিভিন্ন সময়ে স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী কত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে কোন কোন আনন্দ কত নির্ম্মল, কত পরিপূর্ণ। সেই আনন্দময় চিত্র কল্পনাদ্বারা বর্ত্তমানে টানিয়া আনিয়া আমরা কত মধুরভাবে তাহা আবার উপভোগ করিতে পারি। এইরূপে কত দেশ-বিদেশ, পর্ব্বত, সমুদ্র বন, উপবনে ভ্রমণ করিয়া কত মাধুর্য্য উপভোগ করা যায়। বয়োধিক্য ও বৈচিত্র্যহীনতার জন্য জীবন যখন নীরস ও বিষাদময় হয়, তখনও এই কল্পনাদ্বারা আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ মধুর স্বাদ উপভোগ করিতে পারি। গ্রীষ্মের সময় বর্ষা, বর্ষায় সময় শরৎ, শীতের সময় বসন্ত ইত্যাদি যখন যেমন ইচ্ছা প্রকৃতিকে অনেকটা তেমনি করিয়া উপভোগ করিতে পারি। ভবিষ্যতের কত সুখময় চিত্র আঁকিয়া এবং সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কত মধুর আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারি। এ আনন্দ—এ শান্তি অতি পবিত্র, অথচ দুর্লভ নহে; কেন না বহির্জগতের কোন বস্তুরই ইহা অপেক্ষা করে না।

মনে মনে গুন্‌গুন্ স্বরে গান করা এবং সেই সঙ্গে উচ্চ ভাবরাশি চিন্তা করাও নির্ম্মল আনন্দলাভের একটি প্রধান উপায়। গানের ন্যায় নির্ম্মল আনন্দের জিনিষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। ইহা দ্বারা যেমন মানসিক শান্তি, তেমনি কর্ম্মশক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই জন্য বিখ্যাত কবি কার্লাইল বলিয়াছেন—"Give us, oh, give us the man who sings at his work! Be his occupation what it may, he is equal to any of those who follow the same pursuit in silent sullennesss. He does move in the same time—he will do it better—he will perseve e longer".

শারীরিক সুস্থতা আনন্দ লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এ কথা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না যাই। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে, শরীরস্থ যন্ত্রসমূহ সবল ও কার্য্যক্ষম থাকিলে, এবং ব্রহ্মার্য্য পালনে সারধাতু অবিকৃত থাকিলে, আমাদের মনে এমন এক আনন্দ চির-স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠিবে, যাহার সহিত অন্য কোন সুখের তুলনা হয় না। ইহাতে পাত্রাপাত্র বা অবস্থাভেদ নাই। অটুট স্বাস্থ্য ও নির্ম্মল আনন্দ পরস্পর চির সহচর। এই জন্য আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মতে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। যদিও Idealism ও Realism এর মতে মনেরই প্রাধান্য, জড়ের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই - জড় ইহারই সৃষ্ট; কিন্তু তথাপি আনন্দের অনুভূতি শারীরিকভাবে নাড়ী (nerve), মস্তিষ্ক প্রভৃতির ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে। দেহ ও মন যে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং দেহের উপর মনের সম্যক্-ভাবে আধিপত্য স্থাপন বহু সাধনা ও অনুশীলন-সাপেক্ষ—একথা কিছুতেই অস্বীকার করার উপায় নাই। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে মানসিক সকল শক্তি প্রয়োগই সহজ-সাধ্য হইবে এবং কর্ত্তব্য সাধন ও নির্ম্মল আনন্দ ভোগ কিছুই তখন কঠিন হইবে না।

অবশেষে একটী কথা যেন আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি যে, সাধারণতঃ আমাদের দৈনন্দিন সর্ব্বপেক্ষা সুখের জীবনেও অধিকাংশ সময়ই আমরা অপ্রফুল্ল থাকি। উপযুক্ত বিচারে যে নির্ম্মল আনন্দ, তাহা

কাহাকে বলে আমরা একরূপ কিছুই জানি না! আমরা যাহাকে সুখ ও শান্তি বলি প্রকৃত পক্ষে উহা তাহা নয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্তভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে সতর্ক—সচেষ্ট থাকিতে হইবে। জড়তা ও অজ্ঞানতা পরিহার পূর্ব্বক আত্মার আনন্দে জীবনকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমরা মনুষ্য জীবনের চরমোদ্দেশ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

শিশুর খাদ্য—মাতার স্বাস্থ্য

মনুষ্য চক্ষুর অন্তরালে, মনুষ্য বুদ্ধির অগোচরে কত অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মানবের সাধ্য কি যে ভগবানের সকল কার্য্যের পদ্ধতি বুঝিয়া উঠিতে পারে? সকল ক্ষেত্রেই কি ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে পাই, কেন ঘটিতেছে—তাহা সম্ভবতঃ বুঝিতে পারি; কিন্তু কিরূপে ঘটিতেছে তাহা বুঝিয়া উঠা সাধ্যাতীত।

গর্ভে ভ্রূণের জন্মের সঙ্গে তাহার বৃদ্ধি ও পালনের জন্য মাতার দেহে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা দেখিতে পাই,—বুঝিতে পারি, ঐ সকল পরিবর্ত্তন ও মাতার দেহে নূতন শক্তির আবির্ভাব না ঘটিলে, মানব-শিশুর বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। কিন্তু কিরূপে এ সকল ঘটে, তাহা বিজ্ঞান এখনও প্রকাশ করিয়া বলে নাই, জানি না,—তাহার শক্তির বাহিরে কি না। ভ্রূণের আত্ম-প্রকাশের সহিত মাতার শরীরে চাঞ্চল্য দেখা যায়। ভ্রূণ অবস্থায় ও তাহার পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর যাহাতে তাহার সংরক্ষণ হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই—মাতার শরীরে স্তনের পরিণতিতে। ভ্রূণ যতদিন গর্ভে আশ্রয় লইয়া থাকে, মাতার শরীরের রক্ত দিয়া ভ্রূণের রক্ষা হয়, এবং গর্ভ বাসের পর তাহার রক্ষার জন্য মাতার স্তনে ঐ রক্তই অমৃত রূপে দুগ্ধ রূপে ক্ষরিত হয়। গর্ভে শিশুর বৃদ্ধির সহিত মাতৃ-দুগ্ধেরও পরিবর্ত্তন হয় এবং এককালীন্ জলের আকার হইতে প্রসবের কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকৃত দুগ্ধের আকার ধারণ করে।

বিশ্বনিয়ন্তার বিচারে স্তন্যই শিশুর একমাত্র খাদ্য। অবশ্য যে সকল ক্ষেত্রে স্তন্য বঞ্চিত হইয়া শিশু রক্ষা পাইয়াছে সে সকল স্থলে কথা স্বতন্ত্র। শিশুর খাদ্যের বিচার করিতে গেলে দেখিতে হয়, শিশুর দেহ পালন ও উন্নতির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ খাদ্য উপযোগী। শিশু অবস্থায় নানাপ্রকার খাদ্যের বিষয় বিচার করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। যাহাতে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম না ঘটায় সেই দিকে প্রধানতঃ লক্ষ্য থাকা উচিত। মাতৃ দুগ্ধের স্থান অধিকার করিবার মত বস্তু আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই; ভগবানের বিধানে শিশুর জন্যই স্তন্যের আবশ্যকতা—তাহার জন্মের সহিত দেখা যায়, এবং উহার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে স্তন্য অদৃশ্য হয়। শিশু কিছুক্ষণ স্তন্য পান না করিলে বা সন্তান নিকটে না থাকিলে, মাতৃ-হৃদয় তাহা বুঝিতে পারে। পরে দৃষ্টি মাত্রেই পুলকের ধারা স্তনের স্রাব আপনিই পড়িতে থাকে। সময়ে সময়ে মাতার স্তনের বেদনা বুঝাইয়া দেয়—শিশুর আহারের দাবী সাময়িক ভাবে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, এবং তাহার শাস্তি রূপে স্তনের বেদনা দেখা দিয়াছে। বিজ্ঞান বহু বিচার করিয়া দেখিয়াছে স্তন-দুগ্ধের সমকক্ষ আর কিছু নাই; উহার পরই অবশ্য গাভীর দুগ্ধ উপযোগী। (গর্দ্দভের দুগ্ধ মাতার দুগ্ধের পরই সহজ-পাচ্য; কিন্তু তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা চলে)।

দেখা যায়, দন্ত বিকসিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্তন-দুগ্ধের উপর শিশুরই একমাত্র দাবী; তাহার অন্য ব্যবহার নাই। আজকাল প্রথা বিদেশী মতে কোন কোন মাতা দেহের সৌন্দর্য্য অটুট রাখিবার জন্য শিশুকে স্তনদানে অসম্মতি প্রকাশ করেন ও নীচ জাতীয়া পরিচারিকার উপর ঐ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। আমাদের মতে ঐ সকল মাতা রাক্ষসী সমতুল্য; এবং মানব ও বিশ্বপিতার চক্ষে দোষী ও দণ্ডণীয়া। যে দ্রব্যে ঐ শিশু ব্যতিরেকে আর কাহারও কোন দাবী নাই,—এমন কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না, যাহা দ্বারা সেই স্তন্যপানে শিশুকে বঞ্চিত করিতে পারা যায়। দুগ্ধ শরীরে ধারণ করিয়া রাখিবার উপায় নাই, তাহা অতি শীঘ্র প্রদাহরূপে মাতাকে কষ্ট দিবে। সে জন্য দুগ্ধ শরীর হইতে নির্গত করিয়া দিতেই হয়। কিন্তু তাহা শিশুকে পান করিতে না দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। মাতার দুগ্ধে বঞ্চিত হইয়া শিশু ক্ষীণ হইয়া পড়ে, নানা রকম রোগগ্রস্ত হইয়া শিশুকালে মাতাকে কষ্ট দেয়; এবং দুর্ব্বল শরীর ধারণ করিয়া নিজের তথা সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি করে।

দন্ত নির্গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাতার স্তন্যই একমাত্র উপযোগী আহার্য্য তাহা আমরা বলিয়াছি। এ সময় মাতার স্তনের দুগ্ধই তাহার সমস্ত ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রেও বলিয়া রাখি, কোন বিশেষ রোগের কারণে মাতার যদি সন্তানকে স্তন্যপান হইতে বঞ্চিত করিতে হয়, তাহা স্বতন্ত্র কথা। সাধারণ বাঙ্গালী মাতার স্বাস্থ্য আজকাল আর অটুট নাই। দেশ মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ শরীরের সার অংশ নষ্ট করিয়া দেয়, তাহাতে শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ অতি শীঘ্র গর্ভ ধারণের ফলে ক্রমশঃই দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকে। অনাহার, অল্পাহার ও অনুপযুক্ত আহার মাতার স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ। বিশেষ বিশেষ রোগের কারণেও দুগ্ধ হ্রাস হইতে পারে - বা এককালে বন্ধ হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। এমন কি মাতার রোগের কারণে শিশুর দুগ্ধপান বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

দুগ্ধের স্বল্পতা হেতু যদি শিশুর আহার কম পড়ে তাহা এক কথা। কিন্তু রোগ-দুষ্ট দুগ্ধ পান হেতু শিশুর স্বাস্থ্য হানি ঘটিতে পারে। আমাদের দেশে পাকা গৃহিণীরা বলিয়া থাকেন যে মাতার কুপথ্য সদ্য-সদ্য শিশু-শরীরে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। আজকাল সাধারণ বাঙ্গালী মাতার অম্লের পীড়া দেখা যায়, এইরূপ মাতার শিশুগুলিকেও অম্লরোগের লক্ষণ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। ইহা এত সাধারণ কথা যে, এ বিষয়ে আর বিশদ আলোচনা না করিলেও চলে।

এখন মাতার স্বাস্থ্যের কথা বলিয়া আমরা ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিব। শিশুর স্বাস্থ্য মাতার স্বাস্থ্যের সহিত যখন ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট, তখন মাতাকে সদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার শরীরে কোনরূপ রোগ আশ্রয় দিতে পারেন না। তিনি নিজের শরীরে যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে পারেন, কিন্তু শিশুর প্রতি তাঁহার গুরুতর দায়িত্ব আছে; সে জন্য তাঁহাকে বিধি-মতে নিজের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। যে সকল খাদ্য অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার শরীরের পক্ষে উপযোগী নহে, সেরূপ খাদ্য যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন। হয় ত ঐ সকল খাদ্য তাঁহার শরীরের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিত না; কিন্তু শিশু শরীরে তাহা গুরুতর রূপে প্রকাশ পাইতে পারে। শরীর রক্ষার অতি স্বাভাবিক নিয়মগুলি তাঁহাকে পালন করিতে হইবে। যথা, কার্য্যাদির বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার, নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ পরিত্যাগ করা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিমিত পরিশ্রম ও বিশ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি। প্রসূতির পক্ষে প্রচুর পরিমাণে জল পান এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অনেকের ধারণা—পুষ্টিকর খাদ্য অর্থেই বহুমূল্য বস্তু। আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ, এবং সে বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। শরীরের ময়লা যাহাতে নিয়মিতভাবে বহির্গত হইয়া যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্তন সদা পরিষ্কার রাখা উচিত।

শিশুর স্তন্যপান কাল অর্থাৎ জন্মের পর পাঁচ হইতে সাত মাস পর্য্যন্ত প্রসূতির পক্ষে স্বামী সহবাস নিষিদ্ধ। যদি ইতোমধ্যে পুনঃ গর্ভাধান হয়, তাহা হইলে জাত শিশুর রোগ হওয়া অনিবার্য্য। নূতন গর্ভ না হইলেও

স্বামী সহবাসে শরীরের নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটায় এবং তাহাতেও দুগ্ধের গুণের যথেষ্ট হানি হয়।

মানসিক অবসাদও দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণের হ্রাস করিয়া থাকে। শোক ভয় প্রভৃতি কারণে স্তনের দুগ্ধ অম্লত্ব প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। সে সময় যে শিশু ঐ দুগ্ধ পান করে তাহার রোগগ্রস্ত হওয়া বিচিত্র নহে। মাতার মনের স্ফূর্ত্তি কোন প্রকারে নষ্ট হইতে দিতে নাই। শিশুর ঐ মনের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। খিট্ খিটে মাতার স্ফূর্ত্তিমান সন্তান প্রায়ই দেখা যায় না। সদা সর্ব্বদা কোপন-ভাব থাকা হেতু দেহের সকল প্রক্রিয়ারই ব্যাঘাত ঘটে। ক্রোধ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে পরিপাক শক্তির তারতম্য হয় এবং সে কারণে স্তন-দুগ্ধের বিকৃতি হওয়া স্বাভাবিক।

মোটের উপর, নিজ স্বাস্থ্য অটুট রাখিয়া সন্তান পালন কর', তাহাকে 'মানুষ' করিয়া তোলা—দেবতার পূজা অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য জ্ঞান করা উচিত। সন্তানের উপর মাতা-পিতার সংসার-পরিজনের দশের দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। সেই শিশুর অসহায় অবস্থার যাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকার ব্যবস্থা আছে, তাঁহাদের দায়িত্ব অতি কঠোর। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই নারী জন্মের—মাতৃত্বের সার্থকতা।

জীবন-কল্যাণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[ডাঃ নরেন্দ্রকুমার দাস—M.B., M.C.P.L.S. (C.P.S.). M.R.I.P.H. (Eng.) M.D.(H)" ভিষগরত্ন"]

(৫) তামাক

এই পর্য্যায়ে আমরা তামাক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

তামাকের উৎপত্তি। ১৪৯২ সালের নভেম্বর মাসে "কলম্বস্" কিউবা দ্বীপ আবিষ্কারের পর ২টী নাবিককে ঐস্থানের অনুসন্ধান জন্য পাঠাইয় দেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলে যে, কিউবা দ্বীপবাসীরা সঙ্গে মশাল লইয়া বেড়ায় এবং তাহাদের মুখ ও নাসারন্ধ্র হইতে সর্ব্বদা ধূম উদ্গীরণ হইয়া থাকে; তাহারা আরও বলে যে, উলঙ্গ বর্ব্বরেরা এক রকম বড় বড় পাতা জড়াইয়া দানবের ন্যায় ধূম পান করে।

পেরিরার মেটীরিয়া মেডিকা পুস্তকের ৫৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, তামাককে "নিকোটীনা-ট্যাবকম্" বলা হয়। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে "জন্ নিকোট" নামক এক ব্যক্তি স্পেইন দেশ হইতে ফ্রান্সে তামাকের গাছ চালান দেন। তাঁহার নাম হইতেই সম্ভবতঃ তামাকের "নিকোটীন্" নামকরণ হইয়াছে।

হারনানডেজ-ডি-টোলিভো নামক জনৈক ব্যক্তি 'কিউবা' দ্বীপ হইতে প্রথমে তামাক স্পেইন দেশে আনয়ন করেন। আবার "জন্-নিকোট" কর্ত্তৃক উহা প্রথমে ফ্রান্সে আনীত হয়।

আমেরিকা আবিষ্কারের কিছুদিন পর হইতেই ইংলণ্ডে তামাক প্রচলিত হয়। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে সার জন্ হকিংস দ্বারা—ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে তামাক প্রচলিত হয়। পরে সার ওয়াল্টার র‍্যালে এই কদভ্যাসটীর প্রচলনের বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। উত্তর আমেরিকার "ভার্জ্জিনিয়া" হইতে সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে তামাক আনীত হইয়াছিল। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, এই কদভ্যাসটী কোন রাজা, দিগ্বিজয়ী বা বিখ্যাত চিকিৎসক কর্ত্তৃক সভ্য জগতে প্রচলিত হয় নাই। "কিউবা", "প্যারা-গুয়ে" প্রভৃতি স্থানের বর্ব্বরদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া সভ্য জগতে এই তামাক-বিষ প্রবেশ করিয়াছে।

এই সম্বন্ধে একটী বেশ গল্প আছে :—

সার ওয়াল্টার র‍্যালে যখন প্রথমে এই ঘৃণিত অভ্যাসটী আমেরিকার বর্ব্বরদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডে আসেন, তখন একদিন নিজ গৃহে বসিয়া তামাক সেবন করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় আপন ভৃত্যকে বিয়ার নামক মদ্য ১ গেলাস আনিতে আদেশ করেন। তখন সার ওয়াল্টার র‍্যালের মুখ ও নাসারন্ধ্র হইতে ক্রমাগত তামাকের ধূম নির্গত হইতেছিল। এদিকে ভৃত্য পান-পাত্র ভরিয়া বিয়ার লইয়া আসিয়া দেখিতে পাইল যে, তাহার প্রভুর শরীরে আগুন লাগিয়াছে—কেননা তাঁহার মুখ ও নাসারন্ধ্র হইতে তখন তামাকের প্রচুর পরিমাণে ধূম নির্গত হইতেছিল। ইহার পূর্ব্বে ভৃত্য এরূপ দৃশ্য আর কখনও দেখে নাই। সুতরাং প্রভুর শরীরে আগুন জ্বলিতেছে বিবেচনা করিয়া সে আগুন নিভাইবার উদ্দেশ্যে পানপাত্র পূর্ণ সমস্ত 'বিয়ার' প্রভুর মাথায় ঢালিয়া দিল।

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে সার টমাস্ রো নামক জনৈক ইংরাজ —ইংলণ্ড-রাজ প্রথম-জেম্সের দূতরূপে জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজসভায় আসিয়াছিলেন। তিনিই ভারতে প্রথম তামাক আনিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই ভারতে তামাক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং কিঞ্চিদধিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে তামাক ব্যবহার আরম্ভ হয়।

পেরিরার মেটীরিয়া মেডিকা নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে তামাকের মধ্যে 'নিকোটীন' নামক একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে। ইহা যে কেবলমাত্র তামাকের পাতাতেই পাওয়া যায় তাহা নহে, পরন্তু তামাকের মূলে, বীজে ও ধূমেও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। 'নিকোটীন' একটী অতি উৎকৃষ্ট বিষ। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দ্বারা যেরূপ অত্যল্প সময় মধ্যেই হঠাৎ প্রাণনাশ হইতে পারে, তামাক দ্বারাও ঠিক সেইরূপ হইতে পারে। কড়া তামাকে শতকরা ৬ কিম্বা ৮ ভাগ নিকোটীন পাওয়া যায়।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, একটী কুকুরকে মাত্র ১২ ফোঁটা নিকোটীন খাওয়াইলে—কয়েক মিনিট মধ্যেই কুকুরটী মারা যাইয়া থাকে।

কিছুদিন আগে "লণ্ডন-ল্যান্সেট্" নামক পত্রিকায় সিগারেট সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে লেখক লিখিয়াছিলেন যে, সিগারেট ধূমে—নিকোটীন ছাড়া ও এল্ডিহাইডস্, এক্রিলাল্ডিহাইড্ এবং এক্রোলিন নামক ক্ষতিকর পদার্থও আছে। এই সমস্ত পদার্থ অত্যন্ত উত্তেজক এবং পরে অবসাদক।

এল্ডিহাইডস্ ব্যবহারে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহে কম্পন উপস্থিত হয় এবং পেশীসমূহের অক্ষেপ আরম্ভ হইতে থাকে। যাহারা অধিক সিগারেট ব্যবহার করে—তাহাদের হস্ত-লেখায় এই কম্পনের প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বেশী সিগারেট ব্যবহারের ফলে নিকোটীন্-বিষ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছা রোগ ও শারীরিক গ্লানি আনয়ন করে।

বিখ্যাত মার্কিণ চিকিৎসক ডাঃ কেলগ্ বলেন যে, তামাক দ্বারা বর্দ্ধনশীলতার ক্ষতি হয় ও মস্তিষ্ককে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করিয়া তুলে। এই সমস্ত কারণে—অধুনা মার্কিণদেশের নানাস্থানে, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জাপান, ক্যানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে আইন করা হইয়াছে যে, ২০ বৎসরের ন্যূন বয়স্কদিগকে ধূমপান করিতে দেখিলেই আইনতঃ তাহারা দণ্ডনীয় হইবে।

৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে জাপানে তামাকের প্রচলন আরম্ভ হয়। তখন মূল্যবান ঔষধ-জ্ঞানে জাপান—তামাককে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কিন্তু জাপান শীঘ্র তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিল। তামাকে যে তাহাদের ভবিষ্যত একেবারে নষ্ট করিতে বসিয়াছে—তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল; বুঝিতে পারিল বলিয়াই তাহার সংশোধনের জন্য তাহারা সকলে মিলিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল। জাপান দেখিল যে, তামাক-সেবন ব্যাপার একটী জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করিতে না পারিলে জাপান হইতে তামাক নির্ব্বাসিত হইবে না। জাপানীরা তামাকের বিষময় ফল বুঝিতে পারিয়াই ছেলেদের মধ্য হইতে ধূমপান কু-অভ্যাস নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন আরম্ভ করিল। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে

জাপানী পার্লামেণ্ট আইন জারী করিলেন যে, ২০ বৎসরের কম বয়স্ক বালক ও যুবকেরা তামাক সেবন করিলে আইনতঃ দণ্ডণীয় হইবে।

জাপানী পার্লামেণ্টের অন্যতম সভ্য অনারেবল্ মিষ্টার নিমেটি ঐ সময়ে বলেন যে, অহিফেনের ন্যায় তামাকেও মাদকীয় বিষ আছে। এই বিষে শরীরের নাড়ী (nerve) সকল অবসাদগ্রস্ত ও ছেলেদের মানসিক শক্তি হ্রাস করিয়া দেয়। এই জন্যই তিনি জাপানের জাতীয়তা রক্ষার্থে (পার্লামেণ্ট্ হইতে ধূমপান বিষয়ক এই বিধি নিষেধ প্রচার করিতে সবিশেষ উদ্যোগী হয়েন। জাপানবাসী এই আইনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই ইহার গৌরব অক্ষরে অক্ষরে অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে সকলে মিলিয়া আইনের আদেশ অবনত মস্তকে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিল; তাই আজ ৺হেমচন্দ্রের যুগের অসভ্য জাপান স্বাস্থ্যে গৌরবে, মহিমায়, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, সভ্যতায় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আর হেমবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়"।

জানি না আবার কতদিনে স্বাস্থ্য-শান্তি-শক্তির শুভ্র পতাকা ভারতের ক্ষত বিক্ষত বক্ষে উড্ডীন হইতে আরম্ভ হইবে। জানি না কতদিনে কত যুগ পরে ভারত-ক্ষেত্র হইতে মহাকালের ভৈরব নিনাদ, মৃত্যু ও রোগের তাণ্ডব নর্ত্তন একেবারে অন্তর্হিত হইয়া আবার শান্তি স্বাস্থ্য শক্তির শীতল ধারা প্রবাহিত হইবে।

তামাকের কুফলঃ—তামাক ব্যবহার করিলে "তামাক-বিষ-সঞ্চিত হৃৎপিণ্ড-পীড়া" নামক এক প্রকার 'পীড়া হয়। ইংরাজীতে সাধারণ ভাষায় ইহাকে 'টোব্যাকো-হার্ট' বলে। সাধারণ লোকের হৃৎ-স্পন্দন ও তামাক-ব্যবহারকারীর হৃৎস্পন্দন উভয়ের তুলনা করিলেই সহজে ইহা বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই ফুটবল, টেনিস্, কুস্তি ইত্যাদি খেলোয়াড়দিগকে ওস্তাদেরা ধূমপান ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। তামা সেবীর নাড়ীর গতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়।

তামাক আয়ু ক্ষয় করে।

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সিগারেট সেবন কালে নাড়ীর গতি ৬০ বা ৭০ হইতে ১২০—১৩০ পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে এবং চুরুট বা সিগারেট শেষ হইতে না হইতে নাড়ীর গতি ৪০এ আসিয়া দাঁড়াইবে; সুতরাং তামাক ক্ষণিক উত্তেজক হইলেও ইহা যে হৃৎপিণ্ডের অবসাদক তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তামাক হৃৎক্রিয়াকে দুর্ব্বল করে বলিয়াই ইহা দ্বারা আয়ুক্ষয় হয়, জীবনী-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

তামাক অন্যান্য নেশা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

তামাক-সেবীরা অতি অল্পেই অন্য নেশার অধীনস্থ হয়। যে দেশে তামাক বেশী ব্যবহৃত হয়, সে দেশে সুরা-পানও বেশী চলে। প্রায় সকল সুরাপায়ীই তামাক-সেবী এবং তাহাদের অনেকেই জীবনের প্রারম্ভে তামাক আরম্ভ করিয়া সুরায় জীবন শেষ করে।

বহু দেশ-পর্য্যটক মার্কিণ চিকিৎসক ডাঃ ডি, এইচ, ক্রেশ এই কথা বহু স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরাও বহু স্থলে দেখিয়াছি।

তামাক সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভিমত।

চিকিৎসা বিজ্ঞান আলোচনা করিলে তন্মধ্যে তামাকের অপকারিতা সম্বন্ধে বহু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

তামাকের অপকারিতা পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসক সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান তামাকের অপকারিতা সম্বন্ধে কি বলে তাহাই আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

(ক) তামাক-জনিত অন্ধাত্ব—মাঞ্চেষ্টার রয়েল্ আই-হস্পীটাল্ নামক চক্ষুরোগের হাসপাতালের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ম্যাকনব্ বলেন যে, সপ্তাহে ১২—২ আউন্স তামাক ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয় এবং ক্রমশঃ অন্ধত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। ডাক্তারী কথায় ইহাকে "টোব্যাকো এ্যামারোসিস্" পীড়া বলে।

(খ) তামাক-জনিত পক্ষাঘাত—পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, তামাক ব্যবহারে শরীর অবসাদগ্রস্ত হয়। চিকিৎসকেরা বলেন যে "ক্রিপিং-প্যারালিসিস" বা "মৃদু পক্ষাঘাত" নামক পীড়া অনেক সময়ে তামাক ব্যবহারের ফলেই হয়। অত্যধিক ব্যবহার করিলে—"লোকোমোটর এটাক্সিয়া" বা "কশেরুকা-মজ্জার-ক্ষয়" নামক রোগ জন্মিতে পারে; এই রোগক্রান্ত রোগী হাঁটীবার সময় ঠিক ভাবে হাঁটীতে পারে না মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে।

(গ) ধূম্রপান-জনিত কর্কট রোগ—অতিরিক্ত ধূম্রপানকারীদের "ক্যান্সার" বা কর্কটীকা রোগ হইতে পারে। ইহাকে "স্মোকার্স ক্যান্সার" বলে। ইহা সাধারণতঃ ওষ্ঠে বা জিহ্বার অগ্রদেশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদিও ইহা সকলেরই হয় না তথাপি যাহা বিপদ্জনক—তাহা সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বসময়েই পরিত্যজ্য।

(ঘ) ধূম্রপানের পরিণামে যক্ষ্মা ও কাশ রোগ—ঘরে ধূম লাগিলে যেরূপ ঝুল পড়ে, ঠিক সেইরূপেই, তামাকের ধূমে শ্বাস নলীতে ও ফুস্ফুস্ মধ্যে এক প্রকার পীতনীলাভ ময়লা পড়ে। এইরূপে অনেক সময়ে ইহা হইতেই নানাবিধ শ্বাসযন্ত্রের পুরাতন পীড়া, কাশ রোগ—এমন কি অসাধ্য যক্ষ্মা রোগও উৎপন্ন হইতে পারে।

(ঙ) তামাক নাড়ীসমুহের পীড়ার (nervous disease) উৎপাদক—আমেরিকার তামাক-নিবারণী সভা বলেন যে, তামাক দ্বারা নানাবিধ নাড়ীয় পীড়া উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই জন্যই বঙ্গদেশের অধিকাংশ যুবকই নাড়ী-বিকার বা তথাকথিত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ভুগিয়া থাকে।

(চ) তামাক অজীর্ণ রোগোৎপাদক—বহু অজীর্ণ রোগেরও মূল কারণ—তামাক সেবন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার মেন্ডেল্সন্—"মিলিটারী মেডিক্যাল্ একাডেমি" নামক বিদ্যালয়ের এক হাজার ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, তামাক-সেবীদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগেরই ফুস্ফুসের ও পাকস্থলীর পীড়া অল্পাধিক বর্ত্তমান আছে।

(ছ) তামাক সেবন-জনিত গল-ক্ষত—বা "স্মোকার্স সোরথ্রোট্"। তামাক ব্যবহারে স্বর-যন্ত্রের ক্ষতি হইয়া থাকে এবং পরে গলক্ষত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। তামাক সেবীর স্বর কর্কশ ও রূঢ় হয়।

(জ) তামাক ঘ্রাণশক্তি ক্ষীণ করে—তামাক সেবনে ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হয়। বিস্তৃত পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, তামাকের বিষ ঘ্রাণশক্তির হ্রাস করে। ধূমপায়ীদের এই দুর্ব্বলতা শীঘ্রই দেখা যাইয়া থাকে। দোক্তা ও তামাকে আস্বাদন শক্তিরও যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে।

তামাক সম্বন্ধে নানাবিধ মত—

আমেরিকার ইয়েল-বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়ামকার্য্যের পরিচালক বলেন যে, বহু পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বর্দ্ধিষ্ণু বালক ও যুবক যুবতীদের পক্ষে ধূম-পান বিশেষ ক্ষতিকর। ধূমপায়ীদের শরীরের সম্পূর্ণ গঠন হয় না এতদ্ভিন্ন ইহাদের ফুসফুস্ও খারাপ হইয়া যায়। বাড়ন্ত যুবকদের পক্ষে 'নিকোটীন্' (তামাক-বিষ) অত্যন্ত ক্ষতিজনক।

আমেরিকার ধূমপান নিবারণী সমিতির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পরলোকগত ডাঃ পল্সন্ বলেন যে, যে বালক বাল্যাবস্থা হইতে সিগারেট-ধূমপান আরম্ভ করে, সে এ জগতের বিশেষ কোন উপকারে আসে না। বাস্তবিক পক্ষে সিগারেট ধূমপায়ী বালক করুণার পাত্র।

সার বেঞ্জামিন-ব্রডি বলেন যে, ধূমপানে যেরূপ ৩য় ও ৪র্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পৈতৃক মন্দ অভ্যাসের অপকারিতা দেখা যায়, তদ্রূপ অন্য কিছুতেই দেখা যায় না।

সুবিখ্যাত আবিষ্কারক মিঃ এডিসন বলেন যে, সিগারেটে "এক্রোলিন" নামক যে বিষ পাওয়া যায়, তাহা অনেকের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকারী। যে কাগজ দ্বারা সিগারেট মোড়া থাকে, সেটীতে অগ্নি সংযোগ করিবামাত্রই "এক্রোলিন" উৎপন্ন হয়। ইহাতেই ধূমপানে উত্তেজিত করে। মিঃ এডিসন অনেক স্থলে দেখিয়াছেন যে, এই এক্রোলিনের ক্রমাগত ব্যবহার বালকগণকে পাগল করিয়া দেয়। এক্রোলিনের ভয়ানক ক্ষতিকর কুফল বোধগম্য করা দুঃসাধ্য; তথাপি যখন

কোন যুবক বা বালক সিগারেট ব্যবহার করে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে এই বিষ দেহ-মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকে।

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি, এল, মেলন বলেন যে, ২৪ বৎসর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া তাঁহার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, বাড়ন্ত যুবকদের পক্ষে তামাক বিশেষ অনিষ্টকারী।

কেবল মাত্র ১৯১৪ সালে আমেরিকায় ১৪,৫৩০,৪৮৬,২০০টি সিগারেট ব্যবহৃত হইয়াছে। আমেরিকায় এই বৎসরে সিগারেটের জন্য ৪২,৪৫,৫৯,১৯০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

পাঠক! বঙ্গদেশে এই সিগারেট-অনলে কত শত টাকা প্রতি বৎসর ভস্মীভুত হইতেছে—তাহার কোনও সংবাদ রাখেন কি? কেবল মাত্র ১৯১১ সালেই মুঙ্গের সিগারেট ফ্যাক্টরীতে ২৮২৮ টন (২৮২৮ × ২৭ = ৭৬৩৫৬ মণ) সিগারেট প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা কেবল মাত্র একটী কারখানায় ১৯১১ সালের সংবাদ। এখন বোধ হয় সেখানে অন্ততঃপক্ষে বৎসরে এক লক্ষ মণ সিগারেট তৈয়ারী হইয়া থাকে।

দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ের এক শিলিগুড়ী ষ্টেশনেই ১৯০৭ সালে ৫৯১৪ মন সিগারেট বিক্রয় হইয়াছিল; ১৯১০ সালে ৭০১২ মন বিক্রয় হইয়াছিল অর্থাৎ সংখ্যায় ২০ কোটি সিগারেট। ইহা কেবল এক ষ্টেশনেরই খবর। সমগ্র বঙ্গদেশের ষ্টেশনে, বাড়ীতে, হাটে, বাজারে, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কত কোটী সিগারেট বিড়ি ইত্যাদি পোড়ান হইতেছে,—যদি আমেরিকার মত হিসাব রাখা হইত, তাহা হইলে তাহার সংখ্যা দেখিয়া অতি বড় বীরচেতা হিসাবিকেরও আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আমরা প্রত্যহ কত কোটী টাকা যথা অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছি। যদি এই অজস্র টাকা শরীর ও মনের হানিকর পদার্থে ব্যয়িত না হইয়া, দেশের দীন-দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করা যাইত, তাহা হইলে ভারতে আর বোধ হয় দ্বিতীয়বার দুর্ভিক্ষ হইবার আশঙ্কা থাকিত না।

দার্জ্জিলিং, কার্শিয়াং প্রভৃতি স্থানের ও নিকটবর্ত্তী চা বাগানের পার্ব্বত্য কুলীদের মধ্যে সিগারেট-পান একটা মজ্জাগত অভ্যাসের মধ্যে দাড়াইয়া গিয়াছে। কার্শিয়াং-এর নিকটবর্ত্তী কতিপয় চা-বাগানের মেডিক্যাল অফিসার রূপে প্রায় ৩ বৎসর কাল কার্য্য করিয়াছি; এই সময়ে, ওই পার্ব্বত্য কুলীদের আচার-ব্যবহার উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। আমি বেশ ভালভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, সিগারেট ব্যতীত ইহাদের আদৌ চলিবে না। বরং ভাত না খাইয়া ইহারা ২।১ দিন উপবাস করিতে প্রস্তুত আছে; কিন্তু সিগারেট ব্যতীত ইহাদের ২।১ ঘণ্টাও অতিবাহিত হওয়া কঠিন। ইহারা আহারাদি অতি সামান্যই করিয়া থাকে এবং যাহা কিছু ব্যয় এক ঐ সিগারেটের জন্যই। এই সমস্ত কুলী দৈনিক ৶১০—।৵০ আনা উপার্জ্জন করে; কিন্তু দৈনিক /১০—৵০ আনা ইহারা সিগারেটেই ব্যয় করিবে। আমার একটী এ দেশীয় ঝি ছিল, সে ৫৲ টাকা বেতন পাইত; কিন্তু প্রতিমাসে সে ৩৲ টাকার সিগারেটই খাইত। কার্সিয়াং বা দার্জ্জিলিং-এর এই সমস্ত কুলী জাতির মধ্যে "ব্যাটল য়্যাক্স" (Battle Ax) নামক এক প্রকার অতি কম মূল্যের সিগারেট অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইত। ১ বাক্স (৬টী সিগারেট) সিগারেটের মূল্য ৫ পয়সা। আমার বোধ হয়, এই জাতিটার মধ্য হইতে সিগারেট সেবনটা উঠিয়া গেলে ইহারা মানুষ হইতে পারিত। ইহাদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। যক্ষ্মায় মৃত্যু-সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদের মধ্যে পঞ্চম বর্ষের দুগ্ধপোষ্য শিশু, স্ত্রী-পুরুষ, সকলের মুখেই সেই প্রজ্জলিত সিগারেট। যে গরীব পরাধীন দেশের অধিবাসীরা এতগুলি টাকা প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, সে দেশের লোক যদি অনশনে, উলঙ্গ অবস্থায় কুকুর বিড়ালের মত না মরে, তো কাহারা মরিবে?

দিনাজপুর, রংপুর, প্রভৃতি স্থানের কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় যে, পিতা-পুত্রে নির্ব্বিকার চিত্তে একই

হুকায় তামাক খাইতেছে, তাহাতে কোনও সঙ্কোচ-ভাব নাই। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্কুলেই তামাকের অপকারিতা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলে বোধ হয় ভাল হয়। গ্রামের শিক্ষিত যুবকেরা যদি আলস্যে তাস-পাশায় সময় নষ্ট না করিয়া, নিজ নিজ গ্রামে তামাক-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে তামাকের অপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা হইলে বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে এই প্রশ্নের কিছু মীমাংসা হইতে পারে।

এ সম্বন্ধে আরও ২।১টী কথা বলিয়া অদ্যকার আলোচ্য বিষয় সমাপ্ত করিব। ধূমপায়ীদিগকে—সভা-সমিতিতে সাধারণ লোকের সহিত একত্রে বসিতে নিষেধ করা হয়; কারণ সিগারেটের অগ্নিতে বহু বিপদ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতায় ট্রাম গাড়ীতে ধূম-পায়ীকে পশ্চাতের বেঞ্চিতে বসিবার নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে এ মন্দ অভ্যাস কি না করিলেই নয়? তামাক দ্বারা যখন জগতের অপকার ব্যতীত কোন উপকার হয় না, তখন এ মন্দ অভ্যাসটী একেবারে পরিত্যাগ করিলে দোষ কি?

আমেরিকার কোনও তামাক-ব্যবসায়ী তাঁহার পৌত্রের জন্য ১৫০,০০০৲ ডলার রাখিয়া যান এবং এই ভাবে উইল করিয়া যা'ন যে, পৌত্রটী ৩০ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কোন প্রকার মাদক বা তামাক ব্যবহার করিলে এই টাকা পাইবে না। নিজে তামাক ব্যবসায়ী হইলেও ইনি ইহার প্রকৃত অপকারিতা বুঝিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

পাঠক! তামাক ও সিগারেট সম্বন্ধে বোধ হয় আর কিছু বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। তামাক বঙ্গদেশকে যেরূপভাবে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে—তাহাতে মনে হয় যেন ইহা ১টী জাতীয় প্রথা হইয়া দাড়াইয়াছে। চীন যেরূপ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশ হইতে অহিফেন উৎপাটন করিবার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছে, আমাদের দেশেও সেইরূপ না করিলে ঐ তামাক-রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও উপায় নাই। প্রথমে যখন চীন দেশে অহিফেন চাষ আরম্ভ হইল, তখন ইহা "স্বর্গ-প্রেরিত ঔষধি" নামে আখ্যাত হইয়াছিল। যত দিন অহিফেন অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হইত—ততদিন ইহার মন্দ ফল বিশেষভাবে কেহ বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু যেই অহিফেন সর্ব্ব সাধারণে অতিমাত্রায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, তখনই ইহার বিষময় ফল নেতৃবৃন্দ সকলে উপলব্ধি করিলেন। আর সকলেই বুঝিল—ইহা "স্বর্গ-প্রেরিত ঔষধ" নহে, পরন্তু ইহা জাতীয় জীবনের পরম শত্রু—স্বাস্থ্যনাশের গোপন বিষ। সুতরাং চীন গভর্ণমেণ্ট অবশেষে বার্ষিক নয় কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি-স্বীকার করিয়াও সমগ্র চীন জাতিকে এই গোপন-বিষের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তথা হইতে ইহাকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

যদিও বঙ্গদেশে ছোট ছোট ছেলেদের ধূমপান নিবারণ জন্য সম্প্রতি আইন পাশ হইয়াছে; তথাপি শিক্ষিত সমাজের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আইন যাহাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়, যাহাতে সুদূর পল্লীগ্রামেও বাস্তবিক এই আইন-অনুযায়ী কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। এ কাজ একেলা করিলে চলিবে না; সকলে সমবেত চেষ্টা না হইলে এই সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান বজায় থাকা অসম্ভব। অধুনা সিগারেট, তামাক, চুরুট, জর্দ্দা ইত্যাদি শিষ্টাচারের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এ প্রথাটীও—বিশেষ চেষ্টা করিয়া উঠাইয়া দিতে হইবে। বাঙালী জাতি ক্রমশঃ শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; এই সময়ে জন-নায়কগণের—এই ভীষণ কুপ্রথার দিকে দৃষ্টিপাত করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। চীন হইতে যেরূপ অহিফেন প্রায় সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে, প্রকৃত মঙ্গল ও দেশের উন্নতি চাহিলে, বাঙলা দেশ, শুধু বাঙলা কেন—সমগ্র ভারত হইতেই ঠিক সেইরূপ ভাবেই তামাকের ব্যবহার উঠিয়া যাওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। জানি না, এই অভিশপ্ত প্রথার অবসান কত দিনে হইবে!

(ক্রমশঃ)

গো-সেবা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[রায় সাহেব ডাঃ শ্রীদিবাকর দে, জি, বি ভি, সি,]

গো পরিচর্য্যা ও গো-শালা

আমাদের দেশে যে সংখ্যক বৃষ, বলদ ও গাভী আছে, তাহার উন্নতি বিধান করিতে পারিলেও অনেকটা কাজ করা হয়। সংখ্যাধিক্যই অধিকতর লাভের নহে। তাহাতে কয়েকটী অসুবিধা ঘটে। অল্প সংখ্যক হইলেও বলদ বা গাভী যদি উৎকৃষ্ট জাতীয় হয়, তাহা বহু সংখ্যক দুর্ব্বল নিকৃষ্ট জাতীয় বলদ বা গাভীর সহিত একক্ষেত্রে পরিশ্রম ও অপর ক্ষেত্রে দুগ্ধ দান করিতে সক্ষম। অল্প সংখ্যক পশু হইলে স্থান অল্প লাগে, আহার পরিমাণে কম হইলে চলে, এবং সেবার জন্য অল্প সময় ও পরিশ্রম লাগে। মহামারী রোগ প্রভৃতি হইলে অল্প সংখ্যক পশু পৃথক রাখিবার বা স্থানান্তর করিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

কোনো জাতির উন্নতি করিতে হইলে বৎসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়; কারণ শিশুই জাতির জীবন, জাতির শক্তি। সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ তাহাদেরই ক্ষতিবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে।

প্রথম হইতেই বৎস রক্ষার দিকে মনোযোগী হওয়া উচিৎ। সেজন্য গাভী প্রসব হইবার পর হইতে যাহাতে বৎসের কোন ব্যাধি প্রভৃতি হইয়া দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রসব হইবার পর দশ দিন গৃহের শিশু-বালক-বালিকার জন্য ঐ দুগ্ধ ব্যবহার না করাই ভাল; সে সমস্ত দুগ্ধ অত্যন্ত গাঢ় থাকে। কিন্তু সমস্ত দুগ্ধ বৎসকে পান করিতে দিবেন না, তাহাতে দুগ্ধ পরিপাক না হইয়া অজীর্ণ উৎপত্তি করে।

প্রসবের পর বাছুর উঠিয়া দাঁড়াইবার পর, তাহার পেট হইতে এক ইঞ্চি পরিমাণ বাদ রাখিয়া নাভীতে একটী সুতা জোর করিয়া বাঁধিয়া, তাহার অব্যবহিত উপরিভাগে ধারাল কাঁচি দিয়া (পূর্ব্বে সিদ্ধ করা) নাড়ীচ্ছেদ করিয়া, টিংচার আয়োডিন দিয়া দিবেন। নাড়ী বিশেষ বড় থাকিলে তাহা দ্বারা শরীরে বহু প্রকার রোগ প্রবেশ লাভ করে।

বৎস দেড় মাসের হইলে, তাহাকে অন্যান্য খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। দুই মাস পর্য্যন্ত গাভীর একটী বাঁটের সমস্ত দুধ বৎসকে পান করিতে দিতে হয়; তাহার পর উপযুক্ত পরিমাণ ফেন বা ক্ষুদ সিদ্ধ, কাঁচা কচি ঘাস প্রভৃতি সচ্ছন্দে দেওয়া যাইতে পারে। পুরাকালে ঋষিগণ বৎস পান করিবার পর যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিত, তাহা ব্যবহার করিতেন।

গোবৎসকে দৌড়াদৌড়ি করিতে দিবার সুযোগ দেওয়া উচিৎ। একমাস পর্য্যন্ত বাছুরকে বাঁধিয়া রাখিতে নাই, শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য জন্ম হইতেই সংস্কার তাহাদিগকে লাফালাফি করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছে।

গাভীর জন্য পালককে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। অল্প অযত্নে গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে।

যাহাতে স্বচ্ছন্দে আহার ও ভ্রমণের সুযোগ পায়, সেই প্রকার ব্যবস্থাই করা উচিৎ। গাভী যত কম বাঁধা থাকে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল।

গর্ভাবস্থায় গাভীর যত্ন একটু বিশিষ্ট প্রকারের হওয়া উচিৎ। যাহাতে প্রসব বিনা কষ্টে সম্পন্ন হয়, সে জন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। তাহাতেই অধিকাংশ সময়, প্রসবের আনুসঙ্গিক বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। সে জন্য গাভীর প্রতি অতিরিক্ত যত্ন লইবার কারণ নাই। ইহাতে তাহাদের স্বভাবদত্ত সুবিধাগুলি অন্তর্হিত হইয়া অধিকমাত্রায় মানুষের উপর নির্ভর করিতে শিখায়।

প্রথম ছয় মাস সাধারণ ভাবেই আহারাদি চলিবে এবং সাধারণ পরিশ্রম হইতে বিরত করিবার প্রয়োজন নাই। গর্ভাবস্থা যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই গাভী যাহাতে শান্ত ভাবে থাকিতে পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। গর্ভবতী গাভীকে যাহাতে অন্য কোন গাভী বা বৃষ বিরক্ত না করে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিৎ। পুং-সঙ্গ এ অবস্থায় একেবারে নিষিদ্ধ। ছয় মাস গর্ভাবস্থা হইতে প্রসব কাল পর্য্যন্ত গাভীকে আর গোচারণে না পাঠানই ভাল। তবে ব্যায়াম একেবারেই বন্ধ করা ভাল নহে। বস্তুতঃ অধিক মাত্রায় যত্ন বা একেবারে অযত্ন, উভয়ই ব্যবস্থা গর্ভস্রাব ঘটাইতে পারে।

আহারাদি বিষয়ে গর্ভের প্রথম কয়েক মাস বিশেষ যত্ন না লইলেও চলে। এমন কি সাধারণ আহার্য্যই উপযুক্ত। এ অবস্থায় গাভীর জন্য বিশেষ ব্যয় করার কোন প্রয়োজন নাই; তাহাতে মোটের উপর পালককে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। কিন্তু গর্ভাবস্থা যতই অগ্রসর হইতে থাকে, আহারাদি বিষয়েও দৃষ্টি ততই প্রখর করিতে হয়। "ছাতাধরা" বা অধিক তৈলাক্ত খাদ্য একেবারে অনুপযোগী। যতদূর সম্ভব টাট্কা সহজপাচ্য খাদ্য দেওয়া বিধেয়। অধিক মাত্রায় আহার হেতু গাভীর দেহ স্থূল হইতে থাকে; তাহাতে প্রসবের বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারে। নির্ম্মল পানীয় জল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া উচিৎ, এবং প্রখর রৌদ্রে বা হিমে থাকিতে দিবে না।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় স্থানে থাকিতে দিবে। ঐ সময় লোকজন তামাসা দেখিবার জন্য আসিয়া যেন ভিড় না করে, এবং কোন রকমে যাহাতে বিরক্ত না করে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন।

ফুল পড়া না পর্য্যন্ত কোন রকমে বিরক্ত করিবে না। যদি ফুল পড়িতে বিলম্ব হয়, অর্দ্ধখণ্ড ইট বা অল্প ওজনের অন্য দ্রব্য নাড়ীতে (বিলাতে মেয়েদের নূতন জুতা নাড়ীতে বাঁধিয়া দেয়) বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিতে হয়, ওজন যেন খুব বেশী না হয়। যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুল না পড়ে, তবে গোচিকিৎসককে সংবাদ দিয়া আনাইয়া ব্যবস্থা করিতে হয়।

প্রসবের পর গুড় একসের, দেশী মদ ৪ আউন্স, ম্যাগ সল্‌ফ অর্দ্ধ পাউণ্ড, শুঠ অর্দ্ধ আউন্স, দু পাঁইট গরম জলে সিদ্ধ করিয়া দুইবারে খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা সুবিধামত না পাওয়া গেলে গুড়, ধান ও বাঁশ পাতা সিদ্ধ দেওয়া যাইতে পারে।

যদি গর্ভস্রাব ঘটে, তাহা হইলে ফুল প্রভৃতি স্থানান্তরে লইয়া গিয়া পুতিয়া ফেলা ভাল। গাভীর যোনিদ্বার, লেজ প্রভৃতি, বা এক আধ সের গরম জলে এক বা আধ ড্রাম বোরিক পাউডার বা টিংচার আওডিন্ মিশাইয়া সুখোষ্ণ অবস্থায় ধোয়াইয়া ও তুলা দ্বারা মুছাইয়া দিবে। পুনরায় গর্ভধারণের সময় উপস্থিত হইলে যাহাতে উপযুক্ত বৃষ দ্বারা গর্ভোৎপাদন হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অনেকের ধারণা আছে, জননকারী ষণ্ডের আহারাদি বিষয় লক্ষ্য করিবার কিছুই নাই, কিন্তু সেটী একটী ভ্রান্ত ধারণা। একটী বৃষই প্রকৃত পক্ষে পালের অর্দ্ধেক। তাহার পেশী ও অস্থি যাহাতে সবল হয়, সেই রকম আহার দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

স্বেচ্ছা বিচরণ ষণ্ডের স্বাস্থ্য-রক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। সকল সময়ে তাহা সুবিধা হইয়া উঠে না; সে ক্ষেত্রে খুব লম্বা রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া, তাহার যথা সম্ভব সীমাবদ্ধ বিচরণের সুবিধা করিয়া দিবে।

বৃষের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। তাহার দেহের বাহ্যতঃ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে, কারণ নির্দ্ধারণে যত্নবান হইতে হয়। রোগী বা অসমর্থ ষণ্ডদ্বারা গর্ভোৎপাদনে বৃষ অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং বৎসও দুর্ব্বল হয়।

ষণ্ড পালনে একটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার—যাহাতে সে তাহার পালককে ভয় করে। অধিক মাত্রায় শাসনের বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও, ক্ষেত্র বিশেষে শাসন, অন্যান্য পশুর ন্যায় সেও মনে রাখে। এ বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়। তাহা না হইলে একটি

বলবান বৃষ পালন করা বিশেষ বিপজ্জনক হইয়া পড়িতে পারে।

চাষের জন্য বলদ প্রয়োজন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অল্পসংখ্যক হইলেও যদি সুস্থ ও সতেজ বলদ হয়, তাহাতে বহু সুবিধা আছে।

বাছিয়া লইবার সময় উপযুক্ত পুরুবৎস লইয়া তাহাকে বলদ করিয়া লওয়া ভাল। বাজারে কেনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় গোবৎস সংগ্রহ করিয়া বলদ করিয়া লওয়া বিশেষ লাভজনক।

বলদ করিতে হইলে তিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে করাই উচিৎ। যদি কোন কারণে বৃষ দ্বারা হল-চালনা করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহার নাকের মধ্যে ফুটা করিয়া একটি তামার আংটা পরাইয়া লইবে, তাহাতে পশু বেশ কর্ম্মঠ থাকে।

সবল রাখিবার জন্য প্রয়োজন মত আহার বিশেষ প্রয়োজন। পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া, বলদের ব্যায়ামের আর স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দরকার করে না। তাহার বিশ্রামেরই বিশেষ প্রয়োজন। মাঠে পরিশ্রম হেতু মুক্ত বায়ুর আর অভাব থাকে না। বিশ্রামের স্থান যাহাতে সুপরিষ্কৃত হয়, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। অন্যান্য পশু অপেক্ষা বলদের পানীয় জল আরও প্রয়োজন।

গোশালা

গোশালা নির্ম্মাণে প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পশুগুলি অঙ্গ সঞ্চালনের ও শয়নের উপযুক্ত স্থান পায়। একস্থানে কতগুলি গরু আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহাদের ইচ্ছ মত অঙ্গসঞ্চালনের অসুবিধা হইলে, গরুর স্বাস্থ্য—মানুষের স্বাস্থ্যের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়। অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে অনেকগুলি আবদ্ধ রাখা অপেক্ষা মাত্র যে-কয়টী রাখিবার স্থান আছে, সেই সংখ্যক পশু রাখা উচিৎ।

কিন্তু সেইজন্য বহুবিস্তৃত স্থান দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা হইলে গরু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আহারের পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া জাব নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

গোশালায় আলো ও হাওয়া যাতায়াত করিবার সুবন্দোবস্ত করা বিধেয়। মাটী হইতে ৬ হাত উচ্চে জানালা বা বায়ু চলাচলের "ফুকর" রাখিবে। ঘর একেবারে চতুর্দ্দিকে মাটির দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা যদি সকল দিক খোলা থাকে, তাহা হইলে মন্দ হয় না। তবে রাত্রিকালে (বিশেষ করিয়া শীত ও বর্ষাকালে) পর্দ্দা প্রভৃতি ফেলিয়া ঘিরিয়া দেওয়া উচিৎ। যাহাদের তাহাতে অসুবিধা আছে, ঝাঁপ দিয়া বন্ধ রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। শীতকালে যাহাতে উত্তর দিক হইতে বাতাস না আসিতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিবে।

মেঝে ইট বা মাটিরই হউক, প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ যে, তাহা অপরিষ্কার ও পিচ্ছিল হইয়া না থাকে। যদি প্রত্যহ ছাই প্রভৃতি দিয়া শক্ত করিয়া পিটাইয়া মূত্র বাহিরে গড়াইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইট দিয়া মেঝে করিবার প্রয়োজন নাই। তবে পশুর শয়নে কোন অসুবিধা না হয়, শরীরে ময়লা লাগিয়া অস্বস্তি বোধ না করে, ইহার জন্য যদি ইট বা বালির দিয়া মেঝে নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় তাহাও করা উচিৎ।

(ক্রম-ঢালুতাযুক্ত) সমতল মেঝে হইলে গোশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিশেষ সুবিধা হয়। মাঝে মাঝে মেঝে বেশ করিয়া ফিনাইল প্রভৃতি দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া দোষশূন্য করিয়া দেওয়া দরকার; তাহাতে অনেক সংক্রামক রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে।

মূত্র যাহাতে ঘরের মধ্যে জমিতে না পারে, এমন ভাবে নালা কাটিয়া দূরে লইয়া যাওয়া ভাল। গোমূত্র একটি অতি উৎকৃষ্ট সার, তাহা কোন মতে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিৎ নহে। গোশালা হইতে অন্ততঃ বিশ গজ দূরে, একটা বাঁধানো গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোমূত্র গোশালা-ধোওয়া জল পড়িবার বন্দোবস্ত করিবেন। গর্ত্তটীর যাহা হয় কিছু একটা আবরণের বন্দোবস্ত করিবেন এবং সপ্তাহে এক বা দুই দিন স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যদি নিকটে চাষ করিবার মত জমি থাকে, নালা কাটিয়া একেবারে সেখানে লইয়া যাইতে পারিলে ব্যয় লাঘব হয়। গোময় গোয়ালের মধ্যে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে বেশী দিন জমা হইতে দেওয়া উচিৎ নহে। ঘুঁটে প্রভৃতির জন্য যতটা পরিমাণ দরকার, তাহা লইয়া সারের জন্য তাহা একটী গর্ত্তে ফেলিয়া রাখা দরকার।

গোশালার মধ্যে জাব নার পাত্রগুলি, একটু দূরে দূরে সন্নিবিষ্ট হওয়া ভাল; পাত্রগুলি খুব উচু বা নীচু হওয়া ভাল নহে। রাত্রে একটি অপরটীর পাত্র হইতে জাব্ যাহাতে না খাইতে পারে সেই বন্দোবস্ত করিবেন।

গোশালার প্রত্যেক অংশই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার "মেঞ্জার" (আহারের পাত্র) উপর। যাহাতে পাত্রে ময়লা জল প্রভৃতি জমিয়া না থাকে, স্বতপরতঃ সেই চেষ্টা করিবেন। সম্ভব হইলে দিনে দুইবার পাত্র একেবারে ধুইয়া ফেলিয়া, তবে তাহাতে জাব দিবেন। প্রত্যেক পশুর জন্য দুইটী পাত্র থাকা দরকার। প্রত্যেক পাত্র ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন, তাহাতে অনেক উপদ্রবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

স্থান সঙ্কুলান হইলে বাছুর থাকিবার খোঁয়াড় মাতার নিকটে হইলে ভাল হয়; বিশেষতঃ বাছুর যখন ছোট থাকে, তখন মাতাকে নিকটে পাইয়া উভয়েই শান্তভাবে থাকিতে পারে।

বহু পরিসর গোশালা হইলে জাব দিবার খড়কুটা, খইল প্রভৃতি ভিজাইবার পাত্র গোশালার এক পাশে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, জাব দিবার সময় অনেক পরিশ্রম ও সময় বাঁচিয়া যায়।

আমরা গোয়াল ঘরে ঝুলানো পর্দ্দা বা ঝাঁপের কথা বলিয়াছি; এ ক্ষেত্রে শীত কালে, তাহাদের পিঠে এক-খানি ছোট পাতলা কম্বল বা ক্যাম্বিস-কাপড় বা চট ঢাপা দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়।

বলদ ও ষাঁড় পৃথক গোশালায় রাখার বন্দোবস্ত করিতে হয়, বিশেষতঃ ষাঁড়ের জন্য পৃথকস্থান হওয়া একান্ত দরকার। গাভী অতি সন্নিকটে বাঁধা থাকিলে, তাহাদের নানাভাবে বিরক্ত করিতে পারে এবং যদি কোন রকমে বন্ধনমুক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে কেবলমাত্র বিরক্ত করা নয়, গোয়ালের মধ্যে নানা রকম উৎপাত করিয় গৃহস্থের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে।

আমাদের দেশে, রাত্রে এবং দিনেরও কতক সময় গরুকে একেবারে অনাচ্ছাদিত স্থানে রাখা উচিৎ নহে। গোশালার চালের জন্য গোলপাতা, খড়, উলু এবং সম্ভব হইলে টিনের ছাদ করা ভাল। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধোঁয়া দেওয়া উপলক্ষে গোশালায় মাঝে মাঝে আগুণ লাগিয়া যায়; সে জন্য উলু ও খড় চালের জন্য অনেকটা অনুপযোগী। গোলপাতা উহাদের মত সহজ-দাহ্য নহে।

এই আগুনলাগা সম্পর্কে আরও একটু সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল। প্রত্যহ দুর্ঘটনা না হইলেও, অনেক সময় ঘটা আশ্চর্য্য নহে। সেজন্য এক গোশালার মধ্যে অধিক সংখ্যক গরু রাখা উচিৎ নহে, এবং খোঁটাগুলি এমন স্থানে হওয়া উচিৎ, ও বাঁধনগুলি এত সহজ হওয়া উচিৎ, যাহাতে বিপদ উপস্থিত হইলে পশু বাহিরে আনিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা না হয়।

নিয়মিতভাবে গোশালা পরিষ্কার রাখার যেমন প্রয়োজন সেইরূপ যাহাতে ডাঁশ মশা মাছি প্রভৃতি বিশেষ উত্যক্ত না করে, সে বিষয়েও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হয়। অবশ্য গোশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে মাছি প্রভৃতির হাত হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। সখের দেশে সৌখীন মানুষ গাভীর জন্য মশারির ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমাদের হতভাগ্য দেশে মানুষেই মশারি পায় না, সেখানে গাভীর জন্য মশারির কথা বলিলে রহস্য করিবার মত শুনায়। কিন্তু সন্ধ্যার সময় ধোঁয়া করিয়া যাহাতে মশকাদি দূরীভূত হয়, সে ব্যবস্থা প্রত্যহই করা প্রয়োজন; সে বিষয়ে অবহেলা করিলে চলিবে না।

গোশালা শুষ্ক ও উচ্চস্থানে হওয়া দরকার। উহা বাসস্থানের খুব দূরে বা অতি নিকটে না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। পানীয় জলাশয়ের যতদূরে হয় ততই মঙ্গল।

গোশালার সংলগ্ন যাহাতে খোলা জমি খানিকটা পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করা উচিৎ; মাঠে চরিতে দিবার সুযোগ বা সুবিধা না থাকিলে সেখানে গরু বাঁধিয়া রাখিলেও উপকার আছে। চতুর্দ্দিক যত ফাঁকা হয় ততই মঙ্গলজনক।

আমার আমেরিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা*

[শ্রীমতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবর)]

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধের পরিণামে পাঠকগণকে এই আশ্বাস দিয়া বিদায় লইয়াছিলাম যে, আমার আগামী প্রবন্ধে জ্যাক্ ডেম্প্‌সী ও বিল ব্রেননের মধ্যে বিজয়-লক্ষ্মীলাভের সেই স্মরণীয় প্রচেষ্টা যতদূর সাধ্য উজ্জ্বলভাবে তাঁহাদিগের সম্মুখে চিত্রিত করিব।

এক্ষণে এই বিখ্যাত মুষ্টি-যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, যে-সকল পাঠক মুষ্টিযুদ্ধ কিরূপ রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে কিছু শুনাইতে চাহি। এক একটি মুষ্টিযুদ্ধে কয়েক 'হাত' খেলিতে হয়; অর্থাৎ এক একটি খেলা কয়টি পর্য্যায়ে বিভক্ত, প্রত্যেক পর্য্যায়ের মধ্যে সামান্য একটু একটু বিশ্রামের অবসর আছে। যাঁহারা সখের মুষ্টিযোদ্ধা, তাঁহাদের খেলার এক এক হাত দুই মিনিট কাল স্থায়ী হয়; যাঁহারা পেশাদার, তাঁহারা এক এক হাত তিন মিনিট ধরিয়া খেলেন। দুই পর্য্যায়ের মধ্যবর্ত্তী বিশ্রামের কাল মাত্র এক মিনিট করিয়া। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক পক্ষ পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়া লন্—তাঁহাদের খেলা কয়টি পর্য্যায়ে বিভক্ত হইবে।

তারপর জেতা নির্দ্ধারণ করিবার দুই রকম রীতি প্রচলিত আছে। একটি প্রাচীন প্রথা—জেতা প্রতিপক্ষকে ঘুষি মারিয়া এমনভাবে টান্‌টান্ করিয়া মাটিতে শোয়াইবে ফেলিবে যে, দশ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত সে যেন উঠিয়া দাঁড়াইতে না পারে, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের দশ সেকেণ্ড কাল মাটিতে পড়িয়া থাকা চাই। বিপক্ষ যেই মাটিতে পড়িলেন, অমনি বিচারক (Referee) এক দুই তিন করিয়া দশ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে গণিয়া যাইবেন; যদি দশ গণিবার পূর্ব্বে বা সঙ্গে সঙ্গে তিনি পায়ের উপর ভর দিয়া না উঠেন, তাহা হইলে তিনি বাজী হারিবেন (counted out).

আর একটি অধুনা-প্রচলিত রীতি—যাহা আমার নিকট কোমলতর বলিয়া মনে হয়, সেটি হইতেছে—পয়েণ্ট্ গণিয়া যুদ্ধের ফলাফল স্থির করা। বিষয়টি আর একটু বিশদভাবে বুঝাইতে গেলে বলিতে হয় যে, রেফারী সুবিবেচনার সহিত আইনসিদ্ধ-ভাবে নানাদিক হইতে দুই পক্ষের মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষমতা ও কলা-কৌশল প্রদর্শনের নোট্ টুকিয়া যান্; উভয় যোদ্ধা কয়বার আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ করিলেন, কয়বার একজন অপর জনকে ভূপাতিত করিলেন, নীতিসঙ্গত কায়দার সঙ্গে কে কতবার তাহা সুদ্ধ সহ ফিরাইয়া দিলেন ইত্যাকার এক একটি মারপ্যাঁচের উপর এক একটি 'পয়েণ্ট' স্থিরীকৃত হয় এবং যিনি যত অধিক সংখ্যক পয়েণ্ট্ লাভ করেন, তিনিই রেফারী কর্ত্তৃক জয়ী বলিয়া বিঘোষিত হন্। আজকাল বড় বড় ভালো ভালো প্রতিযোগিতায় হার-জিত পয়েণ্ট্ গণিয়াই নির্ণীত হয়।

* মূল ইংরাজী হইতে শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু কর্ত্তৃক অনুবাদিত। প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত।

ডেম্প্‌সী ও ব্রেননের মধ্যে যে যুদ্ধ হইল, তাহার ফলাফল পয়েণ্ট্ এর উপর নির্দ্ধারিত হয় নাই, হইয়াছিল দশ-গণার রীতির উপর। ইহা বারো হাত খেলা হইয়াছিল।

প্রথম হাত:—ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে, চিতাবাঘ যেমন তাহার শীকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, ডেম্প্‌সী তেমনি করিয়া ব্রেননের প্রতি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—তাঁহাকে আত্ম-রক্ষার কোনো সুযোগ প্রদান করিলেন না; পরক্ষণেই ডেম্প্‌সী প্রতিপক্ষের চিবুকের উপর বিরাশী সিক্কা ওজনের একটি প্রচণ্ড ঘুষি এমন ভীম বেগে লাগাইয়া দিলেন যে, তাহার গুরুগম্ভীর আওয়াজ সমস্ত প্রেক্ষাস্থল ভরিয়া স্পষ্ট শুনা গেল। ব্রেনন্ আচম্বিত ঘুষি খাইয়া বিল্‌কুল্ হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহার উত্তোলিত হস্ত পড়িয়া গেল, হাঁটুদ্বয় কাঁপিতে লাগিল এবং এমন অবস্থা হইল যে, সকলে মনে করিল—ব্রেনন্ বুঝি প্রথম মুখেই ধুলি চুম্বন করিয়া পরাজয়ের পথ পরিষ্কার করিলেন। কিন্তু ব্যাপার ততদূর গড়াইল না।

মিঃ জ্যাক্ কেয়ারন্স্ ডেম্প্‌সীর ম্যানেজার ছিলেন; তিনিই পাকা জহুরীর মত সর্ব্ব প্রথমে ডেম্প্‌সীর মধ্যে বিজয়ী বীরের প্রচ্ছন্ন গুণ-সমূহ ধরিতে পারিয়া, তাঁহাকে গরিমাময় কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছিলেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে সর্ব্বজয়ী হইতে দেখিয়া মনে মনে যথেষ্ট আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। ঠিক এই মুহূর্ত্তে কেয়ারন্স্ মল্লভূমির প্রান্ত-দেশ হইতে চীৎকার করিয়া ডেম্প্‌সীকে এই সুযোগে অগ্রসর হইয়া আর একটি বজ্র-কঠোর ঘুষি হানিয়া 'কর্ম্ম ফতে' করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রেননের পশ্চাদ্ভাগে সহচররূপে তাঁহার ভাই দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনিও হটবার পাত্র নহেন; তিনিও উচ্চ কণ্ঠে ব্রেননকে ডেম্প্‌সীর কাছ ঘেঁষিয়া নবীন বিক্রমে যুদ্ধ করিতে কহিলেন। চক্ষের নিমেষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্রেনন্ তাঁহার প্রতিপক্ষের নকটতম হইয়া মুষ্টি উত্তোলন করিলেন; ডেম্প্‌সী একবোরে মুখোমুখি যুদ্ধ বাড়াইয়া চলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যুদ্ধ চলিল পূর্ণোদ্দমে।

চেষ্টার ত্রুটি হইল না, কিন্তু ডেম্প্‌সী প্রথম বাজীতে আর কোন মতে ব্রেননকে ধরাশায়ী করিতে পারিলেন না। জ্যাক্ কেয়ারন্স্ ত আপ্‌শোষে ঠোঁট্ কামড়াইয়া গুম্‌রাইতে লাগিলেন, মায়ের চেয়ে যেন মাসীর দরদ বেশী! যাহা হউক, সময় মত ১ মিনিট্ অবকাশের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; ব্রেননের শুভাকাঙ্ক্ষীগণ আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

সত্য কথা বলিতে কি, পহেলা কিস্তীতেই ব্রেনন ভায়া বেশ কিছু কাবু হইয়া পড়িয়াছিলেন; কারণ তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট কোণে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে হইল; তাঁহার সহচরদের মধ্যে কেহ তাঁহার মাথায় বরফ দিতে লাগিল, কেহ বা নাকের নীচে 'স্মেলিং সল্টের' শিশি খুলিয়া ধরিল। ওদিকে জ্যাক্ কেয়ারন্স ডেম্প্‌সীকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে, ব্রেননের মত লোককে প্রথম বাজীতেই কুপোকাৎ করিয়া ফেলা নিতান্ত উচিত ছিল এবং সজোরে উপদেশ দিলেন—দ্বিতীয় বাজী শেষ হইতে না হইতেই যেন ব্রেনন্ 'পপাত ধরণীতলে' হয়। এই সময় দ্বিতীয় বাজী আরম্ভের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় হাত।—ম্যানেজারের হাতে মিঠে-কড়া রকমের বকুনি খাইয়া ডেম্প্‌সীর রক্ত রীতিমত গরম হইয়া গেল; তিনি প্রবল বিক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিয়া ক্রমাগত ঘুষি বর্ষণ করিতে সুরু করিলেন, শত্রুপক্ষের ঘুষির আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করার কথাটুকু একেবারে বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু আইরিশ যোদ্ধা ব্রেনন্ ধরাশায়ী হইবার নামটি পর্য্যন্ত করিলেন না; বরং বুলডগের মত জবরদস্তির সহিত লড়িতে লাগিলেন। দুইজনেই উৎসাহে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

তারপর ডেম্প্‌সী শতচেষ্টা স্বত্বেও বিপক্ষকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া, রাগে গরগর করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ দিতে আরম্ভ করিলেন;

অপর পক্ষে ব্রেননও ডেম্প্‌সীর হাতের ক্রমাগত কাঠখোট্টা রদ্দা খাইয়া যন্ত্রনায় পাগল হইয়া উঠিলেন। এই অধীরতার সংক্রামণ সমস্ত দর্শকদিগের ভিতর মুহূর্ত্তে ছড়াইয়া পড়িল; এই সময় প্রায় প্রত্যেকেই উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কেহ "জ্যাক্ ওকে কাবার্ কর," কেহ "ওটাকে একেবারে শেষ করে' ফেল জ্যাক্", কেহ বা "ফূর্ত্তিসে লাগাও রদ্দা ভাই"...ইত্যাকার শব্দে চেঁচাইতে লাগিল; যে সকল আমেরিকানদের মধ্যে আইরিশ রক্ত ছিল, তাহারা যথাসাধ্য উচ্চু গলায় এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"থবর্দ্দার্ বিল্, পড়্‌লে চল্‌বে না" "বিল্, যুদ্ধে পাল্টা জবাব দাও" "ভুলোনা বিল্ তুমি আইরিশ"...ইত্যাদি।

মল্লক্ষেত্রের চারিধার ঘেরিয়া যে সকল সুসজ্জিতা বড় ঘরের স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন, নিজেদের আভিজাত্য-মর্য্যাদা ভুলিয়া বা জাতি-সুলভ সরমের সীমা অতিক্রম করিয়া, গলা ফাটা চীৎকারে ব্রেননের প্রতি সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই উচ্ছৃঙ্খল উচ্চ কলরবের মধ্যে দ্বিতীয় বাজী খতম হওয়ার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ব্রেনন এমনই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি নিজের নির্দ্দিষ্ট কোণে প্রত্যাগমন না করিয়া ভ্রমক্রমে প্রায় টলিতে টলিতে তাঁহার প্রতিপক্ষের নির্দ্দিষ্ট কোণের দিকে আসিতে লাগিলেন, এই সময় তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে ধরিয়া নিজের স্থানে লইয়া গেলেন এবং আসন্ন বাজীর জন্য নানাভাবে তাঁহাকে তোয়াজ করিতে লাগিলেন।

এক মিনিট অন্তে আবার ঘণ্টা-নিনাদিত হইয়া তৃতীয় বাজীর সূত্রপাত ঘোষণা করিল। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বাজী কমবেশী দ্বিতীয় বাজীরই পুনরভিনয় হইল; সুতরাং ইহাদের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এই বাজীগুলির মধ্যে দুইটি সত্য নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইল যে, জ্যাক্ ডেম্পসীর মত আক্রমণের দ্বিগুণ কাহারও নাই এবং তাঁহার সেই অসহ্য আক্রমণকে অটল স্থৈর্য্যের সহিত হজম করিতে ব্রেননের আর জোড়া নাই। ক্রমশঃ বেশীর ভাগ লোক ব্রেননের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করিতে ও তাঁহার দুঃসাহসিকতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ হাতে এক অচিন্ত্য বিস্ময় সকলকে অভিভূত করিয়া দিল।

ষষ্ঠ হাত।—ডেম্প্‌সী অভ্যস্ত রীতি অনুযায়ী খেলার প্রারম্ভেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রতিপক্ষকে একটি মারাত্মক রকমের ঘুষি বসাইতে গেলেন; কিন্তু এবার ব্রেনন্ সে ঘুষি ব্যর্থ করিতে চকিতে এক পাশে সরিয়া গেলেন্ এবং বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ক্ষিপ্রগতিতে ডেম্প্‌সীর চিবুকের নিম্নভাগ লক্ষ্য করিয়া একটি প্রচণ্ড ঘুষি ঝাড়িলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ব্রেননের যে, ঘুষিটি ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িল না! যদি পড়িত, তাহা হইলে বোধ হয় বিশ্বজয়ের গর্ব্বটীকা সে রাত্রে ললাট বদল করিত। এই আচম্বিত আক্রমণে ডেম্প্‌সী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিস্মিত হইলেন্ এবং ক্ষণকাল ব্রেননের মুখের পানে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া দুই পদ পিছাইয়া গেলেন্। তারপর সেই সুপরিচিত কায়দায় দেহকাণ্ড কোঁকড়াইয়া ঘন-সংঘাত ভাবে ঘুষি-বিনিময়ের জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কে যেন ব্রেননের বুকে সাহসের উৎস-মুখ খুলিয়া দিয়াছিল; তিনি ইহাতে হটিলেন না। ডেম্প্‌সী একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ব্রেনন্ যুদ্ধে অধিকতর সজাগ হইয়া উঠিলেন। তিনি ঘন-সংঘাত ঘুষি-যুদ্ধের ফাঁদে পা দিলেন না—দূর হইতে বজ্র-মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন্। আমার নিকটও এই ধারণা হইল যে, ডেম্প্‌সীর কাছ ঘেঁষিয়া লড়াই না করিয়া, একটু দূরপাল্লায় দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। ব্রেনন্ অবশ্য এ জ্ঞানটি লাভ করিলেন বড় দেরীতে; পাঁচ হাত খেলিবার পর তিনি নিজের ভ্রম-সংশোধন করিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু পূর্ব্ব বাজীগুলির পরিশ্রমে তিনি বেশ একটু কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি তিনি রণ-তুরঙ্গের ন্যায় অশান্ত উদ্যমে কায করিয়া চলিলেন। অবশেষে ষষ্ঠ বাজী নিসংশয়ে ব্রেননের অনুকূলেই শেষ হইল।

সপ্তম হাত।—আশার অরুণ রাগে হৃদয় রঞ্জিত করিয়া, ব্রেনন্ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোন্ হইতে সতেজে মল্লভূমির কেন্দ্রস্থলে লাফাইয়া আসিয়া ডেম্প্‌সীর সম্মুখীন্ হইলেন্। পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রথম আক্রমণ এবার ব্রেননই করিলেন এবং পর পর বেশ কয়েকটা 'গদাগুম্‌সা' ঘুষি প্রতিপক্ষের গাত্রে বসাইয়া দিলেন্। জ্যাক্ মরিয়া হইয়া ব্রেননকে নিকট-যুদ্ধে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ব্রেনন্ সুতীক্ষ্ণ চতুরতার সহিত নিজেকে দূরে রাখিয়া, বেশ তাক্ করিয়া ক্রমাগত কয়েকটী চমৎকার মুষ্ট্যাঘাত প্রদান করিলেন। কিন্তু ব্রেননের মুষ্টিযোগে সে তীক্ষ্ণ-বীর্য্যতার অভাব ছিল—যাহার বলে শত্রুকে কাবু করিয়া মাটিতে ফেলা যায়; পূর্ব্বেকার রণশ্রম যেন তাঁহার শক্তির অনেকাংশ হরণ করিয়াছিল। ষষ্ঠ ও সপ্তম বাজীতে যে চালে ব্রেনন্ খেলিতে লাগিলেন, সেই চাল্ যদি প্রথম হইতেই প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে জ্যাক্ ডেম্প্‌সীর সুনামে সেদিন ঘোরতম মসী পড়িত—"তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়"—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বেশ জাঁকালো রকমের বিজ্ঞান-সম্মত মুষ্টিবাজি ও পাঁয়তাড়ার কসরৎ দেখাইয়া সপ্তম হাত শেষ হইল।

তারপর অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ বাজীতে পুনরুজ্জীবিত ব্রেননের প্রতি বিজয়-লক্ষ্মী সুস্পষ্ট ঢলিয়া পড়িলেন; ইহাতে ডেম্প্‌সীর পক্ষভুক্ত লোকগণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার ম্যানেজার ক্রোধে গস্‌গস্ করিতে লাগিলেন্। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ "কি হয় কি হয়"—এই সংশয়াগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিল; প্রত্যেক হৃদয় যেন সশব্দে দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। খেলার সূত্রপাতে যে-ব্রেনন্ পরাজয়ের প্রান্ত হইতে টলিতে টলিতে ফিরিয়া আসিল, সেই কিনা এখন ভাগ্য-বিপর্য্যয় করিতে বসিয়াছে—ইহা দেখিয়া জ্যাক্ কেয়ারন্স গোচারী ক্ষোভে-লজ্জায়-রাগে প্রায় চুল ছিড়িবার উপক্রম করিলেন। শেষে দ্বাদশ বাজীতে প্রতিযোগিতা চরম সীমায় পহুছিল।

দ্বাদশ হাত।—আশার রঙে রঙীন্ হইয়া—উদ্দীপনার আতিশয্যে ক্ষিপ্ত হইয়া, বিল্ ব্রেনন্ ঘণ্টা বাজাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যাকের দিকে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রায় কোণ-ঠাসা করিয়া ফেলিলেন্। এই অত্যধিক উত্তেজনাই কিন্তু ব্রেননের কাল্ হইল। ষষ্ঠ হাত হইতে ডেম্প্‌সী যে ফাঁদে ফেলিবার জন্য এতবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিলেন্, সেই ফাঁদে ব্রেনন্ আসিয়া কতকটা স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন্। ডেম্প্‌সী তৎক্ষণাৎ ঘুষি বাগাইয়া আগাইয়া আসিলেন্। তারপর দুই পক্ষে তুমুল নিকট-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রকৃতপক্ষে অদূর যুদ্ধে জ্যাকের সমতুল্য কেহ ছিল না; তাঁহার নিকটস্থ হইয়াই ব্রেনন্ একটি অসংশোধনীয় প্রমাদ ঘটাইলেন। ধার ঘেঁষিয়া এইরূপ মিনিট দেড়েক জবরদস্তি লড়াইয়ের পর, ব্রেনন্ ভীষণ চোট্ খাইয়া একখানা কাঠের গুঁড়ির মত ধড়াস্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন্; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দশ গণিতে না গণিতেই তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন্। সে চোট্ কিন্তু কেহ দেখিতে পায় নাই—এমনই কৌশলে ডেম্প্‌সী উহা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন; খুব সম্ভবতঃ উহা জুতসই গোছের 'আপার্-কাট্' নামক অপরিহার্য্য ঘুষি অথবা উদরদেশে প্রদত্ত জবর-গোছের মুষ্ট্যাঘাত।

ব্রেনন্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘুষি তুলিতে না তুলিতেই, ডেম্প্‌সী এক লম্ফে অগ্রসর হইয়া ব্রেননের মাথার পশ্চাদ্ভাগে "র‍্যাবিট্ পাঞ্চ" নামক এক মারাত্মক আঘাত করিলেন; সে আঘাতের টাল্ সাম্‌লানো স্বয়ং ভীমসেনেরও সাধ্যায়ত্ত ছিল না—দুর্ভাগা ব্রেনন্ ঘুরপাক খাইয়া মুখ থুবড়াইয়া সশব্দে ধরাতল লুটাইয়া পড়িলেন্। "র‍্যাবিট্ পাঞ্চ" নামক কায়দাটি তখন আমেরিকায় সবে মাত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং বড় রকমের প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় এই সর্ব্বপ্রথম কার্য্যে প্রযুক্ত হইল; এখন যুক্ত প্রদেশের ষ্টেট্ য়্যাথ্‌লেটিক্ বক্সিং কমিশন কর্ত্তৃক এই প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রেনন্ মাটিতে পড়িবামাত্র রেফারী নিয়মমত এক দুই তিন করিয়া দশ পর্য্যন্ত গণিয়া গেলেন্; কিন্তু ব্রেনন্ একেবারে নট-নড়ন-চড়ন্! তাঁহাকে তাজা ও খাড়া করিতে তাঁহার সহচরগণের কয়েক মিনিট সময় লাগিল।

সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ ডেম্প্‌সীর জয়নাদে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল; ম্যানেজার বিষাদের পর এই হরিষ লাভে শুধু তাণ্ডব-লীলা দেখাইতে বাকী রাখিলেন। ডেম্প্‌সী ভূপতিত ব্রেননের নিকট গিয়া তাহার করকম্পন করিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, "আমি আমার পূর্ব্বার্জ্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছি বলিয়া সুখী হইলাম বটে, কিন্তু আপনার ন্যায় বীরের সহিত সে গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণপণ জুঝিতে হইল বলিয়া দুঃখিত!"

মহাভারত-প্রসিদ্ধ গজকচ্ছপের যুদ্ধের ন্যায়, ডেম্প্‌সী-ব্রেননের বিরাট মুষ্টিযুদ্ধ এইভাবে শেষ হইল। ইয়োরোপ

ও আমেরিকায় : ভ্রমণ-কাল-মধ্যে এমন চমক-প্রদ, চিত্তাকর্ষক ও যোগ্যতম যুদ্ধ আমার অদৃষ্টে আর দ্বিতীয়বার দেখা ঘটে নাই!

এখন আমার নিজের বিষয় কিছু বলিতে চাই। পাঠকবর্গের বোধহয় স্মরণ আছে যে, ডেম্পসী-ট্রেনন্ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমার ম্যানেজার, মল্লক্ষেত্রে সমবেত আমেরিকার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মল্লবীরের সহিত আমার পরিচয় ঘটাইয়া দিয় ছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষ হইলে, ম্যানেজার আমাকে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ একটি হোটেলে সান্ধ্য ভোজনের জন্য লইয়া গেলেন। শুধু আমেরিকায় কেন—সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বোধহয় এত বড় বিলাসিতাবহুল আরামদায়ক ব্যয়সাধ্য রেস্তোরাঁ আর দ্বিতীয় নাই। উহা সেই জগদ্বিখ্যাত "রুফ্ গার্ডেন্ অফ্ আমষ্টর্ডম্ থিয়েটার।" এই ভোজনাগারটি সুপ্রসিদ্ধ নাট্য-প্রদর্শক ফ্লোরেন্স জিগ্‌ফিল্ড্ কর্ত্তৃক পরিচালিত।

কেন এই ব্যয়বহুল হোটেলে আনিয়া আমাকে হাজীর করা হইল—জিজ্ঞাসা করাতে, ম্যানেজার আমাকে একান্তে কহিলেন যে, সমগ্র আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, কুস্তীগির, ব্যায়ামবীর, পালোয়ানদের পৃষ্ঠপোষক, অপেরা-গায়ক, বায়োস্কোপ ও থিয়েটারের অভিনেতৃগণ, ঐ সম্বন্ধীয় সুবিখ্যাত শক্তিশালী সংবাদপত্রের কর্ত্তা ও সম্পাদকগণ নিয়মিতভাবে এখানে জমায়েৎ হইয়া, আহার, গল্প ও ভাববিনিময় করেন। সুতরাং নিজেকে আমেরিকান্ জগতে যথাশীঘ্র জাহির করিবার মানসে ও ব্যবসায় বুদ্ধির দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, এরূপ ফ্যাসন-দোরস্ত হোটেলে কিছু বেশী টাকা খরচ করিয়া খাওয়ায় লাভ ছাড়া লোকশান্ নাই এবং খাইতে দ্বিরা করাও উচিত নহে। পাঠকগণ এখনই জানিতে পারিবেন যে, এই হোটেলে এক রাত্রে খাইতে আমাদের কত টাকা খরচ পড়িল।

আমার মাথায় পাগ্‌ড়ী থাকাতে অনেকের কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। আমাদের জন্য চারি চেয়ার ও টেবিলযুক্ত একটি স্বতন্ত্র স্থান পূর্ব্ব হইতেই রিজার্ভ করা ছিল। আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন পরিগ্রহ করা মাত্র, আমেরিকার একজন নামজাদা খেলোয়াড়-পরিপোষক—নাম মিঃ জ্যাক্ কার্লি—আমাদিগের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার টেবিলে যোগদান করিতে আহ্বান করিলেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের টেবিলেই সবান্ধব আসিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলাম। তিনি সে অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে তৎক্ষণাৎ সস্ত্রীক আসিয়া হাজীর হইলেন। নানা বিষয়ে আমাদের কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল। সে রাত্রে গায়ক, অভিনেতা প্রভৃতি নানাশ্রেণীর শিল্পীর সহিত আমি পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হইলাম; ইঁহাদের মধ্যে ইটালির অমর সঙ্গীতজ্ঞ সাইনর্ কর্ণসো, ভুবন-বিজয়িনী নর্ত্তকী মাদাম্ পাভ্‌লোভা, রাসিয়ার বিখ্যাত গায়ক চালিয়াকিন্, চলচ্চিত্রাকাশের নক্ষত্র মিস্ মে মারে, স্বনামখ্যাতা মেরী পিক্‌ফোর্ডের ভ্রাতা জ্যাক্ পিক্‌ফোর্ড, অধুনা মৃত রুডল্‌ফ ভ্যালেন্টিনো প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কথা-প্রসঙ্গে জ্যাক্ কার্লিকে এই প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, পরদিন ছোট হাজারির পূর্ব্বেই তাঁহার ব্রডওয়ে আফিসে গিয়া খবরের কাগজওয়ালাদের সাক্ষাৎদান করিব। অধিকন্তু মিঃ কার্লি আমার ম্যানেজারকে অনুরোধ করিলেন যাহাতে আমার জন্য কুস্তির প্রতিযোগিতা স্থির করিবার সুবিধাটুকু তিনি পান্। তৎক্ষণাৎ একটি চুক্তিপত্র লিখিয়া সহি করা হইল। আমরা সদলবলে প্রায় রাত্রি দুইটার সময় রুফ্ গার্ডেন্ ত্যাগ করিলাম। আমার পাঠকগণ বোধহয় শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইবেন যে, সে রাত্রে এই রাজোচিত ভোজনাগারে আমাদের চারিজনের ভোজন কল্পে পঁচাত্তর ডলার বা প্রায় ২২৫৲ খরচ পড়িল। চারিখানি চেয়ারে কেবল বসিবার ভাড়াই মাথা পিছু দশ ডলার বা ত্রিশ টাকা। স্থানের মর্য্যাদানুযায়ী মূল্যবান্ খাবারও পরিবেশিত হইল; পরিমাণ ও রকমারিও নিতান্ত কম ছিল না।

আমার ম্যানেজার, "ওয়াল্‌ড্রফ আস্‌তোরিয়া" নামক নিউ ইয়র্কের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে আমার জন্য ঘর ভাড়া করিয়াছিলেন্। সেখানে গিয়া বাকী রাতটুকু নিদ্রা কোলে কাটাইলাম। এখানকার ভাড়াও বেজায় রকমের চড়া। কিন্তু ম্যানেজার মহাশয় উপদেশ দিলেন—এরূপ উঁচু দরের চাল বজায় রাখিলে ব্যবসার দিক হইতে বিশেষ সুবিধা হইবে। সাধারণ একখানি সজ্জিত কক্ষের (গোসলখানা সমেত) দৈনিক ভাড়া ১৫ ডলার বা ৪৫৲ টাকা।

পরদিন আমার ম্যানেজারকে সঙ্গে করিয়া আমি ব্রডওয়ে ফরটিসেকেণ্ড্ ষ্ট্রীট্, মিঃ কার্লির আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি পুরা ভারতবর্ষীয় পোষাক পরিধান করিয়া যাওয়ায়, ব্রডওয়ে অঞ্চলে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

কার্লির আফিসে পঁহুছিয়া, আমাদিগকে চারিজন স্পোর্ট-রিপোর্টারকে পৃথক পৃথকভাবে দর্শন দিতে হইল। আমাকে প্রত্যেকের নিকট বলিয়া তাই

হইল—ভারতে কুস্তী-বিদ্যা কি কি নিয়মে কেমন করিয়া চালিত হয়, কি ভাবে ভারতীয় নৃপতিগণ বড় বড় পালোয়ানের দল পুষেন, কেমন করিয়া আমরা কুস্তিগিরি আয়ত্ত করি, প্রত্যহ এক একজন বিখ্যাত পালোয়ান কিরূপ মূল্যবান্ সামগ্রী আহার করেন, নিজের বল অব্যয় করিবার জন্য কেমন ভাবে আমরা সোনা ও রূপার ছোটো ছোটো পাতা ও মুক্তাচূর্ণ ভক্ষণ করি—ইত্যাদি। যে রিপোর্টারকে সোনার পাতা ভক্ষণ করার কথা বলিলাম, তিনি সন্দেহ-বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা—হিন্দুরা—বড় বড় আজগুবী খবর জাহীর করতে খুব মজবুত।" এরূপ মন্তব্য-প্রকাশের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি মোলায়েমভাবে উত্তর করিলেন্ "আপনার সোনা-খাওয়া গল্পটিতে বেশ মৌলিকত্ব আছে!" তাঁহার এই অবিশ্বাসের কথা শুনিয়া রাগের চেয়ে দুঃখই বেশী হইল, কারণ স্বদেশের অনেকে হয়ত এই কথাটা এখনও নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমি সংবাদিক মহাশয়কে পরদিন আমার হোটেলে গিয়া স্বর্ণ-পত্র ভক্ষণ ব্যাপারটা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া ও নিজেও তাহার স্বাদগ্রহণ করিয়া আসিতে অনুরোধ করিলাম। তারপর চলচ্চিত্রের পর্দ্দায় আমাকে দেখাইবার জন্য আমার কতকগুলি ফটো গ্রহণ করা হইল এবং ঘণ্টা দুইয়েকের মধ্যে এই সকল ঝঞ্ঝাট্ কাটিয়া গেল।

তারপর কার্লির সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল; তিনি তখনই আমাকে একটা কুস্তির প্রতিযোগিতায় নামিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমার তৈয়ারী হইতে এবং আমেরিকার প্রচলিত কুস্তির কায়দা-কানুন্ জানিতে-শুনিতে ও তাহাতে অভ্যস্ত হইতে অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ সময় লাগিবে; তাহার পর কোনো পহেলা নম্বরের পালোয়ানের সঙ্গে পাল্লা দিতে সাহস করিব। কিন্তু মিঃ কার্লি এ যুক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না—একেবারে নাছোড়বান্দা, আমার ম্যানেজারও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন; তাঁরা দুইজনেই যতশীঘ্র সম্ভব আমাকে জুতিয়া দিতে চাহেন। বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া আমাকে শেষে রাজী হইতে হইল। মিঃ কার্লি আমার ম্যানেজারের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন আমাকে ঠিক পরের সোমবারেই টমি ড্যারাক্ (Tommy Darrak) নামক হল্যাণ্ডের সেরা পালোয়ানের সঙ্গে লড়িতে হইবে। শরীরটা ভাঁজিয়া লইতে ও আমেরিকার আচারে ওয়াকিবহাল্ হইবার জন্য হাতে মাত্র এক সপ্তাহ সময় পাইলাম। যাহোক, এত ক্লেশ সহ্য করিয়া আমেরিকায় পদার্পণ করিবার দশ দিন পরেই আমি পৃথিবীর একজন নামজাদা উঁচু দরের পালোয়ানের সহিত কুস্তী লড়িতে আমন্ত্রিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী।—

সম্প্রতি তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা লইয়া একটা বড় রকম আলোচনা হইয়া গেল। এতকাল কেবল সংবাদপত্রে তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথায় অল্প স্বল্প যা আলোচনা হইতেছিল, তাহাতে প্রতিকারের কোন আশা ছিল না; তাহা এক কাণ দিয়া ঢুকিত, অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত। এখন দেশবাসী সভা-সমিতি করিয়া বক্তৃতা করিয়া এই দুর্ভাগ্যদের দুর্ভাগ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে, যদিও যথার্থ প্রতিকারের আশা খুবই অল্প। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার পরিমাণ করা যায় না। সেই সকল বিষয়ের মধ্যে তাহাদের স্বাস্থ্য-ঘটিত অসুবিধার কথাই আমরা কেবল আলোচনা

করিতে পারি! এদেশের রেল পথে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দরিদ্র ভারতবাসী দেড়া ভাড়া, দুনা ভাড়ায় রেলগাড়ীতে চড়িবার কল্পনাও করিতে পারে না। যত লোক প্রত্যহ তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে যাতায়াত করে, তাহাদের সংখ্যার তুলনায় গাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। কাজেই গাড়ীতে অসম্ভব ভীড় হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাই সাধারণ অবস্থা। ইহার উপর, শনিবার ছুটীর দিনে, মেলা বা পর্ব্বোপলক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে যাত্রীর ভীড় আরও বেশীই হয়। সে এত বেশী যে কল্পনাও করা যায় না। পশুদের ক্লেশ নিবারণের জন্য ইংরেজের আইনে বিধান আছে। কিছু কাল পূর্ব্বে একবার সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, হগসাহেবের বাজারে খাঁচায় করিয়া যে সব বানর ও মুরগী মফস্বল হইতে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়,—খাঁচার ভিতর অত্যন্ত গাদাগাদি করিয়া আনার দরুণ তন্মধ্যে কয়েকটা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল বলিয়া, আমদানী-কারক ও বিক্রেতারা অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে-রাজ্যে পশুক্লেশ নিবারণের জন্য এমন কঠোর ব্যবস্থা, সেই রাজ্যে মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য অতি সামান্য ব্যবস্থাও নাই। যে রকম গাদাগাদি করিয়া বানর ও মুরগী আমদানী করা আইনানুসারে দণ্ডার্হ অপরাধ,—তৃতীয় শ্রেণীর রেল যাত্রী তদপেক্ষাও গাদাগাদি করিয়া রেল-পথে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়, অথচ তাহাদের এই দুঃখ দেখিবার কেহই নাই, আইনে কোন ব্যবস্থাই নাই। রেলগাড়ীর প্রত্যেক কামরায় যদিও লেখা থাকে যে, এতজন বসিবে, ততজন বসিবে; কিন্তু উহা কেবল লেখাই থাকে—ঐ লিখনানুসারে কোন কাজই হয় না; কারণ যাত্রী-সংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট সংখ্যক গাড়ী থাকে না। এরূপ গাদাগাদি করিয়া রেলপথে যাতায়াত করা—বিশেষতঃ যদি বেশী দূরে যাইতে হয় কতখানি স্বাস্থ্য-হানিকর তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইংরেজের ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যা-কাণ্ডের কথা খুব বড় গলা করিয়াই বলা হয়; কিন্তু ভারতীয় রেল-পথের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে অন্ধকূপের অভিনয় নিত্য ঘটনা—কেই বা তাহার খবর রাখে! এইরূপ ভীড়ের দরুণ কষ্ট ত হয়ই, তা'ছাড়া, সন্দিগ্ধাগ্নী, শ্বাসরোধ প্রভৃতি দুর্ঘটনায় অপঘাত মৃত্যুর কথাও যে মধ্যে মধ্যে শুনা না যায়, তাহাও নয়। তবে তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের না কি অতি কঠিন প্রাণ, তাই তাহারা এত কষ্ট সহ্য করিয়াও প্রায়ই বাঁচিয়া থাকে! সময়ে সময়ে এক একটা দুর্ঘটনার কথা সংবাদ-পত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, দক্ষিণ ভারতের কোন রেলপথে কতকগুলি মোপ্লা বন্দীকে স্থানান্তর করিবার সময় অতিরিক্ত ভীড় বশতঃ কয়েকজন বন্দী শ্বাস-রোধ হইয়া মারা যায়। সে সময়ে সেই ঘটনার কথা লইয়া সংবাদ-পত্রে খুব লেখালেখি, দেশময় খুব হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ফ্রী প্রেসের একটী টেলিগ্রামে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় অত্যধিক ভীড় বশতঃ একটী বর্ষীয়সী মুসলমান মহিলা যাত্রিনীর অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে। এরূপ দুর্ঘটনা ছাড়া, ভীড়ের মধ্যে আরও নানা প্রকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। যাত্রীদের মধ্যে কাহারও কোন রোগ (বিশেষতঃ সংক্রামক রোগ) থাকিলে তাহা অপর সুস্থকায় যাত্রীর দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। তা ছাড়া, রেলগাড়ীতে থুথু, গয়ের, পানের পিচ, পান মোড়া কলাপতের ঠোঙ্গা, চীনের বাদামের খোসা প্রভৃতি আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকিয়া গাড়ী অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় থাকে। কোন ট্রেণ কোন terminus ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলে ধর্ম্মের ডাক-ডাকা গোছের একবার করিয়া ঝাড়ু দিবার ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু থুথু গয়ের প্রভৃতির তাহাতে কোনই প্রতিকার হয় না। যদি যক্ষ্মা রোগীর থুথু গয়ের হয়, তাহা হইলে সেটা অপর যাত্রীর পক্ষে কতটা অনিষ্টকর হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিষোধক ঔষধের দ্বারা ধৌত করিলে ইহার দোষ কিছুতেই কাটিতে পারে না। জন সাধারণ যখন তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের দুর্দ্দশা মোচনার্থ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন আমাদের মতে, অন্যান্য অসুবিধার সহিত, এই সকল অসুবিধার প্রতিকারার্থ প্রবল আন্দোলন চালানো উচিত। এবং যতদিন না এই সকল দুরবস্থায় প্রতিকার হয়, ততদিন যেন আন্দোলন বন্ধ না হয়।

BLANK PAGE(S)
DOUBLE COLOUR PAGE

ভারতের অন্যতম বলী

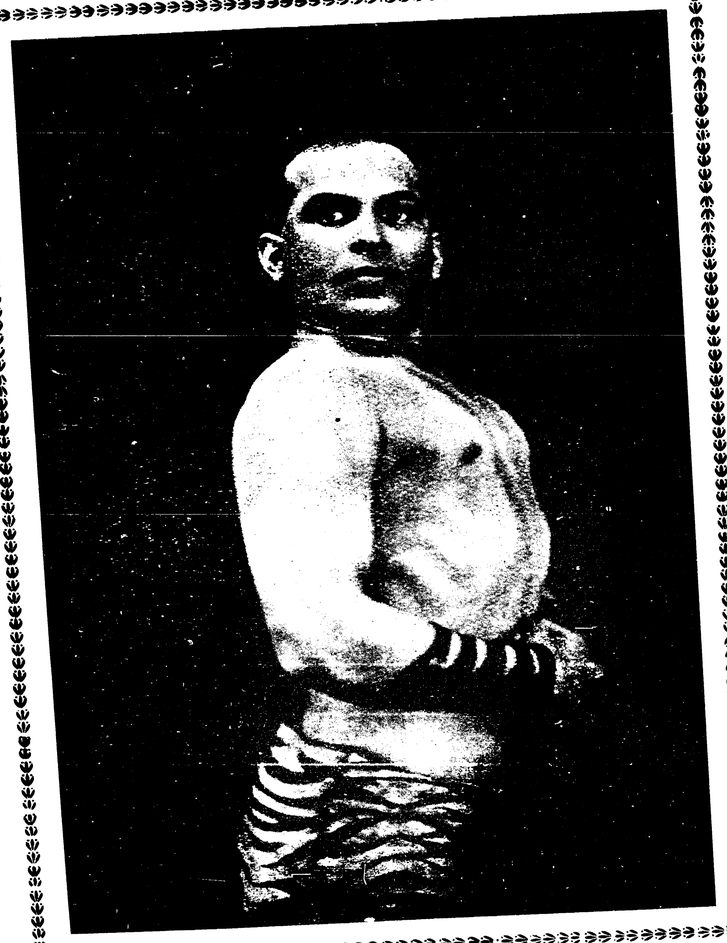

মিঃ ভিভিয়ান্ দেশ

বাটলিওয়ালার বিল্ডিংস্, বোম্বাই।

ইনি লাহোরের প্রসিদ্ধ শক্তিগুরু

ডাঃ এ, রোলোর শিষ্য।

স্বাস্থ্য সমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৬শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল | ৪র্থ সংখ্যা

অহিত-ভোজন।

[ডাঃ শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী]

"স্বাস্থ্যবান করে যদি অহিত ভোজন,

* * * * *

অবশ্য তাহার ঘটে স্বাস্থ্যের পতন।"

শরীর পোষণ ও শরীরকে কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্যই আহারের প্রয়োজন। তাহার যথেচ্ছাচার করিলেই শরীরের হানি হইয়া থাকে। অক্ষুধায় আহার, ক্ষুধায় অনাহার, বিষম ভোজন, অল্প ভোজন, বহু ভোজন, অসময়ে ভোজন, শারীরিক পরিশ্রমানুযায়ী আহারের গুরু-লঘু বিবেচনা না করা···ইত্যাদি আহারের বহু নিয়ম-লঙ্ঘনে অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করে, আর সেই অজীর্ণ রোগ হইতেই যাবতীয় রোগের সৃষ্টি হয়।

একটী গল্পে শুনিয়াছি যে, এক রাজা স্বীয় রাজ্যের যাবতীয় রোগ দূর করিবার বাসনায় ঘোষণা করেন, যেন কোন রোগ তাঁহার রাজ্যে বাস না করে। এইরূপ ঘোষণায় রোগেরা রাজ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে কহিল—ধর্ম্মাবতার, বহু দিবস হইতে আমরা আপনার রাজ্যে বাস করিতেছি। সহসা আমাদের প্রতি নির্দ্দয় হইয়া এরূপ কঠোর আদেশ দিলেন কেন? রাজা রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, তোমাদের অত্যাচারে আমার রাজ্য ধ্বংশ-প্রায় হইয়াছে। প্রজা সবল অধিকাংশ সময় রোগাক্রান্ত থাকায় রাজকর আদায় হইতেছে না। সুতরাং তোমরা কেহই আমার রাজ্যে বাস করিতে পারিবে না। রাজাকে এ বিষয়ে স্থির-প্রতিজ্ঞ বুঝিয়া রোগেরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করিয়া কহিল, মহারাজ! যদি একান্তই আমাদের প্রতি বাম হইয়া থাকেন, তবে আমরা আপনার রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছি; কিন্তু হে ভূপাল! আপনার শ্রীচরণে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের মধ্যে একজন মাত্রকে

DOUBLE COLOUR PAGE

আপনার বিস্তৃত রাজ্যের এক কোণে স্থান দান করুন্। রাজা তখন তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কহিলেন, ভাল, একজন না হয় থাক ; কিন্তু তোমরা পরামর্শ করিয়া বল কে থাকিবে ? আমি তাহাকে দেখিতে চাই।...তখন একজন শীর্ণকায় অজীর্ণ-রোগকে দেখাইয়া কহিল, হে রাজন্! এই ক্ষুদ্র অজীর্ণটীকে আপনার রাজ্যে স্থান দান করুন্। রাজা ঐ শীর্ণকায় দুর্ব্বলকে দেখিয়া তাহার দ্বারা এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তাহাতে সকলে সন্তুষ্ট হইল। এ সন্তুষ্টির তাৎপর্য্য এই যে, অজীর্ণ স্থান পাইলে সকলেই স্থান পাইল অর্থাৎ যাবতীয় রোগের অজীর্ণই হেতু।

আয়ুর্ব্বেদীয় মাধব-নিদানে লিখিত আছে—

"রোগানীকস্য তে মূলনজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তিহি।
অনন্তচ্ছ অজীর্ণাজ্জায়তে রোগস্তস্মাদ্রক্ষেদজীর্ণতঃ॥

ভূক্ত বস্তু সম্যকরূপে পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া রসাদি সপ্ত ধাতুতে পরিণত হইতে না পারিয়া, শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া, শারীরিক ও মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতা নাশ করে ও শরীরে নানারূপ ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

এই অজীর্ণের মূল অহিত ভোজন।

পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ, এই আহার হিতকর—এই আহার অহিতকর, ইহা নির্দ্ধারণোপযোগী কতকগুলি কার্য্য-কারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন।

আমরা যে প্রকারই আহার করি না কেন, সেই প্রকার আহারের হিতকারিতা ও অহিতকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আহার সম্বন্ধীয় "প্রকৃতি" "করণ" প্রভৃতি আটটী প্রধান বিবেচ্য বিধির বর্ণনা করা যাইতেছে।

(১) প্রকৃতি।—আহার্য্য দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ। যে যে দ্রব্য আমাদিগকে ভক্ষণ করিতে হয়, তন্মধ্যে কোন্‌গুলি লঘু, কোন্‌গুলি গুরু তাহা বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করিয়া, কোন দ্রব্য কত পরিমাণে সেবন করিতে হইবে তাহা স্থির করা যাইতে পারে। লঘু পাক দ্রব্য যে পরিমাণে ভক্ষণ করিতে হয়, গুরুপাক দ্রব্য তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে সেবন করা উচিত। পক্ষান্তরে কোন কারণ বশতঃ উপযুক্তরূপ ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে, গুরুপাক দ্রব্য একেবারেই আহার করিবে না। সেরূপ করিলেই তাহা অহিত ভোজন।

(২) করণ।—গুণাগুণ ধারণার্থ দ্রব্যের রূপান্তর বা সংস্কার করা। যদি আমরা গুরু বস্তুকে রূপান্তর করিয়া লঘু করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে অধিকাংশ সময়েই আমাদিগকে গুরুদ্রব্য ভোজন করিয়া পাকস্থলী ভারাক্রান্ত করিতে হইত। অন্নের পরিবর্ত্তে ধান্যই সেবন করিতে হইত। কিন্তু চাউল ও লাজরূপে (খইরূপে) লঘু হইয়া থাকে।

(৩) সংযোগ।—দুই বা ততোধিক দ্রব্যের সংমিশ্রণ। কতকগুলি দ্রব্যের পরস্পর সংমিশ্রণে আহার্য্য পদার্থ বিশেষ গুণ-সম্পন্ন ও উপকারী হইয়া থাকে; আবার কতকগুলির মিশ্রণে বিষগুণ প্রাপ্ত হয়। যেমন শুধু দাইল খাইলে অজীর্ণ রোগ জন্মে ; কিন্তু দাইল ও ভাত একত্রে খাইলে বলকারক সহজ-পাচ্য খাদ্য হয়। যেমন মধু ও ঘৃত পৃথকরূপে সেবন করিলে কোন অনিষ্ট হয় না, বরং ব্যক্তিগতভাবে পুষ্টিকর ; কিন্তু ঐ দুই দ্রব্য সমপরিমাণ একত্র করিয়া খাইলে বিষের ন্যায় অনিষ্টকারী হয়। দুগ্ধের সহিত মৎস্য ও মাংস বিষবৎ ক্রিয়া দর্শায়। অতএব বস্তু বিশেষের উপযুক্ত সংযোগে ইষ্ট এবং অনুপযুক্ত সংযোগে অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে।

(৪) রাশি।—আহার্য্য দ্রব্য সমূহের বা এক একটীর পরিমাণ। ইহার দ্বারা খাদ্যের মাত্রা নির্দ্ধারণ করা যায়। যেমন কোন ব্যক্তি ভাত, দাইল, মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রত্যহ ১॥০ সের পরিমাণ আহার করে এবং সেই দেড় সেরই তাহার সহজে পরিপাক হয়, তাহা হইলে সেই দেড় সেরই তাহার আহার-মাত্রা। কিন্তু ঐ দেড় সেরই যদি তাহার পাক না পায়, অথবা অল্পতা বশতঃ তাহার তাহাতে শরীর পোষণ না হয়, তাহা হইলে তাহাই তাহার অতিযুক্ত কিংবা অযুক্ত মাত্রা। আবার কোন একটী জিনিষ যেমন দাইল যে পরিমাণ আহার করিলে একজনের পরিপাক হয় না, সুতরাং তাহার ঐ দাইলের মাত্রা কম

করা, অথবা তদ্বারা পোষণ কার্য্য রীতিমত সম্পন্ন না হইলে, তাহার মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক হয়। একটী ছোট শিশু যে পরিমান দুগ্ধ খাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদপেক্ষা বড় হইলে তাহার দুগ্ধের পরিমাণ সুবিবেচনার সহিত বৃদ্ধি করিতে হয়।

(৫) দেশ—স্থান বা দেশ ভেদে আহার্য্য-পদার্থের উৎপত্তির গুণাগুণের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যেমন বিন্ধ্যাচলোৎপন্ন দ্রব্য লঘু, হিমাচলোৎপন্ন দ্রব্য গুরু। উষ্ণ-প্রধান ভারত ও আফ্রিকা-জাত দ্রব্য লঘু এবং শীত-প্রধান ইউরোপ প্রভৃতি দেশোৎপন্ন দ্রব্য গুরু। দেশ ভেদে ও শীত ও উষ্ণতা অনুসারে দ্রব্যের লঘুত্ব ও গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই সূত্র দ্বারা ভূমণ্ডলস্থ দ্রব্য জাতের প্রকৃতি মোটামুটি নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। দেশ ভেদে কোন কোন দ্রব্য উৎপন্ন অধিক বা কম হইয়া থাকে ; যেমন ভারত-জাত কোন কোন দ্রব্য ইউরোপ খণ্ডে উৎপন্নই হয় না, যথা---আম্র, ইক্ষু, ধান্য প্রভৃতি।

(৬) কাল—ঋতুভেদে বা তিথিভেদে কোন কোন দ্রব্যের গুণের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। শীতকালে যে দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়, গ্রীষ্মকালে আবার সেই দ্রব্যই সহজপাচ্য হয় না। পক্ষান্তরে গ্রীষ্মকালের খাদ্য আবার শীতকালে সহ্য হয় না। যেমন শীতের কর্‌করা ভাত, গ্রীষ্মের পান্তা ভাত। শীতে পিঠে সহ্য হয়, গ্রীষ্মে হয় না...ইত্যাদি। আবার কোন কোন দ্রব্য তাহার বাল্যাবস্থায় যেমন উপকারী হয়, বৃদ্ধ হইলে তাহা তদপেক্ষা গুরু হয়। আবার কোন কোন দ্রব্য পাকা খাইলে যেমন সহজপাচ্য হয়, কাচায় গুরুপাক হয়...ইত্যাদি।

(৭) উপযোগ সংস্থা---উপযোগের নিয়ম পালন। যেমন এক দ্রব্য আহারের পর তাহা পরিপাক হইলে পুনরায় আহার গ্রহণ। অথবা এই আহার তাহার উপযোগী কিংবা অনুপযোগী নির্দ্ধারণ করা ইত্যাদি।

(৮) উপযোক্তা---আহার দ্রব্যের প্রকৃতি ও নিজের প্রকৃতি বিচার দ্বারা সামঞ্জস্য নির্ণয় পূর্ব্বক ভোজন করা। এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা সকল শরীরে সহ্য হয় না। সেইগুলি বিবেচনা পূর্ব্বক ভোজন না করিলে অহিত হয়।

অসময়ে ভোজন।

ত্রিশ দণ্ড দিবা ভাগকে সমান তিন অংশে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক অংশের পরিমাণ দশ দণ্ড বা চারি ঘণ্টা। আর্য্য-চিকিৎসকগণ বলেন, পূর্ব্বাহ্নের দশ দণ্ড শ্লেষ্মা বা কফের ; মধ্যাহ্নের দশ দণ্ড পিত্তের এবং অপরাহ্নের দশ দণ্ড বায়ুর সময়। রাত্রের ত্রিশ দণ্ডও এইরূপ বিভাগ অনুসরনীয়। আর্য্য-চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় পিত্তই অগ্নি। সেই অগ্নি-বলে ভূক্ত দ্রব্য পরিপাক হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রেও পিত্তকেই পাচক রসের মধ্যে প্রধান রস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং মধ্যাহ্ন দশ দণ্ড পিত্তের সময় বলিয়া ঐ সময় আহারের উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে। রাত্রেও এই নিয়মে আহার করা উচিত। এতদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ১১টা হইতে ২টার মধ্যেই মাধ্যাহ্নিক আহারের প্রকৃষ্ট সময়। আমরা বাঙ্গালা দেশে বরাবরই সেই নিয়মে আহার করিয়া সুস্থদেহী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান রাজ-নিয়মানুসারে ১০টায় স্কুল-কলেজ, কাচারী ও অফিস করিতে হয় বলিয়া বেলা ৮।৯ টার মধ্যে ভোজন শেষ করিতে হয়। ঐ ৮।৯ টার সময় শ্লেষ্মার যৌবন বা প্রাবল্যাবস্থা ; সেই সময়ে আহার করিলে যে শরীরের বিশেষ হানি হইয়া থাকে তদ্‌বিষয়ে আর মোটেই সন্দেহ নাই। সেই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে সহরে লোকের এত অজীর্ণ ব্যাধি।

আয়ুর্বিজ্ঞানবিৎ ভাবমিশ্র বলেন—

যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ বলক্ষয়ঃ॥

অর্থাৎ এক প্রহর মধ্যে (৯ টার মধ্যে) ভোজন করা উচিত নহে ; দুই প্রহর-(১২টা)কেও অতীত হইতে দিবে না। এক প্রহরের মধ্যে আহার করিলে অপক্ক

রস জন্মে (সুতরাং অজীর্ণ রোগ হয়) এবং দুই প্রহারাতীতে বলক্ষয় হয়। এরূপ ভোজন অহিত-জনক।

একবার আহার করিয়া পরিপাক না হইতেই পুনরায় আহার গ্রহণ।

এরূপ আহার বড়ই দোষাবহ। একমাত্র সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই যে আহারের নিয়ম প্রতিপালিত হইল এমত নহে, তৎসঙ্গে ক্ষুধার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্ষুধার উদ্রেক হউক আর নাই হউক, সময় উপস্থিত হইলে আহার করিতে হইবে এমন নিয়ম হওয়াও উচিত নহে। সুতরাং "জীর্ণান্নে ভুঞ্জীত" অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক পাইলে পুনঃ ভোজন করা উচিত। প্রকৃত ক্ষুধা না জন্মিলে, আহার করা কোন মতেই উচিত নহে।

শ্রমজীবী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সময়ানুযায়ী আহার-বিধান কার্য্যকর হয় না। কারণ শারীরিক কঠিন পরিশ্রমে ভুক্ত খাদ্য সহজে ও শীঘ্র পরিপাক হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় থাকিলে তাহাদের শারীরিক উপাদান ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং একমাত্র সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই যে আহারের নিয়ম প্রতিপালিত হইল এমত নহে, তৎসঙ্গে ক্ষুধার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই জন্যই বাঙ্গলা দেশের কৃষিজীবী দিবারাত্রে—চারিবার আহার করিয়া থাকে। আর অনুরোধে উপরোধে পড়িয়া বাবুরা ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও "বোঝার উপর শাকের আটি" চালাইয়া দিয়া অম্লরোগের জন্য রাস্তা তৈয়ারী করিয়া থাকেন।

অল্পাহার।

শরীর পোষণার্থ, ক্ষুধার অনুরূপ যে পরিমাণ খাদ্য ভোজন করা উচিত, তাহার ব্যতিক্রমই অহিতাহার। অল্প ভোজন জন্য উদর পূর্ত্তি হয় না, আলস্য, কার্য্যে অনাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শরীর-পীড়া প্রবল হইয়া থাকে। অধিক দিন ব্যাপি অল্পাহারের জন্য রক্তাল্পতা, শীর্ণতা, অলসতা, জীবনের প্রতি উদাসীনতা, স্কার্ভিরোগ, বেরীবেরী, চর্ম্মের শুষ্কতা ও রুক্ষতা, জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য প্রভৃতি শরীরের অপকৃষ্টতা জন্মে। দুর্ভিক্ষের সময় এই সকল লক্ষণ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক চম্পারণ রিলিফ্ ওয়ার্কসের কার্য্যে চিকিৎসক থাকার সময় বহুদিন পূর্ব্বে এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র পল্লীবাসীর মধ্যে নিয়ত চিকিৎসা ব্যপদেশে এই সকল লক্ষণ দর্শন করিয়াছেন। এই অল্পাহারীদিগের মধ্যে প্রায়ই অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে। এবং ইহারা ম্যালেরিয়া জ্বরে অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

অত্যধিক ভোজন।

যাহারা সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য গ্রহণে অসমর্থ তাহারা যদি কোনদিন অধিক খাদ্য পাইয়া ভোজন করে, অথবা বাজি রাখিয়া বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অধিক ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাদের পাকস্থলীতে খাদ্য বিকৃত হইয়া কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন-সালফাইড্ প্রভৃতি গ্যাস উৎপাদন করে; এবং অনবরত উদ্গার অথবা দুর্গন্ধযুক্ত বাই সরিতে থাকে। তদ্ভিন্ন অজীর্ণতা, উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর, লিভারে বেদনা, কামলা প্রভৃতি রোগ জন্মিতে দেখা যায়।

নিমন্ত্রণ-ভোজন।

বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক ভোজে বিবিধ খাদ্য দ্রব্যের বাহুল্য বশতঃ, অসময়ে অনুরোধ-উপরোধে বা লোভে পড়িয়া নানা কুযোগপ্রাপ্ত বা গুরুপাক দ্রব্য অধিক ভোজন জন্য, উদরাধ্মান, অম্ল, অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। অনেকে একদিনের অহিত ভোজনে বহুদিন কষ্ট পাইয়া থাকেন।

গুরুদ্রব্য ভোজন।

শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় বা পূর্ব্বে, বালকদিগের মাংস পরিপাকের অনুপযুক্ত কালে, রোগান্তে দুর্ব্বলতায়

ও বৃদ্ধাবস্থায় গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে অজীর্ণ, অতিসার, আমাশয়, জ্বর প্রভৃতি পীড়া জন্মিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, শিশুর দুগ্ধ ব্যতীত অন্য খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি জন্মে নাই, তাহাকে সোহাগ করিয়া রসগোল্লা খাওয়াইয়া পেটের পীড়া জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে বালক মাংস পরিপাকের উপযোগী নহে, নিমন্ত্রণ বাড়ীর ঘৃত-মসল্লাযুক্ত মাংস খাওয়াইয়া অজীর্ণ রোগ জন্মান হইয়াছে। বৃদ্ধকালে সাধারণতঃ খাদ্যের প্রতি লোভ জন্মে; ঐ সময় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যা তা খাইলেই পেটের পীড়া, হাঁপানি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। রোগান্তে দুর্ব্বলতায় যে সকল গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে তাহার অনিষ্ট হইতে পারে, তাহাই ভোজন করিয়া পীড়ার পুনরাক্রমণ ভোগ করিয়া থাকে।

অখাদ্য ভোজন।

নিতান্ত দরিদ্রতা হেতু অথবা দুর্ভিক্ষের সময় শরীর-ধারণোপযোগী প্রকৃত বলকারক খাদ্য না পাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অনেকে অখাদ্য ভোজন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অভ্যাস ও শরীর বিধানের অপচয় হেতু অনেকে অখাদ্য ভোজন করিয়া থাকেন। পচা অন্ন ব্যঞ্জনাদি কাহারও কাহারও মুখরোচক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এরূপ অহিত ভোজনে অজীর্ণ, অম্ল ও অতিসারাদি পীড়া জন্মিয়া থাকে।

অপরিষ্কার খাদ্য ভোজন।

আমাদের দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদ থাকায় ইতরেতর অনেক জাতির খাদ্য উচ্চবর্ণীয় জাতিগণ গ্রহণ বা ভোজন করেন না। আমাদের বোধহয় তাহার মধ্যে প্রধান কারণই তাহাদের খাদ্য অপরিষ্কার। আমরা অনেক নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া ইহা বেশ অনুধাবন করিয়াছি। তাহাদের খাদ্য-পাত্রাদি নিতান্ত অপরিষ্কার, খাদ্য-দ্রব্য প্রায়ই না ঢাকায় তাহাতে মাছি-কীট-পতঙ্গাদি বসিয়া খাদ্যগুলিতে সংক্রামক বিষ রোপণ করে। মল-মূত্রাদির সন্নিকটে আহার্য্য পদার্থ নিয়ত থাকায় সেগুলি বিষদুষ্ট হয়। তাদের হাতগুলি নিতান্ত নোংরা। উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের সহিত খাদ্যগুলি সংস্পৃষ্ট; একারণ সেগুলিকেও অহিত খাদ্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ইহা অনেক প্রকার ব্যাধি-বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে।

ঘৃণার সহিত খাদ্য-গ্রহণ।

খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে অনেকেই অনেক খাদ্য পছন্দ করেন না, অথবা লোকধর্ম্মাচার বশতঃ তাহা গ্রহণ করেন না। আমরা পল্লীগ্রামে দেখিয়াছি জেলে, রাজবংশী, চাড়াল প্রভৃতি হিন্দুজাতি এবং কৃষিজীবী মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকেই দুগ্ধপান করেন না। এই সকল পরিবারে ডাক্তারী মতে চিকিৎসা করিতে যাইয়া দুধ-সাগু, দুধ-ভাত পথ্য খাইতে দিয়া দেখিয়াছি, তাহারা ঐরূপ খাইলে হয় বমন করিয়া ফেলে, নতুবা তাহাতে অনভ্যাসবশতঃ তাহাদের অজীর্ণাদি রোগ জন্মিয়া থাকে। কোন প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে বা দুর্গন্ধযুক্ত আহার্য্য একবেলা গ্রহণ করিয়াই কাহারও অসুখ হইয়া থাকে। যে সকল যুবক ডাক্তারী-বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান, তাঁহারা প্রথম প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া, ঘৃণায় মোটেই খাদ্য গ্রহণ করিতে পারেন্ না। কেহ কেহ মৃত দেহ দাহন করার পর আহার্য্য গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করিয়া থাকে বা আহারান্তে বমন করিয়া ফেলে। এইরূপ ভোজনকেও অহিত ভোজন বলা যাইতে পারে।

হোষ্টেলে ভোজন।

হোষ্টেলে, বিশেষতঃ রেল ও ষ্টিমার ষ্টেসনের নিকট যে সকল হোটেল থাকে, তাহাতে বাসি, উচ্ছিষ্ট দাউল-ভাত গরম করিয়া বা গরম ভাতের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিয়া থাকে। ঐ সকল হোষ্টেলের পাচক নানারূপ সংক্রামক দুষ্ট ব্যাধিতে পীড়িত থাকে। হয়ত তাহাদের গা ভরা দক্রু খোস, পাচড়া, উপদংশ প্রভৃতি পীড়া থাকে; তাদের পৃষ্ট অন্ন-সেবনে ঘৃণা জন্মে ও নানা প্রকার ব্যাধি-গ্রস্থ হইবার আশঙ্কা থাকে। গায়ের ঘাম,

মুখের লাল, পানের থুথু, গলার শ্লেষ্মা দ্বারা ঐ সকল খাদ্য নিয়তই দূষিত হয়। এরূপ খাদ্য গ্রহণ করা অপেক্ষা উপবাসী থাকাও হিতকর।

দোকানের মিঠাই।

রেল, ষ্টিমার-ষ্টেসন, পল্লীগ্রামের এবং অনেক ক্ষুদ্র সহরের মিঠায়ের দোকানগুলি যাঁহারা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন—ঐ সকল মিষ্টান্ন রাস্তার রোগ-বীজাণুযুক্ত; ধুলি, মাছি, ইন্দুর, পিঁপড়া প্রভৃতি ঐ সকল খাদ্য নিয়ত দূষিত করিতেছে। এতদ্ব্যতীত তাহার প্রস্তুতকারীরা নানা প্রকার রোগদুষ্ট ও অনাচারী। এরূপ মিষ্টান্ন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কখনই সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। কলিকাতার মত বড় বড় সহরের মিষ্টান্নাদি আলমারীর ভিতর নয়নরঞ্জক-ভাবে সাজানো থাকিলেও, তাহা রোগ-বীজাণুযুক্ত হইবার যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং নানা দূষিত দ্রব্যে তৈয়ারী হয়।

বাসি বা পচা খাদ্য।

বাসি বা পচা কোন খাদ্য বিশেষতঃ বাসি দুগ্ধ কিছুতেই সেবন করা উচিত নহে। একবার একটী বাড়ীতে বাটীস্থ শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই পান্তা ভাত খাইয়া ভেদ ও বমন করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে ২।৩টী লোক মৃতকল্প ও ১টীর মৃত্যু হয়। ঐ বাড়ীর কর্ত্তার দুই স্ত্রী এবং নিয়তই তাহাদের মধ্যে কলহ হইত; এজন্য যে স্ত্রী এই অন্ন রাখিয়াছিল অপর স্ত্রী প্রকাশ করে যে, সে তাহাতে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ঐ বমিত খাদ্য সহ পুলিসে এ সংবাদ দেওয়া হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় এই অন্নে কোনরূপ বিষ পাওয়া যায় না। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছিল, উহার মধ্যে একটী টিক্‌টিকি মরিয়া পচিয়া ছিল এবং তাহার অদূরবর্ত্তী স্থানে একটা সাপের খোলস পাওয়া গিয়াছিল। এরূপ খাদ্য কিছুতেই ভোজন করা কর্ত্তব্য ছিল না। খাদ্য অল্‌গা বা অনাবৃত রাখা আমাদের গৃহস্থ বাটীর একটা অপরিহরণীয় কদভ্যাস; তা'ছাড়া অনেক ভদ্রগৃহের স্ত্রীলোকদিগের নষ্ট দুধ, বাসি লুচি ও রুটি, পয়ুসিত অন্ন, পচা মাছের ঝাল প্রভৃতি টাট্‌কা অপেক্ষা বেশী ভাল বাসেন।

দেশ ভেদে ভোজন।

ভিন্ন দেশের কথা বাদ দিলেও এই ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা প্রকার খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে, তদনুযায়ী এক স্থানের খাদ্য অন্যস্থানে আহার করিলেই অসুখ জন্মিয়া থাকে। যেমন শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে লঙ্কা বেশী খাইয়া থাকে। জনশ্রুতি যে ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে কোন প্রকার সামাজিক ভোজ উপস্থিত হইলে তাহার প্রথমে কত পরিমাণ লঙ্কার আবশ্যক তাহার ফর্দ্দ করা হয় এবং সেই লঙ্কার নিরি-খেই ভোজের খরচের পরিমাণ স্থির করা হইয়া থাকে। আবার রাঢ় দেশে কাঁচা কলাইয়ের দাইল চোঁকা সুদ্ধ খাইয়া থাকে। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে মোটেই ঝাল খাওয়া সহ্য হয় না। শুনিয়াছি বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে ঝাল খাইয়া থাকে। বেহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে মৎস্য সেবন খুব কম লোকেই করিয়া থাকে এবং ভাত অপেক্ষা তাহাদের দাইল রুটীই সাধারণ খাদ্য। ঐ সকল পশ্চিম-দেশবাসী ছাতু, ভাজা পোড়া, কাঁচা সব্জী ও চাটনী অধিক আহার করে। উড়িষ্যা দেশে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ মৎস্য আহার করেন না। সুতরাং যে স্থানে যে প্রকার খাদ্য ব্যবহৃত হয়, তদনুরূপ আহার ধীরে ধীরে অভ্যাস না করিলে অহিত-জনক হইতে পারে। পূর্ব্ব বঙ্গবাসী দক্ষিণ বঙ্গে থাকিলে তদ্দেশবাসীর খাদ্যই খাওয়া উচিত; নতুবা কিছু অহিত হইয়া থাকে।

ঋতু-ভেদে ভোজন।

যে সকল দ্রব্য গ্রীষ্ম কালের আহার, তাহা শীত কালে খাইলে অসুখ জন্মে; আবার শীত কালের আহার গ্রীষ্ম কালের উপযোগী নহে এইরূপ সকল ঋতুতেই আহার্য্য-দ্রব্য নির্ণয় পূর্ব্বক ভোজন না করিলে অহিত ভোজন হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে ঋতুচর্য্যা অধ্যায়গুলিতে

ঋতুভেদে ভোজনবিধি যেরূপ উক্ত আছে, সাধ্যানুযায়ী তাহা পালন করিতে চেষ্টা করা উচিত।

তিথি ভেদে ভোজন।

হিন্দু শাস্ত্রকারেরা এক এক তিথিতে এক এক দ্রব্য আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যায় যে, ঐ সকল দ্রব্য ঐ ঐ তিথিতে ভিন্ন গুণসম্পন্ন ও বিকৃত হইয়া থাকে; অনেক সময় উহার মধ্যে রোগ-জীবাণু জন্মিয়া শরীরের অহিত জন্মায়।

'ভ্যাজাল ভোজন।

আহার্য্য পদার্থের মধ্যে দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, ময়দা প্রভৃতি দ্রব্যে এত ভেজাল মিশ্রিত হইতেছে যে, তাহা অখাদ্য হইয়াছে। ইহা নিবারণের কোন উপায় থাকিলেও তাহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিলেই চলে। পল্লী-মধ্যে যদিও অনেক প্রকারে ইহার হস্ত হইতে বাঁচিবার উপায় আছে; কিন্তু সহরে মোটেই নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। সেজন্য সহরের লোক অম্ল-রোগে বেশী ভুগিয়া থাকে। তবে যে সকল খাদ্য দ্রব্য, যথা—ময়দা, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল প্রভৃতি...সহর হইতে পল্লীতে চালান যায়, সেগুলিতে সমানভাবেই ভ্যাজাল্ মিশানো হয়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভ্যাজাল মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ সম্পূর্ণ অহিত ভোজন।

প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইল বলিয়া আমরা সংক্ষেপে ইহা শেষ করিলাম। ভেজাল খাদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করা যাইবে।

আমার স্বাস্থ্য-সমাচার*

[ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি]

(২)

শারীরিক বলের সহচরী যদি হন অসমসাহসিকতা, বল ও স্বাস্থ্যক্ষয় হইতে বেশী দিন লাগে না। অসম-সাহসিকতায় ও অনিয়মে যে আমার বলক্ষয় হইতেছিল, সে বিষয় ভাবনাতেই আসে নাই।

সে কালে মফঃস্বলে যিনি কিঞ্চিৎ যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাকে যে কত প্রকারে অনিয়ম করিতে হইয়াছে, আধুনিক সহরবাসী চিকিৎসকের সে ধারণা নাই। আর যশ উপার্জ্জন যে অনেক সময় একটা আকস্মিক কারণে হয়, সে কথাটাও বলা আবশ্যক। সেই যশ উপার্জ্জনই আমার স্বাস্থ্যহানির কারণ। যে দিন শ্রীহট্ট সহরে অবতরণ করিয়াছি, তাহার পরদিনই একজন ধনীকে দেখিতে গেলাম। বয়স তাঁহার চল্লিশ। শিরোভাগের মধ্যস্থান গোলাকারে কামান। শ্রীহট্ট অঞ্চলে এই প্রকার চুল কামান কবিরাজী চিকিৎসার লক্ষণ। সাহেবদের দেশে নাকি এই "hair bargling" ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইতেছে। গল্প লেখক A. I. Alan বলেন—এই ফ্যাসন নাকি ইউরোপে "পাগলা আগুনের" (wild fire) মতন ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ফ্যাসনের জন্মস্থান নাকি বুকারেষ্ট (Bukares')। বার্গ্লিং শব্দের ব্যুৎপত্তি বার্গ্লস্ (barglos) হইতে। রোমানিয়া দেশের ব্যাগ্লস্ শব্দে বুঝায় পাদ্রী পাদ্রীরা নাকি ঐ রকম চুল কামান্। তবে মহিলারা বোধ হয় ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত হইয়া এই

* গত বৈশাখে প্রকাশিত "পুরাতন স্বাস্থ্য-সমাচার" শীর্ষক প্রবন্ধটীরই ইহা পরিবর্ত্তিত নামে অনুবৃত্তি বিশেষ। লেখক আপন সুদীর্ঘ সাফল্য-মণ্ডিত চিকিৎসক-জীবনের লোক-শিক্ষাকর অভিজ্ঞতাগুলি এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়া ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিবেন।

ফ্যাসন গ্রহণ করেন নাই। জনৈক সমাজনেত্রী সুন্দরীর মাথায় টাক পড়িয়াছিল। তিনি সেই স্থানটা সবই গোল করিয়া কামাইলেন, অমনি সুন্দরী মহলে তাহা ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইল।

আমার রোগীর কিন্তু ওটা ফ্যাসন নয়, ফ্যাসাদ্। কবিরাজেরা গাছ-গাছড়া বাটিয়া মাথায় দিতে হইলে মাথার খানিকটা গোল করিয়া কামাইয়া নিতে বলেন। ঐ গাছ-গাছড়ার প্রলেপকে বলে "ভরণ"। আমার রোগীর জ্বর হইয়াছিল। কবিরাজ মহাশয় ঐ কামান স্থানে "ভরণ" দিয়াছিলেন। রোগীর আত্মীয়েরা বলিলেন, ঐ 'ভরণ' লাগান মাত্র রোগী অন্ধ হইয়া পড়িল। আমার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ডাক্তার সাহেবকেও ডাকা হইল। ডাক্তার সাহেব ঘোড়া হইতে নামিয়া একখানা আরসী ধরিয়া চোকের উপর সূর্য্যালোক ফেলিয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু দেখিতে পাইলে?" রোগী "না" বলিবামাত্র সাহেব ঘোড়া চড়িয়া পলায়ন করিলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন "nopeless"। আমি নূতন চিকিৎসক; চক্ষু চিকিৎসা সম্বন্ধে নূতন উৎসাহ; রোগীকে ছাড়িয়া দিব কেন? তিন সপ্তাহ পর যখন তাহার রেটিনার রক্তাধিক্য কমিয়া গেল, রোগ সারিয়া গেল। অন্ধকে চক্ষুদান করিয়াছে, এই কথাটা যখন দেশময় রাষ্ট্র হইল, তখন রবি বাবুর গদাই-ভগিরথের মতন আমার দশা হইল। খাইবার নাইবার অবসর নাই।

খাইতে বসিয়াছি; "ডাক্তার বাবু বাড়ী আছেন?" ঘুমাইয়া পড়িয়াছি; "ডাক্তার বাবু কি ঘুমাচ্ছেন?"। যেন ঘুমাইবার সময়ও ডাক্তার বাবু ঘুমের মাথা খাইয়া বসিয়া আছেন। রোগী দেখিতে দেখিতে রোগীর উপর কেমন একটা মায়া বসিয়া যাইত। অনেক সময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। কঠিন রোগের কথা শুনিলে অনেক সময় এত উৎসাহ আসিত যে, অনেক দূরে অসময়ে যাইতে হইলেও কুণ্ঠিত হইতাম না। শরীরে ছিল বল, মনে ছিল সাহস। দুঃসাহসের অন্ত ছিল না। আজ কেবল সেই দুঃসাহসের গোটা দুই চারি দৃষ্টান্ত দিব।

১নং দুঃসাহস।—সবে দুই তিন মাস হইল চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। তখনও যন্ত্র-তন্ত্র সব ক্রয় করা হয় নাই। একমাত্র সম্বল পকেট কেস্। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে খবর আসিল একটী স্ত্রীলোক অত্যন্ত পীড়িত। স্থান সহর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে। বাহন অশ্ব। পকেট কেস্ লইয়া দ্রুতবেগে চলিলাম। সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলাম এক ছোট খালের তীরে। নৌকা নাই। রোগীর নিকট যাইতেই হইবে। ঘোড়াশুদ্ধ একলম্ফ। আমি জল পার হইলাম, কিন্তু ঘোড়ার পা ক্রমশঃ পঙ্কে মগ্ন হইয়া পাতালের দিকে চলিতে লাগিল। আমি লাগাম হাতে ধরিয়া তীরে লাফাইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘোড়ার পাতাল গতি থামিল না। ওপারের লোকেরা আসিয়া ঘোড়াকে টানিয়া তুলিল।

রোগিনীর প্রসব-বেদনা চারিদিন পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে। ছেলের মাথা বস্তিপথে আটকাইয়া রহিয়াছে এবং পচিয়া ঢোল হইয়াছে। কাজ সোজা হইয়া গেল। ছুরী দ্বারা মাথা কাটিয়া ঘি বাহির করিলাম। মাথা হাত দিয়া চাপিয়া ছোট করিয়া টানিয়া আনিলাম। সে গ্রামে সাবান নাই। চূণ ও মাটি দ্বারাই কাজ সারিলাম এবং ঐ দুর্গন্ধময় হাতেই ভোজন-ক্রিয়া সমাধা করিলাম। অবশ্য রোগিনী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তখন পল্লীগ্রামের লোকের বোধ হয় রোগ তাড়াইবার শক্তি (Resisting power) অধিক ছিল। সেপ্‌টিক জ্বর রোগীর ত্রিসীমানায় আসিল না।

২নং দুঃসাহস।—বৈকালিক কার্য্য সারিয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়াছি। খবর আসিল সাত ক্রোশ দূরে একজন মুসলমান জমিদার মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। পথ পাহাড়ের ভিতর দিয়া। বাঘ ভাল্লুকের ভয় আছে। ভয় কাহাকে বলে জানিতাম না। প্রলোভন দুইটী—একটী মৃত্যুমুখ হইতে রোগীকে টানিয়া আনা, আর একটী—জায়গাটা ঢাকা দক্ষিণ, মহাপ্রভু

জন্মস্থান; ইতঃপূর্ব্বে কখনই দেখা হয় নাই। আহারান্তেই অশ্বারোহণ। সহিস অগ্রবর্ত্তী হইয়া লণ্ঠন ধরিয়া চলিল। শেষরাত্রে যখন গিয়া উপস্থিত হইলাম, মৌলবীরা কোরাণ না কি পাঠ করিতেছেন। তাঁহারা নিদ্রার স্থান দেখাইয়া দিলেন। কান্নাকাটির মধ্যে কি আর নিদ্রা হয়? প্রভাতেই মহাপ্রভুর বাড়ী দর্শন করিয়া অশ্বারোহণে ফিরিলাম।

৩নং দুঃসাহস।—বর্ষা কাল। নদী সমুদয় ফুলিয়া ফুলিয়া দুকূল ছাপাইয়া চলিতেছে। শ্রীহটের বৃষ্টি বিরাম জানে না। সূর্য্যের মুখ দেখিতে দেয় না। ঘন ঘন বাজের শব্দে কাণ ফাটিয়া যায়। ঝড় উঠিলে নৌকা ডাঙ্গায় উঠে, ঘর হাওয়ায় উড়ে, গাছ ভূমি-শয্যা গ্রহণ করে। এ হেন বর্ষায় ডাক আসিল—এক দূর গ্রাম হইতে। নৌকা-পথে যাইতে হইবে। ধনী রোগী—মৃত্যু শয্যায়। আমাকে নেওয়া হাইকোর্টে আপিল করা। না লইয়া গেলে কুটুম্বেরা কি বলিবে? রাজি হইলাম। ঝড়ের প্রাণ-বিদারী ঝঞ্ঝণা শুনিতে শুনিতে ও প্রলয়ঙ্করী ঢেউ খাইতে খাইতে দুপ্রহর রাত্রে যখন গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম বৃদ্ধকে "গুরু গঙ্গা কাশী" প্রভৃতি নাম শুনান হইতেছে। রোগী মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতেছেন—"পাঁচ শ টাকা সুদে-আসলে বারো শ হয়েছে, তমাদি হয়ে যাবে; কালই নালিশ করতে হবে।" রোগীরও এদিকে আয়ুর মেয়াদ তমাদি হইয়া গেল; তাঁহাকে অবিলম্বে ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইতে হইল। বেচারী অধমর্ণ অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও নিষ্কৃতি লাভ করিল। তৃতীয় পক্ষের তরুণী গৃহিণী সুর করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা গো মা! আর কি মাছ খেতে পাব? আর কি তুমি তেমনি ক'রে রান্না ক'রে মাছে-ভাতে খাওয়াবে? আর কি ঢাকাই সাড়ী পরাবে?" সে রাত্রে নিদ্রা দেবীর অনুকম্পা হইল না। শুইয়া শুইয়া ভাবিলাম—ডাক্তারদের নিকট কেবল রোগীর কথাই আসে না কেন? তাহাদের নিকট সামাজিক সমস্যা আসিয়া আর্ত্তনাদ করে কেন?

৪নং দুঃসাহস।—অশ্বারোহণে প্রায় ৪০ মাইল ব্যাস্ পরিমিত স্থানে রোগী দেখিতে হইত। সহরে তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা একটী বালিকাকে দেখিতেছি। খবর আসিল সাড়ে সাত ক্রোশ দূরে একটী বালিকা প্রসব বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। দুইটী তেজস্বী ঘোড়ার ডাক বসাইলাম। একটী অত্যন্ত অদম্য। লোকেল্ বোর্ডের রাস্তা দুইতালা সমান উচ্চ। একধারের জল অন্যধারের জল অপেক্ষা নীচু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদের জল নিকাশ ব্যবস্থার এতই বাহাদুরী। দুষ্ট ঘোড়াটা আমাকে নিয়া রাস্তার নীচে যাইবা মাত্র এক হাতে কষিয়া রাশ ধরিয়া লাফাইয়া পড়িলাম। ঘোড়া তখন সোয়ার চিনিয়াছে। আর কিছু উচ্চবাচ্য না করিয়া পোষা বিড়ালের মতন চলিল। সাঁড়াশী দিয়া প্রসব করাইয়া, সেই দিনই বিকাল বেলা সহরে ফিরিয়া ঐ মৃত্যুশয্যায় শায়িতা স্ত্রীলোকটী দেখিয়া তবে বাড়ী ফিরিলাম। ভগবানের কৃপায়, ঘোড়াটী যেমন লোক চিনিয়া কোন গোলযোগ করে নাই, রোগও বুঝি তেমনি লোক চিনিয়া নিকটে আসিতে সাহস করে নাই।

ক্ষয়রোগের সহিত যুদ্ধ।

যক্ষ্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানবেতিহাসের উন্মেষের সহিত যক্ষ্মার নাম বিজড়িত রহিয়াছে। হিন্দুর প্রাচীনতম বৈদ্যক শাস্ত্র চরক সংহিতায় ইহার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে যক্ষ্মার বিস্তৃতির কারণ, লক্ষণ ইত্যাদি বিশদভাবে আলোচনা করা আছে।

যক্ষ্মা প্রত্যেক সভ্যদেশে চিরদিনই আছে। কিন্তু আপাততঃ যে ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিগত ও জাতিগত হিসাবে একটী ভীষণ সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। আজকাল ইহাতে আক্রান্ত হইয়া প্রত্যেক মিনিটে অন্ততঃ চার জন লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে এবং কতলোক যে জীবন্মৃত অবস্থায় আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যে সংসারে একবার যক্ষ্মা প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, প্রায় সে সংসার একেবারে সবংশে নির্ম্মূল করিয়াছে। মনে হয়, যদি যক্ষ্মার প্রতিষেধ ও প্রতিকারের আশু কোন উপায় উদ্ভাবন করা না যায়, তাহা হইলে অনতিকালের মধ্যে বাঙ্গালা, অন্যান্য রোগের সাহচর্য্যে যক্ষ্মা কর্ত্তৃক একেবারে লোকশূন্য হইয়া পড়িবে।

এই সর্ব্বব্যাপী রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, আমাদের কল্যাণকর যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির একযোগে কার্য্য করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কোন বিশিষ্ট লোক বা কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান যে এই রোগ দূরীকরণে সমর্থ নহে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ইহা জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; সে হেতু সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা না করিলে অতি সামান্যও ফল লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ বিজ্ঞানবিদ্ মহ মতি Koch (কক্) যক্ষ্মা-জীবাণুর আবিষ্কার করিয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এখন আমরা এই জীবাণুর অতি ক্ষুদ্র ইতিহাস, ইহার উৎপত্তি, বিস্তৃতি, পরিণতি সকল বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারিয়াছি; তথাপি ইহাই অতিমাত্রায় বিস্ময়ের বিষয় ও বিপদের কারণ এই যে, আজ পর্য্যন্ত ইহারা প্রকৃত আরোগ্যকর কোন ঔষধের আবিষ্কার হয় নাই।

যক্ষ্মা-জীবাণুর ইতিহাসের আভাস পাওয়াতে যক্ষ্মা প্রতিষেধের কয়েকটী উপায় স্থূলতঃ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য রোগের ন্যায়, যক্ষ্মাও মানুষের অজ্ঞতার উপর আসন বিস্তার করিয়া আছে। রোগ প্রতিষেধ বিষয়ে উপেক্ষা ঐ অজ্ঞতার একটী বিশিষ্ট বন্ধু এবং উভয়ে মিলিত হইয়া যক্ষ্মার গুপ্তচররূপে তাহার ধ্বংশলীলার সাহায্য করিতেছে।

এখন উপায় কি? সত্যসত্যই কি আমরা এই ধ্বংসের করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি না? সত্যই কি আমরা কি জাতি-হিসাবে মৃত্যু-পথেরই যাত্রী? সত্য, কিন্তু আমাদিগকে জাগিতেই হইবে - এ ধ্বংসের থাণ্ডব-দাহনকে প্রতিরোধ করিতেই হইবে! আমাদের জাতীয় জীবন সাফল্য-মণ্ডিত করিতে হইলে জগতের মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেই হইবে! আমাদের উজ্জ্বল অতীত আছে, আমাদের ভবিষ্যত ইতিহাসও উজ্জ্বল করিতে হইবে।

আমাদের যতদূর মনে হয়, ইহার উপায় আছে। তাহার অধিকাংশগুলিই অতি সহজ। আমাদের দৈনন্দিন সকল কার্য্যের মধ্যেই সাবধানতা অবলম্বন করা যক্ষ্মা-প্রতিষেধের একটী প্রকৃষ্ট উপায়। কতগুলি বিষয় অতিশয় গুরু এবং তাহারা আজও বিচারাধীন। আমরা ক্রমে ক্রমে সকল বিষয় আলোচনা করিব।

শিশু-রক্ষার জন্য পিতামাতার অতি গুরু কর্ত্তব্য রহিয়াছে। যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ অতি অসহায় অবস্থায় শিশুকে আক্রমণ করে। তখন তাহাদের পিতামাতার উপরও শিশুর অসহায় অবস্থার অনুপাতে কর্ত্তব্যও গুরু হইতে গুরুতর বলিয়া মনে হয়।

সন্তান পৃথিবীতে আনয়ন করার জন্য পিতামাতা যেমন দায়ী, তাহাদের সুস্থ সবল করিয়া সযত্নে পালন করাও তাঁহাদের একটী অপরিহার্য্য কার্য্য। সেই কারণে আমাদের প্রাথমিক আলোচ্য বিষয় হইতেছে যে, পিতামাতার শরীরে রোগাধিকার থাকিলে, তাহাতে সন্তানের অবস্থা কিরূপ হওয়া সম্ভব।

যক্ষ্মা বংশানুক্রমিক কিনা?—বহুদিন হইতে লোকের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা যে, যক্ষ্মা বংশানুক্রমে মনুষ্য-দেহে সংক্রামিত হয়। একই বংশের মধ্যে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে এবং শিশু-শরীরে সংক্রামিত হওয়ায় এই ধারণা আরও প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ ও চিকিৎসক বৌমগার্টেন্ (Baumgarten)-এরও এই মত। কিন্তু এই ধারণা এখন ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে। মানব-শরীরে যক্ষ্মার স্থিতি-নির্ণয়ের জন্য যে সকল পরীক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা দ্বারা দেখা যায় যে, শিশু-শরীরে ঐ সকল পরীক্ষা যক্ষ্মার কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না, অথচ তাহারই মাতার শরীরে ঐ রোগ বর্ত্তমান আছে।

সম্ভবতঃ রোগযুক্ত মাতার নিকট শিশুকে সচরাচর থাকিতে এবং ঐ মাতার স্তন্য পান করিতে দেওয়া হয়; সেইজন্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার শরীরে রোগের সংক্রমণ হইয়া থাকে। শিশু-শরীর রোগ-প্রতিষেধের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল দেহখানি অপরিমেয় সংখ্যক বলশালী রোগ-জীবাণু কর্ত্তৃক শীঘ্রই আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে যক্ষ্মা রোগ অপেক্ষা ঐ রোগ-প্রবণতা বংশানুক্রমে সন্তানে সঞ্চালিত হয়। টুরবান প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদের মতে, মাতার ফুস্‌ফুস্ বা অন্যস্থানের রোগ সন্তান-শরীরে দুর্ব্বল ফুস্‌ফুস বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎপাদন করে। তবে যথার্থ রোগ মাতা বা পিতার শরীর হইতে আসে না। নিগ্রো, আরব প্রভৃতি জাতির ভিতর যক্ষ্মা রোগ একেবারে নাই; কিন্তু তথাপি তাহারা সভ্য জাতির সংস্পর্শে আসা মাত্র যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের রোগ ভীষণ আকার ধারণ করে। অবশ্যই তাহারা পিতামাতার দেহ হইতে রোগ লাভ করে নাই; তথাপি তাহারা রোগগ্রস্ত হইয়া অতি শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার কারণ কি? যে সমাজে যক্ষ্মা রোগ নাই, সেখানকার লোকেদের মধ্যে রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতাও নাই এবং সেইজন্য তাহারা এত যক্ষ্মারোগ-প্রবণ।

যক্ষ্মা রোগীর বিবাহ করা উচিৎ কিনা?—এই স্থানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—যক্ষ্মা রোগীর বিবাহ করা উচিত কি না? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রোগীর সন্তান জন্মকালে রোগাক্রান্ত না হইলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাহার শরীরে রোগ সংক্রামিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে এবং পিতামাতার শরীর হইতে অস্থি, গ্রন্থি, ফুসফুস প্রভৃতি দুর্ব্বল অঙ্গ লাভ করিয়া শীঘ্রই যক্ষ্মাগ্রস্ত হইতে পারে। যক্ষ্মা-বীজাণু সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানেই বিশেষতঃ সভ্যজগতে—বর্ত্তমান আছে। সেই জন্য তাহাদের প্রসারলাভের উপযোগী স্থান পাইলেই আনন্দে স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই সকল কারণে আমাদের মতে রোগগ্রস্ত লোকের বিবাহ করা কোন মতেই উচিৎ নহে। তাহাতে তাহারা যে নিজেদের জীবন শীঘ্র ক্ষয় করিয়া ফেলে তাহা নহে, তাহারা রোগপ্রবণ সন্তান-সন্ততি সমাজকে দান করিয়া সমাজ-শরীরকেও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

বিবাহিত জীবনে পুরুষ অপেক্ষা নারীর অবস্থা অধিকতর চিন্তার কারণ উপস্থিত করে। যৌন সংসর্গ হেতু পুরুষ ও নারী উভয়েরই শরীর দুর্ব্বল হয়, এবং রোগ তাহাতে অতিমাত্রায় শক্তিলাভ করে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে বিপদ আরও অধিক। গর্ভধারণের ফলে সমস্ত শরীর দুর্ব্বল হয়, এবং বহুক্ষেত্রে ঐ সময়ে বা প্রসবের পরে যক্ষ্মা ও অন্যান্য নানাপ্রকার রোগ আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। এই কারণে ক্ষয়রোগ-গ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ-নিবারণের জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়।

যদি কোন রোগিনীর গর্ভ-সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে গর্ভধারণ কালে ও প্রসবের অন্ততঃ ছয় মাস পর পর্য্যন্ত অতিমাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করিয়া রোগের পুনরাক্রমণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য যক্ষ্মাগ্রস্তা নারীর সুস্থ সন্তান প্রসব করা নিতান্ত বিরল নহে।

যদি বিবাহ ও পরে সন্তান-পালনের জন্য সাংসারিক দুশ্চিন্তা অত্যধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে পুরুষের বিবাহ না করাই মঙ্গল। অর্থাভাব—সাধারণতঃ বহুতর অসুবিধা ও রোগের মূল। সেইজন্য অর্থের অপ্রতুলতা হেতু অশন, বসন, সন্তান-পালন, শিক্ষা প্রভৃতি ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য দুশ্চিন্তা দ্বারা রোগীর মনকে ও শরীরকে ব্যস্ত করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। যদি একান্তই

রোগ-সন্দেহযুক্ত নারী বা পুরুষের বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহাদের সাধারণতঃ স্বতন্ত্র গৃহে বাস করা শ্রেয়ঃ এবং বহুদিন অন্তর স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হওয়া মঙ্গল।

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য।—জাত সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য অসীম, বিশেষতঃ তাহাদিগকে শরীরে ও মনে "মানুষ" করিয়া তোলা একটী অতি গুরুতর কার্য্য। শৈশবে যদি শরীর দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা ভবিষ্যৎকালে কোন শ্রমসাপেক্ষ কার্য্য আশা করা যায় না। পিতামাতা যদি রুগ্ন হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য শতগুণ বৃদ্ধি পায়। নিজেদের শরীরের রোগ যাহাতে সন্তান শরীরে বিস্তার লাভ করিতে না পারে, সেই চেষ্টা বিশেষভাবে করা উচিত। সন্তান-রক্ষার জন্য কোনরূপ সতর্কতাই কঠিন ও কষ্টদায়ক মনে করা উচিত নহে। মাতা যদি যক্ষ্মা রোগিনী হন, সন্তান-পালনের ভার সদ্য সদ্যই অপরের উপর ন্যস্ত করিতে হয়। মাতা প্রাণে বেদনা অনুভব করিবেন বলিয়া তাঁহার কোল হইতে সন্তান 'ছিনাইয়া' লইতে দ্বিধা বোধ করা কোনরূপেই সঙ্গত নহে। মাতার স্তন্য দানের পরিশ্রম রুগ্ন মাতার শরীরে বিষম অনর্থ উপস্থিত করিতে পারে; উপরন্তু ঐ মাতার দুগ্ধ এবং সন্তান-পালনের সময় স্নেহের দান—স্বর্গের মাধুর্য্যজড়িত চুম্বন যে সন্তানকে মৃত্যুর পথের যাত্রী করিয়া দেয়, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া বাহ্যিক নিষ্ঠুরতার সহিত কর্ত্তব্য-সম্পাদনে পশ্চাৎপদ হওয়া বিষম ভুল। সন্তান স্থানান্তরে পালিত হইলে যে তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্প থাকে, সে বিষয় জননীকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে অন্য কোনো সুস্থ আত্মীয়ের দ্বারা পালন করানো নিতান্ত কঠিন ব্যাপার নহে।

ধাত্রীর দ্বারা সন্তান পালন।—যে ধাত্রীর নিকট সন্তান পালনের ভার দিতে হইবে, তাঁহার কোনরূপ রোগ আছে কি না সে বিষয় বিশেষরূপ জানিয়া লইতে হয়। আত্মীয়ার মধ্যে যদি কেহ ভার লয়েন, তাহা হইলে বহুদিকে সুবিধা হইতে পারে, বিশেষ মাতার মনের দিক দিয়া। কিন্তু একই বাড়ীতে মাতার সহিত শিশুকে পালন করিতে দিতে নাই; তাহা হইলে সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিবার লোভ মাতার পক্ষে সময় সময় এত প্রবল হওয়া সম্ভব যে তাহা রোধ করা অতি বড় পাষণ্ডেরও সাধ্যাতীত। তদ্ব্যতিরেকে, যক্ষ্মা রোগীর সহিত শিশু-পালন যে অতি মাত্রায় বিপজ্জনক তাহা আমরা বারংবার বলিতেছি। শিশুর দুগ্ধ জীবাণুশূন্য করিয়া তবে পান করিতে দিতে হয় এবং যদি "বোতলে" করিয়া দুগ্ধ পান করাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।

শিশুপালনে সতর্কতা।—এই প্রসঙ্গে আমরা শিশু পালনের উপযোগী মোটামুটী আরও কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। শিশু পালন করিতে হইলে এই সকল বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। শিশু শরীরে সহজে রোগ সংক্রামণের বহুতর সুবিধা আছে; সেই জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য আমরা পুনঃ পুনঃ একই বিষয়ের অবতারণা করিতে বাধ্য হইতেছি।

শিশুর স্বভাব, তাহারা যাহা পায় তাহাই মুখে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তাহাদের লজ্জা-ঘৃণা-ভয়-রূপ প্রতিবন্ধকগুলি এককালে নাই; কাযেই তাহাদের সকল কার্য্যই একটু স্বতন্ত্ররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, আহার বিষয়েও তাহাই। সেকারণ, তাহাদের খেলিবার সামগ্রীগুলি যাহাতে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে এবং প্রত্যহ বিশেষ যত্নের সহিত কয়েকবার ধুইয়া ফেলা হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিধেয়। তাহারা যাহাতে জুতা, ঝাঁটা প্রভৃতি দ্রব্য হাতে না পায়, সেরূপ নিরাপদ স্থলে রাখিয়া দিতে হয় এবং অসাবধানতা প্রযুক্ত যদি হাত দিয়া ফেলে, তাহা হইলে হাত ভাল করিয়া ধুইয়া দেওয়া ভাল। তাহাদের ক্রীড়ার ও বিচরণের স্থান বাটীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অংশ ও শয়নের জন্য রৌদ্র-বাতাস-যুক্ত গৃহ নির্দ্ধারিত করা উচিত। তাহাদের দেহের বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা অভ্যন্তরভাগ সুস্থ রাখিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করে। ছোট ছেলেদের যক্ষ্মা রোগীর গৃহে কদাচ যাইতে দিতে নাই; এমন কি সকল স্থানে সন্তানবতী মাতাকেও যাইতে না দেওয়া মঙ্গল। যক্ষ্মারোগীর নিকট হইতে কোনরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিতে দিবে না, তাহাদের হাত হইতে কোন বস্তু লইতে না দেওয়া যদি সম্ভবপর হয়, তাহাও করিতে হইবে। যক্ষ্মা রোগীর চুম্বন করা একেবারে নিষিদ্ধ।

শিশু বালক হইলে, বিশেষতঃ তাহারা যদি যক্ষ্মা-রোগীর সন্তান হয়, তাহার প্রতিপালনের নিয়মগুলি যতদূর সম্ভব কঠিন দুর্লঙ্ঘ্য রাখিতে হয়। যাহাতে তাহার মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা অত্যধিক হইয়া না পড়ে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোনরূপ নূতন লক্ষণের আবির্ভাব হইলে চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। কোনরূপ উৎকট রোগের হাত হইতে মুক্ত হইবার পর, বা হাম ও হুপিংকফ প্রভৃতি রোগের পর, যক্ষ্মা বিস্তারের একটী কাল উপস্থিত হয়, সে জন্য ঐ সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। শারীরিক অসুস্থতা যদি না ঘটে, তাহা হইলে যক্ষ্মা-প্রবণ বালকের সামান্য ব্যায়াম বিশেষ উপযোগী।

ফুসফুসের যক্ষ্মা।—শিশুশরীরে যক্ষ্মার লক্ষণ-সকল প্রকাশ পাইবা মাত্র যাহাতে শীঘ্র তাহারা সুচিকিৎসকের সাহায্য পায়, তাহ'ই তাহার পক্ষে যক্ষ্মার প্রধান ঔষধ। সাধারণতঃ শিশুকালে যক্ষ্মার লক্ষণসকল বেশ পরিস্ফুট হয় না। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, যক্ষ্মার প্রথম অবস্থার লক্ষণগুলি অন্য রোগের লক্ষণের সহিত গোলমাল হইয়া যায়, এবং যথার্থ রোগ বহুকাল ধরা পড়ে না। সংক্ষেপতঃ ফুসফুসের ক্ষয়রোগে গাত্রতাপ সামান্য বৃদ্ধি পায়, অলসতা ও খেলায় বিতৃষ্ণা, মানসিক দুর্ব্বলতা, অগ্নি-মান্দ্য, উপযুক্ত আহারেও শরীরের ক্ষয়, এবং দেহের পরিমাণ বৃদ্ধি না হওয়া স্ফূর্ত্তির অভাব এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী কাসি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাসি খুব গুরুতর ভাব ধারণ করে এবং সাধারণতঃ হুপিং কাসির ন্যায় ঘন ঘন হইয়া থাকে, কিন্তু "হুপ" "হুপ" শব্দ থাকে না।

(ক্রমশঃ)

অজীর্ণ রোগে স্বায়ত্ত চিকিৎসা।

[ডাঃ শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ, এম্, বি, বিদ্যাভূষণ।]

কেন লিখিলাম?

বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট নিবেদন এই যে, নিম্ন-লিখিত চারিটি কারণে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতেছি, ও তাঁহাদের হস্তে পাঠের জন্য সাহস করিয়া অর্পণ করিতেছি:—

১। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী আছি, এবং এই দীর্ঘকালে বাঙ্গালী ও ভারতীয় অন্যান্য বহু জাতীয় অজীর্ণ রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি।

২। নিজে বহু বৎসর এই রোগভোগ করিয়াছি; আরোগ্যলাভ করিবার জন্য ও রোগীগণকে আরোগ্য করিবার জন্য বহু অধ্যয়ন, চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ফল এই পাইয়াছি, যে রোগ বহু বৎসর অত্যাচারী প্রভু হইয়া আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, ভগবৎ কৃপায় তাহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছি, এবং যাঁহারা আমার উপদেশ সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহারাও অধিকাংশই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

৩। এই জন্য বড় সাধ হইয়াছে যে, আমার স্বদেশীয় নরনারীগণের মধ্যে যাঁহারা এই রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিই—কিরূপে এই কষ্টকর রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, পুনরায় জীবন-ধারণের সুখভোগ করিতে পারেন।

৪। আমাদের দেশের লোকের বর্ত্তমান কালের খাদ্য পেয়, আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিয়া অজীর্ণ রোগের চিকিৎসার একখানি পুস্তকও ইংরাজি, বাঙ্গলা বা অন্য কোন ভাষায় লিখিত হয় নাই, সেই অভাব দূর করা এই পুস্তকের ৪র্থ উদ্দেশ্য।

উপক্রমণিকা।

ইংরাজিতে যাহাকে "ডিসপেপ্‌সিয়া" বলে, আমাদের বৈদ্য শাস্ত্রে তাহাকেই "অজীর্ণ" "মন্দাগ্নি" প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ইহাতে অম্লের লক্ষণ প্রবল থাকে এবং বেদনাও অতিশয় কষ্টদায়ক থাকে বলিয়া তখন অনেকে ইহাকে "অম্লের পীড়া" "অম্লশূল" প্রভৃতি নাম প্রদান করেন। সকল দেশে সকল সময়ে ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের ভিতর এই রোগ দেখা যায়। কিন্তু জীবন-যুদ্ধের আত্যন্তিক্ পরিশ্রম, সাংসারিক দুশ্চিন্তা, দরিদ্রতা, প্রভৃতি কারণে বিগত পঞ্চাশ যাইট বৎসর হইতে বাঙ্গালা দেশে এই রোগের অভ্যুত্থান, ক্রম-বিস্তার ও রাজ্য-স্থাপন যেরূপ অব্যাহত-ভাবে হইয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তঃপুর-বাসিনী মহিলাগণের অর্দ্ধেকের অধিক এবং পুরুষগণের—বিশেষতঃ নগরবাসী পুরুষগণের অধিকাংশই এ রোগের কবলে পতিত হইয়া দুঃখময় জীবন যাপন করিতেছেন।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, এই রোগ আরোগ্য হয় না। একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। তবে পুরাতন রোগ যে ডাক্তার, বৈদ্য প্রভৃতির চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তাহার কারণ তিনটী।

১ম। কতকগুলি অবস্থা এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় থাকে, যে তাহার উপর চিকিৎসকের আধিপত্য চলে না। রোগীর "ধাতু" বা "প্রকৃতি" "প্রবৃত্তি" বা "পেশা" "অভ্যাস" ও "রুচি"-পরিবর্ত্তন করা চিকিৎসকের অসাধ্য। আবার, এত বিভিন্ন এত বিভিন্ন কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয় যে, অনেক সময়ে দুইজন রোগীকে এক প্রকার ব্যবস্থা দেওয়া চলে না। [illegible] ভিতর দীর্ঘকাল আপাহার, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও তৎসঙ্গে জীবন-যাত্রার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম বশতঃ যৌবনের মধ্যভাগ হইতে যে অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নিদান ও চিকিৎসা এক প্রকার; সঙ্গতিপন্ন বিলাসী লোকগণের আলস্য, অতি ভোজন, ও বৃথা আমোদজনিত অজীর্ণের চিকিৎসা অন্য প্রকার। ইহাদের লক্ষণ একপ্রকার হইলেও একজনের নিকটে যে খাদ্য-পেয়-ঔষধাদির ব্যবস্থা অমৃত তুল্য, অপরের নিকট তাহা বিষবৎ ফলপ্রদ। আমিষ-ভোজী রোগীগণকে মৎস্য মাংসাদি পথ্য দিয়া চিকিৎসা না করিলে সে তাহা গ্রাহ্যই করিবে না, অথচ নিরামিষ ভোজীকে দুর্ব্বল দেখিয়া ঐ সকল পদার্থ দিলে রোগ বাড়িয়া যাইবে। রাত্রিকালে আহারের অব্যবহিত পরে শয়ন করিলে, অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়, ইহা সমস্ত পৃথিবীর লোকে জানে। কিন্তু এই বাঙ্গলা দেশেই সহস্র সহস্র লোক এমন আছেন, যে রাত্রি কালের আহারের পর দশ মিনিটের মধ্যে শয়ন করিতে না পাইলে, নিদ্রাও আসে না, হজমও হয় না। আশৈশব অভ্যাস, সঙ্গ-দোষ প্রভৃতিতে বহু রোগী এমন স্থায়ী ভিত্তির উপর নিজ নিজ রোগ গাঁথিয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন তাহাও স্বীকার, কিন্তু চিকিৎসককে অগ্রসর হইয়া কুরীতির ভিত্তি খনন করিতে দিবেন না।

২য়। নিজেই নিজের শত্রু। যাহারা ধন, মান, প্রভৃতি উপার্জ্জনের জন্য অযথা পরিশ্রম করিয়া এই রোগ ভোগ করেন, তাঁহাদের ঐ সকল বৃত্তি এত প্রিয় যে তজ্জন্য তাঁহারা নিজের জীবন ও স্বাস্থ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই গৌরব মনে করেন। তাঁহারা পিতা মাতা বন্ধু বা স্ত্রীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ হাসিয়া উড়াইয়াছেন, এবং কেবলমাত্র যখন রোগের যন্ত্রনায় আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া আসে, তখনই দিন কয়েক ঈশ্বর ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং কষ্টকর উপসর্গগুলি একটু কম পড়িলেই উভয়-কেই ভুলিয়া যান। আর যাঁহারা চা, তামাকু, মদ্য, অহিফেন প্রভৃতি অভ্যাসের ক্রীতদাস হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা অতি ভোজন, অসময়ে ভোজন, অথবা কোন গোপনীয় পাপের দাসত্ব করিতেছেন, তাঁহারা তো কিছুতেই

চিকিৎসককে নিজ রোগ আরোগ্য করিবার জন্য ঐ সকল অভ্যাস ভাঙ্গিতে দিবেন না। ভারপূর্ণ শকট যেমন দুইখানি চাকার উপর ভর দিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়, রোগভাব পূর্ণ দেহকেও আরোগ্যপথে চলিবার জন্য চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই পরস্পরের সেইরূপ সমতুল্য সাহায্য প্রয়োজন। একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন শকট আর অগ্রসর হইতে পারে না, সেইরূপ রোগী ও চিকিৎসকের একজন অমনোযোগী হইলেও রোগ আরোগ্য হয় না। সুতরা যখন পথ্য ঔষধাদির কঠোর নিয়মে বিরক্ত হইয়া রোগী দিন দিন চিকিৎসকের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিতে থাকেন, তখন অনন্যউপায় হইয়া চিকিৎসক রোগীকে—"আপনি আর এখানে থাকিবেন না. 'চেঞ্জের' জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাউন" বলিয়া নিজের মান বাঁচাইয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৩য়। ঔষধে রোগ ভাল হয় না। চিকিৎসকের দ্বারা এই রোগ আরোগ্য না হওয়ার সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, অজীর্ণ রোগ প্রাচীন হইলে আর কোনও ঔষধে আরোগ্য হয় না। ইহা চিকিৎসক বা রোগীর দোষ নহে, ইহা রোগের দোষ। জ্বরে যেমন কুইনাইন, বাতে যেমন 'স্যালিসিলেট' বর্গ, উপদংশে যেমন পারদ-বিশিষ্ট ঔষধ, সেইরূপ ধন্বন্তরিবৎ অজীর্ণ রোগের কোন ঔষধ নাই। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, হকিমি বা অন্য কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই। এই রোগের সকল ঔষধই আশু শান্তিপ্রদ; কিন্তু স্থায়ি ফল-দানে অক্ষম। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, দীর্ঘকাল ঔষধ সেবন করিলে এমন দিন আসে যে, তখন আর কোন ঔষধে তিল মাত্রও উপকার হয় না। তখন সহস্র সহস্র রোগী নিরন্তর মুষ্টিযোগ ও টোটকা ঔষধ, স্বপ্ন-দত্ত ও অবধৌতিক ঔষধ সেবন করেন; দেশী, বিলাতি, ফরাসি, জার্ম্মান, মার্কিন দেশীয় পেটেণ্ট ঔষধে দেহ বোঝাই করেন; পরিশেষে মাদুলি, কবচ ধারণ, মন্দিরে-মঠে হত্যা দেওয়া প্রভৃতি অনেক অনুষ্ঠান করেন, এবং যদি কিছুতেই আরোগ্য না হয়, তখন হতাশ হইয়া শেষের সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন।

স্বয়ংচিকিৎসা।

চিকিৎসক যখন আরোগ্য করিতে পারেন না, তখন কি এই রোগ কেহই আরোগ্য করিতে সমর্থ নহেন? পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে এই রোগের প্রাচীন অবস্থায় যে নানাবিধ উপসর্গ বর্ণিত হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া এই ব্যাধি রাক্ষসীকে "Mother of a Hundred Diseases". বা "শত রোগের জননী" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কে ইহার এই শত অসুর-পুত্রকে বিনাশ করিতে সক্ষম? কে এই রোগের মূল উৎপাটন করিয়া মানব-দেহকে নিরাময় করিতে সমর্থ? ইহার একমাত্র উত্তর—"রোগী স্বয়ং"। ভিতরকার যন্ত্রগুলি খারাপ হইবার পূর্ব্বে, রোগী যদি বদ্ধ-পরিকর হইয়া স্বীয় চিকিৎসায় অগ্রসর হয়েন এবং "নিশ্চয়ই আরোগ্য হইব" এই ধ্রুব বিশ্বাসে বলীয়ান্ হইয়া আত্ম-চিকিৎসা করিতে থাকেন, তবেই আরোগ্য হইবেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন "ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসো সিদ্ধেঃ প্রথম-লক্ষণং"।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

সৃষ্টির সার মানব, মানবের সার শুভকার্য্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। অনন্যমনা হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক যে কেহ প্রত্যহ ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনিই তাঁহার সত্ত্বা ও করুণা অনুভব করিতে পারেন। একাগ্র চিত্তে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে তিনিই সহায় হন। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা তাঁহার প্রিয় কার্য্য। তাঁহার প্রদত্ত অন্ন যদি আমরা প্রত্যহ তৃপ্তিপূর্ব্বক খাইতে ও জীর্ণ করিতে পারি, তাহাতে তিনিও তৃপ্ত হ'ন। তবে কেন ঘরে অন্ন খাইতে অজীর্ণ রোগে ভুগিব ও জল-সাগু খাইয়া দিনপাত করিব? ইহা নিশ্চয়ই কোন শত্রুর কায। কে সেই শত্রু? সে শত্রু আর কেহ নহে, কেবল আমাদের অসংযত মন। এই নিকৃষ্ট মন সর্ব্বদাই আমাদিগকে প্রথমে মিষ্ট, পরিণামে বিষময় ফলপ্রদ যে সকল কার্য্য, তাহাতেই ভুলাইয়া

লইয়া ষায়। ইহাই আমাদের জীবাত্মার নিকৃষ্ট অংশ; ইহারই পরামর্শে চলিয়া আমরা নানাবিধ রোগের হস্তে পতিত হই। ইহারই প্ররোচনায় আমরা মন্দ অভ্যাসগুলি ছাড়িতে পারি না বলিয়া যাবজ্জীবন এই জাতীয় রোগ ভোগ করি।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে এক উৎকৃষ্ট মন আছেন, তাঁহার নাম বিবেক-বুদ্ধি। তিনিই—মানুষের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ থাকিয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে মন্দ পথ হইতে, রোগের পথ হইতে, দুঃখের পথ হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই বন্ধুর অনুরোধ আমরা শুনি না। শত্রুর পরামর্শে ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বদাই নিজের গলায় ছুরি দিবার চেষ্টা করি। যখন কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া আসিয়া রাত্রিতে আত্মগ্লানি বশতঃ শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করি, যখন অত্যন্ত ধন-মান-বিদ্যা বা ভোজ্য-পেয়-লোভের ফলে অম্লশূলের যন্ত্রনায় চিৎকার করিতে থাকি, তখন এই বন্ধু মনের ভিতর উদয় হইয়া বলেন, "আমি তো বারণ করিয়াছিলাম - তুমি মানিলে না, এখনও আমার কথা শুন, এখনও আরোগ্যলাভ করো"। যে কেহ এই বন্ধুর কথা একবার মানিতে আরম্ভ করেন, তিনিই স্বায়ত্ত চিকিৎসার পথে, আরোগ্যের পথে আপন-আপনি অগ্রসর হইলেন। জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভগবদ্‌গীতা বলিয়াছেন "যে মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মা দ্বারা নিকৃষ্ট আত্মাকে জয় করিতে পারে, সেই নিজের বন্ধু, আর যে তাহা পারে না সে নিজেই নিজের শত্রু"। (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৫৩৬ শ্লোক)

একাগ্রতা।

শ্রেষ্ঠ আত্মার অভয় বাণী যে দিন সৌভাগ্যবান রোগীর কর্ণে মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সেই দিনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মানসপুত্র—একাগ্রতা রোগীকে আরোগ্যের পথে অগ্রসর ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া যায়। রোগী যাহা করে, যাহা দেখে শুনে, তাহাতেই নিজের রোগের কারণ বুঝিতে পারে এবং মনে মনে বলে "হায় এতদিন কেন বুঝি নাই"। তখন প্রবল বাত্যার সম্মুখে তৃণ-খণ্ড সকল যেমন উড়িয়া যায়, তেমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও একাগ্রতার সম্মুখে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূরে চলিয়া যায়, রোগী দ্রুতপদে স্বায়ত্ত চিকিৎসার পথে অগ্রসর হয় ও অদূরে আরোগ্যের দিব্য দ্যুতিমান্ মঙ্গলময় মন্দির দেখিতে পায়।

এই গ্রন্থে যে সকল চিকিৎসা বর্ণিত হইবে, তাহার কিয়দংশ চিকিৎসকের আয়ত্ত, অধিকাংশই রোগীর স্বায়ত্ত। সুতরাং রোগী যদি নিজের রোগের দৈনন্দিন গতি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একখানি রোজনামচার পুস্তিকা রাখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। ঐ পুস্তকের উপরিভাগে লিখিয়া রাখিবেন "ধ্রুবমেবারোগ্যং মে ভবিষ্যতি—" আমি নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিব, কিছুতেই তাহার বিঘ্ন হইবে না!

(ক্রমশঃ)

ভাইটামিনের কিছু

[ডাঃ শ্রীপঞ্চানন বসু এম্-ডি (বার্লিন্)]

ভাইটামিন বলিতে খাদ্যের সূক্ষ্ম সঞ্জীবনী রস বোঝায়। শরীরের বৃদ্ধি ও পোষণের জন্য এবং শরীরের সমস্ত যন্ত্রের নিয়মিত ক্রিয়ার জন্য এই ভাইটামিনের দরকার। শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য, স্ত্রীলোকদের গর্ভধান ও প্রসবের পর যতদিন শিশুকে স্তন্যদান করিতে হয় সে সময়ে, কোন অসুখের পর···ইত্যাদি সময়ে খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন থাকা আবশ্যক। তা'ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করিবার জন্য, প্রত্যহ মল পরিষ্কার হইবার জন্য, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর করিবার জন্য ভাইটামিনযুক্ত খাদ্য খাওয়া আবশ্যক।

কলিকাতা সহরে বেরিবেরি হইবার পর হইতে অনেকেই ভাইটামিন নামটি শুনিয়াছেন। খাদ্যে যে ভাইটামিন থাকা দরকার তাহাও শুনিয়াছেন। তা'ছাড়া আজকাল সহরে এবং সুদূর পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত যেরূপ ভেজাল ও নকল খাদ্যদ্রব্যের আমদানি হইতেছে, তাহার বেশীর ভাগের ভিতরই কোন ভাইটামিন থাকে না। সেজন্য কোন্ খাদ্যে কি পরিমাণ কোন্ জাতীয় ভাইটামীন্ আছে, তাহা প্রত্যেকেরই জানা আবশ্যক। বাড়ীর গৃহিনীরা যদি নিম্নলিখিত তালিকা দেখিয়া বাড়ীর লোকেদের খাবার ব্যবস্থা করেন, তাহা পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে এবং বাড়ীতে অসুখের মাত্রা কমিয়া যাইবে। অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সাধারণ গৃহস্থ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, সেই অর্থ দিয়া যদি তাঁহারা পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয়ে খরচ করেন, তাহা হইলে সেই অর্থের দশগুণ ফল তাঁহারা পরে পাইবেন।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা যদি প্রত্যেকে তাঁহাদের গৃহিনীর হস্তে দেন, তাহা হইলে তাঁহারা সহজেই পুষ্টিকর খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।

ভাইটামিন-এ

প্রচুর পরিমাণে	অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে	নগণ্য পরিমাণে
টাট্‌কা মাখন, কাঁচা ঘি, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির ডিমের কুসুম, দুধের মাটা, ক্রিম, মাংসের মিটুলি, কড্-লিভার অয়েল।	ইলিশ, রুই, ভেটকি, মাগুর, বাটা, ট্যাংরা, পুঁটি, খয়রা, খলিসা প্রভৃতি মাছ, দুধ (যে গাভী বা ছাগল কাঁচা ঘাস খায় ও ফাঁকা মাঠে চরে, তাহার দুধ)	ছাগল বা ভেড়ার চর্ব্বি, বাঁধাকপি, শাকপাতা, গাজর, ইত্যাদি।

শিশুদের বৃদ্ধির জন্য ও হাড় শক্ত হওয়ার জন্য এ-ভাইটামিনের বিশেষ প্রয়োজন। ইহার অভাব হইতে শিশুদের রিকেটস্ রোগ হইতে দেখা যায়।

এ-ভাইটামিন বেশী উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য ঘি মাখন গলাইলে বা দুধ অনেকক্ষণ জাল দিলে ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। দুধ pasteurised করিলে দুধের বিষাক্ত জীবাণু মরিয়া যায়, অথচ ভাইটামিন নষ্ট হয় না। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে pasteurise করা শক্ত; সেজন্য দুধ জাল দিয়া, যদি অন্ততঃ ১৫।৩০ মিনিট কাল রৌদ্রে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই দুধে পুনরায় ভাইটামিনের শক্তি সঞ্চারিত দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ছেলেদের জন্য যে দুধ দিতে হইবে, তাহা যতদূর বিশুদ্ধ হয় ততই ভাল, এবং যে গাভী কাঁচা ঘাস খায়, সে গাভী হইতে এই দুধ লওয়া উচিত। এইরূপ দুধ জাল দিয়া রৌদ্রে রাখিয়া ছেলেদের খাওয়াইলে ছেলেদের রিকেটস্ হয় না।

ডিম কাঁচা বা অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া খাইলে তাহাতে অধিক পরিমাণে ভাইটামিন থাকে। ডিমভাজা বা ডিমের বড়া প্রভৃতিতে ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়।

বি-ভাইটামিন বেরিবেরি-প্রতিষেধক। ইহার অভাব হইতে পরিপাক-ক্রিয়ার বিশেষ ব্যাঘাত হয়। কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও তাহার আনুসঙ্গিক মাথাধরা, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ অথবা পাত্‌লা বাহ্যে ও হৃদি-স্ফীতি, দৌর্ব্বল্যাদি ইহার অভাবে দেখা দেয়। এই ভাইটামিনের অভাবে জীবন ধারণ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

ভাত রাঁধিয়া ফেন গালিলে, তরি-তরকারী সিদ্ধ

করিয়া জল ফেলিয়া দিলে, তাহার সহিত প্রায় সমস্ত ভাইটামিন বাহির হইয়া যায়। অতএব ভাত রাঁধিতে, তরি-তরকারি সিদ্ধ করিতে এমন ভাবে আন্দাজ করিয়া জল দিতে হইবে, যাহাতে ফেন গালিতে না হয় ও জল ফেলিয়া দিতে না হয়। জলের ভাপে যদি তরিতরকারি সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে ভাইটামিন নষ্ট হয় না।

ভাইটামিন-বি

প্রচুর পরিমাণে	অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে	নগণ্য পরিমাণে
ডিমের কুসুম, আখরোট, বাদাম পেস্তা প্রভৃতি, কড়াইশুটি, বরবটি, সিম, প্রভৃতি, মাংসের মিটুলি, কলা-গজান ছোলা, ঈষ্ট (yeas')	জাঁতায় ভাঙ্গা আটা, আঁকাড়া চাউল, মাছের ডিম।	আম, কাঠাল, জাম, খেজুর, কিস-মিস, মনক্কা প্রভৃতি, শাকপাতা, তরিতরকারি, দুধ।

ছাঁকা তৈলে তরিতরকারি ভাজিলে ভাইটামিন সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য কচুরী, বেগুনি, ফুলুরী, জিলাপী, ভাজা-পিঠা, লুচি, পাঁপর প্রভৃতির ভাইটামীনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

সেজন্য ছেঁচকী করিয়া কিংবা তরিতরকারি সিদ্ধ করিয়া কিম্বা অল্প ঘৃতে সাঁৎলাইয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত। মুখরোচো করিয়া রান্না করিতে গিয়া অনেক সময় ভাইটামিন নষ্ট হয় বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া যে মুখরোচক করিয়া আদৌ রান্না করিবে না, এমন নহে। তরি-তরিকারি রুচীমত প্রস্তুত করিয়া যদি তাহাতে "ঈষ্টের" গুড়া দিয়া খাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাইটামিনের অভাব অনেকটা পূরণ হইতে পারে।

কলের ছাঁটা চালে বা কলের ময়দায় ভাইটামিন নাই। তাহা মোটেই ব্যবহার করা উচিত নয়।

ভাইটামিন-সি

প্রচুর পরিমাণে	অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে	নগণ্য পরিমাণে
কমলা ও গোঁড়া, বাতাপি লেবু প্রভৃতি, বিলাতি বেগুন, বাঁধাকপি, পালম শাক।	মূলা, লাউ, কুমড়া, পেঁয়াজ, লসুন।	আলু, গাজর, ফুলকপি, মাংসের মিটুলী, দুধ, lime juice প্রভৃতি।

এই সি-ভাইটামিনের অভাব হইতে স্কার্ভি (দুষ্ট মুখক্ষত) রোগ হইতে দেখা যায়।

নিম্নলিখিত জিনিষগুলিতে ভাইটামিন নাই।

সরিষার তৈল, অলিভ তৈল, চর্ব্বিমিশ্রিত ভেজাল ঘৃত, নকল ঘি বা ভেজিটেবল ঘি, নকল মাখম বা মারগারিন, বাজারের ঘি-ভাজা খাবার, পেটেণ্ট ফুড, পার্লবার্লি, সাগু, জ্যাম জেলি, চিনি, সাদাসাদা কলের চাল, চা, কফি ইত্যাদিতে কোন ভাইটামিন নাই।

অবশ্য খাদ্য হিসাবে উপরিউক্ত অধিকাংশ জিনিষের প্রয়োজনীয়তা আছে বটে; কিন্তু যেক্ষেত্রে ভাইটামীনের অভাব বশতঃ শরীরের উপযুক্তরূপে বৃদ্ধি ও পোষণ হইতেছে না বলিয়া মনে হইবে, সেক্ষেত্রে উপরের তালিকাগুলিতে ভাইটামিন বহুল যে সব খাদ্যের বলা হইয়াছে, সেই সব বেশী পরিমাণে খাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। মোটের উপর বলিতে গেলে, যাহাতে বাড়ীতে বিশুদ্ধ দুধ, ভাল মাখন, খাঁটি ঘি, টাটকা ডিম, মাছ, ঢেঁকি-ছাটা চাল, জাতা-ভাঙা আটা, টাট্‌কা তরিতরকারি ও পাকা ফলমূল আহারের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেজন্য বাড়ীর গিন্নি ও কর্ত্তা—দুইজনেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

আমার আমেরিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবর)]

পাঠকগণ আমার বিগত প্রবন্ধে জানিতে পারিয়াছেন যে, আমার ম্যানেজার ও মিঃ কালির নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, আমার প্রতিবাদ ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই আমাকে হল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান্—টমি ড্রাকের সহিত কুস্তী করিবার একরার-পত্রে সহি করিতে হইল। হাতে মাত্র এক সপ্তাহ সময় আছে; তখনো পর্য্যন্ত আমেরিকার জল-বাতাস ভালো করিয়া আমার গায়ে বসে নাই, তার উপর আমেরিকা-প্রচলিত কুস্তীর বিশিষ্ট প্যাঁচ-কায়দা একেবারে অজানা! যখন দেখিলাম, কোন মতেই এ কুস্তীর হাত এড়াইবার উপায় নাই, তখন প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার নিকট মূল্যবান বলিয়া মনে করিলাম। বৃথা আফ্‌শোষ পরিত্যাগ করিয়া, নিজেকে ওয়াকিব্‌হাল করিয়া লইতে একটা ভালো আখড়া বা ব্যায়ামাগার খুঁজিবার চেষ্টায় রহিলাম—যেখানে কোনো উপযুক্ত কুস্তীগীরের নিকট সেখানকার কায়দা-কানুনগুলি মোটামুটি শিখিয়া লইতে পারি। অনেক জায়গায় ঢুঁড়িয়া শেষে জর্জ্জ বথ্‌নারের আখড়াই আমার নিকট পছন্দসই হইল। মালিক আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, পরদিন হইতে তিনি আমাকে একজন কুস্তী শিক্ষা দিবার লোক দিবেন। যাহাহউক, আখড়া ঠিক করিয়া সেই দিনই আমি কাছে-পিঠে একটা থাকিবার জায়গা খুঁজিয়া লইলাম, কারণ কুস্তী শিক্ষার অবস্থায় বিশেষ বিশেষ অনুমোদিত আহার্য্য গ্রহণ করিতে হয়—যাহা সাধারণ হোটেলে মেলা দুর্ঘট। এই সকল যোগাড়ের ব্যাপারে আমার ম্যানেজার অবশ্য সাহায্য করিলেন। সেই দিন রাত্রেই তিনি কিছুদিনের জন্য "বাফেলো" নামক স্থানে যাত্রা করিলেন, সেখানে তাঁহার ইন্‌সিওরেন্সের কারবার আছে। ম্যানেজারের এক বন্ধু আমার তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন।

পরদিন সকালে আমার শিষ্য শ্রীমান্ বনমালী ঘোষ ও ম্যানেজারের বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আখড়ায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু যে কুস্তীগীরের আমার শিক্ষাভার লইবার কথা ছিল, তাঁহার টিকি দেখিতে পাইলাম না। সেখানে ব্যায়াম ছাড়া আর কিছু করিবার উপায় না দেখিয়া, আমার শিষ্য বনমালীর সঙ্গেই খানিকক্ষণ লড়া গেল। কিন্তু তাহাতে আমার উদ্দেশ্য ত বিশেষ কিছুই সিদ্ধ হইল না, কারণ সেজন্য ত আমি আখড়ায় ভর্ত্তি হই নাই। আমি আসিয়াছি—আমেরিকান্ কুস্তীর কায়দা অধিগত করিতে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন সে সুযোগ পাইলাম না, তখন আমাকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। তবে আখড়ায় আসিয়া, তাহার মধ্য হইতে যতটুকু উপকার নিংড়াইয়া লইতে পারি—তাহাতেই আমার লাভ আছে, এই বিশ্বাসে বনমালীর সহিত কিছুক্ষণ মহলা দিবার পর হাজার খানেক বৈঠক করিলাম, আধঘণ্টাটাক্ ডাম্বেল ভাঁজিলাম এবং ব্যায়ামাগারের মধ্যে পনেরো মিনিটকাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া লইলাম। আধুনিক আমেরিকান্ ব্যায়ামাগার-গুলিতে দৌড়ানো-ব্যায়ামের জন্য যথেষ্ট জায়গা খালি রাখা হয়; এই ব্যায়ামকে তাহারা "Jogging" বলে। পাঠকগণ বোধহয় অবগত আছেন যে দৌড়ানোতে ফুসফুসদ্বয়ের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হয়, সেরূপ আর কোনো ব্যায়ামে হয় না এবং বিভিন্ন জাতীয় প্রত্যেক

* শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু কর্ত্তৃক মূল ইংরাজী হইতে অনুবাদিত। প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত।

খেলায় দম্ বা ফুস্‌ফুসের বায়ু-ধারণ-শক্তিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ব্যায়াম অন্তে-মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম করিয়া, বাষ্পাগারে গেলাম; সেখানে আঁটা জায়গার মধ্যে গরম জলের বাষ্প উত্থিত হইয়া চর্ম্মকূপের মধ্য দিয়া শরীরে প্রবেশ করে এবং শরীর হইতে প্রচুর ঘর্ম্মের সহিত সঞ্চিত সমস্ত জড়ত্ব ও ক্লেদ বাহির করিয়া দেয়। সেখানে পাঁচ মিনিট কাল অবস্থান করিয়া, বাহিরে আসিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা-কাল রীতিমত গাত্র-উদ্বর্ত্তন করাইলাম এবং তৎপরে সেখানকার গোসল্‌খানায় ঝারি-স্নান (Shower ba h) করিলাম। এইভাবে আমার ব্যায়াম ও তদানুষঙ্গিক কর্ত্তব্য শেষ হইল। ব্যায়ামের পর আমার প্রথম কায হইল—ছুই কাঁচের গ্লাস-ভর্ত্তি ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান। বেলা বারোটার সময় ব্যায়ামাগার পরিত্যাগ করিলাম।

বেলা আড়াইটার সময় কিছু ভাত, পাঁওরুটি, মাংসের ঝোল ও পনীর খাইয়া খানিকক্ষণ দিবানিদ্রার আরাধনা করিতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ঘুম আমাকে এমন পাইয়া বসিল যে, শেষে প্রায় সন্ধ্যা ছয়টার সময় বনমালী আমাকে ডাকিয়া তুলিল; সে আমার সহিত সান্ধ্য-ব্যয়াম করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দেখিতে পাইলাম যে, শরীর এমন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, একটু নড়া-চড়াও যেন কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে। তখন বুঝিলাম যে, কিছুদিন স্থগিত রাখার পর ব্যায়াম করিয়াছি, তাহার উপর দেশের জল-হাওয়া ভালোভাবে সহ্য হইতে না হইতে সকালে স্নানাদির মাত্রা একটু বেশী রকম হইয়া গিয়াছে; সেইজন্যই হঠাৎ এই জড়-ভাব দেখা দিয়াছে। ইহাতে আমার নিজের উপর নিজেরই অত্যন্ত রাগ হইল কারণ কুস্তী-প্রতিযোগীতার দিন ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল। যাহাহউক, অদ্ধ-ঘণ্টাকাল পুনরায় ডলাই-মলাই করাইয়া লইবার পর যেন এই ভার-ভার-ভাবটা কাটিয়া গেল—অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম। তারপর শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া আখ্‌ড়ায় গিয়া কিছুক্ষণের জন্য ডন, ডাম্ব্‌বেল ও বারবেল্ ব্যায়াম করিলাম।

ব্যায়ামাগারের মালিক যদিও আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি আমাকে আমেরিকার কুস্তী-রীতি শিক্ষা দিবার জন্য একজন ওস্তাদ দিবেন, তথাপি দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার সত্য পালন করেন নাই এবং করিবারও কোনো উদ্যোগ দেখিলাম না। সাতদিন ধরিয়া বনমালীকে সঙ্গে লইয়া জানা-শোনা ব্যায়ামের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতে লাগিলাম, কি করিব—উপায় ছিল না। শরীরের জড়তা দুইদিন তিন যাবৎ নিকট-আত্মীয়ের মত আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় চতুর্থ দিন হইতে এ ভাব কাটিয়া গেল। শুধু তাই নয়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার পর হইতে মনে হইতে লাগিল—যেন সেই দারুণ শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আমার শরীর রীতিমত মজবুত হইয়া উঠিতেছে। বাস্তবিক সে বৎসর নিউইয়র্ক সহরে অসাধারণ রকমের ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল; থার্ম্মমিটারে শূন্যের নিম্নে তিন হইতে দশ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পারদ নামিত।

এই দুঃসহ ঠাণ্ডায় আমার শিষ্য বনমালীর কিছু কষ্ট হয় নাই—যদিও সে জীবনে এই প্রথমবার ইয়োরোপ বা আমেরিকার শীতের অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিল। বনমালী কেবল যে শীতের প্রকোপ চমৎকারভাবে বহন করিল—তাহা নহে, তাহার শরীর অতি অদ্ভুতভাবে উন্নতি লাভ করিল। যখন আমরা ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে ভারত পরিত্যাগ করি, তখন বনমালীর ওজন ছিল ১৬০ পাউণ্ড বা প্রায় দুইমণ; ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাসে যখন নিউ ইয়র্ক ছাড়িলাম, তখন তাঁহার ওজন ১৯৫ পাউণ্ড বা প্রায় দুই মণ সতের সের। তখন তাহার শরীরেরও বেশ বাঁধুনি হইয়াছে। সুপুষ্ট সুগঠিত সুসমঞ্জস মাংসপেশীতে সুশোভিত—তাহাতে এক কাঁচ্চা অনাবশ্যক চর্ব্বি নাই।

যে কয়টা দিন বনমালীর সহায়তায় ব্যায়াম-অভ্যাস করিয়াছিলাম, সে কয়দিন আমার প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকা নিম্ন-লিখিতরূপ ছিল:—প্রভাতে ব্যায়াম করিবার পর দুই গ্লাস দুগ্ধ; বেলা আড়াইটার সময় ভাত, মাংসের ঝোল, পাঁওরুটি ও পনীর; রাত্রি সাতটার সময় কি[illegible]

বাদাম ও একগ্লাস দুধ; রাত্রি আটটার সময় কয়েকটি টাট্‌কা ফল; এবং রাত্রি দশটার সময় মাছের ঝোল, ডাল, মাখন, ভাত ও খান্ কয়েক পরোটা। তারপর এগারোটার পর শুইবার সময় পুনরায় গ্লাস দুই দুধ পান করিতাম। পরদিন আট্‌টা লাগাৎ উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ব্যায়াম অভ্যাসের জন্য প্রস্তুত হইতাম।

কুস্তী-প্রতিযোগীতার দিন।

গত রাত্রে আমার বেশ প্রগাঢ় নিদ্রা হইয়াছিল; সে দিন সকাল প্রায় দশটার সময় উঠিলাম। কোনো লড়াইয়ে নামিবার পূর্ব্বে "কি জানি কি হয়" এই সংশয়িত চিন্তা খুব কমই আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমি সর্ব্বদাই ফল সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া থাকি; ইহা হয় জিৎ, নতুবা 'দোনো বরাবর' (draw)! কোনো প্রতিযোগীতায় আমি হারিব—এ চিন্তা আমার মনে কখনো উদিত হয় না বলিলেই হয়; কারণ এ পর্য্যন্ত আমিও কখনো কোনো হক্ খেলায় পরাজয়ের মাটি মাখি নাই। হক্ শব্দটি অর্থে আমি বলিতে চাহি যে, যিনি বা যাঁহারা কুস্তীর ফলাফল বিচার করেন, তিনি বা তাঁহারা যদি খাঁটি ইমান্ বা ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া রায় দেন্। কারণ অনেক ক্ষেত্রে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রতিযোগীতার শক্তিশালী উদ্যোক্তা ও পরিপোষকগণ রেফারীকে টিপিয়া দেন্—যেন অমুক্‌কে অমুকার জেতা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষেও ফুটবল হইতে কুস্তী পর্য্যন্ত সকল খেলার প্রতিযোগীতায় কখনো কখনো এই রূপ বিচারের নামে অবিচার হয় বটে, তবে বোধ হয় ওই দেশের মত নহে।

শয্যাত্যাগ করিয়া খুব তোয়াজ করিয়া গাত্র ডলাই-মলাই করাইয়া লইলাম। এই সময় লক্ষ্য করিয়া দেখি—বনমালীর মনের অস্থিরতা তাহার প্রতি অঙ্গে যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আসন্ন দ্বন্দ-যুদ্ধের ফলাফল চিন্তায় তাহার নাড়ী-চাঞ্চল্য (nervousness) উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহাকে এজন্য ভর্ৎসনা করিলাম; কারণ কুস্তীগীরের পক্ষে সব চেয়ে ঈপ্সিত বস্তু হইতেছে—লৌহ সবল নাড়ীতন্ত্র, একটু সংশয়-দোলায় দুলিলেই জয়-লক্ষী করায়ত্ত করা সুকঠিন। আমাদের দেশে ছাত্র ও শিক্ষক অথবা চেলা বা গুরুর মধ্যে যে সম্বন্ধটি থাকে, সেটি পিতাপুত্রের সম্বন্ধেরই মত যেমন স্নেহভক্তি-বিমণ্ডিত, তেমনি সুপবিত্র সুমহান্ অচ্ছেদ্য; সুতরাং বনমালী যে তাহার গুরুর জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমার শিষ্য-সংযোগ সম্বন্ধে আমি বড় ভাগ্যবান। তাহারা প্রত্যেকে আমার প্রতি যথাতিরিক্ত শ্রদ্ধান্বিত ও অনুরাগী। গত ১৯০৭ সাল হইতে যখন আমি প্রথম কুস্তি লড়িতে আরম্ভ করি, তখন হইতে কত লোক যে আমার আখ্‌ড়ায় শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছে—তাহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক খবর দেওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে; তবে আন্দাজে এইটুকু বলিতে পারি যে, এইরূপ শিষ্যের সংখ্যা পাঁচ ছয় হাজারের কম নহে; ইহাদের কেহ কেহ মধ্যবয়স্ক বা প্রৌঢ়ও ছিলেন। আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য গর্ব্বিত, কারণ তাঁহারা সকলেই আমার সহিত সুব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, তিনি এতগুলি শিষ্য-রত্নের অধিকারী হইবার সৌভাগ্য আমাকে দান করিয়াছেন।

যাক্, এখন পুনরায় কুস্তী-প্রতিযোগীতার ঘটনায় ফিরিয়া আসি। গা-টেপাইয়া ও স্নান সারিয়া, দৈনন্দিন অন্যান্য কার্য্যগুলি নিরুপদ্রবে যথাযথ করিয়া গেলাম। বৈকালে যেটুকু অবসর মিলিল, সেটুকু স্বদেশে খানকয়েক চিঠি লিখিতে ব্যয় করিলাম। রাত্রি সাতটা লাগাৎ, আমি আমার ম্যানেজারের বন্ধু সমভিব্যহারে ব্রুক্‌লি নামক মহল্লায় যাত্রা করিলাম। এইখানেই প্রতিযোগীতা হইবার কথা। সময়মত ব্রুক্‌লিতে পঁহুছানো গেল। তাহার পর উদ্যোগ-পর্ব্ব আরম্ভ হইল। আমি ও টমি ড্র্যাক্ দুইজনে পর পর কাঁটায় চড়িলাম। আমার ওজন হইল সে রাত্রে ২৫৭ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন মণ ষোলো সের এবং ড্র্যাকের ওজন হইল ২৩৯ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন মণ সাত সের। যাহাহউক, আমরা সাড়ে

খেলায় দম্ বা ফুসফুসের বায়ু-ধারণ-শক্তিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ব্যায়াম অন্তে মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম করিয়া, বাষ্পাগারে গেলাম; সেখানে আঁটা জায়গার মধ্যে গরম জলের বাষ্প উত্থিত হইয়া চর্ম্মকূপের মধ্য দিয়া শরীরে প্রবেশ করে এবং শরীর হইতে প্রচুর ঘর্ম্মের সহিত সঞ্চিত সমস্ত জড়ত্ব ও ক্লেদ বাহির করিয়া দেয়। সেখানে পাঁচ মিনিট কাল অবস্থান করিয়া, বাহিরে আসিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা-কাল রীতিমত গাত্র-উদ্বর্ত্তন করাইলাম এবং তৎপরে সেখানকার গোসল্‌খানায় ঝারি-স্নান (Shower ba h) করিলাম। এইভাবে আমার ব্যায়াম ও তদানুষঙ্গিক কর্ত্তব্য শেষ হইল। ব্যায়ামের পর আমার প্রথম কায হইল—দুই কাঁচের গ্লাস-ভর্ত্তি ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান। বেলা বারোটার সময় ব্যায়ামাগার পরিত্যাগ করিলাম।

বেলা আড়াইটার সময় কিছু ভাত, পাঁওরুটি, মাংসের ঝোল ও পনীর খাইয়া খানিকক্ষণ দিবানিদ্রার আরাধনা করিতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ঘুম আমাকে এমন পাইয়া বসিল যে, শেষে প্রায় সন্ধ্যা ছয়টার সময় বনমালী আমাকে ডাকিয়া তুলিল; সে আমার সহিত সান্ধ্য-ব্যায়াম করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দেখিতে পাইলাম যে, শরীর এমন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, একটু নড়া-চড়াও যেন কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে। তখন বুঝিলাম যে, কিছুদিন স্থগিত রাখার পর ব্যায়াম করিয়াছি, তাহার উপর দেশের জল-হাওয়া ভালোভাবে সহ্য হইতে না হইতে সকালে স্নানাদির মাত্রা একটু বেশী রকম হইয়া গিয়াছে; সেইজন্যই হঠাৎ এই জড়-ভাব দেখা দিয়াছে। ইহাতে আমার নিজের উপর নিজেরই অত্যন্ত রাগ হইল কারণ কুস্তী-প্রতিযোগীতার দিন ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল। যাহাহউক, অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল পুনরায় ডলাই-মলাই করাইয়া লইবার পর যেন এই ভার-ভার-ভাবটা কাটিয়া গেল—অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম। তৎপর শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া আখড়ায় গিয়া কিছুক্ষণের জন্য ডন, বৈঠক ও বারবেল ব্যায়াম করিলাম।

ব্যায়ামাগারের মালিক যদিও আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি আমাকে আমেরিকার কুস্তী-রীতি শিক্ষা দিবার জন্য একজন ওস্তাদ দিবেন, তথাপি দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার সত্য পালন করেন নাই এবং করিবারও কোনো উদ্যোগ দেখিলাম না। সাতদিন ধরিয়া বনমালীকে সঙ্গে লইয়া জানা-শোনা ব্যায়ামের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতে লাগিলাম, কি করিব—উপায় ছিল না। শরীরের জড়তা দুইদিন তিন যাবৎ নিকট-আত্মীয়ের মত আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় চতুর্থ দিন হইতে এ ভাব কাটিয়া গেল। শুধু তাই নয়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার পর হইতে মনে হইতে লাগিল—যেন সেই দারুণ শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আমার শরীর রীতিমত মজবুত হইয়া উঠিতেছে। বাস্তবিক সে বৎসর নিউইয়র্ক সহরে অসাধারণ রকমের ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল; থার্ম্মমিটারে শূন্যের নিম্নে তিন হইতে দশ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পারদ নামিত।

এই দুঃসহ ঠাণ্ডায় আমার শিষ্য বনমালীর কিছু কষ্ট হয় নাই—যদিও সে জীবনে এই প্রথমবার ইয়োরোপ বা আমেরিকার শীতের অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিল। বনমালী কেবল যে শীতের প্রকোপ চমৎকারভাবে বহন করিল—তাহা নহে, তাহার শরীর অতি অদ্ভুতভাবে উন্নতি লাভ করিল। যখন আমরা ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে ভারত পরিত্যাগ করি তখন বনমালীর ওজন ছিল ১৬০ পাউণ্ড বা প্রায় দুইমণ; ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাসে যখন নিউ ইয়র্ক ছাড়িলাম তখন তাঁহার ওজন ১৯৫ পাউণ্ড্ বা প্রায় দুই মণ সতের সের। তখন তাহার শরীরেরও বেশ বাঁধুনি হইয়াছে; সুপুষ্ট সুগঠিত সুসমঞ্জস মাংসপেশীতে সুশোভিত—তাহাতে এক কাঁচ্চা অনাবশ্যক চর্ব্বি নাই।

যে কয়টা দিন বনমালীর সহযতায় ব্যায়াম-অভ্যাস করিয়াছিলাম, সে কয়দিন আমার প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকা নিম্ন-লিখিতরূপ ছিল:—প্রভাতে ব্যায়াম করিবার পর দুই গ্লাস দুগ্ধ; বেলা আড়াইটার সময় ভাত, মাংসের ঝোল, পাঁওরুটি ও পনীর; রাত্রি সাতটার সময় ঘি বাদাম ও একগ্লাস দুধ; রাত্রি আটটার সময় কয়েকটি টাট্‌কা ফল; এবং রাত্রি দশটার সময় মাছের ঝোল, ডাল, মাখন, ভাত ও খান্ কয়েক পরোটা। তারপর এগারোটার পর শুইবার সময় পুনরায় গ্লাস দুই দুধ পান করিতাম। পরদিন আটটা লাগাৎ উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ব্যায়াম অভ্যাসের জন্য প্রস্তুত হইতাম।

কুস্তী-প্রতিযোগীতার দিন।

গত রাত্রে আমার বেশ প্রগাঢ় নিদ্রা হইয়াছিল; সে দিন সকাল প্রায় দশটার সময় উঠিলাম। কোনো লড়াইয়ে নামিবার পূর্ব্বে "কি জানি কি হয়" এই সংশয়িত চিন্তা খুব কমই আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমি সর্ব্বদাই ফল সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া থাকি; ইহা হয় জিৎ, নতুবা 'দোনো বরাবর' (draw)! কোনো প্রতিযোগীতায় আমি হারিব—এ চিন্তা আমার মনে কখনো উদিত হয় না বলিলেই হয়; কারণ এ পর্য্যন্ত আমিও কখনো কোনো হক্ খেলায় পরাজয়ের মাটি মাখি নাই। হক্ শব্দটি অর্থে আমি বলিতে চাহি যে, যিনি বা যাঁহারা কুস্তীর ফলাফল বিচার করেন, তিনি বা তাঁহারা যদি খাঁটি ইমান্ বা ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া রায় দেন্। কারণ অনেক ক্ষেত্রে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রতিযোগীতার শক্তিশালী উদ্যোক্তা ও পরিপোষকগণ রেফারীকে টিপিয়া দেন্—যেন অমুককে অমুকার জেতা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষেও ফুটবল হইতে কুস্তী পর্য্যন্ত সকল খেলার প্রতিযোগীতায় কখনো কখনো এই রূপ বিচারের নামে অবিচার হয় বটে, তবে বোধ হয় ওই দেশের মত নহে।

শয্যাত্যাগ করিয়া খুব তোয়াজ করিয়া গাত্র ডলাই-মলাই করাইয়া লইলাম। এই সময় লক্ষ্য করিয়া দেখি—বনমালীর মনের অস্থিরতা তাহার প্রতি অঙ্গে যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আসন্ন দ্বন্দ-যুদ্ধের ফলাফল চিন্তায় তাহার নাড়ী-চাঞ্চল্য (nervousness) উপস্থিত হইয়াছে! আমি তাহাকে এজন্য ভর্ৎসনা করিলাম; কারণ কুস্তীগীরের পক্ষে সব চেয়ে ঈপ্সিত বস্তু হইতেছে—লৌহ সবল নাড়ীতন্ত্র, একটু সংশয়-দোলায় দুলিলেই জয়-লক্ষ্মী করায়ত্ত করা সুকঠিন। আমাদের দেশে ছাত্র ও শিক্ষক অথবা চেলা বা গুরুর মধ্যে যে সম্বন্ধটি থাকে, সেটি পিতাপুত্রের সম্বন্ধেরই মত যেমন স্নেহভক্তি-বিমণ্ডিত, তেমনি সুপবিত্র সুমহান্ অচ্ছেদ্য; সুতরাং বনমালী যে তাহার গুরুর জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমার শিষ্য-সংযোগ সম্বন্ধে আমি বড় ভাগ্যবান। তাহারা প্রত্যেকে আমার প্রতি যথাতিরিক্ত শ্রদ্ধান্বিত ও অনুরাগী। গত ১৯০৭ সাল হইতে যখন আমি প্রথম কুস্তি লড়িতে আরম্ভ করি, তখন হইতে কত লোক যে আমার আখ্‌ড়ায় শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছে—তাহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক খবর দেওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে; তবে আন্দাজে এইটুকু বলিতে পারি যে, এইরূপ শিষ্যের সংখ্যা পাঁচ ছয় হাজারের কম নহে; ইহাদের কেহ কেহ মধ্যবয়স্ক বা প্রৌঢ়ও ছিলেন। আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য গর্ব্বিত, কারণ তাঁহারা সকলেই আমার সহিত সুব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, তিনি এতগুলি শিষ্য-রত্নের অধিকারী হইবার সৌভাগ্য আমাকে দান করিয়াছেন।

যাক্, এখন পুনরায় কুস্তী-প্রতিযোগীতার ঘটনায় ফিরিয়া আসি। গা-টেপাইয়া ও স্নান সারিয়া, দৈনন্দিন অন্যান্য কার্য্যগুলি নিরুপদ্রবে যথাযথ করিয়া গেলাম। বৈকালে যেটুকু অবসর মিলিল, সেটুকু স্বদেশে খানকয়েক চিঠি লিখিতে ব্যয় করিলাম। রাত্রি সাতটা লাগাৎ, আমি আমার ম্যানেজারের বন্ধু সমভিব্যহারে ব্রুক্‌লি নামক মহল্লায় যাত্রা করিলাম। এইখানেই প্রতিযোগীতা হইবার কথা। সময়মত ব্রুক্‌লিতে পঁহুছানো গেল। তাহার পর উদ্যোগ-পর্ব্ব আরম্ভ হইল। আমি ও টমি ড্র্যাক্ দুইজনে পর পর কাঁটায় চড়িলাম। আমার ওজন হইল সে রাত্রে ২৫৭ পাউণ্ড্ অর্থাৎ প্রায় তিন মণ ষোলো সের এবং ড্র্যাকের ওজন হইল ২৩৯ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন মণ সাত সের। যাহাহউক, আমরা সাড়ে

দশটার সময় মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম। ড্র্যাক্ প্রথমে প্রবেশ করিল, তাহার পাঁচ মিনিট পরে আমি প্রবেশ করিলাম। আমরা উভয়েই দর্শকবৃন্দ কর্তৃক সাদরে সংবর্দ্ধিত হইলাম।

প্রেক্ষাগৃহ মোটামুটি রকমের পূর্ণ ছিল; উপস্থিত দর্শক-সংখ্যা চার হইতে পাঁচ সহস্রের কম নহে। সে দিন প্রচণ্ড শীতের রাত্রি, অল্প অল্প বৃষ্টি ও তৎসহিত তুষার পড়িতেছিল। রেফারী আমাদিগের দুইজনকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার উপদেশামৃত বর্ষণ করিলেন্। তারপর আমরা দুইজন মল্লভূমের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। খেলা সুরুর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই আমরা দুইজনে অগ্রসর হইয়া হাত কষিতে লাগিলাম।

ভারতবর্ষে আমরা কুস্তী করিবার সময় খালি পা ও খালি গা করি—কোমরে মাত্র একটা ল্যাঙ্গোট্ পরা থাকে। কিন্তু সেখানে লড়িবার সময় পালোয়ান্রা পায়ের উপর পর্য্যন্ত চামড়ার ফিঁতা জড়ানো জুতা পায়ে দেন্ এবং অনেকে জিম্ন্যাষ্টদের মত 'লং টাইট্' পরেন। তাঁহারা বলেন্—এরূপ পোষাক্ পরিলে "সোয়ারী" লাগাইতে খুব সুবিধা হয়। তা'ছাড়া ইয়োরোপ্ ও আমেরিকায় তাঁহারা আলগা মাটির উপর কুস্তী লড়েন না, ইহার জন্য এক প্রকার পুরু মোলায়েম্ মোটা মাদুর মল্লভূমির উপর বিছাইয়া দেওয়া থাকে। এই মাদুরগুলির প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১৮-২০ ফুট্ এবং ৮-১০ ইঞ্চি পুরু। উপর-নীচে দুই পর্দ্দা মাদুরের মধ্যে করাতের গুঁড়া পুরা থাকে। আবার মাদুরের চতুর্দ্দিকে একটি কোমল মথ্মলের ওয়াড়্ টান্ টান্ করিয়া পরানো থাকে। সুতরাং ইহাতে কাটা-ছড়ার কোনো ভয় নাই। একখানি কুস্তীর গালিচা তৈয়ারী করাইতে বিস্তর টাকা ব্যয় পড়ে। তবে যে সব দেশে লোকে টাকাকে প্রায় গোলামকুলীর মতই জ্ঞান করে, সেই সব দেশেই শুধু এইরূপ বিলাস-ঐশ্বর্য্যময় বন্দোবস্ত সম্ভবে।

যাক্, এখন আসল দ্বন্দ্বযুদ্ধ-ব্যাপারটির বর্ণনা আরম্ভ করি। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমার পাঠকগণকে এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলি যে, আমাদের দেশে যে প্রথায় কুস্তীর হার-জিৎ স্থির হয়, উহাদের দেশে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের এখানে যে প্রতিদ্বন্দ্বী অপরকে মাটিতে সটাং চিৎ করিয়া দিতে পারিবেন, তিনিই জয়ী বলিয়া গণ্য হইবেন। তবে চিৎ এমনভাবে হওয়া চাই যাহাতে শায়িত অবস্থায় বিজিতের সমস্ত বক্ষস্থল বিচারকর্ত্তার নিকট পরিদৃশ্যমান হইবে। কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি একটু একপেশে বা হঠাৎ কাইৎ হইয়া মাটিতে সটাং পাতিত হন্ এবং এই অবস্থায়ও তাঁহার সম্পূর্ণ বক্ষস্থল পরিদৃষ্ট হয়, তাহাহইলেও রেফারী তাঁহাকে পরাজিত বলিয়া রায় দিতে পারেন—যদিও ইহা "সাফ্-চিৎ" নহে।

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় কিন্তু ঠিক্ এ নিয়ম প্রচলিত নহে। একটু কাইৎ বা একপেশে হইয়া ভূমিতে কোনো খেলোয়াড়্ পতিত হইলে, তিনি পরাজিত হইবেন না। বিজেতাকে জয়ী নাম কিনিতে হইলে, তাঁহার প্রতিপক্ষকে এমনভাবে মাদুরে ফেলিতে হইবে যে, তাঁহার দুইটি স্কন্ধ যেন গিয়া মাটিতে ঠেকে এবং তাঁহাকে এই অবস্থায় অন্ততঃ তিন সেকেণ্ড্ কাল চাঁসিয়া রাখিতে হইবে; তখন রেফারী আসিয়া জেতার পিঠ্ চাপ্ড়াইবেন। ইহাই হইল কুস্তীর বিজয়-বিঘোষণা।

ব্যক্তিগতভাবে এই দুই ভূখণ্ডের বিভিন্ন দুইরূপ আচার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ওদেশে যে ভাবে জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হয়, তাহা আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক ভালো ও সুবিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত; কারণ এইরূপ প্রথায় আকস্মিক বা দৈব দুর্ঘটনার প্রতি গুরুত্ব প্রয়োগ করিবার কোনো কারণ থাকে না এবং প্রকৃত বলী ও কৌশলী তাঁহার যথাযোগ্য পুরস্কার পান্।

যাহাহউক, খানিকক্ষণ দুইজনে মৃদুমন্দভাবে হাত-কষাকষি ও গর্দ্দান্ টানাটানি করিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের এলেম্ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। তারপর হঠাৎ আমি পিছাইয়া আসিয়া তাহাকে স্থির সঙ্কল্পের সহিত আক্রমণ করিতে গেলাম। ড্র্যাক্ একপাশে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। আমি সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার বাম বাহুর নীচ দিয়া গলিয়া গিয়া দুই হাতে তাঁহার কোমর ধরিয়া ভূমি হইতে শূন্যে তুলিয়া ফেলিলাম, উদ্দেশ্য—তাঁহাকে দড়াম্ করিয়া মাটিতে ফেলিব। এই পর্য্যন্ত আমার কৃতকার্য্যতা মন্দ হইল না।

তারপর আমি তাঁহাকে বাংলা ৪য়ের আকারে শূন্যে ঘুরাইয়া মাদুরে আনিয়া পাড়িয়া ফেলিলাম। কিন্তু পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ড্র্যাক্ শরীর কোঁচ্কাইয়া এক কাইতে পড়িয়া এমন শক্ত প্যাঁচে আমার একখানা হাত শরীরের সমস্ত ভার দিয়া জাপ্টাইয়া ধরিলেন, যে তাহা ছাড়াইবার বা নাড়াইবার ক্ষমতা আমার রহিল না। এ প্যাঁচটি আমেরিকার বৈশিষ্ট্য; আমার নিকট তখন জানা ছিল না, এখনো পর্য্যন্ত বোধ হয় কোনো ভারতীয় খেলোয়াড়ের জানা নাই। কচ্ছপ কামড়ের মত আমার হাত চাপিয়া ড্র্যাক্ অর্দ্ধশায়িতভাবে বুক বাহির করিয়া পড়িয়া রহিল; কিছুক্ষণের জন্য আমরা দুইজনেই একেবারে 'নট্ নড়ন্-চড়ন্ নট্ কিচ্ছু'! আমি দেখিলাম যে, আমার পর-শাসনগত স্থান-নিবদ্ধ নিজের হাতখানাই ড্র্যাকের দুই স্কন্ধকে মাদুর-স্পৃষ্ট করিতে বাধা দিতেছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া হাতখানি প্রতিদ্বন্দীর কবল হইতে ছাড়াইতে পারিলাম না। ভারতীয় কুস্তি-খেলার নিয়মানুযায়ী আমি এই অবস্থায়ই জয়ী বলিয়া বিঘোষিত হইতে পারিতাম; কিন্তু পাঠকগণকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমেরিকার মাটিতে এ কৃতকার্য্যতা জয়ের গৌরবে বিভূষিত হইবার নহে।

পাঁচ মিনিটকাল আমার প্রতিপক্ষ এইভাবে পড়িয়া রহিল; আমিও প্রাণপণে নিজের হাতখানা ব্যর্থতার সহিত টানা-হ্যাঁচড়া করিতে লাগিলাম। মনে হইল—কে যেন আমার হাতখানি পাক্সাঁড়াশী-কলের (Vice) মধ্যে আট্কাইয়া রাখিয়াছে। যাহাহউক, তারপর চমৎকার কৌশলে ও আকস্মিক গতিতে আমার বিপক্ষ যে হাতখানি এতক্ষণ বজ্রবলে ধরিয়াছিলেন—সেইখানিতে ভর দিয়া এবং আমার পায়ের সহিত কাঁচি মারিয়া, আমার উপর উঠিয়া পড়িয়া ঠাসিয়া ধরিলেন। আমি উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু তিনি এমন গোড়ালি কষিয়া ধরিয়াছিলেন যে, আমার উঠিবার সাধ্য রহিল না। যত রকম প্যাঁচ্-কায়দা তাঁহার জানা ছিল, তদ্দ্বারা আমাকে তিনি সাফ্ চিৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না; তবে কয়েকবার কাৎ করিতে পারিলেন বটে!

প্রতিযোগীতার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়দিন কোনো ওস্তাদের নিকট আমেরিকান্ কায়দা শিক্ষা করিবার অক্ষমতার জন্য আমার অদৃষ্টকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিলাম; কারণ আমার অজ্ঞাত এই বিশিষ্ট কৌশলের বলেই ড্র্যাক্ আমাকে এমন কাবু করিয়া ফেলিতে পারিয়াছে। যাহাহউক, আমি দমিবার পাত্র নহে; খেলার শেষ পর্য্যন্ত আমি যথোচিত ধৈর্য্য ও বীরত্বের সহিত ড্র্যাকের আক্রমণ সহিতে ও প্রতিহত করিতে লাগিলাম। তখন ডেম্প্সীর সহিত বিল্ ব্রেননের যুদ্ধের চিত্রখানি আমার স্মৃতি-সায়রে ভাসিয়া উঠিল; ব্রেননের আঘাত সহিবার সাহস ও পরাজয়ের স্পষ্ট লক্ষণেও অদ্ভুত স্থৈর্য্যের চিন্তা আমাকে যেন নূতন শক্তিতে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। আমি স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিলাম।

যাহাহউক, ইহার কিছুক্ষণ পরে অর্থাৎ খেলা আরম্ভ হইবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অবসর বুঝিয়া অর্দ্ধকাইৎ অবস্থা গ্রহণ করিয়া "হাফ্ নেল্সন্" নামক একটি বিলাতী কায়দা মারিতে প্রস্তুত হইলাম। ইতঃপূর্ব্বে আমিও একবার ড্র্যাক্কে অর্দ্ধ কাইৎ করিয়াছি ও সে-ও আমাকে কয়েকবার ঐরূপ করিয়াছে, তাহাতে আমেরিকার নিয়মানুসারে কিছুই যায়-আসে নাই। এবার আমি শত্রুপক্ষকে বাগে আনিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় অর্দ্ধ কাইৎ ভঙ্গী করিলাম। কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে রেফারী নিজের আসন ত্যাগ করিয়া আসিয়া ড্র্যাকের পিঠ চাপ্ড়াইয়া তাহাকে জয় সম্মান্ দান করিলেন। আমি, ড্র্যাক্ ও সমগ্র দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলাম। কিন্তু উপায় ছিল না, ব্রহ্মবাক্যের ন্যায় রেফারীর বিচারের আর নড়্-চড়্ নাই। আমি ক্ষীণভাবে প্রতিবাদ করিলাম এবং আমার ম্যানেজারের বন্ধুর প্রতি সাহায্য

সূচক দৃষ্টিতে চাহিলাম ; কিন্তু তিনি দারুভূত মুরারীর ন্যায় নীরব নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিদেশে, সম্পূর্ণ সহায়-সম্পত্তি হীন অপরিচিত অবস্থায়, আমেরিকার কায়দা-কানুনে অজ্ঞ, নিজের ম্যানেজার কর্ত্তৃক এই সঙ্কটকালে পরিত্যক্ত—আমি আর কি করিব ? ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে আমার সজ্জা-কক্ষে ফিরিয়া গেলাম।

সজ্জা-কক্ষ হইতে দেখিলাম—রেফারী-বয় ড্র্যাক্‌কে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের অভিনন্দনে তেমন উৎসাহ বা সজীবতা দেখা গেল না।

আমার পরাজয়ের অবিচার, পক্ষপাতিত্ব ও একদেশদর্শিতা সম্বন্ধে নিজমুখে বেশী কিছু বলিতে চাহি না ; তবে আমার পক্ষে এই টুকু বলাই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, পরদিন প্রভাতে যখন নিউ ইয়র্কের একখানি শ্রেষ্ঠ দৈনিকে নিম্নলিখিত বড় বড় হেডিং সমেত আমাদের প্রতিযোগীতা বিষয়ক সাংবাদিক মন্তব্যটি আমূল পাঠ করিলাম, তখন আমার অবসন্ন হৃদয়ে যথেষ্ট সান্ত্বনা পাইলাম :—

"গত রাত্রের বিরাট কুস্তী-প্রতিযোগীতা

"রেফারীর পক্ষপাত-দুষ্ট বিচার !

"দানবতুল্য দিগ্বিজয়ী হিন্দু মল্ল এবং নিখিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের গুরুভার উত্তোলন ও কুস্তী-বিজয়ের পদবীধারী যতীন্দ্র গুহ (গোবর), আমেরিকার জন-সাধারণের সম্মুখে প্রথম দর্শন দিয়াছিলেন—টমি ড্র্যাকের কুস্তী-প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ! টমি ড্র্যাক্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে আসিয়া কয়েকটি প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হইয়া বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই কুস্তী-লড়াইটি খুব উত্তেজনাপূর্ণ ও গতিশীল হয় নাই ; কারণ প্রত্যেকেই বেশ সতর্কতার সহিত পরস্পরের শক্তির বহর বুঝিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। তারপর হিন্দু পালোয়ানটি ড্র্যাক্‌কে আক্রমণ করিয়া তাহাকে মাদুরের উপর কূপোকাৎ করিয়া ফেলিলেন্ বটে ; কিন্তু ড্র্যাক্ না হারিয়া পাঁচ মিনিটকাল ঐ অবস্থায় থাকিবার পর ক্ষিপ্রগতিতে হিন্দুর উপরে উঠিয়া পড়িল। হিন্দু তাঁহাকে ছাড়াইতে বিধিমত চেষ্টা করিলেন্ ; কিন্তু ড্র্যাক্ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন না। তারপর কুস্তীর যে সকল কৌশল প্রদর্শিত হইল, তাহা বাস্তবিকই অপরূপ। আমরা জীবনে কখনো কোনো পালোয়ানকে প্রতিপক্ষের অমানুষিক শাস্তি এরূপ অম্লান বদনে গ্রহণ করিতে দেখি নাই। অবশেষে প্রত্যেককে বিস্মিত করিয়া রেফারী মহাশয় ড্র্যাকের পক্ষে আচম্বিতে জয়-ঘোষণা করিয়া বসিলেন। * * * রেফারীর এই অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ না হইলে বাজী কে জিতিত—তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। তবে আমারা এইজন্য ড্র্যাক্‌কে বেশী পছন্দ করি যে, তিনি হিন্দু গোবর অপেক্ষা সুঠাম সুগঠিত দেহের অধিকারী। হিন্দু যখন নিজের শরীরটি মল্লোপযোগী সুষ্ঠু করিতে পারিবেন, তখন যদি তাঁহাকে প্রতিযোগীতায় সুবিচার প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তিনি অনেককেই হারাইতে সমর্থ হইবেন। তখন প্রসিদ্ধ সোয়ারী-প্রয়োগে-তৎপর গোবরের সহিত এখানকার শ্রেষ্ঠ কুস্তীগীর জো ষ্টেচারও যে খুব জুৎ করিতে পারিবেন—এরূপ বলিয়া বোধ হয় না। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুকে পুনরায় সক্রিয় দেখিতে পাইব ; তিনি খুব নিপুণ পালোয়ান্ ও খেলোয়াড়। আমরা দেখিতে চাই—শরীরকে মাফিক্‌সই তৈয়ারী করিয়া তিনি কতদূর কি করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁহার বর্ত্তমান্ ম্যানেজার অপেক্ষা একটু বেশী চালাক-চতুর চট্‌পটে ম্যানেজার হওয়া দরকার এবং গোবরের নিজেরও জ্ঞান থাকা উচিত যে, পেশাদারী খেলায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে ম্যানেজার, রেফারী ও অনুষ্ঠাতৃগণের কার্য্যাবলীর উপর আগাগোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। যাহা হউক, আমরা পরের খেলার গোবরের জয়-কামনা করি।"—নিউইয়র্ক ওয়ারল্ড্, ৩১শে জানুয়ারী ১৯২১।

আমি ঐ কাগজের বিশেষ অংশটুকু কাটিয়া আমার নিকট ভবিষ্যত প্রয়োজনের সম্ভাবনায় রাখিয়া দিয়াছি। যাহা হউক, সত্য ঘটনা জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হওয়ায় আমি শান্তিলাভ করিলাম। কিন্তু আমার ম্যানেজার ও মিঃ কার্লির হাতের খেলার পুতুল হইয়া, নিজেকে উপযুক্তরূপ দোরস্ত না করিয়া প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে দৌড়িয়া যাওয়ার নির্ব্বুদ্ধিতাকে আমি ক্ষমা করিতে পারি নাই।

আমার পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বোহেমিয়ার অতিকায় পালোয়ান্ কার্ল-স্কাল্‌জ ও ড্র্যাকের সহিত দ্বিতীয় প্রস্থ লড়ার কাহিনী বিবৃত করিব।

(ক্রমশঃ)

গো-সেবা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[রায় সাহেব ডাঃ শ্রীদিবাকর দে, জি, বি, ভি, সি,]

গো-জনন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গোপালন হইতে লাভবান্ হইতে হইলে সুপ্রজননের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাতে যে কেবলমাত্র সুস্থ সবল বৎস পাওয়া যায় তাহা নহে, ইহার দ্বারা গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধিও করা যায়।

প্রজনন গোপালনের পক্ষে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয় ; কারণ যদি প্রজননের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে বৎস প্রসবেরও বিলম্ব ঘটে, সময়ে সময়ে গাভী একেবারে বন্ধ্যা হইয়া যায় ; তাহাতে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কথা।

গাভীর যখন পুংসঙ্গ-লিপ্সা হয়, তাহারা কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা তাহা প্রকাশ করে ইহা মোটামুটী পালকদিগের জানা আছে ; গাভী চঞ্চল হয়, পুনঃ পুনঃ মলমূত্র ত্যাগ করে, চঞ্চল দৃষ্টি হয় এবং ষণ্ডের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ডাকিতে থাকে। যোনিদ্বার হইতে এক প্রকার স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং সময়ে সময়ে একেবারে দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করে। খাদ্য গ্রহণে আর পূর্ব্বের ন্যায় রুচি দেখা যায় না। নিকটে অন্য গাভী থাকিলে তাহার পৃষ্ঠে উঠিতে চেষ্টা করে এবং সময়ে সময়ে পা ও শিং দিয়া মাটী আঁচড়াইতে থাকে।

প্রথম সঙ্গমের স্পৃহা প্রায় দুই বৎসরের গাভীতে দেখা যায় এবং ইহারা সর্ব্বসমেত ১২ হইতে ১৫টী পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব করে।

কোন কোন গাভী প্রসবের পর পাঁচ সপ্তাহ (কখনও কখনও তিন সপ্তাহ) মধ্যে পুংসঙ্গের স্পৃহা প্রকাশ করে। সাধারণতঃ তিন মাসের মধ্যে পুনরায় সংসর্গ করিতে দেওয়া বিহিত নহে ; বহুক্ষেত্রে গাভী তাহাতে গর্ভ ধারণ করে না। ইতোমধ্যে যদি গাভী পুনরায় সঙ্গমের জন্য কাতর হয়, তাহা না হইতে দিলে গাভীর কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু তিন মাস বাদে "ডাকিলে" আর অবহেলা করিতে নাই। এই সময়ে পালকের একটু সতর্ক থাকা উচিত, কারণ কাহারও কাহারও মতে গাভীর ঋতুকাল মাত্র ২৪ ঘণ্টা, কেহ কেহ আরও কম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

তিন হইতে চারি বৎসরের ষণ্ডই জনন-কার্য্যের প্রকৃত উপযোগী হয়। যে গাভীর বহু দুগ্ধ দানের শক্তি আছে তাহার পুংসন্তানকে পালন করিয়া জননকারী ষণ্ডরূপে ব্যবহার করা মঙ্গলজনক। এইরূপ ষণ্ড হইতে যে স্ত্রীবৎস উৎপন্ন হয়, সে তাহার পিতামহীর গুণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার বহু দুগ্ধ দান করিবার ক্ষমতা হয় ; একারণে ষণ্ড নির্ব্বাচনে আলস্য ত্যাগ করা উচিত। প্রায়ই দেখা যায়, পরিশ্রম লাঘব হেতু নিযুক্ত লোকগুলি প্রথম যে ষণ্ডই দেখিতে পায়,

তাহার দ্বারাই গাভীর গর্ভোৎপাদন করাইয়া লয়। ইহাতে গাভীর সমূহ ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ যাঁহারা অধিক সংখ্যক গাভী পালন করেন, তাঁহারা নিজের পালের মঙ্গলের জন্য একটি উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ পালন করিবেন। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে নিকটস্থ কোন ভাল বৃষ সন্ধান করিয়া লইয়া সেই বৃষ দ্বারা গাভীর গর্ভাধান করাইয়া লইলে তাহাতে ক্রমশঃ পালের মধ্যে উৎকৃষ্টতর গাভী প্রস্তুত হইতে থাকে।

লক্ষ্য রাখা উচিত, যে উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ দ্বারা জাতির দ্রুত উন্নতি করিবার আশায়, বৃহদাকার ষণ্ড ব্যবহার করা না হয়। তাহাতে গর্ভের সন্তান ধারণের স্থানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে প্রসবকালে গাভী ভীষণ কষ্ট পাইতে পারে। সময়ে সময়ে মারা যাওয়া অসম্ভব নহে। অনেক স্থলে বিষম ভার হেতু সঙ্গমকালে গাভীর অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। বেহারী ষণ্ড বঙ্গদেশীয় গাভীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কোন বৃষকে সপ্তাহে দুইবারের অধিক সংযোজনে ব্যবহার করা উচিত নহে। তাহাতে বৃষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। একটি গাভীর পক্ষে একবার বা দুইবার সঙ্গম গর্ভোৎপাদনের পক্ষেই যথেষ্ট। সেইজন্য গর্ভোৎপাদনের সময় বৃষকে অযথা বারবার সঙ্গমের জন্য একই গাভীতে উপগত হইতে দিতে নাই। এইরূপ করিলে, একই বৃষকে সপ্তাহে তিনটি গাভীর সঙ্গমের জন্যও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ঋতুমতী গাভীর সহিত বৃষকে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের স্বেচ্ছা ও প্রবৃত্তিমত বৃষ যদি গাভীতে উপগত হয়, তাহাই গাভীর গর্ভোৎপাদনের প্রকৃষ্ট উপায়। তবে বৃষকে যদি সেই সপ্তাহে অন্য গাভীর ব্যবহারে লাগাইতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। বহুস্থলে গাভীর চঞ্চলতা হেতু তাহাতে বিশেষ অসুবিধা ঘটে, এবং জননের পূর্ব্বে অত্যধিক পরিশ্রম হেতু বৃষ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেরূপ ক্ষেত্রে ছোট রজ্জু দ্বারা চঞ্চল গাভীকে বাঁধিয়া বৃষকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহাতেও না হইলে গাভীর চঞ্চলতা বন্ধ করিবার জন্য ক্রমশঃ ব্যবস্থা করিতে হয়। মোট কথা, যাহাতে বৃষ ও গাভী উভয়েরই সুবিধামত জননকার্য্য সম্পন্ন হয় সেইরূপ করিবে।

প্রথম ঋতুমতী বৎসতরী বৃষ সংসর্গের ভয়ে মাটিতে শুইয়া পড়ে ও নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি করে, এরূপ ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বৃষকে গর্ভোৎপাদনের সুবিধা করিয়া দিতে হয়, নচেৎ শীঘ্র গর্ভধারণ না করিতে পারিলে গাভী বন্ধ্যা হইয়া যাইতে পারে।

বৎসগণ পুং ও স্ত্রী ভেদে পিতামহ ও পিতামহীর গুণ পায়; সেজন্য কখনও নিকৃষ্ট ষণ্ড দ্বারা গর্ভোৎপাদন করাইবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, পশুদিগের নিকট আত্মীয়ের মধ্যে সঙ্গম দ্বারা গর্ভোৎপাদন করান সুফলপ্রদ নহে। পশুর গুণ নিজ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাতে, কোন রকম উন্নতি লাভ করিতে পারে না, ক্রমশই হীন গুণসম্পন্ন হইয়া পড়ে। গোজাতির পক্ষে সন্তান, ভ্রাতা বা পিতার দ্বারা গর্ভোৎপাদন করিতে দেওয়া অন্যায় ও বিশেষ ক্ষতিকারক। যদি জাতির মধ্যে কোনওরূপে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই রোগ জাতির মধ্যেই নিহিত থাকে। অন্যস্থানের বৃষ হইলে এই আশঙ্কা বহুপরিমাণে দূর হয়।

সঙ্গমের পর গাভীকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে দিবে না। তখন তাহারা পূর্ব্বের চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করে। মৈথুনের পর গাভীর শৃঙ্গে ও মস্তকে তৈল দিয়া স্নান করাইয়া দিবে ও কচি দূর্ব্বা আহারের জন্য দিবে। ৪।৫ দিন অতি উগ্র বা তৈলাক্ত দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া বিধেয় নহে, তাহাতে গর্ভধারণের ব্যাঘাত ঘটে।

বন্ধ্যা গাভী।

সংযোগ মাত্রেই যে গাভী গর্ভবতী হয় তাহা নহে, অনেক গাভী আছে যাহারা আদৌ গর্ভধারণ করে না। গাভীর দেহে অতিরিক্ত চর্ব্বি জন্মিলে এবং মাংসল হইয়া পড়িলে, জরায়ুতে চর্ব্বি জমিয়া গর্ভধারণের উপায় বন্ধ করিয়া দেয়। নানা প্রকার ব্যাধি দ্বারা গর্ভাশয়ের নানা প্রকার রোগ, গর্ভোৎপাদক বীজের কোন প্রকারে বিনাশ, যোনির অপরিপুষ্টতা, গর্ভযন্ত্রের কোন অংশের অভাব, বহুদিন গর্ভধারণ না করা বা বার্দ্ধক্য, বহুদিনের সূতিকা এবং প্রদর—এই সকল কারণে আক্রান্ত হইয়া গাভী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং সেরূপ কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলে তাহাকে দল হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে চেষ্টা করিবে।

সঙ্গম মাত্রেই গাভী গর্ভবতী না হইলে তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া গণ্য করিবার কারণ নাই। সাধারণ নিয়মে একবার সঙ্গমে ফলেই গাভী গর্ভবতী হয়, কিন্তু দুই বা ততোধিক বার গর্ভবতী হওয়া খুব অস্বাভাবিক নহে।

সাধারণ ক্ষেত্রে, প্রথম সঙ্গমের ফলেই গর্ভোৎপত্তি হইয়াছে মনে করিয়া যথাসময়ে গাভী ঋতুমতী হইলে, তখন আর বৃষ দ্বারা উপগত করান হয় না। ফলে গাভীর গর্ভধারণে বিলম্ব হইয়া পড়ে বা এককালে আর না "ডাকা" হেতু বন্ধ্যা হইয়া পড়ে!

হিসার, মণ্টগোমেরী এবং অন্যান্য স্থান যথা—অষ্ট্রেলীয়া, ইংলণ্ড, কানডা প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত গাভী বিশেষ ডাকে না। তাহাদের চাঞ্চল্য এবং যোনিদ্বার হইতে স্রাব নির্গত হওয়া ছাড়া অন্য প্রকারে ঋতুকাল প্রকাশ করে না। তাহাদের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

বলিষ্ঠ ও বৃহদাকার গাভী, অনুপযুক্ত ষণ্ড দ্বারা গর্ভ গ্রহণ করে না; সে সকল গাভীর একাধিকবার ও উপযুক্ত ষণ্ডের দ্বারা সঙ্গম হওয়া প্রয়োজন হয়। সময় সময় উপযুক্ত বৃষ দ্বারা চার পাঁচবার সঙ্গমের ফলে গর্ভধারণ করিতে দেখা যায়। যদি ক্রমাগত সাময়িক সঙ্গমের ফলেও দুইবৎসর কাল গাভী গর্ভধারণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে বন্ধ্যা বলা যায়।

গাভীর চর্ব্বি অত্যধিক হওয়ায় বন্ধ্যা হইলে তাহার আহার কমাইয়া অত্যন্ত সাধারণ খাদ্য খাইতে দিতে হয়। কেবলমাত্র মাংসক্ষয় হেতু শীর্ণ হইয়া, বৃষ গ্রহণ করিবার পর গর্ভবতী হইতে পারে। তৈলযুক্ত আহার, খৈল প্রভৃতি যাহা চর্ব্বি বৃদ্ধি করিবার পক্ষে উপযোগী, তাহা তাহাকে দেওয়া নিষিদ্ধ। এরূপ অবস্থায় ঋতুমতী হইবার কালে গরুর পালের মধ্যে বেড়াইতে দিলে তাহাদের সুবিধা মত সঙ্গমের দ্বারা গর্ভধারণ করিতে পারে। চৈত্র বৈশাখ মাসে বন্ধ্যা গাভীও চঞ্চল হয়; এসময় পালককে সতর্ক থাকিতে হয় এবং ঋতুর কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না থাকিলেও বৃষের নিকট লইয়া যাইতে হয়। যদি যোনিপথের অস্বাভাবিক মাংসবৃদ্ধি হেতু গাভী বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে Red Oxide of Mercury Ointment অঙ্গুলি দ্বারা লাগাইয়া দিতে হয়।

বন্ধ্যাত্ব প্রতিকারের বিশেষ কোন নিয়মের কথা বলা বড় কঠিন। শুষ্ক আহারে গাভীকে ঋতুমতী হইতে দেখা যায়। শুষ্ক খড়, খৈল প্রভৃতি দেওয়া বিধেয় এবং প্রয়োজনানুযায়ী স্বতন্ত্র জল দিতে হয়। অল্প পরিশ্রম করান গর্ভধারণের অনুকূল।

নিতান্ত দুঃখের বিষয়

এবার বহু পুরাতন গ্রাহক আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্নে না জানাইয়া জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় সংখ্যার ভিপি ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে আশাতীত ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছেন। এই সকল অনিষ্টকর মহাপুরুষ হইতে যাহাতে অন্যান্য সমব্যবসায়ীগণ সতর্ক থাকিতে পারেন ও ইহাঁদিগকে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ যাহাতে ভালো রকম চিনিয়া রাখিতে পারেন, সেইজন্য আগামী ভাদ্র সংখ্যায় তাঁহাদিগের নাম-ধামের একটা তালিকা প্রকাশ করিয়া দিব।

বৈচিত্র্য-পঞ্চক

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু-সংগৃহীত]

দীর্ঘজীবিনী বিদেশিনী

মেরিয়া উষ্টাভ্ নাম্নী দক্ষিণ রাসিয়ার প্রান্তভাগস্থ টুন্‌কিয়া প্রদেশ-বাসিনী জনৈক স্ত্রীলোকের সম্প্রতি একশত পঁয়ত্রিশ বৎসরে মৃত্যু হইয়াছে। জীবনের মধ্যে তাঁহার কখনও কোনো শক্ত অসুখ হয় নাই ; তাঁহার সাতটি সন্তান-সন্ততিরাও জীবনে ব্যাধির মুখ দেখে নাই। মৃত্যুর পর তাঁহার বিরাশীজন পৌত্র ও প্রপৌত্র শবদেহের অনুগমন করিয়াছিল।

মেরিয়া বেশীর ভাগ টাট্‌কা শাক-সব্জী ও পরিমিত-ভাবে মৎস্যের উপর জীবন ধারণ করিতেন ; জীবনে তিনি কখনও তামাক, দোক্তা বা মদ্য স্পর্শ করেন নাই।

রাসিয়ার এই অংশে ও সমগ্র বুল্‌গেরিয়া রাজ্যে শতবর্ষজীবী লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তাহাদের দীর্ঘ জীবন ও নিরোগ শরীরের প্রধান কারণ—তাহারা পরিশ্রমী, নেশা-বিরত, অল্প-ভোজী এবং প্রধানতঃ লাল আটার পাউরুটি ও ঘোল খাইয়া থাকে।

দেহ-মনে সমভাবাপন্ন যমজ

পৃথিবীতে যে সকল যমজ সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে, দেহ মনের গঠনে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখা যায় ; ইহাই আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই। কিন্তু অভিন্ন-ভাবাপন্ন এক জোড়া যমজ পুত্রের কথা কিছু দিন পূর্ব্বে লণ্ডন য়্যুনিভার্সিটি কলেজের শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক ডাক্তার জি, পি, ক্রাউডেন প্রকাশ করিয়াছেন।

এই যমজ পুত্র দুইটির নাম মিঃ জি, এলিস্ ও মিঃ এল্, এলিস্। ইঁহারা মেড্‌লে রোডের অধিবাসী, বয়স ছাব্বিশ বৎসর, দুইজনেই পিতার এটর্ণী আফিসে পেটেণ্ট আইনে শিক্ষা-নবিশী করিতেছেন। তাঁহারা জন্মাইবার পর হইতেই বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের দুইজনের শারীরিক ক্রম-বিকাশ ও মানসিক প্রগতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং ঐ গুলি বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা করিয়া তাহার ফলাফল যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছেন।

আকারে, প্রকারে, গঠন-বৈচিত্র্যে, বর্ণে, অঙ্গভঙ্গীতে, মুদ্রাদোষে এই দুই যমজ ভ্রাতা অবিকল এক ; তাহা ছাড়া তাহাদের আঙ্গুলের টিপ-সহি, হাতের লেখা, শোণিত-সঞ্চাপ (blood pressure), নাড়ীর গতি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ধারা, ধাতু-প্রকৃতি সমস্তই হুবহু এক।

তাঁহারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু শরীর খুব দুর্ব্বল থাকায় ১৮ মাস বয়সের সময় তাঁহাদিগকে বিলাতে আনা হয়। বাল্যকালে তাঁহারা একই সময়ে একই রোগে পড়িতেন ও সমকালব্যাপী ভুগিতেন। যখন তাঁহারা স্কুলে পড়িতেন, তখন তাঁহাদের পড়া-শুনা —মানসিক উৎকর্ষ কাঁটায় কাঁটায় একই ভাবের হইতে লাগিল। পিতা যখন মাষ্টারদের নিকট দুই ছেলের কে কোন্‌টি কেমন পড়া-শুনা করে - জানিতে চাহিতেন, তখন মাষ্টাররা দুইজনের সম্বন্ধে সর্ব্বদা একই মন্তব্য লিখিতে ইতস্তত করিতেন, অথচ না লিখিয়াও পারিতেন না।

একই পরিবেষ্টনীয় মধ্যে পড়িয়া তাঁহাদের চিন্তার ধারা একই পথে উৎসারিত হইত। একবার পরীক্ষক দুই ভাইয়ের অঙ্কের খাতা দেখিয়া পরস্পরে নকল করার অপরাধে ধৃত করেন, কারণ দুই জনে একই অঙ্কের একই স্থলে একই প্রকার ভুল করিয়াছিলেন। শেষে পরীক্ষা গৃহের গার্ড যখন সাক্ষ্য দিলেন যে, ঐ দুই ভাই পরীক্ষা-হলের দুই বিপরীত কোণে বসিবার আসন পাইয়াছিলেন, তখন পরীক্ষক তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। একবার দুইজনকে সমসময়ে এক একখানি ইংলণ্ডের ম্যাপ মানস-অঙ্কন করিতে দেওয়া হয়। প্রত্যেকেই এক স্থান হইতে পেন্সিল টানিতে সুরু করিয়া একই স্থানে শেষ করেন এবং দুইখানি মানচিত্রই রেখায় রেখায় অনন্যরূপ হইয়া উঠে। স্কুল ছাড়িয়া দুই ভাইই ইঞ্জিয়ারিং পড়িতে কলেজে ঢুকেন এবং একই সময়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছাড়িয়া আইনের শিক্ষায়তনে প্রবেশ করেন।

বিবাহ দীর্ঘায়ুর শ্রেষ্ঠ দাওয়াই!

বিবাহিত জীবন সুখের হউক, দুঃখের হউক, বিস্তৃত পরীক্ষার ফলে দেখা যাইতেছে যে, বিবাহিত ব্যক্তিরা চিরকুমারদিগের অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘজীবন সম্পন্ন হন। কবির হিসাবে চিরবিরহীদের 'দীর্ঘ দিবস' যামিনে কাটিতে চাহে না, কিন্তু বস্তুগত পর্য্যবেক্ষকদের হিসাব-মতে দেখি যে, ইহাদের জীবনের দিবস-যামিনীগুলি বড় হ্রস্ব হইয়া পড়ে।

বার্লিন্ মিউনিসিপ্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ব্যুরোর ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর, প্রফেসর সিল্‌বারস্লিট্ অধুনা এই সত্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ২৫ হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে অবিবাহিতের মৃত্যু-সংখ্যা বিবাহিত ব্যক্তি অপেক্ষা দ্বিগুণ। আইবুড়াদিগের সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক সময়—চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে। এইকালে তাহারা যেখানে একশটির মধ্যে পঁচাত্তর জন মরেন, তথায় বিবাহিত মরেন শতকরা মাত্র চব্বিশ জন। তিনি আরও বলেন যে, যে সকল বিপত্নীক্ চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে পুনরায় দার পরিগ্রহ না করেন, তাঁহাদের পঞ্চাশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা প্রায় নাই বলিলেও চলে।

আমাদের দেশে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" বলিয়া যে প্রাচীন নীতিকথাটি প্রচলিত আছে, তাহার ব্যবহারিক অর্থ আর কিছুই নহে—পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত যৌন জীবন (active sexual life) যাপন করিবে, তাহার পর স্ত্রী-সহবাস ও বিষয়-বাসনা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া বনেই হউক বা গৃহ কোণেই হউক্ ভগবানের চিন্তায় নিযুক্ত হইবে। প্রত্যেক সুস্থ যুবকের একুশ হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করা এবং চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা আমরা সমর্থন করি বটে। কিন্তু আমরা ইহা চাহি না যে, ৪৫ বৎসর বয়স্ক বিপত্নীক্ একটী এগারো বারো বৎসরের বালিকার পাণি-পীড়ন করিবেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কুড়ি বৎসরের বেশী পার্থক্য হইলে উভয়েরই স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং অন্ততঃ এক পক্ষের সহবাস-সুখের পরিতৃপ্তি-পথে ব্যাঘাত ঘটে। সেইজন্য আমরা বিপত্নীকদিগের সহিত যুবতী বিধবাদিগের বিবাহ-বিধিরই দৃঢ় সমর্থক।

একটি অসাধারণ রোগ

সম্প্রতি প্যাডিংটনের গ্রীন্ চিলড্রেন্স হাঁসপাতালে, 'ম্যান্‌সিনিজম্" নামক একটি অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব রোগ-পীড়িত ছয় বৎসর বয়স্ক বালককে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। এই বালকটির নাম উইলি কোজেন্স।

শারীরিক ও মানসিক পরিণতিতে উইলি প্রায় স্বাভাবিক মানুষের মতই। কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক-কেন্দ্রের স্থান বিশেষের কোনো অভাবনীয় বৈচিত্র্যবশতঃ সে সর্ব্বদা পশ্চাদ্দিক হইতে (অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামে) লেখে এবং সমস্ত হরফগুলি উল্টা করিয়া বসাইয়া যায়।

ডাক্তার ও মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই কেস্‌টির পর্য্যবেক্ষণে যথাতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইতেছেন এবং অনেকে চেষ্টা করিয়া দেখিতেছেন যে, উপযুক্ত শিক্ষার বলে তাহাকে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে লিখাইতে পারা যায় কি না!

গর্ভবান্ পুরুষ-যুগল

"Dorrierre Italino" নামক রোম নগরী হইতে প্রকাশিত একখানি কাগজে কয়েক মাস পূর্ব্বে একটি বড় মজার খবর বাহির হইয়াছিল। গত জানুয়ারী মাসের প্রথমে, সার্বিয়া রাজ্যের রাজধানী বেলগ্রেড্ সহরের জেনারেল্ হাঁস্‌পাতালে জিভোটা জাডোভিচ্ নামক এক জন বেশ জোয়ান্ চাষার ছেলে—বয়স বাইশ বৎসর—

পেটে এক অসহ্য বেদনা লইয়া হাজীর হয়। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া মত দিলেন, পেটের নিম্ন দিকে একটা বড় রকমের মাংস-পিণ্ড গজাইয়াছে—অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন।

জগদ্বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ডাঃ হোরিক্ জাডোভিচের পেট্ চিরিয়া একটি প্রকাণ্ড টিউমার জাতীয় মাংসার্ব্বুদ কাটিয়া বাহির করিলেন্। মাংসার্ব্বুদটি কাটিয়া দেখা গেল—তাহার মধ্যে যথক্রমে ১০ ইঞ্চি ও ৫ ইঞ্চি লম্বা দুইটি পুরুষ-ভ্রূণ বর্ত্তমান্।

বড় ভ্রূণটির মাথা সুগঠিত, মুখে দুইটি দাঁত, হস্ত-পদদ্বয়, বুক প্রভৃতি সুস্পষ্ট বিকশিত, দক্ষিণ করে ছয়টি আঙ্গুল আছে। ছোট ভ্রূণটির মাথায় দুইটি কঠিন পাথরের ন্যায় চক্ষু-গোলক ব্যতীত আর কিছুই চিনিবার উপায় নাই।

এই অস্বাভাবিক রকমের ব্যাপারের কথা শুনিয়া চারিদিকে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ভগবানের অপরূপ নির্ম্মাণ—এই গর্ভবান্ পুরুষ-অবলাকে দেখিবার জন্য হাসপাতালের দরজায় কাতারে কাতারে কুতুহল দর্শক আসিয়া হাজীর হইল; বহু কষ্টে পুলিসের দল তাহাদিগকে ভাগাইয়া দিল।

ডাক্তারগণ নিদান-বহির্ভূত এই চমকপ্রদ কেস্ দেখিয়া একেবারে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন্। হোম্‌রা-চোম্‌রা বৈদ্যরা ইহার কারণ নির্ণয় করিতে এক এক নূতন রকমের থিওরী খাড়া করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে এক নামজাদা চিকিৎসক এই অসম্ভাবিত সম্ভাবনার যে কারণ প্রদর্শন করিলেন, তাহাই সভ্যদেশের বৈদ্যমণ্ডলীর নিকট অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ ও গ্রহণীয় হইল। তিনি বলিলেন, জাডোভিচের মাতা বাইশ বর্ষ পূর্ব্বে তিনটি ভ্রূণকে পেটে ধরিয়াছিলেন; তন্মধ্যে জাডোভিচের ভ্রূণটি অধিকতর পুষ্ট হইয়া ও অন্য দুইটি ক্ষুদ্রতর ভ্রূণকে নিজের মধ্যে শোষণ করিয়া লইয়া, একটি বলিষ্ঠ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কুক্ষিগত ভ্রূণদ্বয় স্বাভাবিকভাবে পুষ্ট হইবার জন্য জরায়ু ও ফুল না পাইয়া, জাডোভিচের ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে অতি ধীরে ধীরে বাড়িয়া ওই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। প্রসূতি-পুরুষ জোড়া ভ্রূণ প্রসব করিয়া সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে আছেন।

আবার গত ২১শে জুলাই ফী প্রেসের কৃপায় মান্দালয় হইতে এই জাতীয় আর একটী অত্যদ্ভুত খবর প্রকাশ পাইয়াছে। মিঙ্গিয়ান্ জেলার কোনো এক গ্রামে আরউইন্ নামক একটি লোক শূল-বেদনায় ভুগিতেছিল। সে এক সার্জ্জেনের কাছে যায়। সার্জ্জেন তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে তাহার নিম্ন পাঁজরে একখণ্ড মাংস গজাইয়াছে; উহা সময় বিশেষে উঠা নামা করে।

সার্জ্জেন তাহার পর ঐ ব্যক্তির শরীরে যথাস্থানে অস্ত্রোপচার করেন এবং উক্ত তাল-পাকানো মাংসখণ্ড এলাইয়া একটা গো-শাবকের অনুকৃতি দেখিতে পান্—গরুর মত মাথা, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা পায়ে ক্ষুর, কিছু কিছু লোমও গজাইয়াছে। এই গো-ভ্রূণটিকে একটী স্পিরিটপূর্ণ বোতলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে। নানাস্থান হইতে দলে দলে গ্রামবাসীরা আসিয়া এই আজব মাংসপিণ্ড দর্শন করিয়া, চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া যাইতেছে।

গো-শাবকধারী লোকটি এখনও জীবিত আছে; তাহার চিকিৎসা চলিতেছে। বিছানায় শুইয়া বেচারা হয় ত আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে—গরুর ভ্রূণ তাহার পেটে আসিল্ কোথা হইতে?···দেখি, জল-সাবুর ব্যবস্থা-কারী ভারী ভারী ডাক্তারবাবুরা ইহার কি উত্তর দেন!

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

শিশু স্বাস্থ্য।—ডাঃ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ভৌমিক ও ডাঃ শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র ভৌমিক প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুত সুকুমাররঞ্জন দাস, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী, ৭০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ৪৬ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানি পরিবর্ত্তিত ক্যারিকুলাম্ অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী করিয়া লিখিত। ইহাতে স্বাস্থ্যের কথা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, আহার, জল, বায়ু, অঙ্গ-সংস্থান ও ব্যায়াম, মশা ও মাছি, এবং চর্ম্মরোগ—এই কয়টি বিষয় ছাত্র-শিক্ষকের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া বিবৃত হইয়াছে। যাহাদের জন্য পুস্তিকখানি লিখিত, তাহারা পাঠে উপকৃত হইবে। ভাষা বেশ স্বচ্ছন্দ ও সহজবোধ্য; অনেকগুলি ছবিও আছে। দাম চারি আনা হইলে ভাল হইত।

বর্ত্তমান্ বেগ ও উদ্বেগ।—শ্রীযুত ক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ-লিখিত ও তৎকর্ত্তৃক শান্তিপুর (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত। ৩০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

শ্রীযুত ক্ষীরোদ বাবু স্বাস্থ্য-সমাচারে ও অন্যান্য কাগজে মাঝে মাঝে লিখিয়া থাকেন। স্কুল মাষ্টারী করিয়া, পরীক্ষার খাতা দেখিয়া ও সংসারের দুঃখ-দুর্দ্দিনের থেসারৎ যোগাইয়া যে টুকু সময় অবশিষ্ট থাকে, তিনি সেই সময়কুটু দেশের মঙ্গল-চিন্তায় ও সৎসাহিত্য-চর্চ্চায় নিয়োজিত করেন। তিনি অন্য সাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন; ইহাতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, সত্যকার সূক্ষ্মদর্শিতা, বিষয়-বর্ণনার পাকা মুন্সিয়ানার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

নাগরিক জীবনের অস্বাভাবিকতা শত অসুবিধা, নিত্য অভাবের সৃষ্টি, বিলাসিতার মোহ, চাকুরির বিড়ম্বনা, আত্ম-প্রবঞ্চনা, শূন্যগর্ভ বিদ্যার আস্ফালন, সর্ব্বগ্রাসী দৈত্যস্বরূপ কল-কব্জার সৃষ্টি, পরকে পদদলিত করিয়া আত্ম-প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা, ইহার ফলে দেশের দুরন্ত দুরবস্থা, জাতীয় অক্ষয় আয়ু-ভাণ্ডারে ঘুণের বাসা, পারিবারিক অশান্তি, জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস, আহার্য্য-পরিচ্ছদের দুর্ম্মূল্যতা, ধর্ম্মনিষ্ঠার ও নৈতিক বলের হ্রস্বতা, কৃষি ও গোজাতির অবনতি...প্রভৃতি বিশদভাবে পাদটিকা, ইংরাজী-বাংলা-সংস্কৃত বহু প্রামাণিক বাক্য ও নিজ বিস্তৃত অভিজ্ঞতার ফল সহযোগে বিবৃত করিয়াছেন। "God made the country and man made the town"—এই সত্যটি নানা যুক্তি-বিচারপূর্ণ তথ্যের মধ্য দিয়া লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। পুস্তকের মধ্যে স্বলিখিত এক এক বিষয়ের কবিতার খণ্ড মূল-পাঠ্যরূপে সন্নিবিষ্ট না করাই ভাল ছিল এবং ইহার অধ্যায়-বিভাগ ও বিষয়ের শৃঙ্খলা বিধান আর একটু সুযোগ্যতার সহিত হওয়া উচিত ছিল। তথাপি এই বিরাট্ পুস্তকখানির আমরা প্রশংসা করি ও লেখকের এই নির্ভীক উদ্যমকে অভিনন্দিত করি। লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, "আধুনিক যুগের এই ছুটাছুটি, লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি ও মাতামাতির মধ্যে"···"স্বল্পায়ু হীনবীর্য্য সাধারণ মানবের পক্ষে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ কবিতাদি পাঠের ও হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর কোথায়?" এ কথা সত্য। দেশের দুর্ভাগ্য যে, এমন উদ্দীপনাময় জ্ঞান-গর্ভ পুস্তকের এই প্রথম সংস্করণ দুই বৎসরের মধ্যে এখনও নিঃশেষিত হয় নাই!

দ্রষ্টব্য। আমরা কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পোষাক-বিক্রেতা মেসার্স্ বৈকুণ্ঠ নাথ শুঁই এণ্ড সন্স, প্রধান বন্দুক ব্যবসায়ী মেসার্স্ ডি, এন, বিশ্বাস্ এণ্ড কোং মহাশয়দিগের নিকট হইতে এক একখানি সুচিত্রিত সুন্দর

দেওয়াল-ক্যালেণ্ডার এবং ঢাকার বিখ্যাত 'গণেশরাম' নিকট হইতে একখানি চিরস্থায়ী কার্ড-ক্যালেণ্ডার প্রস্তুতকারক মেসার্স্ করিম এণ্ড কোং মহাশয়দিগের উপহার পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

হাসপাতালে সামাজিক সঙ্কীর্ণতা।—

মাড়োয়ারী হাসপাতালের একটী ঘটনার কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঘটনাটি এইরূপ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, একটী বর্ষীয়সী মাড়োয়ারী মহিলা পীড়িতা হইয়া ঐ হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে প্রকাশ পায় যে, তাঁহার পুত্রের সামাজিক মতামত কিছু উদার—তিনি বিধবা বিবাহের সমর্থন করেন, নিজেও একটী বিধবা মাড়োয়ারী যুবতীকে বিবাহ করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়াই না কি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ উক্ত আশ্রিতা বৃদ্ধা রোগিণীকে হাসপাতাল হইতে বাহির করিয়া দেন। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। হাসপাতাল জনসেবার প্রতিষ্ঠান। এখানে সামাজিক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে শুধু জনসেবায় মহান পবিত্র আদর্শ লইয়া হাসপাতালের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। একে ত ঐ মাড়োয়ারী হাসপাতাল শুধু মাড়োয়ারী সমাজের থাকিবার জন্য—সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে; ইহাতেই হাসপাতালের মহান্ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; তদুপরি সেই মাড়োয়ারী সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সামাজিক মতামত বিচার করিয়া যদি আশ্রয় প্রার্থী রোগীদের স্থান দেওয়া না দেওয়ার কথা বিচার করিয়া দেখিয়া তবে কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার অপেক্ষা অনুদারতা আর কি হইতে পারে! সম্প্রদায় বিশেষের অর্থ-সাহায্যে সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধার জন্য হাসপাতাল স্থাপন করিয়া সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেওয়া—বহু জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-সমাজ ভুক্ত ব্যক্তিগণের অধ্যুষিত দেশে বিশেষ আপত্তিকর। তাহার উপর এরূপ সামাজিক গোঁড়ামি যে কতখানি অন্যায় তাহা বলাই বাহুল্য। সুখের বিষয়, মাড়োয়ারী সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এরূপ গোঁড়ামির নিন্দা করিয়াছেন। বস্তুতঃ হাসপাতাল সেবাধর্ম্মের আদর্শ-স্থল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী দণ্ড লাভের পূর্ব্বে যদি পীড়িত হয় তবে তাহাকে হাসপাতালে আশ্রয় দিয়া চিকিৎসা করিতে হয়; ঔষধ দিয়া নিরাময় করিতে হয়,—অনতিবিলম্বে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া তাহার চিকিৎসায় উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই মর্ম্মান্তিক শত্রু পরস্পরকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া আহত হইলে, একই হাসপাতালে পাশাপাশি শয্যায় স্থাপন করিয়া উভয়ের চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা আছে—যদিও সবাই ইহা জানে যে আরোগ্য লাভ করিয়া উভয়েই আবার পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করিতে পারে। সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানে সামাজিক গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিয়া কাজটা নিতান্তই গর্হিত হইয়াছে। আশা করা যায়, অতঃপর এরূপ দুর্ঘটনা আর ঘটিবে না।

BLANK PAGE(S)

DOUBLE COLOUR PAGE

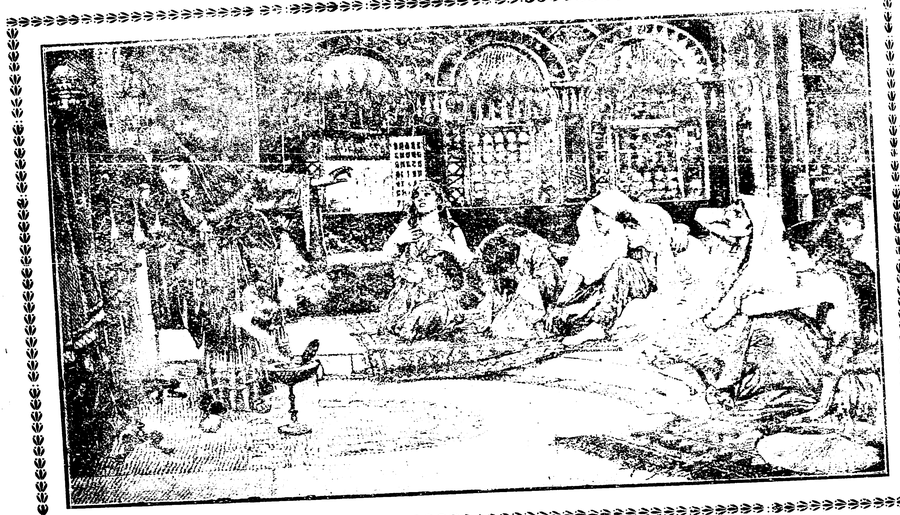

গ্রীসীয় নারীগণ ডেলফীর দৈববাণী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। আত্মীয়-স্বজন কাহারো কোনো কঠিন ব্যারাম হইলে তাহারা আরোগ্য হইবে কি না তাহা স্থির করিতে এই মন্দিরে ছুটিয়া আসিতেন।

DOUBLE COLOUR PAGE

স্বাস্থ্য-সমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৬শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল | ৫ম সংখ্যা

যক্ষ্মার সহিত যুদ্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে শৈশবকালীন ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মার কথা উল্লেখ করিয়া কি কি লক্ষণ ত হাতে প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা দুই এক কথায় বলিয়া গিয়াছি। এক্ষণে শিশু-যক্ষ্মার বিষয় আরও কিঞ্চিৎ বলিব এবং এই রোগের কারণ ও বিস্তার সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শিশুর দেহে যক্ষ্মা প্রথমে ফুসফুসের চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হয়। শিশুর ক্ষয়রোগে রক্ত উঠিতে প্রায়ই দেখা যায় না; তাহারা কফ তুলিয়া ফেলিতে পারে না বলিয়া অনেক সময় শিশুর যক্ষ্মা নির্ণয়ে বিলম্ব ঘটে এবং সাধারণ সর্দ্দি ও কাসির চিকিৎসা চলিতে থাকে। আমরা যে লক্ষণ সকল পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি তাহা যে যক্ষ্মার সূচনা করিতেছে, তাহা স্থির নিশ্চয়ভাবে জানিবার জন্য টিউবার-কিউলিন দ্বারা পরীক্ষা করা দরকার। শিশু কফ গিলিয়া ফেলে সেইজন্য শিশুর মল হইতে যক্ষ্মার জীবাণু পরীক্ষা দ্বারা ধরা পড়িতে পারে।

শিশুর Lymphatic Systemএর (রস-স্রাবী যন্ত্রের) ক্ষয়রোগ।—

ফুসফুসের ক্ষয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের যক্ষ্মা শিশু দেহ আক্রমণ করে এবং তাহাতে ফুসফুস-সংক্রান্ত রোগ-লক্ষণ কিছুই প্রকাশ করে না। দেহের রসস্রাবী গ্রন্থি ও রসবাহী নলিকার স্থানে স্থানে যক্ষ্মার জীবাণু আক্রমণ করিতে দেখা যায়।

বহুদিন হইতে ঐ রোগ গণ্ডমালা নামে প্রচলিত ছিল; এবং এখনও অনেকে আছেন, যাঁহারা উহাকে পিতামাতার নিকট প্রাপ্ত একপ্রকার বিশিষ্ট রোগ বলিয়া উল্লেখ করেন।

বাস্তবিক তাহা নহে ; রসস্রাবী যন্ত্রের অংশগুলি দেহের সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বদেহেই ছড়াইয়া আছে। এই যন্ত্রের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অংশগুলির শেষ ভাগ দিয়া যক্ষ্মা জীবাণু প্রবেশের সুগম পথ লাভ করে। শরীরের সকল স্থানেই রসবাহী নলিকার অবস্থিতি আছে ; কিন্তু যে সকল স্থানে উহারা একেবারে বাহিরের দ্রব্যের সংস্পর্শে আসে সেই সকল স্থান দ্বারাই জীবাণু প্রবেশ লাভ করিয়া গ্রন্থি আক্রমণ করে। প্রথমে ঐ স্থান গুলিতে যথা নাসিকাবিবরের মূলদেশ, গলদেশ, অন্ননালী প্রভৃতি স্থান, জীবাণুগুলির সহিত দেহস্থিত রোগ প্রতিরোধক জীবাণুর সংগ্রাম হয়। যদি যক্ষ্মা জীবাণু সমরে বিজয়ী হয়, তাহারা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। সাধারণতঃ এই সকল জীবাণু দেহের রসবাহী অংশগুলির মধ্যেই নিজেদের শক্তি নিবদ্ধ রাখে এবং গ্রন্থিগুলির স্ফীতি ব্যতীত অন্য কোনরূপ রোগ-লক্ষণ প্রকাশ করে না।

রোগাক্রান্ত স্ফীত গ্রন্থিগুলির ক্ষতি করিবার শক্তি পাঁচ ছয় বৎসর শিশুর দেহে প্রকাশ পায় ; তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক বালকবালিকা বিশেষ কোন কষ্ট পায় না।

কিন্তু এই রোগযুক্ত গ্রন্থিগুলির অনিষ্ট করিবার শক্তি ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতে পারে। বহুদিন দেহের মধ্যে অবস্থান করিবার পরও যদি গ্রন্থিগুলি লুপ্ত না হয়, কালে ইহা দ্বারা যুবা বা বৃদ্ধ শরীরের অন্যান্য অংশে বীজাণু বিস্তারের সুযোগ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কখন কখন একস্থানের রোগযুক্ত গ্রন্থিগুলি প্রত্যেকটী স্বতন্ত্রভাবে স্ফীত হইয়া উঠে ; পরে তাহাদের কোন একটী পূঁযযুক্ত হইয়া ফাটিয়া গিয়া তাহাদের বীজাণু সহ বিষ রক্তস্রোতে মিশিয়া যায়। তখন বীজাণুগুলি আপনাদের শক্তি অনুযায়ী নিকটবর্ত্তী গ্রন্থি, অস্থি, সন্ধিস্থান, ফুসফুস আক্রমণ করিতে পারে। দেহের এই রসস্রাবী গ্রন্থি যদি ফাটিয়া যায়, সে ক্ষত শীঘ্র শুকায় না, বহুদিন পর্য্যন্ত পূঁয বহির্গত হইতে থাকে এবং শোষের উৎপত্তি করিতে পারে।

কাজেই দেখা যাইতেছে—"গণ্ডমালা" একটী স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া যাহাকে এতদিন উপেক্ষা করিয়া আসা গিয়াছে, তাহা যক্ষ্মারই পূর্ব্বাভাষ, এবং তাহার বিপদ ঘটাইবার শক্তির কথা ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহা উপেক্ষা করিবার বস্তু নহে। সেইজন্য গণ্ডমালার আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু বা বালকের প্রকৃত চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। বাস্তবিক পক্ষে এ সময়ে চিকিৎসা বিশেষ কোন ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। শিশুকে সাবধান রাখা, রৌদ্র, আলোক ও বাতাস প্রচুর পরিমাণে পায় তাহার ব্যবস্থা করা, শরীরের শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করিবার পক্ষে উপযোগী বিশুদ্ধ খাদ্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অত্যধিক রৌদ্র, শীত, বর্ষা হইতে রক্ষা করা, পরিমিত আহার, বিশ্রাম, ব্যায়াম, নিদ্রা, শরীরের ক্লেদ নির্গমণের পথগুলি পরিষ্কার রাখা, দেহ ও পোষাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অর্থাৎ যাহাতে শিশু কোনরূপ রোগগ্রস্থ হইয়া দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে—এইরূপ নিয়ম পালন করা বিধেয় ; উপরন্তু দেহে শক্তি সঞ্চার হইলে পেশী অস্থি প্রভৃতি দৃঢ় হইলে, কালে "গণ্ডমালা" দূর হইয়া যায় ও ভবিষ্যতে সকল প্রকার দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

রোগের কারণ—সাধারণতঃ শতকরা ত্রিশ হইতে চল্লিশটী ক্ষেত্রে দেখা যায়, গোজাতির যক্ষ্মা মানবশরীরে সংক্রামিত হইয়া রোগ সৃষ্টি করে। শিশুকালে গোদুগ্ধের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করিতে হয়, সেজন্য পেয় দুগ্ধ হইতে কোন প্রকারে রোগের সংক্রামণ না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। দুধ ফুটাইলে দুধের গুণের হানি হয় সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও রোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে দুধ না ফুটাইয়া পান করা একান্ত অন্যায়। শিশুর আহার্য্য সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার, মাছি প্রভৃতি বসিয়া দুষ্ট করিতে না পারে। আমরা পরে রোগোৎপত্তি ও বিস্তারের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, আরও নানা কারণে ও নানারূপে রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে।

শ্বাসনালীর যক্ষ্মা—লিমফ্যাটিক গ্রন্থির ন্যায় শ্বাসনালীর গ্রন্থিতেও যক্ষ্মা দৃষ্ট হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার হইতে একটু স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশ পায় ; যদিও রোগ প্রকৃত পক্ষে একই।

শিশুদের এই রোগে সন্দেহজনক লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না, এবং বীজাণুগুলি বহুদিন নির্ব্বিবাদে বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ পায়। রোগোৎপত্তিকাল হইতেই শিশু অসুস্থ হইতে থাকে, যে কোন সামান্য কারণেই যেন বেশী অসুখ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শিশু সচরাচর যে সকল পরিশ্রমে অভ্যস্ত, তাহাতে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং সকল কাযে যে উত্তেজনা প্রকাশ পাইত, তাহার লোপ পাইতে থাকে। রাত্রে নিদ্রার চাঞ্চল্য ঘটিতে দেখা যায় এবং ক্রমশঃ খিট্‌খিটে হইয়া পড়ে। ক্ষুধামান্দ্য, রক্তহীনতা, দেহপুষ্টির অভাব ঘটে। গ্রন্থিগুলি ক্রমশঃ বিবৃদ্ধি লাভ করিলে শ্বাস প্রশ্বাসের পথ আংশিকভাবে রোধ করিতে থাকে এবং শ্বাস কষ্টের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বক্ষঃস্থলে বেদনা অনুভব হইতে থাকে, সামান্য পরিশ্রমের পর শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়, ভয়ানক আক্ষেপযুক্ত কাসি, কখনও কখনও রক্তের ছিট সংযুক্ত শ্লেষ্মা উঠিতে দেখা যায়। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াসমূহের বৃদ্ধি ঘটে এবং কদাচিৎ আহার গলাধঃকরণে অসুবিধা দৃষ্ট হয়। উপরোক্ত রোগ লক্ষণগুলি যদি গুরুতর ভাব ধারণ না করে, তাহা হইলে দীর্ঘকাল অবস্থান হেতু ঐ সকল রোগ লইয়া বাস করা এক প্রকার অভ্যাস হইয়া যায়।

বয়োবৃদ্ধির সহিত এই রোগগ্রস্ত শিশু কোনরূপে অটুট স্বাস্থ্যলাভ করিতে সক্ষম হয় না, সামান্য কারণেই সর্দ্দি, কাসি, জ্বর প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হয়। তাহারা বয়সের অনুপাতে দীর্ঘাকৃতি হইয়া পড়ে, শরীরে যেন কোনরূপেই চর্ব্বি জমিতে চাহে না এবং স্কন্ধদেশের, বক্ষঃস্থলের ও উদরের নীলাভ শিরাগুলি যেন বর্ণহীন চর্ম্মের নিম্ন হইতে আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। আকারে স্বাস্থ্যহীনতা প্রকাশ করে এবং দেহের অস্থিগুলি একখানি পাতলা চর্ম্ম দ্বারা আবৃত বলিয়া মনে হয়। হস্তদ্বয় দীর্ঘ মাংসহীন কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় ও শীতল বলিয়া ও অনুভূত হয়। গাত্রত্বক শুষ্ক ও লোল হয়

ও তাহাতে নানারূপ চক্রাকার কালবর্ণের দাগ দৃষ্ট হয়। দেহের আকারে রোগ প্রকাশ করে, পেশী দুর্ব্বল হয়। এবং রোগী সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা ক্রমশঃ ফুসফুসের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশ করিতে পারেন। নিশ্বাস প্রশ্বাসে অস্বাভাবিক শব্দ হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে, শেষ ভাগ প্রায় স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিবার শক্তি থাকে না। কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, বিশেষতঃ সামান্য পরিশ্রম করিলে ইহা বিশেষ স্ফুট হয়। গ্রীবা গ্রন্থিগুলি শীঘ্র আক্রান্ত হইয়া দেখা যায়। শিশু ও যুবার মধ্যে এমন কি বয়স্থের মধ্যেও গ্রন্থিগুলির স্ফীতি সহজেই অনুভূত হয়। কখনও কখনও কেবল এক পার্শ্বের গ্রন্থিগুলি অতি মাত্রায় পরিস্ফুট হয়। ক্রমশঃ ইহাদের স্ফীতি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রন্থিতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং কখনও কখনও স্বাস্থ্যের উন্নতির সহিত গ্রন্থিস্ফীতি অপসারিত হয়, কিন্তু এই সকল গ্রন্থি চিরকালের মত দুর্ব্বল থাকে এবং কোন প্রকারে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ইহাদের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

রোগের কারণ ও বিস্তার-পদ্ধতি।

শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইলে তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া, পরে নিজের সেনা চালনা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ক্ষয়রোগের বীজাণু কি প্রকারে বিস্তার লাভ করে তাহা জানিতে পারিলে, তাহার বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করা কতকটা সম্ভব হইতে পারে। যক্ষ্মা-বীজাণু যে যক্ষ্মা বিস্তারের এক মাত্র মুখ্য কারণ তাহা বিজ্ঞান স্থির করিয়া বলিয়াছেন বটে ; কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় যে, জীবাণুর অবস্থিতি থাকিলেও প্রকৃত রোগ তখনও আত্ম প্রকাশ করে নাই, অথবা শরীরে অতি অল্পমাত্র রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

কোন কোন দেহে বহুকাল জীবাণু লক্ষিত হইলেও প্রকৃত রোগ হয়ত কখনও প্রকাশ করিল না, অথচ সেই জীবাণু অপর শরীরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রলয় সংসাধন করিল, ইহার কারণ কি ? সহরবাসী শতকরা

নব্বই সংখ্যক লোকের দেহে যক্ষ্মা-বীজাণু থাকা সত্ত্বেও মাত্র দশটী কেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়? ইহার উত্তর কে দিবে।

জীবনীশক্তির ক্রিয়া।

ইহার উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, জীবনীশক্তি যতদিন রোগের জীবাণুর সকল প্রকার হানিকর শক্তিকে ব্যাহত রাখে, ততদিন রোগ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। নানা প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও রোগ-জীবাণু প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ না হইয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে। কিন্তু ইহারা সুযোগের জন্যই সদাই সতর্ক থাকে এবং বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক কারণে কোন প্রকারে জীবনীশক্তির হ্রাস ঘটিলে, সুবিধা মত বহুকালের পুরাতন আবাস-স্থল পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে বা সেই স্থানেই আপন ক্ষয়-কার্য্যে মনোনিবেশ করে; ফলে যথার্থ রোগের সৃষ্টি হয়, এবং রোগের সুস্পষ্ট লক্ষণসকল প্রকাশ পাইতে থাকে। কোন প্রকারে রোগ বিস্তারের সুবিধাজনক পরিবর্ত্তন ঘটিলে ঐ অবস্থাই দেহকে যক্ষ্মা-প্রবণ করিয়া ফেলে। প্রকৃতপক্ষে দেহের রোগ-প্রতিরোধক শক্তি যদি কোনও প্রকারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং দেহ-দুর্গ রক্ষাকারী সৈন্যগণের সহিত রণে যদি যক্ষ্মা-বীজাণুরা বিজয়লাভ করে, তখন দেহাস্থিত জীবাণুগুলিই যথার্থ রোগ সৃষ্টি করে। মাত্র সেই সময়েই যে যক্ষ্মা-জীবাণু দেহমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া নূতন রোগ সৃষ্টি করিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা হয় না। মোটের উপর এই কথা বলা যাইতে পারে যে, রোগ-বীজাণু বা দেহের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি হ্রাস হওয়া, ইহাদের উভয়ের মিলিত কারণে প্রকৃতপক্ষে রোগ সৃষ্টি হয়। ইহাদের মধ্যে একটী যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে রোগ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। জীবাণুগুলি দেহমধ্যে থাকিয়া সদাসর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে যে, কখন দেহটী রোগ-প্রবণ হইবে এবং তাহাদের কার্য্যের সুবিধা হইবে।

মূল কারণ ক্ষয়-জীবাণু।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রোগ-তত্ত্বান্বেষী Villemin বহু গবেষণার পর প্রকাশ করেন যে, যক্ষ্মা সংক্রামণযোগ্য ব্যাধি। তৎপূর্ব্বে লোকের যক্ষ্মা সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না এবং লোকে মনে করিত যে, অন্যান্য রোগের ন্যায় যক্ষ্মাও ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ পায় এবং রোগীর সহিত অন্তর্হিত হয়। কিন্তু যক্ষ্মার বিশেষ বিপদ সংক্রামণে। ইহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণুগুলির অস্তিত্ব ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মহামতি Robert Koch কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। সেই লোকচক্ষুর অগোচর জীবগুলির কার্য্যকলাপ জ্ঞাত হইবার জন্য Koch জীবাণু সংগ্রহ করিয়া সুস্থ দেহে প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যে তিনি দেখিলেন—নূতন দেহে যক্ষ্মার জীবাণুগুলি তাহার ক্রিয়া শীঘ্রই প্রকাশ করিল।

জীবাণুর আকৃতি।—

যক্ষ্মা জীবাণুগুলি অতি সূক্ষ্ম দণ্ডাকৃতি উদ্ভিজ্জাণু বিশেষ। সাধারণতঃ ইহা দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির দশ হাজার ভাগের এক ভাগ ও স্থূলত্বে আশী হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহা হইতেই তাহার সূক্ষ্মত্ব বিষয়ে একটী ধারণা করা যাইতে পারে। অণুবীক্ষণের (Microscope) সাহায্য ব্যতিরেকে ইহা কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা বর্ণহীন; সেইজন্য ইহাদের শরীর লোহিত প্রভৃতি কোন বর্ণের দ্বারা রঞ্জিত করিলে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের কাঁচের নীচে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মারাত্মক জীবাণুগুলি গতিহীন, অন্য বাহনের সাহায্য ব্যতিরেকে জড়ের ন্যায় থাকে।

বাহিরের এই প্রতিকূল প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র দেহেরও একটী তেমনই ক্ষুদ্র বর্ম্ম আছে এবং এই বর্ম্মাবৃত দেহখানি শীতাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিকূল প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাসায়নিক দ্রব্যাদি সহজে ইহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। কোন দেহ-মধ্যে অবস্থান কালে এই জীবাণু ধ্বংস করা কখনও সম্ভব নহে। তাহারা দেহের অতি গুরুতর অনিষ্টসাধন করিলেও এই অত্যদ্ভুত সহমশীল বর্ম্মখানি ভেদ করিয়া সত্যকার জীবাণু আক্রমণ করিতে পারে না। ৮০ সেন্টিগ্রেড উত্তাপ পাইলে সম্ভবতঃ তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সূর্য্যালোক ইহাদের একটী প্রধান শত্রু। কিন্তু এই জীবাণুর এককালে বিনাশ সাধন করা খুব সুসাধ্য ব্যাপার নহে। বীজাণুযুক্ত কফের মধ্যে দুই মাস বাদেও জীবিত ও কার্য্যক্ষম জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায় এবং পরিশ্রুত জলে বাস করিতে পাইলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ জীবিত থাকে। পচ্যমান দ্রব্যেও ইহাদের বাসের কোন অসুবিধা হয় না। প্রকৃতপক্ষে কোন দেহে অবস্থান কালে ঐ দেহের বিশেষ কোন ক্ষতি করিয়াও এই জীবাণুর সমূলে বিনাশ সাধন করা বা ইহাদের ক্রিয়ার কোনরূপ গুরুতর ব্যাঘাত ঘটান এক প্রকার অসম্ভব কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্য রোগের অতি প্রবল জীবাণুও কোন-না-কোন প্রকারে মনুষ্যের বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, মনুষ্যের দৃষ্টি-শক্তির অতি দূরে অবস্থানকারী জীবাণুগুলি সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করিয়া আপনাদের ধ্বংসলীলা অবাধে চালাইয়া আসিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে। বিধাতার বিধানে ইহাদের তবু গতি-শক্তি নাই—কোন বাহন না আশ্রয় করিলে ইহাদের একস্থানে অবস্থান ব্যতীত উপায় নাই; ইহারা গতি-শক্তিবিশিষ্ট হইলে কি হইত তাহা কল্পনায় আনা যায় না।

জীবাণুর প্রকার-ভেদ।

মনুষ্য, গো ও পক্ষীতে যে ক্ষয়-জীবাণু দৃষ্ট হয় তাহা এক না বিভিন্ন প্রকারের—ইহা লইয়া বহুদিন পণ্ডিতদিগের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। আমরা সেই বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন কারণ দেখি না। এই তর্কবিতর্কের ফলাফল এখনও স্থিররূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। অধিকাংশের মতে পক্ষী-সুলভ ক্ষয়-জীবাণু অন্য অন্য পশু-দেহ বিশেষ আক্রমণ করে না, তাহাকে একটু স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে স্থিররূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, গোজাতি হইতে ক্ষয়-জীবাণু মনুষ্য-দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে এবং উভয়ের মধ্যে ধ্বংস-ক্রিয়া একই ভাবে প্রকাশ করে।

সকল তর্কবিতর্ক ত্যাগ করিলে, আমরা এই সত্যটুকুর সন্ধান পাই যে, ক্ষয়-জীবাণুর ক্রিয়া নর, গো ও পক্ষী সকল দেহেই, একই ভাবের ক্রিয়া প্রকাশ করে। সম্ভবতঃ তাহারা একই জাতীয়, সামান্য প্রকার ভেদ আছে মাত্র,এবং তাহা হইতে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

ক্ষয়-জীবাণুর অবস্থান—দেহের কোথায়?

দেহের সকল স্থানেই ক্ষয় জীবাণুর অবস্থান লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন কোন অংশ অপর কোন কোন অংশ হইতে অধিক রোগ-প্রবণ হইতে পারে, কিন্তু পেশী ব্যতীত কোন অংশই ইহার দুর্ব্বার আক্রমণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। এই রোগ-প্রবণ অংশগুলির মধ্যে রসস্রাবী গ্রন্থিগুলি (Lymphatic glands) সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমেই আক্রান্ত হয়। তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। যে স্থান দিয়াই জীবাণু দেহে প্রবেশ লাভ করে, তাহারা দেহের রস বা রক্ত-স্রোতে মিশিয়া গ্রন্থির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় ও উহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই কারণে তাহারা তাহাদের প্রবেশ-পথের নিকটবর্ত্তী গ্রন্থিসকলে আপনাদের ক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ করে এবং স্ফীতি প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ করে। কখনও কখনও একই স্থানের বহুসংখ্যক গ্রন্থি আক্রান্ত হইতে দেখা যায় এবং স্ফীত গ্রন্থির মালারূপে আবির্ভূত হয়; বিশেষতঃ গণ্ডমালা রোগে এই লক্ষণ বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়।

রক্তস্রোতে গা ভাসাইয়া জীবাণুগুলি কোন রকমে গ্রন্থি অতিক্রম করিয়া গেলে তাহারা ফুসফুসের বায়ু-কোষের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সুযোগ বুঝিলে সেইখানেই আত্ম ক্রিয়া প্রকাশ করে। শরীরের অন্যান্য স্থানে যক্ষ্মা-জীবাণুর গমনের বিশেষ সুবিধা না ঘটিলেও তাহারা ফুস্‌ফুসে যাইবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুবিধা পায়, কারণ দেহের সকল রক্তই ফুস্‌ফুসের মধ্য

দিয়া বাহির হইয়া দেহে ছড়াইয়া যায়। এই কারণেই অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ফুসফুস অধিক মাত্রায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। যতক্ষণ যক্ষ্মার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা থাকে, ততক্ষণ উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। কিন্তু প্রায় সকল সময়েই ফুসফুসে অবস্থান করিবার সুবিধা পায় বলিয়া সুযোগ মত আক্রমণ করে। রসস্রাবী গ্রন্থি ও ফুসফুসের পর, দেহের প্রায় সকল স্থানই প্রায় সমভাবেই রোগ-প্রবণ এবং কোন একটী যন্ত্রকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা যায় না।

যক্ষ্মা-জীবাণুর অবস্থান—বাহ্য জগতে।

যক্ষ্মা-জীবাণু রোগগ্রস্ত লোকের কফে অবস্থান করে, সে বিষয়ে এখন আর কোন মতদ্বৈধ নাই এবং সেই কারণে যে স্থানে কফ পরিত্যক্ত হয়, সেই স্থানে জীবাণুর অবস্থান লক্ষিত হইয়া থাকে। বহির্জ্জগতে অবস্থান কালীন প্রায়ই এই জীবাণুগুলি রৌদ্রের তাপে অনেক-গুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং যদ্যপি তাহারা বায়ুর সাহায্যে রৌদ্রময় স্থান হইতে কোনো ছায়াময় স্থানে নীত হইয়া বাঁচিয়াও থাকে, তথাপি তাহাদের নূতন করিয়া রোগ সৃষ্টি করিবার শক্তি বহু পরিমাণে অন্তর্হিত হয়। এই কারণে কখনও কখনও রোগীর গৃহে বাহিরের ধূলির সহিত জীবাণু দৃষ্ট হইলেও তাহার দ্বারা নূতন বিপদের সম্ভাবনা অল্প বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু রৌদ্র-বাতাসহীন স্থানে যদি কোন প্রকারে সতেজ জীবাণু একবার আশ্রয় লইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের শক্তি বহুদিন কার্য্যকরী থাকে, সেকথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

গাভীর পালানে যদি জীবাণু আশ্রয়লাভ করিয়া ক্ষত উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ গাভীর দুগ্ধে জীবাণু দৃষ্ট হয় এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঐ দুগ্ধ শিশুদিগের মধ্যে রোগ-বিস্তারের একটী প্রধান সহায়।

বাহ্য জগতে জীবাণুর অবস্থানের আরও কয়েকটী সুবিধা আছে এবং তাহার দ্বারা কিরূপে রোগ বিস্তার হয়, আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহার আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

রন্ধন-সমস্যা

। শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল।

রজনীর ভূষণ যেমন চন্দ্রমা, পুরুষের ভূষণ যেমন বিদ্যা, স্ত্রীলোকের ভূষণও তেমনি রন্ধন। পতিপরায়ণতা, কর্ম্মপটুতা, ও ধর্ম্মশীলতা ইত্যাদি গুণের সঙ্গে সঙ্গে এই রন্ধনশীলতাটীও স্ত্রীলোক মাত্রেরই অপরিহার্য্য গুণ হওয়া উচিত। রন্ধনাদি কার্য্যে আলস্য বা উদাসীনতা প্রকাশ করা বাস্তবিকই বড় দুঃখের বিষয়। ইহার অভাব দিনদিন আমরা এত তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি যে এসম্বন্ধে কাগজে-কলমে আলোচনা ও মন্তব্য প্রকাশ এখন কোন দোষের হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্ত্রীলোক উচ্চ-শিক্ষা তেমন না পাইতে পারেন, সূক্ষ্ম শিল্প বা কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী হইতে না পারেন; কিন্তু যদি একমাত্র এই রন্ধন বিদ্যায় অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রায় সকলের নিকটই প্রশংসার যোগ্যা ও প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন। অপর পক্ষে নানাবিধ গুণে ভূষিতা হইয়াও যদি এই রন্ধনশীলতার অভাব হয়, তাহা হইলে তিনি গোলাপহীন উদ্যানের মতই দৃষ্টা হইয়া থাকেন। অন্যান্য গুণরাজি থাকা সত্ত্বেও লোকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারেন না।

প্রথমতঃ, পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা-বিধানের দিক দিয়া বিষয়টী বিচার করা যাক। মেয়েদের এই রন্ধনের অভ্যাস দিন দিন হ্রাস পাওয়াতে আমরা কতই অভাব-অসুবিধায় পতিত হইতেছি। পূর্ব্বে কি ধনী কি

দরিদ্র প্রতি গৃহস্থ-ঘরে গৃহলক্ষ্মীরা সকলেই রন্ধন-বিদ্যায় পটু ছিলেন এবং নিজেরা স্বহস্তেই সমস্ত রন্ধনাদি কার্য্য করিতেন। পাচক-পাচিকা রাখিয়া রন্ধনাদি করান কেহ কখনও জানিতেন না। ইহা বোধ হয় তাঁহাদের নিকট উপহাসের বিষয় ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বড় লোকের কথা দূরে থাকুক, আজকাল সামান্য তিরিশ টাকা মাহিয়ানার কেরাণীদেরও অনেক সময় ভাগাভাগি করিয়া উড়ে ঠাকুর রাখিতে দেখা যায়। উড়েঠাকুর ভিন্ন যেন কিছুতেই চলিবার উপায় নাই।

মা-লক্ষ্মীরা একটু বড় ঘরের মেয়ে হইলে ত কথাই নাই, রাঁধাটা যে একটা রমণীর অপরিহার্য্য গুণ তাহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। শিক্ষিত মধ্য-বিত্ত ঘরের হইলেও অনেক বধূই রন্ধনবিদ্যাতে প্রায়ই অনভিজ্ঞা হয়েন এবং রন্ধনের নাম শুনিলেই নাসিকা সঙ্কুচিত করেন। এই ভয়ানক অন্নসমস্যার দিনে ইহা অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে একশত টাকা যাঁহার মাহিয়ানা, সংসার প্রতিপালন করিয়া সন্তানাদির শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে তাঁহাকেও অতি সাদাসিধা ভাবে একরূপ কায়ক্লেশেই দিন কাটাইতে হয়; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যদি একজন ৫০৲ মাহিনার কেরাণীর একজন উড়েঠাকুরের ব্যয়ভার বহন করিতে হয় (এবং একজন ঠাকুর রাখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য দু একটি বিলাসিতাও বাড়িয়া যাইবে) তাহা হইলে পরিণাম-ফল কি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অনতিকাল মধ্যেই দেনার দায়ে তাঁহাকে একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় এবং পরিণামে এমন অবস্থায় গিয়া দাঁড়াইতে হয়, যাহা ভদ্রতা ও মনুষ্যত্বের গণ্ডীর সম্পূর্ণ বাহিরে। তখন বামুনঠাকুর রাখার পরিবর্ত্তে নিজেদেরই সেই পাচক-পাচিকার কার্য্যে ব্রতী হইতে "চোখের জলে নাকের জলে" হইতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত আজকাল অহরহঃ চোখে পড়িতেছে। কিন্তু হায়! এমনি আমাদের অধঃপতনের সময় যে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কিছুতেই আমাদের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিতেছে না।

শুধু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথা নহে, ধনীদের ভিতর এই দোষও কোন মতে উপেক্ষার বিষয় নহে। ধনীর দাস-দাসী ও পাচক-পাচিকা নিযুক্ত করিয়া বিশেষ কিছু অর্থ-কষ্ট অনুভব করিতে না পারেন; কিন্তু যদি তাঁহারা ঐ অনাবশ্যকীয় খরচ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা তদ্বারা দুই একটি অনাথ-পরিবারের প্রাণ-রক্ষার কারণ হইতে পারিতেন; মানবজীবনের সার-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত! বিপন্ন বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-আত্মীয়াকে তাঁহারা প্রতিপালন করা গুরুভার বলিয়া মনে করেন; কিন্তু ঠাকুর-চাকর রাখিয়া ও তৎসঙ্গে নানারূপ ব্যয়বাহুল্য, কদর্য্যতা ও ব্যাধিবীজের বিলাসিতার, প্রশ্রয় দিয়া অর্থের অপব্যবহার করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন না। ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? একটি অনাথ আতুরকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে যে পবিত্র সুখ ও শান্তি আছে, পৃথিবীর কোন্ সুখ তাহার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে? তারপর এই ধনীদিগকে কিছুদিনের মধ্যে —এই ঠাকুর চাকরেরই অধীন হইতে হয়। মা-লক্ষ্মীরা ক্রমশঃ এমনি হইয়া পড়েন যে, একদিন বা একবেলাও উড়ে ঠাকুর না হইলে চলে না। কোন দিন যদি ঠাকুর আসিতে না পারে (যাহা মাঝে মাঝে ঘটিয়াই থাকে) তাহা হইলে সেদিন অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিককেও একরূপ উপবাসে কাটাইতে হয় বা হোটেল হইতে ভাত-তরকারী কিনিয়া চালাইতে হয়। এইরূপ ছোট-খাট আরও কত রকম অসুবিধা ও অশান্তি কত সময় ভোগ করিতে হয়, যাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই ভাল জানেন। কিন্তু হায় তবু ইহা মদ্যাদির ন্যায় এমনি নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, শত শত অপকার হইতেছে জানিলেও ছাড়িবার কোনই উপায় নাই। মন্দকাজ ও বিলাসি-তার পথ ক্রম-নিম্ন ও পিচ্ছিল। একবার পদস্খলন হইলে একেবারে নিম্নতম স্তরে আসিয়া পৌঁছিতে হয়। তৎ পূর্ব্বে থামিতে পারা কদাচিৎ দু একজন শক্তিমানের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং একবার এই উড়ে ঠাকুর রাখা প্রথাটিকে প্রশ্রয় দিলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিলাসিতার উপকরণ ও আকুণ্ঠিত আলস্য আপনা

দিয়া বাহির হইয়া দেহে ছড়াইয়া যায়। এই কারণেই অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ফুস্‌ফুস অধিক মাত্রায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। যতক্ষণ যক্ষ্মার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা থাকে, ততক্ষণ উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। কিন্তু প্রায় সকল সময়েই ফুস্‌ফুসে অবস্থান করিবার সুবিধা পায় বলিয়া সুযোগ মত আক্রমণ করে। রসস্রাবী গ্রন্থি ও ফুস্‌ফুসের পর, দেহের প্রায় সকল স্থানই প্রায় সমভাবেই রোগ-প্রবণ এবং কোন একটী যন্ত্রকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা যায় না।

যক্ষ্মা-জীবাণুর অবস্থান—বাহ্য জগতে।

যক্ষ্মা-জীবাণু রোগগ্রস্ত লোকের কফে অবস্থান করে, সে বিষয়ে এখন আর কোন মতদ্বৈধ নাই এবং সেই কারণে যে স্থানে কফ পরিত্যক্ত হয়, সেই স্থানে জীবাণুর অবস্থান লক্ষিত হইয়া থাকে। বহির্জগতে অবস্থান কালীন প্রায়ই এই জীবাণুগুলি রৌদ্রের তাপে অনেক-গুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং যদ্যপি তাহারা বায়ুর সাহায্যে রৌদ্রময় স্থান হইতে কোনো ছায়াময় স্থানে নাত হইয়া বাঁচিয়াও থাকে, তথাপি তাহাদের নূতন করিয়া রোগ সৃষ্টি করিবার শক্তি বহু পরিমাণে অন্তর্হিত হয়। এই কারণে কখনও কখনও রোগীর গৃহে বাহিরের ধূলির সহিত জীবাণু দৃষ্ট হইলেও তাহার দ্বারা নূতন বিপদের সম্ভাবনা অল্প বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু রৌদ্র-বাতাসহীন স্থানে যদি কোন প্রকারে সতেজ জীবাণু একবার আশ্রয় লইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের শক্তি বহুদিন কার্য্যকরী থাকে, সেকথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

গাভীর পালানে যদি জীবাণু আশ্রয়লাভ করিয়া ক্ষত উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ গাভীর দুগ্ধে জীবাণু দৃষ্ট হয় এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঐ দুগ্ধ শিশুদিগের মধ্যে রোগ-বিস্তারের একটী প্রধান সহায়।

বাহ্য জগতে জীবাণুর অবস্থানের আরও কয়েকটী সুবিধা আছে এবং তাহার দ্বারা কিরূপে রোগ বিস্তার হয়, আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহার আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

রন্ধন-সমস্যা

। শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল।

রজনীর ভূষণ যেমন চন্দ্রমা, পুরুষের ভূষণ যেমন বিদ্যা, স্ত্রীলোকের ভূষণও তেমনি রন্ধন। পতিপরায়ণতা, কর্ম্মপটুতা, ও ধর্ম্মশীলতা ইত্যাদি গুণের সঙ্গে সঙ্গে এই রন্ধননশীলতাটীও স্ত্রীলোক মাত্রেরই অপরিহার্য্য গুণ হওয়া উচিত। রন্ধনাদি কার্য্যে আলস্য বা উদাসীনতা প্রকাশ করা বাস্তবিকই বড় দুঃখের বিষয়। ইহার অভাব দিনদিন আমরা এত তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি যে এসম্বন্ধে কাগজে-কলমে আলোচনা ও মন্তব্য প্রকাশ এখন কোন দোষের হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্ত্রীলোক উচ্চ-শিক্ষা তেমন না পাইতে পারেন, সূক্ষ্ম শিল্প বা কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী হইতে না পারেন; কিন্তু যদি একমাত্র এই রন্ধন বিদ্যায় অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রায় সকলের নিকটই প্রশংসার যোগ্যা ও প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন। অপর পক্ষে নানাবিধ গুণে ভূষিতা হইয়াও যদি এই রন্ধনশীলতার অভাব হয়, তাহা হইলে তিনি গোলাপহীন উদ্যানের মতই দৃষ্টা হইয়া থাকেন। অন্যান্য গুণরাজি থাকা সত্ত্বেও লোকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারেন না।

প্রথমতঃ, পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা-বিধানের দিক দিয়া বিষয়টী বিচার করা যাক। মেয়েদের এই রন্ধনের অভ্যাস দিন দিন হ্রাস পাওয়াতে আমরা কতই অভাব-অসুবিধায় পতিত হইতেছি। পূর্ব্বে কি ধনী কি দরিদ্র প্রতি গৃহস্থ-ঘরে গৃহলক্ষ্মীরা সকলেই রন্ধন-বিদ্যায় পটু ছিলেন এবং নিজেরা স্বহস্তেই সমস্ত রন্ধনাদি কার্য্য করিতেন। পাচক-পাচিকা রাখিয়া রন্ধনাদি করান কেহ কখনও জানিতেন না। ইহা বোধ হয় তাঁহাদের নিকট উপহাসের বিষয় ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বড় লোকের কথা দূরে থাকুক, আজকাল সামান্য তিরিশ টাকা মাহিয়ানার কেরাণীদেরও অনেক সময় ভাগাভাগি করিয়া উড়ে ঠাকুর রাখিতে দেখা যায়। উড়েঠাকুর ভিন্ন যেন কিছুতেই চলিবার উপায় নাই।

মা-লক্ষ্মীরা একটু বড় ঘরের মেয়ে হইলে ত কথাই নাই, রাঁধাটা যে একটা রমণীর অপরিহার্য্য গুণ তাহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। শিক্ষিত মধ্য-বিত্ত ঘরের হইলেও অনেক বধূই রন্ধনবিদ্যাতে প্রায়ই অনভিজ্ঞা হয়েন এবং রন্ধনের নাম শুনিলেই নাসিকা সঙ্কুচিত করেন। এই ভয়ানক অন্নসমস্যার দিনে ইহা অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে একশত টাকা যাঁহার মাহিয়ানা, সংসার প্রতিপালন করিয়া সন্তানাদির শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে তাঁহাকেও অতি সাদাসিধা ভাবে একরূপ কায়ক্লেশেই দিন কাটাইতে হয়; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যদি একজন ৫০৲ মাহিনার কেরাণীর একজন উড়েঠাকুরের ব্যয়ভার বহন করিতে হয় (এবং একজন ঠাকুর রাখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য দু একটি বিলাসিতাও বাড়িয়া যাইবে) তাহা হইলে পরিণাম-ফল কি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অনতিকাল মধ্যেই দেনার দায়ে তাঁহাকে একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় এবং পরিণামে এমন অবস্থায় গিয়া দাঁড়াইতে হয়, যাহা ভদ্রতা ও মনুষ্যত্বের গণ্ডীর সম্পূর্ণ বাহিরে। তখন বামুনঠাকুর রাখার পরিবর্ত্তে নিজেদেরই সেই পাচক-পাচিকার কার্য্যে ব্রতী হইতে "চোখের জলে নাকের জলে' হইতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত আজকাল অহরহঃ চোখে পড়িতেছে। কিন্তু হায়! এমনি আমাদের অধঃপতনের সময় যে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কিছুতেই আমাদের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিতেছে না।

শুধু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথা নহে, ধনীদের ভিতর এই দোষও কোন মতে উপেক্ষার বিষয় নহে। ধনীর দাস-দাসী ও পাচক-পাচিকা নিযুক্ত করিয়া বিশেষ কিছু অর্থ-কষ্ট অনুভব করিতে না পারেন; কিন্তু যদি তাঁহারা ঐ অনাবশ্যকীয় খরচ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা তদ্বারা দুই একটি অনাথ-পরিবারের প্রাণ-রক্ষার কারণ হইতে পারিতেন; মানবজীবনের সার-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত! বিপন্ন বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-আত্মীয়াকে তাঁহারা প্রতিপালন করা গুরুভার বলিয়া মনে করেন; কিন্তু ঠাকুর-চাকর রাখিয়া ও তৎসঙ্গে নানারূপ ব্যয়বাহুল্য, কদর্য্যতা ও ব্যাধিবীজের বিলাসিতার, প্রশ্রয় দিয়া অর্থের অপব্যবহার করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন না। ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? একটি অনাথ আতুরকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে যে পবিত্র সুখ ও শান্তি আছে, পৃথিবীর কোন্ সুখ তাহার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে? তারপর এই ধনীদিগকে কিছুদিনের মধ্যে —এই ঠাকুর চাকরেরই অধীন হইতে হয়। মা-লক্ষ্মীরা ক্রমশঃ এমনি হইয়া পড়েন যে, একদিন বা একবেলাও উড়ে ঠাকুর না হইলে চলে না। কোন দিন যদি ঠাকুর আসিতে না পারে (যাহা মাঝে মাঝে ঘটিয়াই থাকে) তাহা হইলে সেদিন অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিককেও একরূপ উপবাসে কাটাইতে হয় বা হোটেল হইতে ভাত-তরকারী কিনিয়া চালাইতে হয়। এইরূপ ছোট-খাট আরও কত রকম অসুবিধা ও অশান্তি কত সময় ভোগ করিতে হয়, যাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই ভাল জানেন। কিন্তু হায় তবু ইহা মদ্যাদির ন্যায় এমনি নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, শত শত অপকার হইতেছে জানিলেও ছাড়িবার কোনই উপায় নাই। মন্দকাজ ও বিলাসি-তার পথ ক্রম-নিম্ন ও পিচ্ছিল। একবার পদস্খলন হইলে একেবারে নিম্নতম স্তরে আসিয়া পৌঁছিতে হয়। তৎ পূর্ব্বে থামিতে পারা কদাচিৎ দু একজন শক্তিমানের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং একবার এই উড়ে ঠাকুর রাখা প্রথাটিকে প্রশ্রয় দিলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিলাসিতার উপকরণ ও আকুণ্ঠিত আলস্য আপনা

হইতেই আসিয়া পড়িবে,—ক্রমেই নানা অভাব ও বিবিধ আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া চলিবে এবং এইরূপে অনতিকাল মধ্যে ঘোর নৈতিক অধঃপতন আসিয়া উপস্থিত হইবে।

তারপর, স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যদি একবার এইদিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে এই রন্ধনশীলতার অভাব দোষ অত্যন্ত ভীষণভাবে উপলব্ধ করিব। যে সব উৎকলাগত ঠাকুর আমাদের প্রতি ঘরে ঘরে শোভা পায়, তাহাদের অধিকাংশই রামরাজাতলা হইতে একগাছি পৈতা পরিয়া আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন্ জাতি—কি বংশ—কি আচার-পদ্ধতি কিছুই আমাদের জানিবার প্রয়োজন হয় না, বা প্রয়োজন হইলেও জানিবার উপায় নাই। আমরা অনায়াসে উহাদিগকে অন্তঃপুরের শুদ্ধ-চারিণী মহিলাদের মধ্যে বরণ করিয়া লইয়া যাই। উহাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বইটীরই বংশগত কোন, না-কোন কুৎসিৎ ব্যাধি লুক্কায়িত থাকে, অথবা প্রলোভনে পড়িয়া অগম্যস্থানে গমনাগমন-সংস্পর্শে ঐ সব ব্যাধিতে জড়িত হয়। ইহা যে আমরা অজ্ঞাত থাকি তাহা নহে। কিন্তু হায়! মানুষের বিলাসিতা ও অভ্যাস এমনি জিনিষ যে, যাহা কোন নিকট আত্মীয়ের মধ্যে দেখিলেও তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করি, এই সব বামুন-ঠাকুরের মধ্যে তদপেক্ষা শতগুণ দেখিয়াও একবার এ ভুল সংশোধনের কথা আমাদের মনে আইসে না। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারও অনায়াসে এই সব অনাচার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সহ্য করেন।

এই সব ঠাকুরদের উচ্ছিষ্টজ্ঞান ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ত আদৌ নাই—সময় সময় থুথু, ঘাম, শিক্‌নি ইত্যাদিও খাবারের জিনিসের মধ্যে অসাবধানে বা অবলীলাক্রমে ফেলিয়া থাকে *। আরও দু একটি কদর্য্যতার বিষয় আছে যাহা প্রকাশ করিতে ঘৃণায় লেখনীও সঙ্কুচিত হয়। অথচ আমরা এ সব বিশেষরূপে বিদিত আছি। এই সবের পরিণামই আমাদের অগণিত আধি ব্যাধি,—ইহারই ফলে আমরা দিন দিন ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল হইতেছি। এইজন্যই সকল থাকিতেও অসহায় অবস্থায় আমাদিগকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইতেছে। এই সব পরম মঙ্গলময় মূল্যবান বিষয় লইয়া স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিকাদিতে সর্ব্বদাই আলোচনা হইতেছে; ইহার ফল হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, রোগের চিত্র চোখে আঙ্গুল দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে; কিন্তু তাহাতেও আমাদের চোখ ফুটিতেছে কি? ঠাকুর রাখার পদ্ধতি দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, মেয়েরাও রন্ধনাদি বিষয়ে ক্রমেই অধিকতর অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাহাদের বিলাসিতার মাত্রাও বাড়িয়া চলিতেছে।

আজকাল সহরাঞ্চলে এত যে উৎকট ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাধি, তাহার প্রধান কারণই আহারাদি বিষয়ে অপরিষ্কৃত ও অসংযমতা। খাদ্য আমাদের প্রাণ—অন্নরূপী স্বয়ং ভগবান এই খাদ্যবিষয়ে আমাদের শাস্ত্রকারকগণ সাত্ত্বিকতা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য কত অনুশাসন প্রদান করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত আচার-পদ্ধতিই প্রধানতঃ এই খাদ্যাদির ব্যাপার লইয়া। এই খাদ্য বিষয়ে সংযম ও পবিত্রতা রক্ষা হইলে আশ্চর্য্যভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ও অব্যাহত স্বস্থি থাকিতে পারে। এই রহস্য তাঁহারা বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই আহারাদি বিষয়ে সংস্পর্শদোষ পর্য্যন্ত এত দোষণীয় করিয়া গিয়াছেন; এবং এ বিষয়ে সাবধানী হইতে গিয়া স্বপাক ভোজন পর্য্যন্ত ব্যবস্থা

* লেখকের এই আলোচনা প্রসঙ্গে একটা সত্য ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। কোনো নিষ্ঠাবান্ জজের বাড়ীতে এক উড়ে ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন উড়ে বামুনের অনুপস্থিতে মেয়েদিগকে রাঁধিতে হয়। জজ মহাশয় মাছের ঝোল দেখিয়াই বলিয়া উঠেন, "এঃ তোমরা কি মাছের ঝোল রেঁধেছ। রঙ, এরূপ মেটে মেটে কাদা-ঘোলা হয় কেন? বামুন ঠাকুর কেমন লাল টক্‌টকে ঝোল রাঁধে—দেখলেই প্রথমটা চক্ষু জুড়ায়" এই মন্তব্য শুনিয়া অন্তঃপুরিকাগণের মনে বড় কষ্ট হইল; তাঁহারা সঙ্ক করিলেন, কি করিয়া পাচক ব্রাহ্মণ ঝোলে লঙ্কা বাটা না দিয়াও রক্তিমাভ করে—সংগোপনে দেখিবেন। একদিন সুযোগ ঘটি তাঁহারা দেখিলেন—ঝোল্ ফুটিবার সময় ঠাকুর ভালো করিয়া দুইটা পা ও দোক্তা মুখে করিয়া চিবাইতে লাগিল; ঝোল নামাইবার মিনিট পূর্ব্বে মুখভরা পানের পিচ্ ঝোলের কড়ায় অতি সন্তর্পণে নি করিয়া তাহার বর্ণ-সুষমা সম্পাদন করিল।...

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু, সহঃ স

করিয়া গিয়াছেন। এখনও দুইচারিজন যাঁহারা স্বপাক-ভোজী এবং আহারাদি বিষয়ে সাত্ত্বিকতাসম্পন্ন তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও অন্যান্যদিকে দৃষ্টি করিলেই এ বিষয়ের সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি হইবে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ লইয়াই জগতের ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখ সৃষ্ট। আহারাদি বিষয়ে এই গুণের প্রভাব কত বেশী তাহা বর্ত্তমানে আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিবার শক্তি আদৌ নাই। তাই আজকাল কথায় কথায় আমরা শাস্ত্রীয় আচারকে উপহাস করিয়া নিজেদের বিলাতী বিদ্যার বাহাদুরী দেখাই; পচা মাছ খাইলে পেটের অসুখ হয়, পিঁয়াজ-রসুন উত্তেজক,—এইটুকু পর্য্যন্তই আমরা স্থূল বিজ্ঞানের বুদ্ধিতে ধরিতে পারি। কিন্তু তাচ্ছিল্যভাবে বা ঘৃণার সহিত কেহ রাঁধিয়া দিলে বা দুর্নৈতিক আবেষ্টনীর মধ্যে খাইতে আহ্বান করিলে যে তাহাতে রাজসিকতা ও তামসিকতার সৃষ্টি করে, সেই খাদ্যগ্রহণ পাপ এবং খাইলে দুদিনে হউক দশদিনে হউক কোন-না-কোন বিষময় ফল অবশ্যই প্রদান করে—এ বিজ্ঞানের রহস্য কয়জন আমরা বুঝি বা ভাবিয়া দেখি? ইহা শাস্ত্রকারক মুনিঋষিদের উন্মাদ-কল্পনা নহে—সম্পূর্ণ পরীক্ষিত দার্শনিক সত্য। আমাদের বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি এ সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচার করিয়া ততদূর উঠিতে অক্ষম; তাই জড় বুদ্ধিতে যেটুকু বুঝি তাহার অতিরিক্ত কিছু হইলেই হাসিয়া উড়াইয়া দেই।

মা, বোন, পিশিমা, মাসিমা ইত্যাদি স্নেহময়ী গুরুজন অথবা প্রেমময়ী পতিব্রতা স্ত্রী প্রসন্নচিত্তে প্রাণের আদর ভালবাসা মাখাইয়া যে খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিয়া দেন, তাহা শাকভাত হইলেও আমাদের স্থূল চক্ষুর অগোচরে এমন এক পূত সাত্ত্বিক অণু-পরমাণু তাহার সঙ্গে গিয়া মিশ্রিত হয়, যাহাতে উক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি অমৃত-তুল্য গুণ ধারণ করে। এইজন্য পরমপূণ্য গ্রন্থ মহাভারতে দেখিতে পাই—দ্রৌপদী যখন রন্ধন করিতেন, তখন তাঁহার রন্ধনে অমৃত মিশ্রিত হইত;—সামান্য শাক ভাত হইলেও সেই খাদ্যে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের ক্ষুধা দূর করিতে ও তৃপ্তি প্রদান করিতে পারিতেন। দ্রৌপদী রন্ধনের সময় প্রসন্নচিত্তে ও একান্ত মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রাণের যত্ন ভালবাসা মাখাইয়া ভোজ্য দ্রব্য রন্ধন করিতেন, কাজেই তাঁহার হস্তের রন্ধনদ্রব্য অমৃতময় গুণ ধারণ করিত। আমাদের মা-ভগ্নিরা যখন তাঁহাদের প্রাণের তৃপ্তি দিয়া পরিষ্কৃতভাবে আমাদের জন্য রান্না করেন, তখন তাঁহাদের চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে এক আনন্দ ও সাত্ত্বিকতার প্রবাহ ছুটিতে থাকে; সেই-প্রবাহে তন্নিকটস্থ বায়ুমণ্ডল—সুতরাং খাদ্যদ্রব্যাদিও এক নূতন গুণ ধারণ করে। ইহা অনুমান মাত্র নহে—অভ্রান্ত সত্য! মেস, হোটেলের অন্ন এবং অন্যের গলগ্রহ হইয়া খাওয়ার অন্ন যে গায়ে লাগে না, অথচ বাড়ীর শাক-ভাতেও শরীর সবল ও সুস্থ থাকে, ইহাই বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ। ভাল-মন্দ কোন জিনিষেরই ফল একদিনে বুঝা যায় না; যখনই কুপথ্য করি, তখনই কি রোগে ধরে? আমাদের এই যে সব নানাবিধ ব্যাধি-বিড়ম্বনা ইহারা কোন্ সূত্রে কি ভাবে আইসে এবং তাহাদের মূল কোথায় আমরা কি কখনও অনুসন্ধান করি? প্রথমতঃ যখন রক্তের জোর থাকে, কত অত্যাচারই সহ্য হয়; কিন্তু রোগের সূক্ষ্মতম বীজ শরীরের মধ্যে থাকিয়া যায় এবং একটু পরিণত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ফলটি ফলিতে থাকে।

সামাজিকতার দিক হইতে দেখিলেও এই রান্নার প্রভাব কম দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে পূজা-পার্ব্বণাদি ও অন্যান্য নিমন্ত্রণ-ব্যাপারে, বাড়ীর মেয়েরাই রন্ধনাদি সকল কার্য্য করিতেন। বাড়ীর মেয়েরা অশক্ত হইলে, পাড়ার মেয়েরা এবং সময়ানুসারে অন্যপাড়ার মেয়েরাও রন্ধন ব্যাপারে সাহায্য করিতে আসিতেন। চারি পাঁচশত লোক খাওয়াইতে হইলেও কখনও কোন রাঁধুনি-ব্রাহ্মণ দরকার হইত না। রাঁধুনি বামুনের নামও কেউ জানিত না। মেয়েদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, কর্ম্মপটুতা, পবিত্রতা ও উৎসাহশীলতার সে ছবি এখনও মনে হইলে শ্রদ্ধায় ও আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে! আর আজ কি পরিতাপের বিষয় যে, দ্বাদশটা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেও উড়ে ঠাকুর বাড়ীতে না

থাকিলে, মাহিনা করিয়া ঠাকুর আনিলে তবে ভোজন ব্যাপার সমাধা হয়। এমন ব্যাপার আমার এই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় স্বচক্ষে কত দেখিয়াছি যে, কোন কারণে বায়না-করা উড়ে ঠাকুর আসিতে দেরী হইয়াছে, এজন্য বেলা ১টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বেলা ৫টার সময় অত্যাগত-গণের আহার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, তবু কোন মেয়েরা রন্ধনে হস্তক্ষেপ করেন নাই! অথচ লোক খাইতে মাত্র ৪০টী! সুখের বিষয়, পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক গ্রামে এখনও এতদূর দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় নাই। এখনও মেয়েদের হাতাবেড়ী উড়িয়া ঠাকুর আসিয়া অধিকার করিয়া বসিতে পারে নাই; নিমন্ত্রণ-ব্যাপার এখনও হাসিতে হাসিতে মেয়েরা পাঁচজনে মিলিয়াই নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু সহরের বিলাস-হাওয়া যখন ক্রমে ক্রমে দূর পাড়াগাঁয়েও অধিকার বিস্তার করিতেছে, তখন অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়েও যে কি দেখিতে হইবে—তাহার স্থিরতা কি? আজকাল অসুখ-বিসুখ বা কোন বিশেষ কারণ ঘটিলে পাশের বাড়ীর মেয়েরাও একবেলার জন্য সাহায্য করেন না; কিন্তু তখন অন্য পাড়া বা অন্যগ্রাম হইতেও অনায়াসে রন্ধনের সাহায্য মিলিত। এই ভাবটী কত মধুর ছিল, তাহা কি বাস্তবিকই একবার ভাবিয়া দেখার বিষয় নহে?

অনেক পরিবারে আজকাল দেখা যায় যে, রান্নার ভার বাড়ীতে বুড়ী মা বা পিশি-মাসি যিনি থাকেন, তাঁহার উপর চাপাইয়া, বিলাসিনী বধূ কেশ-বেশ প্রসাধনে ও নাটক-নভেল পাঠ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকেন। (মা-লক্ষ্মীরা এই অপ্রিয় সত্যের জন্য হতভাগ্য লেখককে ক্ষমা করিবেন)। স্বামী মহোদয়েরাও অনায়াসেই এ জিনিষটা হজম বা উপেক্ষা করেন। কেন না তাঁহারা মনে করেন, আগুনের উত্তাপে নব বধূর—বয়স অবশ্য তিরিশের উপর হইলেও—রূপের প্রভা মলিন হইয়া যাইবে। বধূ অত ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া রোগগ্রস্থা হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, বৃদ্ধা মাতা পিশি বা মাসি যাঁহাদের কাছে তাঁহারা প্রতি রক্তবিন্দুটীর জন্য দায়ী, তাঁহাদের প্রতি ইহাতে কি যথোচিত কর্ত্তব্য সাধন হইতেছে? রন্ধনাদি কার্য্যে রূপের প্রভা মলিন না হইয়া যে উজ্জ্বলই হয়, তাহা পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। সহরের মেয়েদের রূপ শুধু বাহ্য বেশ ভূষা ও সাবান এসেন্স লইয়াই। উহা যথার্থ রূপ নহে। যথার্থ রূপের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এবং শারীরিক পরিশ্রমই স্বাস্থ্যোন্নতির প্রাধান উপকরণ। রন্ধন-বাটনাবাটাদি কায়িক পরিশ্রমের অভাবে মেয়েদের স্বাস্থ্য দিন দিন এত খারাপ হইতেছে। অন্তঃসত্বা অবস্থায় যে সব মেয়েরা রন্ধনাদি পরিশ্রমের কাজ করেন, তাঁহাদিগকে সন্তান প্রসবের সময় প্রায়ই কোন কষ্ট পাইতে হয় না। আজ-কাল সহরাঞ্চলে, বিশেষতঃ ধনী-গৃহে এত পাশ-করা ধাই, লেডী ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও যে সুতিকাগৃহে শিশু ও পোয়তির মৃত্যু-সংখ্যা এত বাড়িতেছে, ইহাও তাহার প্রধান কারণ বুঝিতে হইবে।

গৃহলক্ষ্মী কথাটি শুনিলেই সর্ব্বপ্রথমে রন্ধনশীলা সেবারতার পবিত্র আনন্দময় ছবিখানি মনে উদিত হয়। রন্ধনই কুনললনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। আমার পাঠ্য জীবনে আমি কোন এক স্বনামধন্য প্রফেসারের বাসাতে থাকিয়া পড়িতাম। তিনি আমায় এতদূর স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন যে, আমার যথাসর্ব্বস্বের জন্য আমি চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী রহিব। তাঁহারই বাড়ীতে এই প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীর যে মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছি, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। আমারই মত অসহায় আরও ছাত্র তিনি প্রতিপালন করিতেন। বাসাতে আত্মীয়-স্বজন ও আমাদের লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ তেইশ-চব্বিশটী লোক, ইহার পর উপরি লোকও দুই চারিটী সময় সময় হইত এবং পূজনীয় অধ্যাপক মহাশয়ের উদার স্বভাব-গুণে ছোট খাট নিমন্ত্রণ-ব্যাপার প্রায়ই বাসাতে লাগিয়া থাকিত। ইহাতে একদিনের জন্য যে বাড়ীতে কখনও উড়ে ঠাকুর বা কোনরূপ রাধুনী ঢুকিতে দেখি নাই। পরমপূজনীয় মাতৃ-স্থানীয়া অধ্যাপক-পত্নী নিজ হস্তেই রন্ধনাদি সকল কার্য্য করিয়াছেন। বাজারাদি করিবার জন্য একজন চাকর ছিল মাত্র।

ছয়শত টাকা মাহিয়ানার প্রফেসার—অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও বড় ঘরের সন্তান, তাঁহার পত্নীও তদনুরূপ সম্ভ্রান্ত ও ধনীর গৃহের মেয়ে। ইচ্ছা মাত্র তাহারা দুই এক জন বামুন ঠাকুর রাখিতে পারিতেন; এবং ছেলে পিলে লইয়া ও সাময়িক অসুখ-বিসুখে আমরা সকলেই সেটা অপরিহার্য্যও মনে করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তিনি এক বেলার জন্যও বাড়ীতে ঠাকুর আসিতে দেন নাই। পরমপূজনীয়া আদর্শস্থানীয়া মহিলা নিজ হাতেই হাসি মুখে ও আনন্দিত চিত্তে আমাদিগকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে অন্নদান করিয়াছেন। গৃহ-লক্ষ্মীর সে পবিত্র মূর্ত্তি—সে দয়া-মায়া-স্নেহ-যত্নশীলতা—সে আনন্দময়ী ছবি এখনও মনে হইলে শ্রদ্ধা ও আহ্লাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মনে হয়, ধনীদের প্রতি ঘরে যে দিন এই পূত মধুময় দৃশ্য দেখিতে পাইব, সেইদিন আমাদের কষ্টের ভার অনেকটা লাঘব হইবে—সেইদিন আমাদের জাতীয় জীবন সার্থক ও ধন্য হইবে। মহা-ভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এই রন্ধনশীলতার আদর্শ কত দেখিতে পাই। সম্রাট পত্নী, রাজমহিষীরাও নিজহস্তে রাঁধিয়া পরিবারবর্গকে খাওয়াইতেন। মা লক্ষ্মীদের নিকট এইটুকু প্রার্থনা—তাঁহারা যেন প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইয়া অনিন্দময়ী মূর্ত্তিতে স্বামী-পুত্রদিকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করান। তাহা হইলে তাঁহাদের ভিতর যে মাধুরী, যে সৌন্দর্য্য, যে পবিত্রতা দেখিতে পাইব, তেমন আর কিছুতেই আশা করিব না। তাঁহাদের ছবি মনে হইলে তখন আপনা-আপনি শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসিবে। আজ "নারী-জাগরণের" দিনে মা-লক্ষ্মীরা কত উচ্চ আদর্শের কথা ভাবিতেছেন, কতরূপ উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা যেন দ্রৌপদীর আদর্শে বিভূষিতা হয়েন।

জীবন-কল্যাণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীনরেন্দ্রকুমার দাস, M B, M. C. P. & S. (C. P. S.), M. D. (Bio), M. D. (H), M. R. I. P. H. (Eng) "ভিষগরত্ন"]

(৬) **নস্য**—তামাকের গুঁড়ার সহিত অন্যান্য উত্তেজক অথচ সুগন্ধ মশলা প্রভৃতি ও গন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নস্য প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহা তামাকের মতই অপকারী ও উগ্র—অধিকন্তু মস্তিষ্কের উপর তামাক অপেক্ষাও ইহা অধিক শীঘ্র ও তীব্র রূপে কাজ করিয়া থাকে। অধুনা স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে নস্য গ্রহণ করা একটা 'ফ্যাসান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ছাত্রেরা প্রথমে ইহা অল্প অল্প নাকে টানে—প্রথম প্রথম খুব হাঁচিতে থাকে, যাহাদের শরীর দুর্ব্বল তাহাদের মস্তক ঘূর্ণনও সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, কেহ কেহ বমনও করে; কিন্তু কোনও রূপে কিছুদিন অভ্যস্ত হইয়া গেলে শেষে আর কোন অসুবিধা বুঝিতে পারে না: কাযেই সিগারেট-সেবীর মত ক্রমাগত অধিক ব্যবহার করিতে থাকে।

ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে শেষে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, পকেটে নস্যের শিশিটা না থাকিলে কোনও রূপেই তাহারা শান্তি পায় না। নস্য ব্যবহার এখন সাধারণ একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের ভয় হয় যে, নস্য-ব্যবহার সম্বন্ধে স্কুল-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি সতর্ক না হয়েন, তবে তামাক-সিগারেট যেরূপ বয়স্ক-দিগের মধ্যে ভদ্রতা রক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভবিষ্যতে নস্য ছাত্র-সমাজে ঐরূপ স্থান অধিকার করিবে। পরন্তু ভবিষ্যতে যে নস্য সকল সমাজেই ভদ্রতা রক্ষার স্থান অধিকার করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আজকাল পিতামাতারাই ছেলেদের শাসন করেন না। এইজন্য অনেক স্থলে দেখা যায় যে, ছেলেরা পিতামাতার সম্মুখেই নস্য ব্যবহার করে; অনেকস্থলে এমনও দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষক ছাত্রের নিকট হইতে নস্য চাহিয়া লইয়া অবাধে ও অসঙ্কোচে ব্যবহার করিতেছেন। নস্য টানা যখন শরীরের পক্ষে অপকারী, তখন উহার যাহাতে দেশে বহুল প্রচার না হয়, সেজন্য শাসক সম্প্রদায় ও মঙ্গলেচ্ছু নেতাদের দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। এই নস্য ব্যবহার বয়স্কদের দেখিয়াই ছাত্রগণ শিক্ষা করিয়াছে; এখন আবার যদি বয়স্কগণ ইহা ত্যাগ করেন, তবে ছাত্রগণও ইহা ত্যাগ করিবে।

নস্য ব্যবহার যে কেবল কদভ্যাস তাহা নহে, পরন্তু ইহা অতি অস্বাস্থ্যকর, এবং অসভ্য অভ্যাস। কোনও সভ্য জগতেই, কোনও আধুনিক রুচিসম্পন্ন ভদ্র সম্প্রদায়-মধ্যেই এই অসভ্য অভ্যাসটি নাই। সত্য কথা বলিতে কি নস্যসেবীরা সভ্য সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতে লজ্জা বোধ করে; কারণ তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নস্য গ্রহণ করিতে হয়, রুমালে অথবা কাপড়ের কোঁচড়ে পুনঃ পুনঃ নাসিকা মর্দ্দন করিতে হয়। নস্যসেবীর রুমাল নাসিকা ঘর্ষণ করিতে করিতে, নস্যের রংএ ও নাকের "পোঁটায়" এমন সুন্দরভাবে রঞ্জিত ও কুগন্ধ-বিশিষ্ট হয় যে, তাহা কোন ভদ্র সমাজেই বাহির করা চলে না, অথচ নস্যসেবীরা এই রুমালে পুনঃ পুনঃ নাসিকা ঘর্ষণ ব্যতীত কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। কি কদর্য্য অভ্যাস! কী অসভ্য রুচি!!

নস্যসেবীদের নাসারন্ধ্র বর্দ্ধিত ও মোটা হয়, স্বর অনুনাসিক ও কর্কশ হয়, দীর্ঘকাল ব্যবহারকারীর মুখশ্রী কদর্য্য হয় এবং নানাবিধ শিরঃপীড়া হইতে দেখা যায়। হায় রে দেশ! তবুও মানুষ এই বিশ্রী অভ্যাসের বশবর্ত্তী হয়। এই কদভ্যাস একমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়। তবে পূর্ব্বকালে ইয়োরোপে শ্রেণীবিশেষের মধ্যে ইহার ব্যবহার সঙ্কীর্ণভাবে প্রচলিত ছিল। এখন আর অন্য কোনও দেশে ইহার প্রচলন আমরা দেখি না বা জানি না। একে তো এমনি ভারতমাতার সন্তানেরা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্পদ সমস্তই হারাইয়া, রোগে, শোকে জীর্ণ, শীর্ণ, বীর্য্যহীন ও বলহীন হইয়া প্রবল বেগে মৃত্যুর পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার উপর এই নানাবিধ কদভ্যাসগুলি আসিয়া যোগ দিয়া, ক্ষীণজীবি ভারতবাসীর জীবনকে আরও ক্ষীণতর করিয়া তুলিতেছে। ভারতের বুকের উপর দিয়া মৃত্যু যেমন আগুণের মত ছুটিয়া আসিতেছে, রোগ যেন তেম্‌নি হাওয়ার মত আসিয়া তাহাতে যোগ দিতেছে; আবার এই বিবিধ কদর্য্য অভ্যাসগুলি ঐ মৃত্যু-অনলে ইন্ধন যোগাইতেছে। জানি না ভারত-বক্ষ হইতে কত দিনে আবার এই কদভ্যাসগুলি বিলুপ্ত হইবে!

(৭) আফিং (অহিফেন)

সুরার ন্যায় আফিং (অহিফেন) ব্যবহার করাও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। সুরাপায়ী যেরূপ সুরা ব্যবহারের নানাপ্রকার আপত্তি দর্শাইয়া থাকেন, আফিং-সেবনকারীও সেইরূপ আফিং ব্যবহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার ওজর-আপত্তি দেখান ও বলেন যে আফিং শরীরের অনেক উপকার করে।

ভারতে আফিংএ অনেক ক্ষতি করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতবাসীদের এইরূপ ধারণা যে, ডাক্তার ও কবিরাজ মহাশয়েরা বার্দ্ধক্য-পীড়ায় আফিং ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই অমূলক ধারণা বশতঃ আজকাল বৃদ্ধদের এমন কি ৫০ বৎসর পার হইলেই তারপর যদি কোন ব্যায়রাম হয়, তবে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাদিগকে আফিং খাইতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাঁহারা ইহার অপকারিতা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ; তাহা না হইলে তাঁহারা কখনই তাঁহাদের আপনার জনকে এই বিষময় ঔষধ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেন না। আজকাল, আমরা—বঙ্গবাসী, স্বাস্থ্যে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ধনে সর্ব্বপ্রকারে সফল দেশের নীচে—সকলের পিছে রহিয়াছি এবং স্বাস্থ্য-রত্নে বঞ্চিত হইয়া জগতে কোন স্মরণ-যোগ্য কায শেষ করিতে না করিতেই কালের করাল কবলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছি। ইহার

উপর আবার এই সকল কদভ্যাস আসিয়া আমাদের স্বাস্থ্যকে হীন হইতে হীনতর করিয়া, আরও শীঘ্র মৃত্যু-মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

অভ্যাসের কারণ।—বহু চিকিৎসক শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা ও যন্ত্রনা উপশম করিবার জন্য আফিং ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। অধিকাংশ লোকেরই এই মন্দ অভ্যাস চিকিৎসা হইতেই আরম্ভ হয়। চিকিৎসক আফিং ব্যবস্থা করিলেন বেদনা উপশমের জন্য; কিন্তু রোগী বেদনা আরোগ্যের পরও আফিং ত্যাগ করিতে পারেন না। এইরূপে তাঁহারা বিষ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন।

বাত, বহুমূত্র ইত্যাদি কোন কোন পীড়ায় চিকিৎসকেরা আফিং সেবনের পরামর্শ দেন। কিন্তু চিকিৎসকেরা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা শরীরের বিষ (পীড়া) দূর করিতে গিয়া আর একটী অতি এক তীব্র বিষ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা যদি আফিং প্রয়োগের কুফল অবগত থাকিতেন, তবে কখনই রোগীকে এই বিষ সেবনে পরামর্শ দিতেন না।

আফিং সেবনের কুফল।—ডাঃ গ্রুড্ সাহেব তাঁহার মেটিরিয়া মেডিকা নামক ঔষধের পুস্তকের ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, অহিফেন দ্বারা গরিপাক-শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে ও ইহা কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে। আফিং সেবী ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে। আফিং সেবীর সমস্ত নাড়ীমণ্ডল নিস্তেজ হয় ও রোগী অহিফেন ব্যবহারের পর ধীরে ধীরে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয় এবং এই জন্য বেদনা অনুভব করিতে পারে না।

ডাঃ-কেলগ্ অনেক আফিং-সেবীকে আফিং সেবনে নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার Home Hand-Book of Hygiene নামক পুস্তকের ৫৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আফিং সেবনের কুফল চা, কফি, তামাক ও সুরা ব্যবহারের কুফল অপেক্ষাও গুরুতর। চিকিৎসকেরা ইহা ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে দেন এবং ইহার ফলে এই বিষ ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে করিতে রোগীগণ আফিংখোর হইয়া পড়েন; অতএব ডাক্তারদের আর এরূপ ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত নহে। যে জিনিষ ঔষধরূপে ব্যবস্থিত হইয়া এত অহিতকর হয়, সে ঔষধ ব্যবহার না করাই ভাল। এই জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদেরা বহু গবেষণা করিয়া আফিংএর ন্যায় শক্তি-বিশিষ্ট অথচ অক্ষতিকর কয়েকটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিলে আফিং প্রয়োগের সকল সুফলই পাওয়া যায়, অথচ উহার দ্বারা কোন কুফল ফলে না ও একটী রোগ আরোগ্য হইয়া অপর একটী রোগের আবির্ভাব (vicious circle) হয় না।

অহিফেনের শক্তি।—একবার যে আফিং সেবন আরম্ভ করিয়াছে, সে উহা সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। সুরাপান ত্যাগ করা তবুও সম্ভব-পর; কিন্তু আফিং ত্যাগ বড়ই শক্ত ব্যাপার। আফিং সেবন করিতে করিতে যে মোহময় পীড়া জন্মে, তাহাকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে "ওপিওম্যানিয়া" (Opiomania) বলে। অহিফেন এমন একটী জিনিষ যে, ইহা একবার নাড়ীমণ্ডলে প্রবেশ করিলেই দ্বিতীয়বার খাইতে ইচ্ছা হয়, দ্বিতীয় বার খাইলেই তৃতীয় বার খাইতে ইচ্ছা হয় ও এইরূপে ইহাতে আশক্তি ও অভ্যাস জন্মে। প্রথমে লোকে বুঝিতে পারে না যে, ইহা একটী ভীষণ নেশা; কিন্তু এই নেশা ছাড়িবার চেষ্টা করিবার সময় বুঝিতে পারে যে, ইহার প্রভাব কি ভীষণ। তখন সে ইহার প্রভুত্বের নিকট মাথা হেঁট করিয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে সরিষার পরিমাণে আফিং খাইতে আরম্ভ করিয়া কিছুকাল পরেই মটরের পরিমাণ খাইতে থাকে। ঘটনা ক্রমে একদিন যদি আফিং না জুটে, তাহা হইলে আফিংসেবীর যে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন না। আফিংসেবী, যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আফিং সেবন করে, ঠিক সেই সময়েই সে আফিংএর অভাব বুঝিতে পারে। তখন সে যদি আফিং না পায়, তবে সে বাড়ীর ঘটি-বাটি, আসবাব-

পত্র, বাড়ী-ঘর, আত্মবিক্রয়—এমন কি স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিতেও বোধ হয় বিন্দু মাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেনা। ইহা যখন এমন একটী জঘণ্য কদভ্যাস ও ইহার জন্য যখন লোকে সবই করিতে পারে, তখন এমন অভ্যাসের কাহারও দাস হওয়া উচিত নহে।

চীনের আফিং ত্যাগ।—চীনে পূর্ব্বে আফিংএর চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত এবং চীনের প্রায় প্রত্যেকেই আফিংসেবী ছিল। সেই জন্য তাহারা, নৈতিক চরিত্র, পুরুষোচিত উদ্যম সম্বন্ধে জগতের সকল দেশ অপেক্ষা হীন ছিল। সে সময়ে চীনাগণ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে ডুবিয়া-আরম্ভ করিল ও বৈদেশিক আচার-ব্যবহারের সংস্পর্শে আসিল, তখন তাহারা দেখিল যে, আফিংই এত বড় দেশ-টার সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও এই জন্যই এত বড় একটা রাজ্য জগতের সকল জাতির পায়ের তলায় পড়িয়া সবলে দলিত হইতেছে। তখন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল এবং যখন দেখিল যে, আফিংই এই ভয়ানক অনিষ্টের মূল, তখন তাহারা আফিংএর চাষ বন্ধ করাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। অনেক স্থলে অস্ত্রাদির সাহায্যেও আফিংএর চাষ বন্ধ করিতে হইয়াছিল। চীনদেশে রাজ সরকার-ভুক্ত শত-করা পঁচানব্বই জন কর্ম্মচারীই অহিফেন-সেবী ছিলেন।

অবশেষে চীন গভর্ণমেণ্ট ১৯০৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর আফিং চাষের বিরুদ্ধে একটী কঠোর আইন জারি করেন। প্রায় চল্লিশ কোটী (৪৪,০০০,০০০) লোকের নিকট এই আজ্ঞা প্রচারিত হয় ও স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র আফিংএর তাল ও নল পোড়াইয়া দেওয়া হয়। চীন এই মন্দ অভ্যাস সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, সেই সকল উপায় অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশেরও এই কদভ্যাস সমূলে উৎপাটিত করা উচিত। আফিং সেবন ও আফিংএর চাষ বন্ধ করিয়া চীন সভ্য-জগতের নিকট যে জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহা অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চীনের ন্যায় অজ্ঞ ও অশিক্ষিত দেশ যদি এইরূপ সুদৃষ্টান্তের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে, আমরা তদপেক্ষা অধিক শিক্ষিত হইয়াও যদি আফিং সেবন ত্যাগ করিতে না পারি, তবে আমাদের ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে?

ভারত! তোমার মধ্যে এত সভ্যতা, এত জ্ঞান এত বুদ্ধি, এত পুরা-গৌরব, এত উচ্চ শিক্ষা, এত উন্নতি, তথাপি তুমি এখনও সেই জ্ঞান-বুদ্ধি-বিনাশিনী অহিফেন-রাক্ষসীর পদসেবায় নিযুক্ত আছ। চীন অহিফেন ত্যাগ করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিল; কিন্তু তুমি আজও সুরা, অহিফেন, তামাক, গাঁজা চরশ, ভাঙ্ ইত্যাদি বিবিধ মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করিয়া ক্রমশঃ অস্বাস্থ্য ও মৃত্যুর পথে ছুটিয়া চলিয়াছ। জানি না, কতদিনে তোমার এ মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিবে! ভারতবাসি, জাগ! ওঠ! স্বাস্থ্যের জ্যোতিতে, দেহ-মনের শক্তিতে ও জাতীয় গৌরবে অন্যান্য সভ্য জগতের সমান না হইতে পার, অন্ততঃ পক্ষে স্বর্গীয় হেম বাবু-বর্ণিত "অসভ্য চীন অসভ্য জাপান" তাহাদের সমানও হইবার চেষ্টা কর। ভগবানের আশীর্ব্বাদ-রাশির উপর স্বেচ্ছায় পদাঘাত করিয়া নিজের অমঙ্গল ও দেশের অকল্যাণকে ডাকিয়া আনিও না।

এবার আশ্বিন-সংখ্যা

প্রবন্ধ, গল্প, চিত্র, সংগ্রহ প্রভৃতিতে ভূষিত ও বিশেষত্ব মণ্ডিত হইয়া আপনার পূর্ব্ব গৌরবকে বর্দ্ধিত করিবে। এই বিশিষ্ট সংখ্যা ১০ই আশ্বিনের মধ্যেই গ্রাহকদিগের হস্তে পঁহুছিবে। এবার বহু নামজাদা সুলেখক প্রবন্ধ লিখিবেন। খুচরা এই সংখ্যার মূল্য চারি আনা; বার্ষিক গ্রাহকগণকে অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না।

আমার স্বাস্থ্য-সমাচার

[ডাক্তার শ্রীসুন্দরমোহন দাস এম্-বি]

(৩)

"আমি", "আমার" লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার স্বাস্থ্যের কথা লিখিবার কারণ, বল ও স্বাস্থ্যের হানি কি প্রকারে হয়, এবং কি প্রকারে তাহা পুনরুদ্ধার করা যায়, তাহাই বিবৃত করা।

শ্রীহট্টে বর্ষাকালে ১৫।১৬ দিন ধরিয়া সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না। সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া অশ্বারোহণে চিকিৎসাস্থলে যাইতে হইত। অকস্মাৎ একদিন কম্প দিয়া জ্বর আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য লুপ্ত হইল। সেখানকার সিভিল সার্জ্জন আসিয়া বলিলেন, এই বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে দ্বিগুণ মাত্রায় এণ্টিমনি সংক্রান্ত ঔষধ (James Powder) দিতে হইবে এবং মাথায় ৬টী জোঁক বসাইতে হইবে। মস্তক মুণ্ডন করিয়া ঠাণ্ডা জল ঢালা হইল (অবশ্য ঘোল নয়), এবং সেখানকার বড় বড় ৬টা "ভঁইষা জোক" মাথায় ও ঘাড়ে বসান হইল। সম্পূর্ণ সারিতে এক মাস লাগিয়াছিল। শুনিলাম মাতা ঠাকুরাণী কেবল ডাক্তারীর উপর নির্ভর করেন নাই। জলপড়া, দৈববাণী, স্বস্ত্যয়ন, কিছুই বাদ যায় নাই। আরোগ্য লাভ করিব বলিয়াই নাকি দৈববাণী হইয়াছিল।

স্বাস্থ্য লাভের জন্য দৈববাণীর আশ্রয় গ্রহণ করা কেবল ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য নয়। প্রতীচ্যে যে গ্রীক সভ্যতায় এত বড়াই, সেই দেশে ডেল্‌ফীর দৈববাণী সর্ব্ব শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ কিরূপ আগ্রহের সহিত শুনিত, মুখপাতে প্রদত্ত ছবি দেখিলেই তাহা কতকটা বোঝা যায়।

দৈববাণীর বলেই হউক আর চিকিৎসার গুণেই হউক, যখন সারিয়া উঠিলাম, তখন আবার সেই অসুরের খাটুনি আরম্ভ হইল। আহার-নিদ্রার অনিয়মে অজীর্ণতা, অজীর্ণতার দরুণ চর্ব্বি-বৃদ্ধি। ঘি-মাখন সমস্ত জীর্ণ না হইয়া চামড়ার নীচে এবং হৃৎপিণ্ডে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হইল। একদিন আমার স্ত্রী কৌতুকচ্ছলে বুকের উপর ষ্টেথেস্‌কোপ বসাইয়া হার্ট পরীক্ষা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। আমার হৃৎপিণ্ড থামিয়া থামিয়া চলিতেছিল। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহাও থামিয়া থামিয়া চলিতেছে।

ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা-মুখী হইয়াছিলাম। কলিকাতা আসিবার দুইটী কারণ। একটী কারণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, দ্বিতীয় কারণ রাজনৈতিক গুরু ৺সুরেন্দ্রনাথের আদেশে দেশ-সেবা। ব্যায়ামের অভাবে অজীর্ণতা এবং অজীর্ণতার দরুণ হৃদ্‌রোগ—এই মনে করিয়া একজন বন্ধুকে লিখিলাম প্রতিদিন পদব্রজে চলিতে হয় এইরকম একটা কার্য্যের সন্ধান নিয়া আমাকে জানাইবার জন্য। তিনি লিখিলেন, সম্প্রতি ডাক্তার সিম্‌সন্ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর সংস্কার কল্পে নূতন মেডিকেল ইন্‌স্‌পেক্টর নিযুক্ত করিতেছেন। ঐ কাজ খালি আছে। 'একে ত মনসা তায় ধুনোর গন্ধ।' স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উপর চিরকালই ঝোঁক ছিল। শুনিলাম, পদব্রজে সহর পরিদর্শন করিতে হইবে। ঔষধ পথ্য দুইয়েরই ব্যবস্থা হইল।

পত্রপাঠ মাত্র সেই রাত্রেই অশ্বারোহণে ১৫ মাইল অতিক্রম করিয়া জাহাজে উঠিলাম। কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তিনি সেই "দুর্ব্বল সিং"ই আছেন, কিন্তু মানসিক বলে বলীয়ান্। তিনি নেক্-টাই পরিতেন, কিন্তু হ্যাট পরিতেন না। তাঁহারাই পরামর্শে আমি নেক্-টাই আঁটিলাম, কিন্তু ওয়েষ্টকোটের উপর গলায় বোতাম আঁটা পার্শী কোট পরিলাম। এই বেশে হেল্‌থ্-অফিসে গেলাম। একজন ফিরিঙ্গী এনালিষ্ট ছিলেন।

তিনি পোষাক দেখিয়া এবং বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া বলিলেন — "ভদ্রলোক, এঁরই এই কাজ পাওয়া উচিত।" ৺সুরেন্দ্র নাথের কৃপায় কাজ পাওয়া গেল।

ঔষধ ব্যবহার করিতে হইল না। প্রতিদিন প্রায় ৫।৬ মাইল হাটিয়া বেড়াইতে হইত। এতদ্ভিন্ন ইংরাজীতে যাহাকে বলে "শ্বাসের ব্যায়াম" (Breathing exercise), আর আমাদের দেশে বলে "প্রাণায়াম", সেই ব্যায়াম ও "যুক্তাহার-বিহার"ই স্বাস্থ্য পুনর্লাভের কারণ হইল।

আমাদের দেশে এই প্রাণায়াম একটা শারীরিক কস্ত নয়। একটী ধর্ম্মসাধন-প্রণালী। ইহাতে যে কেবল শরীর সুস্থ থাকে তাহা নয়, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব আসে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

গীতা বলিতেছেন ঃ—

ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥

ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যিনি বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই দেহী। মন অন্ধ, বুদ্ধি প্রজ্ঞাবতী। মন বিচারহীন; বুদ্ধি সৎ অসৎ বিচার করেন। বুদ্ধির উপরে আত্মা। আত্মা সাক্ষীস্বরূপ হইয়া অন্তরে অবস্থিত। এই আত্মা দ্বারা যিনি দেহকে বশ করিতে পারেন, তিনি সুস্থদেহ ও সুস্থ মন লইয়া বাস করিতে পারেন। যুবকেরা সহরে বিলাস-বিভ্রমে মুগ্ধ হইয়া এই সমুদয় ঋষি-বাক্য ভুলিয়া যান। শারীরিক ব্যায়ামের মধ্যে গড়ের মাঠে ভিড় করিয়া, ম্যাচ্ দেখিয়া, গার্জ্জেন্টের প্রহার ও রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া, ট্রাম ও বাসে বাদুড়ের মতন ঝুলিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন। আহার ও পান "রেষ্টুরেণ্ট" নামক অপবিত্র অস্বাস্থ্যকর স্থানেই অনেক সময় হইয়া থাকে। চা ও 'বার্ডস্ আই'-এর শ্রাদ্ধ, এবং নানা অপ্রীতিকর বিষয়ে জটলা!

দেশে নানাবিধ শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। সর্ব্বপ্রধান শত্রু মানসিক দারিদ্র্য। ছেলেটির গোঁপে রেখা না দিতে দিতেই কপালে অর্থচিন্তার রেখা অঙ্কিত হয়। তাহাকে যে ভবিষ্যতে দশজনের একজন হইয়া বংশের ও দেশের মুখ উজ্জল করিতে হইবে—এই উচ্চাভিলাষ অতি অল্প সংখ্যক যুবকেরই আছে। শীঘ্র শীঘ্র পুস্তকগুলি গলাধঃকরণ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটা চাকুরী পাওয়া যাইবে, এই চিন্তাই সর্ব্বপ্রধান চিন্তা।

কিসে শরীর ও মন সুস্থ থাকে, সে বিষয়ে কোন চেষ্টাই নাই। কলম পেষাই প্রধান পেশা। শারীরিক পরিশ্রমের কথায় অনেকেই অপমান বোধ করেন। "ভদ্রলোকের ছেলে কি মুটে মজুরী করে খাব?"—এই প্রশ্নটী যতদিন মন হইতে অন্তর্হিত না হইবে, ততদিন আমাদের দারিদ্র্যও ঘুচিবে না, সাংসারিক সচ্ছলতাও আসিবে না; এবং শরীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভেরও কোন আশা থাকিবে না।

শারীরিক বল ও স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজন। বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত। মাতা ও ভগিনীদিগকে আততায়ীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। শারীরিক বল থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বলও আসে! কাপুরুষ জীতেন বাড়ুয্যে মশাই সেদিন সেকালের কথা বলিতে ছিলেন……ইউনিভার্সিটী-হলে পরীক্ষা। আমরাও পরীক্ষা দিতে গিয়াছি। কতকগুলি ফিরিঙ্গী ছেলে দরজায় দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী ছেলেদিগকে ঢুকিতে দিতেছে না। জীতেন বাবু দুইদিকে মুষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে হলে প্রবেশ করিলেন এবং বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে ভিতরে ডাকিয়া লইলেন। স্বাস্থ্য এবং বলের প্রয়োজন আত্ম রক্ষা ও আত্মীয় রক্ষার জন্য—গুণ্ডামীর জন্য নহে, কি গুণ্ডামী নিবারণের জন্য।

আগামী পূজা-সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুন্দরী বাবুর একটি মনোমুগ্ধকর রস-বৈচিত্র্যবহুল শিক্ষাপ্রদ ছোটো গল্প প্রকাশিত হইবে।

আমার আমেরিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবর)]

দীর্ঘকাল অনভ্যাসের পর সুবিখ্যাত পালোয়ান্ ড্র্যাকের সহিত যথাশক্তি যুঝিয়া ও তাহার কলে গরিমাময় পরাজয়ের আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া, পরদিন প্রাতে সর্ব্ব অঙ্গে এমন একটা অসহনীয় বেদনা বোধ করিলাম যে, বেলা দশটার পূর্ব্বে বিছানা ছাড়িয়া উঠা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি সর্ব্ব শরীর যেন কঠিন অসাড় হইয়া রহিয়াছে। এমনটি যে হইবে তাহা আমি গত রাত্রেই অনুমান করিয়াছিলাম। যাহা হউক, শয্যা হইতে উঠিয়া আমার প্রিয় শিষ্য বনমালীকে নিকটে ডাকিলাম। একরাত্রের মধ্যেই বেচারার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, মনের স্ফূর্ত্তি নিভিয়া গিয়াছে, চক্ষে একটা কাতর অবসাদের অভিব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার পরাজয়ে তাহার শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ প্রাণে কঠিন আঘাত লাগিয়াছে; তাহাকে দেখিয়াই বুঝা গেল যে, তাহার হৃদয় দুঃখ-ভারাক্রান্ত।

আমি প্রথম এক চোট্ প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া তাহাকে জানাইয়া দিলাম যে, এক মাঘেই শীত যায় না; কয়েক মিনিট বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিলাম। তাহাকে বলিলাম যে, গত রাত্রে নিরপেক্ষভাবে শক্তি-পরীক্ষা হয় নাই এবং এইরূপ অবিচার যে-কোন বড় পালোয়ানের ভাগ্যে ঘটিতে পারে—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমার বিশ্বস্ত শিষ্য ও ভক্তকে তখন যেন একটু প্রাণবন্ত দেখা গেল, এবং সে আমাকে ডলাই-মলাই করিতে লাগিয়া গেল। তারপর বেশ আরাম করিয়া স্নান করার পর, আমরা দুইজনে মিলিয়া দ্রৌপদীর নিপুণতায় ভারতীয় খাবার রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সময় আমার ম্যানেজারের নিকট হইতে একটি তার পাইলাম, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

"স্থানীয় দৈনিকে গত রাত্রের প্রতিযোগিতার খবরে বিস্মিত। রাত্রের এক্সপ্রেসে রওনা হইতেছি। আপনার সহিত সহরে সকালে দেখা হইবে। আমি না পঁহুছা পর্য্যন্ত নিজে কোনো ব্যবস্থা লইবেন না, খবরের কাগজ-ওয়ালাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।"

বৈকাল লাগাৎ "নিউ ইয়র্ক্ টাইম্স"-আফিস্ হইতে এক সাংবাদিক আসিয়া আমাদের বাসস্থানে উদয় হইলেন; তিনি গত রাত্রের কুস্তী সম্বন্ধে এবং আমার প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে খোলাখুলি অভিমত জানিতে চাহিলেন। ম্যানেজারের তারে-প্রেরিত উপদেশ অনুযায়ী এতৎসম্বন্ধে সাংবাদিক ভায়াকে নিরাশ করিতে হইল। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সাধারণভাবে ভারতীয় আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ও বিশেষভাবে হিন্দুরা এক স্ত্রীর বেশী অধিকারে রাখে কি না—এইরূপ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব কিনা। আমাদের কথাবার্ত্তার একটু নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রশ্ন।—হিন্দুরা কি একাধিক স্ত্রী রক্ষা করে?

উত্তর।—একটির বেশী স্ত্রীলোককে অধিকারে রাখা ব্যক্তিবিশেষের বিলাসের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে এবং সকল সভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য দেশের ধনীলোক-দিগের মধ্যে এই বিলাস-প্রথা অল্প বিস্তর বিদ্যমান। হিন্দুরা ধর্ম্মপ্রবণ জাতি বলিয়া কোনো অনাথা ও অরক্ষণীয়া কন্যাকে একমাত্র আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যেই কখনো কখনো বিবাহ করে; কারণ আমাদের মতে, বিবাহ না করিলে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের উপর আইনসঙ্গত কোন অধিকার জন্মে না এবং তাহাদের সুনামও বজায় রাখা যায় না। কিন্তু অন্যান্য সভ্য দেশে দেখি এই প্রথাই অনুষ্ঠিত হয়—একটু রূপান্তর গ্রহণ

করিয়া; তাঁহারা বিবাহিত পত্নী ব্যতীত উপরন্তু দুই একটি নারী-বন্ধু রক্ষা করেন, ইঁহারা উপপত্নী ছাড়া আর কিছুই নহেন।"

[সাংবাদিক বন্ধুটি এই সত্য কথাটি শুনিয়া একটু অশোয়াস্তি বোধ করিলেন এবং চেয়ারে বসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যেন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।]

প্রশ্ন।—আপনি অবশ্য এ কথা বলিতে চাহেন না যে, আমেরিকায় অ'ম। বহু বিবাহের অনুষ্ঠান করি?

উত্তর।—আমি ঐ কথাই বলিতে চাহি। এই প্রথা ইয়োরোপের ন্যায় আপনাদের এখানেও কিছু কম প্রচলিত নহে। তবে ইহার বৈশিষ্ট্য এইটুকু যে, প্রকাশ্যে ও আইন-সঙ্গতভাবে ইহা আচরিত হয় না এবং ইহা বহুপতিত্ব বা বহুপত্নীত্ব বলিয়া জন-সাধারণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় না। এই প্রথার মূল সত্তার অস্তিত্ব আপনাদের দেশে কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমি আপনাদের দেশে মাত্র তিন সপ্তাহ কাল পদার্পণ করিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে ওই বিষয় সম্বন্ধে সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া যদি কোনো মতামত প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে আমি এইটুকু অবধি বলিতে পারি যে, আমি বহু আমেরিকান্ স্ত্রী-পুরুষের বিষয় পাঠ করিয়াছি —যাঁহারা স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অন্য লোকের সহিত অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

প্রশ্ন।—যাক্, আপনি তাহা হইলে বলিতে চান্ যে, ধনিষ্ঠ হিন্দু ব্যতীত অন্য কেহ দেশাচার অনুযায়ী একটির বেশী স্ত্রী রাখেন্ না?

উত্তর।—সাধারতঃ এই নিয়মই প্রবল। তবে বহুবিবাহ ভারতবর্ষে হিন্দুদের ভিতর এখন আর তেমন প্রচলিত নাই; ছিল যুগযুগ কাল পূর্ব্বে। এখন সামাজিক ও অর্থনীতিক্ পরিবর্ত্তন ও সর্ব্বোপরি সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, এই প্রথা একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। আজকাল দুইটি বিবাহিত স্ত্রী-সমন্বিত পুরুষের খোঁজ পাইতে আপনাকে সেখানে বহুদূর পরিভ্রমণ করিতে হইবে।

প্রশ্ন।—হিন্দুরা ইংরাজ শাসন কেমন পছন্দ করে?

উত্তর।—আপনার পূর্ব্ব পুরুষেরা স্বাধীনতা-যুদ্ধ-জয়ের পূর্ব্বে যেরূপ করিতেন, ঠিক সেইরূপ।

সাংবাদিক ভায়া বুঝিয়া দেখিলেন্ যে, তিনি ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতেছেন; কাযেই হঠাৎ তাঁহার প্রশ্নের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া, এবং আর একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন—এই আশ্বাস দিয়া, 'রামরাম্' ঠুকিলেন্।

আমার ম্যানেজার মহাশয় পরদিন প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন্। তারপর আমাদের মধ্যে ড্রাক্-যুদ্ধ ও তাহার অসম্ভাবিত ফল সম্বন্ধে বেশ উত্তপ্ত আলোচনা চলিতে লাগিল। তারপর ম্যানেজার আমাকে পুনরায় তৈয়ারী হইবার জন্য অন্ততঃ চারি সপ্তাহ সময় দিতে ও ওয়াকিব্-হাল্ হইবার জন্য অবিলম্বে একজন শিক্ষক্ যোগাড় করিয়া দিতে প্রস্তাব করায়, আমরা সম্মতি-জ্ঞাপন করিলাম; তিনি আমাদের নিকট আরও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আমার মঞ্জুর না পাইয়া কোনো প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা ঠিক্ করিবেন না এবং শিক্ষাকালীন্ আমার সমস্ত খরচ বহন করিবেন। ম্যানেজার পরদিন প্রভাতে বাফেলো চলিয়া গেলেন্।

পূর্ব্বে যে ব্যায়ামশালায় ব্যায়াম অভ্যাস করিতাম, সেইখানেই পুনঃ প্রবেশ করিলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, শত চেষ্টা স্বত্ত্বেও কায়দা-কসরৎ শিখাইবার একজন ভালো ওস্তাদ কদাপি পাই নাই। যাহাহউক তবু এবার দুই একজন তৃতীয় শ্রেণীর ওস্তাদের নিকট প্রায় প্রত্যহই শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইতাম। কিন্তু তাহাদের সহিত শরীর ভাঁজিয়া তৃপ্তি হইত না। কাযেই কিছুক্ষণ বনমালীর সঙ্গে মাটি মাখিয়া, কয়েক শত ডন্-বৈঠক্ অভ্যাস করিয়া শান্তি লাভ করিতে হইত। এইরূপে দুই সপ্তাহ অভ্যাসের পর আমার তাকৎ যথেষ্ট বাড়িয়াছে বুঝিতে পারিলাম।

তৃতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি আমার ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট হইতে এক তার পাইলাম, তিনি আমাকে কাল-বিলম্ব না করিয়া বাফেলোয় পঁহুছিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীমান্ বনমালীকে সঙ্গে লইয়া

পরদিন বাফেলো রওনা হইলাম। ম্যানেজার মিঃ ডেলিভাক্ আমাদের জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন্। তিনি আমাদের লইয়া "হোটেল্ ষ্ট্যাট্লার" নামক বাফেলোর শ্রেষ্ঠ পান্থ-নিবাসে লইয়া গেলেন্।

হোটেলে পঁহুছিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ডেরাডাণ্ডা বিছাইয়া পনেরো মিনিট কাল কাটাইতে না কাটাইতে দুই চারি জন করিয়া সংবাদ-সংগ্রাহকের আবির্ভাব হইতে লাগিল। পথের ঘাম শুকাইবার অবসর না দিয়া, তখনই তাঁহাদিগকে দর্শন দিলাম। তারপর এইখানে বিখ্যাত তুর্কীদেশীয় পালোয়ান মামুদের ও তাঁহার ম্যানেজার এমিল্ ক্ল্যাঙ্কের সহিত পরিচিত হইলাম। এমিল্ ক্ল্যাঙ্কের নাম ইতঃপূর্ব্বে আমি শুনিয়াছিলাম। ইনি বোধ হয় তখন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ও জগজ্জয়ী পালোয়ান্ ফ্র্যাঙ্ক্ গচ্-এর জন্য প্রতিযোগীতার সংঘটন করিয়া দিতেন। এই করিৎকর্ম্মা মিঃ ক্ল্যাঙ্ককে ১৯২৪-২৫ সালের আমার ম্যানেজার রূপে নিযুক্ত করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

আমার পাঠকবর্গের অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন যে, একদা গুরু-ভারোত্তলনে ও কুস্তীলড়ায় অপরাজেয় পদবীধারী—ষ্ট্যানিলাস জীস্কো (Stanylus Zbyscc), কিছুদিন পূর্বে প্রতিযোগীতার অনুসন্ধানে ভারতে আসিয়াছিলেন, সঙ্গে ম্যানেজার-রূপে ছিলেন এমিল্ ক্ল্যাঙ্ক্। কিন্তু চারি মাস অবস্থান করার পর কোনো পালোয়ানেরই সহিত প্রতিযোগীতার সন্তোষজনক পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগকে হতাশহৃদয়ে স্বদেশে ফিরিতে হয়। আমি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জীস্কোর সহিত এখানে লড়িবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র ও বিশেষ করিয়া কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল বলিয়া তাঁহারা আমার আবেদন নামাঞ্জুর করিলেন্।

যাহাহউক, পুনরায় আমার পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই। আমরা চারিদিন যাবৎ বাফেলো-বাস করিলাম; ইতোমধ্যে আমার ম্যানেজার চতুর্দ্দিকে বড় বড় পাণ্ডা-দিগের নিকট অশ্রান্তভাবে পত্র লিখিতেছিলেন। অবশেষে তিনি চিকাগোর ফিজ্ মন্স্ নামক উদ্যোগী পাণ্ডাকে বাগে আনিলেন্। পরদিন আমরা "লাক্স্যু-রিয়াস্ এইটন্থ সেনচুরী" নামক আরাম-বিধায়ক দ্রুতগামী ট্রেণে আরোহণ করিয়া চিকাগো যাত্রা করিলাম। চিকাগো হইতে নিউ ইয়র্ক পর্য্যন্ত হাজার মাইল্ পথ অতিক্রম করিতে এই বাষ্প-রথের মাত্র আঠারো ঘণ্টা সময় লাগে। বর্ত্তমানে এই ট্রেণখানির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "লাক্স্যুরিয়াস টোয়েন্টিয়েথ্ সেনচুরী" রাখা হইয়াছে। ইহার ভ্রমণ-কাল আঠারো হইতে কুড়ি ঘণ্টায় বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ কর্ত্তৃপক্ষরা মনে করিলেন যে, এতদ্রুত বেগে গমন করিয়া ট্রেন্খানি অনর্থক বিপদের সম্ভাবনাকে ডাকিয়া আনিতেছে।

বাস্তবিক এরূপ ট্রেণে ভ্রমণ করিয়া, আরোহীদের একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি আছে। মনে হয়, যেন চলন্ত ট্রেণে বসিয়া নাই, কোনো পার্থিব ভোগ-সুখ-সামগ্রীতে ঘেরা একটি স্থাবর হোটেলের মধ্যে দিব্য আরামে বসিয়া আছি। এই ট্রেণে আপনি যে-কোনো ভাল বই ও সর্ব্ব প্রকার আধুনিক সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিবার জন্য পাইতে পারেন্; ট্রেণের মধ্যেই কামাইবার 'হাজামৎ-খানা' আছে। তার উপর এক ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়-চোপড় ধোলাই ও ইস্ত্রী করিবার বন্দোবস্ত ইহার মধ্যে আছে। ঘড়ী ধরিয়া চর্ব্য-চোষ্য খানা খাইতে দিবার বন্দোবস্তত আছেই, তদুপরি রাত্রি আটটার সময় কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা প্রত্যেকের জন্য ধব্ধবে পরিষ্কার চাদরের নীচে নবীন-কোমল বিছানা পাতিয়া দিয়া যায়। প্রাতঃকালে নিরঙ্কুশ নিদ্রার পর যখন ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবেন, তখন বোধ হইবে যেন আপনি কোনো কেতা-দোরস্ত বড় হোটেলে রাত্রিবাস করিয়া বাহির হইতেছেন।

চিকাগোর কুস্তী-সংঘটক্ মিঃ ফিজ্ মন্স্-এর সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত ছিল—ট্রেণ পঁহুছিবার অব্যবহিত পরেই তিনি রেলওয়ে-ডিপোর সাম্নে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু তিনি পাঁচ মিনিট পরে

আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আমাদিগকে ধরিতে পারিলেন না। আমরা কয়েক মিনিট তাঁহার আশায় ষ্টেশনের ইতস্ততঃ ঘুরিয়া, অবশেষে ম্যান্‌সন্ হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হোটেলটি বেশ বড়; ব্যবসায়ী শ্রেণীর মুসাফিরগণ সাধারণতঃ এই হোটেলটিতে অবস্থান করেন। আমরা পঁহুছিবামাত্র জানানো হইল, হোটেলে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ। কথার ভাবেই বুঝিতে পারিলাম, তাহারা আমাদিগকে ডাহা মিথ্যা কথাটা বলিল; আদৎ কথা—তাহারা আমার মত কালা আদমীর পৃষ্ঠ-পোষকতা চাহে না। হোটেলটিতে এক হাজার ভদ্রলোকের শয়ন-ভোজনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে; তখন এমন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই বা কাযের মুরস্থম্ পড়ে নাই—যাহাতে সমস্ত হোটেল্‌টিই পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। আমেরিকায় বর্ণ-বিদ্বেষের গন্ধ এই সর্ব্বপ্রথম আমার নাকে আসিল।

যাহাহউক, সেখান হইতে নড়িয়া আমরা "হোটেল্ লেস্-স্যালে"তে আসিলাম। এ হোটেলটিও বেশ বড় এবং ম্যান্‌সন্ হোটেল অপেক্ষা ইহার সুনাম বেশী। এখানে আমরা আন্তরিকতার সহিত পরিগৃহীত হইলাম। দিবাভাগের অধ্যক্ষ আমাদিগের জন্য আটতলার উপর দুইটি থাকিবার জায়গা ও তৎসংশ্লিষ্ট গোসল্‌খানা ঠিক করিয়া দিলেন্ এবং নিজে সঙ্গে করিয়া আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পঁহুছাইয়া দিয়া যথেষ্ট আপ্যায়িত করিলেন। প্রতি-দিন্ হোটেলের খরচ দিতে হইবে বারো ডলার করিয়া। পরে কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে, অধ্যক্ষটি বেদান্ত-দর্শনের একজন মস্ত বড় ভক্ত। ১৮৯২ সালে নিখিল-বিশ্ব ধর্ম্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণস্পর্শী তেজোগর্ভ বক্তৃতায় বিমোহিত হইয়া তিনি তদবধি বেদান্তে অটল বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। যখনই আমি প্রথমে হোটেল্ কাউন্টারের দ্বারে আসিয়া রেজেষ্ট্রী-বহিতে আমার নাম লিখিয়া স্থায়ী বাসস্থান "কলিকাতা, ভারতবর্ষ" লিখিয়া দিই, তখনই তিনি আমাদিগকে স্বামীজীর দেশের লোক বুঝিয়া, আমাদিগের আশাতীত যত্ন লইতে সুরু করেন। আমরা চিকাগোয় এক সপ্তাহ কাল ছিলাম; তিনি প্রত্যহই অবসর মত আমাদিগের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং ঘুরিয়া-ফিরিয়া ধর্ম্ম-মহাসভার সেই স্মরণীয় ঘটনাবলীর বর্ণনা করিতেন। তিনি সগর্বে বলিতেন—স্বামীজী বেদান্তের মনোরম ব্যাখ্যা এবং হিন্দু ধর্মের সার্বভৌমিক বিশালতা ও গভীরতা-প্রতিপাদক বক্তৃতার দ্বারা কেমন করিয়া সমগ্র আমেরিকায় একটা অক্ষয় আন্দোলনের ঢেউ বহাইয়াছিলেন, কেমন করিয়াই বা আজও পর্য্যন্ত আমেরিকায় বহু মনীষীর মনে বেদান্ত-দর্শনের জ্ঞান-পিপাসা জাগিয়া আছে!

বৈকাল বেলা আমরা ফিজ্ মন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কয়েকদিন পরেই বোহেমিয়ার অজেয় পালোয়ান্ জো স্কাল্‌জের সহিত আমাকে লড়িতে হইবে —ইহা একপ্রকার স্থির হইয়া গেল। প্রতি-যোগিতার তারিখ হইল ১৪ই মার্চ ১৯২১। ফিজ্ মন্স্ আমার অভ্যাসের জন্য একটি আখ্‌ড়া ও মোটামুটি গোছের একজন ওস্তাদ ঠিক করিয়া দিলেন, এবং আমাদের থাকিবার জন্য আখ্‌ড়ার অনতিদূরেই একটা বাসার যোগাড় করিয়া দিলেন। আমাদের কুস্তী অভ্যাস তিনি প্রত্যহ নিজে আসিয়া তদারক করিতেন এবং আমার প্রতিযোগীতার অনুকূলে যাহা কিছু সুবিধা বিধানের প্রয়োজন তাহা করিতে তিনি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। লড়াইয়ের পূর্ব দিন শরীরে এমন একটা সাচ্ছন্দ্য একটা সতেজ স্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করিলাম, যাহাতে মনে হইল—সেই মুহূর্ত্তেই ইচ্ছা করিলে জগতের শ্রেষ্ঠ কুস্তীগীর গুলিকে আমি একে একে মাদুরের উপর চিৎ করিয়া ফেলিতে পারি।

পরদিন যথাসময়ে কুস্তী আরম্ভ হইল। মন তখন বিজয়-লাভের দৃঢ় সঙ্কল্পে উৎফুল্ল। মাত্র একুশ মিনিট কুস্তী হইল। তাহার পর আমার প্রতিপক্ষকে সবলে মাদুরের উপর চিৎ করিয়া ধরিয়া তাহাকে গদ্দান ঠাসিয়া ধরিয়া রাখিলাম, নিয়মানুযায়ী শুধু তিন সেকেণ্ড নয়—প্রায় এক মিনিটকাল ব্যাপী। সেই সময় রেফারী উঠিয়া আসিয়া আমাকে চেঁচাইয়া বলিলেন, "উঠুন্ উঠুন্, আপনি জিতিয়াছেন।" আমার বিজয়-কাহিনীর বর্ণন

নিজমুখে নিশ্চয় শোভনীয় হইবে না, নিম্নে খবরের কাগজ হইতে প্রতিযোগীতার সংবাদটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, উহা পরদিন সকালে "চিকাগো-ডেলিতে" প্রকাশিত হয়।

"সৌম্যদর্শন হিন্দু গতরাত্রে প্রকাণ্ড 'চিকাগো-কলি-সিয়ামে' কুস্তী-প্রতিযোগীতায় বোহেমিয়ার্ অজেয়-আখ্যা-ধারী বীরকে জিতিবার কোন সুযোগই প্রদান করেন নাই। আমাদের প্রবল ইচ্ছা—এই হিন্দুকে একবার অবিলম্বে কুস্তী-রাজ্যে অনাহত দিগ্বিজয়ী ম্যারিয়ান্ প্লাস্‌তিনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্ দেখিতে।

"...যখন প্রতিযোগী দুইজন মল্লভূমে অবতীর্ণ হইলেন, তখন মনে করিলাম কুস্তী ঘটনা-বৈচিত্র্যশূন্য ধীরগতি হইবে; কারণ জো'কে ঈষৎ কৃশাঙ্গ ও লম্বা দেখাইতে লাগিল, হিন্দুকে সেইরূপ স্থূলাঙ্গ ও বেঁটে দেখাইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার পদদ্বয়ের গঠন অতি চমৎকার এরূপ এক জোড়া পা আমরা কোনো কুস্তীগীরের দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবার পর মুহূর্ত্তে হিন্দু পালোয়ান্ গোবর তাঁহার বিপক্ষকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিলেন্; খেলা আরম্ভের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি জো'কে গর্দ্দান ও উরু ধরিয়া মাদুরের উপর কাইৎ করিয়া একবার ফেলিয়া দিলেন্। তারপর ১৬ মিনিটে কাল অতিক্রম না করিতেই হিন্দু তাঁহার প্রতিযোগীকে চিৎপটাং করিয়া পাড়িয়া ফেলিলেন। এইটুকু বলা উচিত মনে করি যে, জো তাঁহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকের সহিত বেশ সাহসের সহিত লড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার যুদ্ধ খেলোয়াড়ের উপযুক্তই হইয়াছিল। যাহাহউক, আমরা হিন্দুকে একবার ম্যারিয়ান্ প্লাস্‌তিনার বিরুদ্ধে লড়িতে দেখিতে চাহি।"

পরদিন্ প্রায় বেলা দুইটার সময় আমার ম্যানেজারের নিকট হইতে এক তার পাইলাম—তিনি আমাকে বিজয়-অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং আমার পুরাতন বন্ধু টমি ড্রাকের সহিত আগামী এপ্রিল মাসে পুনরায় লড়িতে ও তজ্জন্য রীতিমত দোরস্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। টমি ড্রাকের সহিত আমার দ্বিতীয় সংঘর্ষ হয়—১৯২৩ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে। প্রধানতঃ ঐ বিষয়ের বর্ণনা আশ্বিনের প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব।

(ক্রমশঃ)

একালের বাঙালী

[শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।]

কিছুদিন হইতে বাঙালাদেশে যদিও কয়েকটী উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তথাপি বাঙলা ও বাঙালীর কথা ভাবিলেই একটী প্রহেলিকাময় প্রশ্ন উঠে,—বাঙালী কেমন করিয়া স্বরাজের চিন্তা করে? স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির সমষ্টিই যে প্রত্যেক জাতির মেরুদণ্ড ইহা কি বাঙালী শিখে নাই? এই জন্যই যে প্রাচীন স্পার্টায় আইন ছিল—"দুর্ব্বল ব্যক্তির জীবনধারণের কোন দাবী নাই" (The weaklings have no right to live—*Lycurgus* এবং আধুনিক জগতে সর্ব্বাধিক বলশালী জাম্মাণ জাতিরও যে কতকটা ঐরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে, ইহা কি বাঙালীর অজ্ঞাত? না কি স্বরাজাকাঙ্ক্ষী বাঙালী জানে না যে, বাঙালার আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ, অন্য দেশের স্ত্রী-পুরুষ ত দূরে থাকুক, ভারতেরই অন্যান্য প্রদেশের স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষাও দুর্ব্বল? যে জাতির প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন দুর্ব্বল, যে জাতির মেরুদণ্ডই নাই, সে জাতি কোন্ সাহসে স্বরাজ কল্পনা করিবে?

বাঙালার দিকে একবার তাকাইলেই দেখিবেন, সহস্র সহস্র কণ্ঠের করুণ হৃদয়-বিদারক হাহাকার রব সর্ব্বক্ষণই দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে,—

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া সারাদেশটির বুকে মৃতদেহের উপর শকুনির মত ব্যাপিয়া রহিয়াছে,—গুণী-মানী-ধনী নির্ব্বিশেষে অনাহার, অল্পাহার, কদাহার, ব্যাভিচার, আলস্য ইত্যাদিতে জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে। কবি যে দেশকে 'সোণার বাঙালা' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়াছেন, যে দেশের স্বর্ণপ্রসূভূমি ও অতুল ঐশ্বর্য্য লোভের প্রদীপ্ত প্রলোভন বুকে করিয়া মোগল, পাঠান প্রভৃতি কতশত জাতি দুর্গম অরণ্য, দুরারোহ পর্ব্বত, নদ, নদী অতিক্রম করিয়াছে, কত কলম্বাস, কত ভাস্কোডিগামা যে দেশের সন্ধানের জন্য প্রাণপাত করিয়াছে, যে দেশের ধনরত্ন খাদ্য-সম্ভার বিশ্বপ্রবাদ হইয়া উঠিয়া পৃথিবীর সকল জাতিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইতে বাধ্য করিয়াছে, সে দেশের আজ জনপ্রতি প্রাত্যহিক আয়—উইলিয়াম্ ডিগ্‌বি তাঁহার "উন্নতিশীল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" পুস্তকে দেখাইয়াছেন—অর্দ্ধপেন্স্ বা অর্দ্ধআনা, সে দেশে এখন প্রতিদিন দুই হাজার লোক 'দুর্ভিক্ষ-রোগ' ম্যালেরিয়ায় মারা যাইতেছে। হায় বাঙলা! হা বাঙালী!

আচ্ছা, এ দৈন্যের জন্য প্রধানতঃ দায়ী কে? সামান্য চিন্তা করুণ, দেখিবেন,—দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের লোপ, বিদেশে প্রচুর শস্য-রপ্তানি, উৎপীড়িত কৃষক-জাতির দুরবস্থা, বিলাতী সৌখীনতা, আচার-ব্যবহার, হাব্-ভাবের প্রবল প্রচার ইত্যাদি কারণের সর্ব্বাগ্রে রহিয়াছে—জাতির স্বাস্থ্যহীনতা-জনিত আলস্য ও নিরুৎসাহ বাঙলা, আজ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সিফিলিস্, গণোরিয়া, ডিস্‌পেপসিয়ার তাণ্ডব নৃত্যে জর্জ্জরিত! বাঙালী আজ কঙ্কালসার, মেরুদণ্ডবিহীন, প্রাণহীন, নিষ্ক্রিয়—তাই সে বিশ্বের প্রতিযোগিতায় এত পশ্চাৎপদ।

এখন দেখা যাক, এই যে ভয়াবহ স্বাস্থ্যহীনতা, ইহা আসিল কোথা হইতে? পরাধীনতা-জনিত দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্যই কি ইহার কারণ, না দেশবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা, তাচ্ছিল্যই ইহাকে আনিয়াছে?

দেশে চারিদিকেই যে 'দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ' রব শোনা যায়। অনেক স্থলে তাহা প্রাচুর্য্যের অভাবমাত্র, এবং সে অভাবও প্রায়ই সহরে আবদ্ধ। গ্রামে এখনও খাদ্য-দ্রব্য প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়, না গেলেও বুঝিতে হইবে অবহেলা অনাদরে নষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যে "গ্রামে ফিরিয়া যাও" (back to village ! back to village !) বলিয়া এত চীৎকার করিলেন, তাহা উন্মাদের প্রলাপোক্তি নয়। সহরে কি আছে? শুধু ত চাকচিক্য, পাশ্চাত্য বিলাসিতার লালসা, আর সঙ্গে সঙ্গে অভাব, অপবিত্রতা, চরিত্রভ্রষ্টতা; স্বাস্থ্যহীনতার কয়েকটী প্রধান কার্য্যকারক—অসংখ্য রেষ্টুরেণ্ট, কেবিন, নিকৃষ্ট মিশাল ঘৃত-ময়দায় তৈয়ারী খাবারের দোকান, থিয়েটার, বায়স্কোপ এবং অসংখ্য গণিকালয়! - ইহার জন্যই কি দলে দলে সকলে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন?

কয়েকজন অজুহাৎ দিবেন গ্রাম পরিত্যাগের কারণ ম্যালেরিয়ার অত্যাচার। সত্যই ম্যালেরিয়ার অত্যাচার অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন কি, পূর্ব্বে যখন কলের জল ছিল না, ফাঁকা পাকা রাস্তা ছিলনা - অর্থাৎ আধুনিক সহরের অস্তিত্ব ছিল না, তখন কিরূপে সকলে গ্রামে বাস করিত? ম্যা কি জ্বর-জাড়ি পূর্ব্বে গ্রামে ছিল না, এখনই হইয়াছে? পাটচাষ, রেললাইন ইত্যাদি কারণে জ্বর হয়ত পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, কিন্তু বাঙলায় চিরকালই জ্বর-জালা ছিল এবং জ্বর যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাহা যে আমরা কমাইতে পারি না, তাহাও নয়। সকলে যদি গ্রামে বসবাস করে, পথ, ঘাট, বন, জঙ্গল, সব পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখে, তাহা হইলেই ম্যালেরিয়া কমিয়া যা নাট্যরসিক অমৃত লাল বোস মহাশয় বেশ বিদ্রূপ করিয়া বলেন,—"আরে, যারা সাপ বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রে জীবন যাপন ক'রে এসেছে, তাদের কাছে ম্যালেরিয়া ঘেঁসতে পারে! জীবনীশক্তি যদি থাকে, লড়্‌বার ক্ষমতা যদি থাকে তাহ'লে কোন মিঞা কিছু কর্‌তে পারে না, তা' ম্যালেরিয়া!"—প্রকৃতই জ্বর, ম্যালেরিয়া আজ নূতন আসে নাই,—তাহারা ছিল, কেবল উপদ্রব করিত কম, এখন আমাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ বুঝিয়া বেশী অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাজে

ম্যালেরিয়া প্রভৃতির জন্যও প্রধানতঃ দায়ী আমাদেরই অবহেলা ও নাগরিক প্রলোভন।

এখন দেখা যাক্, আমরা জীবনীশক্তি হারাইলাম কিসে? কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলায়ই জীবনীশক্তি হারাইয়াছি; স্বাস্থ্যহীনতা হইয়াছে আমাদের জাতীয় অবনতির স্ফুটতম লক্ষণ।

(১) ব্যায়াম বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পরিচালনা স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার একটী প্রধান উপায়। আমাদের মধ্যে সেইটীরই অভাব। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের দোহাই দিয়া আমরা অনেক কথাই বলি; কিন্তু আমাদের দেশের মত পা না নাড়াইয়া হাত না চালাইয়া আলস্যে গা ঢালিয়া জীবন ধারণ করিবার এমন সুবন্দোবস্ত বোধ করি অন্য কোনও দেশে নাই। ইউরোপ, এমেরিকা ইত্যাদি মহাদেশে ধনী, নির্ধন সকলকেই রীতিমত খাটিয়া খাইতে হয়। জগতের শ্রেষ্ঠ ধন-কুবের হেম্‌রী ফোর্ড্‌কে ছিয়াত্তর বৎসর বয়সেও প্রত্যহ দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু এদেশে—যেখানে প্রায়ই 'দুর্ভিক্ষ' অন্নকষ্টের হাহাকার শুনা যায়, যাঁহার সামান্য কিছু অর্থ বা জমা-জমি আছে তিনি ত ধনী, কাজেই নিজ হাতে কাজ করিবেন কেন! আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল,—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্, সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।" কিন্তু এখন হইয়াছে ঠিক বিপরীত। নেহাৎ দুরবস্থা না হইলে বাগানে কোদাল দিয়া মাটী কোপান, নিজের কাপড় কাচা, নিজে হাট-বাজারে যাওয়া, ইন্ধনের জন্য কাট-কাট্‌রা চ্যালা করা ইত্যাদি অপমানসূচক কাজ ত (?) বাঙালী করেনই না; কেহ কেহ জামা গুলিতে একজন চাকর রাখেন, স্নানের জন্য একজন বেয়ারা রাখেন,—কবে হয়ত খাওয়াইয়া দিবার জন্যও লোক নিযুক্ত করিবেন!

যে দরিদ্র, সে ভাবে—আমার ধর্ম্মপ্রাণ দেশবাসী আছে, এক মুষ্টি করিয়া ভিক্ষা দিলেও আমার দিন চলিবে; বেশী কষ্ট হইলে চাঁদা তুলিয়াও সাহায্য করিবে। এবং দেখুন, কত সহস্র সবল, সক্ষম নরনারী ভিক্ষোপজীবী হইয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাঙালার গলগ্রহ হইয়া আছে।

চাকুরীজীবী ও ছাত্রগণের অবস্থা প্রায় একইরূপ। বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় দুইটীর রাশীকৃত পুস্তকের বোঝার ভারে বাঙলার ছাত্রগণ কুব্জপৃষ্ঠ, শীর্ণদেহ, ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া পড়িতেছে। বাঙালীর আদর্শ হইয়াছে চাকরী,—সরকারের অধীনে হইলে ত সৌভাগ্য বলিয়াই গণ্য হয়। তাই বাঙালী সন্তানের পিতা, পিতামহ তাহাকে দুগ্ধপোষ্য অবস্থাতেই রাশীকৃত পুস্তকের ঝোলা ঘাড়ে চাপাইয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন অবশ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে। শিশুকে দিবারাত্র লেখাপড়া করিতে বলেন, বুঝাইয়া দেন—অল্প বয়সে ভালরূপে পাশ করিতে না পারিলে, তাহার ভাল চাকরী হইবে না। আর কি, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ খেলা ধূলা সবই অবহেলা করিয়া শৈশব হইতেই ছাত্রেরা পড়ে,—ব্যায়াম দূরে থাক, স্নানের পূর্ব্বে দেহে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করিলে যেটুকু ব্যায়াম হয়,—লোমকূপ পরিষ্কার থাকায় শরীর ভাল থাকে, সে তৈল মর্দ্দনেরও তাহার সময় থাকে না। ইংরাজীর উপর বাঙ্গালীর এত শ্রদ্ধা, এত ভক্তি, কিন্তু ইংরাজী প্রবাদ—"all work and no play makes Jack a dull b oy"—তাঁহাদিগকে শৈশব হইতেই সন্তানদিগকে দিবারাত্র পড়ায় নিযুক্ত করিতে শিক্ষা দেয় কি? স্মাইল্‌স্ সাহেব লিখিয়াছেন—"The altar of examination is the Moloch to which modern parents sacrifice their children." সত্যই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার-পর-পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে বলি দেওয়াই হয়। বঙ্গের গৌরব রবীন্দ্রনাথও দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—ইউরোপে যে বয়সে ছেলেরা ক্ষেতে ক্ষেতে আখ খাইয়া বেড়ায়, বাঙলার ছেলেরা সে বয়সে স্কুলের বেঞ্চিতে নিশ্চল, স্ফূর্ত্তিহীন বসিয়া শিক্ষকের বেত খায়।—প্রকৃতই এ স্বাস্থ্যনাশক চাকরীকরী লেখাপড়ার ভিত্তির উপর কি দেশের স্বাধীনতার বেদী কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে?

চাকরীজীবিগণেরও এই অবস্থা। চাকরী তাঁহাদের

দিনরাত সর্ব্বক্ষণ প্রাণমন ব্যাপিয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় শুষ্কমুখ, ক্লান্তদেহ লইয়া পা টানিতে টানিতে বাড়ী ফিরিয়া, তাঁহারা নৈশ ভোজনের পরই ঘুমান; কেহ কেহ বা একটু তাস-পাশা খেলেন, পরচর্চ্চা করেন। সকালে উঠিয়াই—ভয় হয়, বেলা হইল, বেলা হইল, একটু তেল মাখিয়া যে স্নান করিবেন, বসিয়া উত্তমরূপে চিবাইয়া যে খাইবেন, তাহারও সময় হয় না। স্বাস্থ্যের প্রতি এরূপ অবহেলার ফলে যে অম্ল, অজীর্ণ, হৃদি-দৌর্ব্বল্য রোগ হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা সমানভাবে লক্ষিত হয়। নেহাৎ সেকালে ধরণের ছাড়া প্রায় সকল গৃহস্থেরই সংসারে আজকাল পাচকে রান্না করে, ঝি-চাকর সংসারের কাজ-কর্ম্ম করে—এমন কি বিছানা পাতা ও ছেলের দুধ খাওয়ানো পর্য্যন্ত। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ নারীদিগের জন্য যে সংসারধর্ম্ম-বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক হিন্দুরমণীগণ তাহার কোন ধারও ধারেন না,—চা, জরদা, দোক্তা খান, নভেল পড়েন, থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখেন,—এবং পরিণামে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অম্ল, হৃদরোগ, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি ব্যাধি ভোগ করেন। পুরাদস্তুর ইংরাজী আদর্শের অনুকরণে আজকাল সহস্র সহস্র বঙ্গনারী শিক্ষিতা হইতেছে; ইহারই বিষময় পরিণাম—বাঙলার গৃহে গৃহে মূর্ত্ত অশান্তি, জাতির এই শোচনীয় অবনতি পথের পাথেয়! ইংরাজী-নবীশদের নিকট হিন্দুশাস্ত্রকারগণ নির্ব্বোধ গণ্য হইলেও, নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের নিকট আবহমানকাল হইতেই সূক্ষ্মবুদ্ধি, অসামান্য পণ্ডিত, প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াই আছেন—কারণ হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি পৃথক মাটীতে গড়া, হিন্দুপ্রকৃতিই ভিন্ন ছাঁচে ঢালা।

হিন্দুরমণীর বৈশিষ্ট্য ছিল, গ্রামে এখনও আছে,—লজ্জাশীলতা, কর্ম্মতৎপরতা, ধর্ম্ম-প্রবণতা। তাই তাঁহারা মাতৃসম্বোধনে পূজা পাইতেন, তাঁহাদের সংসারে লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া থাকিত। আধুনিক বাঙলার নারী কোন কাজ কর্ম্ম ত একরকম করেনই না, অনেকস্থলে মাতৃত্বের ভারও তিনি অন্যের স্কন্ধে ন্যস্ত করেন। প্রসবের পরই তিনি মুক্তা হন, - তাহার পর যাহা করেন ধাই। সুতরাং ধাইয়ের ব্যাগার-দেওয়া মাতৃত্বের কোলে বাঙলার সন্তানগণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

সবল প্রসূতিই যদি না রহিল, মনপ্রাণ যদি তাঁহার হইল অমূল ইংরাজী ভাবাবিষ্ট, উপরন্তু সন্তানের লালন-পালনের ভার রহিল যদি অশিক্ষিত ধাইএর উপর - তবে সুশিক্ষিত, আদর্শ, স্বাস্থ্যবান বাঙ্গালী কিরূপে হইবে? মহাপুরুষ নেপোলিয়ন কি সারগর্ভ কথাই বলিয়া গিয়াছেন—"The country n eds nothing so much to promote its regeneration as good moth rs"——জাতীয় উন্নতির জন্য দেশের প্রধান আবশ্যকতা উপযুক্ত সুমাতা।

(২) আমাদের স্বাস্থের প্রতি অবহেলা আর কয়েকটী ছোটখাট কার্য্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আমরা অনেকে সময়াভাবে উত্তমরূপে দাঁত মাজি না—ফলে দাঁত অপরিষ্কার হওয়ায় হজমের একটী প্রধান উপাদান দাঁতের লালা, খাদ্য দ্রব্য চিবাইয়া খাইবার উপযুক্ত পরিমাণে নির্গত হইতে পারে না। অধিকাংশ বাঙালীই উদরভর্ত্তি করিয়া খান—মনে মনে বোধ হয় ভাবেন—পেট খালি রাখিয়া খাইলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটী ঠিক বিপরীত; পেট কিছু খালি রাখিয়া খাইলেই উত্তম হজম হওয়ায় শরীর সবল হয়।

তার পর অজীর্ণ, অম্ল ও হৃদরোগের প্রধান সহায় সিগারেট, জরদা নস্য, চা—বাঙালীর সভ্যতার করেকটী নিদর্শন হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, উচ্চ, নীচ সকল মহলেই চা হইয়া উঠিয়াছে সভ্যতার প্রধান লক্ষণ। জর্দ্দা সুক্তি না খাইলে, নারী-মহলে অনেক সময় অর্দ্ধ-সভ্য বলিয়া অনেকে উপেক্ষিত হয়। নস্য ত আজকাল বাঙলার ছাত্রদলের প্রধান সুহৃৎ।—প্রত্যক্ষ ফল ফলিয়াছে ফলিতেছে। পরিণামের কথা চিন্তা করিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

(৩) স্বাস্থ্যরক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ—আমোদ

আহ্লাদ, স্ফূর্ত্তিও আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। বাঙালী যুবকের দিকে চাহিলেই দেখিবেন বিষাদ-মলিন তাহার মুখ, ললাটে চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুই-একজনের মুখে হাসি থাকিলেও প্রাণে আনন্দ নাই। আনন্দ, স্ফূর্ত্তির উৎস—জাতীয় উৎসবগুলি আজকাল কেবল কয়েকটী ছুটির দিন লইয়া আসে। জাতীয় উৎসবের সার্থকতা এখনও যে-সকল গ্রামে অক্ষুণ্ণ আছে সেখানে গেলে দেখিবেন—আবালবৃদ্ধবণিতার মধ্যে প্রতি উৎসবে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে, নূতন কি এক উদ্দীপনা, নবীন সে এক উৎসাহ, অভিনব তাহাদের উল্লাস। ধরুন, শরতের রবি, চন্দ্র, জল, হাওয়া সকলে মিলিয়া বাঙলাকে যখন ফলে-ফুলে সুখে-সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া তুলিয়াছে মা দুর্গা আসিতেছেন; ঘরে-ঘরে তখন কাঁসর ঘণ্টা, শঙ্খ বাজিতেছে, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলের বুক দুলিয়া উঠিয়াছে, আনন্দোজ্জ্বল মুখে তাহাদের এক কথা —'মা আসিয়াছেন'।

(৪) অবশেষে আমাদের দুইটী খুব প্রয়োজনীয় বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের আহার্য্য এবং মাতা পিতার শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের কথা। প্রকৃতই সকল জীবজন্তু, বৃক্ষ লতার স্বাস্থ্যের জন্য এই দুইটীই প্রধানরূপে দায়ী। সার আর বুথ্‌নট্‌লেন্ একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—মাতাপিতার বৃত্তিসমুদায় সন্তানে সমাগম, ও পুষ্টিসাধন—এই দুইটীই প্রধানভাবে জীবজন্তু, মানুষ ও লতাপাতার স্বাস্থ্য, শক্তি ও চরিত্র নির্দ্ধারণ করে ("Heredity and nutrition are the two main factors which determine the health, strength and character of men, animals and plants.")

প্রথমতঃ, জন্মের সহিত উত্তরাধিকার-সূত্রে জীবের শারীরিক যে সকল বৃত্তি উৎপন্ন হয় অনেকাংশে তাহার বিষয়ই আলোচনা করা যাক্। মাতাপিতার স্বাস্থ্যানুরূপ সন্তানের স্বাস্থ্য হয়, ইহা সাধারণভাবে অনেকেই জানেন। সুতরাং মাতাপিতা উভয়েরই যে সবল, স্বাস্থ্যবান হওয়া প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এখন দেখা যাক্, মাতাপিতার পরস্পরের প্রতি প্রেম, ভালবাসা, এক কথায় তাহাদের মনের মিলন সন্তানের স্বাস্থ্যের উপর ক্রিয়া করে কি না।

পাশ্চাত্য-জগতে বিবাহ-বিজ্ঞানের আলোচনায় বহু প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার বলিয়াছেন দাম্পত্য আকর্ষণ (sexual affinity) না থাকিলে সন্তান দেহ-মনে স্বাস্থ্যবান হয় না। কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। যে দম্পতীর মধ্যে প্রেম, ভালবাসা, আনন্দ, মনোবৃত্তির একত্ব নাই, তাহাদের সন্তান-সন্ততি স্বাস্থ্যহীন হয়; বিশেষতঃ গর্ভবতীর প্রফুল্লচিত্ত জরায়ুস্থ সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ রূপে দায়ী। যদি এ কথা প্রকৃতই সত্য হয়, তাহা হইলে বাঙলার বিবাহ-প্রথা তাহার শিশুদিগের স্বাস্থ্যহীনতার একটী কারণ। দেখা যায়, অনেক স্থলেই বিবাহের কয়েক বৎসর পর পর্য্যন্ত অথবা আজীবন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেম, ভালবাসা, মনের মিলনের অভাব রহিয়াছে; হেতু এই যে, হয় স্বামীর স্ত্রী পছন্দ হয় নাই, কিম্বা স্ত্রীর স্বামী পছন্দ হয় নাই। এরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়, কারণ শুভদৃষ্টির পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামী স্ত্রী পরস্পরের বিষয় বিন্দুমাত্র ধারণাও করিতে পারে না। ঠিক পাশ্চাত্য ধরণের না হইলেও পুরাকালে আমাদের দেশে স্বয়ম্বর-প্রথা ছিল। সে প্রথা পুনঃপ্রচলিত করা শক্ত হইলেও, বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র পাত্রী উভয়কেই উভয়ের বিষয় মোটামুটি জানিতে দিয়া, তাহাদের মতামত জানা উচিত। কারণ বাঙলার বিবাহবন্ধন আমরণ, এবং স্বামী স্ত্রীর মনের মিলনের উপর সন্তানাদির স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করে।

(৫) এখন খাদ্যদ্রব্যের আলোচনা করি। বাঙলীর খাদ্যদ্রব্যের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়—পুষ্টিসাধক আহার্য্যের একান্ত অভাব। বাঙলার প্রতি শতের মধ্যে পঁচানব্বই জন লোক বলিবে,—"পুষ্টিসাধক আহার্য্য আর পাওয়া যায় কই? দুধ পাওয়াই যায় না—পাওয়া গেলেও তাহার তিনচতুর্থাংশ জল, এবং তাহার মূল্য দেওয়াও গরীব বা মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে এখন দুঃসাধ্য। ঘি পাওয়াই যায় না—ঘিএর নামে কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর চর্ব্বি বিক্রয়

হয়। সরিষার তৈলে নিকৃষ্ট হোয়াইট্ অয়েল, পাক্‌রা বীজের তৈলে প্রায় অর্দ্ধ পরিমাণে মিশ্রিত হয়। ফলে তৈয়ারী আটা, ময়দা মাত্রেই সোপ্ ষ্টোনের গুঁড়া মিশান। অতএব আমাদের প্রধান খাদ্যগুলিই অপ্রাপ্য বা স্বাস্থ্যহানিকর।"

কথাগুলি মিথ্যা নয়। কিন্তু, পুষ্টিসাধনের অভাব এখনও দেশে ঘটে নাই। এ পুষ্টিসাধনের অভাব আমাদেরই অবহেলা ও অজ্ঞতা-জনিত। স্বাস্থ্যের পুষ্টিসাধন করা বাঙলার অধিবাসীর পক্ষে যে খুব ব্যয়-সাধ্য নয়, ইহাই এখন দেখাইবার চেষ্টা করিব।

এখন প্রথমে দেখা যাক্, পুষ্টিসাধন হয় কিসে? বৈজ্ঞানিকগণ খাদ্যদ্রব্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন যে, তাহার প্রধান উপাদান হইতেছে আমিষ, ভাইটামিন্, মিষ্ট ও চর্ব্বি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 'ক্ষার লবণ' নামক আর একটী আবশ্যকীয় ও স্বাস্থ্যকর বস্তু খাদ্যাদির মধ্যে পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভাইটামিন্ নামক পদার্থটাই জীবদেহের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী, এবং এই 'ক্ষার লবণ'ও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর; যেহেতু উপযুক্ত পরিমাণে এই খনিজ পদার্থটীর অভাব ঘটিলে ভুক্তদ্রব্যাদি উত্তমরূপে হজম হয় না, কাজেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, এবং ফলে অন্ত্রসমূহে খাদ্যদ্রব্য পচিয়া উঠিয়া বহুরোগবীজাণু উৎপাদিত করে ও শরীরস্থ অন্য রোগবীজাণুকে প্রশ্রয় দেয়; তখন নানাবিধ রোগে আমরা আক্রান্ত হইয়া পড়ি। এই ক্ষার শাক সব্‌জিতে ও ফল মূলের উপরিভাগের ছালের নীচেই প্রচুর পরিমাণে থাকে।

এখন দেখা যাক্ কোন্ কোন্ আহার্য্যে ভাইটামিন্ অধিক পরিমাণে থাকে। বৈজ্ঞানিক মতে ভাইটামিন প্রধানতঃ তিন প্রকারের। যে ভাইটামিনে শরীর গঠিত হয়, তাহা 'ভাইটামিন 'এ' নামে অভিহিত। যে ভাইটামিনে হজমশক্তি বৃদ্ধি করে তাহাকে 'বি' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাইটামিন 'সি' শরীর শীতল রাখে, কিয়ৎ পরিমাণে হজমের সাহায্য করে ও চর্ম্মরোগ, রক্তদুষ্টি, স্কার্ভি ইত্যাদি হইতে রক্ষা করে। কাজেই এ তিন প্রকারের ভাইটামিনই পুষ্টিকর।

ভাইটামিন 'এ' অধিক পরিমাণে থাকে—ঘি, মাখম, নারিকেল, টাট্‌কা মাংস, মাছ, মুরগী ও হাঁসের ডিম, গমের আটা, শাকপাতা, ডাল (মুসুর, মুগ, অড়হর, ছোলা) ইত্যাদিতে। ভাইটামিন 'বি' প্রচুর পরিমাণে থাকে—প্রধানতঃ চাউলে, তাহার পর ডিমের কুসুম, ছানা, দধি, ডাল, কলাগজান ছোলা, বাদাম, পেস্তা, মাংসের মিটুলি, মাছের ডিম, ফলমূল, শাকসব্জি ইত্যাদিতে। এবং ভাইটামিন 'সি' কমলা ও গোঁড়া লেবু, বাতাবী লেবু, টক দধির ঘোল, বিলাতী বেগুণ, বাঁধাকপি, পিঁয়াজ, রসুন, মূলা, লাউ, শাক (বিশেষতঃ পালঙ-শাক) ইত্যাদিতে বহুল পরিমাণে থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙলায় যে সকল খাদ্যবস্তু প্রধানতঃ পাওয়া যায়, এবং এখন না থাকিলেও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের যে সকল প্রধান খাদ্য ছিল, সেই সকল দ্রব্যেই 'এ', 'বি', 'সি' তিন প্রকারেরই ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে আছে। ঘি, মাখম, মাছ, ডাল, চাল, ফলমূল, কলা, ছোলা, শাকপাতা, দুধ, দই—এই সকলই আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্র ন আহার্য্য ছিল, এই সকল খাদ্যেই তাঁহারা সবল ও স্বাস্থ্যবান হইতেন, আমারাই বা হইতে পারি না কেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন, আগেকার মত খাঁটী দুধ, ঘি পাওয়া যায় না, অধিকন্তু তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ফলমূল, মাছ, মাখন খাইতে পারিতেন; আমরা অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি—খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এ উত্তর খুবই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু এ স্বাস্থ্যহীনতার জন্য পূর্ব্বের মত খাদ্যবস্তুর অভাব তত দায়ী নয়, যত দায়ী আমাদের পুষ্টিসাধক আহার্য কি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি খাইতেন—ইহা জানিবার প্রতি অবহেলা ও সেই সকল খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রতি বিতৃষ্ণা।

সামান্য গার্হস্থ্য পশুপক্ষীদিগের আহারাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, কোন্ বিশেষ খাদ্যদ্রব্য তাহাদিগকে সম্যক সজীবতা দান করে, অন্য কোন্ আহার্য

তাহারা হীনবল ম্রিয়মান হইয়া পড়ে? সুতরাং ইহা ঠিক যে, বিশেষ বিশেষ খাদ্যদ্রব্য বিশেষ বিশেষ জীবজন্তু উদ্ভিজ্জাদির পক্ষে পুষ্টিকর,—এই জন্যই আহার্য্য সম্বন্ধে নিত্য নূতনতা চলে না। কত সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতানুযায়ী যে সকল খাদ্যদ্রব্য পূর্ব্বপুরুষগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রায় সংস্কারেই পরিণত করিয়া গিয়াছেন,—তাহা বদলান কি ভয়ানক মারাত্মক! আমাদের রুচি পরিমার্জ্জিত হইয়া, চিরন্তন রুচিতে অরুচি আসিয়াই আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। আমরা শিখিয়াছি আদব-কায়দা, পোষাকপরিচ্ছদ হইতে খাদ্যদ্রব্য পর্য্যন্ত সকল জিনিষে পারিপাট্য। কাযেই এখন হবিষ্যান্ন ত ভুলিয়া গিয়াছিই, অধিকন্তু যে চাউল আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, সেই সিদ্ধ কলে-ছাঁটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাউল হইয়াছে আমাদের খাদ্য। চাউলে ভাইটামিন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে—ঠিক ইহার উপরে ছালের তলায়; কলে ছাঁটাই করিলে এই ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়, ছাঁটাইয়ের পর যেটুকু থাকে তাহাও ফ্যানের সহিত বাহির হইয়া যায়। যাঁহারা ময়দা আটা খান, তাঁহারা পরিষ্কার, সাদা ধব্‌ধবে কলের আটা, ময়দা ব্যবহার করেন—লাল জাঁতা-ভাঙা আটাতেই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাইটামিন থাকে তাহা বুঝিয়া দেখেন না। যাঁহাদের সংস্থান আছে তাঁহারা প্রায় ভাইটামিন-হীন, মিশাল্ ভেজাল ঘি-ময়দায় প্রস্তুত খাবার, বিষাক্ত অথচ পরিমার্জ্জিত রুচির চপ্, কাট্‌লেট ইত্যাদি খাইবেন; কিছু কাঁচা ফল মূলাদি, একটু মাখন, ছানা, নূন পক্ষে চিড়া, মুড়ি, নারিকেল, খই, মুড়কী খাইবেন না।

ফল, মূলাদির উপকারিতা সম্বন্ধে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য খাদ্য-বিজ্ঞান এক মত। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্বাধিক খাইতেন ফল-মূল। ইংরাজিতে পূর্ব্বে প্রবাদ ছিল—an apple a day keeps the doctor away; এখন অবশ্য কমলালেবু আপেলের স্থান অধিকার করিয়াছে। পুরাকালে আমাদের ব্যঞ্জনাদিতে, মসলা, সুগন্ধি ইত্যাদির প্রাচুর্য্য থাকিত না, এবং তরি-তরকারি এমনভাবে সিদ্ধ হইত না যাহাতে কোনও রূপে দাঁতগুলির ব্যথা না লাগে, তাহাদের চিবাইয়া কষ্ট করিতে না হয়। এখন হইয়াছে ঠিক বিপরীত। ফলে, অতিসিদ্ধ তরিতরকারিতে ভাইটামিন থাকে না, কার্য্যাভাবে দাঁত হীনবল হইয়া পড়ে, দন্তরোগ জন্মে, অল্পবয়সে দাঁত পড়িয়া যায়; অধিক মশলাদি ব্যঞ্জনাদিকে গুরুপাক করিয়া তোলে। তরিতরকারি অতিসিদ্ধ হইলে তাহা হজমও হয় কম; কারণ চিবাইবার প্রয়োজন না থাকায়, তাহাদের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে দাঁতের লালা মিশিতে পারে না।

এইরূপ অপেক্ষাকৃত নূতন, অপরীক্ষিত, পরিমার্জ্জিত খাদ্যবস্তু আমাদের আহার্য্য হওয়ার ফলেই পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বপ্নের অগোচর এ্যাপেণ্ডিসাইটিস, বেরিবেরি, ক্যান্‌সার, বহুমূত্র ইত্যাদি রোগ আজ আমাদের এত প্রপীড়িত করিতেছে।

পুনরায় বলি, আমাদিগের স্বাস্থ্যহানির জন্য খাদ্যদ্রব্যের অভাব তেমনভাবে দায়ী নয়, যেমন দায়ী পুষ্টিসাধন ও আহার নির্ব্বাচনের প্রতি আমাদের অবহেলা। পুনরায় বলি, দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য আমাদের শোচনীয় স্বাস্থ্যের জন্য তত দায়ী নয়, যত দায়ী আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—এবার আশ্বিন সংখ্যা আগামী ৮ই আশ্বিন প্রকাশিত হইয়া ১১ই বা ১২ইয়ের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পঁহুছিবে। যাঁহারা ভিপি ফেরৎ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের ফিরিস্তি এবার স্থানাভাবে গেল না।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

১। সরল ধাত্রী-শিক্ষা ও কুমার-তন্ত্র।—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, এম্-বি প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ, ৩০৪ পৃষ্ঠা, কাপড়ের বাঁধাই, মূল্য দুই টাকা। প্রকাশক শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ ও যোগানন্দ দাসদ্বয়, ১০৯নং আপার সার্কিউলার রোড, কলিকাতা।

এই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদিগের দেখার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুপালন সম্বন্ধে এমন একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর সুবোধ্য জ্ঞানগর্ভ পুস্তক এতাবৎকাল বাংলা ভাষায় আর প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। বিদেশী পাঁচ সাত সের ওজনের বিরাট বিরাট গ্রন্থ-ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান-রস নিঙড়াইয়া এই মনোহর ক্ষুদ্র ভাণ্ডের ভিতর রক্ষা করিয়া পাঠকগণকে উপহার দেওয়া, একমাত্র সুন্দরী বাবুর ন্যায় যুগপৎ অভিজ্ঞ স্ত্রী-চিকিৎসক ও শক্তিশালী লেখকেই সম্ভবে। ইংরাজীতে গাইনেকলজি ও অব্‌ষ্টেট্রিক্সে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, প্রায় সেই সকল বিষয়ই ডাক্তার দাস মনোরমভাবে কথোপ-কথন ছলে এমন চমৎকার সংক্ষিপ্ত অথচ কার্য্যকরীভাবে বিবৃত করিয়াছেন যে, সাধারণ গৃহস্থ জননীগণ ইহা মনোযোগের সহিত দুই তিনবার পাঠ করিলে, যে-কোন পাশ-করা নার্স ও ধাত্রীর সমান অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন।

শুনিতেছি, অনেক গৃহিণী এই পুস্তকের সাহায্যে সহজে প্রসবকার্য্য ও শিশু-চিকিৎসা সম্পাদন করিতেছেন। পল্লীগ্রামে যেরূপ শিক্ষিতা দাইয়ের তীব্র অভাব, এবং অশিক্ষিতা যমরাজ-দূতী-স্বরূপা নোংরা দাইয়ের কৃপায় যেরূপ প্রসূতি ও শিশু-মৃত্যুর আধিক্য, তাহাতে এইরূপ একখানা বই প্রতি পল্লী গৃহস্থেরই 'লক্ষ্মীর পেতে'র ন্যায় সশ্রদ্ধ যত্নে রক্ষা করা উচিত। চতুর্থ সংস্করণে কিছু কিছু নূতন কথা সংযোজিত হইয়াছে। কতকগুলি কবিরাজী মুষ্টিযোগাদির সংশ্লেষণ হইয়াছে। প্রায় ৭০ খানি চিত্র সহযোগে বর্ণিত বিষয়গুলি সহজবোধ্য করিবার সফল প্রয়াস করা হইয়াছে। "মায়ের স্তনে ছেলের অমৃত" শীর্ষক শিল্পী যতীন্দ্রকুমারের মুখপাতে রঙীন্ চিত্রখানি পুস্তকের সৌন্দর্য্যের সহিত গুরুত্বও একটু বাড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুখের বিষয়, অনেক কবিরাজী ও হোমিও-প্যাথি বিদ্যালয়ে পুস্তকখানি পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে ও ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষার্থিনীর নিকট ইহা পরম আদরের হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকের প্রতি বর্ষে একটী করিয়া সংস্করণ হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। পুস্তকখানির মূল্যও যথোচিত সুলভ বলিয়া মনে হইল।

২। বৃদ্ধাধাত্রীর রোজ নাম্‌চা।—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম্-বি প্রণীত। ৮০ পৃষ্ঠা, বোর্ডে বাঁধাই, মূল্য বারো আনা। প্রকাশক পাল ব্রাদার্স, পি, ৫৩ সি, রসারোড্ সাউথ্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

এই পুস্তকে কয়েকটি মনোহারিণী গল্প-গাথার মধ্য দিয়া লেখক স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। সিফিলিস, গনোরিয়া প্রভৃতি আমাদের দেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তৃতি করিতেছে এবং তাহার ফলে আমাদের জাতীয়-জীবনী-শক্তি কিরূপে হ্রাস পাইতেছে, তাহার উজ্জ্বল চিত্র ডাঃ দাস কয়েকটি গল্পে হৃদয়গ্রাহীভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন এই সকল গল্প 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন আমরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম ও বন্ধুবর্গের মধ্যে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হৃদয়ে বৃদ্ধ ডাক্তারের মানস-ধাত্রীর অপূর্ব রচনা-ভঙ্গীর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতাম। ১০খানি ছবি দিয়া পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রোজনাম্‌চাখানি অনেকের অন্ধনেত্রে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কার্য্য করিবে। পুস্তকের ছাপা, কাগজ সুন্দর।

৩। শিশু-মঙ্গল প্রথম শিক্ষা।—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম্-বি প্রণীত। ৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ছয় আনা। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ ও যোগানন্দ দাসদ্বয়, ১০৯ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীনে যে-সকল অশিক্ষিতা পল্লীদাইদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে, বিশেষ করিয়া তাহাদেরই উপযোগী করিয়া ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। "সরল ধাত্রী শিক্ষা ও কুমার-তন্ত্র" নামক পুস্তকের অংশ বিশেষ ঈষৎ রদ্‌বদল করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মডেল্ ও চিত্রের সাহায্যে পাঠ্যাংশ হৃদয়ঙ্গম করিবার মত কায়দায় বইখানি সাজানো হইয়াছে। পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সাধারণ লোকেও ইহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

৪। পারিবারিক চিকিৎসা।—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগরত্ন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী প্রণীত। প্রকাশক—এডেণ্ডা কোম্পানী, ১নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। ১৪৪ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য দশ আনা।

শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ বয়সে নবীন হইলেও আলোচ্য পুস্তক-সম্বন্ধীয় জ্ঞানে তিনি যে একেবারেই নবীন নহেন, তাহার পরিচয় শুধু এই পুস্তকখানিতে নহে, ইতঃপূর্বেও নানা ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছে। 'আয়ুর্বিজ্ঞান' পত্রে যখন ইহার কতকাংশ প্রকাশিত হয়, তখন আমরা ইহার অস্বীকার্য্য কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম এবং এইরূপ জ্ঞান সাধারণ্যে প্রচার মানসে সুলভ মূল্যের পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে গ্রন্থকারকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। 'পারিবারিক চিকিৎসা' সার্থকনামা হইয়াছে—একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। অল্প-শিক্ষিত গৃহকর্তা বা গৃহিনীরা ইহার সাহায্যে বেশ সহজে সাধারণ রোগসমূহের চিকিৎসা করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে কয়েকটি স্থলে গ্রন্থকার ঔষধের মাত্রার আদৌ উল্লেখ করেন নাই; পরবর্ত্তী সংস্করণে সেগুলি সন্নিষ্টি করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। দেশের দুর্ভাগ্য যদি এরূপ পুস্তকের সমাদর না হয়। মূল্যও যথোচিত সুলভ হইয়াছে।

৫। রেডিয়াম্ চিকিৎসা ও রঞ্জনরশ্মি চিকিৎসা।—ডাঃ শ্রীযুত সুবোধ মিত্র এম্-ডি (বার্লিন), এফ্-আর-সি-এস্ (এডিন্) প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৫৬ পৃষ্ঠা, ৩৭ খানি ছবি, কাপড়ের বাঁধাই, মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকখানি হাতে পাইয়া আমাদের মনে প্রথমেই এই প্রশ্ন জাগে—ইহা কাহাদিগের জন্য লিখিত, চিকিৎসক না সাধারণ লোকের জন্য? পুস্তকখানি আমূল পাঠ করিলেও এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা মিলে না। শ্রীযুত সুবোধবাবু জার্মানী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে সম্প্রতি-প্রতিষ্ঠিত রেডিয়াম্ ও রঞ্জন-রশ্মি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং সাধারণ্যে ঐ দুইটি ব্যাপার বুঝাইয়া, ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য একখানি সহজ সুন্দর ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রয়োজন—তাঁহারই সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভব করা স্বাভাবিক। অথচ "সুচিকিৎসা" নামক ডাক্তারী মাসিক পত্রে পুস্তক-বর্ণিত বিষয়টির আমূল প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং উভয় শ্রেণীকে সমঝাইবার জন্য এই পুস্তিকার সমুদ্ভব। কাযেই বইখানি লেখা অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে।

প্রথমেই 'সূচনা' নাম দিয়া একখানি সাদা পৃষ্ঠায় গীতার সেই বহু-ব্যবহৃত "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য"...ইত্যাদি শ্লোকের দুইটি চরণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ কি এই বুঝিতে হইবে যে, বিংশশতাব্দীর ধর্মের গ্লানি মুছিয়া লইবার জন্য শ্রীভগবান্ রেডিয়াম্ ও রঞ্জন-রশ্মি-রূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন?...তারপর গ্রন্থকার একমাত্র ক্যানসার ছাড়া রেডিয়াম দ্বারা চিকিৎস্য আর কোনো রোগের পূর্বলক্ষণ, পরবর্ত্তী লক্ষণ, কারণ, নিদান ও আরোগ্য-লক্ষণের কোনো বর্ণনা দেন্ নাই। প্রথম ৩৩ পৃষ্ঠাব্যাপী রেডিয়ামের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কলম্ব হইয়া, হঠাৎ ডাঃ মিত্রের চিত্তে পুনরায় ধর্মভাব জাগিয়া উঠিয়াছে; তিনি ক্যান-

সার, সার্কোমা, হজকিন্স্ ডিজিজের মাথায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেশের আসন বিছাইয়া দিয়াছেন। যথা—"পরমহংস দেব বল্‌তেন যে, ভগবান তিনবার হাসেন্। তার ভেতর একবার হাসেন যখন ডাক্তার রোগীকে বলে—ভয় কি, আমি ভালো ক'রে দেবো। 'এই যে ভালো ক'রে দেবো'—এর মূল্য যে কত কম, সে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি কচ্ছি।... রেডিয়াম্ যে ধন্বন্তরী নয়—সে জ্ঞান সকলেরই থাকা উচিত।"...এই সকল সংশয়মূলক উক্তি ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসার পুস্তক প্রদত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। অন্ততঃ যে-শতকরা পঁচিশ জন ক্যানসারের রোগী রেডিয়াম্ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাও অভিজ্ঞের এই ভগবদ্ভক্তি-মূলক উক্তিতে হতাশ হইয়া দূর হইতেই রেডিয়াম্‌কে প্রণাম করিবেন।

রঞ্জন-রশ্মি চিকিৎসা সম্বন্ধে এত অল্প কথা বলা হইয়াছে যে, ডাক্তার ত দূরের কথা, যে-কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাতে কোনো নূতন কথা খুঁজিয়া পাইবেন না। রঞ্জন রশ্মির কার্য্য-প্রণালী ও যন্ত্র-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলা উচিত ছিল। ২২ নং নক্সা-চিত্রের সহিত টিউবের ক্যাথোড, য়্যানোড্ প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের নাম ও কার্য্যকারিতা না দেওয়ায় উহা একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। পুস্তকে বানান-ভুলও অনেকগুলি আছে; এমন কি ভূমিকায় লেখকের গুরুকল্প ডাঃ সত্যশরণ বাবুর নামটিতেই বর্ণ-বিভ্রম ঘটিয়াছে।

মোট্ কথা, ডাঃ সুবোধবাবুর বইখানি খুব সুবোধ্য ও হৃদ্য হয় নাই; ইহাকে তিনি যদি 'সুচিকিৎসা' মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ রাখিতেন, তাহা হইলে সুবুদ্ধির কার্য্য হইত। ডাঃ মিত্রের ন্যায় আলোচ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ দেশীয় লোক খুব অল্পই আছেন—তাঁহার লিখিবার ও প্রকাশ করিবার ভঙ্গীও নিন্দ্যনীয় নহে। আশা করি, তিনি আগামী সংস্করণে খোল্-নলিচা পরিবর্তন করিয়া বইখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবেন।

৬। **বিধবার বিবাহ।**—শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি-এল্। মেদিনীপুর, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ভদ্র কর্ত্তৃক 'বিধবা বিবাহ সমিতি' হইতে প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই আনা অথবা দশজনকে পড়িয়া শুনাইবার প্রতিশ্রুতি। ২য় সংস্করণ।

যথা সময়ে এই পুস্তিকার প্রথম সংস্করণের সমালোচনা স্বাস্থ্য-সমাচারে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ তাহারই পুনর্মুদ্রণ। বহুদিন হইতে আমরা বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। এই পুস্তিকা পাঠের পূর্বে যদি আমরা ইহার বিপক্ষেও থাকিতাম, তাহাহইলে ভাগবতবাবুর সুযুক্তিপূর্ণ গবেষণাবহুল সুচিন্তিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া ইহার পক্ষভুক্ত হইতাম। আমাদের দেশের ধনীলোক-গণের উচিত, এই পুস্তিকা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া (গ্রন্থকারের অনুমতি লইয়া) আপামর সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা; তাহা হইলে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, কূপ-খনন ও দান-ষোড়শ অপেক্ষাও বেশী পুণ্য হইবে।

৭। **বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত।**—শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি-এল্। মেদিনীপুর, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

সত্যযুগ হইতে বিরাট হিন্দু সমাজ উদ্ভূত হইয়া, যুগে যুগে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া কেমন করিয়া বর্ত্তমান্ অবস্থায় আসিয়া পহুছিয়াছে, তাহারই একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থকার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকের প্রতি পত্রে লেখকের গভীর অধ্যয়নশীলতা, গবেষণা-নিষ্ঠা, সূক্ষ্মদর্শিতা, বুঝিবার ও বুঝাইবার ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির এই সামাজিক রামায়ণখানি সশ্রদ্ধ আগ্রহে পাঠ করা উচিত।

বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা।—

বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ, মিঃ ওটেন বাঙ্গালার বিদ্যালয়গুলিতে সঙ্গীত-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। সঙ্গীত একটা মস্ত বড় বিদ্যা। এই বিদ্যায় বাঙ্গলার ছাত্র-সমাজকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে একটা কাজের মত কাজ হইতে পারে। সঙ্গীত হইতেছে —আনন্দম্। যে গান করে, যে গান শোনে উভয় পক্ষই আনন্দ পায়। এ হেন সঙ্গীত শিক্ষায় যে কেহ্ বিরোধী হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। তবে একটা কথা। সঙ্গীত বিদ্যাটা এমন যে, যে-সে তাহা শিখিতে পারে না। যে যথার্থ সঙ্গীত শিখিবে,—সঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে তাহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকা দরকার। যাহার তাহা নাই, তাহার পক্ষে সঙ্গীত শিক্ষার আশা দুরাশা! এক কথায়, আমাদের দেশে সাধারণের বিশ্বাস—সঙ্গীত শিখিতে হইলে ঈশ্বরদত্ত একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকা চাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রমাত্রেরই যে এই ক্ষমতা থাকিবে, এমন কোন কথা নাই, এবং তাহা থাকেও না। তথাপি, আমরা বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বিরোধী নই। আমাদের বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যাহা শেখানো হয়, তাহার অতি সামান্য অংশই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে; বাকী সময়টাই প্রায় বৃথা হয়। বোঝার উপর শাকের আঁটীর মত সঙ্গীত শিক্ষাও না হয় সেইরূপ বৃথা হইবে। তবে বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার প্রবর্ত্তন একেবারেই যে বৃথা হইবে, এমন কথাও আমরা বলি না। পূর্ব্বে যে স্বাভাবিক প্রবণতার কথা বলিয়াছি, তাহা যাহাদের নাই, তাহাদের সঙ্গীত শিক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও, দুই একজন এমন ছাত্রও থাকিতে পারে যাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতার অভাব নাই। এরূপ ছাত্রেরা রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইলে পরিণত বয়সে গুণী কেলোয়াৎ হইতে পারিবে। আমরা জানি, কোন কোন বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার পাকা রকম বন্দোবস্ত ছিল; এখনও হয়ত কোথাও কোথাও সে বন্দোবস্ত আছে। তাহার ফল যে খারাপ হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না; কারণ সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য হইতে অনেক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গুণী আমরা পাইয়াছি। বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে সঙ্গীত-শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে, তাহা যে যথার্থ গুণীদের আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়া দিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসামের কালাজ্বর।—

আসামের স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তা মেজর টি, ডি, মরিসন আসামের কালাজ্বর সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব্বে আসামে কালাজ্বরাক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৯০জন মারা যাইত; কিন্তু নবাবিষ্কৃত ইনজেকসন চিকিৎসা এতদূর

সাফল্য লাভ করিয়াছে যে, অবস্থা ঠিক উল্টা দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ এখন শতকরা ৯০ জন আরাম হইতেছে ও শতকরা ১০ জন মারা যাইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক কালাজ্বর চিকিৎসা-প্রণালী-অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য; কিন্তু এমন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা সমগ্র আসামে এই চিকিৎসা-প্রণালী যথেষ্ট সুলভ হইয়াছে। এখন যে কেহ তাহার নিজের বাসস্থানের সান্নিধ্যে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কালাজ্বরের রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছিল। কিন্তু সুচিকিৎসার ফলে এখন রোগীর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। আশা করা যায়, কয়েক বৎসরের মধ্যে কালাজ্বর মূলতঃ আসাম হইতে সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে। কালাজ্বর আসামের রোগ। এখন কিন্তু উহা সমগ্র বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আসামে যখন কালাজ্বর কমিতেছে, তখন বঙ্গে উহার এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব কেন? আসামের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-প্রণালী বঙ্গে প্রবর্ত্তিত হইতেছে না; অথবা, যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা আসামের মত সফল হইতেছে না কেন?

বাধ্যতামূলক ব্যায়াম প্রথা।—

এমন এক সময় ছিল যখন কেবল লিখিতে ও পড়িতে শেখাই আমাদের ছেলেদের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইত। কিন্তু সে দিন গিয়াছে। এখন স্থির হইয়াছে - মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উন্নতিও আবশ্যক। মানসিক উন্নতির ন্যায় শারীরিক উন্নতিও শিক্ষা অর্থাৎ চর্চ্চাসাপেক্ষ। লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম চর্চ্চা না করিলে কাহারও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই জন্য যখন শুনিলাম, মান্দ্রাজের কর্পোরেশন তাঁহাদের এলাকাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ব্যায়ামশিক্ষা সংক্রান্ত একটী প্রস্তাব তাঁহাদের একটী অধিবেশনে মঞ্জুর করিয়াছেন, তখন যথার্থই সুখী হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে, দেশের সর্ব্বত্র সকল কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

সম্পাদকের ডাকবাক্স

মহাশয়

১৩৩৪ সনের শ্রাবণ সংখ্যার স্বাস্থ্য-সমাচারের ১১০ পৃষ্ঠায় দেশ-ভেদে ভোজন শীর্ষক প্রবন্ধে লিখা আছে—

"জনশ্রুতি যে, ঢাকা বরিশাল প্রভৃতি স্থানে কোন প্রকার সমাজিক ভোজ উপস্থিত হইলে তাহার প্রথমে কত পরিমাণ লঙ্কার আবশ্যক তাহার ফর্দ্দ করা হয় এবং সেই লঙ্কার নিরিখেই ভোজের খরচের পরিমাণ স্থির করা হইয়া থাকে।"

প্রকৃত পক্ষে ঢাকা বরিশাল জিলা দূরের কথা, পূর্ব্ব বঙ্গের কোথায়ও এইরূপ প্রথা নাই। এইরূপ কোন জনশ্রুতিও পূর্ব্ব বঙ্গে নাই। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় কিংবা পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন স্থানে চাকুরী অথবা ব্যবসা উপলক্ষে বসবাস করেন, তাঁহারা কখন এইরূপ জনশ্রুতি শুনেন নাই। উক্ত প্রবন্ধের লিখক পশ্চিম বঙ্গবাসী বলিয়া মনে হয়। এই জনশ্রুতি কি প্রকারে তাঁহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

নিবেদক

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্দীপ, নোয়াখালী।

BLANK PAGE(S)

DOUBLE COLOUR PAGE

আমেরিকার সুঠাম শক্তিমন্ত্র-প্রচারক
মিঃ স্যামুয়েল্ এড্উইন্ গুমষ্টেড্।
ইনি বিখ্যাত বার্ণার্ ম্যাক্‌ফ্যাডেনের শিষ্য।

শ্রীজয়গোপাল নন্দী বর্ম্মা। কোন্নগর।

স্বাস্থ্য সমাচার

"শরীমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৬শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

দুর্গমে এস মা দুর্গে!

ওরে, মা আসিতেছেন বৎসরান্তে একবার তিন দিনের জন্য। কে আছিস্, মায়ের উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার আয়োজন কর্, বোধন-ঘট পাত্, আমন্ত্রন ও অধিবাসের যোগাড়্ কর্, হৃদয়ের পেয়ালা আজ আনন্দ-সুধায় কাণায় কাণায় ভরিয়া ফেল্। কই, কে আজ এ ডাক্ শুনে? শ্মশানে আজ মড়ার মাথা গড়াইয়া গড়াইয়া ঠোকাঠুকি করিয়া, শুধু অন্তরাত্মার এ আহ্বানকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছে! বোধন-ঘট ভাঙিয়াছে, আশা-তরু শুকাইয়াছে, আনন্দ-ধারা মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালুকা-রাশিতে দিশাহারা হইয়াছে। আর বাকী কি? মাগো, দেবাসুরের যুদ্ধ আবার নূতন করিয়া লাগিয়াছে। এবার আর অমৃত লইয়া কাড়াকাড়ি নয়, অমৃত-ভ্রমে বিষ লইয়া কাড়াকাড়ি। মন্থনের গরল একবার স্বেচ্ছায় পান করিয়া নীলকণ্ঠের আকণ্ঠ পরিপূরিত; এবারকার বিষ উভয় দলকেই ভাগাভাগি করিয়া খাইতে হইতেছে। তাই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া সবাই ছট্‌ফট্ করিতেছে। আনন্দ করিবার প্রাণ কই, উৎসব জমাইবার আগ্রহ কই?

আবার কোন্ ইন্দ্র বিবেক-নারদের উপহার-দত্ত পারিজাত-মালা ঐশ্বর্য্যমদ-ঐরাবতের কণ্ঠে হেলায় দুলাইয়া দিয়াছে; আবার নারদের অভিশাপ হাতে হাতে ফলিয়াছে। আমরা আবার লক্ষ্মী-ছাড়া হইয়াছি। এবার আর মন্দার নাই; বাসুকীর মাথায় পৃথিবী রক্ষিত—ছাড়িয়া আসিবার উপায় নাই। কাযেই দেবাসুরের এ নিস্ফল কাম্ড়াকাম্ড়ি শুধু সমুদ্রোপকূলেই চলিতেছে। কিন্তু এবার সত্যকার দেব আর অসুর নহে, কারণ আর দেবের সে আধ্যাত্মিক বলের বৈশিষ্ট্য নাই—অসুরের সে দৈহিক বলের বিশেষত্ব নাই; দুই দল আমরা দেব আর অসুরের মিথ্যা মুখোস্ পরিয়া সত্যসত্যই নেড়ী

DOUBLE COLOUR PAGE

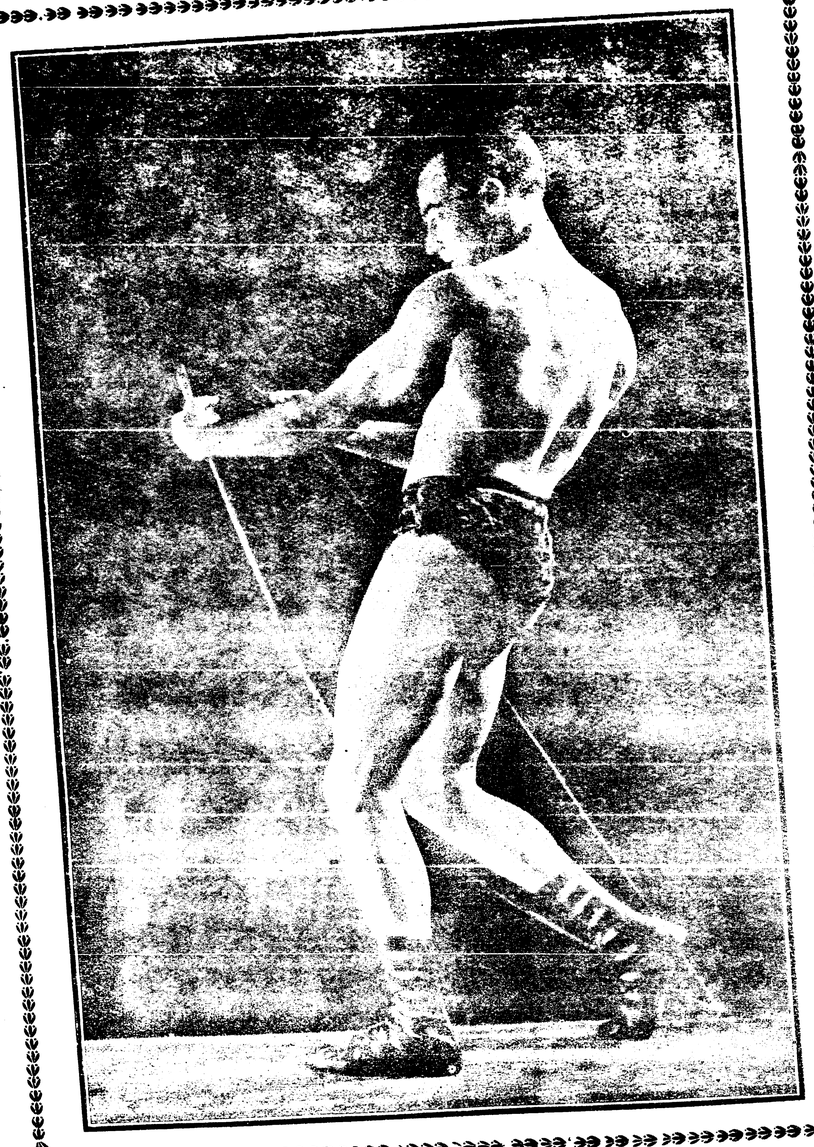

আমেরিকার সুঠাম শক্তিমন্ত্র-প্রচারক
মিঃ স্যামুয়েল্ এড্উইন্ ওমষ্টেড্।
ইনি বিখ্যাত বার্ণার্ ম্যাক্ফ্যাডেনের শিষ্য ।

শ্রীজয়গোপাল নন্দী বর্ম্মা। কোন্নগর।

স্বাস্থ্য-সমাচার

"শরীমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্"

১৬শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

দুর্গমে এস মা দুর্গে!

ওরে, মা আসিতেছেন বৎসরান্তে একবার তিন দিনের জন্য। কে আছিস্, মায়ের উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার আয়োজন কর্, বোধন-ঘট পাত্, আমন্ত্রন ও অধিবাসের যোগাড়্ কর্, হৃদয়ের পেয়ালা আজ আনন্দ-সুধায় কাণায় কাণায় ভরিয়া ফেল্। কই, কে আজ এ ডাক্ শুনে? শ্মশানে আজ মড়ার মাথা গড়াইয়া গড়াইয়া ঠোকাঠুকি করিয়া, শুধু অন্তরাত্মার এ আহ্বানকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছে! বোধন-ঘট ভাঙিয়াছে, আশা-তরু শুকাইয়াছে, আনন্দ-ধারা মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালুকা-রাশিতে দিশাহারা হইয়াছে। আর বাকী কি? মাগো, দেবাসুরের যুদ্ধ আবার নূতন করিয়া লাগিয়াছে। এবার আর অমৃত লইয়া কাড়াকাড়ি নয়, অমৃত-ভ্রমে বিষ লইয়া কাড়াকাড়ি। মন্থনের গরল একবার স্বেচ্ছায় পান করিয়া নীলকণ্ঠের আকণ্ঠ পরিপূরিত; এবারকার বিষ উভয় দলকেই ভাগাভাগি করিয়া খাইতে হইতেছে। তাই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া সবাই ছট্ফট্ করিতেছে। আনন্দ করিবার প্রাণ কই, উৎসব জমাইবার আগ্রহ কই?

আবার কোন্ ইন্দ্র বিবেক-নারদের উপহার-দত্ত পারিজাত-মালা ঐশ্বর্য্যমদ-ঐরাবতের কণ্ঠে হেলায় দুলাইয়া দিয়াছে; আবার নারদের অভিশাপ হাতে হাতে ফলিয়াছে। আমরা আবার লক্ষ্মী-ছাড়া হইয়াছি। এবার আর মন্দার নাই; বাসুকীর মাথায় পৃথিবী রক্ষিত—ছাড়িয়া আসিবার উপায় নাই। কাযেই দেবাসুরের এ নিস্ফল কাম্ড়াকাম্ড়ি শুধু সমুদ্রোপকূলেই চলিতেছে। কিন্তু এবার সত্যকার দেব আর অসুর নহে, কারণ আর দেবের সে আধ্যাত্মিক বলের বৈশিষ্ট্য নাই—অসুরের সে দৈহিক বলের বিশেষত্ব নাই; দুই দল আমরা দেব আর অসুরের মিথ্যা মুখোস্ পরিয়া সত্যসত্যই নেড়ী

DOUBLE COLOUR PAGE

কৃত্তার কর্কশ কোলাহল-বিলাসিত নখদন্তের কঠোর লড়াই জমাইয়া দিয়াছি! লক্ষ্মী কোথায়, জননি? —অতল সমুদ্র-রহস্যের অন্তস্তলে প্রবাল-মণি-মুক্তা-খচিত পালঙ্কে শুইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন!

সরস্বতী আজ অভিমানে সাগর-পারে; নিবীর্য্য কার্ত্তিক আজ বিলাসের বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া অমানিশার অন্ধকারে পাপ-অভিসারে চলিয়াছে; গণ-পতি আজ ধনপতির ধাপ্পাবাজী, উৎপীড়ন ও উপেক্ষা ও অবিচারে রুদ্ধশ্বাস—নিষ্প্রাণ। মা, তোমারও প্রতিমূর্ত্তি আজ কোথাও খুঁজিয়া পাই না; তোমার চর্ম দেখিতে পাই মুচির প্রাঙ্গনে, তোমার রক্ত দেখিতে পাই কশাইয়ের হস্তে, তোমার মাংস দেখিতে পাই তথা-কথিত গোঁসাইদের রন্ধনশালে! আজ তুমিও নাই, তোমার সাঙ্গোপাঙ্গও নাই; যা'-কেবল তোমার পদ-ভার-মুক্ত সিংহের প্রতাপই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে দেখি। তবে তুমি কি মা, আজ ভক্তদের ছল করিতে—তাহাদের মন ভুলাইতে শূন্যগর্ভ মায়া-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, পূজা লইতে আসিয়াছ? একি তোমার প্রেতমূর্ত্তি?

সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, পূর্ণ হোক্, শূন্য হোক্, তোমার ওই শান্তিময়ী বরাভয়-মূর্ত্তি—বিজয়-বৈভবসূচিত ক্ষেমঙ্কর রূপ প্রকটিত করিতে আর আসিও না। ভারতে এখনো শান্তি আসে নাই, শক্তি আসে নাই, প্রেম আসে নাই, ভক্তি আসে নাই, ভাব আসে নাই, মিলন আসে নাই, নিষ্ঠা আসে নাই। স্বাধীনতা আসে নাই। নিয়মরক্ষা করিতে যদি নিতান্তই এস, তাহাহইলে মহীষাশূর, দুর্গাসুরাদিকে সংহার করিতে যে মূর্ত্তি একবার পরিগ্রহ করিয়াছিলে, সেই প্রলয়ঙ্করী ভীমাভৈরবী ভয়ঙ্করী চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে অযুত ডাকিনী-প্রতিনী সঙ্গিনীদের সঙ্গে লইয়া এস; আগে তোমার দশ প্রহরণ দিয়া আমাদের আলস্য, মূর্খতা, রোগ, অস্বাস্থ্য, আত্মম্ভরিতা, কাপুরুষতা, পরশ্রীকাতরতা, পরমুখাপেক্ষিতা, বিলাস-বিভ্রম ও সঙ্কীর্ণ-মানসিকতা নাশ কর,—হৃদয়ে-বাহিরে স্বদেশে-বিদেশে মহামানবতার মহাশত্রুগুলিকে নির্মম করে কাল-কবলিত কর, কাল বৈশাখীর রুদ্র নিঃশ্বাসে জড়-সৃষ্টির শিরায় শিরায় উদ্দাম চঞ্চলতা আনো, জীর্ণ কঙ্কালে আগে প্রাণ সঞ্চার কর; তারপর তোমার স্নিগ্ধ সুমধুর প্রসন্ন মূর্ত্তিতে আমাদের জয়তৃপ্ত নয়ন-সম্মুখে অপরূপ শোভায় প্রকাশিত হইয়া উঠিও। তখন তোমার ভক্তের প্রাণে প্রাণে আবার আনন্দ-সাগরের বাণ আসিয়া উথলিয়া উঠিবে, আবার বুক-চেরা রক্ত দিয়া ষোড়শোপচারে তোমার পূজা দিব।

দুরন্ত-দুস্তর-দুঃখ-সাগর-তারিণী দুর্গতিনাশিনী তারা, আজ তোমার মোহনরূপ লুকাইয়া, জগতের রসনায় তোমার দারুণ-জ্বালার স্বাদ জাগাও, নচেৎ আমাদের আর মুক্তি নাই। এ ঘোর দুর্দিনে, এই ঝঞ্ঝা-বিশ্লিষ্ট দুর্লঙ্ঘ্য ধ্বংসস্তূপ, মহাতমসাসমাচ্ছন্ন দামিনী-ঝলকিত, কোটি আর্ত্তকণ্ঠ-মুখরিত শোণিতকর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথের মধ্য দিয়া আজ তোমার আগমন-পথ বিনির্মিত রহিয়াছে। আজ নব রূপ ধরিয়া, কৈবল্যদায়িনী মাতঃ, এই দুর্গমে নামিয়া এস, শবকে আজ শিব করিয়া তুলিয়া তোমার শক্তিময়ী নাম সফল কর—ললাট-অনলে সহস্র দুর্গতির যজ্ঞাহুতি হইতে সত্যসুন্দরের জন্ম দিয়া, তোমার দুর্গা নামকে চির-সার্থক্ কর!

যক্ষ্মার সহিত যুদ্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রোগ-সংক্রামণ।—যক্ষ্মার জীবাণুই যে যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন করে—তাহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত এবং আমরা সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রোগ-জীবাণুর সংক্রামণ বাহ্যজগৎ হইতে ঘটিয়া থাকে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ কোন দেহে যক্ষ্মা-জীবাণু আপনা হইতে জন্মায় না। কি করিয়া বাহিরের জীবাণু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপন্ন করে, সেই বিষয়টী সর্ব্বাপেক্ষা দুর্জ্ঞেয় এবং বহু অনুসন্ধানের ফলেও তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করা সুসাধ্য হয় নাই। সাধারণ নিয়মগুলি আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি; কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কি ভাবে রোগের সংক্রামণ হইল এবং কতদিন দেহমধ্যে জীবাণু বাস করিবার পর, দেহের স্বাভাবিক প্রতিষেধ-শক্তি ও রোগ-প্রতিষেধক জীবাণুগুলিকে পরাভূত করিয়া রোগ সৃষ্টি করিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, সাধারণতঃ সহর ও সহরতলীর লোকদিগের দেহে যক্ষ্মা-জীবাণু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অবস্থান করে। বড় বড় সহরে শতকরা ৯০টী পর্য্যন্ত লোকের দেহে যক্ষ্মা-জীবাণু পাওয়া যায়; কিন্তু রোগ মাত্র কয়েকটী লোকের দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সকল স্থানের শতকরা ৭৫টী লোক যে যক্ষ্মাবজাণু-গ্রস্ত সে বিষয় আমরা নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিতে পারি। এক পক্ষে যেমন ইহা চিন্তার কারণ, অপর পক্ষে ইহা হইতে কতক পরিমাণ সান্ত্বনা পাওয়া যাইতে পারে। এই রোগ-জীবাণু সভ্য জাতির মধ্যে এমন ব্যাপকভাবে থাকাতেও যে সকলেই রোগাক্রান্ত হয় না, ইহা হইতে ধারণা করা যাইতে পারে যে, তাহারা রোগের আক্রমণ সহ্য করিবার শক্তি অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য দিয়াই অনেক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছে এবং রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন অজ্ঞাত কারণ, তেমনই অজ্ঞাত উপায়ে লাভ করিয়াছে।

কফ।—রোগাক্রান্ত লোকের কফই যে যক্ষ্মা-বিস্তারের প্রধান সহায়তা করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কফের সকল রকম অবস্থায়ই জীবাণু বাঁচিয়া থাকিবার সুবিধা পায় এবং বিস্তারেরও বিশেষ সুযোগ ঘটে। প্রত্যেক লোকেরই হাঁচি বা কাসির সহিত কফের অতি-সূক্ষ্ম অংশ কিছুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া যায়। ঘটনাচক্রে যক্ষ্মা রোগীর এক এক সময় অত্যন্ত কাসি হইয়া থাকে। এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে যক্ষ্মার সংক্রামণ নিকটবর্ত্তী লোকের মধ্যে অতি সহজে সংঘটিত হইয়া থাকে। বার বার কফ ওঠা হেতু রোগী সকল সময় সাবধানতা অবলম্বন করে না, এবং শয়ন-ঘরের মধ্যেই বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কফ ত্যাগ করা হেতু রোগ বিস্তার ঘটে। কাসি হইতে বা বাতাসে নীত হইয়া যক্ষ্মা-জীবাণু—কাপড়, পোষাক, ঘরের আসবাব-পত্রসকল রোগদুষ্ট করিয়া ফেলে। রোগীর ঘরে অনাবৃত অবস্থায় রক্ষিত খাদ্য দ্রব্যাদিতে যক্ষ্মা বীজাণু ছড়াইয়া পড়ে এবং ঐ খাদ্য গ্রহণ হেতু রোগ অপর শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। রোগীর ব্যবহৃত বিছানা, পোষাক, প্রভৃতি ব্যবহার হেতু রোগ দেহান্তরে আশ্রয় পায়। যক্ষ্মারোগীর চুম্বন হেতু শিশুদেহে যক্ষ্মা প্রবেশ করে।

দুগ্ধ—রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ ভাল করিয়া সিদ্ধ না করিয়া পান করাতে, গো-দেহ হইতে মনুষ্য-দেহে জীবাণু বিস্তার লাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ যে সকল গাভীর পালানে যক্ষ্মা-জীবাণু ক্ষত উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে, সেই গাভীর দুগ্ধে ক্ষয়-জীবাণু অতি শক্তিশালী থাকে

এবং মানবদেহে রোগোৎপত্তি করিবার বিশেষ সুবিধা পায়।

মাংস—রোগগ্রস্ত পশুর মাংস হইতে রোগ মনুষ্য-দেহে সংক্রামণের কখনও কখনও সুবিধা পায়। মাংস অসিদ্ধ অবস্থায় খাওয়া হয় না, তাহাতে ইহাতে বিপদের অনেক কম সম্ভাবনা; কিন্তু ভালরূপে সুসিদ্ধ অবস্থায় না আসা পর্য্যন্ত একেবারে বিপদ দূর হয় না। যাহা হউক, পশুমাংস হইতে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা খুবই অল্প সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রোগের বাহন।—অন্যান্য বাহনের বিষয় আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মানুষকেই যক্ষ্মার একটী প্রধান বাহন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সকল দেহেই যে রোগ উৎপন্ন হয় না, তাহা সত্য বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কাযেই যাঁহাদের যক্ষ্মার কোন লক্ষণ নাই, তাঁহারা রোগী দেখিতে গিয়া তাঁহাদের পোষাকে রোগের বীজ লইয়া স্থানান্তরে ছড়াইতে পারেন।

প্রায় সকল প্রকার রোগ-বীজাণু-বহনকারী মানবের পরম শত্রু—মাছির কথা বিশেষ না বলিলেও চলে। তাহারা নিজেরা কোন রোগগ্রস্ত হয় না, কিন্তু তাহাদের শ্রীপদে মৃত্যুর দূতরূপ যক্ষ্মার জীবাণু স্বচ্ছন্দে বহন করিয়া লইয়া যায়, এবং যাহার উপরেই বসে, তাহাতেই রোগ-জীবাণু ছাড়িয়া দেয়।

বায়ু একটী প্রধান বাহন। নিজ কার্য্য সম্পাদনে সে কাহারও ক্ষতি-বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখে না, এবং তাহাতেই বহু উপকারের সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ্মা-বীজ বহন করিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করে। কফ শুষ্ক হইয়া গেলে বাতাসে জীবাণুগুলি উড়িবার সুবিধা পায় এবং বীজাণু-দেহের অতি লঘুত্ব হেতু বহু দূরে নীত হয়। সূর্য্যালোকে ইহাদের কতকগুলি মরিয়া যায়, এবং কতকগুলি নির্জ্জীব অবস্থায় উপযুক্ত স্থানে আশ্রয় পায় এবং সুযোগ পাইলেই স্বকর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

রোগ প্রবেশের দ্বার।—যক্ষ্মা অতিশয় সংক্রামক রোগ, তাহা এখন সকলেই স্বীকার করেন এবং আমরা রোগের সংক্রামণ প্রসঙ্গে রোগ প্রবেশের পথগুলি সম্বন্ধে এক্ষণে আলোচনা করিব।

চর্ম্ম—সুস্থ ও সবল শরীরে ত্বকের নিম্নে injection দ্বারা যক্ষ্মার সৃষ্টি করা যায়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রোগ সুস্থ শরীরে প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা লওয়া গিয়াছে। চর্ম্মদ্বারা সুস্থ শরীরে রোগের সংক্রামণ হওয়া নিতান্ত বিরল নহে। যক্ষ্মা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধৌত করিতে, ভগ্ন পাত্র, গহনা ব্যবহার, injection করিবার syringe লইয়া অসাবধানে নাড়াচাড়া করিতে, যক্ষ্মারোগীর মৃতদেহ লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে, চর্ম্ম ঘর্ষিত হইয়া বা ছড়িয়া-কাটিয়া মনুষ্য-শরীরে রোগের সংক্রামণ ঘটে। চর্ম্ম দ্বারা সংক্রামণ ঘটিলে প্রায়ই রোগ সেই স্থানে নিবদ্ধ থাকে এবং ভাল করিয়া চিকিৎসা করিলে প্রায়ই আরোগ্য লাভ করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ সুস্থ চর্ম্মের ছিদ্র মধ্য দিয়া যক্ষ্মা প্রবেশ করিতে পারে না; তাহা সম্ভব হইলে বহুদিন মনুষ্য জাতিকে ধরা-পৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইতে হইত।

শোণিত।—রক্তদ্বারা জীবাণু প্রবেশ লাভ করা নিতান্ত বিরল নহে; কিন্তু ইহাকেও স্থূলতঃ চর্ম্ম দ্বারা রোগাধিকার বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মনুষ্য-দেহের আবরক ঝিল্লির ফাঁক দিয়া প্রবেশ করিয়া, রক্ত-স্রোতে গা ভাসাইয়া ইহারা ফুস্ ফুস প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করিতে পারে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি-পথে প্রবেশ করিয়া রোগসৃষ্টি করিবার একটী বিশেষ সুযোগ আছে এবং বহুক্ষেত্রে রোগ এই ভাবে উৎপন্ন হয়। শিশুদিগের মধ্যে গণ্ডমালা রোগ (scrofula) অতিশয় স্বাভাবিক, এবং এই ক্ষেত্রে নাসিকা, গলা, মুখ প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দ্বারা জীবাণুরা প্রবেশ লাভ করিয়া নিকটস্থ রসবাহী গ্রন্থিগুলিতে আশ্রয় লাভ করে। সকল ক্ষেত্রেই যে প্রবেশ করা মাত্রেই ক্ষত উৎপন্ন করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। বহুদিন গুপ্তাবস্থায় থাকিবার পর সুবিধামত আত্ম-প্রকাশ করে। সাধারণতঃ সর্দ্দি-কাসি হইলে উহার সাহায্যে জীবাণুগুলি প্রবেশের ও প্রবর্দ্ধনের সুবিধা পায়।

অন্ননালী।—কোন কোন পণ্ডিতের মতে অন্ননালী-দ্বারা জীবাণু দেহমধ্যে প্রবেশ করে; এবং বহুদূরে পেটের মধ্যে যাইবার সুবিধা পায়। কখনও কখনও প্রবেশ স্থানে ক্ষত সৃষ্টি করে। রোগ জীবাণুর সংখ্যা ও শক্তি হিসাবে প্রবেশদ্বারের নিকটে বা দূরে ক্ষত সৃষ্ট হয়। শিশুদিগের মধ্যে অন্নে যক্ষা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। রুগ্ন গাভীর অল্প ফুটন্ত দুগ্ধই যে রোগ সৃষ্টি করিবার প্রধান কারণ, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। ক্ষয়-রোগীর দ্বারা পাচিত অন্ন বা তাহার ভুক্তাবশেষ গ্রহণ দ্বারা একটী পরিবারের সকলেই আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

নাসিকা (নিশ্বাস-দ্বার)।—ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মা প্রধানতঃ নাসা-পথে প্রবিষ্ট ক্ষয়-জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই কারণে ক্ষয়-রোগ স্থান হইতে স্থানান্তরে ছড়াইয়া পড়িবার সুবিধা পাইয়া থাকে। পশুর নাসিকার নিকট ক্ষয়-জীবাণুযুক্ত বায়ু সঞ্চালন দ্বারা শীঘ্রই তাহার দেহে ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মার সৃষ্টি করা যায়। এই রূপ পরীক্ষা করা বিশেষ বিপজ্জনক এবং এইরূপ পরীক্ষা করিতে গিয়া অনেকে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

সাধারণ প্রতিষেধ।—যক্ষ্মা-জীবাণু সর্ব্বত্র আছে, এবং সম্ভবতঃ সকল শরীরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে। কিন্তু রোগ যে সকল সময় হয় না, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। এতদবস্থায় সকলেরই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালন করা বিধেয়, যাহাতে প্রথমতঃ যক্ষ্মা-জীবাণু শরীরে প্রবেশ না করে, দ্বিতীয়তঃ যদিই দেহ-মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, যেন রোগের সৃষ্টি করিতে না পায়।

কি উপায়ে এবং কোন্ সময়ে যে যক্ষ্মা-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। যেরূপ ভাবেই সতর্কতা অবলম্বন করা যাউক, সহরের মধ্যে—ঘন-সংবদ্ধ লোকালয়ের ভিতর বাস করিয়া যক্ষ্মা-জীবাণুর প্রবেশ রোধ করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। সে কারণে কোন বিশেষ প্রতিষেধ-বিধির কথা বলা অতীব সমস্যার বিষয়। বিশেষজ্ঞেরা নিজ নিজ ভাবের মত ব্যক্ত করিয়াছেন; তবে তাহার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, সেগুলিই পালন করিলে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হইতে পারে।

কোন কোন দেশে যক্ষ্মার সহিত সংগ্রামে মানব জয়ী হইতে চলিয়াছে। ইউরোপে যক্ষ্মার উপদ্রব অনেক পরিমাণে কমিয়াছে এবং ঐ মহাদেশের লোকেরা আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা যক্ষ্মাকে একেবারে দূর করিতে সক্ষম হইবেন। অন্ততঃ যক্ষ্মার বীজাণু বর্ত্তমান থাকিলেও লোকের প্রতিষেধ-শক্তি এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার আশা করা যায় যে, তাহাতেই রোগের আক্রমণ-সম্ভাবনা প্রকৃতপক্ষে দেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে।

রোগের জীবাণু যখন ক্ষত প্রস্তুত করিবার সুবিধা পায়, তখনই প্রকৃতপক্ষে যক্ষ্মা-রোগ প্রকাশ পায়। শরীরের যে-কোন স্থলে বীজাণু কর্ত্তৃক সৃষ্ট ক্ষতই যক্ষ্মা-রোগ। এই ক্ষত-নিবারণে নিষ্ক্রিয় প্রতিষেধ-শক্তি বৃদ্ধি করাই যক্ষ্মার সহিত যথার্থ যুদ্ধ। শরীরের শক্তি বৃদ্ধি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস, কার্য্যস্থল আলোক ও বাতাস-সম্পন্ন হওয়া, আহারাদি উপযুক্ত পুষ্টিকর, নিয়মিত সময়ে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া, মাদক দ্রব্য ত্যাগ, মনের স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদি সকল কারণে যক্ষ্মার প্রতিষেধ-শক্তি বৃদ্ধি পায় ও প্রকারান্তরে যক্ষ্মা-জীবাণু ধ্বংশের সহায়তা করে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যাহারা যক্ষ্মার গুরুত্বের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে জানেন, তাঁহারা পরিবারবর্গকে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিবার পরামর্শ না দিয়া, যক্ষ্মা রোগীর উপর সমস্ত সতর্কতা অবলম্বনের ভার দেন। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ যক্ষ্মা-রোগীর সহিত না হইয়া যক্ষ্মা-জীবাণু, তথা—যক্ষ্মারোগের সহিত হওয়া উচিৎ। যাহাতে রোগীর উপর অযথা কঠোর নিয়ম স্থাপন না করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া গৃহস্থ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।

রোগের বাহন ও বিস্তারের উপায় পূর্ব্বেই বর্ণিত

হইয়াছে। এক্ষণে তাহার প্রত্যেকটির জন্য কি কি প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা বিধেয়, তাহার বিচার করিতে হইবে।

(শ্লেষ্মা, কফ।—কফই রোগ বিস্তারের প্রধান সহায় এবং সেই কারণে কফ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। রোগীকে যে কেবলমাত্র যথা-তথা কফ ফেলিতে নিষেধ করিতে হইবে—তাহা নহে, কোথায় কফ ফেলা প্রয়োজন তাহাও বুঝাইয়া বলিতে হইবে। গৃহের বাহিরে, রৌদ্র ও আলোকযুক্ত স্থানে কফ ত্যাগ করাতে বিপদের গুরুত্ব অনেক অল্প, যেহেতু জীবাণুগুলি শীঘ্রই রোগসৃষ্টি-শক্তিহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু গৃহ মধ্যে আশ্রয় পাইলে জীবাণুগুলি বহুদিন জীবিত ও সতেজ থাকে। সাধারণতঃ গৃহের নিকটেও কফ ত্যাগ করা উচিত নহে, ইহা একটি অত্যন্ত কদভ্যাস; গৃহের স্বাস্থ্য নষ্ট করে এবং অপরিচ্ছন্ন দেখায়; তদ্ব্যতিরেকে জুতা ও পদের দ্বারা শীঘ্রই রোগের জীবাণু গৃহমধ্যে আশ্রয় পাইতে পারে।

গৃহমধ্যে বা অতি নিকটে কফ ত্যাগ করা বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর মহা বদ অভ্যাস। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে সকল বড় বড় হোটেল বা আফিস বাটীতে ইউরোপীয় ও ভারতবাসীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে এবং তথায় ভারতীয়দের জন্য সিঁড়ির কোণ্-গুলিতে কফ ফেলিবার কাঠের গুঁড়াপূর্ণ পাত্র থাকা সত্ত্বেও দেওয়ালের চারিদিক অত্যন্ত অপরিষ্কার; এবং ইউ-রোপীয় দের জন্য সিঁড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেন সবেমাত্র কলি দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতেই কতক পরিমাণে বুঝা যায়, ইউরোপীয়েরা কেমন করিয়া যক্ষ্মা দূর করিতে সমর্থ হইতেছে, ভারতবাসীর মধ্যে যক্ষ্মা-রোগীর সংখ্যা কেন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে! প্রাচীর গাত্রে উভয়েরই জন্য লেখা আছে "পাত্র ভিন্ন থুথু ফেলা নিষেধ"; কিন্তু এই সামান্য আইন একজন পালন করিয়া অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে ও অপরকে সুস্থ থাকিবার সুবিধা দিতেছে; কিন্তু অপরজন কেবল মাত্র-যে রোগ বিস্তার করিয়া নিজে মরিবার সঙ্গে সঙ্গে অপরকে সমন-সদনে প্রেরণ করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছে—শুধুই তাহা নহে, গৃহ শ্রীহীন করিয়া ফেলিতেছে!

যে স্থলে অনেক লোকের সমাগম হয়, সে স্থানে কফ ত্যাগ করিবার পাত্র থাকা চাই। কারণ বহু লোকের মধ্যে কাহারও না কাহারও রোগ থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। ঐ সকল আধার রোগ-জীবাণু-ধ্বংশকারী দ্রব্যাদি দ্বারা পরে ধুইয়া ফেলিতে হয়।

রোগীর গৃহের মধ্যে থুথু ফেলিবার পাত্র থাকা একান্ত বিধেয়। তাহাকে পাত্র ভিন্ন অন্য স্থানে কফ ফেলিবার বিপদের কথা বুঝাইয়া দিয়া, একমাত্র পাত্রেই কফ ফেলিবার উপদেশ দিবে।

রোগীর কফ দগ্ধ করিয়া ফেলাই জীবাণু-ধ্বংশের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়। যদি শ্লেষ্মা কফ পরিমাণে অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে করাতের গুড়া প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ মিশাইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। জীবাণু ধ্বংশের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করার রীতি আছে। তন্মধ্যে সকলগুলিই সুবিধাজনক নহে। অনেকগুলি কফের সহিত অসম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া তাল পাকাইয়া যায় এবং তাহাতে ঐ পিণ্ডের মধ্যস্থ জীবাণুগুলি বেশ নির্ব্বিবাদে বাঁচিয়া থাকিবার সুবিধা পায়। Corrosive Sublimate (পারা হইতে প্রস্তুত সাংঘাতিক বিষ বিশেষ) সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক বিষ বিধায় জীবাণুধ্বংশের জন্য ব্যবহার করা চলিতে পারে। Carbolic acid ইহাপেক্ষা কম শক্তিশালী হইলেও উহা ব্যবহার করা চলিতে পারে। ফিণাইল, চূণ প্রভৃতি কম শক্তিশালী হইলেও ব্যবহার্য্য।

রোগীর গৃহে শিশুদিগের যাওয়া নিষিদ্ধ। এবং আরও এই সকল সাংঘাতিক বিষ ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া শিশুদিগের অত্যন্ত সাবধান রাখা বিধেয়। Lysol বা অন্য ক্ষার জাতীয় ক্ষয়-বিষনাশক দ্রব্য ব্যবহার করা এক পক্ষে মঙ্গল, কারণ তাহাতে কফের জীবাণু দ্রব হইয়া গিয়া প্রত্যক্ষভাবে জীবাণুগুলিকে আক্রমণ করিতে সুযোগ হয়। রোগীর কফ কোন স্থানে ফেলিয়া দিবার পূর্ব্বে যেন তাহার দোষ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, এমন কি নর্দ্দমা প্রভৃতি স্থানে ফেলিবার পূর্ব্বেও এইরূপ করা দরকার। রুমালে কফ ত্যাগ করা অতিশয় কদভ্যাস এবং তাহা সমূহ ক্ষতিজনক। কফ ত্যাগ করিবার সময় হাতে লাগিয়া যাওয়া সম্ভব, অথবা রুমাল ভিজিয়া গিয়া পকেট ও সেখান হইতে বাহির করিবার সময় হাত নষ্ট করিতে পারে। নাসা-নির্গত কফ মুছার জন্য কাপড়ের একটু বড় টুকরা ব্যবহার করা মন্দ নহে। বেশ পরিষ্কার ধোয়া ন্যাকড়া পাট করিয়া রাখিয়া দিতে হয় এবং প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর তাহা পরিত্যাগ করিয়া, একসঙ্গে দুই তিন খানি জমিলে পরে দগ্ধ করিয়া ফেলা ভাল। আজকাল জাপানী কাগজের রুমাল বিবাহোপলক্ষে পত্র ছাপিবার জন্য বেশ চলন হইয়াছে। ঐ কাগজ টুকরা করিয়া এই কার্য্যে ব্যবহার করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক; মূল্য হিসাবে অধিক নহে এবং অতি শীঘ্র দগ্ধ করিয়া ফেলা যাইতে পারে।

হাঁচি বা কাসির সময় অতি যত্নে রুমাল্ মুখ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়, যাহাতে পাশের লোকের মুখ, গাত্র স্পর্শ না করে; নচেৎ ইহাতে রোগ বিস্তৃতির বিশেষ সুবিধা হয়। যদি কাছে রুমাল না থাকে, তাহা হইলে যে দিকে লোক নাই এরূপ অবস্থায় হাচা বা কাসা উচিৎ; তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা একেবারে দূর না হইলেও অনেক পরিমাণে কম হয় বটে।

ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার সাধারণ নিয়মাবলী পালন করিলে রোগ সংক্রামণের বিপদ অনেক পরিমাণ দূর হয়। হাঁচা, কাসা প্রভৃতি বিষয়ে উল্লিখিত নিয়ম সুস্থ ব্যক্তিরও পালন করা উচিত।

মল, মূত্র, পূঁয।—মল মূত্র ও ক্ষত হইতে নির্গত পূঁয হইতে সংক্রামণ হওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার। এ সকল ক্ষেত্রে কাপড় প্রভৃতি প্রত্যেকবারে ভাল সিদ্ধ করিয়া লওয়া ভাল। ধোপারা যে নিয়মে কাপড় প্রভৃতি পরিষ্কার করে, রোগ জীবাণুশূন্য করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু যাহারা সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে কাপড় প্রভৃতি নাড়া চাড়া করিবে, তাহাদের নিরাপদের জন্য রোগীর কাপড়, জামা, বিছানার ছাদর প্রভৃতি দ্রব্য লাইসল, ইলেক্ট্রোলিটিক ক্লোরোজেন (E. C.) প্রভৃতি বিষনাশক দ্রব্যাদি দ্বারা বিশোধন বা খুব ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া, ধোপার বাড়ী দেওয়া উচিত।

দুগ্ধ ও গোশালা—দুগ্ধ হইতে যক্ষ্মার জীবাণু শিশুদিগের দেহে ছড়াইয়া পড়ে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শিশুদেহের যক্ষ্মা কখনও যুবা বা বৃদ্ধ শরীরে ফুসফুস আক্রমণ করে। যে সকল গাভীর দুগ্ধ পান করা হয়, সাধারণতঃ তাহারা যাহাতে সুস্থ ও সবল পশু হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়; এবং যদি সন্দেহ থাকে তাহা হইলে গাভীকে Tuberculin দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লওয়া ভাল। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে আইন দ্বারা সমস্ত দুগ্ধবতী গাভী ঐ ভাবে পরীক্ষা করিয়া লইবার ব্যবস্থা হওয়াই সমীচীন। এই কারণে বিজ্ঞ পশু-চিকিৎসক নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ বিশেষ কোন সন্তোষজনক ফল পাইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। যদি গাভী পরীক্ষা করানো সম্ভব না হয়, সেরূপ গাভীর দুগ্ধ উত্তমরূপে সিদ্ধ না করিয়া পান করা কখনও উচিত নহে। ভারতবর্ষে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিবার ব্যবস্থা থাকাতে বিপদের সম্ভাবনা অনেক কম। উত্তমরূপে সিদ্ধ করিবার পরই কোন পাত্র দ্বারা ভালরূপে দুগ্ধ আবৃত করিয়া, সেই পাত্র ঠাণ্ডাজলে বসাইয়া দিয়া দুগ্ধ শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়; তাহাতে দুগ্ধের গুণ অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে।

যথাসম্ভব হাত না লাগাইয়া দুগ্ধ দুটান, পাত্রে ঢালা প্রভৃতি কার্য্য করা উচিত। শিশুদিগকে খাওয়াই-সময় ভিন্ন দুগ্ধে হাত দিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঝিনুক দিয়া দুধ খাওয়ান অভ্যাস করাই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক; কারণ ঝিনুক প্রত্যেকবারে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবার সুবিধা আছে। "বোতলে" করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইবার অভ্যাস করিতে নাই, তাহাতে বহুবিধ রোগ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা আছে।

যে গাভীর দুগ্ধ পান করিতে হইবে, তাহার বাসস্থান যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিৎ। গাভীর যক্ষ্মা না থাকিলেও কোন রকমে যক্ষ্মার বীজ গোশালার মধ্যে আসিয়া পালানে লাগিতে পারে; এবং দোহনের সময়ে দুগ্ধে সেই বীজাণু আসে। একারণে গোশালা সর্ব্বদা দোষশূন্য করিবার জন্য বিশোধক দ্রব্যাদি দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হয়। যে সকল ব্যবসায়ীরা দুগ্ধের জন্য একস্থলে অনেকগুলি গাভী রাখে, সরকার হইতে যে সকল স্থান পরিদর্শনের জন্য লোক নিযুক্ত করাইতে হইবে।

তৈজস-পত্রাদি—যক্ষ্মা রোগীর ব্যবহারের জন্য তৈজস-পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হওয়া উচিৎ, এবং বাটীর শিশু প্রভৃতি কাহাকেও কোন রকমে সে সকল পাত্র ব্যবহার করিতে দিতে নাই। সচরাচর সংসারে ব্যবহারের পাত্র রোগীর গৃহে যদি কোন রকমে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে যথাসম্ভব দোষশূন্য করিয়া লওয়া যুক্তি-যুক্ত। ব্যবহারের পর ছাই, নারিকেল-ছোবড়া প্রভৃতি দিয়া বাসন মাজিবার জন্য আমাদের যাহা ব্যবস্থা আছে, তাহা কতকটা মঙ্গলজনক বটে; কিন্তু এইরূপে মাজিবার পর পাত্রগুলি একবার গরম জল দ্বারা ধুইয়া লওয়া প্রশস্ত।

রোগীর মৃত্যু ঘটিলে তাহার ব্যবহৃত প ত্রাদি ফেলিয়া দেওয়াই মঙ্গলজনক; কিন্তু তাহা যেন অপরে ব্যবহার না করিতে পারে, এই ভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়।

গৃহের আসবাব-পত্র। রোগীর গৃহের আসবাব-পত্র সদাসর্ব্বদা বেশ পরিষ্কার থাকিবে এবং যথাসম্ভব অল্প সংখ্যক হইবে। সম্ভব হইলে রোগীর ব্যবহারের বিছানা ব্যতিরেকে কিছু না থাকাই মঙ্গল। রোগীর ব্যবহৃত বিছানা ইত্যাদি প্রত্যহ অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য রৌদ্রে দেওয়া ভালো এবং উত্তমরূপে বিশোধন না করিয়া কচাচিৎ যেন ব্যবহার করা না হয়। এমন কি রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া পরিধানের কাপড়-চোপাক বদলাইয়া ফেলিতে পারিলে ভাল হয় এবং ঐ পোষাক উত্তমরূপে কাচিয়া পুনরায় ব্যবহার করা উচিৎ।

ঘর-বিশোধন। যে গৃহে যক্ষ্মা-রোগী বাস করে, তাহা ব্যবহার করিতে হইলে গৃহ যথাসম্ভব দোষশূন্য করিয়া লওয়া উচিত। কেবল মাত্র যক্ষ্মা-রোগীর গৃহে বাস করার জন্য বহুলোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। যক্ষ্মা-রোগী গৃহ ত্যাগ করিবার পর তাহা বিশোধনের নিমিত্ত সম্ভব হইলে নূতন বালি-কাম করাইয়া, কলি দিয়া লইতে হয়; অন্ততঃ একবার উত্তমরূপে কলি ফিরাইয়া লওয়া খুবই উচিত।

আবর্জ্জনা পরিষ্কার—যক্ষ্মা রোগীর গৃহ পরিষ্কার করিতে হইলে তাহাতে ধূলা না উড়ে, এইটী প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ফিনাইল, ইলেক্ট্রালিটিক ক্লোরোজেন্ প্রভৃতি জলে মিশাইয়া সেই জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া ঘর পুঁছিয়া ফেলা মঙ্গল। সেই ন্যাকড়া অপর কোন ঘরের জন্য কচাদিৎ ব্যবহ র করিতে নাই।

রোগীর গৃহের আবর্জ্জনা ঝাঁট দিয়া তাহা যথেচ্ছা ফেলা নিষিদ্ধ। উহার সহিত রোগের অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জীবাণু থাকিতে পারে; সে কারণে প্রত্যহই উহা পুড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলা বিধেয়।

রোগী ও তাহার পরিচর্য্যাকারীর পালনীয় নিয়ম—রোগী ও যাহাদের তাহার সংস্পর্শে সদা সর্ব্বদা আসিতে হয়, তাহাদিগের মধ্যে যক্ষ্মার বিস্তার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অথবা কতকগুলি কঠোর নিয়মের যেমন প্রয়োজন নাই, সেইরূপ যে সকল নিয়ম পালন করা প্রকান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। যদি কোন রোগী সাধারণ নিয়ম পালনে অবজ্ঞা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়াই বিধেয়। সাধারণতঃ রোগী, চিকিৎসক ও পরিচর্য্যাকারীর মধ্যে সাহচর্য্যের ভাব থাকা চাই, তাহা না হইলে সকলেরই বিশেষ অসুবিধা ঘটে (বিশেষতঃ রোগীর) এবং তাহাতে রোগ বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক।]

শরীর রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। যে খাদ্য সহজে হজম হয়, যাহা স্নিগ্ধ এবং পুষ্টিকর, তাহাই শরীর রক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী খাদ্য। প্রত্যেক মানুষেরই ইহা লক্ষ্য রাখিয়া খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এদিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবল লালসার বশবর্ত্তী হইয়াই খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষের বিচার-বুদ্ধি সহজে এই লালসার হাত এড়াইয়া চলিতে পারে না; এজন্য যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াও অনেক সময় শরীর রীতিমত পুষ্ট হয়, না বরং শরীরে নানা ব্যাধি জন্মিয়া উহাকে শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংসমুখে লইয়া যায়।

পাকস্থলীর বিকৃতি ঘটিয়াই অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং লালসা-পরবশ হইয়া নির্বিচারে খাদ্য গ্রহণ করিলেই পাকস্থলীর বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে মানুষ অপেক্ষা মনুষ্যেতর প্রাণীদিগকেই এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। তাহারা প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া চলে, এজন্য তাহাদের মধ্যে মানুষ অপেক্ষা ব্যাধিপীড়া অনেক কম হয়। তাহারা ক্ষুধা না পাইলে খাদ্য-দ্রব্য সম্মুখে থাকিলেও লালসার বশবর্ত্তী হইয়া তাহা সাধারণতঃ গ্রহণ করে না, বা যে খাদ্য তাহাদের ধাতস্থ নয়, তাহাও তাহারা খায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। ক্ষুধা না থাকিলেও লোভনীয় খাদ্য-দ্রব্য সম্মুখে পাইলে মানুষ সহজে তাহা ছাড়ে না, এমন কি পীড়িত অবস্থায় যে খাদ্য বিষক্রিয়ার কাজ করিতে পারে, অসুখ লইয়া সেরূপ খাদ্যও লোভে পড়িয়া কেহ কেহ খাইয়া থাকে; মনুষ্যেতর প্রাণী কিন্তু তাহা করে না। আর যাহা তাহার ধাতস্থ নয়, এরূপ খাদ্যও মানুষ অনেক সময় গ্রহণ করিয়া থাকে। আর ধাতস্থ নহে বা তাহার পক্ষে অখাদ্য—এরূপ খাদ্যই বা মানুষের নিকট কি আছে? তাহাকে একরূপ সর্ব্বভুক্ বলিলেই চলে!

বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা ক্রমশঃই জটিল হইয়া উঠিতেছে। ইহা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা এই সম্বন্ধে আজ এখানে কিছু আলোচনা করিব। বাঙ্গালীর খাদ্য-দ্রব্য দিন দিনই মহার্ঘ, দুষ্প্রাপ্য ও ভেজাল-মিশ্রিত হইতে চলিয়াছে। ধনীদের কথা ততটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে না হইলেও, যাহারা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ বিপদের কথা হইয়াছে, বিশেষতঃ যাহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র-লোক, তাহাদের পক্ষে ইহা জীবন-মরণ-সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালীর খাদ্য প্রধানতঃ চাউল, ডাল, মাছ, তরী, তরকারী ও দুধ-ঘি ইত্যাদি। ইহার মধ্যে চালই প্রধান খাদ্য; কিন্তু তাহার দর ক্রমেই বাড়িতেছে।

চাউলের মধ্যে কোন কিছু ভেজাল দিবার তেমন সুবিধা নাই বটে, কিন্তু আর এক উপসর্গ জুটিয়া ইহাকে ভেজাল-দুষ্ট বস্তু অপেক্ষাও অসার করিয়া দিতেছে। আজকাল কলে চাউল ছাটাই হইতেছে এবং এই কলে-ছাটা চাউল হইতেছে ভদ্রলোকদের ভদ্রতাসম্মত খাদ্য। আছাটা চাউল বা মোটা চাউল (coarse ric) ভদ্র-সমাজে ক্রমেই অচল হইয়া আসিতেছে। উহা এখন ইতর সাধারণ বা ছোটলোকের খাদ্য। আর যাহাদিগকে ইতর সাধারণ বলা হয়, তাহারাও এখন ভদ্রলোকদের দেখাদেখি এই কলেছাটা চাউলের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে। এদিকে গো-রক্ষা ও গোপালনের দিকে লোকের ঝোঁক নাই, গোবংশ ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দুধ ঘি দিন দিন মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে;

যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহাও নানারূপ ভেজাল দ্বারা দূষিত হইয়া অখাদ্যে পরিণত হইতেছে। বাংলার খাল বিল নদ নদী সব ক্রমশঃ মজিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার ফলস্বরূপ মাছও ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। কাজেই এখন চাউলই বাঙ্গালীর শুধু প্রধান খাদ্য নয়—একমাত্র খাদ্য হইয়া পড়িতেছে, আর তাহাও কলে ছাটাই হওয়াতে উহার সারাংশ বাহির হইয়া যাইতেছে। কেবল শুভ্র স্বচ্ছ অসার অংশ যাহা রহিয়া যাইতেছে, তাহাই হইতেছে বাঙ্গালীর প্রধান ও একমাত্র খাদ্য। ইহা খাইয়া বাঙ্গালীর জীবনশক্তি কি করিয়া বৃদ্ধি পাইবে? বৃদ্ধি পাওয়া ত দূরের কথা, উহা দিন দিন হ্রাস পাইতে চলিয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালীর দেহে রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতার অভাবহেতু নানা ব্যাধি-পীড়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছে।

চাউলের উপর যে একটা লাল আবরণী (coating) থাকে, উহাই চাউলের vitamin, protein ও phosphate মিশ্রিত সারাংশ। চাউলকে ভদ্রসমাজে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য এই দৃষ্টিকটু অংশ কলে ছাটিয়া ফেলিয়া উহাকে মারিয়া খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা refine করা হয়। চাউলে সার পদার্থ কিছু থাকুক বা না থাকুক, সেদিকে দেখিবার দরকার নাই, উহা খুব পরিষ্কার হইলেই ভদ্রলোকের উপযোগী হইল! চাউল যত বেশী পরিষ্কার হইবে, যত বেশী সারাংশ-বর্জ্জিত হইবে, উহা তত অধিক ভদ্র-উপযোগী ও তত অধিক মূল্যবান বিবেচিত হইবে! যিনি যত অধিক এইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাউল ব্যবহার করিবেন, তিনি তত অধিক 'বড় মানুষ' বলিয়া সমাজে পরিচিত!

ভদ্রলোকেরা ভাতের ফেন ফেলিয়া দেয়, ইতর সাধারণের মধ্যেও অনেকেই তাহাই করে। ফেনের সঙ্গে ভাতের অবশিষ্ট সারাংশটুকু একরূপ নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়। যাহাদের ভাতই প্রধান খাদ্য, তাহাদের পক্ষে ফেন ফেলিয়া দেওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। পরিমাণ করিয়া জল দিয়া ভাত রাঁধিতে পারিলে ফেন ভাতের সঙ্গেই মাখিয়া যাইতে পারে, ভাতও ঝর্‌ঝরা হইতে পারে। যাঁহারা ধনীলোক, তাহারা ইচ্ছামত সরু ও মিহি চাউল ব্যবহার করুন; কিন্তু তাঁহাদের দেখাদেখি ভদ্র-সাধারণ ও ইতর-সাধারণের ওরূপ করা উচিত নয়। ধনীলোক দুধ-ঘি-মাছ-মাংস ইত্যাদি দ্বারাও শরীর পোষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন; কিন্তু যাহাদের চাউলই একমাত্র প্রধান খাদ্য, তাহাদের পক্ষে এই কলে-ছাটা চাউল, তদুপরি ফেন্ গালা ভাত শরীর-পোষণের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নহে, বরং মারাত্মক অমঙ্গলের কারণ। সুতরাং চাউলের মধ্যে যতটা সারাংশ পাওয়া যায়, তাহার বিন্দুমাত্রও নষ্ট না করিয়া চাউল গ্রহণ করা উচিত; নতুবা জীবন-সংগ্রামে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য।

তথাকথিত ভদ্রলোকগণ! এখন হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করুন, মিহা ভদ্রতার মোহে পড়িয়া সারাংশ-বর্জ্জিত কেবল পরিষ্কার বা refineএর দিকে যাইবেন না। মিহি চাউলের ভিতর সার বস্তু কিছু নাই—যাহা জীবনীশক্তি প্রদান করিবে। জীবনীশক্তিবিহীন ভদ্রতার মূল্য কি? কলেছাটা চাউল ত্যাগ করিয়া আছাটা চাউল ব্যবহার করিতে অভ্যাস করুন। মোটা হইলেও, coarse হইলেও, তাহাতে vitamin ও সার পদার্থ আছে—যাহা দ্বারা জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ভাতের ফেন ছোট লোকের খাদ্য নহে, ফেনশুদ্ধ ভাত খাইতে আরম্ভ করুন। ফেনশুদ্ধ ভাত খুব পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক। মোটা চাউলের ফেনশুদ্ধ ভাতে খরচও অনেক কম পড়ে, অথচ পুষ্টিকর বস্তুও অনেক গুণে বেশী পাওয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও যাহারা কলেছাটা সরু চাউলের পক্ষপাতী হইবেন, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিতে পারেন; কিন্তু বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলিয়া তাহাদিগকে আখ্যাত করা যায় না।

কলিকাতা অঞ্চলে বেরি-বেরি রোগের প্রাদুর্ভাবের পর হইতে চিকিৎসকগণ সকলেই মোটা চাউল খাইবার ব্যবস্থা দিতেছেন। কারণ মোটা চাউলে ভিটামিন অনেক বেশী থাকে এবং ভিটামিন শরীরে বেশী থাকিলে বেরি-বেরি বা অন্যান্য অপুষ্টিজনিত রোগের জীবাণু শরীরে

সহজে কোন ক্রিয়া করিতে পারে না; উহা অনেক রকম ব্যায়রামের প্রতিষেধক। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়, তথাকথিত ভদ্রতা আমাদের এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, আমাদের refined test বা শুধু অসার বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতি আসক্তি কিছুতেই যাইতে চাহে না। ঘরে খাবার নাই, অথচ বাইরে বড়মানুষী 'চাল'—এই আমাদের ভদ্রতার মাপকাঠী। শুধু খাদ্যে নয়, পোষাক-পরিচ্ছদে, আচারে ব্যবহারেও আমাদের এই অবস্থা। তাই স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, "ভদ্রতার নাম এখন শুভ্র মিথ্যা কথা। সত্যকে আমরা শুভ্র মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে চাই।"

কলেছাটা চাউলের দিন দিন এত কাট্‌তী হইতেছে যে, চাউল ছাটাই করিবার কলের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। সুদূর পল্লী অঞ্চলেও এই কল বসান হইতেছে। পল্লী অঞ্চলে হাজার হাজার দরিদ্র লোক হাতে চাউল তৈরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল; কিন্তু কলের সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করায় ইহাদের জীবিকা অর্জ্জনের পথ নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এই দুর্দ্দিনে আবার নূতন করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের পথ তৈরী করিয়া লওয়া খুব সুসাধ্য নহে। দেশের লোক সকলেই যদি কলে-ছাটা চাউল ব্যবহার না করিয়া পূর্ব্বের মত হাতে-ছাটা চাউল ব্যবহার করিতে পুনরায় আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সব দিক দিয়াই মঙ্গল। একদিকে যেমন পুষ্টিকর চাউল দ্বারা জাতীয় জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, অপর দিকে এই সব দরিদ্র লোকদিগকে বেকার অবস্থায় পড়িয়া অসীম দুর্দ্দশা ভোগ করিবার হাত হইতে বা একরূপ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার কাজ হইবে।

চাউল আমাদের প্রধান ও বর্ত্তমানে একমাত্র খাদ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে; সেজন্যই চাউল সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লিখিলাম। চাউল সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, ময়দা, চিনি, লবণ ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ধান কিনিয়া ঘরে সিদ্ধ করিয়া নিজ হাতে চাউল তৈরী করিয়া লইতে পারিলে ব্যয় অনেক কম পড়ে এবং জিনিষও ভাল পাওয়া যায়। আমাদের refined testএর দরুণ আমরা আটার চেয়ে ময়দার, গুড়ের চেয়ে চিনির অধিক পক্ষপাতী। কলের ময়দার কাট্‌তি খুব বেশী, এজন্য ময়দার কলও অনেক হইতেছে, আটাও আজকাল কলে তৈরী হইতেছে; ময়দা ও আটা দুয়েতেই নানারূপ ভেজালও চলিতেছে। রোলার সাদা ময়দাতে সারবস্তু অনেক বাহির হইয়া যায়; কলের আটার অবস্থাও কতকটা সেইরূপ, আর নানারূপ ভেজাল মিশ্রিত, আর উহা সব সময় টাটকা পাওয়া যায় না। এজন্য যাহারা আটা ব্যবহার করিবেন, তাহারা যেন বাড়ীতে গম পিষিয়া আটা তৈরী করিয়া লন, গমের খোসা যেন ফেলিয়া না দেন; কেন না খোসার মধ্যেই সার ভাগ বেশী থাকে। ময়দা ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। আজকাল ভদ্রলোকের ঘরে পুরুষদের মধ্যে ত আছেই, মেয়েদের মধ্যেও অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ইহারা যদি ঘরে নিজ হাতে ধান সিদ্ধ করিয়া চাউল তৈরী করিয়া লন বা গম পিষিয়া আটা তৈরী করিয়া লন, তাহা হইলে শরীরও ভাল থাকিবে এবং টাট্‌কা ভেজালবিহীন পুষ্টিকর খাদ্যও ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমরা এমন কর্ম্মকুণ্ঠ হইয়া পড়িতেছি যে, এতটুকু পরিশ্রম বা খাটুনীর ভয়ে ঘরের ভালো জিনিষ ফেলিয়া অনায়াস-লভ্য বাজারের দূষিত জিনিষ গ্রহণ করিতেই অভ্যস্ত হইয়াছি। এখনও পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েরা নিত্য বাড়ীতে গম পিষিয়া আটা তৈয়ারী করিয়া লয়। সময় বিশেষে পুরুষেরাও করিয়া থাকে। সে দেশের পুরুষ-মেয়ে সকলেই আমাদের মত শ্রম-কাতর বা কর্ম্মকুণ্ঠ নহে, এজন্য তাহাদের শরীরও আমাদের অপেক্ষা অনেক সুস্থ, সুঠাম ও সবল। চিনি অপেক্ষা গুড় ব্যবহার করা ভাল। চিনিতেও সার ভাগ কম ও নানারূপ ভেজাল থাকে। লবণও যত কম refine হয় তত ভাল। Refine-করা লবণের সঙ্গেও আজকাল খুব ভেজাল চলিয়াছে। সৈন্ধব লবণ, অভাবপক্ষে কর্কচ লবণ ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত।

তারপর ঘি, দুধ ও মাছ মাংস সম্বন্ধে কিছু বলিতে

চাই। ঘি, দুধ, মাছ ইত্যাদিও বাঙ্গালীর নিত্যকার খাদ্য ; ইহাও দিন দিন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইতেছে। পাড়াগাঁয়ে দুধ-ঘি আগে বিশুদ্ধ ও সস্তা পাওয়া যাইত ; আজকাল সেখানেও ঘি-দুধে নানারূপ ভেজাল মিশ্রিত হইতেছে, দামও বাড়িয়া চলিয়াছে। ঘি, দুধ খুব উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। যাহাতে ইহা সুলভে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে এবং ভেজাল মিশ্রিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য গোরক্ষা ও গোপালনের দিকে উদ্যোগী হইতে হইবে। একদিকে মানুষের খোরাক যোগাইতে কসাইয়ের হাতে ও অপরদিকে মড়ক লাগিয়া যমের হাতে গো-বংশ ক্রমে ধ্বংস পাইতেছে। যাহারা গো-খাদক, তাহারা একটু বিচার বুদ্ধির সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, গোমাংস অপেক্ষা গো-জাত ঘি-দুধ ও তজ্জাত খাদ্যাদি সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও অধিক প্রয়োজনীয়। আর চাষ-আবাদের জন্যও গোবংশ রক্ষা করা দরকার। যাহাতে গোজাতির মধ্যে মড়ক (epidemic) না লাগিতে পারে বা মড়ক লাগামাত্রই তাহা দূর করা যায়, পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে। অবশ্য আজকাল গোরক্ষা ও গোপালনের দিকে কেহ কেহ নজর দিতেছেন, ইহা খুব ভাল কথা। অনেক বিচক্ষণ মুসলমানও উল্লিখিত কারণে গরু খাওয়ার পক্ষপাতী নহেন।

গো-রক্ষা ও গো-পালনের সহিত কৃষিকার্য্যের সংশ্রব রাখিলে খুব ভাল হয়। খড়, বিচালী, ঘাস ইত্যাদি গরুর খাদ্যাদি, যাহাদের কৃষিকার্য্য আছে, তাহারা অনায়াসে ও বিনা খরচায় জোগাইতে পারে ; আবার গোবর সাররূপে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারও করিতে পারে। যাহাদের কৃষিকার্য্য নাই, তাহাদিগকে গরুর খাদ্যাদি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া জোগাইতে হয়, অথচ তদনুরূপ কিছু লাভ হয় না, এজন্য তাহারা গোপালন করিতে চাহে না। পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ২।১টী করিয়া গরু থাকিত ; ইদানীং অনেকেই গরু ছাড়াইয়া দিতেছেন, বিশেষ ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা। গরুর রীতিমত খাদ্য জোগাইতে পারিলে এখনও যথেষ্ট ঘি-দুধ পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে গো-চারণের জন্য অনেক খোলা মাঠ ছিল, এখন তাহারও অভাব হইয়াছে ; সে সকল মাঠ এখন চাষী জমিতে পরিণত হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে পর্য্যন্ত গরুর ঘাস জোগান কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে।

পল্লীতে অনেক ভদ্র লোকের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় আজকাল বেকার অবস্থায় বসিয়া আছেন, অথবা ১টী ১০৲ টাকার চাকরীর প্রত্যাশায় ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহারা ত এই দিকে মনোযোগ দিতে পারেন। ইহারা যদি পাঁচজনে মিলিয়া সমবায় প্রণালীতে উন্নত উপায়ে বৈজ্ঞানিক মতে কৃষিকার্য্যের সহিত গোপালনাদি কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, তাহাহইলে ইঁহাদেরও সুবিধা, দেশেরও লাভ। ইহাতে চাকরী করার চেয়ে হাতে-নাতে কর্ম্ম করিয়া শরীর-মনও ভাল থাকিবে এবং সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যও অনেক বাড়িবে। যার যার সুবিধা ও সামর্থ্যানুসারে কিছু কিছু জমি লইয়া স্বতন্ত্রভাবেও কলের লাঙ্গল দ্বারা চাষ আবাদের কাজ করিতে পারেন, তাহাতে নানারূপ ফসল, তরী-তরকারী ও ফলাদি উৎপন্ন করিতে পারেন, কতকটা স্থানে গোপালনের ব্যবস্থা করিতে পারেন ; সুবিধা হইলে কতক স্থানে পুকুর কাটিয়া মাছের চাষও করিতে পারেন। ইহাতে নিজেরা সুলভে প্রচুর পরিমাণে ভেজালবিহীন বিশুদ্ধ খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া নিজেরাও খাইয়া পুষ্ট হইতে পারেন এবং বিক্রী করিয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে ও নিজেরা লাভবান হইতে পারেন। নিজের শ্রমসাধ্য কার্য্য করিলে শরীর ভাল থাকিবে, অগ্নিমান্দ্য ও বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া আর অকাল-বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতে হইবে না ; সহরে প্রলোভনে ও বিলাস-ব্যসনে ডুবিয়া মনও কলুষিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

যাহারা বিদ্যানুশীলনের পক্ষপাতী, তাহারা সেখানে বাংলা ফাসানে ২।১ খানা ঘর উঠাইয়া একটী লাইব্রেরী ও ক্লাব করিতে পারেন ; কিছু বাদ্যযন্ত্রও রাখিতে পারেন-

চিত্ত-বিনোদনের জন্য ; অবসর মত রুচি অনুসারে সেখানে বিদ্যানুশীলন বা সঙ্গীত-বিদ্যার চর্চ্চাও করিতে পারেন। ইহাতে জীবনটা একঘেয়ে বলিয়া বোধ হইবে না। তেমন হিতুয়ানীর বালাই না থাকিলে, সেখানে কতকস্থানে পাঠা, হাঁস, মুরগীর চাষও করিতে পারেন। ইহাতে বিস্তর লাভ। কতকস্থানে তুলার চাষ করিয়া ও তাঁত বসাইয়া কাপড় চোপড়ও নিজেরাই করিয়া লইতে পারেন। ইচ্ছা থাকিলে ও চেষ্টা থাকিলে ইহার সহিত কলের ঘানি, গম ভাঙার ছোট যন্ত্র প্রভৃতি আরও কত রকম লাভের কাজ জুড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। এ সব কাজ করিতে হইলে সহরাপেক্ষা পাড়াগাঁয়েই সব রকমে সুবিধা। দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যদি সহরের দিকে না ছুটিয়া, এইরূপ কাজ লইয়া পাড়াগাঁয়ের দিকে অগ্রসর হন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেবা-সমিতি স্থাপনাদি করিয়া পল্লীসংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তবে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় উপায়হীন শিক্ষাভিমানী যুবকগণেরও একটা কিনারা হয়। তাহারা কি এই সকল কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না—যাহাতে নিজেদের ও দেশের উভয়েরই কল্যাণ ?

আজকাল ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ইত্যাদি প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্রাহ্মণেতর সকল রকম জাতিই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সকলেরই মধ্যেই উপবীত গ্রহণের খুব আড়ম্বর চলিয়াছে এবং এজন্য নানারূপ উদ্যম, উৎসাহ, বক্তৃতা ও অর্থব্যয়ও হইতেছে। এমন কি কোথাও কোথাও এজন্য নানারূপ দলাদলি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্য্যন্ত চলিয়াছে। যাহারা উপনীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব-বৈশ্যত্বের দাবী করিতেছেন, তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব-বৈশ্যত্ব কি শুধু উপবীত নামধেয় একগাছা সূত্রের আবেষ্টনীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে ? বৈশ্যের শাস্ত্র ও সমাজ-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম—কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ; তাঁহারা এই সকল কর্ম্মে লাগিয়া যান না। গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি। শুধু উপবীতের উপর নির্ভর না করিয়া তাহারা গুণ এবং কর্ম্মের দ্বারা প্রতিপাদন করুন যে, তাঁহারা বৈশ্য ; তাহা হইলেই তাহা শাস্ত্রসম্মত, ন্যায়সম্মত ও লোকসম্মত হইবে। যাঁহারা উপবীতের জোরে ক্ষত্রিয়ত্বের জন্য দাবী করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও বলি যে, তাঁহারা আগে এই সকল কার্য্য করিয়া বৈশ্যত্বই প্রতিপাদন করুন, তারপর ক্ষত্রিয়ের পদবীতে উঠিবার দাবী করিবেন। ক্ষাত্রধর্ম্ম এখন বৈশ্য-বণিক ইংরাজ জাতির করতলগত। শুধু উপবীত গ্রহণের দ্বারা তাহা অর্জ্জিত হইবার নহে।

এখন মাছের কথা বলিব। এ দেশের নদ-নদী খাল-বিল ক্রমশঃ মজিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে ; এজন্য মাছও ক্রমে দুর্ম্মূল্য দুষ্প্রাপ্য হইতেছে ! অথচ মাছও বাঙ্গালীর নিত্য নৈমিত্তিক খাদ্য। এক টুক্‌রা মাছ ও মাছের ঝোল দিয়া বাঙ্গালী এক রাশ ভাত অনায়াসে উদরস্থ করিতে পারে। রেল কোম্পানীর কৃপাতেও অনেক নদ নদীর দুর্গতি হইয়াছে। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নদী—রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশা ভীমকায়া ভীষণা পদ্মা, তিনিও সাড়া-সেতুর কল্যাণে হীনতেজা ও ক্ষীণকায়া হইয়া পড়িয়াছেন। দেশব্যাপী রেলপথের বিস্তারের মধ্যে মধ্যে সহজ ও সরলগতিতে জল নিকাশের পথ সব বন্ধ হওয়ায় দেশের স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ খারাপ হইতে চলিয়াছে। একদিকে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, অন্য দিকে দেশ হইতে দেশান্তরে নানা উৎপন্ন দ্রব্যাদির সহিত অসংখ্য রোগ-বীজাণুর আমদানী-রপ্তানী ! অথচ যুগ-প্রয়োজনে রেলপথের আবশ্যকতা সুবিধাটাকেও বাদ দিবার উপায় নাই। কাজেই দেশের পক্ষে এখন বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার বিষয় হইয়াছে, কি উপায়ে এই সব নদ নদী খাল বিল দিন দিন মজিয়া না যাইয়া বেশ সচল ও সবল থাকিতে পারে। রেল পথ বিস্তারের গতি রোধ করা যখন অসম্ভব, তখন তাহার স্থায়ীত্ব ও গতি-পথের মধ্য দিয়াই যথাসম্ভব আমাদিগকে এসব বিষয়ে সুবিধা করিয়া লইতে হইবে এবং যাহাতে অন্যান্য উপায়েও নদ নদী খাল বিল সবল ও সচল রাখা যায়, তাহার চেষ্টা করিয়া মাছের অপ্রাচুর্য্য ও দুর্ম্মূল্যতা দূর করিতেই হইবে। মাছ ম্যালেরিয়ার বীজাণু-বাহক মশকের ভাবী বংশধরগণের কালান্তক যম ও বাঙ্গালীর

পরম হিতকারী অতি উপাদেয় মুখরোচক ভক্ষ্য ও বধ্য জীব। কাজেই মাছের প্রাচুর্য্য ও সুলভতার জন্যবাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্কের পরিচালন অপব্যয় নহে; বরং ইহাদের প্রাচুর্য্য ও সুলভতা থাকিলে বাঙ্গালী-মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা আরও বৃদ্ধি পাইবার আশা আছে।

আমরা বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে এখানে যাহা সামান্য আলোচনা করিলাম, আশা করি, দেশহিতকামীগণ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা আজ বাস্তবিকই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী কি খাইয়া জীবনী-শক্তি লাভ করিবে? কি খাইয়া সে আজ এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে লড়াই করিবে?

নারীর কর্ত্তব্য

[শ্রীমতী শ্যামমোহিনী দেবী।]

এদেশের অধিকাংশ মেয়েদের সাধারণ অবস্থা এই—পরিবারের অশ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে জন্ম, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-ভাবে শিক্ষাহীন বাল্যজীবন কাটানো, তারপর বিবাহ, ও তারপর আনুষাঙ্গিক সুখ, দুঃখ রোগ শোক ভোগ ও তারপর মৃত্যু। জীবনের মধ্যে সেই মামুলী গৃহকর্ম্ম ও সন্তান-পালন ছাড়া কোনো সময় কোন বৈচিত্র্য নেই, আনন্দ নেই; প্রতিপদে কেবল বাধা আর নিষেধ, অধিকার আর অনধিকারের সমস্যা। মানব-জীবন অবশ্য সুখ-দুঃখেই জড়িত; কিন্তু এদেশের মেয়েদের যে রোগ, শোক, দুঃখভোগ, তাহার অনেকটা তাদের প্রতি সামাজিক অত্যাচারের ফলে, এবং মেয়েরা সকল অত্যাচার নির্ব্বিচারে মানিয়া নিয়াছে বলিয়া।

মানুষের অর্থের অভাব থাকিতে পারে; কিন্তু ভগবানের সৃষ্ট এই বিশাল পৃথিবীতে কত সুন্দর সহজ-লভ্য বিচিত্র দৃশ্য ও কত আনন্দের খনি নিহিত আছে, তাঁহার উদার দান মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণে কত স্বচ্ছন্দতা, আরাম, আনন্দ ও স্বাস্থ্য লাভ হয়—মেয়েরা এসব থেকেই বঞ্চিত। বদ্ধগৃহে স্বাস্থ্য ও আনন্দহীন জীবন যাপনই এদেশের মেয়েদের অদৃষ্ট-লিপি। অথচ ভারতের বাহিরে সমস্ত সভ্য ও স্বাধীন দেশে এবং বাংলা দেশের বাহিরে এই ভারতেরই পঞ্জাব, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের মেয়েরা কিরূপ মুক্ত ও স্বাধীন-ভাবে জীবন যাপন করেন! অটুট স্বাস্থ্য ও বিমল আনন্দ তাঁহাদের জীবনকে সার্থক সুন্দর উপভোগ্য করিয়া তুলিতেছে। শিক্ষা দ্বারা যোগ্য হইয়া তাঁহারা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন এবং অবনতিকর কোনো প্রাচীন নিয়মই তাঁহারা ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না।

চির অবরোধের রাজ্য তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশের নারীরাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নারী-শক্তি জাগরিত না হইলে দেশের কল্যাণ নাই; তাই তাঁহারা অবরোধ-প্রথা ত্যাগ করিয়া নারীকে দেশের সর্ব্ব প্রকার কল্যাণ-কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিতে দিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশের মেয়েদের শক্তি-বিকাশের কোনো বাধা না থাকাতে তাঁহারা পুরুষের সহিত এক যোগে সকল দিক দিয়া সকল ক্ষেত্রে দেশকে ও জাতিকে উন্নত করিতে পারিতেছেন। আজকাল কেহই নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে চাহে না; যাহার যতটুকু শক্তি আছে, তাহা সে বিকাশ করিতে চায়। এই বাংলাদেশের মেয়েরাই কি কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়া ও অনধিকারের অজুহাতে এই শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্য-হীন, আনন্দ ও গৌরবহীন জীবন যাপন করিবেন এবং দেশের অর্দ্ধেক শক্তির উৎস নিজেদের গৃহ কোণে আবদ্ধ রাখিয়া, দেশহিতকর কোনো কল্যাণ-কর্ম্মে উৎসারিত হইতে না দিয়া, দেশকে ও জাতিকে দিন দিন অবনতির নিম্নতর স্তরে নীত করিবেন? গৃহ কর্ম্ম

ও সন্তান-পালন করিতে হইবে বলিয়াই কি অবসর সময়েও জগতের কোনো দিকে মন দিবেন না?

প্রত্যেক উন্নত ও স্বাধীন দেশের মেয়েরা অতি উৎকৃষ্ট ভাবে সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন করিয়াও দেশ ও দশের হিতকর কত কাজ করিয়া থাকেন। যে অবরোধ এদেশের নারী জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ, এই অবরোধ এবং তজ্জনিত অবনতি চিরন্তন কাল হইতে এ দেশে ছিল না। অতি প্রাচীন কালের নারীগণের চরিত্র ও অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায়—গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, বিশ্ববারা, যমী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি রমণীগণ পিতা ভ্রাতা বা স্বামীর সহিত বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন, অথচ এখন বেদ-পাঠেও মেয়েদের অধিকার নাই। তারপর দেখা যায়, রাজর্ষি জনকের সভায় ব্রহ্মবাদিনী ঋষি-কন্যা গার্গী জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সমক্ষে তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিয়াছেন। সুলভা নাম্নী একজন মহিলারও জনকের সভায় শাস্ত্রীয় বিচারের বিষয় জানা যায়। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন দুই পত্নীকে ধন সম্পদ বিভাগ করিয়া দিয়া, ব্রহ্মো-পাসনার জন্য বন গমনে উদ্যত হইলেন, তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, এই ধন সম্পদের দ্বারা কি ব্রহ্মকে লাভ করা যায়? ঋষি বলিলেন, "না"। তখন মৈত্রেয়ী বলিয়া উঠিলেন, "যেনাহং নামৃতস্যাম, কিমহম তেন কুর্য্যাম" অর্থাৎ যাতে আমি অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিব না, তা দিয়ে আমি কি করিব!···তারপর তিনি সংসারের নশ্বরত্ব সম্বন্ধে অনেক তর্ক করিয়া তাঁহার সহিত বনে গিয়া তপস্যা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ইহাতেও কি বুঝা যায় না যে, তখন অবরোধ-প্রথা ও স্ত্রীদিগের এ মূর্খান্ধ্যতা আদৌ ছিল না এবং বিদ্যা-লাভের জন্য নারীরাও বহু আয়াস স্বীকার করিতেন। তারপর মহাভারতের যুগেও মেয়েদের বিদ্যাবুদ্ধির বহু নিদর্শন তো পাওয়া যায়ই, তাহা ছাড়া সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর অদ্ভুত সাহস ও অস্ত্র-চালনার বিষয়ও পুরাণে পাই। তার পরে জ্যোতিষশাস্ত্রে খনার ও অঙ্কশাস্ত্রে লীলাবতীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের সময়েও দেখি শঙ্কর ও মণ্ডনমিশ্রের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্কের সভায় মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতী মধ্যস্থ হওয়ার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সে সময়ে অবরোধ প্রথা না থাকার ইহাও এক প্রমাণ।

ইহারও পরে ভারতে মুসলমান রাজত্বের সময়ে চাঁদ-সুলতানা রাণী দুর্গাবতী প্রভৃতি রমণীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম বীরত্বের সহিত দেশ রক্ষা করিতেছেন দেখিতে পাই। আলতামস কন্যা রিজিয়াও হয়তো ঐ প্রথা থাকিলে সাম্রাজ্ঞী হইতে পারিতেন না। এই সব কারণে মনে হয় অবরোধ-প্রথা বহু কালের নয়; অল্পদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে হয়তো সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়াছিল; ক্রমে ক্রমে মেয়েরা নিজেরাই সঙ্কুচিত হইয়া শম্বুকের ন্যায় গোপন অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছিল। ফলে পুরুষরা দেখিলেন যে, ইহাতে নিজেদের দিক দিয়া অনেক লাভ আছে। জ্ঞান বুদ্ধি না থাকিলে তার প্রতি যথেচ্ছা প্রভুত্ব খাটানো যায়, কাযেই ক্রমে ক্রমে বিধি-নিষেধের মাত্রাও বাড়িয়া চলিয়াছে; মেয়েরাও তাহা মানিয়া লইয়া বর্ত্তমান দুর্গতির অতল তলে নিমজ্জিত হইয়াছেন।

কিছুদিন হইল স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হওয়াতে—অতি অল্প সংখ্যক মেয়ে শিক্ষিত হইয়াছেন বটে; কিন্তু সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যার অনুপাতে মেয়েরা হাজার করা প্রায় ৫ জন মাত্র শিক্ষিতা। যে দেশের মেয়েরা শিক্ষায় এত নীচে পড়িয়া আছে, তাহাদের দ্বারা কোন মঙ্গল কাজ হওয়া সম্ভব? একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "কোন দেশ কত উন্নত সে দেশের মেয়েদের অবস্থাই তাহার প্রমাণ।" এই দেশের অবনতির মূলেও মেয়েদের এই দুরবস্থা। কিন্তু এই অবস্থা, এ দীনতা-হীনতা চিরদিন অব্যাহত থাকিলে চলিবে না; মেয়েদের ত্যক্ত ও হৃত অধিকার আবার নিজেদের উদ্যমে অর্জ্জন করিতে হইবে। শিক্ষিতা মেয়ের (বিশেষভাবে উদরচেতা কুসংস্কার-নির্ম্মুক্ত বিধবারা) সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করুন—সমস্ত কুপ্রথা দূর হইবে, আবার এদেশের মেয়েরা স্বাস্থ্যে-ধর্ম্মে, জ্ঞানে-কর্ম্মে উন্নত হইয়া, নিজেদের ও জাতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইবে।

মুষ্টিযোগের ঝুলি

। শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র-সংগৃহীত।।

আগুনে পোড়ার প্রতিকার—

সামান্য পরিমাণ তিল তৈলের সহিত খানিকটা চুণের জল বেশ করিয়া মিশাইয়া একটী শিশিতে ভাল করিয়া রাখিয়া দিবেন। হঠাৎ দেহের কোন স্থান আগুণে বা গরম জলে পুড়িয়া যাইলে, তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে খানিকটা ইহা মালিস করিয়া (মালিসের অসুবিধায় কেবল ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া লাগাইয়া) দিলেই সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হইবে এবং ফোস্‌কা পড়িবে না।

অর্শের প্রতিকার—

পদ্মপাতা ছাওয়াতে (কোনরূপ উত্তাপে নহে) শুকাইয়া লইয়া, তাহা প্রদীপের শিখে ধরিয়া পুড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিবেন। পরে ঐ ছাই ভাল করিয়া চূর্ণ করিয়া, অল্প জলে গুলিয়া মলমের ন্যায় অর্শের উপর দিনে ৩।৪ বার প্রয়োগ করিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইবে ও অর্শের উপশম হইবে। পরীক্ষিত।

পুকুর পাড়ে কাঁকড়া যে মাটী তুলিয়া রাখে, সেই মাটী অল্প জলে গুলিয়া মলমের ন্যায় অর্শের উপর প্রয়োগ করিলে প্রভূত উপকার দর্শে।

উদ্ধক শ্লেষ্মার অমোঘ মহৌষধ—

অল্প পরিমাণ "কায়ফল" (এক পয়সায় যতটা বেনের দোকানে পাওয়া যায়) উত্তমরূপে হামান্‌দিস্তায় গুড়া করিয়া এক টুকরা পরিষ্কার নেকড়ায় তাহা ছাঁকিয়া লইবেন, পরে সেই চূর্ণ নস্যের ন্যায় দিনে তিন অথবা চার বার গ্রহণ করিলে, উদ্ধশ্লেষ্মার যেরূপ যন্ত্রনা হউক না কেন, একদিনের মধ্যে কম পড়িবে এবং দুই তিন দিনের মধ্যে তাহা সারিয়া যাইবে। পরীক্ষিত।

আমাশয়ের ঔষধ—

কোন পাথর বা চীনামাটীর পাত্রে এক আউন্স Vinum Galicii এর সহিত চায়ের চামচের তিন চামচ দোবরা চিনি বেশ করিয়া ফেটাইয়া লইয়া উহার উপর একটী দিয়াশালাই জ্বালাইয়া ধরিলেই উহা জ্বলিতে থাকিবে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, এইটুকু প্রত্যেকবার আহারের পর খাইলে যেরূপ আমাশা হউক না কেন তিন চারদিনের মধ্যে তাহা সারিয়া যাইবে। পরীক্ষিত।

ক্ষীরুই গাছের খুব ছোট এক ইঞ্চিটাক্ লম্বা শিকড় ২৷৷০ টা গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাইলে সেই দিনই রক্ত আমাশা সারিবে।

বরাস-ফুল (Rhododendron) তিনটী একটু মিছরির সহিত বাটিয়া প্রাতে খালি পেটে খাইলে তিন দিনে রক্ত আমাশা সারে। নূতন রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

চায়ের চামচের দুই চামচ আন্দাজ ভাল গব্য ঘৃতে এক মটর আন্দাজ ভাল হিং ভাজিয়া লইবেন। হিং লালচে হইয়া যাইলেই উহা ঠিক ভাজা হইয়াছে জানিবেন, তখন হিংটি ফেলিয়া দিয়া, ঐ ঘৃত অল্প ঠাণ্ডা হইলে প্রাতে খালিপেটে সেবন করিলে সাত দিনে নূতন বা পুরাতন রক্ত আমাশা সারিয়া যায়। পুরাতন রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। শিশুদের এক চতুর্থ অর্দ্ধ মাত্রা। পরীক্ষিত।

হাতীশুঁড়োর গাছের মূল শিকড়ের ছাল অর্দ্ধ হইতে এক তোলা আন্দাজ লইয়া জিরা ভিজান জলের সহিত বাটিয়া প্রাতে খালি-পেটে খাইলে যে প্রকারের আমাশা হউক না কেন, তাহা দুই একদিনের মধ্যে সারিয়া যাইবে। আফুলা গাছ হওয়া চাই অর্থাৎ যে গাছে শিষ বাহির হয় নাই—এরূপ গাছ। পরীক্ষিত।

দমকা বাহ্যের ঔষধ ঃ—

পানের বোঁটা একটি, ছোট পেঁয়াজ একটি ও এক টুক্‌রা মিছরি রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে খালি পেটে সেই জল তিন চারিদিন খাইলে দমকা বাহ্যে নিরাময় হয়।

হাজার ঔষধ ঃ—

সম পরিমাণ খয়ের (পাণে যাহা ব্যবহার হয়) ও চা-খড়ি গুঁড়া করিয়া অল্প জলে গুলিয়া হাজাযুক্ত স্থানে দুই তিনবার দিলে যে প্রকারের হাজা হউক না কেন তাহা সারিয়া যাইবে।

বটগাছের সরুডালে ফুলের মত যে একটী পদার্থ থাকে—তাহা ভাঙ্গিলেই সে আটা বা দুধ বাহির হয়, সেই দুধ হাজাস্থানে দিলে যতদিনের হাজা হউক না কেন, তাহা সারিয়া যাইবে।

মেচেতা, ব্রণ প্রভৃতি দাগ উঠাইবার উপায় ঃ—

গাভী দুহিবার সময় দুধের যে ফেনা উঠে, সেই ফেণা ৪।৫ দিন মাখিলে সমস্ত দাগ উঠিয়া যায়।

খোস পাঁচড়ার ঔষধ ঃ—

তামাক খাইয়া যে গুল ফেলিয়া দেওয়া হয় সেই গুল ও তাহার সহিত সমপরিমাণ গন্ধক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইবেন, পরে সেই চূর্ণ একটী পাথর বাটিতে কিঞ্চিৎ নারিকেল তৈলের সহিত ফেটাইয়া যে মলম তৈয়ার হইবে তাহা রৌদ্রে গরম করিয়া প্রত্যহ প্রয়োগ করিলে, দুই চার দিনে সমস্ত ক্ষত আরোগ্য হইবে। পরীক্ষিত।

গরলের ঔষধ ঃ—

নিম ও আয়াপানের পাতা সমপরিমাণে হলুদের রসে বাটিয়া গরলের উপর প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া লাগাইলে তিন দিনে গরল সারিয়া যায়। পরীক্ষিত।

বাধকের ঔষধ ঃ—

শতমূলীর শিকড় অর্দ্ধ তোলা, ১ তোলা মিশ্রির সহিত ঋতুর তিন দিন প্রাতে সেবন করিলে বাধক সারিয়া যায়।

প্লীহার মহৌষধ ঃ—

গোঁড়া নেবুর রস অর্দ্ধসের, বিটলবণ ১ ছটাক ও রসুনের রস ২ ছটাক একত্র করিয়া একটী বোতলে ভরিয়া ছিপি আঁটিয়া ১০।১৫ দিন রৌদ্রে রাখিয়া দিবেন ; পরে উহা অর্দ্ধছটাক আন্দাজ প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে সেবন করিলে সাতদিনে প্লীহা সারিয়া যায়। পরীক্ষিত।

শিশু-পালনের কয়টি 'না'।

(১) শিশু কাঁদ্‌লেই ক্ষিদে পেয়েছে ভেবে দুধ খাইও না।
(২) ভরা গ্রীষ্মকালে শিশুকে স্তন্য ছাড়িয়ো না।
(৩) শিশুর ঠোঁটের উপর কখনো চুমো খেয়ো না, অপরকে খেতে দিও না।
(৪) রবারের বা কাঠের চুষি শিশুর হাতে সর্বদা রেখো না।
(৫) দরজা-জানালা-বদ্ধ ঘরে শিশুকে দিনে রাতে কোনে সময়ই ঘুম পাড়িয়ো না।
(৬) শিশুকে দোলায় শুইয়ো না বা শূন্যে উঁচু করে' তুলে ঝাঁকিও না।
(৭) অন্ততঃ দু'বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে খাঁটি দুধ মোটে খাইয়ো না।
(৮) শিশুকে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ ক'রো না, বা কাতুকুতু দিয়ো হাসিয়ো না।

গিল্-ঢিল্-পিল্-বিল্-কিল্ !

(নক্সা)

। ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম্, বি ।

(১)

"ওকি হে ? খাচ্চ না ত, একেবারে যে টপ্ টপ্ করে গিলচ !"

বাঁকুড়ার বিরাট-বপু জমিদারবাবু সদ্যাগত প্রতিবেশী বন্ধুর এই উক্তি শুনিয়া গর্ব্বানন্দ-দীপ্ত চক্ষে অর্দ্ধরুদ্ধ-কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, (ভোজন বা গলাধঃকরণ সমানভাবেই চলিতে লাগিল)— "গিলব না ? দেখ্চ কি ? নবীন ময়রার স্পঞ্জ রসগোল্লা, ভীমনাগ ও তস্য ভ্রাতার ডিম ও চপ সন্দেশ, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, জনাইয়ের মনোহরা, কৃষ্ণ নগরের সরভাজা, ঢাকাই পরটা, মজিলপুরের মোয়া, ফরমাশ-দেওয়া এতগুলি উপাদেয় দ্রব্যের একত্র সমাবেশ! গিলব না ত কি গ্লাড্ষ্টোনের মত প্রত্যেক গ্রাস ৩২ বার করে চিবিয়ে—গরুর মতন জাবর কেটে খাব ? ভ্যালা মোর ভাই রে !···ওরে ভজা ! মুখুয্যেকে এক থালা এনে দে।"

"না ভাই থাক্। অম্বল রোগী। এ সব খেলে ব্রাহ্মণী সদ্যই বিধবা হবে। তুই গিল্, আমি দেখি।"

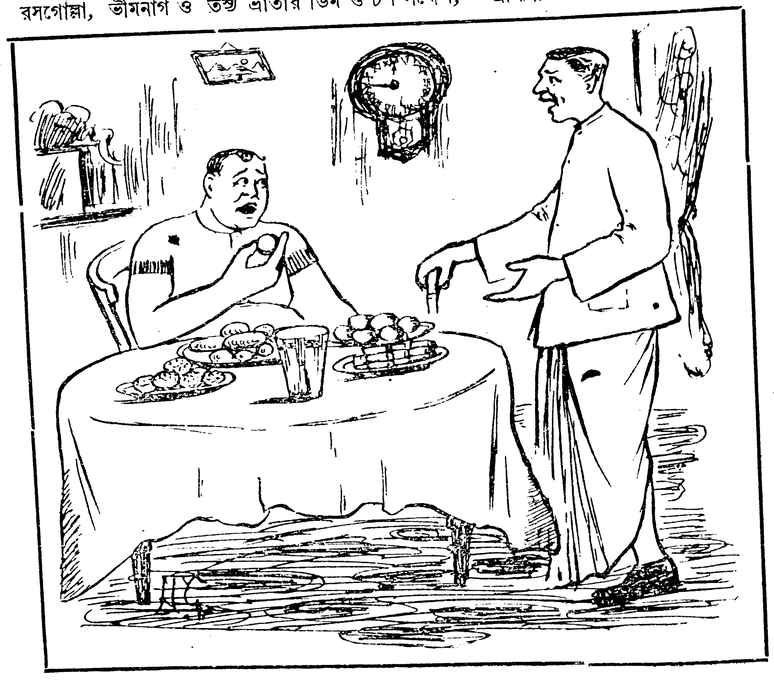

প্রথম দৃশ্য—
'গিল্' !

(২)

"ওহে, এ কি ব্যাপার ?"

'তুই বলে গেলি গিল্, গিলে আমার অম্নি পশ্চাদ্দেশ ঢিল্ !'

রাক্ষসের মতন এক থালা মিষ্টদ্রব্য গিলিয়া জমিদার ক্ষিতীশচন্দ্র দেবরায়ের মুখ ও মলদ্বার দিয়া নরক-রাজ্যের গঙ্গা-যমুনা বহিতেছে

চাকরেরা অস্থির ; ক্রমাগত কাপড় বদলাইতেছে। সেই ময়লা কাপড় পুকুরে কাচিতেছে। সেই পুকুরের জল পাড়ার ঘরে ঘরে পান-পাত্র পূর্ণ করিতেছে। বিছানায় যে মাছি বসিতেছে, সেই মাছি খাবারে বসিয়া রোগ ছড়াইতেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—
'ঢিল্' !

(৩)

কবিরাজে কবিরাজে ছয়লাপ। জমিদার আয়ুর্বেদের পক্ষপাতী। বাত-পিত্ত-কফ সম্বন্ধে অনেক বাগ্-বিতণ্ডার পর বড়ির ব্যবস্থা হইল।

জমিদারের আয়ুবল ছিল, আর নবীনা জমিদার-গৃহিনীর এয়তির জোর ছিল; জমিদারের ঢিল কাছা আঁট হইয়া গেল।

বন্ধুবান্ধব আসিয়া কবিরাজদের কেরামতির অশেষ প্রশংসা করিলেন, আর বিশেষ প্রশংসা করিলেন তাঁহাদের নূতন কবিরাজী পিলের। মাড়িয়া খাইতে হয় না, জলের সঙ্গে আস্ত গিলিয়া খাইতে হয়।

(৪)

কয়েক দিন পরে কবিরাজদের বিল্ দেখিয়া কিন্তু জমিদারের চক্ষুস্থির—মাথায় হাত দিয়ে বসিয়া পড়িলেন, বাপ্‌রে এক হাজার টাকা !

'তা হবে না ত কি ? আমরা কি, রাজা-বাহাদুর, সেই সেকেলে টীকিপুচ্ছধারী কবিরাজ ? আমরা প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংমিশ্রণের পক্ষপাতী। এখনও এক দল ছাতাপড়া ভণ্ড তপস্বী আছেন, যাঁরা মুখে বলেন—এক-মাত্র পুরাতন প্রথাই ভারতের ধাতের সর্বতঃ উপযোগী ; কিন্তু কার্য্যতঃ কুইনাইন্, পটাস্ আয়োডাইড্, ইপিকাক্, নক্স্ ভমিকা প্রভৃতি নামান্তর ও প্রকারান্তের ক'রে দিব্য চালিয়ে দেন। আমরা যখন যেটা ভাল বুঝি, তাই ব্যবহার করি এবং অকপটে স্বীকার করি।

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ ॥"

আমাদের মুনি-ঋষিরা বহুকাল পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার ব্যবস্থা করে' গিয়েছেন। কালে অনেক ওষধি লোপ পেয়ে যাবে, আয়ুর্বেদোক্ত অনেক পত্র-পুষ্প-ফল-মূলের আকার প্রকার ও নামের পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে; সেই সমস্ত ভেবে তাঁরা বলে' গিয়েছেন—যাতে রোগ সারে তাই যুক্ত ভৈষজ্য। এই মনে করুন, জার্ম্মাণ ভিষক যে মর্ফিয়া আবিষ্কার করেছিলেন, তদ্দ্বারা কত প্রাণীর উপকার হচ্চে, কত শূল বেদনা, কত জ্বালা-যন্ত্রনা-অনিদ্রা, কত উদরাময়ের উপশম হচ্চে। তাই সেই ভিষকের প্রপৌত্রের ভৈষজ্যাগারে প্রস্তুত দুর্লভ ঔষধ আনয়নপূর্ব্বক তাহাই হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, গন্ধমাদন প্রভৃতি গিরিশিখর হতে সংগৃহীত বহুমূল্য ভৈষজ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করে' রাজা বাহাদুরকে দেওয়া হয়েছে। কেবল ঔষধের মূল্য দিলে হবে না। পুরস্কার চাই। আর কিঞ্চিৎ সতর্কতারও প্রয়োজন। এখনও রাজা বাহাদুরের আভ্যন্তরিক আম জীর্ণ হতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে আমাদের পরিদর্শনও প্রয়োজনীয়। ভাবনা কি? আমরা ত দ্বারস্থ আছি।"...

কবিরাজরা ত সে দিন যৎকিঞ্চিৎ নিয়ে আধা খুশী হয়ে আশীর্ব্বাদ করতে করতে টিকি নাড়তে নাড়তে

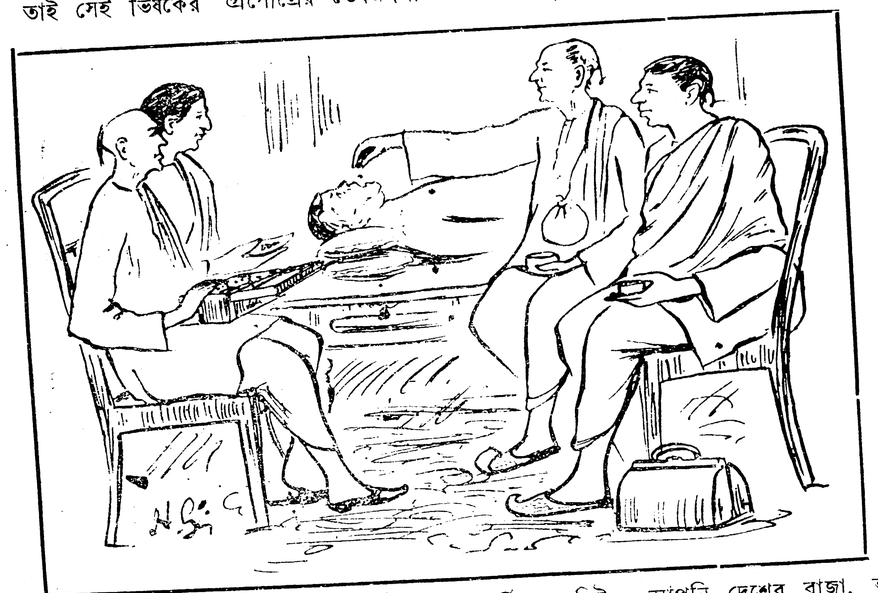

তৃতীয় দৃশ্য—'পিল্'!

প্রস্থান করলেন। বুদ্ধিমান্ গেঁয়ো রাজাবাহাদুর মর্ফিয়া জিনিসটার হদিশ্ জান্বার জন্যে জেলার সরকারী ডাক্তার-সাহেবের কাছে নায়েবকে পাঠিয়ে দিলেন।

(৫)

অভয় দিতে ও বিলের বাকী কয়টা টাকা—তৎসহিত পুরস্কার নিতে, কবিরাজের দল আর একদিন হাজীর!

"আজ্ঞে, আমাদের বিলটার বাকী টাকা কয়টা—আর যদি হুকুম হয়, কিছু পোষ্টাইয়ের ওষুধ তৈরী করে' দিই। আপনি দেশের রাজা, আপনার চিন্তা কি আমরা আছি।"

"হ্যাঁ চিন্তা কিছুই নেই। তবে তোমরা কাছে এসে এই কিল। তোমাদের কেৰ্দ্দানী সব বুঝে নিয়েছি সকল ঔষধের সার ঐ মর্ফিয়া। আর তোমাদের ডাক্ হবে না। পেটের অসুখ প্রভৃতির সেরা ঔষধ হ আফিম। তোমাদের দিগ্‌গজ্ কবিরাজী-বুদ্ধিকে এ দেখ—এই ছোট্ট কৌটার মধ্যে রাক্ষসীর প্রাণের ম পূর্ব্বে রেখেছি। ভাল চাও ত পুরস্কারের আশা

দিয়ে সোজা পথ দেখ। নইলে এই গদাগুম্‌সো হাতের—"

ধন্বন্তরীরা আর পলাইবার পথ পান্ না!

প্রথম সরিষা যত বড়; ক্রমশঃ মটর, পরে কাবুলী মটর। এত বড় গুলিতেও যখন শানাইল না, গাঁজা কুচিলা প্রভৃতি কত কি মিশ্রিত হইল। নেশার মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগ ও রাগের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "ব্যাটা বনবিষ্ণুপুরের বুনো! কিছুই বাঁধ্‌তে জানে না।...এমন রাক্ষসী ক্ষিধে, কোথায় গেল? যাব কলকাতা, দেখানো যাবে ভাল ভাল ডাক্তার, রাখা হবে ভাল ভাল বাবুর্চি।"

(৬)

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। অন্দর মহলের সঙ্গে ইতি পূর্ব্বেই রাজা বাহাদুরের সম্পর্ক ঘুচিয়াছে। একেবারে মুখ দেখাদেখি নেই! প্রবাসে নির্ভার্য্যা অবস্থায়!

..."সেবনাৎ পুংস্ত্ব নাশনং"।

তদুপরি বিভ্রাট, স্ত্রীর উপর সন্দেহ! ডাক্তারের নিকট নালিশ—"ডাক্তার বাবু! দুঃখের কথা কি বল্‌ব? দশ জায়গায় বাছাই করে' দ্বিতীয় পক্ষ এনেছিলাম। কৃষ্ণ-পক্ষ নয়, ডাক্তার বাবু, ধপ্‌ধপে শুক্ল পক্ষ। কিন্তু সেই স্ত্রী খাবারে বিষ মেশাতে লাগল। যা খাই তাই বিষিয়ে

চতুর্থ দৃশ্য—'বিল্'!

অম্বল হয়ে উঠে যেত, কিম্বা আম হয়ে নির্গত হত। আরম্ভ করলাম স্বপাক। জল ত স্বপাক হয় না। চাকরকে ঘুষ দিয়ে জলের সঙ্গে বিষ মেশান্। বিষ্ণু-পুরের রাজাদের এক বিশ্বাসী রাঁধুনী বামনকে ৫০৲ টাকা মাহিনে দিয়ে এনেছিলাম। তার উপর একটী টিকটিকির নজর রাখবার ব্যবস্থাও হল।...কিছুতেই কিছু হয় না। ক্ষিধে একেবারে গেল। রাত্রে ঘুম হয় না। ভয় হয় পাছে ঐ ডাইনীর নিযুক্ত লোক এসে

গলা টিপে মেরে ফেলে। এমন যে দেহ, চারি জন পাল্কী-বেহারা বয়ে নিয়ে যেতে হিম্ সিম খেত, দেখুন শুকিয়ে কি হয়েছে! আর বলতে লজ্জা হয়, কি ঔষধ অলক্ষিতে ঐ ডাইনী খাইয়ে দিয়েছে—মোটে ত বত্রিশে পা দিয়েছি, যৌবনের লক্ষণ কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করতে পারেন—চাক্ষুষ প্রমাণ কি পেয়েছেন? তা পাই নাই, কিন্তু পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। অনুমানও একটা প্রমাণ। এত বড় বুদ্ধিমান রাজা রামচন্দ্র—প্রজাদের অনুমানের উপর নির্ভর করে' ত এমন স্ত্রীকেও বনবাস দিয়েছিলেন। আমি ত বনবাস দিই নাই, বাড়ীতেই রেখে এসেছি। তার জন্যে দেড় হাজার টাকা খরচ করে' আমেরিকান অর্গেণ্ কিনেছিলাম। ডাক্তার বাবু, সেটা নিয়ে এসেছি, আপনি নিয়ে যান। ওর কোন চিহ্ন কাছে রাখতে চাই না। পিসিমা কান্নাকাটি করে' সঙ্গে এসেছেন। তাঁকেও মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। ঘর-পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লেও দড়ি ছিঁড়ে পালায়।"

ডাক্তার।—নির্দ্দোষী স্ত্রী বেচারীর উপর সব দোষ চাপাচ্চেন কেন? আপনার যা যা হয়েছে সবই ত আফিমের দরুণ হয়েছে। আমার হাতে যে কটী

পঞ্চম দৃশ্য—
'কিল্'!

(৭)

আফিংখোর রোগী আছে, তাদের অনেকেরই আপনার দশা! মিছামিছি বাড়ীর মেয়েদের উপর সন্দেহ করে' নিজে কষ্ট পাচ্চেন্, তাঁদেরও কষ্ট দিচ্চেন।

ক্ষিতীশ।—"ঐ যা, শেষকালটা ডাক্তারও এই বেলোয়ারী কাচের চকচকানি দেখে ভুলেছেন? দেশে আমাকে দেখ্‌তে গিয়ে আড়ালে আব্‌ডালে গিন্নীকেই দেখেছিলেন না কি?"

লজ্জায় ঘৃণায় ডাক্তার সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন।

পরদিন জরুরী ডাক পাইয়া যখন দেখিতে গেলেন, রোগীর চক্ষু দুটী লক্ষ্যহীন, দুই হাতে একটা বালিশ আঁচড়াইতেছে, দাঁত কড়্‌মড়্ করিতেছে, আর ঘন ঘন বলিতেছে "ডাক্তার! ডাক্তার! আফিং, সর্ব্বনাশ!"

ডাক্তারবাবুকে আঁচড়ান থামিল। আর যে প্রাণ-পাখী। ঐ অস্থিচর্ম্ম-সার দেহ-পিঞ্জর হইতে বাহির হইবার জন্য এতদিন্ মাথা ঠোকাঠুকি করিতেছিল, সে বাহির হইয়া অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গেল!

সরকারী স্বাস্থ্য-বিবরণী—১৯২৫ সাল

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু]

সম্প্রতি সরকার বাহাদুরের স্বাস্থ্য-বিভাগ বাঙ্গলা দেশের ১৯২৫ সালের বার্ষিক স্বাস্থ্য-বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য ঐ বিবরণী হইতে মোটামুটি বিষয়গুলি সঙ্কলন করিয়া, স্থানে স্থানে আমাদের টিপ্পনী সংযোগ করিয়া দেওয়া হইল।

বাংলার মোট লোকসংখ্যা চট্টগ্রাম পার্বত্য বিভাগ বাদে ১৯২১ সালের আদম-সুমার অনুযায়ী—৪৬,৫২২,২৯৩ জন।

১৯২৪ সালে জন্ম-হার হাজার-করা ২৯·৫, মৃত্যু-হার ২৫·৯

১৯২৫ সালে „ „ ২৯·৬, „ ২৪ ৯।

পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে জন্ম-সংখ্যা শতকরা '৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ৩·৮৬ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

জন্ম-মৃত্যু ও স্বাভাবিক সংখ্যা-বৃদ্ধির বিবেচনায় বাংলাদেশ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কোথায় দাঁড়াইয়া আছে, তাহা নিম্নের তালিকা দেখিয়া বুঝা যাইবে :—

নং	প্রদেশের নাম	হাজার-করা জন্ম-সংখ্যা	হাজার-করা মৃত্যু-সংখ্যা	স্বাভাবিক হাজার-করা লোক-বৃদ্ধি
১।	মধ্যপ্রদেশ	৪৩·৯	২৭·৩	১৬·৬
২।	পঞ্জাব	৪০·১	৩০·০	১০·৯
৩।	বিহার ও উড়িস্যা	৩৫·৬	২৩·৭	১১·৯
৪।	বম্বাই	৩৪·৭	২৩·৭	১১·০
৫।	মাদ্রাজ	৩৩·৭	২৪·৪	৯·৩
৬।	যুক্তপ্রদেশ	৩২·৭	২৪·৮	৭·৯
৭।	বাঙ্‌লা	২৯·৬	২৪·৯	৪·৯
৮।	আসাম	২৯·১	২২·৫	৬·৬
৯।	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	২৬·৯	১৯·৮	৭·১
১০।	বর্মা	২৫·৪	১৮·৭	৬·৭

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও জন্ম-মৃত্যু-সংখ্যা লিপিবদ্ধ-করণে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি ও গলদ রহিয়াছে। নিয়মমত এবারও কতকগুলি টিকাদারকে নির্দিষ্ট সংখ্যক থানায় জন্ম-মৃত্যু-হার লিপিবদ্ধ করণের যাথার্থ্য নির্দ্ধারণের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহারা যতগুলি কেস্ অনুসন্ধানের জন্য হাতে পাইয়াছিলেন, সেইগুলির মধ্যে শতকরা ২·৬টি জন্ম-সংখ্যা ও ২·৩ টি মৃত্যু-সংখ্যা লিপিবদ্ধ হইতে বাদ পড়িয়াছিল।

স্বাস্থ্য-বিভাগ অনুমান করিতেছেন যে, মোট জন্ম-সংখ্যা ও মৃত্যু-সংখ্যা হইতে অন্ততঃ শতকরা ২৭টি কেস্ লিখিত হয় নাই। কাযেই ১৯২৫ সালের প্রকৃত জন্ম-সংখ্যা প্রতি হাজারের ৩৭·৬ ও মৃত্যু-সংখ্যা

৩১·৬ বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত। জেলা স্বাস্থ্য-কর্ত্তা, সিভিল সার্জন, দারোগা ও চৌকিদার—জন্ম-মৃত্যুর হিসাবরক্ষায় এই চারিটি কার্য্যকারকেরই এ বিষয়ে যথেষ্ট শৈথিল্য আছে। সঠিক খতিয়ান্ করিতে হইলে কিরূপভাবের ব্যবস্থা লওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমরা গত বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যার স্বাস্থ্য-সমাচারে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু গভর্ণমেণ্টে তৎপ্রতি এখনও পূর্ণ দৃষ্টি দিবার অবসর পান্ নাই। যাহাদের এলাকায় এরূপ ভ্রান্তিবিচ্যুতি উপর্য্যুপরি তিনবার ধরা পড়িবে, তাহাদিগকে বিভাগীয় রীতি অনুসারে পদাবনতি করা, বদলী বা দণ্ড দেওয়ার রীতি প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জন্ম-হার

সমগ্র ১৯২৫ সালের মধ্যে বঙ্গদেশে মোট্ ১,৩৭৭,০৯৭টি জন্মের কেস্ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ৭১৭,৩৩০ ছেলে ও ৬৫৯,৭৬৭টি মেয়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রতি ১০০টি কন্যা-সন্তানের পশ্চাতে ১০৮টি করিয়া পুত্র-সন্তান প্রসূত হইয়াছে।

জেলা হিসাবে জন্ম-সংখ্যা।

জেলাসমূহের নাম	১৯২৫ সালে হাজার-করা জন্ম-সংখ্যা	১৯২৪ সালে হাজার করা জন্ম-সংখ্যা	গত বৎসরের তুলনায় হাজার-করা কত কম বা কত বেশী	
মুর্শীদাবাদ	৪৭.৪	৪১.৫	৫·৯	বেশী
দিনাজপুর	৩৮·৩	৩৫·০	৩·৩	,,
রাজসাহী	৩৫·৪	৩২·৫	২·৯	,,
নদীয়া	৪০·৩	৩৩·৭	৬·৬	,,
মালদহ	৪০·৫	৩০·০	১০·৫	,,
বীরভূম	৪৩·৭	৩৭·৫	৬.২	,,
বাঁকুড়া	৩৭·৫	৩৩·৫	৪·০	,,
জলপাইগুড়ী	৩০·৪	৩১·৯	১·৫	কম
চট্টগ্রাম	৩০·৫	৩৪·২	৩·৭	কম
নোয়াখালি	৩০·৬	৩৫·১	৪·৫	,,
বাখরগঞ্জ	২৬·৯	৩৩·৫	৬.৬	,,
রংপুর	২৯·২	৩১·৬	২ ৫	,,
দার্জিলিং	৩৩ ৭	৩৩·৫	০·২	বেশী
খুল্না	২৯·৪	২৯·৫	০.১	কম
ফরিদপুর	২৮·১	২৯·৯	১·৮	,,
ঢাকা	২৬·৪	২৯·০	২·৬	,,
বর্দ্ধমান্	৩২·৯	২৭·৪	৫·৫	বেশী
মেদিনীপুর	২৯·৭	২৭·২	২.৫	
হাওড়া	২৭·৬	২৭·৩	০·৩	,,
ময়মন্সিংহ	২৫·৫	২৮·৯	৩·৪	কম
পাবনা	২৭·৯	২৩·৬	৪·৩	বেশী
হুগলী	২৬·৭	২৫·৪	১.৩	,,
যশোহর	২৬·৪	২৮·২	১·৮	কম
বগুড়া	২৮·১	২৪·৬	৩·৫	বেশী
ত্রিপুরা	২১·৩	২২·৭	১.৪	কম
২৪ পরগণা	২৪.৬	২২·২	২.৪	বেশী
কলিকাতা	১৮·৯	১৮.৩	০.৬	বেশী

এবার পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের অনেকগুলি জেলায় জন্ম-সংখ্যার হ্রাস পাইয়াছে ও পশ্চিম বঙ্গের কতকগুলি জেলায় জন্ম-সংখ্যা বেশ সুস্পষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, আলোচ্য বর্ষে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে পাট পূর্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় শতকরা ৩½ভাগ কম পরিমাণে এবং পশ্চিম বঙ্গে চাউল পূর্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ২·৮ ভাগ বেশী জন্মিয়াছিল। ইহা বহুদিনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য যে, যে-বৎসর উত্তর ও পূর্ববঙ্গে পাট বেশী-পরিমাণে জন্মায় ও তদনুপাতে চাহিদা থাকে এবং পশ্চিমবঙ্গে ধান বেশী পরিমাণে জন্মায় ও তদনুপাতে চাহিদা থাকে, সেই বৎসর এই সকল স্থানে জন্ম-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে ১৯২৩-২৪ সালে চাউল হয় ৭,৫০৯,০০০ টন্; ১৯২৪-২৫ সালে হয় ৭,৭২১,০০০ টন্। ১৯২৪ সালে পাট জন্মায় ৭,১৬৬,০০০ গাঁইট্, ১৯২৫ সালে জন্মায় ৬,৯২২,০০০ গাঁইট্।

মৃত্যু-হার

সমগ্র ১৯২৫ সালের মধ্যে বঙ্গদেশে মোট্ ১,১৫৮,৪৭৩টি মৃত্যুর কেস লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে: তন্মধ্যে ৬১৪, ৭৩৬ জন পুরুষ ও ৫৪৩,৭৩৭ জন স্ত্রীলোক। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি ১০০ জন স্ত্রীলোকের পশ্চাতে ১১৩ জন করিয়া পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে একমাত্র যশোহর জেলায় জন্মহার কম ও মৃত্যুহার বেশী যুগপৎ দেখা যাইতেছে; ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য!

সম্প্রদায় বিশেষে মৃত্যু হার।—আলোচ্য বর্ষে খৃষ্টানদিগের মধ্যে মৃত্যু-হার হাজার-করা ১৭·১, হিন্দুদিগের মধ্যে ২৪·৫, মুসলমান্দিগের মধ্যে ২৫·০, বৌদ্ধদিগের মধ্যে ১৯·১, অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে ৩২·৫। এ বৎসরেও খৃষ্টানদিগের মৃত্যু-সংখ্যা প্রকৃত অপেক্ষা কম করিয়া লিপিবদ্ধ করানো হইয়াছে বলিয়া স্বাস্থ্য-বিভাগ সন্দেহ করিয়াছেন। ইহা অমূলক নহে; কিন্তু অবিলম্বে কড়া ব্যবস্থা লওয়া উচিত। প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী ও বর্দ্ধমান বিভাগে হিন্দুদিগের সহিত তুলনায় মুসলমানদিগের মৃত্যু-সংখ্যা বেশী হইয়াছে; কিন্তু ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ঠিক তাহার বিপরীত। জেলা হিসাবে হিন্দুদিগের সর্বাপেক্ষা বেশী মৃত্যু হইয়াছে দার্জ্জিলিংএ ও কম হইয়াছে ত্রিপুরায়; মুসলমান্দিগের মধ্যে মৃত্যু সর্বাপেক্ষা বেশী রাজসাহীতে ও কম ত্রিপুরায়। সকল দিক দিয়া বিবেচনায় ও বাংলার সকল জেলার তুলনায় ত্রিপুরা জেলাই অধিকতম স্বাস্থ্যপ্রদ।

সহরের জন্ম মৃত্যু-সংখ্যা।—বাংলার সমস্ত সহরে ১৯২৫ সালে হাজার-করা ২৩·৯ জনের মৃত্যু-সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; পূর্ব বৎসরে হইয়াছিল হাজার করা ২২·৪। আলোচ্য বর্ষে বাংলার সহর সমূহের গড়্পড়্তা জন্ম-হার বিগত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১·০২ বেশী হইয়াছিল। যাহা হউক, এ খতিয়ান্ আদৌ বিশ্বাস যোগ্য নহে। একমাত্র কলিকাতা ও ঢাকা ব্যতীত আর কোনো সহরেই ঠিক নির্ভুলভাবে জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান্ রাখা হয় বলিয়া আমাদেরও বিশ্বাস নাই, স্বাস্থ্য-বিভাগেরও ভরসা নাই। মফস্বলের কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটিতে জন্ম মৃত্যু-হার অতি অসাবধানতা ও অবহেলার সহিত রক্ষিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা যে হার লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বা সন্তোষজনক নহে। এইরূপ কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটির নাম নিম্নে দেওয়া গেল:—

কাটোয়া, খুলনা, কুমিল্লার, যশোহর, সিউড়ী, মহেশপুর, বজবজ, উত্তর দমদমা, জলপাইগুড়ী, চাঁপদানী, চাঁদপুর, বগুড়া, বর্দ্ধমান, ভোলা, গাইবান্ধা, বরিশাল, গোবরডাঙ্গা, ঝালকাটি, রাজবাড়ী, সিউড়ী, বারাকপুর। নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ জন্ম মৃত্যু-হার লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ প্রায় প্রতি বর্ষে ঠিক্ এই সকল জেলাগুলির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন্। কিন্তু তথাপি ইহাদের চক্ষু খুলে না। জাতীয় স্বার্থের প্রতি এত উদাসীন যাঁহারা, তাঁহারা আবার স্বায়ত্ত-শাসন চাহেন্ কোন্ লজ্জায়?—কোন্ হিসাবে তাঁহারা স্বরাজের বুলি

আওড়ান্? যে-সকল চেয়ারম্যান্, ভাইস্-চেয়ারম্যান্, কাউন্সিলার প্রভৃতি এই সকল মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ণধার, তাঁহারা যদি নিজেদের সংসার ও স্বার্থ লইয়া এত ব্যস্ত থাকেন যে, দেশের স্বাধীনতার প্রতীক্ এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির সদ্ব্যবহার ও সুপরিচালন করিবার অবসর পান্ না, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অবিলম্বে কার্য্যে ইস্তফা দেওয়া উচিত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, মফস্বলের কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটির গণ-নির্ব্বাচিত সাময়িক কর্ত্তাদের সাধারণের তহবিলকে 'আত্মবৎ মন্যতে' করার কেলেঙ্কারী মাঝে-মাঝে প্রকাশিত হইয়া পড়ে ও তাহা লইয়া থানা-আদালতও হয়। এই সকল মিউনিসিপ্যালিটিতে জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্ট্রেসন্ আইন্ বলবৎ রহিয়াছে; অথচ আইনভঙ্গকারীদিগকে নিয়মিত আইনের কবলে আনা বা রীতিমত শাস্তি দেওয়া হয় নাই।

জেলা হিসাবে মৃত্যু-সংখ্যা।

জেলাসমূহের নাম	১৯২৫ সালে হাজার-করা মৃত্যু-সংখ্যা	১৯২৪ সালে হাজার-করা মৃত্যু-সংখ্যা	গত বৎসরের তুলনায় হাজার করা কত কম বা কত বেশী
বীরভূম	২৪·৯	২৮·৬	৩·৭ কম
মুর্শীদাবাদ	৩০·৯	২৬·৯	৪·০ বেশী
দার্জিলিং	৩২·৫	৩৬·১	৩·৬ কম
নদীয়া	৩৪·৬	২৯·২	৫·৪ বেশী
রাজসাহী	৩৭·৪	৩৪·৬	২·৮ বেশী
বর্দ্ধমান্	২৪·৫	২৫·৩	০·৮ কম
দিনাজপুর	৩৩·৩	৩০·৭	২·৬ বেশী
বাঁকুড়া	২৩·৭	২৭·৮	৪·১ কম
জলপাইগুড়ী	২৭·১	৩১·২	৪·১ কম
হুগলী	২৫·৭	২৫·৬	০·১ বেশী
মালদহ	২৯·০	২৩·৪	৫·৬ বেশী
মেদিনীপুর	২২·৫	২৪·৭	২·২ কম
পাবনা	২৬·৪	২৯·১	৪·৭ কম
যশোহর	২৯·২	২৭·২	২·০ বেশী
রংপুর	২৯·৮	৩১·৮	২·০ কম
বগুড়া	২৩·৭	২৬·৪	২·৭ কম
চট্টগ্রাম	২১·৭	২৩·২	১·৫ কম
খুলনা	২৩·৮	২৩·৯	০·১ কম
বাখরগঞ্জ	২৩·২	২৬·১	২·৯ কম
হাওড়া	২৪·৫	২৪·৩	০·২ বেশী
ফরিদপুর	২৩·৭	২৫·০	১·৩ কম
কলিকাতা	৩২·৭	২৯·৬	৩·১ বেশী
২৪ পরগণা	২২·৩	২৪·২	১·৯ কম
নোয়াখালি	২৩·৪	২৫·৪	২·০ কম
ঢাকা	২০·৬	২২·৭	২·১ কম
ময়মনসিংহ	২০·৩	২৩·৯	৩·৬ কম
ত্রিপুরা	১৬·৪	১৬·০	০·৪ কম !

পল্লীগ্রামের খতিয়ান্ করার প্রথা পূর্ব্বাপেক্ষা ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছে বলিয়া জানিতে পারা গেল। শুনিতেছি, এবার কয়েকটি জেলায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের হাত হইতে এই কর্ত্তব্য-ভার উঠাইয়া লইয়া, লোকাল্ বোর্ড, ইউনিয়ন্ বোর্ড বা প্রেসিডেণ্ট্ পঞ্চায়েৎগণের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে; আমরাও অনেকটা এইভাবেরই ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। আলোচ্য বর্ষে সমগ্র পল্লীবিভাগের গড়্পড়্তা জন্ম-হার হাজার করা ৩০·৩; পূর্ব বৎসর অপেক্ষা শত-করা ·৬ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সহর ও পল্লীর জন্ম মৃত্যু-হারের তুলনা।

নাম	১৯২৫ সালে হাজার-করা জন্ম-হার	১৯২৪ জন্ম-হার	১৯২৫ মৃত্যু-হার	১৯২৪ মৃত্যু-হার
কলিকাতা—	১৮·৯	১৮·৩	৩২·৭	২৯·৬
সমগ্র মফস্বল সহরের গড়্পড়্তা—	২০·৩	২০·৩	১৯·২	১৮·৬
সমগ্র পল্লীর গড়্পড়্তা—	৩০·৩	৩০·১	২৫·০	২৬·১

দেখা যাইতেছে, কলিকাতার জন্ম-হার মফস্বল-সহর সমূহ অপেক্ষা শত-করা ৬·৯ ও পল্লীসমূহ অপেক্ষা শতকরা ৩৭·৬ কম; আবার অন্যদিকে মৃত্যু-সংখ্যা মফস্বল সহর-সমূহ অপেক্ষা শতকরা ৭০·৩ ও পল্লীসমূহ অপেক্ষা শতকরা ৩০·৮ বেশী। দুসাধ্য রোগ-যুক্ত বা আসন্ন মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন রোগী অবস্থাপন্ন হইলে প্রায় শেষ সময়ে চরম চিকিৎসার জন্য পল্লী ও মফস্বল-সহর হইতে কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতার মৃত্যুর ভার কিছু পরিমাণে গুরুতর করেন সত্য। তাহা হইলেও খাস কলিকাতার কমবেশী প্রায় দশ লক্ষ অধিবাসীর তুলনায় এই রূপ বাহির হইতে আগত মরণাপন্ন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম, হাজার-করা মৃত্যু-সংখ্যার একটির বেশী কদাপি নহে। তথাপি বৃটিশ্ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী সুসভ্য কলিকাতা মহানগরীতে—যেখানে মোটা মাহিয়ানার হেলথ্ অফিসার, শত শত মশক-ব্রিগেড্, ফুড্ ইন্সপেক্টর, অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল, অসংখ্য পাশ-করা ডাক্তার, সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ, স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ার, পাকা রাস্তা, বিজলী বাতি ও পাখা, ড্রেনের পায়খানা, কলের জল, ইটের দালান রহিয়াছে, সেখানে স্বাস্থ্যের এই দুরবস্থার জন্য বাংলা-সরকার বা স্বরাজী কর্পোরেসন্ কোনক্রমেই অভিনন্দিত হইতে পারেন না।

জন-সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ভড়ং সবই আছে, কিন্তু কায কিছু হয় না। হাজীরা-খাতায় নিত্য নাম সহি করিয়া ও বৎসরান্তে একটা হ-য-ব-র-ল গোছের রিপোর্ট পেশ করিয়াই স্বাস্থ্য-কর্ত্তারা পকেট বোঝাই করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন্। দুঃখের বিষয়, ১৯২৪ সাল অপেক্ষা ২৫ সালে কলিকাতায় মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ১০·৫টি করিয়া বেশী হইয়াছে। কর্পোরেসনের স্বাস্থ্যকর্ত্তা কি নাকে সরিষার তৈল দিয়া ঘুমাইতেছেন? কৌন্সিলার মহাশয়রা কি শুধু বেনামী কনট্রাক্ট্ বাগাইতেই সচেষ্ট, এদিকে কি তাঁহাদের খর দৃষ্টি পড়িবে না?

আমাদের দেশের মোট লোক-সংখ্যার শতকরা প্রায় তেরো ভাগই এক মাস হইতে পাঁচ বৎসরের শিশু দ্বারা গঠিত। মোট মৃত্যু-সংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগই পাঁচ বৎসর ও পাঁচ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদের মধ্যেই সংঘটিত হয়; আরও ৮ ভাগ হয় পাঁচ হইতে দশ বৎসরের শিশুদের মধ্য হইতে। সুতরাং দেখা যাইতেছে,

আমাদের দেশে যত শিশু জন্মায়, তাহার একশটির মধ্যে তিতাল্লিশটি শিশুই কখনও দশ বৎসরের বেশী বাঁচিতে পায় না। ইহার প্রধান কারণ পিতামাতার দারুণ দারিদ্র্য, দুর্ব্বলতা, স্থায়ী ব্যাধি, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ইহাদিগকে জগতে আনিয়া লাভ কি? ইহাদেরও কষ্ট, নিজেদেরও কষ্ট।

কোন্ বয়সে কত মৃত্যু হইয়াছে?

বয়স	মৃত্যু-সংখ্যা	মোট-মৃত্যু সংখ্যার এক শত ভাগের কয় ভাগ
এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক	২৪৯,৫৮২	২১·৫
এক হইতে পাঁচ বৎসর	১৫৬,৯২১	১৩·৫
পাঁচ হইতে দশ বৎসর	৯৩,২৫৯	৮·০
দশ হইতে পাঁচ বৎসর	৫৪,২৮৩	৪·৭
পনেরো হইতে কুড়ি বৎসর	৬৮,১২২	৫·৯
কুড়ি হইতে ত্রিশ বৎসর	১৩৬,৫৭৭	১১·৮
ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর	১১২,৬৪১	৯·৭
চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর	৮৬,৫৭৫	৭·৫
পঞ্চাশ হইতে ষাট	৭৪,৩৫৬	৬·৪
ষাটের উর্দ্ধ বয়স্ক	১২৬,১৫৭	১০·৯

দশ হইতে পনেরো বৎসরের শিশুদের মৃত্যু-সংখ্যা আমাদের দেশে সাধারণতঃ কম থাকে এবং ইহাকেই বাঙালী জাতির জীবনের সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর নিরাপদ কাল বলিয়া উল্লেখ করা যায়। পনেরো হইতে কুড়ির মধ্যে আবার মৃত্যু-হার ধীরে ধীরে বাড়িয়া, কুড়ি হইতে ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ কি—বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকেরাও ১৫ হইতে ৩০ য়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মৃত্যু-মুখে পতিত হন্। এই বয়সেই তাঁহারা সর্বাপেক্ষা বেশী সন্তান সম্ভব করেন এবং এই বয়সেই তাঁহারা প্রসব-ঘটিত দুর্ঘটনা, এক্ল্যাম্প্‌সিয়া, জরায়ু-ঘটিত ব্যায়রাম, যক্ষ্মা, সূতিকা প্রভৃতির কবলে অধিকতর নিপতিত হন্।

শিশু-মৃত্যু।—আলোচ্য বর্ষে মোট শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। যতগুলি শিশু জন্মায়, তাহার এক হাজারের মধ্যে ১৮১·২টি শিশুর এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছে,—পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অতি সামান্যই কমিয়াছে। মোট শিশু-মৃত্যুর শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগেরই মৃত্যু হইয়াছে জন্মের এক মাসের মধ্যে। কি শোচনীয় ব্যাপার!···

আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর হিসাব কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ঠিক মত রাখা হয় না; পল্লীবাসীরা ইহা রেকর্ড করাইতে ও চৌকীদারর ইহার বিষয় থানায় খবর দিতে, সকল সময় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে না, উভয় পক্ষই শিশু মৃত্যু একটা উপেক্ষনীয় ঘটনা বলিয়াই প্রায় মনে করে। সুতরাং সরকারী সুমারে যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা (আমাদের মতে) আরও পঞ্চাশ হাজার শিশুর মৃত্যু আলোচ্য বর্ষে সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাত, আমেরিকা, জার্মাণী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে শিশু-মৃত্যুর হার আমাদের দেশ অপেক্ষা অর্দ্ধেক্ বা এক তৃতীয়াংশ।

কলিকাতায় সর্বাপেক্ষা বেশী ও ত্রিপুরায় সর্বাপেক্ষা কম শিশু-মৃত্যু রেকর্ড্ হইয়াছে; এই তথ্যটি প্রায় প্রত্যেক বাৎসরিক্ রিপোর্টেই প্রকাশ পায়। রাজসাহী জেলার শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। রাজসাহীবাসী, প্রতিকার-চিন্তা করুন্! বীরভূম জেলার শিশু-মৃত্যু সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে, সুখের বিষয়।

কয়েক বৎসর ক্রমাগত আবেদন-নিবেদন, আন্দোলন ও লেখালেখির ফলে গভর্মেণ্ট্ সম্প্রতি শিশু-মৃত্যুর প্রতীকার-চিন্তা অবসর মত করিতে সুরু করিয়াছেন; স্থানে স্থানে পল্লী-দাই শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; বহু জেলায় বৎসরে বৎসরে "শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু গভর্মেণ্টের দৃষ্টি এদিকে গভীরতরভাবে নিবদ্ধ হওয়া উচিত এবং জঙ্গী ও পুলিস বিভাগের খরচ কিছু কমাইয়া উদ্বৃত্ত টাকাটা শিশুদের প্রাণ-রক্ষার প্রচেষ্টায় অকুণ্ঠিত আগ্রহে সদ্ব্যয় করা চাই।

সাধারণ লোকেরও এ বিষয়ে একটা কর্ত্তব্য আছে। শুধু জন্ম দিলেই হইবে না, তাহাদিগকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে, তাহাদিগকে মানুষ হইবার পথ নির্মাণ করিয়া দিতে হইবে। নিজের কাপড়ের বহর বুঝিয়া তবে কোট্ তৈয়ারীর বায়না দেওয়া উচিত নহে কি? দেশের নেতারা এ সব দিকে বড় একটা নজর দিবার সময় পান না। তাঁহারা স্বরাজ-সংগ্রামের প্ল্যান্ তৈয়ারী ও তাহা ভোগ-দখলের উদ্যোগ-আয়োজন করিতেই ব্যস্ত আছেন। তাঁহারা এ টুকু বুঝেন্ না যে, এই ক্ষীণপ্রাণ বাল-গোপালদের না বাঁচাইলে, সংগ্রামে সৈন্য আসিবে কোথা হইতে, রসদ যোগাইবে কে, নেতাদের জয়-ধ্বনি করিবে কাহারা, ইলেক্‌সানে পাণ্ডামি ও ষণ্ডামি হইবে কেমন করিয়া?

অন্যান্য কারণে ও রোগে মৃত্যু-সংখ্যা

মৃত প্রসূত (Still births)।—সরকারী কাগজ-পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে, আলোচ্য বর্ষে ৬২,২৮১টি মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; কিন্তু আমাদের ধারণায় উহার সংখ্যা কম-বেশী এক লক্ষ। এই জীব জীবনের পরিপূর্ণ ব্যর্থতার প্রধান কারণ—(ক) অল্প বয়সে রুগ্ন শরীরে গর্ভ-ধারণ, ও (খ) চরিত্র-দুষ্ট স্বামী-দত্ত গরমী-বিষের প্রভাব! রংপুর, কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালিতে মৃত-প্রসূত যথাক্রমে সবচেয়ে বেশী হইয়াছে।

প্রসব-কালীন স্ত্রী-মৃত্যু।—প্রসব করার ১৪ দিনের মধ্যে কোনো দুর্ঘটনা বা সংক্রামক মারাত্মক রোগের নিবন্ধন যে-সকল প্রসূতি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ১৯২৫ সালে ২৭৯০টি; ১৯২৪ সালে হইয়াছিল ১৯৭২ ও তৎপূর্ব বৎসরে আরও কম হইয়াছিল। সুতরাং এই জাতীয় মৃত্যু-সংখ্যা আমাদের দেশে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্তারা নিজ মুখেই স্বীকার করিতেছেন—প্রসবকালীন্ স্ত্রী-মৃত্যুর সুমার-ব্যাপারে যথেষ্ট গলদ আছে, ইহা ঠিক্‌মত হওয়া উচিত ছিল ৪১৯৭টি।

কলেরা।—১৯২৫ সালে ৩৪,২৭৬টী; পূর্ব বৎসরা-পেক্ষা কম। সম্প্রতি কলেরা-ভ্যাক্‌সীন্ দ্বারা টিকা দেওয়ার প্রথা স্থানে স্থানে অনুসৃত হওয়ায় সুফল ফলিতেছে।

বসন্ত।—১৭,৪৩৬টি; পূর্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় বারো হাজার বেশী। ইহার কারণ কি? শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে টিকার প্রতি লোকের বিশ্বাস-ভক্তি দিন দিন বাড়িতেছে, না—কমিতেছে?

সর্ব্বপ্রকার জ্বরে।—৮৭৪,২২৮টি; পূর্ব বৎসর অপেক্ষা কিছু কম। ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে ৪৯৭,৪৭৩ জন, পূর্ব বৎসরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পাইয়াছে। রাজসাহী জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও মৃত্যু-সংখ্যা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। তাহা ছাড়া যশোহর, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া, খুলনা, মেদিনীপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, হাওড়া ও কলিকাতায় পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ম্যালেরিয়া-ঘটিত মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এণ্টি-ম্যালেরিয়াল্ সোসাই-

টার দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি; গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহাদিগকে যেন একটু নির্জ্জীব অবসন্ন দেখিতেছি। রায় বাহাদুর ডাঃ গোপালবাবুর বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কি এই অবস্থা?···কালাজ্বরে মৃত্যু-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ অনুষ্ঠানের ত ত্রুটি নাই শুনি। ১৯২৪ সালে ৯,৯৯৭ জন কালাজ্বরে মরেন, ১৯২৫ সলে মরিয়াছেন ১৬,৭৬৬। টাকা ত অনেক জমিয়াছে, ডাক্তার ব্রহ্মচারীজী এইবার গভর্মেণ্টের সহায়তায় জেলায় জেলায় Urea-Stibamineয়ের এক একটা দানসত্র খুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করুন্ না কেন?—ইহকালে সি-আই-ই, পরকালে পুণ্য নিশ্চয়ই আছে।

আমাশা ও উদরাময়।—৭১৫৬জন, প্রায় পূর্ব্ববৎ। হাওড়া, দার্জ্জিলিং ও কলিকাতায় পূর্বাপেক্ষা বেশী।

শ্বাসযন্ত্র-ঘটিত ব্যায়রাম।—(ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা, প্রভৃতি)।—মোট ২৭,৩২২৫; পূর্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে। যক্ষ্মায় মরিয়াছে ৬,০৭৯ জন (আরও বেশী মরিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়); সর্ব্বত্র এই কালান্তক ব্যাধি বাড়িয়া চলিতেছে। দেশহিতকামীগণ, ইহার প্রতিকারে একটু সচেষ্ট ও উদ্যোগী হউন্। হাওড়া, দার্জ্জিলিং ও কলিকাতায় যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব সর্বাপেক্ষা বেশী।

অপমৃত্যু।—(আত্মহত্যা, জীবজন্তুর দংশন, অস্ত্রাঘাত দুর্ঘটন প্রভৃতি)।- মোট ২০,৬৯০ টি; পূর্বাপেক্ষা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আত্মহত্যার সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। গরীব দেশে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

হে বাংলার যুবক, বলবান হও।*

[কাপ্তেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বার-এট-ল।।

আজ আপনাদের এই ইন্‌ষ্টিটিউটে এসে যে কি বাধিত ও চরিতার্থ হয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করে' বল্‌তে পারি না। আমি ছেলে বেলায় আমার দাদার (পরলোকগত স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর) সঙ্গে মাঝে মাঝে আপনাদের এই পাড়ায় আসতাম, আমার দাদার সঙ্গে স্যার গুরুদাসের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। আপনারা যাঁর স্মৃতিতে এই প্রতিষ্ঠান্ স্থাপন করেছেন, তিনি ছেলে-বেলায় লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিলেন; শুধু তাই নয় অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং উচ্চ চরিত্র বলে বলীয়ান্ ছিলেন। নিজের প্রতিভায় তিনি হাইকোর্টের জজ্ হয়েছিলেন্। রাজা রামমোহনের পরে বাংলাদেশে স্যার গুরুদাসের মত আজও কেহ জন্মান্ নি। তিনি ছিলেন বাংলার মহাত্মা। এই ইন্‌ষ্টিটিউট্ সেই মহাত্মার পীঠস্থান—আমার তীর্থস্থান্।

আমি physical culture সম্বন্ধে "বক্তৃতা" দিতে আসিনি, পাড়ার ছেলেদের বলবান্ হওয়ার একটু মোটামুটি উপদেশ দিতে এসেছি। আমাদের দেশ দি দিন যেরূপ হীনবল হয়ে যাচ্ছে, তাতে ছেলেরা শরীরে উন্নতির দিকে রীতিমত দৃষ্টি না দিলে, জাতিটা কিছুদি পরে একেবারে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে। যে জাতি আত্মরক্ষা করিতে জানে না, সে বাঁচ্‌তে পারে না তার বাঁচাও উচিত নয়। স্বাস্থ্য না হ'লে কিছু হবে না।

স্বাস্থ্যলাভ কত্তে গেলে এক দিনে কিছু হয় না দশ দিন চাই, জীবন-ভর স্বাস্থ্যচর্য্যার অভ্যাস রাখা চাই সভাপতি মহাশয় একদিন প'ড়ে এত বড় পণ্ডিত হ নাই। আগে রোজ রোজ কত পড়েছেন, তবে পণ্ডি হয়েছেন। আর এখনও পড়তে হয়—জ্ঞানের চ

* গত ২৪শে জুলাই তারিখে নারিকেলডাঙ্গা গু গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউট্-এ প্রদত্ত বক্তৃতার সারাং শ্রীখগেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক শ্রুতিলিখিত।

রাখ্‌তে হয়; তবে আগেকার মত তত নয়, কম। বলবান্ হ'তে হ'লে ওইরূপ করে' প্রথমে বেশী ও পরে অল্প অল্প সারা জীবন ব্যায়াম কর্‌তে হয়। সকালে আধ ঘণ্টা খালি পেটে ব্যায়াম কর্‌লেই শরীর ভাল থাকে, পেটের অসুখ—বুকের অসুখ সব সেরে যায়।

দুই তিন বৎসর অভ্যাস করে' ছেড়ে দিলে চল্‌বে না, বরাবর কর্ত্তে হবে। বাপ-মা-স্ত্রী-পুত্র সংসারের জন্য ভাবনা ছেড়ে দিলে অবশ্য ভাল হবে না, কিন্তু একটু কমিয়ে দেওয়া নেতে পারে। অন্য সব জিনিসের জন্যে সকলে ভাবে, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যে কেউ ভাবে না। স্বাস্থ্যটা যার যার নিজের জিনিস, নিজের স্বাস্থ্য অটুট রাখ্‌তে নিজেরই একটু চেষ্টা থাকা উচিত।

সকাল বেলা প্রাতঃকৃত্য শেষ করে' লেংটি পরে' আধ ঘণ্টাটাক্ ব্যায়াম্ কর্‌লে কিছুদিন পর শরীরে একটা স্ফূর্ত্তি—এমন একটা তেজ—এমন একটা—আনন্দ হয়, যা ব্যায়াম যাঁরা অভ্যাস করেন তাঁরাই অনুভব কর্‌তে পারেন; মনে হয় যেন বাঘ-ভাল্লুকের বল দেহে সঞ্চারিত হয়েছে। ছাতের উপর, বারাণ্ডায় বা খালি জায়গায়ই ব্যায়াম করা উচিত। ব্যায়াম কর্‌লে ডাক্তাররা বড় ভীত হন্; কারণ তাঁদের ডাক কমে' যায়, ঔষধ খেতে হয় না।

আমি এখনও প্রত্যহ সকালে ব্যায়াম করি ও গড়ের মাঠে পাঁচ ছয় মাইল্ বেড়াই। শরীর কেমন ভাল আছে, তা দেখ্‌তে পাচ্ছেন। জীবনে কখনও ভারী অসুখ করেছে বলে' মনে হয় না। সমস্ত দিন মনে বেশ ফূর্ত্তি থাকে; রাত্রে এমন ঘুম হয় যে, চোর ঢুক্‌লেও টের পাই না।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি শুধু মনের চর্চ্চার দিকে নয়, এবার ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দিয়েছেন; খুব সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে আমেরিকান্ ডাইরেক্টর, বিলাতী ব্যায়াম ইত্যাদি না হলে' ব্যায়াম হয় না, এ কথা আমি মানি না। ঘরে বসে' ডন্-বৈঠক কর।

এখানকার ছেলেরা ফুটবল্-এর জন্যে পাগল; কিন্তু সকালে আধ ঘণ্টা ব্যায়াম তার চেয়েও অনেক ভালো। মোহনবাগান, এরিয়ান্ প্রভৃতি ফুটবল খেলার দল ত আগে ছিল না। ত্রিশ বৎসর আগে ইংরাজরা নেটিভদের বড় মার-ধর-অপমান্ কর্‌ত, আমরাও শেষে 'দেখ মার্' কর্‌তে সুরু কর্লাম্। তখন একটু ঠাণ্ডা হ'ল, আমাদের দেখে ভয় কর্‌ত—কিছু বল্‌ত না। আজ-কালও ট্রাম্ বা রেলগাড়ীতে কদাচ-কখনও এরূপ ঘটনা হয়; সাম্‌নের বেঞ্চিতে পা তুলে দেয়, ধাক্কাধুক্কিও দেয়। কিন্তু আজও যদি কেউ আমাকে ঐ রকম করে, তাকে এমন শিক্ষা দিয়ে দিই যে, সে আর কখনও ওরূপ অভদ্রতা কর্‌তে সাহস কর্‌বে না। রোজ ব্যায়াম কর, তোমরাও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই রকম স্পর্দ্ধার কথা বল্‌তে পার্‌বে। ডাক্তারকে পয়সা দিতে হবে না, রাত্রে ঘুম হবে, সুখে থাক্‌বে; চোর তাড়াবার জন্যে পরিবারকে ডাক্‌তে হবে না।

ব্যায়াম কর্‌লেই খাওয়া-দাওয়ার খুব আড়ম্বর কর্‌তে হবে—এটা ভুল ধারণা। নিজের বাড়ীর ডাল-ভাতই ভাল। ভাতের ফেন্ ফেল্‌তে দিও না, এতে অনেক-খানি পুষ্টিকর জিনিষ আমরা নষ্ট করি। ফেন্ গরীব গৃহস্থের দুধ। কলিকাতায় খাঁটি দুধের সের ছ'আনা আট আনা করে'; তার চেয়ে আমাদের ফেন্ ভাল। ফেন্ শুদ্ধ ভাত খেতে চাইলে বাড়ীর মেয়েরা প্রথম প্রথম আপত্তি তুল্‌বে—পেটের অসুখ কর্‌বে, ইত্যাদি। কিন্তু অভ্যাসে সব সয়ে যাবে। "শরীরের নাম মহাশয়; যা সওয়াবে তাই সয়।" আমি ফ্যানে-ফ্যানে ভাত খেতাম; দুধের বদলে ফেন্ ও আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার দানা দু'চার মুঠা খেয়ে ফেল্‌তাম্···। মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—মা, ফেন্ কি হয়? তিনি উত্তর কর্‌লেন—তোমাদের কাল গরুটা খায়। আমি বল্‌লাম—তাকে অর্দ্ধেক দিও, আমায় অর্দ্ধেক দিও। ভাতের সঙ্গে ফেন্ খাওয়ার যদি সুবিধা না কর্‌তে পার ত, খানিকটা ফেনের সঙ্গে লেবুর রস আর লবণ মিশিয়ে সরবতের মত খাবে, তাতে পোষ্টাই হবে। মাংস না খেলে শরীর থাকে না, একথা আমি মানি না।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ছাত্রমঙ্গল-কমিটি ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে' যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রায় শতকরা পঁচাত্তরটি ছেলেই কাযের বাইরে, শরীরে তাদের একটা-না-একটা অসুখ লেগেই আছে। দেশ যদি স্বাধীন হ'ত, তাহ'লে এই রাবিশ মাল্ নিয়ে কি করত? ইয়োরোপে অনেক জায়গার ও জাপানের ইউনিভার্সিটিগুলিতে পড়ার কোর্সের সঙ্গে ব্যায়াম-চর্চ্চাও ঢুকিয়েছে; অন্যান্য বিষয়ের মত ব্যায়ামেও সেখানে পাশ-মার্ক্ রাখ্তে হয়। আজকাল ইংরাজরা জাপানকে একটু ভয়ের চক্ষে দেখেন, একটু খাতিরও করেন। কেন তা বুঝ্তে পেরেছ? তারা বলবান্ বলে'।

এদেশের ছেলেরা দু'বৎসরের কোর্স্ পড়্তে দেড় বৎসর হেসে-খেলে-বেড়িয়ে বাজে নষ্ট করে। পরীক্ষার পাঁচ ছয় মাস আগে থেকে পড়্তে আরম্ভ করে, তাও ভাল করে' নয়; ঠিক মাস দুই আগে থেকে উঠে-পড়ে' লাগে—না খেয়ে না দেয়ে সমস্ত রাত্ বাতি জালিয়ে বইয়ের পাতার ভিতর ডুবে থাকে। এই রকম করে' কেউ ঠিক পরীক্ষার সময়ই অসুখে পড়ে; কেউ ভালোয় ভালোয় পরীক্ষা দিলেও শরীরকে একেবারে মাটি করে' ফেলে। এ রকম করতে নেই। এম্-এ, এম্-এস্সি যাই পড়, প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে দু'তিন ঘণ্টা পড়্লে ও নিয়ম মত ব্যায়াম কর্লে ফল বেশী ভাল হয়।

নিজের গায়ে জোর না থাক্লে আত্ম-সম্মান্ বজায় রাখা যায় না। শরীরের বল পৃথিবীর বল। ইংরাজরা আমাদের দুর্ব্বল বলে' মনে করে, তাই আমাদের উপর এত আধিপত্য কর্ছে, সময়ে-অসময়ে অপমান কর্ছে। গায়ে জোর থাক্লে কেউ কাছে ঘেঁসে না। নিজের শক্তি না থাক্লে পরের শক্তির উপর নির্ভর কর্তে হয়, নিজের উপর বিশ্বাস থাকে না, মনের জোরও কম হয়ে' পড়ে। সেই জন্যে আমাদের দেশের বড় লোকেরা বাড়ীতে ভোজপুরী দরোয়ান্ রাখেন। গায়ে জোর সঞ্চয় কর, মনের জোর আপনি আস্বে। দেহের শক্তি শুধু আত্মরক্ষার জন্য নিযুক্ত কর্বে, গুণ্ডামীর জন্যে নয়; আর আর্ত্তকে রক্ষা কর্বার জন্যে। "Be brave and strong, just and true."

যদি শরীরের উন্নতি কর্তে চাও ত বাড়ী বসে' চায়ের আড্ডা জমানো ছেড়ে, ফাঁকা ময়দানে যাও। বাড়ী বসে' থাকার চেয়ে তবু গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখ্তে যাওয়া ভাল। ডন, বৈঠক, মুগুর নিয়ে ব্যায়াম কর্লেই চল্বে; বেশী দামী সরঞ্জামের দরকার নেই। মুগুর খুব বেশী ওজনের করা কিছু নয়; ছেলেদের পক্ষে এক-একটা তিন পোয়া এক সের ভারী হলেই চল্বে। প্যারালাল্ বার, হোরাইজণ্টাল্ বার, রিং, ডাম্বেল প্রভৃতিতে খরচ আছে। আমার বন্ধু নারাণ ঘোষ বলেন—আজকাল ফুটবল, ক্রিকেট্ প্রভৃতি দামী খেলা ছেড়ে দিয়ে, হাডুডু খেলা আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে খুব ভাল। ৬ জন একদিকে আর ৬ জন অন্যদিকে দাঁড়িয়ে, মাঝ খানে কসি টেনে দিয়ে একটু দৌড়াদৌড়ি ও জড়ামড়ি কর্লে, ফুটবল-ক্রিকেটের চেয়ে কম ফল হয় বলে' বোধ হয় না, বরং বেশী হয়।

কুস্তী করাও খুব ভাল; শরীর বাঁধতে অমন আর কিছু নেই। বড় রকমের ওস্তাদ যোগাড় করতে না পার ক্ষতি নেই। ঐ ঘাসের উপর পড়ে নিজেরা যেমন পার ধস্তাধস্তি কর্লেই হবে; কোনো ভয় নেই, হাত-পা ভাঙ্বে না রোজ দশ পনেরো মিনিট করে' কর্লেই শরীর বেঁধে যাবে। তোমাদের আবার বল্ছি—ভাত, ডাল, তরকারী নিয়মমত খাও আর রোজ কিছুক্ষণ করে' ব্যায়াম কর।

আজকালকার ছেলেরা যখন স্কুলে যায়, মা দুটো পয়সা দেন্, বলেন—খাঁদা, স্কুলে জল্ খাস্। খাঁদা পয়সা দুটো পকেটে পুরে বই বগলে বাড়ীর বাইরে এসে, খানিক দূরে গিয়ে, পানের দোকান্ থেকে এক পয়সা পান্ কিনে খেলে, আবার খানিক দূর গিয়ে বিড়ি কিনে খেলে। এই রকম করে' তারা খারাপ হয়ে' যায়। প্রবীণরা তামাক্ খান—আপত্তি নেই। ছেলেরা, তোমরা তামাক খেয়ো না, তোমাদের কচি দেহে এ বিষে কায কর্বে। আমি এখনও তামাক বিড়ি বিষ খাই না। অনেকদিন আগে উপরোধে পড়ে একবার তামাক খেয়েছিলাম; কেসে কেসে যাই আর কি, মাথা বোঁ বোঁ ঘুর্তে লাগল, বিছানা শুয়ে তিন ঘণ্টা ঘুম আসে নি। মদ প্রভৃতি কোন নিশার জিনিস ছুঁয়ো না, এরা বলবানের শত্রু। মদ তামাক ভগবানের দেওয়া নয়, মানুষের সৃষ্টি করা শয়তানের দান; ভুলেও এ সব স্পর্শ ক'রো না। জলখাবারের পয়সা দিয়ে পার ত সন্দেশ রসগোল্লা কিনে খেও। না পার, হাতে গড়া রুটি, হালুয়া বা গুড় বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে খেও, তাহাতে শরীর ভাল থাক্বে। তোমাদের পক্ষে দুপুর বেলা কিছু খাওয়া দরকার। বাড়ীতে যা পাবে, তাই খাবে; তবে পচা, বাসি, ভেজাল বা গুরুপাক্ জিনিস মুখে দেবে না। যেটা মেলে না, তার জন্য ভাব্বে না। বাজী রেখে কিছু খাবে না, কিংবা দরকারের বেশী কিছু খেয়ো না।

সব জানালা-দরজা খুলে শোবে। ফাঁকা হাওয়ায় থাকা খুব ভাল। হাওয়াই আমাদের জীবন, একে ভয় করো না। আমি প্রায় বারো মাস বারাণ্ডায় পড়ে ঘুমাই—বেশ ঘুমাই; সকালে উঠে মনে হয় যেন আমি বারো বছরের ছেলে। যখন পার মাঠের দিকে গিয়ে বেড়াবে। ফুটবল খেলে যদি শরীরের ¼ অংশ উপকার হয়, ত মর্ণিং এক্সারসাইজে ¾ অংশ উপকার হয়। আমি রোজ ভোর পাঁচটার সময় উঠে, সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত ব্যায়াম করি; তারপর বেশ করে' তেল মেখে ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। সমস্ত দিন নিজের কায-কর্ম্ম করে', ঠিক সাড়ে নয়টার সময় ঘুমোতে যাই। রাত জেগে কখনো বায়োস্কোপ থিয়েটার দেখি না; অনেকে নিমন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটু বেশী রাত করতে বলে, কিন্তু কখনোও সাড়ে নয়টার বেশী রাত করি না। সকালে সকালে উঠ্বে, সকালে সকালে শোবে। মনের জোর রাখবে; মন দৃঢ় করে' যে কাযে লাগ্বে, তাতেই সফল হবে। নিজের ডাক্তার নিজেই হবে। সর্দ্দি হ'লে ময়দানে দুই মাইল খুব জোরে জোরে হেঁটে আস্বে, ব্যস্, সব সেরে যাবে। মরা-বাঁচা ভগবানের হাতে বল্তে পার; কিন্তু মনে করবে যে, সেটা তোমার নিজের হাতেই; অন্ততঃ পক্ষে নিজের স্বাস্থ্যকে অটুট রাখা—নিরোগ রাখা যে সম্পূর্ণ নিজের হাতে এটা ধ্রুব বিশ্বাস রাখ্বে।

এই তীর্থস্থানে দাঁড়িয়ে, আমার বাপের বড় যিনি—যাঁকে বাংলার মহাত্মা বলে' জানি, তাঁর নাম করে' তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্ছি; আবার বল্ছি—হে বাংলার যুবকদল, তোমরা সকলে বলবান হও, মানুষের মত মানুষ হও।

মেডিক্যাল কলেজে বর্ণ-ভেদ।

আজকাল মেডিক্যাল কলেজ লইয়া সাধারণ সংবাদ-পত্রে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে। উপর্য্যুপরি কয়েকটি ব্যাপার লইয়া কিছুদিন ধরিয়া, বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-আয়তন সাধারণের আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজ-সংলগ্ন ইডেন হাসপাতাল-সংক্রান্ত একটী অব্যবস্থার কথা সংবাদ-পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে! সেটী শাদায় কালায় বর্ণভেদ। ইডেন হাসপাতালে একটী আউটডোর ডিস্পেন্সারী আছে। ইয়োরোপীয় ও দেশীয় উভয় শ্রেণীর নারী এই আউটডোর

ডিস্‌পেনসারীর সহায়তা লইয়া থাকেন। সমাগতা মহিলাদিগের জন্য দুইটী অপেক্ষা-কক্ষ আছে। একটী দেশীয় মহিলাদের জন্য ও অপরটি ইয়োরোপীয় মহিলাদের জন্য। কিন্তু এই দুইটী কক্ষের আসবাব প্রভৃতির এবং আয়তনের ব্যবস্থায় আকাশ পাতাল পার্থক্য। বলা বাহুল্য, ইয়োরোপীয় মহিলাগণের কক্ষটির আয়তন বেশ সুপ্রশস্ত; দেশীয় মহিলাদের কক্ষটির আয়তন সঙ্কীর্ণ, অপ্রশস্ত। ইয়োরোপীয় কক্ষে কৌচ, চেয়ার; দেশীয় কক্ষে থান কয়েক বেঞ্চি। ইয়োরোপীয় কক্ষে দুইটী বিজলী পাখা; দেশীয় কক্ষে ও বালাই নাই। তা'ছাড়া, দেশীয় মহিলাগণের সঙ্গে পুরুষ অভিভাবক থাকেনই—তাঁহাদের বসিবার বা অপেক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। এইরূপ পার্থক্যের জন্য সংবাদ-পত্রে অভিযোগ রুজু করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি ফল? মেডিক্যাল কলেজ দেশীয় লোকের অর্থ-সাহায্যে প্রস্তুত তাহাতে সন্দেহ নাই; মেডিক্যাল কলেজ পরিচালনের ব্যয়ও যে দেশীয়গণের প্রদত্ত রাজস্ব হইতেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তাহাও সত্য; তথাপি বলিব, অভিযোগের বিষয়ীভূত ব্যবস্থার পার্থক্য আমাদের নিজেদের দোষেই ঘটিয়া থাকে। কারণ, আমরা আমাদের নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বুঝি না, যথোচিতভাবে তাহার দাবীও করিতে জানি না। কেবল মেডিক্যাল কলেজ বলিয়া কেন,—অব্যবস্থা নাই কোথায়? রেলে, ষ্টীমারে, পথে ঘাটে, আফিসে, আদালতে—সর্ব্বত্র এই পার্থক্য বিদ্যমান। ইহা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক। কেবল মেডিক্যাল কলেজের ইডেন হাসপাতালের আউটডোর ডিস্‌পেনসারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যথেষ্ট নয়, এবং তাহার প্রতিকার হইলেই আমাদের সকল অব্যবস্থার প্রতিকার হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ পার্থক্যের জন্য ইয়োরোপীয় অপেক্ষা দেশীয় লোকেরাই অধিকতর দায়ী। আমাদের স্বজাতিয়েরাই বেশীর ভাগ স্থলে দেশীয় লোকের অপেক্ষা ইয়োরোপীয় দিগকে অধিক সম্মান ও মর্য্যাদা দিয়া থাকে। এইরূপ দুষ্ট বুদ্ধির যতদিন না সংশোধন হয়, ততদিন ইয়োরোপীয় ও দেশীয়ের মধ্যে ঐরূপ পার্থক্য থাকিয়াই যাইবে; একটা আধটা স্থলে একটু আধটু প্রতিকার হইলেও জাতীয় কলঙ্ক দূর হইবে না। এজন্য সর্ব্বাগ্রে চাই লোক-শিক্ষা।

মিস মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়া"।

মিস মেয়ো নাম্নী একটী মার্কিন স্ত্রীলোক "মাদার ইণ্ডিয়া" নামে একখানি বই ছাপাইয়া দেশে-বিদেশে মহা আন্দোলনের ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্রই এই পুস্তকের প্রতিবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। সকলেরই ধারণা—এই পুস্তকের প্রচারের একটা রাজনীতিক উদ্দেশ্য আছে; যাহাতে আমরা আর কোন রাজনীতিক অধিকার না পাই, সেই উদ্দেশ্যে ভারত-বাসীকে হীন, স্বায়ত্ত-শাসন লাভের অযোগ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিস্ মেয়োকে দিয়া এই বইখানি লেখাইয়া প্রচার করা হইয়াছে। পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, উহাতে উল্লিখিত বিবরণ সম্বন্ধে আমাদের দুই একটী কথা বলিবার আছে। "ভারত-মাতা" বইখানিতে লেখা হইয়াছে যে, অনেক ভারতীয় নারী কুৎসিত রোগে ভুগিয়া হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতে যায়। কথাটা সত্য কি না তাহা বিবেচ্য। তর্কের খাতিরে উহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও উহার দ্বারা ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন লাভের অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় নাই; কারণ এই রোগের উৎপত্তি-স্থান ভারতবর্ষ নহে। 'ভাব-প্রকাশ' প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই কুৎসিত রোগের (venereal disease) নাম ফিরঙ্গ রোগ রাখা হইয়াছে। ফিরিঙ্গীরা উহা প্রথম এদেশে আনয়ন করে; ফিরিঙ্গীরা ভারতীয় ইতর শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই রোগ এদেশে প্রথম প্রচার করে। ইহা ইতিহাসের বিষয় এবং ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট অকাট্য প্রমাণ আছে। ফিরঙ্গ রোগ ভারতবাসীর স্বায়ত্ত-শাসন লাভের অযোগ্যতার কারণ কিছুতেই হইতে পারে না। তাহার কারণ ফিরঙ্গ রোগের আমদানীকারক ফিরিঙ্গীদের দেশ স্বাধীন। এইরোগের প্রাদুর্ভাব হেতু কেহ কি ফিরিঙ্গীদের স্বাধীনতা হরণের কল্পনা করিতে পারে? মিস মেয়োর পুস্তক প্রচারের ফলে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের দাবীর বরং আরও বল সঞ্চয় করিতে পারে। ফিরিঙ্গীদের দেশ হইতে এই সকল কুৎসিত রোগের আমদানী রহিত করিবার জন্যই বরং আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করা আরও বেশী দরকার।

☞ ১৫ই আশ্বিন রবিবার হইতে ২৮শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত মহাপূজা-উপলক্ষে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। ১৫ই কার্ত্তিক লাগাৎ কার্ত্তিক-সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

ভি-পি-ফেরৎদাতাদের নির্ঘণ্ট!

যাঁহারা এবারকার স্বাস্থ্য-সমাচারের বৈশাখ সংখ্যা গ্রহণ করিয়া মূল্য দেন নাই এবং জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় সংখ্যা ভি-পি, পূর্ব্বাহ্নে কোনো সংবাদ না দিয়া, নিতান্ত অন্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে ফেরৎ দিয়া এই দরিদ্র সংঘকে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কয়েকজনের নাম-ধাম নিম্নে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল; অবশিষ্ট কয়েকজনের নাম কার্ত্তিকে প্রকাশ করিব। গ্রাহকগণকে ও সমব্যবসায়ীদিগকে এই সকল অকরুণ মহোদয়গণের নাম কিছুদিন স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

—কর্ম্মকর্ত্তা, স্বাস্থ্য-সমাচার।

নাম—শ্রীযুক্ত হরিশ চন্দ্র মৈত্র; ঠিকানা—পোঃ জামিরতা; পাবনা। জয়নারায়ণ দাস গুপ্ত, ডাক্তার; হেমগিরি; পোঃ হেমগিরি রোড; বি, এন, রেলওয়ে। উপেন্দ্র নাথ কাব্যবিনোদ; পোঃ দক্ষিণ মোহনপুর; ২৪ পরগণা। তিনকড়ি দত্ত; ঝরিয়া কয়লার খনি; পোঃ বক্স ১১১; জামাডোবা; ঝরিয়া। ডাক্তার হরিমোহন গুহ; মদন মোহন ফার্মেসী; কুমিল্লা। সহকারী সম্পাদক বার লাইব্রেরী; হাটিয়া, নোয়াখালী। রমণীমোহন রায়, মোক্তার; মানিকপুর; মেদিনীপুর। শ্রীমতী অমিয়া রায়; কেয়ার অফ বাবু মোহিনীমোহন রায়; গ্রাম সতীর পাড়া; পোঃ নরসিংদী; ঢাকা। নফরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; ২৭নং রামকমল মুখোপাধ্যায় ষ্ট্রীট; খিদিরপুর; কলিকাতা। অতুল কৃষ্ণ সেন, উকিল; ১১৬নং রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র ষ্ট্রীট; বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা। এস্ সি চক্রবর্ত্তী, রেলওয়ে ডাক্তার; পোঃ মল; জলপাইগুড়ি। উমেশ চন্দ্র গুহ, অবসর-প্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার; ৪৫নং কুইন ষ্ট্রীট; শ্রীরামপুর। প্রফুল্ল কুমার লাহিড়ী; চিফ সেক্রেটারীর অফিসের কেরাণী; রেঙ্গুন। রাধারমণ দাস; গ্রাম রামনাথপুর; পোঃ অজইল; কুমারখালি; নদীয়া। তারিনীচরণ দেব; পোঃ রাহাবাড়ী ডিব্রুগড়; আসাম। সত্যরচণ রায়; মানিকপুর ইটখোলা; ডেল্‌টা মিল, হাওড়া। সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, উকিল; হাতীরকুল; কোন্নগর। তিনকড়ি বিশ্বাস, পরিদর্শক, খাসমহল, সুন্দরবন; বরিশাল। লক্ষ্মীনারায়ণ গাঙ্গুলী; ৩নং হেমচন্দ্র কর লেন; বাগবাজার; কলিকাতা। যতীন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী; পোঃ গোপেয়া, শ্রীহট্ট। নির্ম্মল চন্দ্র দে; বাঙ্গালী যুবক সম্প্রদায়; আমিনাবাদ পার্ক, লক্ষ্ণৌ। অম্বিকাচরণ রায়; গ্রাম সাহাপুর; পোঃ পুকুরিয়া; পাবনা। ডাক্তার বি, জি, ঘোষ; বলরামপুর; হরিণাকুণ্ডা; যশোহর। কবিরাজ জলধর দত্ত; গ্রাম নগরকস্‌বা; পোঃ মিরকাদিম; ঢাকা। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ; ধুবড়ী; আসাম। এস্, সি, মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার; পোঃ বেসীন; বর্ম্মা। করুণাকুমার ভট্টাচার্য্য, উকীল; কৃষ্ণনগর; নদীয়া। সম্পাদক, হুইম্‌জিকাল ক্লাব; বাওয়ালী; ২৪ পরগণা। ডাক্তার হরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ১৫নং বারয়ারীতলা রোড; বেলিয়াঘাটা; কলিকাতা। দেবেন্দ্র নাথ পাল; সম্পাদক, হিতসাধন সমিতি; পোঃ আতাইকোলা; বুলবারিয়া; পাবনা। বিপিনবিহারী গিরি; ৪৯এ গিরিশ মুখার্জ্জী রোড; কলিকাতা। যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সাব ডেপুটী কলেক টার; পোঃ বহরমপুর। মনীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী; রাণী বাজার; পোঃ ঘোড়ামারা; রাজসাহী। বাবুলাল সিংহ; ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট; কলিকাতা। পান্নালাল হালদার; ১৩নং গঙ্গানারায়ণ দত্ত লেন; কলিকাতা। নগেন্দ্রনাথ পালিত; ১৩নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট; কলিকাতা। রামচন্দ্র মজুমদার, উকিল; ৫২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট; কলিকাতা। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; ২১নং মনসাতলা লেন; খিদিরপুর; কলিকাতা। তারাকিঙ্কর সিংহ, উকিল; তমলুক; মেদিনীপুর। পদ্মিনীকান্ত রায়, স্বাস্থ্যরক্ষানুষ্ঠান পরিদর্শক; নৈহাটী। মনোমোহন ধর, পোষ্টমাষ্টার; পোঃ তাঁতের; ত্রিপুরা। শ্যামাচরণ মল্লিক; বড়হল মথুরাবাটী; পোঃ জঙ্গীপাড়া, ভায়া হরিপাল; হুগলী। শশীনাথ সেন; গৌরীপুর দাতব্য ঔষধালয়; গৌরীপুর; মৈমনসিংহ। যজ্ঞেশ্বর মজুমদার; শীতল দাতব্য

ঔষধালয় ; পোঃ শীতলাই ; পাবনা। ডাক্তার এস, সি, মিত্র ; পোঃ গোবরডাঙ্গা ; ২৪ পরগণা। হেমচন্দ্র গোস্বামী ; গৌহাটী ; আসাম। ডাক্তার ত্রৈলক্য নাথ সরকার ; পোঃ মারনাই ; মালদহ। নৃত্যগোপাল প্রধান, জমিদার ; পোঃ দেবভোগ ; মেদিনীপুর। গোপাল চন্দ্র শ্যাম ; গ্রাম বাণীদা ; পোঃ মুগ্‌বেরিয়া ; মেদিনীপুর। সুশীলচন্দ্র দাস এণ্ড কোং, সওদাগর ; কানপুর। হরিচরণ সিংহ, ডাক্তার ; দাতব্য ঔষধালয় ; পোঃ সেতাবগঞ্জ ; দিনাজপুর। গোবর্দ্ধন চন্দ্র সাহা ; ৫।৩ মমিনপুর লেন ; আলীপুর ; কলিকাতা। অধ্যক্ষ, নৈতিক শিক্ষাপ্রদায়ক বিভাগ, টিপকাই বিদ্যালয় ; টিপকাই ; আসাম। এস, এম, চৌধুরী, সহকারী পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ ; পোঃ ডুমরী ; হাজারীবাগ। রাজেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য ; ১০নং রাধানাথ বোস লেন ; সিমলা ; কলিকাতা। উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, কার্য্যাধ্যক্ষ, ছোটনাগপুর ব্যাঙ্ক ; পুরুলিয়া ; মানভূম। প্রধান শিক্ষক, সারাঙ্গাবাদ এইচ, ই স্কুল ; বজ্‌বজ। প্রধান শিক্ষক, বেলপুকুর এইচ, ই, স্কুল ; পোঃ বেলপুকুর ; নদীয়া। যামিনীনাথ চক্রবর্ত্তী ; পোঃ জয়াগঞ্জ কাছারী ; দিনাজপুর। সম্পাদক, সারস্বত কুঞ্জ ; চণ্ডীপুর ; নদীয়া। এস, মুখোপাধ্যায় ; বোয়ালিয়া ; পোঃ কালুপাল ; নদীয়া। মথুরাপ্রসাদ গুপ্ত ; ৩৬২ বেলিলিয়াে রোড, হাওড়া। অন্নদা চরণ চৌধুরী ; মুন্সীকুটীর, পোঃ লাটু ; শ্রীহট্ট। কৃষ্ণপদ পারল ; গ্রাম ও পোঃ উদাঙ্গ, ভায়া আমতা ; হাওড়া। প্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী, গবরমেণ্ট হাই স্কুল ; বিজনার। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তি, পঞ্চায়েৎ সভাপতি ; করাইদ ; ঢাকা। ডাক্তার সুরেন্দ্র মোহন বিশ্বাস ; পোঃ কমলপুর ; ত্রিপুরা। কেনারাম আচার্য্য, সম্পাদক—বাণী নিকেতন ; গ্রাম—অযোধ্যাপুর ; পোঃ বসন্তিয়া ; মেদিনীপুর। মনীন্দ্র নাথ দাস, পোঃ চন্দোরা ; ত্রিপুরা। উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, ২।১ জরিফ লেন ; কলিকাতা। যজ্ঞেশ্বরচরণ নাথ গ্রাম লফশিল ; পোঃ বিরশ্রী, শ্রীহট্ট। প্রভাসকুমার কুণ্ডু, কেয়ার অফ বাবু মানিক চন্দ্র কুণ্ডু ; পোঃ কুমারখালী ; নদীয়া। পালী চিকিৎসক সম্মিলনী কার্য্যালয় ; রাজামনিপুর ; পোঃ নাবাবগঞ্জ, ঢাকা। শচী সাহা ; হার্ডিঞ্জ রোড ; পাটনা। নগেন্দ্র নাথ কর্ম্মকার ; ১৬ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড ; কলিকাতা। এস্, সি মিত্র ; ৭৮ রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড ; বেলিয়াঘাটা ; কলিকাতা। হরিহর সরকার ; গ্রাম ও পোঃ বৈরা ; ঢাকা। সম্পাদক, চাতরা পুস্তকালয় ও পাঠাগার ; চাতরা ; শ্রীরামপুর। সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পোঃ পোলবা ; ভায়া মগরা ; হুগলী। লক্ষ্মীনাথ বরদোলী, জোড়হাট, আসাম। ডাক্তার রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ; রঙ্গমালা চা বাগান ; পোঃ পানিটোলা ; ডিব্রুগড় ; আসাম। নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ; গ্রাম মালোক ; পোঃ পানিত্রাস ; ভায়া বাগনান ; হাওড়া। শ্রীমতী শান্তিলতা সরকার ; কেয়ার অফ বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ সরকার ; পোঃ চন্দ্রকোনা ; মেদিনীপুর। সম্পাদক, পাতাকুড়া লাইব্রেরী ; কুচবিহার। প্রবোধহরি মুখোপাধ্যায় ; জয়কৃষ্ণপুর ডাঙ্গা ; পোঃ গলসী ; বর্দ্ধমান। জ্যোতিশচন্দ্র মিত্র ; ১৯৮ পাহাড়পুর রোড ; গার্ডেন রিচ, কলিকাতা। সুরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, বি, এ ; পোঃ মহানাঘাট ; ডিব্রুগড়। শ্যাম প্রসন্ন ঘটক ; কেয়ার অফ ডাক্তার এ, পি, ঘটক ; আরা। নৃত্য গোপাল মণ্ডল, সম্পাদক সাধনা নন্দির ; গ্রাম গোপালনগর ; পোঃ মিরকাদিম ; ঢাকা। বসন্ত নাথ দাস ; মলিফা ; পোঃ নাজিরগঞ্জ ; পাবনা। মুকুন্দ লাল দাস ; পোঃ খঞ্জনপুর ; সঙ্গবীরহাট ; বগুড়া। যোগেন্দ্র নাথ দে, সম্পাদক জ্ঞানদায়িনী সভা ; পোরটীয়াস এম্, ই, স্কুল, পোঃ রাজনগর ; শ্রীহট্ট মহম্মদ আবদুল কাদের, ডাক্তার ; গ্রাম চর সুলতানপুর ; পোঃ চরবিষ্ণুপুর ; ফরিদপুর। কবিরাজ অবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ ; কেয়ার অফ, কবিরাজ রজনীকান্ত মজুমদার কবিরত্ন ; যশোহর। রজনীকান্ত সেন, গ্রাম আদিত্যপুর ; পোঃ বালাগঞ্জ ; শ্রীহট্ট। প্রধান শিক্ষক, তালিবপুর এইচ, ই, স্কুল ; পোঃ তালিবপুর ; মুর্শিদাবাদ। এ, সি, রক্ষিত, অধ্যক্ষ—ফেণী কলেজ ; ফেণী ; নোয়াখালী। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজগোপাল নন্দী। কোন্নগর।

স্বাস্থ্য সমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৬শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৩৪ সাল | ৭ম সংখ্যা

শিশুর পরিচর্য্যা—রোগে।

রোগ মানবশরীর মাত্রেই আসে, এবং দেহধারণের একটী অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কেহ বরাবরই রোগ ভোগ করে, কাহারও ভোগের মাত্রা বা অতি অল্প, কিন্তু ব্যাধি হয় নাই বা হইবে না—একথা কখনও বলা যাইতে পারে না।

রোগের চিকিৎসা আছে, তাহা চিকিৎসকের উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু চিকিৎসাই কেবল রোগ দূর করিবার প্রধান অস্ত্র নহে, তাহার সহিত রোগীর পরিচর্য্যা বিশেষ প্রয়োজন। টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে চিকিৎসা অপেক্ষা পরিচর্য্যাই বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু রোগের চিকিৎসা বা পরিচর্য্যা রোগীর নিকট হইতে লক্ষণ জানিয়া-শুনিয়া ব্যবস্থা হইয়া থাকে ; শিশুর ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যাপার।

দুই বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশুর চিকিৎসা বা পরিচর্য্যা করিতে হইলে সবটাই বহির্লক্ষণ দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়। শিশু কি ভাবে তাহার যন্ত্রণা প্রভৃতি ব্যক্ত করে, তাহা শিশুর নিকটে সদা সর্ব্বদা যাহারা থাকে, তাহারা সে বিষয়ে সংবাদ দিতে পারে ; শিশু রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে রোগীর ভার তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত।

বালানাং রোদনং বলং। শিশুর সমস্তই অভাব অভিযোগ, দাবী, আব্দার—ক্রন্দন দ্বারাই প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ সকল কারণেই শিশু কাঁদিতে পারে, কাযেই শিশুর কান্নার পার্থক্য ধরিবার জন্য এবং স্থির নিশ্চয় রূপ কারণ জানিবার জন্য শিশুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। ক্রন্দন ব্যতীত যাহার কোন ভাষা নাই, তাহার জন্য একটু সতর্কতা অবলম্বন করা এবং তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করার জন্য কোন প্রকারেই আলস্য করা উচিত নহে।

ঔষধালয় ; পোঃ শীতলাই ; পাবনা। ডাক্তার এস, সি, মিত্র ; পোঃ গোবরডাঙ্গা ; ২৪ পরগণা। হেমচন্দ্র
গোস্বামী ; গৌহাটী ; আসাম। ডাক্তার ত্রৈলক্য নাথ সরকার ; পোঃ মারনাই ; মালদহ। নৃত্যগোপাল প্রধান,
জমিদার ; পোঃ দেবভোগ ; মেদিনীপুর। গোপাল চন্দ্র শ্যাম ; গ্রাম বাণীদা ; পোঃ মুগ্‌বেরিয়া ; মেদিনীপুর।
সুশীলচন্দ্র দাস এণ্ড কোং, সওদাগর ; কানপুর। হরিচরণ সিংহ, ডাক্তার ; দাতব্য ঔষধালয় ; পোঃ সেতাবগঞ্জ ;
দিনাজপুর। গোবর্দ্ধন চন্দ্র সাহা ; ৫।৩ মমিনপুর লেন ; আলীপুর ; কলিকাতা। অধ্যক্ষ, নৈতিক শিক্ষাপ্রদায়ক
বিভাগ, টিপকাই বিদ্যালয় ; টিপকাই ; আসাম। এস, এস, চৌধুরী, সহকারী পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ ; পোঃ ডুমরী ;
হাজারীবাগ। রাজেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য ; ১০নং রাধানাথ বোস লেন ; সিমলা ; কলিকাতা। উপেন্দ্রনাথ
মজুমদার, কার্য্যাধ্যক্ষ, ছোটনাগপুর ব্যাঙ্ক ; পুরুলিয়া ; মানভূম। প্রধান শিক্ষক, সারাঙ্গাবাদ এইচ, ই স্কুল ;
বজ্‌বজ। প্রধান শিক্ষক, বেলপুকুর এইচ, ই, স্কুল ; পোঃ বেলপুকুর ; নদীয়া। যামিনীনাথ চক্রবর্ত্তী ; পোঃ
জয়াগঞ্জ কাছারী ; দিনাজপুর। সম্পাদক, সারস্বত কুঞ্জ ; চণ্ডীপুর ; নদীয়া। এস, মুখোপাধ্যায় ; বোয়ালিয়া ;
পোঃ কালুপাল ; নদীয়া। মথুরাপ্রসাদ গুপ্ত ; ৩৬২ বেলিলিয়ো রোড, হাওড়া। অন্নদা চরণ চৌধুরী ;
মুন্সীকুটীর, পোঃ লাটু ; শ্রীহট্ট। কৃষ্ণপদ পারল ; গ্রাম ও পোঃ উদাঙ্গ, ভায়া আমতা ; হাওড়া। প্রমথ
নাথ চক্রবর্ত্তী, গবরমেণ্ট হাই স্কুল ; বিজনার। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তি, পঞ্চায়েৎ সভাপতি ; করাইদ ; ঢাকা।
ডাক্তার সুরেন্দ্র মোহন বিশ্বাস ; পোঃ কমলপুর ; ত্রিপুরা। কেনারাম আচার্য্য, সম্পাদক—বাণী নিকেতন ;
গ্রাম—অযোধ্যাপুর ; পোঃ বসন্তিয়া ; মেদিনীপুর। মনীন্দ্র নাথ দাস, পোঃ চন্দোরা ; ত্রিপুরা। উপেন্দ্র নাথ
বন্দোপাধ্যায়, ২।১ জরিফ লেন ; কলিকাতা। যজ্ঞেশ্বরচরণ নাথ গ্রাম লফশিল ; পোঃ বিরশ্রী, শ্রীহট্ট। প্রভাসকুমার
কুণ্ডু, কেয়ার্ অফ বাবু মানিক চন্দ্র কুণ্ডু ; পোঃ কুমারখালী ; নদীয়া। পালী চিকিৎসক সম্মিলনী কার্য্যালয় ;
রাজামনিপুর ; পোঃ নাবাবগঞ্জ, ঢাকা। শচী সাহা ; হার্ডিঞ্জ রোড ; পাটনা। নগেন্দ্র নাথ কর্ম্মকার ;
১৬ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড ; কলিকাতা। এস্, সি মিত্র ; ৭৮ রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড ; বেলিয়াঘাটা ;
কলিকাতা। হরিহর সরকার ; গ্রাম ও পোঃ বৈরা ; ঢাকা। সম্পাদক, চাতরা পুস্তকালয় ও পাঠাগার ;
চাতরা ; শ্রীরামপুর। সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পোঃ পোলবা ; ভায়া মগরা ; হুগলী। লক্ষীনাথ বরদোলী, জোড়হাট,
আসাম। ডাক্তার রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ; রঙ্গমালা চা বাগান ; পোঃ পানিটোলা ; ডিব্‌রুগড় ; আসাম। নিরঞ্জন
মুখোপাধ্যায় ; গ্রাম মালোক ; পোঃ পানিত্রাস ; ভায়া বাগনান ; হাওড়া। শ্রীমতী শান্তিলতা সরকার ; কেয়ার
অফ বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ সরকার ; পোঃ চন্দ্রকোনা ; মেদিনীপুর। সম্পাদক, পাতাকুড়া লাইব্রেরী ; কুচবিহার।
প্রবোধহরি মুখোপাধ্যায় ; জয়কৃষ্ণপুর ডাঙ্গা ; পোঃ গলসী ; বর্দ্ধমান। জ্যোতিশচন্দ্র মিত্র ; ১৯৮ পাহাড়পুর
রোড ; গার্ডেন রিচ, কলিকাতা। সুরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, বি, এ ; পোঃ মহানাঘাট ; ডিব্‌রুগড়। শ্যাম
প্রসন্ন ঘটক ; কেয়ার অফ ডাক্তার এ, পি, ঘটক ; আরা। নৃত্য গোপাল মণ্ডল, সম্পাদক সাধনা মন্দির ;
গ্রাম গোপালনগর ; পোঃ মিরকাদিম ; ঢাকা। বসন্ত নাথ দাস ; মলিফা ; পোঃ নাজিরগঞ্জ ; পাবনা। মুকুন্দ লাল
দাস ; পোঃ খঞ্জনপুর ; সঙ্গবীরহাট ; বগুড়া। যোগেন্দ্র নাথ দে, সম্পাদক জ্ঞানদায়িনী সভা ; পোরটীয়াস
এম্, ই, স্কুল, পোঃ রাজনগর ; শ্রীহট্ট মহম্মদ আবতুল কাদের, ডাক্তার ; গ্রাম চ সুলতানপুর ; পোঃ চরবিষ্ণুপুর ;
ফরিদপুর। কবিরাজ অবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ ; কেয়ার অফ, কবিরাজ রজনীকান্ত মজুমদার কবিরত্ন ; যশোহর।
রজনীকান্ত সেন, গ্রাম আদিত্যপুর ; পোঃ বালাগঞ্জ ; শ্রীহট্ট। প্রধান শিক্ষক, তালিবপুর এইচ, ই, স্কুল ; পোঃ
তালিবপুর ; মুর্শিদাবাদ। এ, সি, রক্ষিত, অধ্যক্ষ—ফেনী কলেজ ; ফেনী ; নোয়াখালী। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপাল নন্দী। কোন্নগর।

স্বাস্থ্য সমাচার

"শরীমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৬শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩৪ সাল { ৭ম সংখ্যা

শিশুর পরিচর্য্যা—রোগে।

রোগ মানবশরীর মাত্রেই আসে, এবং দেহধারণের একটী অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কেহ বরাবরই রোগ ভোগ করে, কাহারও ভোগের মাত্রা বা অতি অল্প, কিন্তু ব্যাধি হয় নাই বা হইবে না—একথা কখনও বলা যাইতে পারে না।

রোগের চিকিৎসা আছে, তাহা চিকিৎসকের উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু চিকিৎসাই কেবল রোগ দূর করিবার প্রধান অস্ত্র নহে, তাহার সহিত রোগীর পরিচর্য্যা বিশেষ প্রয়োজন। টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে চিকিৎসা অপেক্ষা পরিচর্য্যাই বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু রোগের চিকিৎসা বা পরিচর্য্যা রোগীর নিকট হইতে লক্ষণ জানিয়া-শুনিয়া ব্যবস্থা হইয়া থাকে ; শিশুর ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যাপার।

তুই বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশুর চিকিৎসা বা পরিচর্য্যা করিতে হইলে সবটাই বহির্লক্ষণ দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়। শিশু কি ভাবে তাহার যন্ত্রণা প্রভৃতি ব্যক্ত করে, তাহা শিশুর নিকটে সদা সর্ব্বদা যাহারা থাকে, তাহারা সে বিষয়ে সংবাদ দিতে পারে ; শিশু রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে রোগীর ভার তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত।

বালানাং রোদনং বলং। শিশুর সমস্তই অভাব অভিযোগ, দাবী, আব্দার—ক্রন্দন দ্বারাই প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ সকল কারণেই শিশু কাঁদিতে পারে, কাযেই শিশুর কান্নার পার্থক্য ধরিবার জন্য এবং স্থির নিশ্চয় রূপ কারণ জানিবার জন্য শিশুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। ক্রন্দন ব্যতীত যাহার কোন ভাষা নাই, তাহার জন্য একটু সতর্কতা অবলম্বন করা এবং তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করার জন্য কোন প্রকারেই আলস্য করা উচিত নহে।

বিজ্ঞ মায়েরা জানেন, শিশুর কান্নার সহিত হস্তপাদ-ক্ষেপণে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। কান্নার সুরেও বেশ পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে। ক্ষুধার্ত্ত শিশু হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পায়ের চাপ দিয়া পশ্চাদ্ভাগে বাঁকিয়া যায় এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বিরক্ত করিতে থাকে। পেটের ব্যথার জন্য হইলে শিশু থাকিয়া থাকিয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠে এবং অত্যন্ত চঞ্চলতা প্রকাশ করে, কাঁধের উপর উপুড় করিয়া ফেলিয়া বেড়াইলে চুপ করিয়া থাকে। পেটে চাপ পড়ার জন্য স্বস্তি বোধ করে বলিয়া এই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

তীক্ষ্ণ ক্রন্দন-ধ্বনি যদি কিছু সময় অন্তর শোনা যায়, এবং পরক্ষণেই শিশু চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মস্তিষ্কের ঝিল্লির প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। কাণের যন্ত্রণায় শিশু অবিশ্রান্ত কাঁদিতে থাকে, মাঝে মাঝে অধিক চীৎকার করিয়া উঠে এবং সদা সর্ব্বদা বাহকের গাত্রে কাণ চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করে। শিশুর কান্নার রবের দিকে লক্ষ্য করিলে রোগ সম্বন্ধে একটী ধারণা করা অসম্ভব নহে। পিতা মাতা হইতে উপদংশ রোগ শিশু শরীরে প্রবেশ করিলে, তাহার কান্নার শব্দ সর্ব্বদাই ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়; গলার ক্ষত হইতেও এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এইরূপে নানা কারণে শিশু নানারূপে নিজ যন্ত্রণা প্রকাশ করে। শিশু যদি শান্ত হইয়া থাকে এবং কোন সময়েই তাহার কান্নার শব্দ না পাওয়া যায়; অথচ দেহে, মুখে রোগ লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শিশু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, বা শিশুর রোগ অত্যন্ত গুরুতর।

শয্যায় শিশুর অবস্থান হইতে তাহার স্বাস্থ্য ও রোগ সম্বন্ধে ধারণা করা অসম্ভব নহে। অল্প মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য রাখিলে কতগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সহজেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শয়নের অবস্থা ও অন্যান্য লক্ষণ হইতে রোগ সম্বন্ধে যদি ধারণা করিয়া লইতে পারা যায়; তাহা হইলে অনেক সময় সামান্য গৃহস্থালীর ঔষধ ও পরিচর্য্যার দ্বারা অতি অল্পকালে রোগ দূর করা সম্ভব হইতে পারে।

সাধারণতঃ সুস্থ শিশু সামান্য পাশ ফিরিয়া বালিসের উপর মাথা ও গাল রাখিয়া ঘুমায়। গুরুতর পীড়ার চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে এবং প্রায়শঃ বালিশের উপর পিঠ রাখিয়া মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া দেয় ও হাঁ করিয়া নিশ্বাস ফেলে। চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত অবস্থায় থাকে। মস্তিষ্কের আবরক ঝিল্লির প্রদাহে বা গলক্ষত রোগে শিশু পাশ ফিরিয়া মাথা পশ্চাদ্ভাগে ঝুলাইয়া দিয়া বক্রভাবে শয়ন করিয়া থাকে। পেটের ব্যাথায় বা কামড়ানিতে পা গুটাইয়া, বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া দিয়া, উপুড় হইয়া শুইয়া থাকে। এই ভাবে শয়নের অবস্থা হইতেও রোগ সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লওয়া যায়।

গায়ের রং, নাড়ীর গতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চাঞ্চল্য প্রভৃতি লক্ষণও রোগ বা স্বাস্থ্য প্রকাশ করে। শিশুর আকৃতি প্রকৃতি হইতে তাহার পরিপুষ্টি ও তাহার পালনের ধারা নির্ণয় করা কঠিন নহে।

শিশুর রোগ পরিচর্য্যা কালে একটি কথা সদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অতি অল্প কারণেই শিশুদেহে রোগের লক্ষণ গুরুতর বলিয়া মনে হইতে পারে। শিশুর নাড়ী, শিরা, পেশী প্রভৃতি সকলই অপরিপুষ্ট, সেই কারণে তাহাদের প্রতিষেধ-শক্তি-প্রাপ্ত বয়স্কের ন্যায় সক্ষম নহে। সামান্য কারণে শিশু-দেহের উত্তাপ, নাড়ী ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি অতি দ্রুত হয়। প্রাপ্ত-বয়স্কে ঐ সকল লক্ষণ ঐরূপ গুরুতর ভাব ধারণ করিলে নিশ্চয়ই গুরুতর রোগের অবস্থিতি প্রকাশ করে; কিন্তু শিশুদেহে সেরূপ বোধ করিবার কোন কারণ নাই। দেখা যায়, সামান্য বদহজমের সহিত শিশু অত্যধিক জ্বর, কাসি, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস কখনও বা তড়কা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। প্রাপ্ত বয়স্কে হয়ত পেটের নানারূপ গোলমাল ব্যতীত অন্য কিছুই উপসর্গ প্রকাশ করে না। তবে শিশুর ক্ষেত্রে অত্যধিক সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়। শিশু যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে পারে না, সময়ে সময়ে রোগের লক্ষণের প্রতি সম্যক দৃষ্টি না

দেওয়াতে মহা অনর্থ ঘটিতে পারে। তড়কা প্রভৃতি আরম্ভ হইলে রোগ হইতে রোগের লক্ষণের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

শিশুর আহারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শরীর গঠনের প্রধান উপাদান—খাদ্য। উহা শিশুর পক্ষে কতখানি প্রয়োজন তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া লইতে হয়। অধিক মাত্রা অপেক্ষা অল্প মাত্রায় আহার দিয়া ক্রমশঃ পরিমাণ বৃদ্ধি করাই যুক্তিসঙ্গত। অল্পাহার বা অনুপযুক্ত আহার হেতু শিশুর শরীর শীর্ণ হইতে থাকে। সাধারণতঃ দরিদ্র-কুটীরে এরূপ হওয়া সম্ভব; কিন্তু বহু সময় অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থের আলয়েও আহারের দিকে লক্ষ্য না রাখাতে, শিশু শীর্ণ, রক্তহীন ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়া থাকে। মাতার দুগ্ধের এবং যত্নের অভাবে এরূপ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যে স্থানে এরূপ কারণ নাই, সে স্থলে প্রকৃত কারণের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। শিশু অন্তরে কোন রোগ অনুভব করিতে থাকিলে এরূপ হওয়া সম্ভব। শিশুর আহারের বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন দ্বারা, এবং রোগোৎপাদক খাদ্য ব্যবহার বন্ধ করিয়া শীর্ণতা দূর হইয়া থাকে।

শিশুর উপযুক্ত আহার সম্বন্ধে আমরা এ স্থানে বিশেষ কিছু লিখিব না। এ সম্বন্ধে আলোচনা বহুবার এই পত্রিকায় হইয়া গিয়াছে, এবং যাঁহারা এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদের "শিশু পালন" পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে, যে মাতৃদুগ্ধ দশ মাস পর্য্যন্ত শিশুকে পালন করিতে দেওয়া যায়; উহার তুলনায় পৃথিবীতে উপযুক্ত খাদ্য আর কিছুই নাই। ৮।৯ মাস কাল হইতে শিশুকে সিদ্ধ ভাত টিপিয়া দুধ দিয়া দেওয়া যাইতে পারে; দশ মাসের পর আর মাতৃদুগ্ধ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। রুগ্ন শিশুর জন্য দিনে অন্ততঃ দুইবার টাট্‌কা দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে হইবে। বিশেষজ্ঞদের মতে একই গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা দুই বা ততোধিক গাভীর দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করানো মঙ্গলজনক; সহ্যমত দুগ্ধ ও জল মিশাইয়া লওয়া দরকার। Dextrinised food বলিয়া এক প্রকার দেশী "ফুড" পাওয়া যায়। তাহা ব্যবহারে শিশুদের উদরাময়ের উপশম হইতে দেখা যায়। শিশুর দুগ্ধে মিষ্ট মিশাইয়া দেওয়া চলিতে পারে; হজম করিতে পারিলে, শিশুর পুষ্টির সুবিধা হইয়া থাকে। যখন অন্য মিষ্ট হজম করা কষ্টসাধ্য হয়, তখন "বিকানীরের মিশ্রি" শিশুরা অতি সহজেই পরিপাক হইয়া থাকে।

শিশুর আহারের পরিমাণ অতি অল্প হওয়া উচিত; কিন্তু বারে বহু হইলে, পরিমাণের স্বল্পতা শিশুর দেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। দুই ঘণ্টার ভিতর কোন খাদ্য দিবে না, এবং রাত্রিকালে খাদ্য বারে যত কম হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

আহারের ন্যায় শিশুর বাসগৃহও একটী অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। অনুপযুক্ত আহারে যেমন শিশুর শীর্ণতা আনয়ন করে, প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু, রৌদ্রতাপ প্রভৃতির অভাবে শিশু রোগ-লক্ষণ প্রকাশ করে। বায়ু দেহের জীবন; আলো ও তাপ দেহ গঠনের প্রধান শক্তি। কেবলমাত্র আহারে শিশুদেহ গঠনের সকল উপাদান মিটে না। আলো ও হাওয়ার অভাবে, পরিপাক-শক্তি হ্রাস করে ও অঙ্গের শিথিলতা আনয়ন করে। শিশুকালে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে দেওয়ার প্রথা মন্দ নহে। তবে মাথায় রৌদ্র লাগা ক্ষতিকারক।

শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। শিশুর দেহক্ষয়-রোগে অধিকমাত্রায় বিশুদ্ধ বায়ু ও আলো-তাপের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বোধ হইয়া থাকে। শিশু-পরিচর্য্যায় এ বিষয়টী প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শিশু শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে তাহার পরিচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে Cod Liver Oil মাখাইতে উপদেশ দেওয়া হয়। এই রোগে শিশু প্রায়ই কেবল খাদ্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকে। যাহাতে সে হাত পা নাড়িয়া যতদূর সম্ভব খেলা করিবার চেষ্টা করে, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় অল্পেই শিশুরা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। প্রতিষেধ-শক্তি-পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ

করে নাই বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগা শিশুদের একটী বিশেষ রোগ। সাধারণ নিয়মের অল্প ব্যতিক্রম হইলে সর্দ্দি ও পেটের পীড়া প্রভৃতি উৎপন্ন করিতে পারে। শিশুর বাসগৃহের তাপের পরিমাণ সদা সর্ব্বদা একই ভাবে রাখার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। রাত্রিকালে ঠাণ্ডা লাগার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিলেও, বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমাদের দেশে শিশু বৎসরের অধিকাংশ সময়ে খোলা গায়ে থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই; হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া কোন অসুখ না করে—ইহাই একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় হইবে।

পোষাক পরিচ্ছদ কোন প্রকারে দেহে আঁটিয়া থাকা উচিত নহে; রক্ত চলাচলের কোন প্রকারে ব্যাঘাত ঘটিতে দিবে না। সাধারণতঃ দেহখানি ঢাকা দিয়া ছেলেদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পা ও পাছা দেহের মতই ঢাকিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেহের একাংশে তাপ ও অপর অংশে ঠাণ্ডা লাগা ক্ষতিকারক।

আমরা ক্রমশঃ শিশুদের বিশিষ্ট রোগ ও তাহার পরিচর্য্যার বিষয় পাঠকগণকে অবগত করাইব। রোগ হইলে চিকিৎসার জন্য কোন পুস্তকের পাতার মধ্যে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কিন্তু পরিচর্য্যাই চিকিৎসার অঙ্গ এবং তাহা সদাসর্ব্বদাই প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং পরিচর্য্যাকারিণীর সদাসর্ব্বদা সে কথা স্মরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগ আসিবার সময় কাহাকেও জানাইয়া আসে না। অনেক সময় পূর্ব্ব হইতে বিধিমত পরিচর্য্যার ফলে রোগের গতি মন্দ দিকে যাইতে পারে না; সেই আশায় গৃহস্থগণের সুবিধার জন্য এই সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে।

যক্ষ্মার সহিত যুদ্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাসগৃহ নির্ম্মাণের আইন—বাসগৃহ বেশ স্বাস্থ্যের অনুকূল করিয়া নির্ম্মাণ করাই যক্ষ্মা প্রতিষেধের একটী প্রধান উপায়। যে সকল গৃহে বাস হেতু অতি শীঘ্র রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়, তাহাই যক্ষ্মার অনুকূল। অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত পল্লী হইতে বহু লোক সহরে আসিয়াছে ও আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে সহরে বিশেষ ভিড় হইতেছে এবং স্বাস্থ্য-হানি ঘটিবার সুযোগ হইতেছে; বিশেষতঃ লোকের ঘন বসতি বা বসবাস হইলে যক্ষ্মা বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হয়। কলিকাতা প্রভৃতি সহরে আইন দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে এবং ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। লোকে স্বাস্থ্যের কথা ভুলিয়া, জমির চূড়ান্ত দখল লইবার জন্য পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে, তাহা আপাততঃ অস্বাস্থ্যকর ও বাসের অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয়। আলোক ও বাতাস যাতায়াতের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকা চাই, কারণ শরীর রক্ষার জন্য আহারের ন্যায় উহাদেরও প্রয়োজনীয়তা কোন অংশেই কম নহে। শয়ন-গৃহের জন্য আলোক ও বাতাসের সুবন্দোবস্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

সাধারণতঃ পল্লীর দিকে স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আপাততঃ বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ম্যালেরিয়া যে সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহার কথা এস্থলে আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। মোট কথা, বাঙ্গলার পল্লীর স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য নষ্ট হইতে বসিয়াছে। তবে প্রচুর আলো ও বাতাস পাইবার সুবিধা থাকাতে শীত ও গ্রীষ্ম কাল, যখন পল্লীতে কোন রোগ থাকে না, যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে মন্দ নহে। যে সকল পল্লীতে আজও ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব হয় নাই, সে সকল স্থানে যক্ষ্মা-রোগীর বাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কিন্তু পল্লী-বাসের সুবিধাটুকু গৃহ-নির্ম্মাণের সাধারণ নিয়মগুলি রক্ষণে পল্লীবাসীর অজ্ঞতা হেতু নষ্ট হইয়াছে। গৃহগুলির বাতাস চলাচলের পথ অতি সঙ্কীর্ণ, জানালার একান্ত অভাব, এবং শীতকালে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ থাকা হেতু তাহা বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে যক্ষ্মা রোগী গৃহমধ্যে অপরের শরীরে যক্ষ্মা বিস্তারের বিশেষ সুবিধা পাইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামের দিকে আর একটী বিশেষ অস্বাস্থ্যকর অসুবিধা সৃষ্ট করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, উঠানের মধ্যে নানা রকম ফসলের গাছ পুঁতিয়া উঠান্ বা বাড়ীর চারিপাশ ভয়ানক স্যাতসেতে রাখা হয় এবং বাটীর আলো ও বাতাস চলাচলের পথ বন্ধ করা হয়। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে মহা হানিকর। বিশেষতঃ যদি যক্ষ্মা রোগী রাখিতে হয়, তাহা হইলে গৃহের চারিপাশ যতদূর সম্ভব বৃক্ষশূন্য—ফাঁকা রাখিতে হয়।

সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে বসতবাড়ীগুলি খুব কাছাকাছি হয় না, তাহাতে একটী বিশেষ সুবিধা হয়। কৃষক বা মুচী প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোকেরা প্রায়ই গ্রামের বাহিরে খোলা মাঠের মাঝে ঘর-বসত করে; ভদ্রলোক অপেক্ষা তাহাদের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো থাকার ইহা একটি প্রধান কারণ।

জনশিক্ষা—যক্ষ্মা বা অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি মানব-সমাজ হইতে দূর করিতে হইলে সাধারণের মধ্যে রোগ নিবারণ সম্বন্ধে জ্ঞান-বিস্তার—রোগ দূর করিবার একটী প্রধান সহায়। ইংরাজিতে বলে "Prevention is better than cure." রোগ-নিবারণ রোগ-আরোগ্য করা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহা অতি মূল্যবান্ কথা। রোগ আসিবার পর চিকিৎসা দ্বারা দূর করা অপেক্ষা রোগ একেবারে আসিতে না দেওয়া যে ভাল, সে বিষয়ে বুঝাইয়া বলিবার কিছু নাই। রোগ যন্ত্রণা ভোগ, শরীর ক্ষয়, অর্থ নষ্ট, মানসিক দুশ্চিন্তা, কার্য্যের ক্ষতি, এ সকলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—যদি রোগের আক্রমণ রোধ করা যায়।

পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে, যক্ষ্মা রোগ-প্রতিষেধ দ্বারা অধিকাংশে রোধ করা যাইতে পারে। যক্ষ্মা-বিস্তার-পদ্ধতির জ্ঞান আয়ত্ত থাকিলে অতি সাধারণ নিয়ম সকল পালনে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়; কিন্তু একবার রোগ আক্রমণ করিলে, নানা রকম অসুবিধা দুশ্চিন্তার কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রায়ই ইহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না।

আমাদের দেশে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা নানা দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা সেই অসম্পূর্ণতারই একটী অঙ্গ। ইউরোপ ও আমেরিকা যে যক্ষ্মা জয় করিবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাহার একটী প্রধান অস্ত্র—স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে আপামর সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার। শিশু ও বালকদিগকে অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাই উত্তমরূপে ও ব্যবহারিকভাবে দেওয়া হইয়া থাকে। চলচ্চিত্র বা চিত্রপট দ্বারা শিক্ষা দেওয়াতে তাহা অধিক মাত্রায় হৃদয়গ্রাহী হয় ও বহুদিন স্মরণ থাকে।

তথায় সাধারণের মধ্যে বক্তৃতা, চলচ্চিত্র, পুস্তিকা-বিতরণ প্রভৃতির দ্বারা ও সভা-সমিতি গঠন করিয়াও রোগ দূর করিবার জন্য লোককে সচেষ্ট হইতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এখন প্রায় এমন ক্ষুদ্র সহর-পল্লী নাই যেখানে রোগ-জয়ের সেনা সর্ব্বদা সজ্জিত নাই। সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারে সুফলই হইয়া থাকে। লোকে নিয়ম পালন করিতে করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন আর আইনের কড়াকড়ি কষ্ট দিতে পারে না। মানুষ মাত্রেই সদা-সর্ব্বদা কতগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতেছে; কিন্তু সে তাহা মোটেই অনুভব করে না। যখন কোন নিয়ম প্রথম প্রচলিত হয়, তখন প্রতি পদে পদে বাধা অনুভূত হয়; কিন্তু পরে যদি ঐ নিয়মের কোন প্রতিকূলাচরণ করা হয়, তখন ঐ নিয়মের কথা স্মরণ হয় বা অপরে করাইয়া দেয়।

শিশুদিগের মধ্যে স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারে

বিশেষ সুফল হইয়া থাকে। তাহারা নিজেরা ঐ সকল বিষয় আলোচনা করে এবং কাহাকেও কোনরূপে যদি তাহার শিক্ষিত বিষয়ের বিরুদ্ধে কোন কায করিতে দেখে তখনই তাহার প্রতিবাদ করে। ঐ সকল ছাত্রের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়া অপরের যথেষ্ট সহায়তা করে এবং প্রকৃত শিক্ষা দুইচারিজন ছাত্রের হইলে প্রায় সকলেরই শিক্ষার কায করে।

বাজারে, হাটে, যে সকল স্থানে প্রচুর লোক সমাগম হইয়া থাকে, সে সকল স্থানে বক্তৃতা প্রভৃতিতে বিশেষ ফল হয়। লোকে যদি নিজের বিপদ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তাহাদিগকে সতর্ক করিবার যুক্তি দেয় এবং লোকে সাবধানতা অবলম্বন করে।

রোগের বিজ্ঞাপন।—রোগ হইলে বা রোগের পূর্ব্বাবস্থার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, তাহা সাধারণকে বিশেষতঃ যদি কোন স্থলে মিউনিসিপ্যালিটী বা সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগ বা ঐরূপ কোন জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান থাকে, তাহা হইলে তাহা জানান হইবে কি না তাহা একটী বিশেষ চিন্তার কথা। অবশ্য যদি এ সকল স্থান হইতে সুলভে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে রোগের অবস্থা জ্ঞাপন করায় বিশেষ সুবিধা আছে। কোন এক পরিবারে যদি একটী রোগের কথা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে পরিবারবর্গের সাবধানতা অবলম্বন করিবার অনিচ্ছা বা উপেক্ষা থাকিলেও স্বাস্থ্যবিভাগের লোক গিয়া সজাগ করিয়া অপরের মধ্যে প্রতিষেধের নিয়মগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এবং সম্ভব হইলে রোগীর চিকিৎসারও ভার লইতে পারে।

রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে, লোক ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই স্বাস্থ্য-সভাতে জানাইতে পারে; কিন্তু এরূপ অবস্থায় আসিবার পূর্ব্বে সাধারণের মধ্যে এই সকল বিষয়ের উপকারিতা বহুল পরিমাণে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি সম্ভব হয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়া আইন পাশ করাইয়া লওয়া মন্দ নহে। যতদিন এরূপ না হয়, স্থানীয় চিকিৎসকেরা পরস্পরের সাহচর্য্যে এরূপ ভাবের কার্য্য চালাইতে পারেন।

যক্ষ্মা রোগ প্রকৃত পক্ষে কোন চিকিৎসারই অধীন নয় বলিয়াই যক্ষ্মার বিস্তার সাধারণের এত চিন্তার কারণ হইয়াছে। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগ এক কালে মহামারী উপস্থিত করিয়া বহু লোকের মৃত্যু সংঘটিত করিত এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া লোকের মনের মধ্যে বিভীষিকার ছবি সদাই জাগরূক রাখিত। এখনও কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে বহুলোকের মৃত্যু ঘটিতেছে, তথাপি ঐ সকল রোগের শাস্ত্রীয় চিকিৎসা আছে—কেবল এই সাহসেই রোগের আশঙ্কা লোকের মন হইতে বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায় একটী উৎকট মহামারী রোগ অপেক্ষা ঐ রোগের আতঙ্ক হইতে অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যক্ষ্মার যে প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা নাই, ইহাই এই রোগের গুরুত্ব প্রমাণ করে এবং রোগী ও সাধারণের মধ্যে ভীতির প্রচার করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে।

যক্ষ্মার প্রকৃত চিকিৎসা—রোগ ঘটিবার পরে রোগের বিস্তার বন্ধ করা এবং ক্ষত সারিয়া লইবার জন্য দেহের স্বভাবিক প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা। ফুসফুসের যক্ষ্মাতে প্রকৃত পক্ষে কোন চিকিৎসারই উল্লেখ করা যায় না। স্বভাব-সিদ্ধ সরল উপায়ে যাহাতে দেহ-যন্ত্রখানি চলিতে পারে, সেই উপায় করাই একমাত্র চিকিৎসা। আমরা সেই সম্বন্ধে ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

ক্ষত ঘটিবার পর ক্ষতস্থান হইতে নির্গত বিষ দেহের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং দেহের অন্যান্য অংশ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ঐ বিষক্রিয়া নানারূপে প্রকাশ পায় এবং যক্ষ্মার লক্ষণরূপে গণ্য হয়। বিষের শোষণ যত কম পরিমাণে ঘটে, রোগীর পক্ষে ততই মঙ্গলের বিষয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যক্ষ্মার কোন উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা না থাকায়, চিকিৎসকেরা যক্ষ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিবামাত্র

রোগী ও তৎপরিজনের মানসিক অবসাদ ঘটে। ইহা রোগ বিস্তারের সহায়ক। বোধ হয় বিধির বিধানে সেই কারণেই হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের রোগে অনেক লোকের মনে বাঁচিয়া থাকিবার আশা বলবতী থাকে, এবং রোগী প্রায় সকল সময়েই মনের মধ্যে ধারণা পোষণ করে যে, তাহার রোগ-যন্ত্রণা অবসানের আর বিশেষ বিলম্ব নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণতঃ রোগী মাঝে মাঝে মনে করে যে, তাহার উৎকট ব্যাধি তাহার কালরূপে আসিয়াছে এবং শীঘ্র বা বিলম্বে তাহার নিস্তার নাই। মনের এইরূপ অবস্থা রোগ আরোগ্য হইবার বিশেষ পরিপন্থী। তদ্ব্যতিরেকে সাধারণ মানসিক অবস্থার উপরেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে রোগ বিস্তৃতির বিশেষ সুবিধা ঘটিয়া থাকে। সংসার-প্রতিপালন বা ব্যবসা প্রভৃতির চিন্তা রোগীর মন হইতে যতদূর সম্ভব দূরে রাখা প্রয়োজন। আবার কর্ম্মক্ষম হইয়া নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিলে, রোগের চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ প্রয়োগ করা হইল। সাধারণতঃ সারিয়া উঠিবার বহুপূর্ব্বেই রোগী তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহা কোনরূপেই ঘটিতে দেওয়া উচিত নহে। একজনের উপরের সমস্ত ভার অপরের উপর ন্যস্ত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু রোগের গুরুত্ব বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেই হয়। মানসিক শান্তি এই রোগের একটী প্রধান অঙ্গ এবং এই শান্তি যতদূর সম্ভব অব্যাহত রাখিতে হয়। অসুস্থ শরীরের উপর সহনাতিরিক্ত ভার পড়িলে শরীর শীঘ্রই অপটু হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা, এবং সুস্থ সবল শরীর লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া লাভবান হওয়া যায়, তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া রোগীকে সাময়িকভাবে বিরত রাখা প্রয়োজন। সংসারের ভার অপরের উপর ন্যস্ত করিয়া রোগীর চিন্তা দূর করাই বিধেয়। কোন প্রকারেরই চিন্তা রোগীকে যাহাতে বিপর্য্যস্ত না করে, যথাসম্ভব সেই ব্যবস্থাই করা উচিত; কারণ দেখা যায়, মানসিক অবস্থা এই জাতীয় রোগের ক্ষতি-বৃদ্ধির জন্য অতি মাত্রায় দায়ী।

ফুসফুসের যক্ষ্মাতে দেহের সকল যন্ত্রেরই কার্য্য অতি দ্রুত পরিচালিত হইয়া থাকে এবং সেই কারণে দেহের নানা অংশের ক্ষয় অতি শীঘ্র সংঘটিত হয়। এ ক্ষেত্রে দেহের ক্ষয় রক্ষা করা প্রধান কর্ত্তব্য; তাহাতে অনতিকালের মধ্যে দেহের পুনর্গঠনের সুবিধা উপস্থিত হইতে পারে। বিশ্রাম—দৈহিক ও মানসিক—এই কার্য্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। মনের বিশ্রাম নিদ্রা ব্যতীত ঘটা সম্ভব নহে; কিন্তু যদি জাগ্রত অবস্থায় চিন্তার গভীরতা না থাকে, তাহা হইলে সেই চিন্তা বিশ্রামের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে; উপরন্তু আনন্দদায়ক চিন্তায়, মন বিশ্রাম লাভ করা অপেক্ষা বহুগুণ ফল পায়। রোগীর পক্ষে দেহের বিশ্রাম লাভ করা কঠিন নহে, নতুবা যদি কোন অসুবিধা থাকে, তাহা দূর করাই প্রয়োজন। যক্ষ্মার চিকিৎসার মধ্যে রোগযুক্ত স্থানের পূর্ণ বিশ্রামই একটী প্রধান অঙ্গ। স্বভাবতঃ রোগী তাহার রোগ-গ্রস্ত ফুসফুসকে বিশ্রাম দিবার জন্যই, অজ্ঞাতসারে সেই দিকে পাশ ফিরিয়া শয়ন করিয়া থাকে; তাহাতে ঐ ফুসফুসটী বক্ষঃস্থলে আশ্রয় পায় এবং চাপ পাওয়াতে ঐ ফুসফুসের ক্রিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে।

সাধারণতঃ দেখা যায় কোন কঠিন কার্য্য সম্পাদন কালে, শ্বাস-প্রশ্বাস অতি দীর্ঘ ও দ্রুত সম্পন্ন হয়; দণ্ডায়মান অবস্থায় তদপেক্ষা অল্প হয় এবং উপবিষ্ট ও শয়নাবস্থায় ক্রমশঃ স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়া ক্রমশঃ অতি ধীর হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সহিত হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ারও হ্রাস ঘটে। দেহের ক্রিয়া যত দ্রুত হয়, ক্ষতের বিষ তত শীঘ্রই দেহে ছড়াইয়া পড়ে এবং দেহ-মধ্যে মিশিয়া যায়। বিশ্রামের ফলে এই কার্য্যে বিঘ্ন ঘটে, এবং জ্বর, দেহের ক্ষয় প্রভৃতি লক্ষণ সকল শীঘ্রই দূর হইতে থাকে। বিশ্রামের ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার হ্রাস হওয়াতে রক্ত চলাচলও ধীরে ধীরে হইয়া থাকে;

ইহাতে দেহ-মধ্যে রোগ স্থানান্তরে যাইবার সুবিধা অল্প, এবং রোগীর পক্ষে ইহা নিতান্ত অল্প লাভের নহে।

রোগের নামই সূচিত করে যে, ইহাতে দেহের আক্রান্ত অংশের তথা সমস্ত শরীরেরই ক্ষয়-সাধন হয়। মানবের জ্ঞানগম্য ক্ষয় নিবারণের যত রকম উপায় আছে, তন্মধ্যে সেই অংশের বা যন্ত্রের বিশ্রামই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পন্থা। সেই জন্য বিশ্রামের কথা আমরা এত বিশদভাবে বলিতেছি। রোগীকে তাহার নিজের কার্য্যের জন্য শারীরিক কোন পরিশ্রম করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহার সমস্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য সদাসর্ব্বদা একজন লোক নিযুক্ত থাকা প্রয়োজন। অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রমের জন্যও লোকের সাহায্য লইতে হইবে। সাধারণতঃ রোগী দুর্ব্বলতা বা অন্য কারণে বাহিরের সকল কার্য্য বন্ধ করিয়াও, অনেক সময় আপনার প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি যথা, মুখ প্রক্ষালন, গাত্র মার্জ্জন, স্নান প্রভৃতির জন্য যে পরিশ্রম করে, তাহাতেই যথেষ্ট ক্লান্তি বোধ করে এবং অজ্ঞাতসারে শরীরের ক্ষতি করে। রোগীকে কোনরূপই পরিশ্রম করিতে দেওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ যদি রোগী কোনরূপে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে, তাহার পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা হওয়া তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন। পরিবার-বর্গের মধ্যে লোকের অভাবেই হউক বা অদূরদর্শিতার ফলেই হউক, রোগী আপনার প্রয়োজন মত কোন কার্য্যের জন্য কাহাকেও অনুরোধ করিলে, তাহাতে কোন-রূপে বিরক্তি প্রকাশ করিতে নাই। সম্ভবতঃ অক্ষমতা হেতু রোগী ঐরূপ অনুরোধ করিয়া থাকে। এরূপ দেখা যায় যে, চিকিৎসক বা অপরের কথামত রোগীর সেবার জন্য লোক নিযুক্ত করাতে এবং রোগীর সকল প্রকার পরিশ্রম বন্ধ হওয়াতে, রোগীর জ্বর প্রভৃতি অতি সত্বর দূর হইয়াছে। ইহাই যে চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্যিভূত ফল, সে বিষয় বলাই বাহুল্য। কয়েকদিন মাত্র এইরূপ বাঁধা-ধরা নিয়মের ফলে, শীঘ্রই রোগী নিজ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইতে পারে।

প্রত্যহ বা প্রায় সকল সময়েই অরাবস্থা, সর্ব্বদাই দ্রুত নাড়ীর গতি, চঞ্চলতা প্রভৃতি লক্ষণ মাত্রেই রোগীর সকল প্রকার পরিশ্রম বন্ধ করিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে হয়। কেবল মাত্র জ্বর লক্ষণেই রোগীকে বিছানায় আবদ্ধ রাখা অনেক সময় যুক্তিযুক্ত নহে, তবে স্থূলতঃ উহাকেই প্রধান লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ওজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকল ব্যবস্থা করাই মঙ্গল। যদি জ্বর সত্ত্বেও রোগীর ক্ষয়-লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে সতর্কতার বন্ধন অতি কঠিন করিবার প্রয়োজন নাই।

কাহারও কাহারও মতে রোগ লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রোগীকে বিছানায় বিশ্রামের জন্য পরামর্শ দেওয়া যুক্তিযুক্ত। অবশ্য এই ভাবে পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বনের সুবিধা আছে। রোগীকে রোগের প্রথম অবস্থা হইতেই প্রয়োজনানুযায়ী বিশ্রামে অভ্যস্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে রোগ মুক্তির পরবর্ত্তী কালীন্ বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা কমাইয়া দিতে পারে। রোগ গুরুতর আকার ধারণ করিলে, সাধারণতঃ রোগ-মুক্তির জন্য সময় অধিক পরিমাণে ক্ষয় হয়, উপরন্তু পরবর্ত্তীকালের সময়ও অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়। এই বিশ্রামের কালে রোগীর সময়ের কিয়ৎপরিমাণে সদ্ব্যবহার করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহাকে রোগ সম্বন্ধে কোন পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া যাইতে পারে এবং রোগের আক্রমণ প্রভৃতি অংশ বাদ দিয়া সংক্রামণ ও সাধারণ নিয়ম পালন বিষয়ক অংশগুলি যত্ন সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করা যাইতে পারে। তাহাতে রোগী যে কেবলমাত্র নিজেই লাভবান হয় তাহা নহে, রোগের সংক্রামণ প্রভৃতি বন্ধ করিবার উপায় নিজেই করিতে পারে। ইতোমধ্যে চিকিৎসক আসিয়া পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দিয়া যাইতে পারেন।

যক্ষ্মা দেহের কোন এক বিশিষ্ট স্থান, যথা—ফুসফুস আক্রমণ করিলেও, স্থূলতঃ ইহা সমস্ত দেহেরই ব্যাধি, কারণ শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রোগ-লক্ষণসকল

দূর হইতে দেখা যায়। সেই কারণে যাহা দেহের পক্ষে উপকারী, তাহা রোগাক্রান্ত অংশের পক্ষেও উপকারী, তাহা বলাই বাহুল্য। যক্ষ্মা আত্মপ্রকাশ করিবার পরও বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে তাহাতে আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং রোগের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ক্ষত হইতে বিষ ছড়াইয়া যে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা সহ্য করিবার শক্তি নানা দেহে নানা ভাবেই থাকে। বিশ্রামের জন্যও সকলের একই ব্যবস্থা হওয়া সুবিবেচনার কার্য্য নহে। রোগী বিশেষে সতর্কতার মাত্রা নিরূপণ করিয়া লওয়া ভাল। একজনের পক্ষে যাহা যথেষ্ট, অপরের পক্ষে তাহা সমান ফলপ্রদ না হওয়াই সম্ভব। সুস্থ শরীরেই নানাপ্রকার বিশ্রাম বিভিন্ন লোকের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, অসুস্থ শরীরে যে তাহা আরও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এতদ্ব্যতিরেকে রোগের প্রকাশের নানারূপ ধারা, ও রোগের গুরুত্ব হিসাবে বিশ্রাম, চিকিৎসা প্রভৃতি স্থির করিয়া লওয়াই রোগীর পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক।

বিশ্রামের ফল অবশ্যই অতি শীঘ্র উপলব্ধ হয় এবং যদি কোন বিশেষ কারণের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই লক্ষণ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম লাভ করাই প্রয়োজন। লক্ষণ দূর হইবার পরও কিছুকাল স্থিরভাবে থাকাতে বিশেষ লাভ হয়। গাত্র সঞ্চালনে রোগ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; সেই কারণে যে পর্য্যন্ত সেরূপ বিপদের সম্ভাবনা আছে, ততদিন রোগীর বিশ্রাম করাই লাভজনক। তৎপরে ধীরে ধীরে নিজ কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিতে দেওয়া যাইতে পারে। উঠিয়া বসা, জামা পরা, দাঁত মাজা, প্রভৃতি কাজ চেয়ারে বসিয়া সম্পন্ন করিতে দেওয়া যায়। যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় হইলে বিছানা পরিত্যাগ করিয়া পাদচারণা করা যায় এবং শক্তি ও সুবিধা মত এই সময় বৃদ্ধি করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রাতরাশের পর প্রথম প্রথম চলা ফেরা করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে, এবং এই কার্য্যের পর বিশ্রামই অধিকমাত্রায় প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। সামান্য পরিশ্রম-সিদ্ধ কাজ এইকালে করা যায় এবং যতদূর সম্ভব গৃহের বাহিরে রোগীকে রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসক রোগীর অবস্থা ও কাল বিশেষে রোগ লক্ষণের একটী ধারণা করিয়া লইতে পারেন, এবং রোগের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহা চিকিৎসার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় এবং প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার উপরেই চিকিৎসার ব্যবস্থা বহু পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। রোগ-অবস্থানুযায়ী বিশ্রাম নির্দ্দেশ করা বিধেয় এবং প্রয়োজন হইলে তাহার বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ বিকাল বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সকল প্রকার বিশ্রামের ব্যবস্থা হওয়াই মঙ্গল এবং দেখা যায়, অভ্যাসমত রোগী এই সময় নিদ্রাগত হইয়া থাকে।

বিশ্রাম কালীন অবস্থার সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। বিছানায় শয়ন করিয়া শরীরকে আরাম দেওয়াই সকল বিশ্রামের সার বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। হেলান দেওয়া কেদারা বিশ্রামের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক দ্রব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। বিশ্রামের সময় কোনরূপ শারীরিক অসুবিধা না হয়, তাহাই বিশেষ যাহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কেদারাতে পা ছড়াইয়া বেশ আরামে হেলান দেওয়া যাইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থাই হওয়া উচিত। সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়াতে বা পা গুটাইয়া কেদারাতে শয়ন করাতে হজম ও নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে পারে এবং রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা বিশেষ হানিকর। কেদারা খানিতে শীতবস্ত্র গ্রহণের মত স্থান থাকা ভাল এবং শীত বস্ত্র গ্রহণ করিলেও যাহাতে হস্ত পদাদি সঞ্চালনের কোন অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার।

বিশ্রাম করিবার স্থানটী বেশ রৌদ্র ও বায়ু চলাচলের পথ সংযুক্ত হওয়া মঙ্গলজনক। গৃহের বারান্দা

বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান—যদি প্রয়োজন মত শীতল বায়ু ও তীক্ষ্ণ রৌদ্র আগমনের পথ নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহা হইলে উহাই দিবা কালের জন্য এমন কি সহ্য করিতে পারিলে রাত্রিকালের জন্যও বিশেষ উপযোগী। যাহাতে শীতল বায়ু লাগিয়া সর্দ্দি প্রভৃতি উৎপন্ন না করে, তাহাই প্রধান লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হওয়া বিধেয়। অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগা যেমন অনিষ্টকর, অত্যধিক রৌদ্রও সেইরূপ ক্ষতি করিতে সমর্থ। শীতের জন্য উপযুক্ত বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া রাখিতে পারিলে খুব শীতকালেও বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না। রৌদ্রের জন্য আড়াল করা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা সম্ভব নহে। অত্যধিক রৌদ্র লাগায় দেহের তাপ বৃদ্ধি পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা এবং জ্বর না হইলেও মাথা ধরিয়া নানারূপ কষ্ট দিতে পারে; সেই কারণে দেহে রৌদ্র লাগিলেও মাথায় কোনরূপে রৌদ্র লাগিতে দেওয়া বিহিত নহে। শীত, রৌদ্র, বর্ষা হইতে রক্ষা করিয়া রোগী যাহাতে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের সুবিধা পায়, বিশ্রামের স্থান নির্ব্বাচনে তাহাই প্রধান লক্ষ্য করা উচিত। বিশুদ্ধ বায়ুই যে যক্ষ্মার একটী প্রধান ও প্রয়োজনীয় ঔষধ, তাহা এখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ফুসফুসের যক্ষ্মায় বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক।

দিনের ন্যায় রাত্রিকালেও রোগীর যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু পাইবার কোনরূপ অসুবিধা না ঘটে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে হয়। শীত বোধ না করে, এই ভাবে দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া শীত গ্রীষ্ম সকল কালেই ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়া শয়নের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। নিদ্রাকালে গরম আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তা জাগ্রত অবস্থার অপেক্ষা অধিক, কারণ নিদ্রাকালে শরীরের সকল অংশই শিথিল থাকে এবং ঐ অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক হয়। চিকিৎসার প্রাক্কালে ঠাণ্ডা প্রভৃতি সহন-ক্ষমতা অত্যন্ত অল্প থাকে; সেই কারণে শরীরের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করাই মঙ্গলজনক।

বায়ু চলাচলের যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকিলেই রোগীর বাসের উপযোগী ঘর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গৃহ মধ্যের তাপ বাহিরের তাপের সহিত সামান্য তফাৎ থাকাই স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী। বাহিরের ঠাণ্ডা যদি অধিক হয়, এবং রোগী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া নাসা পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া শয়নের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা বিশেষ ক্ষতিজনক এবং রোগীর সহ্যমত গৃহের তাপ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। সকলের পক্ষে এবং সর্ব্ব সময়েই নাসিকা আবৃত করিয়া শয়নে ক্ষতি আছে, রোগীর পক্ষে তাহা বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য।

শীত সহ্য করিবার শক্তি ক্রমে ক্রমে রোগীকে সঞ্চয় করিতে দিতে হয়, তাহা না হইলে রোগী যেমন এক পক্ষে অসুস্থ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা, অপর পক্ষে রোগী বিরক্ত হইয়া আপনা হইতেই সুবিধামত ব্যবস্থা করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং তাহা অধিকাংশ সময়েই স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ারই সম্ভাবনা।

(ক্রমশঃ)

বাংলাদেশে আজ প্রায় পঁচিশ হাজার লোক যক্ষ্মায় ভুগিতেছে; প্রায় সাত হাজার লোক প্রতি বৎসর যক্ষ্মার কবলে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর এই ব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িতেছে!

আমার আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা*

(শেষাংশ)

[শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র গুহ (গোবর)]

আমার আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রকাশমান প্রবন্ধমালার ইহাই হইল শেষ অংশ। অবশ্য ইহাতে আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতার সকল কথা বলা হইল না। কারণ আমি প্রায় সাত বৎসর কাল আমেরিকায় ছিলাম। এই সাত বৎসরের কার্য্যাবলী বিস্তৃতভাবে পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আমার চুক্তি ছিল পাঁচটি প্রবন্ধ লিখিবার; কাযেই ইহার মধ্যে যতটা পারি, আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়া গেলাম।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার পুরাতন বন্ধু টমি ড্র্যাক্‌কে কেমন পাল্‌টা জবাব দিয়াছিলাম, প্রধানতঃ সেই বিষয় আলোচনা করিব। পাঠকগণ বোধ হয় ভুলিয়া যান্ নাই যে, ইতঃপূর্ব্বে কি অসহায়ভাবে বিজাতীয় আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া, কিরূপ নিষ্ঠুর অবিচারের ফলে আমাকে পরাজয়ের কালিমা মাখিতে হইয়াছিল! যাহাহউক, ইতোমধ্যে আমেরিকা-চলিত কুস্তীর কায়দা-কানুন্ মোটামুটি রকম আয়ত্ত করিয়া, যখন দ্বিতীয়বার মল্ল-ভূমিতে ড্র্যাকের সম্মুখহীন হইলাম, তখন বিজয়-লাভের বিষয়ে একেবারে স্থির-নিশ্চিত রহিলাম।

আমেরিকাবাসী শরীরোৎকর্ষ লাভের নিমিত্ত কিরূপ আগ্রহান্বিত এবং সেই আগ্রহকে চরিতার্থ করিতে কি কি অবদানের সৃষ্টি করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে যাহা যাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রবন্ধ-শেষে দিবার চেষ্টা করিব।

পাঠকগণ যদি আমার আমেরিকায় পরবর্ত্তী কার্য্যাবলী জানিতে সমুৎসুক হন্, অর্থাৎ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুরুভারোত্তলনকারী ষ্ট্যাংলার সিউইস্, রাসিয়ার জগদ্বিখ্যাত পালোয়ানু ষ্ট্যানিলাস্ জিস্কো ও তাঁহার ভ্রাতা ওয়াল্‌ডেক্ জিস্কো, পর্বত সদৃশ বৃহৎকায় প্রথিতযশা তুর্কদেশীয় কুস্তিগীর মহম্মদ এবং অন্যান্য বহুতর প্রসিদ্ধ পালোয়ানের সহিত আমার মল্ল-যুদ্ধের কাহিনী সবিশেষ শুনিতে চাহেন, তাঁহা হইলে এই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে এ বিষয়ে আমার সহিত পুনরায় কথা কহিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন।

আমার বিগত প্রবন্ধে আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, কেমন করিয়া আমি জো স্কালজ্‌কে চিকাগো কলিসিয়ামে ঘোল খাওয়াইয়া ছাড়িয়াছিলাম। এই বিজয়লাভের অব্যবহিত পরেই সমগ্র আমেরিকায় আমার নাম ছড়াইয়া পড়িল এবং আমেরিকার খেলোয়াড়-মণ্ডলীর চক্ষে আমি যেন হঠাৎ একটা "কেষ্ট বিষ্ণু" গোছের হইয়া পড়িলাম। কুস্তির প্রতিযোগীতা করিবার জন্য অযোচিতভাবে চারিদিক হইতে বেশ লাভ-ও লোভজনক প্রস্তাব আসিতে লাগিল এবং আমি ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইলাম না—কেমন করিয়া এতগুলি লোকের সহিত অদূর ভবিষ্যতে লড়া সম্ভবপর হইবে। যাহাহউক, এই সকল প্রস্তাবের বোঝা বিবেচনার জন্য আমার ম্যানেজার মিঃ ডেলিভাকের স্কন্ধে চাপাইয়া একরূপ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মিঃ ডেলিভাক্ ও আমেরিকার নামজাদা কুস্তী-পরিচালক মিঃ ফিজ্‌মন্স্ উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই সকল প্রস্তাবের যোগ্যাযোগ্যতা বাছাই করিয়া ব্যাপারটাকে সরল করিয়া ফেলিলেন্। ইহার পর আমেরিকায় যে কয় বৎসর

* প্রকাশক কর্ত্তৃক প্রবন্ধের সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত। শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু কর্ত্তৃক মূল ইংরাজি হইতে অনুবাদিত।

কাটাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে প্রত্যেক কুস্তীর মরসুমে বিশ্রাম বলিয়া কোনো জিনিসকে উপভোগ করিবার আদৌ সময় পাই নাই।

চিকাগো সহরে আমি খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিলাম এবং লোক আমার নামে পাগল হইয়া উঠিল। ঐ সহরের কয়েকজন পাণ্ডা মিলিয়া একদিন ওয়াই-এম্-সি-এ ভবনে একটা প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিল; উদ্দেশ্য---এই উপলক্ষ্যে তাহারা চিকাগোর সকল বিদ্বান ও পদস্থ ভদ্রমণ্ডলীর নিকট আমাকে পরিচিত করিয়া দেওয়া। ইহার উদ্যোক্তাগণ আমাকে আড়াই শত ডলার পারিশ্রমিক দিলেন—কুড়ি মিনিট কাল মাত্র ভারতীয় কুস্তি-ফসরৎ দেখাইবার জন্য। আমার প্রদর্শনী দেখিয়া সকলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। পরিশেষে সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইল।

ওয়াই-এম্-সি-এ-গৃহে সম্মিলনীর দুই দিন পরে বাফেলো হইতে আমার ম্যানেজার আমাকে এক তার পাঠাইলেন—যত শীঘ্র সম্ভব তথায় যাইবার জন্য। তদনুসারে আমরা পরদিন রাত্রি আটটার সময় বাফেলোয় গিয়া উপস্থিত হইলাম। ম্যানেজার আমাদের অপেক্ষায় ষ্টেসনেই হাজীর ছিলেন; তিনি সহাস্যে আমার কর-মর্দন করিলেন্ এবং জিজ্ঞাসা করিলেন্—আমি কেমন আছি। আমি উত্তর করিলাম যে, ওস্তাদের হাতের বেহালার মত আমি বেশ দোরস্ত এবং যে কোনো জবর গোছের পালোয়ানের সহিত দুই এক হাত লড়িতে রীতিমত তৈয়ারী আছি। তারপর কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—হল্যাণ্ডের সর্বজয়ী পালোয়ান, আমার পুরাণো দোস্ত টমি ড্র্যাকের বিরুদ্ধে যদি আমাকে আর একবার খাড়া করিয়া দেওয়া যায়, তাহাহইলে আমি তাহা কি ভাবে গ্রহণ করিব। এ প্রস্তাব শুনিয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলাম; এত শীঘ্র যে আমার অন্যায় পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইব, তাহা আমার ধারণার অতীত ছিল। আমি অধীর আনন্দে ম্যানেজারের প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। কিন্তু ম্যানেজার বলিলেন যে, টমির প্রতিযোগীতায় বড় বিশেষ কিছু লাভবান্ হওয়া যাইবে না, কারণ টমির তরফ হইতে যে টাকার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অধিক। আমি পরাজিত, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া মল্লভূমিতে টানিয়া লইয়া আসার গরজ আমারই স্বভাবতঃ বেশী হওয়া উচিত—এ সত্যটি মনে মনে ভালো রকম উপলব্ধি করিয়াই টম্ এতটা মোটা রকমের দর হাঁকিয়া বসিয়াছিল। আমার ম্যানেজার আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বাস্তবিকপক্ষে এই প্রতিযোগীতা খুব বেশী সংখ্যক দর্শক টানিতে ও ফলতঃ বেশী পরিমাণ অর্থাগম করিতে পারিবে কিনা তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এক কথায় তিনি আমার ধারণা জন্মাইয়া দিলেন যে, ব্যবসার দিক দিয়া এ কুস্তি-প্রতিপক্ষতা খুব কৃতকার্য্য হইবে না। সত্য কথা বলিতে কি, যেখানে মানুষ নিজের ব্যাহত সম্মানকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, সেখানে অর্থের চিন্তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। কাযেই টাকার দিকে দৃক্পাত না করিয়া, আমি আমার ম্যানেজারকে বলিলাম—তৎক্ষণাৎ ড্র্যাকের নিকট এই মর্মে টেলিগ্রাম করিয়া দিতে যে, ড্র্যাক্ যে-যে সর্ত্ত উপযুক্ত বিবেচনা করেন, সেই-সেই সর্ত্তেই আমি তাঁহার সহিত অদূর ভবিষ্যতে লড়াই করিতে প্রস্তুত আছি। যথাসময়ে সেই তারের এইরূপ জবাব আসিল:—

"Tommy Drak will meet Gobar the Hindu Crack on the 19th April Want 1000 dollars guarantee with 30 °/₀ of the gross taking George Bothner (ex-light-weight Champion wrestler) to be the third man in the ring Wire confirmation atonce."

এই তারের খবরটি সাধারণ পাঠকের নিকট একটু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতে হইবে। "1000 dollars guarantee" মানে—ড্র্যাক্ জিতুন, হারুন্ বা আমার সহিত সমান-সমান হউন, এক হাজার ডলার (এক

ডলার তিন টাকার কিছু বেশী) আমার তরফ হইতে তাঁহাকে সেলামী দিতে হইবেই। তার উপর তাঁহাকে বখ্রা দিতে হইবে—"30 °/₀ of the gross taking." অর্থাৎ দ্বার-মুখে যে টিকিট বিক্রয়-লব্ধ অর্থ-সমাগম হইবে, নিখরচায় তাহার শতকরা ত্রিশ ভাগ। তদুপরি জর্জ বথনারকে তাঁহার মনোমত রেফারীও নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছেন। পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ড্র্যাক্ সকল দিক দিয়া কেমন ভাবে নিজের কোলে ঝোল্ টানিয়াছেন। যাহাহউক্, এস্পার কি ওস্পার, ড্র্যাক্‌কে যে কোনো রকমেই হউক্ হারাইয়া গায়ের ঝাল্ মিটাইতে হইবে—এই চিন্তাতেই তখন আমি অস্থির; কাযেই অত-শত চিন্তা না করিয়াই আমি সেই প্রস্তাবের সমর্থন-সূচক একখানা টেলিগ্রাম তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিলাম।

তারপর আমি প্রদীপ্ত স্ফূর্ত্তিতে কুস্তীর মহালা দিতে সুরু করিলাম। আমার চিরাগত দুর্ভাগ্য-বশতঃ এবারও কোনো নাম্‌জাদা বা পুরাদস্তুর ওয়াকিব-হাল্ রকমের ওস্তাদ পাইলাম না। কাযেই বনমালীকে লইয়াই আমার সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। কিন্তু তাহার সহিত শরীর ভাঁজিয়া গায়ের ঘাম বাহির হয় না বলিয়া, আমাকে ডন্, বৈঠক্ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যায়ামের নিয়মিত শরণ লইতে হইত। তখন আমেরিকার আব্‌হাওয়া আমার চমৎকার সহ্য হইয়া গিয়াছে; ক্ষুধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহারের মাত্রাও বেশ দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিতেছিল। প্রকৃত পক্ষে আমার শরীরের সুন্দর উন্নতি হইতেছিল।

অবশেষে প্রতিযোগীতার দিন ঘনাইয়া আসিল; আমার শরীর-মনে বল ও বিশ্বাস যেন আর ধরে না। ঘটনার দিন শরীরটি ভালো করিয়া ডলাই-মলাই করাইয়া, পেট্ পুরিয়া খুব এক চোট্ আহার করিয়া লইলাম। তারপর সারা দ্বিপ্রহর স্বামী বিবেকানন্দের একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া, বৈকালের দিকে ঘুমাইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা ছয়টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর আরামের সহিত গা-হাত-পা ধুইয়া লইয়া, ঘরে-তৈয়ারী লেমনেড্ পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। তারপর বনমালীকে লইয়া যুদ্ধভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

সেখানে পঁহুছিবামাত্র ম্যানেজার কর্ত্তৃক আমাকে সাজ-ঘর দেখাইয়া দেওয়া হইল। তাহার মধ্যে আমি জিনিস-পত্র গোছ্-গাছ করিয়া লইতেছি, এমন সময় দেখি—টমি ড্র্যাক্ তথায় আসিয়া হাজীর। আমি তাহাকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া গেলাম; কারণ প্রচলিত রীতি অনুসারে উভয় প্রতিপক্ষকে প্রতিযোগীতার পূর্বে এক কক্ষে একত্র থাকিতে বা ঘনিষ্টভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় না; ইহার প্রধান কারণ আমার এই বলিয়া মনে হয় যে, যাহাতে এইরূপ দেখা সাক্ষাতের ফলে উভয়ের মধ্যে একটা কোনো গোপন চুক্তি না হইয়া যায়, যদ্দারা এক পক্ষ মোটা টাকার লোভে অপর পক্ষের নিকট অভিসন্ধি-ক্রমে পরাজয় স্বীকার করিয়া লন্। অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম যে, প্রেক্ষা-গৃহের মধ্যে সজ্জা-কক্ষোপযোগী দুইটি ভালো কামরা না থাকায়, একই ঘরের এক এক পার্শ্ব আমাদের উভয়েরই জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ড্র্যাক্ প্রবেশ করিয়াই তাহার দুই হস্ত আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন্, "কি গোবর ভায়া, ভাল ত? তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে বড় সুখী হলুম্। অদ্যকার রাত্রে তোমার শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য কামনা করি"। সমাজ-প্রচলিত ভদ্রতায় আমিও পরাস্ত হইবার পাত্র নহি, আমি উত্তর করিলাম, "টমি ড্র্যাক্ ভাই, তোমায় দেখে বড় আপ্যায়িত হলুম। আশা করি, ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করিবে এবং এবারও তুমি বিজয় লাভ করিবে।"—কিন্তু উভয়েরই এ ডাইনী বুড়ীর আশীর্ব্বাদ! ড্র্যাক্ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যাহোক, আজ আমাদের দুজনকেই ভালো রকম খেলা দেখাতে হবে।" আমি ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে তাঁহার কথায় সায় দিলাম। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, আজিকার এই রণ চলিবে না বেশীক্ষণ! পূর্ব হইতেই আমার মনে একটা বদ্ধ ধারণা হইয়াছিল যে, এ মল্লযুদ্ধে অতি অল্পকাল মধ্যে আমি অসংশয়িতভাবে

জয়লাভ করিব। যখন টমি ও আমার মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, সেই সময় রাসিয়ার জগত-বরেণ্য মল্লবীর জিস্কো আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সে রাত্রে তাঁহারও কোলাফ্ নামক এক রাসিয়ান্ পালোয়ানের সহিত লড়িবার কথা ছিল। তিনি প্রবেশ করিয়াই আমাদের করমর্দ্দন করিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমেরিকার জলবাতাস আমার কেমন সহ্য হইতেছে, আমেরিকা আমার কেমন লাগিতেছে··· ইত্যাদি। তারপর তিনি ভারতীয় কুস্তি-বিদ্যার কথা-প্রসঙ্গে প্রবেশ করিয়া, উহার কায়দা-কানুনের যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

নানা মনোহর কথোপকথনে যখন এইরূপে আমাদের সময় কাটিতেছে, সেই সময় মল্লক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আমরা দুইজন আসর ভাঙিয়া প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া যে-যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলাম। তারপর প্রথানুযায়ী কিছু গৌরচন্দ্রিকার পর, পুনরায় ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমি খুব সতর্কতার সহিত প্রবল বেগে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিলাম। ১৮ মিনিট কাল ভীষণ মল্লযুদ্ধের পর একটা ভারতীয় প্যাঁচে শত্রুকে বিপর্য্যস্ত করিয়া, আবার চারি মিনিটের মধ্যে পুনরায় তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিয়া সুনিশ্চিতভাবে পরাজয় স্বীকার করাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে আমাদের প্রতিযোগীতার বিবরণে স্থানীয় খবরের কাগজগুলি পরিপূর্ণ ও আমার বিজয়-স্তুতিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। পাঠকগণকে এই মল্লযুদ্ধের একটু বিশদ বর্ণনা প্রদান করিবার জন্য তিনখানি খবরের কাগজের রিপোর্ট নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৯২১ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখের "বাফেলো ইভ্‌নিং নিউজ্" নামক সংবাদ-পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

"গুহ ড্র্যাককে হারাইয়া প্রথমবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইলেন।

ভারতীয় মল্লবীর হল্যাণ্ড-নিবাসীকে স্পষ্ট দুইবার নিপতিত করিয়াছেন !!

গত রাত্রে "ব্রড্ওয়ে অডিটোরিয়ামে" মল্ল প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে, শ্যামবর্ণ এসিয়ার দৈত্যসদৃশ বীর গুহ গোবরের উপর হিন্দু দেবতাগণ সুপ্রসন্ন ছিলেন। ভারতের সর্বজয়ী মল্লবীর গোবর—ড্র্যাক্‌কে চারি মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ডের মধ্যে দুই-দুইবার মাটিতে পাড়িয়া ফেলেন, শেষ ভূমি-চুম্বনেই ড্র্যাকের পরাজয় সাব্যস্ত হয়। গোবর আমেরিকায় পদার্পণ করিবার অনতি-বিলম্বে টমি ড্র্যাক্ একবার তাঁহাকে কুস্তীতে পরাভূত করেন; কালরাত্রে পরাজয়ের সে কালিমা গোবর মুছিয়া ফেলিয়াছেন।

ভারতীয় বীর তাঁহার কুস্তীতে চমৎকার নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। একজাতীয় খেলোয়াড় আছেন যাঁহারা হারুন্ বা জিতুন্, সর্ব অবস্থাতেই দর্শকগণের সুযশ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেন, গোবর হইলেন সেই শ্রেণীর একজন। তিনি কলিকাতার অধিবাসী, যেখানে মানুষ নানা বিষয় চিন্তা করে, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করে অতি সামান্যই। খেলার আগাগোড়া তিনি দর্শকমণ্ডলী ও তাঁহার প্রতিপক্ষকে—জয়লক্ষ্মী কাহার ভাগ্যে পড়িবেন, ইহা ধারণা করিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ দিতেছিলেন। ইঁহার মুখাকৃতি দেখিলে বাস্তবিক মনে কেমন একটা ভয়-মিশ্রিত ভক্তির সঞ্চার হয়।

প্রথমবার তিনি ড্র্যাক্‌কে কূপোকাৎ করিতে, "হাফ্-নেলসন্" নামক প্যাঁচের সাহায্যে হোম্‌রা-চোম্‌রা হল্যাণ্ড-বীরকে মাটি হইতে কয়েক ফিট্ উর্দ্ধে অতি সহজে তুলিয়া অদ্ভুত শক্তি-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন, তারপর নিশ্চয়তার সহিত সজোরে তাহাকে মাদুরের উপর পাড়িয়া ফেলিলেন্। এই আকস্মিক পতনে ড্র্যাক্ এরূপ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন, যে পরবর্ত্তী তিন চারি মিনিট সময়ের মধ্যেও সে টাল্ সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিলেন্ না; তারপর তিনি প্রতিদ্বন্দীর আর এক অমোঘ প্যাঁচে কাবু হইয়া

তাঁহার বজ্র-বাহুর নিম্নে প্রথমে ফাৎ ও পরে চিৎ হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িলেন্।

কুস্তির আনুপূর্বিক সমস্ত সময় গুহ আমেরিকার শিক্ষিত কুস্তিগীরির ন্যায় নিজেকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই একবার দুই একটা কসরৎ দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, সেগুলি বিদেশ হইতে আম্‌দানী-করা। তাঁহার স্বদেশের রীতি অনুযায়ী তিনি খালি পায়ে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার উরু ও বাহুর সবল দ্বিশিরস্কা (Biceps) পেশীগুলি—ড্র্যাকের সহিত বুঝিবার কালে কয়েকটি অব্যর্থ মার্-প্যাঁচের ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় কাযে লাগিয়াছিল।"

নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি "বাফেলো কমার্সিয়াল্" নামক পত্রে একই তারিখে প্রকাশিত হয়—

"টম্ ড্র্যাকের বিপক্ষে লড়িয়া গোবর অতি সহজেই জয়লাভ করিয়াছেন। ছয় সপ্তাহ পূর্বে যখন গোবর প্রথম এদেশে আসেন, ঠিক তাহার পরেই টমি ড্র্যাকের সহিত মল্লযুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, ইহার শোধ একদিন তুলিবেনই। গত কল্য সে সত্য রক্ষা করিয়াছেন। গোবর বলেন—ক্রুক্‌লীনে ড্র্যাকের সহিত প্রথমবারের প্রতিযোগীতায় তিনি আদৌ বাহাল-তবিয়তে ছিলেন না, কারণ ভারতবর্ষ হইতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, তিনি তখন সবেমাত্র জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছেন।

"গত রাত্রে গোবর জিস্কোর ন্যায় কুস্তির মধ্যে অতি উচ্চাঙ্গের শক্তি-নৈপুণ্য ও কলা-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন্। তিনি ড্র্যাক্‌কে অনায়াসে আয়ত্তে আনিয়াছিলেন্ এবং কুস্তি আরম্ভের আঠারো মিনিট ছয় সেকেণ্ড্ পরে একবার ও তাহার চারি মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ড্ পরে দ্বিতীয়বার ভূপাতিত করেন্। প্রথমবারের নিপাতনে গোবর 'ক্রচ্' ও 'হাফ্ নেল্‌সন্' নামক কায়দাদ্বয় এবং দ্বিতীয় বারেরটিতে 'ক্রচ্ লক্' নামক কায়দা অবলম্বন করিয়াছিলেন।"

ঐ তারিখের "বাফেলো এক্স্‌প্রেসে" নিম্নলিখিত প্যারাটি মুদ্রিত হইয়াছিল :—

"গুহ গোবরের বিজয়-লাভ!

গত রাত্রের চমকপ্রদ ঘটনাবলীর অন্যতম ছিল—ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান্, ২৪৫ পাউণ্ড্ ওজনের দেহবিশিষ্ট, সূর্য্যগ্রহণের ন্যায় ছায়াময় বর্ণসুষমা-মণ্ডিত গুহ গোবরের মল্লক্ষেত্রে আবির্ভাব। এই এসিয়া-নিবাসী যখন সবেমাত্র নিউইয়র্কে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন ও এদেশের জলবায়ুর সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইবার সুযোগ পান্ নাই, তখন ড্র্যাকের নিকট তিনি পরাস্ত হয়েন। যাহাইউক, এবার নূতন রকমের কাহিনী বর্ণিত হইবে বলিয়া গত রাত্রে কুস্তীর পূর্বে গোবর যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন্, তাহা ফলিয়া গিয়াছে। একজন প্রবল পরাক্রমশালী যুবা-প্রতিদ্বন্দীর বিরুদ্ধে গোবরের লড়াই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। আঠারো মিনিট কুড়ি সেকেণ্ডের মাথায়, তিনি বিস্ময়কর বলশালিতার পরিচয় দিয়া, ক্রচ্ ও হাফ্-নেলসন্ নামক কৌশল প্রয়োগে ড্র্যাক্‌কে শূন্যে তুলিয়া প্রথম একবার নিঃশংসয়ে ভূতলশায়ী করেন। এই নিপাতন চারি মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ডের মধ্যে ভারতীয়ের দ্বিতীয় নিপাতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়, তিনি টমিকে পুনরায় মাটীতে ফেলিয়া 'ক্রচ্-লক্'-এর কায়দায় তাহাকে দৃঢ়ভাবে ঠাসিয়া ধরেন্।

"ড্র্যাক্ পরে স্বীকার করেন যে, প্রথমবারের লড়াইয়ের পর গুহর শরীরের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে; এবং আমেরিকায় তাঁহার ভবিষ্যত কুস্তী-জীবন সাফল্য-সূর্য্যালোকে সমুজ্জ্বল হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন্।"

পাঠকগণ, আমার বিবরণের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে আমেরিকার অধিবাসীগণ আপনাদিগকে বলশালী করিবার নিমিত্ত কিরূপ আগ্রহান্বিত ও আমরাই বা কি করিয়া নিজেদের দৈহিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি—তদ্বিষয়ে যৎসামান্য কিছু বলিয়া, আপাততঃ আপনাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

পাঠকপাঠিকাগণ, প্রবন্ধ-মধ্যে একবার "ওয়াই-এম্-সি-এ" নামক সমিতির নামোল্লেখ শুনিয়াছেন। ইহা চারিটি ইংরাজী শব্দের আদ্যাক্ষর; পুরা পদটি হইতেছে —Young M-n's Christian Association. এই সমিতি স্থাপনের কল্পনা ও প্রাথমিক উদ্যোগায়োজন সর্বপ্রথম আমেরিকায় সমুদ্ভব লাভ করে। এক্ষণে ইহার ন্যায় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে খুব কমই আছে। ইহার শাখা-প্রশাখা খৃষ্টীয় জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার ওয়াই-এম্-সি-এ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শক্তি ও স্বাস্থ্যান্বেষী যুবকগণের সাহায্য ও সুবিধা-প্রাপ্তির যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে এবং এখানকার প্রদেয় শিক্ষা আদৌ বহুমূল্য নহে। তারপর বড় বড় অনেক সহরে য়ুনিভার্সিটি কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত বহু ব্যায়ামশালী আছে এবং তথায় ব্যায়ামচর্চ্চা বাধ্যতামূলক। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত অসংখ্য ছোট বড় আখড়া আছে, যেখানে স্থানীয় অধিবাসীগণ বিনামূল্যে বা অতি সামান্য ব্যয়ে সর্ববিধ ব্যায়াম অভ্যাস করিতে পারেন। সেখানকার স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই শক্তি-সাধনায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করে, এবং পুরুষের ভিতর একাগ্র স্বাস্থ্য-লিপ্সু যেরূপ সংখ্যক আছেন, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও তদপেক্ষা কিছু কম সংখ্যক নাই। অবশ্য আমেরিকায় কুস্তীগির বা মুষ্টিযোদ্ধা স্ত্রীলোক কেহ নাই; এখনও পর্য্যন্ত আমেরিকানগণ এইরূপ ব্যায়াম কোমলাঙ্গীগণের পক্ষে নিতান্ত অশোভন বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু অন্যান্য সকল প্রকার ক্রীড়া ও ব্যায়াম-প্রণালীতে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোককে প্রতিযোগীরূপে অবতীর্ণ দেখা যায়।

পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে বালক-বালিকাগণকে হাল্কা রকমের ড্রিল শিখানো হয়। তারপর তাহাদিগকে সহজভাবের ব্যায়াম-প্রণালী অল্প অল্প শিক্ষা দেওয়া হয়; এতদ্বারা তাহারা শরীরে কিছু শক্তি সঞ্চয় করিলে পর তাহাদিগকে হাণ্ড্‌বল, বাস্কেট্‌বল মেডিসিন্ বল্ প্রভৃতি খেলিতে দেওয়া হয়। পনেরো বৎসর বয়ক্রমে উপনীত হইবার পূর্বে বালক-বালিকাগণকে বয়স্থগণের উপযোগী অসসাধ্য জটিল খেলাসমূহের অংশ গ্রহণ করিতে অনুমতি দেওয়া হয় না। এই বয়সের পর হইতে বালকগণকে একটু একটু করিয়া কুস্তি মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি বিদ্যা অধিগত করানো হয় এবং এইরূপ কঠিন ব্যায়ামের দ্বারা দেহের বাহ্যাভ্যন্তর রীতিমত দৃঢ়িষ্ট হইয়া উঠিলে তবে তাহাদিগকে ফুটবল খেলার অধিকার দেওয়া হয়। আমেরিকায় যে প্রণালীতে ফুটবল খেলা হয়, তাহা কলিকাতা বা ভারতে প্রচলিত ফুটবল অথবা রাগ্‌বী খেলাপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং অতিশয় শ্রমসাধ্য ও বিপজ্জনক। শুনিলাম, প্রতি মরসুমে ছয়-সাতটি করিয়া কলেজের ছেলে এই খেলা খেলিতে গিয়া মারা পড়ে। আমেরিকানদের বৈশিষ্ট্য-সূচক জাতীয় খেলা—বেস্‌বলের ন্যায় এই ধরণের ফুটবল খেলাও অত্যন্ত লোকপ্রিয়।

কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের মানসে স্বাস্থ্য-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইবার জন্য, সপ্তাহে একদিন করিয়া অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্যও স্কুল হইতে তাহাদিগকে ছোট বড় ব্যায়াম-বীরগণের প্রতিমূর্ত্তি বা ব্যায়াম-সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ঘটনাবলী চলচ্চিত্র সাহায্যে দেখানো হয়। তারপর মাসে একবার করিয়া স্থানীয় কোনো নামজাদা পালোয়ানকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, তাঁহার বিভিন্ন রূপ ব্যায়াম-কৌশল ছাত্রগণকে প্রদর্শিত হয়। এইরূপ ভাবে ছাত্রগণ বাল্যকাল হইতেই ব্যায়ামবীরগণের সংস্পর্শে আসে। তা'ছাড়া স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ সকল বয়সের সকল শ্রেণীর পাঠোপযোগী অসংখ্য স্বাস্থ্য ও শক্তি বিষয়ক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় (গল্পের পত্রিকা অপেক্ষা ইহাদের প্রচার—আমাদের দেশের মত নগণ্য নহে)। এই সকল কাগজ স্বাস্থ্যধর্ম প্রচারে বড় কম সাহায্য করে না, এবং শৈশবাবস্থা হইতেই আমেরিকানগণ স্বাস্থ্যচর্চার স্রোতে আপনা-আপনি নিমগ্ন হয় এবং যথাকালে বলবীর্য্যবান্ যুবক-যুবতীরূপে ভাসিয়া উঠে।

আমেরিকান্ পিতা-মাতা ও অভিভাবক তাঁহাদের ভবিষ্যবংশধরদের স্বাস্থ্যার্জ্জনের প্রতি সব চেয়ে বেশী লক্ষ্য রাখেন্ ও তদর্থে সব চেয়ে বেশী পয়সা খরচ করিতে কুণ্ঠিত হন্ না—ঠিক আমাদের দেশের বিপরীত। ছেলেদের শিক্ষার এই বিশিষ্ট দিক্‌টির প্রতি আমেরিকান্ মাতারাই সর্বাপেক্ষা বেশী দৃষ্টি দেন্; কারণ বহু আমেরিকান্ পিতাই অর্থোপার্জ্জন-মানসে গৃহের বাহিরে দিবারাত্র ব্যাপৃত থাকায় এ বিষয়ে নজর দিবার সুযোগই পান্ না। এখানকার মাতাদের এ বিষয়ে এত কড়া দৃষ্টি যে, খুব কম ছেলেই নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস ফাঁকী দিয়া চলিতে পারে। কোনো স্কুল বা কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া বা ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায় যদি কোনো ছেলে অকৃতকার্য্যতা লাভ করে, তাহাহইলে জননীগণ ত তাহাদের খুব এক চোট্ তিরস্কার করেনই, তা'ছাড়া পরিবারের দাসদাসীটি পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী ক্রীড়ায় হৃতগৌরব পুনরধিকার না করা অবধি তাহাকে কতকটা ঘৃণা ও করুণার চক্ষে দেখে। ছেলেরা যতদিন স্কুল ও কলেজে ব্যায়াম শিক্ষা করে, ততদিন পর্য্যন্ত বাটীর স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যনীতিসঙ্গতভাবে তাহাদের আহারাদির সুবন্দোবস্ত রাখেন্।

কিছুদিন পর্য্যন্ত আমি কোন আমেরিকান্ গৃহস্থ-সংসারে খরচ দিয়া অতিথি স্বরূপ বাস করিতাম। একদিন সন্ধ্যার সময় দেখি, গৃহিনীর ১৬ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র মায়ের নিকট কোনো নাচ্ দেখিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে আসিল। মা বলিলেন, "তা যাও বাছা, কিন্তু বেশী রাত্রি করতে পারবে না। বড় জোর রাত্রি সাড়ে দশটার মধ্যে তোমাকে আমি বিছানায় শায়িত দেখ্‌তে চাই। মনে রেখো, আগামী সোমবার দিন তোমাদের স্কুলে খেলার প্রতিযোগিতা আছে, এখন রাত্রি জেগে শরীর নষ্ট করলে চল্‌বে না। রাত্রে ফিরে তোমার গরম দুধের গ্লাস তৈয়ারী দেখতে পাবে।"

এই চিত্রের সহিত একবার ভারতের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখুন। মেয়ের স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তা করা দূরে থাকুক্, ছেলেকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিবার জন্য হাজারে একটি মাতা বা পিতা সাধারণ অমেরিকান্ মাতার অর্দ্ধেক যত্নও গ্রহণ করেন না। এ সম্বন্ধে আপনি ভারতীয়

পিতামাতাকে অনুরোধ করুন, তাঁহারা তখনই উত্তর দিবেন "আরে মশাই, আমাদের ছেলে পুলেরা সব ডালভাত খেয়ে মানুষ হচ্ছে, ব্যায়াম করে' পালোয়ান্ হবে কিসে বলুন্?" মেয়েদের ব্যায়াম অভ্যাসের কথা শুনিলে ত তাঁহারা একেবারে চম্‌কাইয়া উঠিয়া কাণে আঙুল দিবেন্। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ছেলেদের দিয়া ব্যায়াম অভাস করাইতে হইলে, খাওয়া-দাওয়া খুব উচ্চাঙ্গের ও দামী হওয়া চাই। বাস্তবিক পক্ষে সুস্থ সবল বলিষ্ঠ হইতে হইলে এ বিষয়ে এক পয়সাও ফাজিল খরচ লাগে না।

এক্ষণে মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলি। আমাদের সমাজের উচ্চস্তরের ভদ্রলোকগণ তাঁহাদের কন্যাদিগের পাশ্চাত্য পুঁথিগত বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন যে, তাঁহারা "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"—এই শাস্ত্র-বাক্যের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, তবে বাঙ্‌লার কথা যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, আমাদের দেশের আধুনিক আব্‌হাওয়ায় পরিপুষ্ট স্বচ্ছল পিতামাতারা মনে করেন—তাঁহাদের কন্যারা যেন-তেন প্রকারেন যদি দুই একটী য়্যুনিভার্সিটি ডিগ্রী লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে, ইয়োরোপীয় ভগিনীগণের অনুকরণে চায়ের পেয়ালায় চুমুক্ লাগাইতে ও ড্রয়িং রুমের আদব-কায়দাগুলি দোরস্ত করিতে পারেন, তাহাহইলে অনেক মনের মতো পাত্র সাধিয়া আসিয়া জুটিবে। কিন্তু এই খানেই কি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়ের জননীজাতির প্রতি কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হইল? একবার ভালো করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন্। যাঁহাদের নিজেদের স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায় ও স্বাস্থ্যনীতির ক-খ-গ জীবনে শিক্ষা করিবার যাঁহারা অবসর পান্ নাই, তাঁহারা শক্তিমান্ সন্তানের জন্ম দিবেনই বা কেমন করিয়া, ভবিষ্যতে ছেলে-পুলেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্ন লইবেনই বা কিরূপে? কিন্তু যুগজীর্ণ লোকাচার দেশাচারের প্রতি

আমরা বড় আস্থাবান্ জাতি কি না ; তাই কালোপযোগী উন্নততর কোনো নূতন পন্থা নির্দেশ করিলেই অমনি চতুর্দিক হইতে মহা সোরগোল উত্থিত হয়।

কাযেই সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি মাতাদের দৃষ্টিদানের এই কর্ত্তব্য দ্বিগুণ নিবিড়তার সহিত পিতাদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে ; তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি-অবনতির হিসাব-নিকাশ রাখা, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা প্রভৃতির জন্য পিতার প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। পিতারাও কর্ত্তব্য যথোচিত পালন করিতে পারিতেছেন কি ?

ছেলেরা যদি মনে করে যে, পিতা-মাতার সহানুভূতি ও প্রভাবের বাহিরে, বিনা গুরুর নিকট শিক্ষায়, প্রত্যহ ২।৩ মিনিট যা-তা ব্যায়াম করিলেই তাহাদের শরীরের যথেষ্ট সৌষ্ঠব সাধিত হইবে, তাহাহইলে তাহারা ভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করিব। এরূপ ব্যায়াম গ্রহণ করার চেয়ে একেবারে না করাই ভালো। এই প্রকারের ব্যায়াম অভ্যাসে দেহের উৎকর্ষ ত হইবেই না, পরন্তু পরিশেষে কিছুদিন পরে উহা অত্যন্ত 'একঘেয়ে' লাগিবে। ছেলেদের বলি, তোমরা যদি জীবনের সকল আনন্দের উৎস—নিখুঁত শরীর লাভ করিতে চাহ, তাহাহইলে একজন শক্তিশালী আদর্শ গুরুর নিকট হইতে রীতিমত শিক্ষালাভ কর ; দেখিবে তাহাতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শরীরকে অটুট অনিন্দ্য রাখিবার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী থাকিবে।

আমাদের দেশের তথাকথিত বলশালী ব্যক্তিদিগের প্রতি ভালো করিয়া একবার চাহিয়া দেখুন্। তাঁহারা যে-যাঁহার বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সর্বাঙ্গ-সবল সুঠাম দেহ তাঁহাদিগের কাহারও নাই। আমাদের দেশের অনেক ভালো ভালো পালোয়ানদিগের গায়ে অনাবশ্যক রকমের চর্বি (অথবা কিছু বেশী বয়সে বিরাট রকমের ভুঁড়ি) জমা দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা আবার জিম্ন্যাষ্টিক্ আদিতে পাকাপোক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই কৃশ হইয়া পড়েন। কেহ কেহ পদ ও উরুদ্বয়কে সরু হইতে দিয়া, বুক্ ও বাহুদ্বয়কে খুব জম্‌কালো করিয়া তুলেন্। প্যারালেল্ বার করিলে প্রায়শঃ দেখা যায়, উর্দ্ধভাগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বেশ সুপুষ্ট হয়, কিন্তু নিম্ন ভাগ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশের ফুটবল খেলোয়াড়দিগের মধ্য হইতে একটা বেশ নিখুঁত বলবান্ চোহারার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া বাহির করা প্রায় দুঃসাধ্য। শ্রীযুত গোষ্ঠ ও বলাই চাটার্জ্জী—যাঁহারা অন্যান্য ক্রীড়ায় অনুরক্ত ও সমভাবে পারদর্শী হইতে সপারগ, এই দুইজন ব্যতীত আর একটি চৌখস্ শরীরওয়ালা ফুটবল খেলোয়াড় আমাকে দেখাইয়া দিন দেখি ! অন্যদিকে বিদেশী ফুটবল ক্রীড়কদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, চেহারাটি দেখিলেই মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে যে, তিনি ফুটবল খেলা ছাড়া, হয় জিম্ন্যাষ্টিক্ করেন, নচেৎ কুস্তী, মুষ্টিযুদ্ধ বা অন্য কিছু ব্যায়াম অভ্যাস করেন্।

আমার মনে হয়, আমাদের দেশের এখন সর্বাগ্রে, কেন্দ্রীয়ভাবে একটি জাতীয় ব্যায়ামাগারের প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। এই ব্যায়ামাগারে একদল স্বার্থত্যাগী দেশ-হিতৈষী ব্যায়াম-বিশারদ ছেলেদের শিক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকিবেন। এবং এই সকল শিক্ষকদের সংসার-যাত্রা পরিচালনার ভার জাতি নিজের স্কন্ধে বহন করিতে প্রতিশ্রুত থাকিবেন। যদি গভর্মেণ্ট বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেসন্ এ কার্য্যে অগ্রণী হন্ ত ভালই, নচেৎ জন-সাধারণ নিজেদের মধ্য হইতে চাঁদা উঠাইয়া এই কল্পনাকে সাকারা করুন্। এখানে স্বদেশে-বিদেশের বিখ্যাত ব্যায়াম-বীরগণ নিয়মিতভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া স্ব স্ব ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন বা ঐ বিষয়ে সহজ শিক্ষাপূর্ণ বক্তৃতা দিবেন। তা'ছাড়া ছাত্রদিগকে অতি সামান্য পারিশ্রমিকে বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইবে। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদিগের নিকট প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া, শ্রেষ্ঠোত্তীর্ণগণকে পুরস্কার দেওয়া বা যাহাতে তাহাদের শিক্ষার পথটি আনন্দদায়ক হয় এমন ব্যবস্থা করা হইবে। এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া যদি সাফল্য লাভ করা যায়, তাহাহইলে আমার আশা হয়, বাংলা বা বাংলার বাহিরে মফস্বলে সহরে সহরে এইরূপ আদর্শান্বিত এক একটি ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে খাড়া করা যাইতে পারে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র এই ভাবের ব্যায়ামশালা উদ্ভব লাভ করিয়া, প্রতি বৎসর হাজার হাজার বলিষ্ঠ বীর যুবক সংগঠনে সহায়তা করিতে পারে। আমার মতে, দেশকে সুস্থ সবল করিবার ইহাই একমাত্র সহজ সুন্দর সমীচীন পন্থা !

আমার স্বাস্থ্য-সমাচার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম্-বি।]

শ্রীহট্টের এমন বাড়া-ভাত ফেলিয়া অন্নভিখারী হইয়া কলিকাতায় আসি নাই। আসিবার কারণ তিনটী :—

(১) স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার। ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, আহার বিহারের অনিয়ম বশতঃ যখন অজীর্ণতা এবং হৃদরোগ দেখা দিল, তখন হইতে কলিকাতায় এমন একটা কাজের চেষ্টায় ছিলাম যাহাতে কিঞ্চিৎ শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত।

(২) দ্বিতীয় কারণ, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা সমাপন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ঐ শিক্ষা অতি অসম্পূর্ণ ছিল। মান্দ্রাজের স্যানিটারী কমিশন ডাক্তার কিং-এর একখানা ছোট পুস্তক ছিল আমাদের পাঠ্য। সেই পুস্তকের কিয়দংশ মুখস্থ করিয়া আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতাম। হাতে কলমে কিছুই শিক্ষা দেওয়া হইত না। এমন কি কিরূপে টীকা দিতে হয়, কি টীকায় বীজ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও দেখান হয় নাই। ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার চার্লস টীকার সুপারিন্-টেনডেণ্ট ছিলেন। টীকার বিরুদ্ধবাদীদের মত খণ্ডন করিয়া তিনি ইংলিসম্যানে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা এখনও মনে আছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগের চিকিৎসা করিতাম, কিন্তু রোগ নিবারণের উপায় তেমন জানিতাম না। ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্ত্তনাদে যখন আকাশ মুখরিত হইত, এবং মৃত্যুর ঘনীভূত ছায়ায় যখন পল্লী-গৃহগুলি অন্ধকার হইত, তখন রোগ-বিস্তৃতির কারণ ও নিবারণের উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িতাম।

১৮৮৫ সালে হবিগঞ্জ লোকেল বোর্ডের অধীনে ডিসপেনসারী-সমূহের এবং টীকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলাম। সেই সময় ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়া মহামারি অনুসন্ধানের ভার আমার উপর আসিল। জল হইতে রোগ সংক্রামিত হয় এই পর্য্যন্ত জানিতাম ; কিন্তু রোগ নিবারণের প্রকৃত উপায় জানিতাম না। নদী বিশেষের দুই ধারে রোগ-বিজ্ঞানের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলাম। কিন্তু কি প্রকারে ওলাউঠার বীজ জলে প্রবেশ করে, ঐ বীজ কাঁচের টিউবের ভিতর কি প্রকার চাষ (culture) করিতে হয়, কিছুই জানিতাম না। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধেও জলের উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি হইল না। ঐ জনপদধ্বংসকারী দৈত্যের আবাস কোথায়, ইহার ধ্বংস-শক্তির মূল কি, কি প্রকারেই বা ঐ দৈত্য দলন করা যায়, কিছুই অবগত ছিলাম না। মাটি, রস ও পচা উদ্ভিদ সংযোগে এক প্রকার গ্যাসের উৎপত্তি হয়, ঐ গ্যাস দেহে প্রবেশ করিয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করে, জ্ঞানের সীমা তখন এই পর্য্যন্ত ছিল। জলার জলই ঐ গ্যাসের ও ম্যালেরিয়া উৎপাদনের কারণ এই ধ্রুব বিশ্বাস সকল পণ্ডিতেরই ছিল। স্বর্গীয় ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু বহু গবেষণার পর বঙ্গ ভাষায় একখানা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পুস্তক

রচনা করিয়াছিলেন। সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জল হইতেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি। তিনি স্বচক্ষে নাকি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার পাল্কী বেহারারা পার্ব্বত্য নদী বিশেষের জলপান করিয়া ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমিও গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অভিমত জ্ঞাপন করিলাম যে, যে-স্থানে পার্ব্বত্য নদী আছে ঠিক তাহার আশে পাশেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব; সুতরাং পার্ব্বত্য নদীর জলই ম্যালেরিয়ার কারণ।

আমার কিম্বা ধর্ম্মদাস বাবুর কোন অপরাধ নাই। লাভিরাণের ম্যালেরিয়া-কীটাণু আবিষ্কারের পরও ১৮৯৭ সালের ১৯এ আগষ্ট পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক জগতে এই বিশ্বাস ছিল যে, ম্যালেরিয়া-দূষিত জল-পানই ম্যালেরিয়া রোগের কারণ। ১৮৮০ সালে যদিও ফরাশীশ সৈন্যের ডাক্তার লাভিরাণ আল্‌জিরিয়ায় ম্যালেরিয়াক্রান্ত "ফরাশীশদের কবর" নামে ম্যালেরিয়ার কীটাণু আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সুদূর মফঃস্বলে থাকিয়া আমি সে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তখন অনেকেই কথাটা অবিশ্বাস করিতেন। সার পেট্রিক ম্যানসন্ একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। তিনি ম্যালেরিয়া-বাহিনী মশকীর আবিষ্কর্ত্তা রনাল্‌ড্ রসকে অনেকবার লিখিয়াছিলেন যে, জলেই ম্যালেরিয়ার বিষ থাকে। তিনি সার রনাল্‌ড্‌কে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন ম্যালেরিয়া-কীটাণুযুক্ত মশাকে জলে ডুবাইয়া ঐ জল শুকাইয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেন। তিনি ঐ জলমগ্ন মৃত মশা জল সহ পান করিয়া দেখিবেন, ম্যালেরিয়া জ্বর হয় কি না। অথবা সার রনাল্‌ড্ যদি মৃত মশার চূর্ণ বিলাতে পাঠাইয়া দেন, তিনি নস্য নিয়া দেখিবেন—বায়ুযোগে ম্যালেরিয়া-কীটাণু দেহে প্রবেশ করিয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করে কি না। ম্যান্‌সন্ তখনও ম্যালেরিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি ('ম্যাল্' অর্থে মন্দ এবং 'এরিয়া' অর্থে বায়ু) ভুলেন নাই। যাহা হউক, শ্রীহট্টের অনেক পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর নিকটে ম্যালেরিয়া-ভাব, প্রভৃতি নানা কারণে আমার মনে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক সমস্যা তোলা-পাড়া হইতে লাগিল। এমন সময় শুনিলাম স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ ডাক্তার সিমসন্ কলিকাতা স্বাস্থ্য-বিভাগ সংগঠন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তিনি কতিপয় দক্ষ কর্ম্মচারী চাহিতেছেন।

(৩) কলিকাতা আসিবার তৃতীয় কারণ, সাধুসঙ্গ। শ্রীশ্রীগুরুদেব কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিব, ইহাও কলিকাতা আসিবার একটা প্রধান কারণ ছিল। রাজনৈতিক গুরু ৺ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে জনসেবায় যথাসাধ্য আপনার শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করাও অন্যতম কারণ ছিল বটে। গলার বোতাম বন্ধ কোট ও ঢিলা প্যাণ্ট পরিতাম; কিন্তু টাক পড়িবার ভয়ে হ্যাট পরিতাম না। বাল্য-বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ের নিকট নেক্-টাই ধার করিয়া এবং সুরেন্দ্র বাবুর অনুরোধ-পত্র যাদুমন্ত্রঃপূত মাদুলী স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, ডাক্তার সিম্‌সনের সঙ্গে দেখা করিলাম। সিমসন্ লোকটী একহারা ছিপ্‌ছিপে; কিন্তু গঠন দৃঢ়, চক্ষু অন্তরভেদী এবং মুখ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। দেখিয়াই মনে হইল এই প্রকার সুস্থদেহধারী ব্যক্তির নিকটেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা করা আবশ্যক।

মেডিকেল ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত হইলাম। বিলাতে সবে মাত্র তখন ঐ পদের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশালবপু লইয়া আফিসে উপস্থিত হইলাম। ৺ ডাক্তার প্রকাশ চন্দ্র লাহিড়ী আমাকে হাতে খড়ি দিয়া বলিয়া দিলেন, পল্লীতে পল্লীতে পদব্রজে ঘুরিতে হইবে। চাপরাসী ছিলেন একজন মদ্যপায়ী বাঙ্গালী। তাঁহারই সঙ্গে বিশাল দেহ টানিয়া টানিয়া চলিতেছি। কলিকাতায় তখনও অনেক পানা-পচা পুকুর, কাল পাঁকপূর্ণ নর্দ্দমা, শ্বেতকীটপূর্ণ মলকুণ্ড, আর পুকুরের চারিধারে হরিধ্বনি ও কালী-মাইকি-জয়ধ্বনির সঙ্গে ওলাইচণ্ডীর উদ্দণ্ড পূজা।

নিয়মিত সময় পদব্রজে ঐ সমুদয় অস্বাস্থ্যকর স্থানে

ণ করিয়াছি। রোগের অনুসন্ধান উপলক্ষে বিপদ-স্থান স্থানে প্রবেশ করিয়াছি। দেহে ছিল বল, মনে ল সাহস। সেই গ্যাড়াতলার নাম শুনিলে এখনও অনেকের হৃৎকম্প হয়। দিনের বেলা সেখানে প্রবেশ করিতে কেহ সাহস করিত না। ১৮৯৪-৯৫ সালে কলিকাতায় বসন্ত মহামারির প্রাদুর্ভাব। গ্যাড়াতলায় লোকের দরুণ অনেক মৃত্যু হইয়াছিল। রোগ-বিস্তৃতির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং সংক্রামকবিষ-দূষিত বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। সঙ্গে একটী দীর্ঘকায় গঞ্জিকা-সেবনরত নিমীলিত-চক্ষু চাপরাসী। প্রবেশ করিতে হইল একটী কফিখানার পার্শ্বস্থ পথ দিয়া। কফিখানা বিশ্বজাতীয় সার্ব্বভৌমিক মিলন-মন্দির। সে মন্দিরে দীর্ঘকায় পেশওয়ারী দস্যু মদ্যপান করিতেছেন, ঘোর কৃষ্ণকায় স্থূলৌষ্ঠ রক্তচক্ষু কাফ্রি চণ্ডু সেবন করিতেছেন এবং মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক নিজ নিজ রুচি অনুসারে পান-ভোজন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই সকলে "ক্যা মাঙ্‌তা? ক্যা মাঙ্‌তা?" বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মধ্যে একটী লোক আমাকে চিনিত। সেকালে আমরা কেবল অস্বাস্থ্যকর স্থানে পরিদর্শন করিতাম না; দরিদ্রদের বাড়িতে সর্ব্বপ্রকার উদরাময়ের চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া বেড়াইতাম। ঐ ব্যক্তির বাড়ীতে ওলাউঠা রোগীকে আরোগ্য করিয়া ছিলাম। অগ্রসর হইতে হইতে পশ্চাতে কাণাকাণি শুনিলাম, তৎপর শুনিলাম ঐ ব্যক্তি বলিতেছে; "নেহি নেহি, উও বড়া ভালা আদমি।" ধড়ে প্রাণ আসিল, কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া গৃহে ফিরিলাম।

একদিন সিমসন সাহেব হুকুম করিয়াছেন, জাহাজে গিয়া ওলাউঠার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রভাতে উঠিয়া গঙ্গার এক ঘাটে নৌকা-যোগে ঐ জাহাজে গিয়া উঠিলাম, দেখি—কাঠের সিড়ি নাই, আছে দড়ির সিঁড়ি, আর আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক ভীষণ ডালকুত্তা কুকুর আর তদধিক ভীষণতর এক ব্যক্তি একখানা ঘোরা লালমুখ এবং ডালকুত্তারই মত এক জোড়া ঘূর্ণায়মান রক্তবর্ণ চক্ষু লইয়া দণ্ডায়মান। বিপদ ভঞ্জন হরিকে স্মরণ করিয়া এবং একমাত্র অস্ত্র সিম্‌সন সাহেবের আদেশ-পত্র বাহির করিয়া দড়ীর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। ঐ ডালকুত্তা কামড়াইবে কি ডালকুত্তাক্ষ কামড়াইবে ঠিক করিতে পারিলাম না। যাহাহউক, জাহাজে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত আদেশপত্র দেখাইলাম। "গুড্ মর্ণিং, কম্ ঈন্" বলিয়া কাপ্তান সাহেব আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় দড়ীর সিঁড়ি দিয়া নামিতে হইল না। বিশালকায় জাহাজমার্কা প্রশস্তবক্ষ নাবিকগণ দয়া করিয়া কাঠের সিঁড়ি নামাইয়া দিলেন। (ক্রমশঃ)

বায়ু-পরিবর্ত্তন (চেঞ্জ)

[ডাঃ শ্রীসরোজনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-বি।.]

বায়ুপরিবর্ত্তন বা 'হাওয়া বদলাতে যাওয়া' আজকাল খুব প্রচলিত হইয়াছে। সঙ্গতিপন্ন ধনীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরাও পূজায় ছুটি বা বড়-দিনের ছুটিতে একটু স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া আসেন। পূর্ব্বে যখন যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, তখন দেশের স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল এবং আজকালকার মত অন্নসমস্যা এত তীব্র ছিল না, জীবনীশক্তির উপরও এতটা চাপ পড়িত না, তাই হাওয়া খাইতে যাওয়ার কথাও তত উঠিত না। এখন চারিদিকে রেল ষ্টিমার প্রভৃতি হইয়াছে, যাতায়াতের জন্য concessionএর খুব বিজ্ঞাপন ছড়ান হইতেছে; জনসাধারণের স্বাস্থ্যও কোন গতিকে চলনসই গোছ হইয়াছে। এক্ষেত্রে নিজেদের কর্ম্ম-

ক্ষম রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে একটু বিশ্রামও দরকার এবং সুবিধা হইলে একটু বায়ুপরিবর্ত্তনেরও বিশেষ আবশ্যক হয়।

অনেকে যেমন কর্ম্মক্লান্ত শরীরের অবসাদ মোচন করিতে বা মনোরম নানাস্থানের দৃশ্যাদি দেখিতে স্থানান্তরে গমন করেন, সেইরূপ অন্যপক্ষে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা রোগী বা সবেমাত্র রোগমুক্ত হইয়াছেন ; ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যোন্নতি। তাঁহাদের বায়ুপরিবর্ত্তন অতি আবশ্যক ; এবং চিকিৎসকেরাও এই শ্রেণীর লোকদের বিশেষভাবে পরামর্শ দেন বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে বা হাওয়া খাইতে যাইতে। সাধারণতঃ Typhoid প্রভৃতি রোগে বহুদিন ভুগিলে বা একই রোগের দ্বারা বারবার একস্থানে থাকিয়া পীড়িত হইলে, কোন বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে অথবা সেই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে ঐরূপ উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেই অবগত নহেন, কোন্ স্থান কোন্ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং কোথায় বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য যাইলে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে।

সত্য সত্যই এইরূপ স্থান রোগী বিশেষের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াও চিকিৎসকের পক্ষে কঠিন সমস্যা ; কারণ প্রথমতঃ চিকিৎসকের সকলের ভাগ্যে ভারতের সকল স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া নিজের অভিজ্ঞতা লাভ করা ঘটিয়া উঠে না ; দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের নানা স্বাস্থ্যকর স্থানের জলহাওয়ার একটা বিস্তারিত বিবরণ কোন স্থানে record দেখিতে পাই না ; এমন কি ঐ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য পুস্তক যে প্রচারিত হইয়াছে তাহা জানি না। এক্ষেত্রে রোগীরা চিকিৎসকের নিকট খুব বেশী খবর প্রত্যাশা না করিয়া নিজেদের সুবিধামত স্থানেই বায়ুপরিবর্ত্তনে বাহির হইয়া পড়েন। তাঁহাদের কোন আত্মীয়-স্বজন কোন ভাল জায়গায় থাকিলে তথায় প্রথমতঃ চেষ্টা করেন ; নচেৎ কোন রেলওয়ে-অধ্যুষিত স্থানে বাসোপযোগী গৃহাদি জোগাড় করিয়া তথায় চলিয়া যান।

ইংরাজী চিকিৎসা-গ্রন্থ খুলিলেই নানা রকমের স্বাস্থ্যকর স্থান ও স্বাস্থ্যাবাসের উল্লেখ দেখা যায়—সেখানকার জলহাওয়া কেমন, উচ্চতা কত, থাকিবার জায়গা কোথায়, কয় জনের স্থান হইবে···ইত্যাদি সর্ব্ব রকমের সংবাদ পুস্তকাকারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লেখা আছে। সকলেই তাহা দেখিয়া প্রয়োজনমত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন। আর আমাদের এত বড় বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের ভিতর কত ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর স্থান রহিয়াছে, কত শত প্রকারের hot-springs আছে, কত প্রকার mineral waters আছে ; কিন্তু কৈ কেহ আমরা খবর রাখি না, কোন প্রণালীবদ্ধ চেষ্টাও নাই—যাহাতে এই সকল স্থানের বিষয় লিখিয়া দেশে একটা প্রকৃত অভাব মোচন করা হয়। অনেকে ভ্রমণ কাহিনী লেখেন ; কিন্তু তাহাতে আর নূতনত্ব বিশেষ কিছু থাকে না ; clima'ology, water supply, sanitation প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া স্বাস্থ্যের দিক দেখিয়া লিখিলে, দেশের ও জনসাধারণের উপকার হইত, আশা করা যায়।

বায়ুপরিবর্ত্তন করিবার জন্য স্থান বিশেষ স্থির করিতে হইলে নিম্নলিখিত এই কয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১। উচ্চতা—(Altitude)
২। তাপ—(Temperature)
৩। বায়ুর আদ্রতা (Humidity)
৪। মৃত্তিকা-স্তর (Soil)
৫। পানীয়জল সরবরাহ-প্রণালী (Water Supply)
৬। নর্দ্দামার অবস্থা—(Drainage System)
৭। বাসগৃহাদির ব্যবস্থা।
৮। বৃষ্টি, রৌদ্র ইত্যাদি।
৯। স্থানীয় সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়।

উচ্চতা (altitude)।—স্থানের উচ্চতার সঙ্গে বায়ুর তারতম্য দেখা যায়। পার্ব্বতীয় প্রভৃতি উচ্চস্থানে বায়ুমণ্ডলী প্রায়ই পাতলা (rarefied), হাওয়ার

অপেক্ষাকৃত কম, বায়ু বেশী শুষ্ক ও বায়ুতে ভাসমান দূষিত পদার্থ কম থাকে। এই জন্য এই সব স্থানে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যাইলে শরীরে স্বতঃ একটা স্ফূর্ত্তি ও উত্তেজনার সঞ্চার হয়, নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায়, সর্ব্ববিষয়েই একটু চঞ্চলতার সাড়া পড়িয়া যায়। ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, ফুসফুস ও ত্বক হইতে অধিক পরিমাণে শরীরের অনাবশ্যকীয় দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া শরীরের পুষ্টি ও শুদ্ধি সাধিত হয় ; রক্ত-কণিকাসমূহও বৃদ্ধি পাইয়া শরীরের উন্নতি হয়।

এই স্থানে অনেক দিনের রোগী, যাহাদের রক্তাল্পতা (anæmia) আছে বা যাঁহারা সবেমাত্র রোগমুক্ত (convalescent) হইয়াছেন, বা যাঁহারা পুরাতন অজীর্ণ (Dyspeptic) প্রভৃতিতে ভুগিতেছেন, তাঁহাদের বিশেষ উপকার হয়।

নানাকারণে, চিন্তাদিতে যাঁহাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে, তাঁহাদেরও এই সব স্থানের উত্তেজক (stimulating) জলবায়ুতে উপকার হইতে পারে। কোন কোন শ্রেণীর যক্ষ্মা রোগের পক্ষেও এই সব স্থান প্রশস্ত।

বৃষ্টি, রৌদ্র, স্থানিক তাপ (Temperature) বায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতির একটা record জানিয়া রাখা আবশ্যক ; কারণ ঐ সকলের উপরও সেস্থানের জলবায়ু বহুপরিমাণে নির্ভর করে। উপরিলিখিত বিষয়গুলির পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে দেশে বৃষ্টিপাত বেশী হয় না, সূর্য্যের তাপ বেশী পায় বলিয়া সে স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ (বা গ্রীষ্মপ্রধান)।

সূর্য্যের তাপ অবশ্য আমাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ সহায়তা করে। ঐ তাপে বায়ু-সঞ্চারী রোগ-বীজাণু প্রভৃতি বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না এবং তজ্জন্য বায়ুও বেশ বিশুদ্ধ থাকে ; এই বিশুদ্ধ বায়ু রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মেঘ বা বৃষ্টির জন্য রৌদ্র না থাকিলে, বা যে স্থানে বৃষ্টিপাত (Annual rain-fall) বেশী, রৌদ্র কম, যে দেশ সেঁতসেঁতে (damp), নানারকম উদ্ভিজ্জ জন্মায় ছাত লা, ছোট ছোট গাছ-গাছড়া, নিম্নশ্রেণীর নানাজাতীয় কীটপতঙ্গাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়—তথায় মানুষের অপকারক নানারকমের উদ্ভিদজাতীয় জীবাণু (Bacilli) জন্মগ্রহণ করিবার সুবিধা পায় এবং মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিয়া, আমাশয় প্রভৃতি নানারকম পীড়া উৎপন্ন করে। এখানকার বর্ষাকালে আমরা সকলেই এই সব ব্যায়রাম ভোগ করি। এসব স্থান রোগীর পক্ষে বর্জ্জনীয়।

উচ্চতা থাকিলেও (altitude) এসব স্থান অস্বাস্থ্যকর। পর্ব্বতের নিচে—যেখানে জল নিকাশের সুবিধা নাই, বেশী পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং রৌদ্রের তাপ কম, সে সব জায়গায় নানারকমের রোগ দেখা যায়।

অপর পক্ষে যদি রৌদ্র বেশী হয়, সে স্থান দিনের বেলায় অত্যন্ত গরম ও অনেক রোগীর পক্ষে কষ্টকর হয় ; কিন্তু (humidity) বায়ুর সিক্ততার দরুণ এই গরমের তারতম্য বিশেষ বিশেষ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। বায়ুমণ্ডলের এই সিক্ততা না থাকিলে দিনে যেমন গরম, রাত্রে রৌদ্রের অভাবে সেই পরিমাণে ঠাণ্ডা হয় (extremes of temperature) ; দুই রকমই অসহ্য হয়।

ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে এইরূপ অনেক স্থান আছে ; তবে কোন কোন স্থলে আর্দ্র-বায়ুতার (humidity) দরুণ কতকটা সামঞ্জস্য বিধান হয়।

তাপের এত অত্যধিক পরিবর্ত্তন (variation of temperature) রোগী বিশেষের পক্ষে ক্ষতিকর। বৃদ্ধ শিশু বা যাহাদের ফুসফুস সংক্রান্ত কোন পীড়া আছে, তাঁহাদের এই সমস্ত স্থান উপযুক্ত নহে। অধিকন্তু বহির্ভ্রমণের জন্য এই সব স্থান সুবিধজনক হয় না। প্রাতঃকালে বেশ ঠাণ্ডা থাকে এবং রৌদ্র উঠিলে হঠাৎ খুব গরম বোধ হয় ; সায়ংকালেও তাই, হঠাৎ সূর্য্যাস্তের পর ঠাণ্ডা পড়িয়া যায়। রুগ্ন শরীরে এই সব স্থানে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অন্য রকমের রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। হাঁপানী বা শ্বাসনালীর পীড়াগ্রস্ত রোগীর পক্ষে এসব স্থান সুবিধার নহে।

মৃত্তিকা-স্তর।—মৃত্তিকার স্তরের উপরও জল-হাওয়া

কতকটা নির্ভর করে। সাধারণতঃ দুই রকম স্তর আমরা দেখিতে পাই—যথা, সছিদ্র ও দুর্ভেদ্য। সছিদ্র (porous) মৃত্তিকা—যথা বেলেমাটী, কাঁকুরে জমি ইত্যাদির ভিতর দিয়া বৃষ্টির জল উপর হইতে মাটির ভিতর পর্য্যন্ত শীঘ্র যাইতে পারে এবং অপরপক্ষে মাটীর ভিতর হইতে আর্দ্রতাও অনায়াসে মাটীর উপর আসিয়া ঐ স্থানের জল-হাওয়ার তারতম্য ঘটাইতে পারে; এই জন্য এই সব স্থান স্বাস্থ্যোপযোগী। কিন্তু যদি মৃত্তিকা-স্তর সছিদ্র না হইয়া দুর্ভেদ্য (impervious) হয় —যথা, এঁটেল মাটী। তাহাহইলে এ সব স্থানে উপরোক্ত আর্দ্রবাষ্পের আদান-প্রদান মাটীর ভিতর হইতে উপরের হাওয়ার সহিত হওয়ার অসুবিধা হয় এবং হাওয়াতে জলীয়বাষ্প বেশী থাকে ও স্থানটি সেঁতসেঁতে হয়।

বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশই দুর্ভেদ্য মৃত্তিকা স্তরে পূর্ণ (impervious soil)। রাণীগঞ্জ, বাঁকুড়ার কিয়দংশ, মানভুম, সাঁওতাল পরগণা, প্রভৃতি স্থানের মাটি প্রায়শঃ সছিদ্র।

জল সরবরাহ-প্রণালী (water supply)।—যাঁহারা হাওয়া খাইতে যাইবেন, তাঁহাদিগকে এ বিষয়টির খুব ভাল রকম সন্ধান লইতে হইবে। সাধারণতঃ নদী বা নিকটস্থ কোন ঝরণা বা পুষ্করিণী বা কুয়া (কূপ) হইতে জল সরবরাহ হয়। আজকাল অনেক সহরে জলের কল হইয়াছে, দূরস্থ কোন নদী বা হ্রদ হইতে জল আনিয়া সহরে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্বাস্থ্যকর স্থানে বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই; পানীয় জল স্থানীয় কূপ বা নদীর জল ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

এই সব স্থানের জলে নানারকম খনিজ পদার্থসমূহের সূক্ষ্মচূর্ণ মিশ্রিত থাকে; কোথাও লৌহের ভাগ, কোথাও চূণের (calcium) ভাগ, কোথাও, ম্যাঙ্গানিজ (manganese) কোথাও বা মাইকা ইত্যাদি থাকে; এবং ইহাদের পরিমাণ অনুসারে নানাস্থানের নানারকমের জলের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের ধাত বা ঐ রোগে প্রায় কষ্ট পান, তাঁহারা বৈদ্যনাথ অঞ্চলে (Santhal pergana) গিয়া সুবিধা করিতে পারিবেন না; কারণ ঐ স্থানের জলে লৌহের অংশ বেশী। তবে রক্তস্বল্পতা রোগে উপকার হইতে পারে।

আমাদের দেশের নানা স্থানের জল পাশ্চাত্য দেশে ন্যায় বিশ্লেষণ (analyse) করিয়া দেখা হয় নাই, যদি হইয়া থাকে, তাহা সকলের জানা নাই। নানা স্থানের জলের গুণাগুণ, কোথায় কত পরিমাণে কি খনিজ দ্রব্য সংমিশ্রিত আছে জানা থাকিলে বিশে (Carlsbad, apenta) ইত্যাদি জলের আমদানী কোন আবশ্যকতা থাকিত না।

অনেক স্থানের জলে, সাধ্য অজীর্ণ, গ্রহণী প্রভৃতি পরিপাক-বিকৃতি-ঘটিত রোগসমূহের উপকার হয় হজমের খুব সাহায্য করে। এ সব বিষয় সন্ধান লইতে হইলে, একই জায়গার ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে সংগৃহীত জলের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। প্রায়ই লোকের মুখে শুনা যায়, অমুক স্থানে একটী কূপ আছে বা এক পুকুর আছে, তাহার জল খুব উপকারী: অন্য স্থানের জল তত সুবিধার নহে।

কোন কোন স্থানে এমন জলাশয় বা কূপ আছে যে, তাহার জল পাইলে নানারকমের অসুখ হয়। কোন স্থানে (mica) অভ্র অথবা আর্সেনিক জলে থাকায় পেটের পীড়ার সৃষ্টি হয়, কোন স্থানের জলে লোমে গোদ, কোষবৃদ্ধি, গলগণ্ড প্রভৃতি রোগের (goitre) হয়।

বাসগৃহের অবস্থা ও স্থানীয় সুবিধাসুবিধা বিদেশে গিয়া কোথায় থাকিতে হইবে, তাহার বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখা আবশ্যক। অনে মনে করেন—একবার বেরিয়ে পড়ি না, সেখানে একটা বাসা সন্ধান করিয়া লইলেই চলিবে', এ নিতান্ত ভুল। গতবারে বেরিবেরির সময় নানাস্থানে গিয়া বাসগৃহের দরুণ কি ভয়ানক পাইয়াছেন, তাহা জানান যায় না। অনেককে

লোক ও ছোট ছেলেপুলে লইয়া রাস্তার ধারে বা কাহারও বারান্দায় বা স্থানীয় কোন স্কুলবাড়ীতে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে এবং তাঁহাদের কষ্টের অবধি ছিল না! পূর্ব্বাহ্নে বাসস্থানের বন্দোবস্ত না করিয়া বাহির হইতে নাই।

বাসগৃহের চারিদিকের (su roundings) অবস্থাও লক্ষ্য করিতে হইবে। পর্য্যাপ্ত সূর্য্যের আলো, নির্ম্মল হাওয়া আসে কি না···ইত্যাদি বিশেষভাবে বিচার করিয়া বাসগৃহ ঠিক করিতে হয়। পূর্ব্বে ঐ গৃহে কোন ছোঁয়াচে রোগী ছিল কি না, (যথা বসন্ত, যক্ষ্মা, ইত্যাদি) না বাড়ী ঘর ইত্যাদি যথাযথভাবে চুণকাম করা হইয়াছে কিনা খবর লইতে হইবে।

পানীয় জলের স্থান কত দূরে, ইহাও লক্ষ্যের বিষয়। বাজার-হাট কাছে আছে কি না জানা দরকার। অনেক স্থান আছে যেখানে দোকান-পাট অনেক দূরে অবস্থিত, তরীতরকারী-মাছ প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য বা বহুমূল্য, কিংবা সময়ে সকল রকম জিনিষপত্র পাওয়া দুষ্কর; অথচ স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর।—এ সব স্থান সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তত সুবিধার নহে। তবে ধনীদের পক্ষে অন্য কথা, তাঁহারা দূর হইতে যে-কোন মূল্যে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারেন এবং যথেষ্ট সংখ্যক ভৃত্যাদি রাখিয়া নিজেদের সুবিধা করিয়া লইতে পারেন। আমরা বাঙ্গালী মানুষ, একটু খাওয়া-দাওয়ার বৈচিত্র্যের দিকে বেশী নজর; তার উপর বায়ু-পরিবর্ত্তনে গিয়া জল-বাতাস ও অভ্যাসাতিরিক্ত পদব্রজ-ভ্রমণের কল্যাণে ক্ষুধাও সকলের বেশ একটু বাড়িয়া যায়। ৺কাশীধামে খাওয়া-দাওয়ার খুব সুবিধা অথচ একটা প্রধান তীর্থস্থান; তাই অত ভীড় হয়। কার্শ্যাটার, মিহিজাম, সিমুলতলা, ঝাঁঝা প্রভৃতিতে তাই অত ভীড় হয় না।

বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইলেই যে অসুখ সারিয়া যাইবে এমন কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; সেই জন্য স্থানীয় চিকিৎসকেরও সন্ধান করিয়া রাখিতে হইবে। তাঁহার বাসগৃহ বা ডাক্তারখানা পূর্ব্ব হইতে খোঁজ করিয়া রাখা ভাল। চিকিৎসক-বর্জ্জিত স্বাস্থ্যকর স্থান বর্জ্জনীয়।

নিম্নলিখিত কয়েকটী রোগে বায়ুপরিবর্ত্তনে বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা:—

১। **যক্ষ্মারোগ**—প্রথম সূত্রপাতে এই রোগ উপযুক্তরূপে চিকিৎসা করিলে সারিয়া যায়। স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস ইহার অন্যতম প্রধান চিকিৎসা। যে সব বায়ুতে ozone বেশী আছে, সেই সব স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়। সমুদ্রের ধারে, অথবা উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে ঐ ozone বা ঘনীভূত অম্লজান-বায়ু প্রচুর পরিমাণে থাকে। এই জন্য পুরী, ওয়ালটেয়ার, বিন্ধ্যাচল, আলমোরা, নৈনিতাল প্রভৃতি স্থানে ঐ সব রোগী পাঠান হয়, এবং তথায় নিয়মিত চিকিৎসা করাইলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

২। **হাঁপানি রোগ**—এই রোগ শীঘ্র সারে না। যে স্থানে এ রোগের উৎপত্তি হয়, সে স্থান হইতে রোগীকে স্থানান্তরিত করিয়া দিলে রোগের উপশম হয়। সাধারণতঃ শরৎকালে বা শীতকালে ঐ রোগ বাড়ে। যেখানে শীতের প্রকোপ কম বা বৎসরের মধ্যে ঋতুর বেশী তারতম্য হয় না (সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান), সেইরূপ sunny equable climate-এ স্থান পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

সেঁতসেঁতে (damp) স্থানে রোগের উৎপত্তি হইলে একটু উচ্চ স্থানে যাইতে হইবে বা উচ্চ স্থানে রোগের সূত্রপাত হইলে, একটু moist climateএ আসিলে উপকার হয়।

৩। **বেরীবেরী**—এ রোগটি আমাদের দেশে নূতন। এখনও উৎপত্তির সঠিক কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় নাই। খাদ্য-মধ্যে ভাইটামীনের ক্রমান্বয় অভাব ত বটেই, তথাপি অনেকের ধারণা—কোন স্থান-বিশেষের জল-হাওয়া দূষিত হওয়ায় ঐ রোগের বৃদ্ধিকে সহায়তা করে। স্থান-পরিবর্ত্তনে শীঘ্র উপকার হয়, তবে স্থানটি একটু উচ্চ (সমুদ্র-সমতল হইতে অন্ততঃ পাঁচশত ফিট উচ্চ) হইলে ভাল হয় (higher and drier climate)।

৪। **মূত্র-ঘটিত ব্যারাম (Bright's disease)**—এ রোগে একটু গরম ও যে স্থানে ঋতুর পরিবর্ত্তন বেশী হয় না, এই রকম স্থান ভাল। Variation of temperature মোটেই সহে না এবং সেই সব স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৫। **পুরাতন অম্লাজীর্ণ (Chronic Dyspepsia)**—যে সব স্থানে পানীয় জল স্বাস্থ্যকর বা mineral বা organic matter বেশী নাই, এই সব স্থানে যাইলে উপকার হয়।

রাঁচি, হাজারীবাগ, চুনার, ভুবনেশ্বর, বিন্ধ্যাচল, মুঙ্গের এবং পশ্চিম অঞ্চলের অন্যান্য স্থান বিশেষ উপকারী।

৬। **বাতরোগ**—বেশী শীতপ্রধান স্থান বর্জ্জনীয়। সমুদ্রের ধার ভাল। নোনাজলে স্নান, বালির ভিতর রোগযুক্ত অঙ্গাদি কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখা বিশেষ উপকারী।

৭। **স্নায়বিক রোগ**—মনোহরদৃশ্য-বহুল পর্ব্বতীয় স্থান প্রশস্ত। বেশী লোক থাকিবে না, অথচ একবারে নির্জ্জন হইলেও চলিবে না।

পুত্রের যৌন প্রশ্নের উত্তর কি?

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু]

"মা, আমরা কোথা হ'তে—কেমন করে' জগতে এলুম্?"

শিশু-মুখ-নিসৃত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া লক্ষ লক্ষ জননী আজ হতভম্ব হইয়া যাইতেছেন। ছেলে ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়াছে, রাস্তায় মটরগাড়ী চাপা পড়িয়াছে অথবা নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে—এই সংবাদ শুনিলে, মাতা যেরূপ ভীত চঞ্চল হইয়া পড়েন; কিংবা সে কোনো প্রতিবাসীর গৃহ হইতে কিছু চুরী করিয়াছে, কোনো সমবয়সীর মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে, কোনো বালিকাকে অশ্লীল গালি দিয়াছে—এ কথা কর্ণগোচর হইলে মাতা যেরূপ লজ্জিত হইয়া পড়েন, ঠিক সেইরূপ শঙ্কিত, বিব্রত ও অপ্রতিভ হন, যখন শিশু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে "মা, আমরা কোথা হ'তে—কেমন করে' দুনিয়ায় এলুম্"।

এই সঙ্গীন প্রশ্নের সম্মুখীন্ প্রায় জননীরই হইতে হয়, অথচ ইহার জন্য বা ইহার উত্তর লইয়া কেহই প্রস্তুত থাকেন না। পাশ্চাত্য দেশে ইহার সঠিক্ উত্তর দেওয়া উচিত কি না, কতটুকু দেওয়া উচিত, কি ভাবে দিতে হইবে—তদ্বিষয়ে যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া অনেকগুলি পুস্তক লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল বই পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সন্তানের এই জিজ্ঞাসার সম্মান রক্ষা করিতে পশ্চাদপদ্ হন্ না; কিন্তু তথাপি তত্তৎদেশের অনেক জননী এই সকল বিষয়ে এখনও অজ্ঞ, উদাসীন্, অনুদার। কিন্তু বাংলায় —তথা ভারতবর্ষে যেমন এ বিষয়ে একখানিও গ্রন্থ নাই, তেমনি অশিক্ষিতা অপরিণত-বুদ্ধি মাতাও মানস ভাণ্ডারে ইহার সদুত্তর খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান্ হইয়া পড়েন।

ছেলের মুখে এই জাতীয় কোনো প্রশ্ন শুনিলে, সাধারণতঃ মাতা অমনি—"তুমি ছেলেমানুষ, এসব বুঝ্‌বে কি বাছা," "এসব কথা নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ো না" "লেখা পড়া শিখে বড় হ'লে জান্‌তে পার্‌বে" "এখন হাতে কায আছে, পরে বল্‌ব"...ইত্যাকার জবাব দিয়া শিশুর কৌতূহলকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করেন, বটে, কিন্তু স্থায়ীভাবে প্রশমিত করিতে পারেন না। কোনো বুদ্ধিহীনা মাতা শিশুকে তাড়া দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন, কেহ বা গাছের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন, "গাছ যেমন বড় হয়ে ফুল ধরে, তারপর ফল হয়, তেমনি করে' তুমি হয়েছ।" যে শিশু তাড়া খাইল, সে বুঝিল—এ প্রশ্নটি মা'র নিকট যখন বেমানান্ ঠেকিল, তখন নিশ্চয় ইহার মধ্যে কিছু রহস্য আছে। যে ফলের উপমা শুনিল, সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল —ধ্যুৎ, তাই কখনো হয়? মা কি গাছ, আমরা কি ফল? কেমন করে' হবে! গাছের পাতা গজায়, ঝরে' পড়ে, ফুল হয়, গন্ধ বিলায়, তুলে এনে আমরা মালা গাঁথি, ফল হয়—আমরা মজা করে' খাই। কিন্তু ফল কি আমাদের মত হাসে, না—কথা বলে, না—কান্‌তে পারে, নাচ্‌তে পারে, দৌড়ুতে পারে, ঢক্ ঢক্ করে' দুধ খেতে পারে? মা বোকা, ঠিক্ ঠিক্ জবাব দিতে পাল্লে না, বোকা!"

মা কিন্তু ভাবিলেন, ব্যস্, ছেলে ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাঁহার কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পন্ন করিলেন্। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না যে, এই সকল প্রবঞ্চনাময় উত্তরে শিশু সন্তুষ্ট হইল না—তাহার জ্ঞান-পিপাসা 'তাতল সৈকতের' মতই রহিয়া গেল। এই জীবন-মরণ-সমস্যামূলক সুকঠিন প্রশ্ন ওষ্ঠাগ্রে ধরিয়া শিশু পারিবারিক আবেষ্টনী ছাড়িয়া জগতে বাহির হইল—সদুত্তর দিবার লোক খুঁজিতে। ইহার উত্তর পাইতে তাহার বেশী দেরী হয় না, সে তাহা পাইয়া পরিতৃপ্ত হয়ই। কিন্তু কেমন করিয়া কাহার নিকট হইতে পায়—এ সন্ধান পাইলে মাতা হয়ত ঘৃণা-লজ্জা-অনুশোচনায় মাটির সহিত মিশিতে চাহিবেন।

শিশুর এই অনাকাঙ্ক্ষিত উপায়ে উত্তর আহরণ করার জন্য মাতাই প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু পিতা যে একেবারে দায়ী নহেন—তাহা ভুল। প্রথমতঃ তিনি মাপন স্ত্রীকে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার উপযুক্ত শিক্ষা দেন নাই অথবা অধিকার দেন নাই; দ্বিতীয়তঃ এইরূপ কোনো প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসিত হইলে শিশুকে বলেন্—"তোমার মা'র নিকট জিজ্ঞাসা ক'রো", নতুবা জননীর ন্যায়ই একটা অতৃপ্তিকর অসঙ্গত জবাব দিয়া নিরস্ত হন্।

পিতার উচিত শিশুর যৌন প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে

স্ত্রীর সহিত পূর্ব্ব হইতেই আলোচনা করিয়া একটা সন্তোষজনক জবাব স্থির করিয়া রাখা; স্ত্রীর যদি এ সম্বন্ধে পরিস্ফুট জ্ঞান না থাকে, তাহাহইলে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে ওয়াকিব্-হাল করা এবং তিনি নিজে যদি এবিষয়ে উপযুক্তরূপ জ্ঞানবান্ না হন্, তাহাহইলে ঐ বিষয়ক কোনো ইংরাজী বা বাংলা পুস্তক পাঠ করা ও অভিজ্ঞের নিকট হইতে এতৎসম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা। যৌন বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এমন একটা ভিত্তিহীন বিসদৃশ লজ্জাশীলতার ভাব বংশ-পরম্পরা প্রচলমান্ যে, অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও মন খুলিয়া স্বাধীনভাবে সুসঙ্গতির সহিত ইহার আলোচনা চলা কঠিন হইয়া পড়ে। কাযেই শিশু-পুত্রকে তাহার জগতে আগমনের সত্য ইতিহাস শুনাইতে-যে তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইবেন—ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু অধিকাংশ পিতাই বুঝিতে পারেন যে, পারিবারিক আব্‌হাওয়ার মধ্যে যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে না পাইয়া, পরবর্ত্তী জীবনে বিকৃত-লব্ধ শিক্ষার ফলে পুত্রের কতখানি অনিষ্ট সাধিত হয়। শিশুকে এ প্রশ্নের উত্তর যে করিয়া হউক্ শুনাইতেই হইবে; পিতামাতা নিজেরা যদি অপারগ হন্, তাহা হইলে ইহার ভার অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা উচিত।

কিন্তু এমন যোগ্য ব্যক্তি কে আছে? পিতামাতা ছাড়া ইহ-সংসারে আর যোগ্যতর ব্যক্তি কোথায় পাওয়া যায়—যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া এই মহা-দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দেওয়া যাইতে পারে? এমন কাহাকে পাই-যিনি পিতামাতার অপেক্ষা শিশুর জন্মের ইতিহাস ভালো রূপ অবগত আছেন এবং তাহার ছাপ শিশুর মনের মধ্যে ভালোরূপ অঙ্কিত করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখেন্? বলিতে পারেন—শিক্ষক বা গুরুমহাশয়! কিন্তু ধারাপাত ও বর্ণ পরিচয়ের সীমানার বাহিরে তাঁহাদের জ্ঞান ও প্রকাশের ক্ষমতা যেরূপ অল্প—অসহায়, শিশুর হৃদয় রাজ্য হইতেও তিনি তেমনি দূরে নির্বাসিত—ভয়ের দেবতারূপে পূজিত। কড়াকিয়া শতকিয়ার প্রশ্ন করা

৪। **ব্লক-ঘটিত ব্যারাম (Bright's disease)**—এ রোগে একটু গরম ও যে স্থানে ঋতুর পরিবর্ত্তন বেশী হয় না, এই রকম স্থান ভাল। Variation of temperature মোটেই সহে না এবং সেই সব স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৫। **পুরাতন অম্লাজীর্ণ (Chronic Dyspepsia)**—সে সব স্থানে পানীয় জল স্বাস্থ্যকর বা mineral বা organic matter বেশী নাই, এই সব স্থানে যাইলে উপকার হয়।

রাঁচি, হাজারীবাগ, চুনার, ভুবনেশ্বর, বিন্ধ্যাচল, মুঙ্গের এবং পশ্চিম অঞ্চলের অন্যান্য স্থান বিশেষ উপকারী।

৬। **বাতরোগ**—বেশী শীতপ্রধান স্থান বর্জ্জনীয়। সমুদ্রের ধার ভাল। নোনাজলে স্নান, বালির ভিতর রোগযুক্ত অঙ্গাদি কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখা বিশেষ উপকারী।

৭। **স্নায়বিক রোগ**—মনোহরদৃশ্য-বহুল পর্ব্বতীয় স্থান প্রশস্ত। বেশী লোক থাকিবে না, অথচ একবারে নির্জ্জন হইলেও চলিবে না।

পুত্রের যৌন প্রশ্নের উত্তর কি ?

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু]

"মা, আমরা কোথা হ'তে—কেমন করে' জগতে এলুম্ ?"

শিশু-মুখ-নিসৃত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া লক্ষ লক্ষ জননী আজ হতভম্ব হইয়া যাইতেছেন। ছেলে ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়াছে, রাস্তায় মটরগাড়ী চাপা পড়িয়াছে অথবা নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে—এই সংবাদ শুনিলে, মাতা যেরূপ ভীত চঞ্চল হইয়া পড়েন ; কিংবা সে কোনো প্রতিবাসীর গৃহ হইতে কিছু চুরী করিয়াছে, কোনো সমবয়সীর মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে, কোনো বালিকাকে অশ্লীল গালি দিয়াছে—এ কথা কর্ণগোচর হইলে মাতা যেরূপ লজ্জিত হইয়া পড়েন, ঠিক সেইরূপ শঙ্কিত, বিব্রত ও অপ্রতিভ হন, যখন শিশু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে "মা, আমরা কোথা হ'তে—কেমন করে' দুনিয়ায় এলুম্"।

এই সঙ্গীন প্রশ্নের সম্মুখীন্ প্রায় জননীরই হইতে হয়, অথচ ইহার জন্য বা ইহার উত্তর লইয়া কেহই প্রস্তুত থাকেন না। পাশ্চাত্য দেশে ইহার সঠিক্ উত্তর দেওয়া উচিত কি না, কতটুকু দেওয়া উচিত, কি ভাবে দিতে হইবে—তদ্বিষয়ে যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া অনেকগুলি পুস্তক লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল বই পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সন্তানের এই জিজ্ঞাসার সম্মান রক্ষা করিতে পশ্চাদপদ্ হন্ না; কিন্তু তথাপি তত্তৎদেশের অনেক জননী এই সকল বিষয়ে এখনও অজ্ঞ, উদাসীন্, অনুদার। কিন্তু বাংলায় —তথা ভারতবর্ষে যেমন এ বিষয়ে একখানিও গ্রন্থ নাই, তেমনি অশিক্ষিতা অপরিণত-বুদ্ধি মাতাও মানস ভাণ্ডারে ইহার সদুত্তর খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান্ হইয়া পড়েন।

ছেলের মুখে এই জাতীয় কোনো প্রশ্ন শুনিলে, সাধারণতঃ মাতা অমনি—"তুমি ছেলেমানুষ, এসব বুঝ্‌বে কি বাছা," "এসব কথা নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ো না" "লেখা পড়া শিখে বড় হ'লে জান্‌তে পার্‌বে" "এখন হাতে কায আছে, পরে বল্‌ব"···ইত্যাকার জবাব দিয়া শিশুর কৌতূহলকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করেন্, বটে, কিন্তু স্থায়ীভাবে প্রশমিত করিতে পারেন না। কোনো বুদ্ধিহীনা মাতা শিশুকে তাড়া দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন, কেহ বা গাছের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন, "গাছ যেমন বড় হয়ে ফুল ধরে, তারপর ফল হয়, তেমনি করে' তুমি হয়েছ।" যে শিশু তাড়া

গাইল, সে বুঝিল—এ প্রশ্নটি মা'র নিকট যখন বেমানান্ ঠেকিল, তখন নিশ্চয় ইহার মধ্যে কিছু রহস্য আছে। ফলের উপমা শুনিল, সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল —ধ্যুৎ, তাই কখনো হয়? মা কি গাছ, আমরা কি ফল? কেমন করে' হবে! গাছের পাতা গজায়, ঝরে' পড়ে, ফুল হয়, গন্ধ বিলায়, তুলে এনে আমরা মালা গাঁথি, ফল হয়—আমরা মজা করে' খাই। কিন্তু ফল কি আমাদের মত হাসে, না—কথা বলে, না—কান্‌তে পারে, নাচ্‌তে পারে, দৌড়ুতে পারে, ঢক্ ঢক্ করে' জল খেতে পারে? মা বোকা, ঠিক্ ঠিক্ জবাব দিতে জানে না, বোকা!"

মা কিন্তু ভাবিলেন্, ব্যস্, ছেলে ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাঁহার কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পন্ন করিলেন্। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না যে, এই সকল প্রবঞ্চনাময় উত্তরে শিশু সন্তুষ্ট হইল না—তাহার জ্ঞান-পিপাসা 'তাতল সৈকতের' মতই রহিয়া গেল। ঐ জীবন-মরণ-সমস্যামূলক সুকঠিন প্রশ্ন পৃষ্ঠাগ্রে ধরিয়া শিশু পারিবারিক আবেষ্টনী ছাড়িয়া জগতে বাহির হইল—সদুত্তর দিবার লোক খুঁজিতে। তাহার উত্তর পাইতে তাহার বেশী দেরী হয় না, সে যাহা পাইয়া পরিতৃপ্ত হয়ই। কিন্তু কেমন করিয়া তাহার নিকট হইতে পায়—এ সন্ধান পাইলে মাতা কত ঘৃণা-লজ্জা-অনুশোচনায় মাটির সহিত মিশিতে চাহিবেন।

শিশুর এই অনাকাঙ্ক্ষিত উপায়ে উত্তর আহরণ করার জন্য মাতাই প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু পিতা যে একেবারে দায়ী নহেন—তাহা ভুল। প্রথমতঃ তিনি যখন স্ত্রীকে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার উপযুক্ত শিক্ষা দেন নাই অথবা অধিকার দেন নাই ; দ্বিতীয়তঃ এইরূপ কোনো প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসিত হইলে শিশুকে বলেন্—"তোমার মা'র নিকট জিজ্ঞাসা ক'রো", নতুবা জননীর ন্যায়ই একটা অতৃপ্তিকর অসঙ্গত জবাব দিয়া নিরস্ত হন্।

পিতার উচিত শিশুর যৌন প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে স্ত্রীর সহিত পূর্ব্ব হইতেই আলোচনা করিয়া একটা সন্তোষজনক জবাব স্থির করিয়া রাখা ; স্ত্রীর যদি এ সম্বন্ধে পরিস্ফুট জ্ঞান না থাকে, তাহাহইলে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে ওয়াকিব্-হাল করা এবং তিনি নিজে যদি এবিষয়ে উপযুক্তরূপ জ্ঞানবান্ না হন্, তাহাহইলে ঐ বিষয়ক কোনো ইংরাজী বা বাংলা পুস্তক পাঠ করা ও অভিজ্ঞের নিকট হইতে এতৎসম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা। যৌন বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এমন একটা ভিত্তিহীন বিসদৃশ লজ্জাশীলতার ভাব বংশ-পরম্পরা প্রচলমান্ যে, অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও মন খুলিয়া স্বাধীনভাবে সুসঙ্গতির সহিত ইহার আলোচনা চলা কঠিন হইয়া পড়ে। কাযেই শিশু-পুত্রকে তাহার জগতে আগমনের সত্য ইতিহাস শুনাইতে-যে তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইবেন—ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু অধিকাংশ পিতাই বুঝিতে পারেন যে, পারিবারিক আব্‌হাওয়ার মধ্যে যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে না পাইয়া, পরবর্ত্তী জীবনে বিকৃত-লব্ধ শিক্ষার ফলে পুত্রের কতখানি অনিষ্ট সাধিত হয়। শিশুকে এ প্রশ্নের উত্তর যে করিয়া হউক্ শুনাইতেই হইবে ; পিতামাতা নিজেরা যদি অপারগ হন্, তাহা হইলে ইহার ভার অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা উচিত।

কিন্তু এমন যোগ্য ব্যক্তি কে আছে? পিতামাতা ছাড়া ইহ-সংসারে আর যোগ্যতর ব্যক্তি কোথায় পাওয়া যায়—যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া এই মহা-দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দেওয়া যাইতে পারে? এমন কাহাকে পাই-যিনি পিতামাতার অপেক্ষা শিশুর জন্মের ইতিহাস ভালো রূপ অবগত আছেন এবং তাহার ছাপ শিশুর মনের মধ্যে ভালোরূপ অঙ্কিত করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখেন্? বলিতে পারেন—শিক্ষক বা গুরুমহাশয়! কিন্তু ধারাপাত ও বর্ণ পরিচয়ের সীমানার বাহিরে তাঁহাদের জ্ঞান ও প্রকাশের ক্ষমতা যেরূপ অল্প—অসহায়, শিশুর হৃদয় রাজ্য হইতেও তিনি তেমনি দূরে নির্বাসিত—ভয়ের দেবতারূপে পূজিত। কড়াক্রিয়া শতক্রিয়ার প্রশ্ন করা

ব্যতীত, জনন-বিজ্ঞান বা অন্ততঃ কিছুর উত্তর দেওয়ার অধিকার যেন তাঁহার নাই; অভিভাবক কর্তৃক আদিষ্ট হইলেও আজন্মপুষ্ট কুসংস্কার ও সমাজ-সুলভ সঙ্কোচের বশে এ অপ্রীতিকর কার্য্যের ভার কোনো-মতেই তিনি ঘাড় পাতিয়া গ্রহণ করিবেন না।

কাযেই, পিতা-মাতাকে এই 'অপ্রীতিকর' কর্ত্তব্যকে প্রীতিকরভাবে পালন করিতেই হয় এবং কেমন করিয়া উহা সম্পন্ন করিতে হইবে—তৎসম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করারও আবশ্যকতা হয়। নিজেরা এবিষয়ে কিছু না বলিয়া, আমরা এখানে জনৈক মনীষীর মত লিপিবদ্ধ করিব। কয়েক মাস পূর্বে জনৈক মহিলা, আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, জীব-ও-জাতি-তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার জর্জ এ, ডর্সে (Dr. George A. Dorsey) মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সঙ্কটাপন্ন পিতা-মাতাদিগের মুখপাত্রীরূপে, শিশুর যৌন প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে উপদেশ যাচিঞা করেন।...

শিশুরা কোথা হ'তে আসে—এ প্রশ্নের উত্তর শিশু-জননী কেমন ক'রে দিবেন?

কত কম বয়সে ইহার সঠিক উত্তর শিশুকে দান করা যেতে পারে?

কি করে' এমন ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়—যদ্বারা শিশুর মনে অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ক আর কোনো কল্পনামূলক অস্বাস্থ্যকর প্রশ্ন না জাগে?

পাছে অকালে এই নূতন জ্ঞানকে কার্য্যে প্রয়োগ করে, তাহা কেমন করিয়া নিবারণ করা সম্ভব?

শিশুর নিজের অপরিণত বুদ্ধি ও যৌন-জীবনে পূর্ণ অনভিজ্ঞতা থাকা স্বত্ত্বেও, কি ভাবে এ জ্ঞানকে তাহার নিকট পরিস্ফুট, সহজবোধ্য করা সম্ভবপর?

জনন-বিজ্ঞানের কতখানি অংশ শিশুকে বলা উচিত এবং কতটুকুই বা তাহাকে ভবিষ্যতে নিজে নিজেই বিস্কার ক'রনিতে দিবার জন্য অকথিত রাখা ত? এবং কি ক'রেই বা শিশুর মানসিক স্তরের পোপযোগী ভাষায় এই কঠিন বিষয়টির বিবৃত করা ?...

ইত্যাকার কয়টি প্রশ্ন ডাঃ ডর্সেকে করা হইয়াছিল। ডর্সে কিরূপ অদ্ভুত কথন-কৌশলের সহিত সেগুলির সুন্দরভাবে মীমাংসা করিয়া দিলেন, তাহাই স্থানে-স্থানে একটু টিকা সহযোগে বিশদভাবে নিম্নে লিখিয়া গেলাম।

"কোনো জননী তাঁহার সন্তানকে যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দিবার পূর্বে, এ সম্বন্ধে তাঁহার একটা সুদৃঢ় ধারণা অর্জন করা উচিত। যৌন-সংযোগ করিলেই যৌন-জীবনের সকল জটিলতা (আমি 'রহস্য' না বলিয়া 'জটিলতা' শব্দটি ব্যবহার করিতে চাহি) জানা যায় না। স্ত্রী-পুরুষের সংমিলন-কার্য্য—যৌন-সংস্কারের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সপ্রকাশ মূর্তি।

"যৌনাসক্তি অর্থে আমরা কি বুঝি?—যৌনাসক্তি হইতেছে অসীম শক্তির উৎস; যৌনাসক্তিই হইল জীবের সৃজনাত্মিকা প্রকৃতি। যৌনাসক্তি আমাদের সপ্রাণতা, উহাই জগতকে সচল সক্রিয় রাখিয়াছে; যৌনাসক্তিই জীবন। কিন্তু কৃত্রিম লজ্জাশীলা রমণী এই শব্দটির মধ্যে জঘন্য, ইতর, নির্লজ্জ, অবনতি ও পশুত্ব-জনিত উদ্দেশ্যের আরোপ করেন।

"যৌনাসক্তি হইল মানুষের সভ্যতা ও ক্রমোন্নতি চক্রের অক্ষকেন্দ্র। জীব-প্রকৃতির মধ্যে ইহার একটা বিশিষ্ট স্থান ও একটা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য আছে। এই কার্য্যটির নাম—স্বজাতি-বিস্তার বা প্রজনন। মানুষকে বাঁচিতে হইলে অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় যৌনাসক্তিকেও সক্ষম রাখিতে ও শ্রদ্ধা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি—পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক—প্রজননের জন্য অল্পবিস্তর সচেষ্ট হয় না, জীবরাজ্যে তাহার অস্তিত্বই নিরর্থক; সে না জন্মিলে জগতের যতটুকু উপকার হইত, জন্মিয়াও জগতের তদপেক্ষা বড় বেশী কিছু উপকার হইল না।

"যৌনাসক্তি ভগবান সৃজন করিলেন কেন? কারণ ভগবানের নিজেরই মধ্যেই যৌনাসক্তি আছে; সুতরাং তাঁহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশরূপে যে জীবই জন্মগ্রহণ করুক, তাহার মধ্যে ঐ সংস্কার সংগুপ্ত থাকিবেই। জৈব প্রকৃতির মধ্যে ইহার অস্তিত্ব না থাকিলে যে

জীব-লীলার চিরস্থায়ীত্ব বজায় থাকে না—মানুষ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। যৌনাসক্তি জীবনের জোয়ার-ভাঁটাকে নিয়ন্ত্রিত করে। উচ্চতর জীবনের ইহা একটি অনিবার্য্য উপাদান। যৌন-সংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তি যদি তাহার যৌন সংযোগ-তৃষ্ণা অপরিপূর্ণ রাখে, তাহাহইলে জীব-জগতে তাহার কোনো সার্থকতা থাকে না। আহার্য্য-পানীয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুধা না থাকিলে মানুষ মরিয়া যায়; যৌন-সম্ভোগের ক্ষুধা সেইরূপ প্রবল না থাকিলে জাতি মরিয়া যায়।

"অনেক অতিরিক্ত লজ্জাশীল পুরুষ বা স্ত্রীলোক তাহাদের পবিত্রতার বিষয় এত-যে ঢাক পিটাইয়া প্রচার করে, তাহার সুস্পষ্ট কারণ মনস্তত্ত্ব আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছে। যে সকল অজ্ঞান লোক স্বাভাবিক কৌতূহল ও উদ্ধত সাহসকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া, নিজেদের নৈতিক চরিত্রকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের সে চরিত্রকে খুব নিরাপদ ও খাঁটি বলিতে পারি না।

"যৌনসম্বন্ধীয় জ্ঞান-স্রোতস্বিনীর উপর এই অপবিত্রতা-সমস্যার পাষাণ-বাঁধ জীবতত্ত্ব ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং 'যৌনাসক্তি মানুষের সয়তানী শক্তি অর্জন করিবার ও ধ্বংসের মুখে যাইবার প্রশস্ত পথ'—যুগযুগান্ত পূর্বে সমুদ্ভূত এই অসঙ্গত মতকে জীবতত্ত্বই শনৈঃ শনৈঃ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাদের অন্তরের প্রবৃত্তি-প্রগতির বেশী খবর রাখে।

"কিন্তু একা সমাজকেই কেবল দোষ দেওয়া যায় না। যৌন বিষয়টিকে এইরূপ জুজু-বুড়ী করিয়া রাখার জঘন্য ব্যাপারটি একদল মানুষের তৈয়ারী কুসংস্কার-জনিত আইনের ফলে পুরুষানুক্রমে আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার সম্বন্ধীয় কোনো জ্ঞান-লাভ বা প্রচার পাপ বলিয়া ধারণা করা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানকে এই জন্ম-জন্মার্জিত কুসংস্কারের সহিত লড়িতে হইতেছে।

"যৌন-বিষয়ক বেশীর ভাগ জ্ঞানই—যাহা সাধারণতঃ আমাদের দেশের বয়োবৃদ্ধ বা কিশোরগণ লাভ করেন, তাহার পশ্চাতে কোনো প্রণালীবদ্ধ প্রাণীবিদ্যার পৃষ্ঠভূমি থাকে না, কিংবা এমন কোনো শিক্ষা থাকে না—যাহা মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। সুতরাং সে জ্ঞান বাস্তব জীবনে আমরা সুসঙ্গতি ও সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিতে পারি না। দেহের ভিতর এমন একটা স্থান আছে, যাহাকে বাক্য-মনের অতীত করিয়া নীরবতার অন্তরালে গোপন রাখিতেই হইবে ও মানুষের জন্ম-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কোনো সংবিদই ধর্মের দিক দিয়া নিষিদ্ধ—এই মতকে কৃত্রিম নীতিবাদ ও স্বাধীনতার নামে বিরাট মূর্খতাব্যঞ্জক ভণ্ডামী ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। মজা দেখুন। বিবাহ জিনিসটি শাস্ত্রে-পুরাণে-গল্পে-কাব্যে কত বড় একটা স্বর্গীয়ভাব-মণ্ডিত বলিয়া কথিত হইয়াছে, ভগবানকে প্রেমের দেবতা বলিয়া কত প্রশংসাবাদই না করা হইয়াছে; কিন্তু বিবাহের সেই অপরিহার্য্য অঙ্গ, প্রেমের সেই বাস্তব অংশটি নাকি বড় লজ্জাকর ব্যাপার, মদন দেবতা হইলেও পুরাণকারের মতে পাশবিক লালসার পিশাচ-পুরোহিত!

"মানব-দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান ও কার্য্যাবলী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যখন সৃজনের এই অপরিহার্য্য অঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের প্রতি সমাজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগ্রত হইবে, তখন এই সকল মূঢ় বিশ্বাস অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে। যৌনাসক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হইল জীবনের পেয়ালার নূতন প্রাণ-শক্তি, আনন্দ ও যৌবনের অমৃত-মদিরা পূর্ণ করিয়া দেওয়া। যে ভগবান শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনার জন্য ফুসফুস, রক্ত পরিবেশনের জন্য হৃৎপিণ্ড, অন্নমণ্ড জীর্ণ করিবার জন্য পাকস্থলী-অন্ত্রাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভগবানই সুবুদ্ধি করিয়া মানবের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার জন্যই এই জনন-যন্ত্রসমূহের সৃজন করিয়াছেন এবং অন্যান্য সুকোমল যন্ত্রের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রাখিয়া দিয়াছেন। আমরা ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে কোনো

জ্ঞানই মানুষের কৌতূহলের হাত হইতে গোপন করি না; পরন্তু জনন-যন্ত্রিক পরিবেদনা সম্বন্ধে আমাদিগের আরও স্পষ্টবাদী, সরল, অকপট হওয়া উচিত, কারণ এগুলি আরও সুকুমার ও আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ বাহিরের প্রভাবে সব চেয়ে শীঘ্র বিকল হওয়ার সম্ভাবনা।

"প্রত্যেক জননী তাহার সন্তানকে বলেন—'বাছা বেশ আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে খাও, নইলে বদ্‌হজম হবে।' শিক্ষক স্কুলে স্বাস্থ্যনীতি শিখাইবার সময় বলেন—"বাপুরা, সর্বদা মুক্ত বায়ুতে থাক্‌বে এবং গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে নির্মল বাতাস বুকের মধ্যে টেনে নেবে। জিনস্যাষ্টিক্-শিক্ষক তাহাদিগের শক্তি-অর্জনের সুবিধা করিয়া দিতে নিয়মিত নানারূপ ব্যায়াম অভ্যাস করান্। কিন্তু কে এমন ব্যক্তি আছেন—যিনি, সে যে-মুহূর্ত্ত হইতে ধরাতলে আসিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার যৌন যন্ত্রাবলীর চতুর্দিকে কতখানি প্রলোভন, কতটা বিপদ ঘনাইয়া আসিতে থাকে, তৎসম্বন্ধে তাহাকে সম্যক সতর্ক করিয়া দিবেন? কেহ নাই; সেইজন্য বালকগণ এইগুলি পরিপক্ক ও সুপরিপুষ্ট হইবার পূর্বে, দূষিত অন্তরের প্রেরণায় হউক বা কুসংসর্গের প্রতিপত্তিতে হউক, তাহাদের অপব্যবহার শিক্ষা করে। ইহার ফলে বন্ধ্যতা আসে, নানা বিপজ্জনক শরীর-ক্ষয়কর ব্যাধি আসে, জীবন্মৃত্যু, নহেতো অকাল মৃত্যু!

এই জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া উচিত কাহার?—মাতার? তিনি কি হাসিমুখে এ দায়ীত্ব গ্রহণ করেন? তাঁহার মাতা কি এ বিষয়ে বাল্যকালে তাঁহাকে কিছু শিক্ষা দিয়াছিলেন?···কেন দেন্ নাই?

"এই জ্ঞানদান বিষয়ে মাতার নীরবতা বা উদাসীনতার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, শিশু তাঁহাকে সর্বজ্ঞতার মর্য্যাদা দান করিয়া এমন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করে, যৎসম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। রসায়ন-বিদ্যা বা চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার কিছু জ্ঞান থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু যৌন বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার কোনো প্রজ্ঞাই নাই; কাযেই তিনি এই উত্তর-দান-কার্য্য অতি বিকৃত-কদর্য্যভাবে নিষ্পন্ন করেন; জ্ঞান-লাভের জন্য ব্যগ্রচিত্ত শিশু সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, তখনকার মত তাহার কতকগুলি কাল্পনিক ব্যাখ্যা আপন মনে তৈয়ারী করিতে লাগিয়া যায়। এই ত গেল মাতার অজ্ঞানতার কথা।

"তারপর, দ্বিতীয় কারণগুলি এই অজ্ঞানতার তুল্য-মূল্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে—লোকাচার, মিথ্যা শিষ্টাচার, চিরাচরিত প্রথার অভিশাপ-মধ্যে।

স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার বিষয়ক কোনো সংবিদ নির্লজ্জ জঘন্যতা—এ প্রত্যয়টি আলোচ্য জননীগণের মনে শৈশব হইতেই এরূপভাবে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা শুধু শিশু-পুত্র নহে—বয়স্ক আত্মীয়-স্বজনের সহিতও এ বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ করিতে প্রাণে নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করেন। মনস্তত্ত্ব বলেন, ইহা এক প্রকার অভ্যাস-গত প্রবৃত্তি-নিরোধ—যদ্দ্বারা সাধারণ মানুষ চুরী করিতে ঘৃণা অথবা খুন করিতে বিতৃষ্ণা বোধ করে। অথচ সমাজের ও দেশের আইনের চক্ষের উপরে, নিন্দনীয় হইলেও, চুরী, ডাকাতী বা খুন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই প্রাণীকে বহু ক্ষেত্রে সাধন করিতে হয়।

পশুরা চুরী করে—হনন করে—হত্যা করিয়া পরস্পর পরস্পরের মাংস ছিঁড়িয়া খায়; আমরা তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই হই না। আমরা বলি, 'এটা পশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি!' বহুকালের কষ্টকর ও বিরক্তিজনক বহুদর্শিতার ফলে মানুষ এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, যদি আইন ও শৃঙ্খলাসূচক কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করা যায়, তাহাহইলে জগত বাস্তবিক উপভোগ্য ও বাসযোগ্য হইয়া উঠে। মানুষকে এখনও শিখিতে হইবে যে, এই-যে তাহারা শিরোঘূর্ণন, হৃদি-দৌর্বল্য, অন্যান্য ব্যাধিতে ভুগে বা অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তাহা দূর হইতে পারে—এই যৌন বিজ্ঞানকে রহস্য-যবনিকার অন্তরাল হইতে মানুষের তৃতীয় নেত্রের সম্মুখে ধরিলে।

ক্রমশঃ)

কোথাকার জল কোথায় মরে!

[ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্]

বর্ত্তমান কালের চিকিৎসকেরা বেশ প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই মানব-দেহে সত্য সত্যই "এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, অন্য গাঁয়ে মাথা নড়ে"—অর্থাৎ, এই দেহের প্রত্যেক তন্তু, প্রত্যেক এমন কি সুদূরতম অপর তন্তুটির সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সহানুভূতি-সম্পন্ন। 'কথামালায়' "উদর ও অন্যান্য অবয়বের" উপাখ্যানে যে কত বড় সার-সত্য নিহিত আছে, তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইংরাজীতে "ফোকাস্" (কেন্দ্র) বলিয়া একটি বাক্য আছে। যদি সুদূর দাঁতের গোড়ায় পূঁয হওয়ার ফলে পায়ের হাঁটুতে বাত হয়, তবে ঐ বাতটি "ফোকাল-ইনফেক্‌সন্"-সম্ভূত বলা যায়; অর্থাৎ, দাঁতের গোড়ায় অনবরত পূঁয জমার ও উক্ত দাঁতরূপ কেন্দ্রস্থ বিষ-সঞ্চারের ফলে, ক্রমাগত হাঁটুতে ব্যথা ও প্রদাহ হইতে থাকিলে, ঐ দাঁতের গোড়াকে উক্ত বাত সঞ্চারের ব্যাধির "ফোকাস্" বা উৎপাদন-কেন্দ্র রূপে বর্ণনা করা যায়। এই ভাবে, কোথায় কি ব্যাধি কেন্দ্র-স্বরূপ হইয়া শরীরে অপরাপর ব্যাধির সৃষ্টি করে, তাহা কোষ্টকাকরে নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

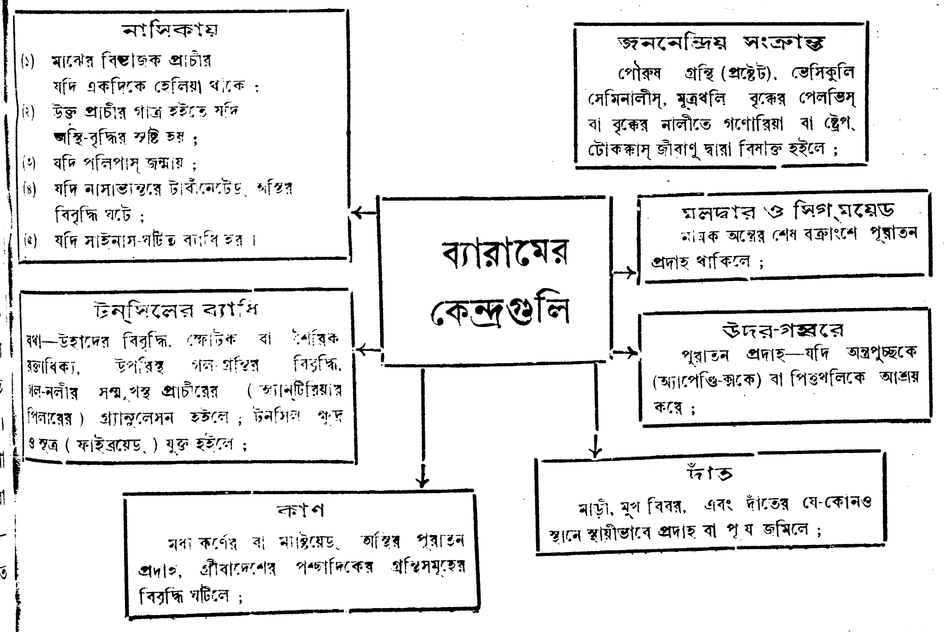

চা ও সিগারেট।

দেশের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র-প্রভাব অনন্য-সাধারণ। সকল প্রকার সৎ ও মানব-হিতকর বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে ছইলে, শরীরকে সুস্থ রাখিতে ও সর্ব্বপ্রকার কদাচার বর্জ্জন করিতে হয়, মহাত্মাজী দেশবাসীকে প্রায়ই এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। কিছু দিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীজী মান্দ্রাজের ছাত্র-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া চা ও সিগারেট বর্জ্জন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমরা মহাত্মাজীর এই উপদেশের পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। ভারতের বার্ষিক বাণিজ্য-বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায়, চা, সিগারেট প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া যাইতেছে। মাদক দ্রব্যের মধ্যে এই দুইটী ছাত্র সমাজের অত্যন্ত প্রিয়। তাহারাই প্রধানতঃ এই দুই বিষ সেবন করিয়া থাকে। ফলে কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিতেছে—তাহাদের তরুণ অপুষ্ট দেহ অকালপক্ক ও ক্ষণভঙ্গুর হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতায় তৈয়ারী "গরম চা"য়ের দোকান দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ছাত্র-সমাজই প্রধানতঃ এই সকল দোকানের পৃষ্ঠ পোষক। তাহারা সকাল সন্ধ্যা এই সকল চায়ের আড্ডায় সমবেত হইয়া গুলজার করিয়া থাকে এবং গল্প গুজবে সময় ক্ষেপণ করে। কেহ কেহ এক একবার একাধিক কাপ চা উদরস্থ করে। একে ত উৎকৃষ্ট খাঁটি চা-ই আমাদের এই গরম দেশের লোকদের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে; তাহার উপর, এই সকল ভুঁইফোঁড় চায়ের দোকানে চা বলিয়া যে জিনিষ বিক্রীত হয়, তাহা চা ত নহেই—তাহা যে বস্তুতঃ কি জিনিস তাহাই বলা কঠিন। আমরা ত উহা সাক্ষাৎ বিষ ছাড়া আর কিছু বলিয়া ভাবিতেই পারি না। সরকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সংযত রাখিবার জন্য আবগারি শুল্ক আদায় করিয়া থাকেন। তাঁহারা চায়ের উপর আবগারি শুল্ক আদায় করেন না কেন? চা মাদক দ্রব্য ছাড়া আর কি? অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবনকারী-দের যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, চা-সেবিদের মধ্যেও তাহাদের অধিকাংশ লক্ষণ মৃদুভাবে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। চায়ের মৌতাতের সময় উপস্থিত হইলে অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবনকারীরা যে রকম কষ্ট অনুভব করে, চা-সেবীরাও ঠিক তাহাই করিয়া থাকে। ঠিক মত্ততা না জন্মিলেও অতিরিক্ত চা-সেবনে অনিদ্রা, বুকজ্বালা, অক্ষুধা, অজীর্ণ ও অন্যান্য শারীরিক গ্লানি প্রকাশ পায়। এই সকল কারণে চা মাদক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে না কেন? গত যুদ্ধের সময় বিলাতী আদালতের বিচারে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, চা মনুষ্যের 'খাদ্য' শ্রেণীভুক্ত নহে। তবে উহা মাদক দ্রব্য ছাড়া আর কি হইতে পারে? আমাদের বিবেচনায় অহিফেন, মদ, গাঁজা, গুলি, চরস প্রভৃতির ন্যায় চায়ের অবাধ বিক্রয় সংযত করিবার জন্য শুল্ক ও লাইসেন্সের ব্যবস্থা হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সিগারেটের কথা বেশী কি বলিব! পথে বাহির হইলেই দুগ্ধ পোষ্য বালক গণের মুখ হইতে সিগারেটের ধুম বাহির হইতে দেখিয়া লজ্জায় আমাদিগকে অধোবদন হইতে হয়। আমরা ছাত্র-সমাজ তথা যুবক সমাজকে চা ও সিগারেট নামক মাদক দ্রব্য দুইটী বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ছাত্র-সমাজ মহাত্মাজীকে ত বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন—তাঁহারা মহাত্মাজীর এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন কি? চা ও সিগারেট সেবন পরিত্যাগ করিবেন কি?

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৬শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সাল | ৮ম সংখ্যা

কলেরার পথ্য ও পানীয়

[ডাঃ শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী]

যত প্রকার পীড়া আছে তন্মধ্যে কলেরা রোগীর পানীয় ও পথ্য-ব্যবস্থাই বিশেষ বিবেচনাধীন। আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, আহার পানীয়ের দোষেই কলেরা আক্রমণ করে। আবার কলেরার আক্রমণ-অবস্থায় বা আরোগ্য-মুখে পানীয় পথ্যের দোষেই অনেক লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। পীড়া হইলেই তাহার একটা পথ্য দেওয়া আবশ্যক, নতুবা সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে—এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে কলেরার রোগীকে যা-তা পথ্য দিয়া রোগীর প্রাণ সঙ্কটা-পন্ন করিয়া ফেলেন। আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাইয়াছি, রোগী বা রোগীর আত্মীয়-স্বজন একটা কিছু পথ্য দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা চিকিৎসকের বিনানুমতিতেই বার্লি, এরারুট, ডাবের জল, মিশ্রির সরবৎ, বেদানা, কমলা লেবু প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিয়া থাকেন। সে সকল রোগী কদাচিৎ আরোগ্য লাভ করে।

প্রায় প্রতি বৎসরই পাবনা জেলা ও তাহার মফস্বলস্থ অনেক স্থানে ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত অত্যন্ত কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-রিপোর্টেও তাহা স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বর্ষার পরবর্ত্তী সময় দূষিত জল পানই তাহার প্রধান কারণ। যাহাদের কলেরা হয় না, তাহাদেরও পেটের পীড়া, অজীর্ণ, পাতলা দাস্ত, বমন, বিশেষতঃ যাহাদের পেটে কৃমি থাকে তাহারা সহজেই এই জাতীয় পীড়ায় এ সময় আক্রান্ত হয়। সাধারণতই বর্ষাকাল অগ্নিমান্দ্যের সময়; সেজন্য ভুক্ত দ্রব্য সহজে হজম হয় না। তাহার উপর গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, দূষিত জলপান প্রভৃতি কারণে কলেরা-বীজ দেহ-মধ্যে বর্দ্ধিত ও পরে তাহা অন্য শরীরে জল

দ্বারা প্রবেশ করিয়া, দেশ-ব্যাপী মহামারী উপস্থিত করে। যাহারা স্বাস্থ্য-রক্ষার বা কলেরা হইতে আত্ম-রক্ষার প্রতিষেধক অবস্থা সম্যক রূপে অবগত নহে, তাহাদের মধ্যেই মৃত্যু-সংখ্যা অধিক ঘটিতে দেখা যায়।

আমরা অনেক স্থানেই দেখিয়াছি, দাস্ত বমন হইতেছে, তদবস্থাতেই তাহাকে শাগু কি বার্লি, দুধসাগু, ডাবের জল প্রভৃতি পথ্য দেওয়া হইতেছে, এবং অনেক সাহসী ডাক্তারবাবুও (হাতুড়ে) সেরূপ পথ্যের অনুমোদন করিয়া থাকেন। এরূপ পথ্য ও পানীয় দিবার সময় যদি তাঁহারা রোগের সমুদায় অবস্থার ও কলেরার "নিদান" উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া পথ্য প্রদান করেন, তবে সেরূপ দুর্দ্দশা হইতে পারে না।

কলেরা রোগাক্রান্ত হইলে জীবনী-শক্তি নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহের অভ্যন্তরস্থ আবরক ঝিল্লির (এপিথিলিয়াম) সমস্ত ক্রিয়া-শক্তিশূন্য হইয়া মলের সহিত খসিয়া পড়িতে থাকে, সুতরাং তাহাদের খাদ্য পরিপাক ও পানীয় শোষণ ও স্রাবণ-ক্রিয়া রহিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় পাকস্থলীতে যাহা পড়ে, তাহা আর সূক্ষ্মতর হইয়া শোষিত হইতে পারে না এবং তাহাতে পাকস্থলীর কষ্ট ও উত্তেজনাই হয়। এইরূপ সময় যে পথ্য দেওয়া হয়, তাহা প্রায় বমন হইয়া যায়, অথবা পাকস্থলীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া পেট ফাঁপিয়া নানাবিধ যন্ত্রণা উৎপাদন করতঃ রোগীর প্রাণসংহার করে। এতাদৃশ রোগের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলে অনেক সময় তাহার পাকস্থলীতে যাহা পৌঁছিয়াছিল, তাহা ঠিক তেমনি অবস্থায় পাওয়া যায়। সেজন্য রোগের পূর্ণ বিকাশ বা হ্রাসের অবস্থায় কোন পথ্যই কখনই দেওয়া উচিত নহে। ঐ সকল অবস্থায় পেটে একপ্রকার ক্ষীণ জ্বালা অনুভূত হইয়া থাকে, সেজন্য রোগী ক্ষুধার কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু তাহা প্রকৃত ক্ষুধা নহে। তাহা "দুষ্ট ক্ষুধা" মনে করিয়া কোন পথ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

আক্রমণাবস্থায় যখন পেট ভার থাকে, দাস্ত ও বমন হইতে আরম্ভ হয়, তখন কোনরূপ পানীয় ও পথ্য দেওয়া উচিত নহে। পূর্ণ বিকাশাবস্থায় তৃষ্ণার যন্ত্রণায় রোগী যখন জল পান করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তৃষ্ণায় রোগী অসহ্য যন্ত্রনা পাইতে থাকে, এমন কি জল না পাইলে উন্মাদের ন্যায় যেখানে জল বা জলপাত্র দেখে সেখানেই ছুটিয়া যাইতে চায়, এরূপ অবস্থায় শীতল জল, অবস্থা বিশেষে দুই এক খণ্ড বরফ বা বরফ-মিশ্রিত জল দেওয়া উচিত। কারণ এই সময় যে ভেদ হয়, তাহাতে জলীয় ভাগই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়। রাসায়নিক পরীক্ষায় এইরূপ জলযুক্ত মলে, সোডা, পটাশ, বিশেষতঃ ক্লোরাইড অব সোডিয়ম (সাধারণ লবণ), অল্প এলবুমেন, ফাইব্রিন, মিউকাস প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শরীরস্থ রক্ত প্রভৃতির জলভাগ কম হওয়ায়, শারীরবিধানে জলের বিশেষ প্রয়োজন হয়; এবং তাহা পিপাসা দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে।

অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক এই সময় যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা জলপান করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। অধিকন্তু এইরূপ জলপানে শরীরস্থ কলেরা-বিষ কতক বমন দ্বারা, ও কতক মলের সহিত বাহির যাইবার সাহায্য করে; এবং কতকটা আশোষণ-ক্রিয়া দ্বারা শরীরস্থ রক্তও অন্যান্য যন্ত্রেও কিয়ৎ পরিমাণে জল যাইয়া উপকার দর্শায়। অধিক পরিমাণে ভেদ-বমন দ্বারা শরীরস্থ লবণের ভাগ বহির্গত হওয়ায়, শরীরে লবণের ভাগ কম হয়; সেজন্য শরীর-মধ্যে লবণ-জল দেওয়া বর্ত্তমান চিকিৎসার বিষয়ীভূত হইয়াছে। এ সময় ঐরূপ শুধু জল ছাড়া, অন্য কোন প্রকার তরল পদার্থ—এমন কি, ডাবের জল, সোডা লেমনেড, বেদানার রস, বার্লি, এরারুটের জল ইত্যাদি কিছুই দেওয়া উচিত নহে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন, এ সময় অধিক পরিমাণে জল পান করিতে দিলে, বমন ও ভেদের আধিক্য হেতু রোগী দুর্ব্বল হওয়ায় তাহার পতনাবস্থা শীঘ্র আনয়ন করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা ঈষদুষ্ণ জল অল্প পরিমাণে বার বার পান করিতে দিয়া উপকার পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করেন। যাহাহউক, এরূপ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে শীতল জল পান করিতে দিয়াই আমরা অধিক উপকার বোধ করিয়াছি।

তাহাতে রোগীও আরাম বোধ করে এবং তদ্বারা পিপাসা-যন্ত্রনা অনেক কম হয়।

আক্রমণ ও বিকাশাবস্থার ন্যায় কলেরা রোগীর পতনাবস্থায়ও কেন পথ্য দেওয়া উচিত নহে। এ অবস্থায় রোগীর অদম্য পিপাসা কম হয়, যে পিপাসা থাকে, তাহা বার বার সামান্য জল পানেই সন্তুষ্ট হয়। এই অবস্থায় স্রাবণ এবং শোষণ উভয় ক্রিয়ারই অভাব অথবা খর্ব্বতা লক্ষিত হয়। জলপান করিবার পরই অথবা ৩।৪ বার জলপানের পরই তাহা বমন হইয়া যায়। কারণ পাকস্থলিস্থ এপিথিলিয়ম খসিয়া পড়ায় তাহার শোষণ ও স্রাবণ ক্রিয়া থাকে না। সুতরাং এ সময় পাকস্থলীতে যাহা পতিত হয়, তাহা তথায় যন্ত্রণা ও জ্বালা উৎপাদন করে; সেজন্য তথা হইতে সে সকলকে দূরীভূত করান জন্য বমন হইয়া যায়। যদি বমন না হয়, তাহা হইলে সেগুলি আর নিম্নগামী বা বৃহদন্ত্র দ্বারা শোষিত হইতে পারে না; সুতরাং প্রস্রাবও বন্ধ হইয়া যায়। এ অবস্থায় কোন পানীয় বা পথ্য দিলে, তাহা সেই অবস্থাতেই পেটে আবদ্ধ থাকে। আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাইয়াছি, এই অবস্থায় শরীরে তাপ ও বল রক্ষার জন্য অনেক ডাক্তার ডাবের জল, বেদানার রস, দুগ্ধ, ব্রাণ্ডি, প্রভৃতি দেওয়ায়, রোগীর পেট ফাঁপিয়া মৃত্যু হইয়াছে। এই অবস্থায় পাকযন্ত্রের শোষণ, স্রাবণ ও নড়ন-চড়ন-শক্তি (peristalsis) কমিয়া যাওয়ায় তাহাতে যাহা পড়ে, তাহা আর কোথাও যাইতে পারে না; সুতরাং সেই অবস্থাতেই তথায় থাকিয়া ক্রমে পেট ফাঁপিয়া উঠে। আমরা জানি, এরূপ পেট ফাঁপায়—পেট গ্যাস জন্মিয়াছে বলিয়া, অনেকে ডাবের জল ও সোডাওয়াটার ব্যবস্থা করিয়া মৃত্যু ডাকিয়া আনেন।

কলেরা রোগীর রোগ-হ্রাসের অবস্থা দূরীভূত হইলে, যখন রোগীর মুখশ্রী ভাল হয়, নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডের গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ধীরভাবাপন্ন, শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক হয়, তৃষ্ণা ও অস্থিরতা দূর হয়, নিঃসারক যন্ত্রাদির ক্ষরণ-ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয়, রোগীর নিদ্রাবেশ হইতে থাকে, বমন নিবারণ হয়, অল্পবিস্তর দাস্ত হইলেও তাহা কাদা-কাদা পিত্ত সংযুক্ত (হরিদ্রাভ) হয়, অন্য কোন মারাত্মক উপসর্গ দেখা যায় না, রোগী আরাম বোধ করে, তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত, কিছু কিছু পানীয় ও পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এসময় বিশুদ্ধ এরারুট জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া, পাতলা করতঃ লবন ও লেবুর রস সহযোগে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। এরারুট সর্ব্বাপেক্ষা লঘুপাক, ধারক ও পোষক। সেজন্য এ সময় এরারুটই উপযোগী পথ্য। এরারুট দুই একদিন সহ্য হইলে পর, ক্রমে বার্লি, সাগু ও পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন, মাগুর মাছের ঝোল, পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই সকল উৎকট রোগে অনেক সময় পথ্য দ্বারা প্রাণ নষ্ট হয়। ৪।৫ দিন কোন পথ্য না দিলে যত অপকার না করে, অবিবেচনার সহিত পথ্য দিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অপকার করিয়া থাকে।

কলেরা রোগীর পানীয়-পথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা অতিশয় কঠিন। ইহা দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা অনুসারে বিশেষ বিবেচনা করিয়া নানাবিধ প্রকারে ব্যবস্থা করা উচিত। কলেরা রোগীকে সাধারণতঃ যে সকল পানীয় ও পথ্য দেওয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে নিম্নে কতকগুলি পথ্যের বিবরণ বর্ণনা করা যাইতেছে।

শীতল জল—কলেরা রোগীর নিদারুণ পিপাসায় জলই একমাত্র পানীয় ও পথ্য। কলেরা রোগীর পিপাসায় কখনই জল দেওয়ার কৃপণতা করা উচিত নহে। "জল পাইবে না" এরূপ কথা কখনই রোগীকে বলা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে রোগীর তৃষ্ণা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। যদি শীতল জল পানে বমন না হয়, তবে যথেষ্ট শীতল জল পান করিতে দেওয়া উচিত। আর যদি জল পান করার পরেই বমন হইয়া যায়, তবে অল্প অল্প করিয়া বারে বারে জল পান করিতে দিবে। অথবা একেবারে অধিক পরিমাণ জল দিয়া কিছুক্ষণ বাদে পুনরায় জল দিবে। এবং জল দিচ্ছি, এই দিলাম··· ইত্যাদি আশ্বাস বাক্যে রোগীকে কিছুক্ষণ জলপানে বিরত রাখিবে। জলপান করিয়া জল সহ্য হইলেই

ভাল, তাহাতে রোগীর রক্তের তারল্য ও সমঘনতা (consistency) রক্ষা হয়। নতুবা বার বার জল বমন হইয়া গেলে, নাড়ী লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বরফ—কোন বাড়ীতে কাহারও কলেরা হইলেই, অমনি বরফের খোঁজ পড়ে, কেহ কেহ বা বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বরফ আনাইয়া থাকেন। তৃষ্ণাতুর কলেরা রোগীর পক্ষেও ইহা উপাদেয় সামগ্রী বটে। কিন্তু বরফের উপকারিতা অপেক্ষা অপকারিতা গুণই অধিক। বহু পরিমাণে বরফ খাইলে, পাকস্থলীর উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়া বমনাদি উপসর্গ অদম্য হইয়া উঠে। হিক্কা ও পেট ফাঁপা জন্মিতে পারে। জলের সঙ্গে বরফ খাইলে, পাকস্থলীতে অতীব ঠাণ্ডা লাগায়, হিক্কা ও পেট বেদনা হয়। অদম্য পিপাসার সময় রোগী বরফ খাইয়াও তৃপ্তি বোধ করে না। সমুদ্রজাত নৈসর্গিক বরফ অপেক্ষা কলে তৈয়ারী কৃত্রিম বরফ বিশুদ্ধ নহে; প্রায়ই এই সকল বরফের জলে অন্যান্য রোগের বীজাণু ধরা পড়ে সুতরাং এই সকল কারণে কলেরা রোগীর ইহা উপযোগী পানীয় নহে। তবে যে সময় রোগীর শরীরের ও পেটের অসহ্য জ্বালা থাকে, সে সময় রোগী বরফ খাইতে ইচ্ছা করিলে, অতি ক্ষুদ্র দুই এক খানা বরফের টুকরা মধ্যে মধ্যে চুষিয়া খাইলে, উপকার হয়। এরূপ প্রকারে খাইলে, উহা মুখের তাপের সমতা প্রাপ্ত হওয়ায়, পাকস্থলীতে কম ঠাণ্ডা লাগে, সুতরাং হিক্কাদি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে না। বরফ অপেক্ষা শীতল জল ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট। হিক্কা, মূত্র, বিকার অপেক্ষা প্রভৃতি উপসর্গে মাথায় ও পেটে বরফ দেওয়া বরং উপকারী।

ডাবের জল—স্থল বিশেষে কলেরা রোগীর ডাবের জলে মহৎ উপকার দর্শিয়া থাকে। বরফ অপেক্ষাও ডাবের জল উৎকৃষ্ট। যে ডাবের ভিতর নেয়াপাতি হয় নাই, এইরূপ ডাবের জলই ব্যবস্থা। ডাব অনেকক্ষণ কাটিয়া রাখিলে এবং তাহাতে বাতাস লাগিলে, সেই জল অম্লগুণ-বিশিষ্ট হয়। সে জল পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। ডাব পাড়িয়া ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিলে, তন্মধ্যস্থ জল বেশ ঠাণ্ডা হয়, তখন ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু অধিকক্ষণ সে জল খোলা হাওয়াতে রাখিয়া পান করা উচিত নহে। অনেকদিন যে ডাব পাড়িয়া রাখা থাকে, তাহা পানে অম্ল জন্মে বলিয়া তাহা পান করা উচিত নহে। কলেরার পূর্ণ বিকাশাবস্থায় ও পতনাবস্থায় যখন পাকস্থলীর কার্য্য প্রায় এক প্রকার রহিত হয় এবং স্রাবণ ও ক্ষরণ অবস্থা থাকে না, তখন ডাবের জলেও কোন উপকার হয় না! তখন তাহাও পেটে জমা হইয়া থাকে। শরীর ও পেটের জ্বালা অধিক, অল্প পিপাসা এবং অল্প জল পানেই রোগী যখন সন্তুষ্ট হয় এবং ক্রমে যখন রোগের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তখন ডাবের জল অমৃতবৎ ফল করে, এবং প্রস্রাব করারও সাহায্য করে।

তাল শাঁসের জল—কচি তালের শাঁসের ভিতর যে জল থাকে, তাহা অতি সুস্নিগ্ধ প্রাণ-তোষক পানীয়। কলেরা রোগের ইহা উৎকৃষ্ট সুপেয় পানীয়। কিন্তু ইহা সকল সময় সকল স্থানে পাওয়া যায় না। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসই তাল শাঁসের সময়। অনেক স্থানে বার মাস তাল শাঁস পাওয়া যায়। ইহা পাকস্থলীর উত্তেজনা, বমন ও হিক্কা নিবারণ করিতে অতি উৎকৃষ্ট পানীয়।

গরম জল—উষ্ণ জলপানে অনেক সময় পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। উষ্ণজল পাকস্থলীর উত্তেজনা নিবারণ করিয়া হিক্কা, পেট বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ নিবারণ করিয়া থাকে। অনেকস্থলে উষ্ণ জলে এরূপ উপকার হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাতে শীঘ্র পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। কিন্তু মৃদু উষ্ণই সমধিক প্রশস্ত।

চিড়ার জল—ইহা ঠাণ্ডা, পোষক ও উত্তেজনা-নিবারক। উৎকৃষ্ট পরিষ্কার পাতলা চিড়া পুনঃ পুনঃ ধৌত করতঃ ভিজাইয়া রাখিলে, যখন চিড়াগুলি ভিজিয়া খুব নরম হয়, তখন তাহার উপরের পাতলা জল কলেরা রোগীকে পান করিতে দেওয়া যায়। ইহা দ্বারা পিপাসা, হিক্কা ও বমনাদি শীঘ্র উপশম হইয়া থাকে। কিন্তু বেশ মনে রাখা উচিত যে, চিড়ার ক্বাথ ইহা অপেক্ষা ভিন্ন

জিনিস। আমরা কোন একটী রোগীকে এইরূপ জল পান করিতে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম; কিন্তু রোগীর আত্মীয়-স্বজন এইরূপ জলের পরিবর্ত্তে ক্বাথরূপে পানীয় দিয়া রোগীর প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন। পরে সেই রোগীকে অন্য একজন ডাক্তার দেখিতে আসিয়া, আমাদের প্রকৃত ব্যবস্থা না জানিয়া বা না শুনিয়া, আমাদের অনেক নিন্দা ও প্রচার করিয়া, আমাদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিলেন।

মুড়ির জল—বিশুদ্ধ, পরিষ্কার ও টাট্‌কা বড় আবারের মুড়ি, বালুশূন্য করিয়া ১৫।২০ মিনিট ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিলে, এক প্রকার লাল্‌চে জল হয়। সেইজল বমনোদ্রেক ও হিক্কা নিবারণ করিতে উৎকৃষ্ট পানীয়।

মসুরির জল—গোটা মসুর উত্তমরূপে ধৌত করতঃ জলে সুসিদ্ধ করিলে, অন্ততঃ ১৫ মিনিট কাল উপরিভাগে যে পরিষ্কার লাল জল থাকে, তাহাই মসুরের জল। মনে রাখা উচিত, সিদ্ধ মসুর চট্‌কাইয়া ইহা ক্বাথ বাহির করা নহে। এইজল ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে, অদম্য হিক্কাও নিবারিত হয়। এবং ইহা অত্যন্ত বল-কারক সুপাচ্য সুপথ্য। মাংসের যুষ অপেক্ষাও ভাল।

দুগ্ধ-জল—এক সের জলে, অর্দ্ধ পোয়া সদ্য দোহিত গাভী-দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেই জল পাঁচ মিনিট কাল ফুটাইয়া মৃদু উষ্ণ অবস্থায় বার বার পান করিতে দিলে, কলেরা রোগীর সহজে প্রস্রাব হয়। ইহা বৃক (কিড্‌নি) নামক মূত্র-সঙ্কর্ষণ যন্ত্রের উপর আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। কলেরা রোগীর মূত্র সহজে না হইলে এই পানীয়ে উৎকৃষ্ট ফল দর্শায়।

এরারুটের জল।—অধিক পরিমাণ জলে, কিঞ্চিৎ এরারুট মিশ্রিত করিয়া পাঁচ মিনিট ফুটাইলে এরারুটের জল প্রস্তুত হয়। ঐ জল সাধারণ চিনির রস অপেক্ষা বরং একটু কম গাঢ় হইবে। ঐ জল কলেরা রোগীর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে দেওয়া উচিত। ইহাতে রোগীর পেট ঠাণ্ডা হয় ও প্রস্রাবের সাহায্য করে; এবং ইহা দ্বারা রোগী শরীরে বল পাইয়া থাকে।

আমাদের দেশে যে সকল এরারুট বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া, বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার মধ্যে নানাপ্রকার ভাজাল মিশ্রিত থাকে। এতদ্ব্যতীত তাহা বেনিয়ার দোকানে খোলা থাকায় তাহার সহিত প্রচুর পরিমাণে ধুলা, বালি মিশ্রিত হয়। বিলাতী এরারুটের কৌটা খুলিয়া বার বার তাহা হইতে লইলেও অনেক সময় অসাবধানতা প্রযুক্ত তাহার সহিত ধুলা ও ময়লা মিশ্রিত হইয়া থাকে। প্রকৃত উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ এরারুট পরিষ্কৃত ও শ্বেতবর্ণ, হাতে রগড়াইলে বেশ মসৃণ বোধ হয়। অনেকদিন খোলা বায়গাতে থাকিলেও বিকৃত হয় না, অল্প জলে গুলিলে আঠার ন্যায় চট্‌চটিয়া হয়, তাহা সহজে হাত হইতে উঠিতে চায় না। সদ্য স্বদেশজাত যে সকল এরারুট এ দেশে পাওয়া যায়, তাহাই সুপথ্য।

সাগুর জল।—সাগু পরিষ্কার জলে ধৌত করতঃ আধ ঘণ্টাকাল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই ভিজান সাগু সুসিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার নেকড়ায় ছাকিয়া লইলে সাগুর জল প্রস্তুত হয়। এরারুটের জলের ন্যায় ইহাও উৎকৃষ্ট বলকারক পানীয়। কিন্তু এরারুট অপেক্ষা গুরুপাক।

সোডা ওয়াটার, লেমনেড।—যখন রোগী পতনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন পাকাশয় ও অন্ত্র প্রভৃতির কার্য্য-রাহিত্য হেতু, পেট ফাঁপিয়া উঠে ও দাস্ত বমন বন্ধ হইয়া যায়, তখন অনেক অজ্ঞ ডাক্তার পেটে গ্যাস হইয়াছে—এই ভুল ধারণায়, সোডা ওয়াটার ও লেমনেড ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কলেরার কোন অবস্থাতেই ঐ সকল পানীয় উপযোগী নহে।

এরারুট-মণ্ড।—এরারুট পরিষ্কৃত জলে রন্ধন করিয়া লইলে, অতি স্বচ্ছ ভাতের ফ্যানের দেখায়। কলেরা রোগীর প্রথম পথ্যের সময় এই পথ্য উৎকৃষ্ট। ইহা বলকারক ধারক ও পোষক। ইহা বার্লি ও সাগু হইতে লঘুপাক।

আজকাল বঙ্গদেশের দুই একটী স্থানে এরারুটের আবাদ হইতেছে, তন্মধ্যে পাবনা জেলার নিমাইপুর

গ্রামে যে এরারুট প্রস্তুত হয়, তাহা অতি উত্তম। বিলাতী এরারুট হইতে কোন অংশে তাহা ন্যূন নহে। বরং ভাল। এই এরারুট কৌটা পূর্ণ হইয়া বাজারে বিক্রীত হয়। ইহা রন্ধন করিলে, পরিষ্কার স্বচ্ছ ভাতের মাড়ের ন্যায় হয়। খাইতেও সুস্বাদু। মূল্যও কম।

বার্লি।—কলেরা রোগীর আরোগ্য-মুখে এরারুট পথ্য সহ্য হইলে, বার্লি পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ বার্লি এরারুট অপেক্ষা ঈষৎ গুরুপাক এবং সারবান। বার্লিচূর্ণ এরারুটের ন্যায় রন্ধন করিতে হয়। চূর্ণ বার্লি অপেক্ষা গোটা বার্লিই উৎকৃষ্ট। বিলাতী বার্লির পরিবর্ত্তে বাছা-বাছা কাঁচা যবের গুঁড়া আরো ভাল। একটু বেশী দাম দিয়া বিলাতী বার্লি খরিদ করা বরং ভাল, তবু দেশী ভ্যাজাল-মিশ্রিত অপরিষ্কৃত বার্লি খরিদ করিয়া, এক রোগ আরোগ্য করিতে যাইয়া অন্য রোগ ডাকিয়া আনা ভাল নহে।

সাগু।—ইহাও সারবান, সহজ-পাচ্য পথ্য। ইহাতে ভেজাল মিশ্রিত করিবার সুবিধা নাই বলিয়া ইহা বিশুদ্ধ অবস্থাতেই বাজারে পাওয়া যায়। বার্লি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ্য। সাগু উত্তমরূপে ধৌত করতঃ এক ঘণ্টা কাল ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত; তৎপরে সুসিদ্ধ করিয়া ঘন আকারে সেবন করিতে দেওয়া যায়। পথ্য সহ্য হইলে, ইহার সহিত দুগ্ধ ও সামান্য মিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়।

মুসুরের ক্বাথ।—সুসিদ্ধ গোটা মুসুর চট্‌কাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাকিয়া লইলে, যে ক্বাথ হয়, তাহা উত্তম বলকারক, মুখরোচক পথ্য। ইহা সুস্বাদু ও বলকারক, লবণ ও লেবুর সহ সেবন করা উচিত। অন্যান্য ডাইলের ন্যায় মসুর ও মুগে পেট ফাঁপে না।

"ঋতে মুদ্গ মুসুরাভ্যাং অন্যেত্বাধ্মানকারকাঃ।"—সুশ্রুত।

গন্ধ ভাদালিয়ার (গাঁদাল) ঝোল।—গন্ধ ভাদালিয়া নামক লতা-বৃক্ষের, ডগা ও পাতা জল দিয়া সিদ্ধ করতঃ তাহার ঝোল, অথবা ডুমুর, বেগুন, থোড় প্রভৃতি তরকারী সহ পাক করিয়া তাহার ঝোল, উত্তম পথ্য। ইহা আগ্নেয় ও পাচক। সাগু, বার্লি, এরারুট প্রভৃতির সহিত ইহার ঝোল উত্তম পথ্য।

মাগুর মাছের ঝোল।—সদ্যধৃত মাগুর মাছের ঝোল অত্যন্ত বলকারক। সাগু, বার্লি, এরারুটের সহিত অল্প অল্প ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

দুগ্ধ।—রোগীর পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হইলে, গো-দুগ্ধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যত দুগ্ধ তত জল সহ সিদ্ধ করিয়া জল মরিয়া গেলে, সেই গরম দুগ্ধ সাগু, বার্লি, এরারুট সহ পথ্য দেওয়া যায়।

মাংসের যুষ।—কলেরা রোগীর পক্ষে এই পথ্য সম্যক উপযোগী নহে। অনেকে চর্ব্বি বা তৈলশূন্য মাংসের যুষ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

লেবুর রস।—কলেরা রোগীর জলাদি ও লবণ অভাবে শরীরস্থ রক্ত গাঢ় ও জমাট-ভাব প্রাপ্ত হয়। লেবুর রসে পটাশ সল্ট আছে, সেজন্য লবণ সহ লেবুর রস সেবন করিলে রক্তের তারল্য অনেক রক্ষা পাইতে পারে। এবং হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমিয়া ক্রিয়াবন্ধ হইয়া যাওয়ার ভয় কম হয়। সেইজন্য লেবুর রস, সাগু, বার্লি, এরারুট, মুসুরের ক্বাথ বা অন্নাদি সহ সেবন করা হিতকর।

খিচুড়ী।—দাইল ও চাউল একত্র পাক করিলে খিচুড়ী হয়। খিচুড়ী অন্ন অপেক্ষাও লঘুপাক। সেজন্য কলেরা রোগীর প্রথম পথ্য মসুরের বা মুগের দাইলের খিচুড়ী পথ্য দিলে সহজে পরিপাক হয়, ও শরীরের বল বিধান করে। কিন্তু ইহাতে কোনোরূপ গরম মশলা, ঘৃত বা ধনিয়া-গোলমরিচ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

অন্ন।—কলেরা রোগীকে প্রথম অন্ন পথ্য দিতে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পুরাতন চাউল এক বা দুই তোলা পরিমাণ লইয়া তাহা একখানি ন্যাকড়ার মধ্যে টিলা করিয়া বাঁধিয়া জলপূর্ণ পাত্রমধ্যে সিদ্ধ করা উচিত। চাউল উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে ন্যাকড়ার পুটলি উঠাইলে, জলগুলি পড়িয়া গিয়া বেশ সাদা

ঝরঝরে ভাত হইবে। ঐ গরম ভাত মাগুর মাছের ঝোল সহ সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

প্রথম প্রথম কয়েক দিন একবেলা অন্ন পথ্য দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাহার পর বেশ ক্ষুধা হইলে সুজি সিদ্ধ করিয়া তদ্বারা প্রস্তুত রুটি ২।১ খান দেওয়া যাইতে পারে।

পুত্রের যৌন প্রশ্নের উত্তর কি?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু]

শিশুদের এই শিক্ষা-কার্য্যে স্কুলসমূহ জননীগণকে বহু পরিমাণে সাহায্য করিতে পারেন। প্রত্যেক স্কুল হইতে বৎসরে একবার বা দুইবার কিছুদিনের জন্য একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে নিযুক্ত করা উচিত—ছাত্রদিগকে জনন-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য। যেমন শরীর সংস্থান-বিদ্যা (anatomy) শিক্ষা দিতে মডেল্ প্রভৃতির দরকার হয়, সেইরূপভাবে মডেল ও চিত্রাদির সাহায্যে এই সকল ব্যাপার জলের মত সরল করিয়া ছেলেদের বুঝাইয়া দিতে হইবে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব যেমন ভাবে শিখানো হয়, সেইরূপ ভাবে এই প্রজনন-ব্যাপারটিও শিখানো হইবে। তাহাহইলে আর ইহার উল্লেখ বা আলোচনা শুনিয়া দুষ্টু ছেলেদের মধ্যে চাপা হাসির লহর উঠিবে না।

"চিকিৎসক-শিক্ষক ছেলেদের বেশ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে, তাহাদিগের জনন-যন্ত্রগুলির যত্ন লইতে হইবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা আরও বেশী করিয়া; আরও বুঝাইতে হইবে—ভবিষ্যতে তাহাদের কার্য্যকারিতার মূল্য কতখানি। 'এটা কোরো না, ওটা কোরো না'—নেতি ও নিষেধের গণ্ডী শিশু-মনের সম্মুখে টানিবার প্রয়োজন নাই। ছেলেদের বলিতে হইবে যে, গনোরিয়া, সিফিলিশ প্রভৃতি জীবনী-শক্তি-হর ব্যাধিগুলি দেহ-মন্দিরের অপবিত্রতা ও জনন-যন্ত্রের অযথা অপব্যবহারের ফলে উৎপন্ন হয়। [এই সঙ্গে কয়েকখানি গনোরিয়া বা সিফিলিশ ক্লিষ্ট রোগীর চেহারা ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে ছেলেদের দেখানো যাইতে পারে।] যৌন পীড়াসমূহ মানব-সভ্যতার বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ। বালকদিগকে যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার ভিতরে ডুবাইয়া রাখার এই পরিণাম। এই অজ্ঞানতার কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। এই রোগগুলিকে কোনক্রমেই অনিবার্য্য পাপাচার বলা যায় না।

"প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন একজন করিয়া চিকিৎসক পাওয়া যাইবে—যিনি (সামান্য পারিশ্রমিকে বা কোনো পারিশ্রমিক না লইয়াই) এই শিক্ষাদান-ব্রত পালন করিতে অগ্রসর হইবেন। ছেলেদের অসুখের সময়ে ডাক্তারদের ডাকা হয়; কিন্তু 'সুখের' সময়েও ডাক্তারদের ফি দিয়া মাঝে মাঝে বাড়ীতে আনাইয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে বালকদিগকে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যেখানে মাতা ভাবাবেগ সম্বরণ করিতে অপারগ, সেখানে ডাক্তার অবিচলিত-হৃদয় হইতে পারেন, রক্ত-সঞ্চালন বা শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া সম্বন্ধে ডাক্তার যেমন অকপটে ঠাকুরমার নিপুনতায় গল্প বলিতে পারেন। যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি সেইরূপ নিসঙ্কোচ কৌশলের সহিত শিক্ষা দিতে সক্ষম।

শিশুকে ঐ বিষয়ক যত ইচ্ছা প্রশ্ন করিতে আমন্ত্রন করিবেন এবং ঐ সকল প্রশ্নের একে একে সরল, সঠিক ও চট্‌পট উত্তর দেওয়া চাই। এই সকল বিষয়ের

যথাযোগ্য জবাব মনের মধ্যে তৈয়ারী করিয়া লইতে দীর্ঘসূত্রতা করিলে চলিবে না। জননী একবার কি দুইবার এই বিষয়ের ঔৎসুক্যকে ভুলাইয়া অন্যদিকে লইতে পারেন, কিন্তু শিশুর অন্তঃপ্রকৃতি—সে ভুলিবার পাত্র নহে, আগ্রহ তাহার মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে।

আবার যে শিশুর মনে এই প্রশ্ন জাগে নাই, তাহাকে এই সকল বিষয় বলিতে যাওয়া একটু বাড়াবাড়ি করা ছাড়া আর কিছুই নহে। ছয় মাসের শিশুকে জোর করিয়া কফির্ ডাল্না খাওয়াইতে যাওয়ার মত ইহা একটা অর্বাচীনতা। কতকগুলি ছেলে একটু অল্প বয়সে, আবার কতকগুলি একটু বেশী বয়সে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে; অন্যান্য ছেলেদের সহিত সংসর্গ, বহির্জগতের প্রভাব; সামাজিক পরিস্থিতি, পারিবারিক আবেষ্টনী, প্রভৃতির উপর আবার এই প্রশ্নের শীঘ্র বা দেরীতে উদয় হওয়া নির্ভর করে। যে সকল বালক শীঘ্র বাহিরের প্রভাব পায়, অল্প বয়স হইতে স্কুলে যায় এবং নানা জাতীয় শিশুদের সহিত পথে-ঘাটে খেলা-ধুলা করে, তাহারা জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃততর জ্ঞান-লাভের জন্য অপেক্ষাকৃত শীঘ্র উৎসুক হয়। তাহার আগ্রহ বুঝিয়া তাহাকে সকল বিষয়ে জ্ঞান-দান করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন জাতীয় জ্ঞানকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য শিশুর মানসক্ষেত্রে বড় বেশী সংখ্যক 'খুঁটা' নাই। তাহার পূর্ব-অভিজ্ঞতা নাই, তুলনা বা মীমাংসার জন্য তাহার কোনো পশ্চাদ্ভূমি তৈয়ারী নাই। আপনি যদি একটা তিন বৎসরের শিশুকে স্ত্রী-পুরুষের সংমিলন সম্বন্ধে কিছু বলিতে যান্, তাহা শিশুর মোটেই ভালো লাগিবে না।

"পাঁচ বৎসর বয়সের পর হইতে দুনিয়ার যত কিছু সামগ্রীর বিষয়ে শিশু নানারূপ প্রশ্ন করে। তাহার কাযই হইল ক্রমান্বয়ে মানসে উদিত প্রশ্নসমূহের উত্তরের সন্ধান করা। তাহার জ্ঞানাকাঙ্খা এত বেশী কিছুতে উদ্দীপ্ত হয় না, যত বেশী হয়—কোন নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি। 'ভগবান্ কে,—কোথায় থাকেন?' রেলের ইঞ্জিন্ বা চাঁদ সম্বন্ধে কৌতূহলের মত যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে কৌতূহলও তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

পূর্বেও বলিয়াছি—এখনও বলিতেছি, যৌনাসক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার মতই অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। খাদ্য-সংগ্রহের জন্য প্রাণী বিশেষ কতখানি বিপদকে বরণ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সাধারণ পরীক্ষাটি এইরূপ—একটা বড় প্লেটের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সংপূরণ করিয়া, তাহার এক পাশে খাদ্য রাখা হয় ও বিপরীত দিকে একটা ইন্দুরকে এমনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়—যাহাতে ঐ খাদ্যলাভ করিতে তাহার প্লেটখানি আড়াআড়ি পার হওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। প্লেটে পদার্পণ করিবামাত্র অভিঘাত (shock) খাইয়া ইন্দুর প্রথমটা একটু পিছাইয়া আসে বটে, কিন্তু আবার নবোদ্যমে প্লেটের উপর উঠে এবং অভিঘাত সহ্য করিয়াও খাদ্যের নিকট পঁহুছে। কোনো বৈদ্যুতিক অভিঘাত বা অন্য কোনো বেদনাদায়ক বাধা—ক্ষুধাতুর ইন্দুরের ভক্ষ্য-আহরণ রোধ করিতে পারে না। আবার ঠিক এইরূপ বাধা সে অতিক্রম করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে—যখন তাহার যৌনক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠে।

"আমি পুনরায় বলিতে চাই, যৌন ক্রিয়া ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যক্তিত্বশূন্যভাবে দেখিতে শিখুন্—ঠিক যেমন ভাবে আপনারা জিহ্বা ও বাক্-শক্তি, কর্ণ ও শ্রুতি-শক্তি, পদদ্বয় ও চলচ্ছক্তি, চক্ষু ও দর্শন-শক্তিকে দেখেন। যদি পরিবারের সকলে শিশুর সম্মুখে নগ্ন অবস্থায় স্নান করেন, তাহা হইলেও শিশুর তাহাতে কোনো ক্ষতিসাধন করিবে না। দেহাবয়বের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তাহার নিকট কিছুই ঢাকা থাকিবে না। যদি কোনো বালক তাহার মাতার সর্ব শরীর দেখিতে পায় (এমন কি, যে অংশ হইতে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই স্থানটি পর্য্যন্ত), তাহা হইলে সে জানিতে পারে—তাহার মাতা পরিপূর্ণভাবে দেখিতে কিরূপ ও কিরূপভাবে তিনি গঠিত। এইরূপ মাতার সর্বাঙ্গ দেখার অবসর পাইলে, সে পরে আর চাপা ঔৎসুক্যের

সহিত তাহার ভগ্নীর, মাসী বা জ্যেঠীর অথবা পাড়ার কোনো স্ত্রীলোকের বস্ত্র-পরিবর্ত্তন ব্যাপারটি লক্ষ্য করিবে না। তারপর যুবা-বয়সে যদি কখনও থিয়েটারে, বায়োস্কোপে বা কোনো বন্ধুর গৃহে সংগোপনে তাহার চক্ষের সামনে কোনো নগ্ন রমণীমূর্ত্তি প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে সে বিস্মিত আগ্রহে চঞ্চল হইয়া উঠিবে না। ইহাতে সত্যই তাহার কোনো যৌন-লিপ্সা জাগ্রত হইয়া উঠিবে না; তখন তাহার বারবনিতার সন্ধানে গুপ্ত অভিসার কিংবা অভাবপক্ষে নিজের যৌন বৃত্তিকে অন্য বিকৃত উপায়ে চরিতার্থ করিবার সম্ভাবনা একেবারে কমিয়া যাইবে।

"কোনো কোনো বালকের স্বভাবতঃ একটু বেশী রকমের, কাহারো কাহারো বা একটু কম রকমের, যৌন-সংস্কার পরিস্ফুট হয়; তাহাদের ক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষার একটু ইতর-বিশেষ করিতে হয়। কিন্তু আমি রাম-শ্যাম-যদুর কথাই বলিয়া যাইতেছি।

"বালক যখনই বাটীর কাহাকেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে যে, 'আমরা কেমন করে' জগতে এলাম্?', তখনই বুঝিতে হইবে যে, প্রাথমিক যৌনতত্ত্ব শিখাইবার যুক্তিসঙ্গত সময় আসিয়াছে, তাহার মস্তিষ্ক এ প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর ধরিয়া রাখিবার মত অনেকটা ক্ষমতা-পন্ন হইয়াছে। এ সময় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া ভুলাইলে চলিবে না। যদি ইহার সদুত্তর তখনই টাট্‌কা-টাট্‌কা না দিয়া চাপিয়া রাখেন, তাহা হইলে পরে পস্তাইতে হইবে। কারণ অচিরে সে তাহার জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার অনভিপ্রেত উপায় খুঁজিবেই।

"তারপর আর একটা কথা। পিতা-মাতা যে দুনিয়ার সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার—এ বিশ্বাস শিশুর মনে বদ্ধমূল হইতে দেওয়া আমার ভালো বলিয়া বোধ হয় না। যদুর মা উত্তর দিতে পারেন, 'বাছা, আমি যতটুকু জানি, ততটুকু তোমায় বল্‌ছি। কিন্তু বাপধন, এর চেয়ে অনেক বেশী জান্‌বার বিষয় আছে, অথচ আমি তা জানি না। জানেন—বড় বড় পণ্ডিতরা আর বড় বড় ডাক্তাররা। একটু বড় হয়ে' তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা কর্লে অনেক নূতন কথা শিখ্‌তে পার্‌বে। যখন ভালো করে' লেখা-পড়া শিখ্‌বে, তখন বিশেষ বিশেষ বই পড়েও এ সম্বন্ধে আর ভালো করে' জ্ঞানলাভ কর্‌বে। আমরা বেশ করে' গুছিয়ে বল্‌তে পারি না—কেমন করে' বা কি জন্য তোমরা এ জগতে আস; কিন্তু তোমরা যে (দশ মাস কাল এই পেটে থেকে, তারপর এই স্থান দিয়ে বের হয়ে') আস, সেটুকু আমরা জানি, তা তুমিও জেনে রাখ। আজ তুমি এ বিষয়ে যতটুকু জান্‌লে, আমরা ছেলেবেলায় ততটুকুও জান্‌তুম্ না, আমাদের মা আমাদের শেখান্ নি। সেইজন্যে আমরা এ বিষয়ে এত অল্প জানি। তুমি বড় হয়ে' এ সম্বন্ধে ভালো করে' অনুসন্ধান করে', ভালো ভালো বই পড়ে,' বেশ পণ্ডিত হয়ে', আমাদের বল্‌বে—কেন ও কি ভাবে তোমরা দুনিয়ায় এস।'

"এরূপ ভাবে উত্তর দিলে, শিশু তাহার প্রশ্ন-বিষয়েও কতকটা সন্তুষ্ট হইবে এবং বর্দ্ধিত বয়সে পণ্ডিত ও পুস্তকের সহায়তায় এ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য তাহার মনের মধ্যে একটা উৎসাহ চিরজাগ্রত থাকিবে। [ইহার ফলে সে স্কুলের দুষ্ট সঙ্গী বা ঝি-চাকরের নিকট মন্দ শিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইবে না; তাহাদের তরফ হইতে এরূপ কোনো শিক্ষাদানের চেষ্টাও সে অকপটে মায়ের নিকট আসিয়া বলিয়া দিবে।] শিশুর মানস-পটে এই ধারণাটি অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে যে, জগতে অনেক জ্ঞানের ক্ষেত্র অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, অনেক সমস্যা সমাধানশূন্য পড়িয়া আছে; শিশুকে মানুষ হইয়া, চিন্তা, পরীক্ষা, অনুসন্ধান প্রভৃতির দ্বারা সেই সকল জিনিসের মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে।... আমি স্কুলে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমাদের প্রাণ যে সকল বিষয় জানিতে চাহে, তাহার সকল গুলির সদুত্তর পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই পাওয়া যায় না; আমরা যাহা জানিতে চাহি নাই, সেই সকল বিষয়ই পাঠ্য পুস্তক আমাদিগকে শিখাইয়াছে ও শুনাইয়াছে।

একটি ছয় বৎসর বয়স্ক শিশুর ওই প্রশ্নের উত্তর

DOUBLE COLOUR PAGE

যথাযোগ্য জবাব মনের মধ্যে তৈয়ারী করিয়া লইতে দীর্ঘসূত্রতা করিলে চলিবে না। জননী একবার কি দুইবার এই বিষয়ের ঔৎসুক্যকে ভুলাইয়া অন্যদিকে লইতে পারেন, কিন্তু শিশুর অন্তঃপ্রকৃতি—সে ভুলিবার পাত্র নহে, আগ্রহ তাহার মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে।

আবার যে শিশুর মনে এই প্রশ্ন জাগে নাই, তাহাকে এই সকল বিষয় বলিতে যাওয়া একটু বাড়াবাড়ি করা ছাড়া আর কিছুই নহে। ছয় মাসের শিশুকে জোর করিয়া কফির্ ডাল্না খাওয়াইতে যাওয়ার মত ইহা একটা অর্বাচীনতা। কতকগুলি ছেলে একটু অল্প বয়সে, আবার কতকগুলি একটু বেশী বয়সে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে; অন্যান্য ছেলেদের সহিত সংসর্গ, বহির্জগতের প্রভাব; সামাজিক পরিস্থিতি, পারিবারিক আবেষ্টনী, প্রভৃতির উপর আবার এই প্রশ্নের শীঘ্র বা দেরীতে উদয় হওয়া নির্ভর করে। যে সকল বালক শীঘ্র বাহিরের প্রভাব পায়, অল্প বয়স হইতে স্কুলে যায় এবং নানা জাতীয় শিশুদের সহিত পথে-ঘাটে খেলা-ধুলা করে, তাহারা জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃততর জ্ঞান-লাভের জন্য অপেক্ষাকৃত শীঘ্র উৎসুক হয়। তাহার আগ্রহ বুঝিয়া তাহাকে সকল বিষয়ে জ্ঞান-দান করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন জাতীয় জ্ঞানকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য শিশুর মানসক্ষেত্রে বড় বেশী সংখ্যক 'খুঁটা' নাই। তাহার পূর্ব-অভিজ্ঞতা নাই, তুলনা বা মীমাংসার জন্য তাহার কোনো পশ্চাদ্ভূমি তৈয়ারী নাই। আপনি যদি একটা তিন বৎসরের শিশুকে স্ত্রী-পুরুষের সংমিলন সম্বন্ধে কিছু বলিতে যান্, তাহা শিশুর মোটেই ভালো লাগিবে না।

"পাঁচ বৎসর বয়সের পর হইতে দুনিয়ার যত কিছু সামগ্রীর বিষয়ে শিশু নানারূপ প্রশ্ন করে। তাহার কাযই হইল ক্রমান্বয়ে মানসে উদিত প্রশ্নসমূহের উত্তরের সন্ধান করা। তাহার জ্ঞানাকাঙ্খা এত বেশী কিছুতে উদ্দীপ্ত হয় না, যত বেশী হয়—কোন নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি। 'ভগবান্ কে,—কোথায় থাকেন?' রেলের ইঞ্জিন্ বা চাঁদ সম্বন্ধে কৌতূহলের মত যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে কৌতূহলও তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

পূর্বেও বলিয়াছি—এখনও বলিতেছি, যৌনাসক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার মতই অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। খাদ্য-সংগ্রহের জন্য প্রাণী বিশেষ কতখানি বিপদকে বরণ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সাধারণ পরীক্ষাটি এইরূপ—একটা বড় প্লেটের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সংপূরণ করিয়া, তাহার এক পাশে খাদ্য রাখা হয় ও বিপরীত দিকে একটা ইন্দুরকে এমনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়—যাহাতে ঐ খাদ্যলাভ করিতে তাহার প্লেটখানি আড়াআড়ি পার হওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। প্লেটে পদার্পণ করিবামাত্র অভিঘাত (shock) খাইয়া ইন্দুর প্রথমটা একটু পিছাইয়া আসে বটে, কিন্তু আবার নবোদ্যমে প্লেটের উপর উঠে এবং অভিঘাত সহ্য করিয়াও খাদ্যের নিকট পঁহুছে। কোনো বৈদ্যুতিক অভিঘাত বা অন্য কোনো বেদনাদায়ক বাধা—ক্ষুধাতুর ইন্দুরের ভক্ষ্য-আহরণ রোধ করিতে পারে না। আবার ঠিক এইরূপ বাধা সে অতিক্রম করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে—যখন তাহার যৌনক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠে।

"আমি পুনরায় বলিতে চাই, যৌন ক্রিয়া ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যক্তিত্বশূন্যভাবে দেখিতে শিখুন্—ঠিক যেমন ভাবে আপনারা জিহ্বা ও বাক্-শক্তি, কর্ণ ও শ্রুতি-শক্তি, পদদ্বয় ও চলচ্ছক্তি, চক্ষু ও দর্শন-শক্তিকে দেখেন। যদি পরিবারের সকলে শিশুর সম্মুখে নগ্ন অবস্থায় স্নান করেন, তাহা হইলেও শিশুর তাহাতে কোনো ক্ষতিসাধন করিবে না। দেহাবয়বের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তাহার নিকট কিছুই ঢাকা থাকিবে না। যদি কোনো বালক তাহার মাতার সর্ব শরীর দেখিতে পায় (এমন কি, যে অংশ হইতে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই স্থানটি পর্য্যন্ত), তাহা হইলে সে জানিতে পারে—তাহার মাতা পরিপূর্ণভাবে দেখিতে কিরূপ ও কিরূপভাবে তিনি গঠিত। এইরূপ মাতার সর্বাঙ্গ দেখার অবসর পাইলে, সে পরে আর চাপা ঔৎসুক্যের

সহিত তাহার ভগ্নীর, মাসী বা জ্যেঠীর অথবা পাড়ার কোনো স্ত্রীলোকের বস্ত্র-পরিবর্ত্তন ব্যাপারটি লক্ষ্য করিবে না। তারপর যুবা-বয়সে যদি কখনও থিয়েটারে, বায়োস্কোপে বা কোনো বন্ধুর গৃহে সংগোপনে তাহার চক্ষের সাম্নে কোনো নগ্ন রমণীমূর্ত্তি প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে সে বিস্মিত আগ্রহে চঞ্চল হইয়া উঠিবে না। ইহাতে সত্যই তাহার কোনো যৌন-লিপ্সা জাগ্রত হইয়া উঠিবে না; তখন তাহার বারবনিতার সন্ধানে গুপ্ত অভিসার কিংবা অভাবপক্ষে নিজের যৌন বৃত্তিকে অন্য বিকৃত উপায়ে চরিতার্থ করিবার সম্ভাবনা একেবারে কমিয়া যাইবে।

"কোনো কোনো বালকের স্বভাবতঃ একটু বেশী রকমের, কাহারো কাহারো বা একটু কম রকমের, যৌন-সংস্কার পরিস্ফুট হয়; তাহাদের ক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষার একটু ইতর-বিশেষ করিতে হয়। কিন্তু আমি রাম-শ্যাম-যদুর কথাই বলিয়া যাইতেছি।

"বালক যখনই বাটীর কাহাকেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে যে, 'আমরা কেমন করে' জগতে এলাম্?', তখনই বুঝিতে হইবে যে, প্রাথমিক যৌনতত্ত্ব শিখাইবার যুক্তিসঙ্গত সময় আসিয়াছে, তাহার মস্তিষ্ক এ প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর ধরিয়া রাখিবার মত অনেকটা ক্ষমতা-পন্ন হইয়াছে। এ সময় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া ভুলাইলে চলিবে না। যদি ইহার সদুত্তর তখনই টাট্‌কা-টাট্‌কা না দিয়া চাপিয়া রাখেন, তাহা হইলে পরে পস্তাইতে হইবে। কারণ অচিরে সে তাহার জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার অনভিপ্রেত উপায় খুঁজিবেই।

"তারপর আর একটা কথা। পিতা-মাতা যে দুনিয়ার সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার—এ বিশ্বাস শিশুর মনে বদ্ধমূল হইতে দেওয়া আমার ভালো বলিয়া বোধ হয় না। যদুর মা উত্তর দিতে পারেন, 'বাছা, আমি যতটুকু জানি, ততটুকু তোমায় বল্‌ছি। কিন্তু বাপধন, এর চেয়ে অনেক বেশী জান্‌বার বিষয় আছে, অথচ আমি তা জানি না। জানেন—বড় বড় পণ্ডিতরা আর বড় বড় ডাক্তাররা। একটু বড় হয়ে' তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা কর্লে অনেক নূতন কথা শিখ্‌তে পার্‌বে। যখন ভালো করে' লেখা-পড়া শিখ্‌বে, তখন বিশেষ বিশেষ বই পড়েও এ সম্বন্ধে আর ভালো করে' জ্ঞানলাভ কর্‌বে। আমরা বেশ করে' গুছিয়ে বল্‌তে পারি না—কেমন করে' বা কি জন্য তোমরা এ জগতে আস; কিন্তু তোমরা যে (দশ মাস কাল এই পেটে থেকে, তারপর এই স্থান দিয়ে বের হয়ে') আস, সেটুকু আমরা জানি, তা তুমিও জেনে রাখ। আজ তুমি এ বিষয়ে যতটুকু জান্‌লে, আমরা ছেলেবেলায় ততটুকুও জান্‌তুম্ না, আমাদের মা আমাদের শেখান্ নি। সেইজন্যে আমরা এ বিষয়ে এত অল্প জানি। তুমি বড় হয়ে' এ সম্বন্ধে ভালো করে' অনুসন্ধান করে', ভালো ভালো বই পড়ে,' বেশ পণ্ডিত হয়ে', আমাদের বল্‌বে—কেন ও কি ভাবে তোমরা দুনিয়ায় এস।'

"এরূপ ভাবে উত্তর দিলে, শিশু তাহার প্রশ্ন-বিষয়েও কতকটা সন্তুষ্ট হইবে এবং বর্দ্ধিত বয়সে পণ্ডিত ও পুস্তকের সহায়তায় এ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য তাহার মনের মধ্যে একটা উৎসাহ চিরজাগ্রত থাকিবে। [ইহার ফলে সে স্কুলের দুষ্ট সঙ্গী বা ঝি-চাকরের নিকট মন্দ শিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইবে না; তাহাদের তরফ হইতে এরূপ কোনো শিক্ষাদানের চেষ্টাও সে অকপটে মায়ের নিকট আসিয়া বলিয়া দিবে।] শিশুর মানস-পটে এই ধারণাটি অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে যে, জগতে অনেক জ্ঞানের ক্ষেত্র অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, অনেক সমস্যা সমাধানশূন্য পড়িয়া আছে; শিশুকে মানুষ হইয়া, চিন্তা, পরীক্ষা, অনুসন্ধান প্রভৃতির দ্বারা সেই সকল জিনিসের মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে।... আমি স্কুলে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমাদের প্রাণ যে সকল বিষয় জানিতে চাহে, তাহার সকল গুলির সদুত্তর পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই পাওয়া যায় না; আমরা যাহা জানিতে চাহি নাই, সেই সকল বিষয়ই পাঠ্য পুস্তক আমাদিগকে শিখাইয়াছে ও শুনাইয়াছে।

একটি ছয় বৎসর বয়স্ক শিশুর ওই প্রশ্নের উত্তর

DOUBLE COLOUR PAGE

দিতে আমাকেও এক সময় বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করাইবার কতকগুলি সুন্দর সহজসাধ্য উপায় আছে; জগতে আসিয়া শিশুর যে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, অর্থাৎ যে জিনিষ বা ব্যাপারগুলি সে ভালো করিয়া চিনিয়াছে, সেই গুলির সহিত তুলনা দিলে, সে উত্তরগুলিকে নিজের ভাবে আপন চিত্তে গঠিত করিয়া লইতে পারে।

"যেমন ধরুন—আগুন। এ জিনিসটি বয়স্ক অপেক্ষা শিশুদের নিকট বেশী চিত্তাকর্ষক। আমরা সাধারণ-জ্ঞান-সম্পন্ন লোক আগুন সম্বন্ধে—বেশী নহে—এই টুকু মাত্র জানি যে, কাঠ বা কয়লার মধ্যগত কার্বনের সহিত বাতাসের অক্সিজেন্ নামক উপাদান মিশ্রিত (oxidised) হয় বলিয়া আগুন জ্বলে ও তাপ বিকীরণ হয়। এই উত্তাপ আমরা কত কাযে লাগাইতে পারি। শীতকালে এই আগুন আমাদের ঘর গরম রাখে; ইহাতে আমাদের খাদ্য দ্রব্যাদি সিদ্ধ হয়। এক কেৎলী জল আগুনে চড়াইয়া দিন। জল যখন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকিল, তখন কেৎলীর চোঙ্গ দিয়া গরম বাষ্প সশব্দে বাহির হইয়া আসিতে থাকে, কেৎলীর ডালাটিও বেশ তালে তালে নাচিতে থাকে। এই উদ্গীরিত বাষ্পের মুখে একটা ছুঁচ বা খড়িকা-কাঠি অক্ষদণ্ড করিয়া কোনো ঘড়ীর চাকা যদি ধরা যায়, তাহা হইলে চাকাটি বেশ ফর্‌ফর্ করিয়া ঘুরিতে থাকে। এক্ষণে শিশুকে বুঝাইয়া দিন, রেলের বড় বড় ইঞ্জিনের চাকা কেমন করিয়া আপনা-আপনি ঘুরে ও লাইনের উপর দিয়া রেলগাড়ী বেগে গড়াইয়া চলে। তারপর তাহাকে বুঝান্, এই যে বাষ্প উড়িয়া যাইতেছে, ইহাকে আমরা নিজেদের তাঁবে আনিয়া ইচ্ছামত ইহার দ্বারা কায করাইয়া লইতে পারি।

"তারপর, এখন একটি হাঁসের ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলুন্। যদি কোনো ডিমে দুই চারিদিন তা' দেওয়া হইয়া থাকে ত, তাহাই ভাঙিতে পারিলে ভালো হয়। ঐ ডিম ভাঙ্গিয়া, কুসুমের গাত্র-লগ্ন একটি ক্ষুদ্র অস্বচ্ছ শ্বেতাভ বিন্দু দেখিতে পাইবেন। এই বিন্দুটিই জীবনের প্রথম সূত্রপাত ও রহস্য। ঐ বিন্দুটি অর্দ্ধেক পুরুষ-হাঁসের ও অর্দ্ধেক স্ত্রী-হাঁসের শোণিত (শুক্রকীট ও অণ্ডাণু) দ্বারা গঠিত। উভয় জাতির শুক্রকীট ও অণ্ডাণু আমাদের চর্মচক্ষুতে দেখিবার উপায় নাই—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ ঘটিয়া এই দুইটি জিনিস্ একত্র হইলে ভ্রূণ-দেহের সূত্রপাত হয়।

"কয়লা ও আগুণ একত্র হইলে যেরূপ তাপের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই শুক্রকীট ও অণ্ডাণু একীভূত হইয়া মায়ের দেহের মিষ্ট জিনিসকে পুড়াইয়া তাপ উৎপাদন করে। এই তাপই আমাদের কর্ম-শক্তি—আমাদের তেজ—আমাদের উৎসাহ। রেলের ইঞ্জিন যেমন আগুনের তাপ পাইয়া লাইনের উপর দিয়া দৌড়ায়, সেইরূপ হাঁসের ঐ ভ্রূণ-দেহ ঈশ্বরের মহীমায় মায়ের দেহের চুণ জাতীয় পদার্থ-সহায়ে প্রথমতঃ নিজের সুকোমল দেহের চারিপাশে একটী শক্ত পাঁচীল (ডিমের খোলা) তৈয়ারী করে—ঐ খোলার মধ্যে তাহার বাড়িবার মত উপযুক্ত উপাদান ও বাঁচিবার মত উপযুক্ত খাদ্য সঞ্চিত থাকিয়া যায়, সেইটুকু হইতেছে ঐ হলদে জিনিসটি—যাহাকে আমরা কুসুম বলি। তারপর ঐ ডিম মায়ের পেটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসে, এবং আপনার অন্তর্নিহিত তেজোবলে এই খাদ্যরাশি পরিপাক করিতে করিতে ভ্রূণ আপনি অতি ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে; শেষে অস্পষ্ট রূপে তাহার ডানা, তাহার রক্ত, তাহার অস্থি, তাহার মাংস, তাহার চর্ম, তাহার মস্তিষ্ক বিকশিত হইয়া উঠে। ভ্রূণের নিজের তাপ পাছে যথেষ্ট না হয় বলিয়া, পক্ষী-মাতা ডিমের খোলার উপর বসিয়া তা' দেয় অর্থাৎ আপনার শরীরের উত্তাপ ইহার মধ্যে সঞ্চালিত করে। এইরূপ ভাবে প্রায় একুশদিনের মধ্যে একটি ছোট হাঁস বা মুরগীর বাচ্চার গঠন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; তখন সে সময় বুঝিয়া ভগবানের দয়ায় প্রাণ পায়, অর্থাৎ আপনি তাহার রক্ত চলাচল করিতে আরম্ভ করে, হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করিতে সুরু করে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকে। কাযেই তখন তাহার

মুক্ত বাতাসের দরকার হয়—ডিমের খোলার অন্ধকার ঘরে আর সে বন্ধ থাকিতে চাহে না, তখন তাহার 'জাগিয়াছে সাধ পরাণের মাঝে—জগত দেখিতে চাই।' সে তাহার নূতন তৈয়ারী ঠোঁট দিয়া ডিমের খোলা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসে, মানব-শিশুর মত চিঁ চিঁ করিয়া কাঁদিতে থাকে, আবার মায়ের আদরে হাসিতে থাকে, মানব-শিশুর মতই নাচিয়া খেলিয়া বেড়ায়। পক্ষী-শিশুর প্রাথমিক দেহ যেমন ডিমের ভিতর তৈয়ারী হয়, তেমনি মানুষ-শিশুর প্রথম দেহ মায়ের তলপেটের ভিতর 'জরায়ু' নামক একটা ছোট মাংসের থলির ভিতর গঠিত হয়; উহার ভিতর সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া নয় মাস পরে বাহির হইয়া আসে। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-মানুষ সকলের ক্ষেত্রেই তাহাদের শিশু, হয় ডিমের মধ্যে নহেতো ওই জরায়ু নামক থলির মধ্যে তৈয়ারী হয়। গাছের যেমন বীজ, তেমনি মায়ের দেহের একটি সূক্ষ্মতম বিন্দু ও পিতার দেহের একটী সূক্ষ্মতম বিন্দু একত্রিত হইয়া খোকার দেহটিকে আস্তে আস্তে গঠন করিয়া তুলে।

"হাঁসের ছানার জন্ম-রহস্য শিশুর কাছে এইরূপভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া তারপর তাহার নিজের জন্মের কথা বলিতে হয়। এই ব্যাপারটিকে শিশুর বুঝিবার মত ভাষায় সহজ সরল করিয়া মাতা কি ভাবে বলিতে পারেন, নিম্নে তাহার একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

"তোমার পিতার একটি ছোট্ট অংশ আর আমার একটি ছোট্ট অংশ দিয়ে, বাছা, তুমি তৈরী হয়েছ। তুমি এই পৃথিবীতে জন্মাবার নয় দশ মাস আগে একটা সরিষার চেয়ে ছোট বীজ রূপে আমার পেটের মধ্যে ছিলে। ঐ বীজ যেমন মাটির মধ্যে পোঁতা হ'লে, মাটির রস পেয়ে আস্তে আস্তে বেড়ে বেড়ে চারা হয়, তেমনি আমার তলপেটের মধ্যে—আমার রক্ত নিয়ে, এই বীজরূপী তুমি, আস্তে আস্তে নয় মাস ধরে' বড় হয়েছ। ডিম যেমন একুশ দিন উপযুক্তরূপ বড় হয়ে' পরে খোলা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে, তেমনি তুমি ঐ জরায়ুর মধ্য থেকে নয় মাস পরে গাছের চারার মত বেরিয়ে এসেছ। তারপর তুমি গাছের মত আরও বড় হবে, ফুলের মত তোমার গুণ দিকে দিকে গন্ধ বিলোবে, ফলের মত তোমার সৎকায কত শত লোকের উপকার করবে। এই যে বীজের কথা বল্‌লুম, এই বীজের অর্দ্ধেকটা তোমার পিতার শরীর থেকে, বাকী অর্দ্ধেকটা আমার শরীর থেকে এসেছে, দুটো অর্দ্ধেক মিশে একটা অতি ছোট্ট বীজ তৈরী হয়েছে। আর এই ছোট বীজের মধ্যে কত শক্তি লুকিয়ে রয়েছে দেখ—যে শক্তির বশে ঐ বীজ নিজের দরকার মত আমার শরীরের ভিতর থেকে খাওয়ার জিনিস সংগ্রহ করে' নিয়ে, একটু একটু করে' বেড়ে' বেড়ে' তোমার মত সোনার চাঁদকে নির্মাণ করেছে। সুতরাং এই বীজ বড় যত্নে ধরে' রাখ্‌বার জিনিস; মানুষের একটি বীজ নষ্ট হওয়া মানে তোমার মত একটি খোকাকে জীবন দান থেকে বঞ্চিত করা। সেইজন্য এই বীজ আমরা শরীরের মধ্যে অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করি। এই বীজের সন্ধান, যখন আমাদের মত বড় বা তোমার ঐ বড় দাদার মত বড় হবে, তখন পাবে। পঁচিশ বছরের আগে মানুষের দেহে ঐ বীজ জন্মায় না। তোমার বাবা, আমি, তোমার সুধা দিদি, ও-বাড়ীর পান্নার মা, আমরা সবাই এই বীজ থেকেই তোমার মত জন্ম গ্রহণ করে', শেষে এত বড়টা হয়েছি।"

"শিশুরা কোথা থেকে—কেমন করে' আসে, এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর যৌনতত্ত্ব-শিক্ষার সুপ্রভাত হয় মাত্র। তাহার কৈশোর উদয়ের পূর্বেই ধীরে ধীরে তাহাকে অতঃপর শিক্ষা দিতে হইবে—কখন কেমন করিয়া তাহার মনে জীব-সৃষ্টির ইচ্ছা জাগ্রত হইয়া উঠিবে, জীব-সৃষ্টির জন্যই নরনারীর সম্মিলন—সুপবিত্র সুমহান্ বিবাহ-ক্রিয়া, আপনার সৃজন-যন্ত্রকে বাহিরের বিপদ-প্রলোভন হইতে কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়···ইত্যাদি।

"পিতামাতারা সাধারণতঃ বুঝিতে পারেন না যে, অতি শিশুকালেই—এমন কি শিশুর জন্মিবার সঙ্গে

সঙ্গেই, শিশুর সকল প্রকার ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-বাহিত জ্ঞানের আধারসমূহ চেষ্টাবান্ অবস্থায় থাকে—তবে সেগুলি বর্দ্ধিত বয়সের ইন্দ্রিয় অপেক্ষা একটু অপরিণত অবস্থায় থাকে (অভিজ্ঞতা বা বাহিরের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি প্রখর হয় ও অবশেষে বার্দ্ধক্যে ভোঁতা হইতে আরম্ভ করে)। ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলে শিশুর মস্তিষ্কের প্রেম-প্রসূ মণ্ডল (Erozenous Zones) বেশ উদ্দীপ্ত করিয়া তোলা যায়। গোড়া হইতেই স্বভাবতঃ শিশুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা চেষ্টাবহা নাড়ী-প্রান্তিকাগুলি (nerve-ends) বেশ তীক্ষ্ণ থাকে—এইগুলি সুখের অনুভূতিকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে ও দুঃখের অনুভূতিকে বিতাড়িত করে; অথচ সেই সুখ বা দুঃখের পরিণাম কি ও কেমন, তাহার জ্ঞান শিশুর মধ্যে মোটেই পরিস্ফুট হয় না। কোনো শিশু আপনার গোপন অঙ্গ নাড়াচাড়া করা কালীন্ বা অন্য কোনো উপায়ে উহাকে উত্তেজিত করিয়া দিলে, তাহাতে যে একটা অব্যক্ত আনন্দ হয়—তাহা বেশ বুঝে। সুতরাং সুবিধা পাইলেই সে ঐ উত্তেজনাকে প্রাণের মধ্যে কামনা করে ও উহার সাধনে তৎপর হয়। এইরূপ করিয়া অনেক ছেলেই অতি কচি বয়স হইতে গোপনে আত্ম-বিকৃতি করিতে শিখে ও পর-জীবনে তাহার ফলে নিজেরাও কষ্ট পায়, পিতামাতারও অশেষ যন্ত্রনার কারণ হয়।

"কেমন করিয়া শিশুর প্রেম-প্রসূ-মণ্ডল-সংযোগী নাড়ী-প্রান্তিকাগুলি অকালে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে?—প্রায়ই পিতামাতা-আত্মীয়-স্বজনের অনিচ্ছায় বা অজ্ঞানতাবশতঃ ইহা সঙ্ঘাত হয়। হাঁটুর উপর শিশুকে বসাইয়া, ঘোঁড়ায় চড়ার মত করিয়া নাচানো—শিশুর যৌন-সংজ্ঞা জাগাইবার একটি সর্বজনানুসৃত কুপ্রথা। শিশুর স্নানের সময় মাতা বা ধাত্রীর অত্যন্ত আদর-সোহাগ কিংবা স্নেহ বা কৌতূহলের বশে ঝি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি কর্তৃক তাহার গোপন অংশে সময়ে-অসময়ে হস্তক্ষেপ।···কিন্তু যখনই শিশুরা বুঝিবে যে এইরূপ করিলে গাত্রে তাহাদের কেমন একটা পুলক লাগে, তখনই তাহার মনে ছাপ লাগিয়া যাইবে যে, এই স্থানটি একটি পুলক সঞ্চারের উৎস। তখন তাহারা ঐ স্থান নিজে নিজে নাড়াচাড়া করিতে ত শিখিবেই, তা'ছাড়া সুখানুভূতিকে প্রগাঢ়তর করিবার অন্যান্য উপায়ও আবিষ্কার করিতে তৎপর হইবে। এইরূপ করিয়া আমাদের মূর্খতার জন্য শিশুর মন্দ অভ্যাস সংগঠিত হইয়া যায়। শুধু যে মানুষের সংস্পর্শেই তাহার এইরূপ কুঅভ্যাস জন্মিতে পারে—তাহা নহে, তাহাদিগকে বিছানায় শোয়াইবার দোষ বা তাহাদের ঘুমাইবার কায়দাও এইরূপ যৌন-লিপ্সা জাগরণের সহায়তা করিতে সক্ষম। শীতকালে ছোট ছেলে-পুলেদের লেপ বা কাঁথার বাহিরে (মাথার দুই পাশে) হাত রাখিয়া ঘুমাইবার অভ্যাস করানো উচিত; মাথা ঢাকিয়া, হাঁটুর মধ্যে হাত রাখিয়া কোঁকড়াইয়া শোয়া বা উপুড় হইয়া শোওয়াও কখনও সমর্থন করা কর্ত্তব্য নহে। শিশুকাল হইতে এই সকল সামান্য অভ্যাস বদ্ধমূল করাইতে তেমন কিছু কষ্ট করিতে হয় না; অথচ এই অভ্যাস জীবন ভরিয়া অব্যাহত থাকিলে মানব-শিশুর মহা উপকার সাধিত হয়। শিশু যদি জিজ্ঞাসা করে—লেপের মধ্যে হাত মুখ রাখায় কি দোষ হয়, তখন উত্তর করিতে হয় যে···তাহা হইলে তাহারা রাত্রির বাতাস পাইয়া সম্যকরূপ পুষ্টিলাভ করিবে ও তাহাদের বৃদ্ধি বাড়িবে। এ বিষয়ে শিশুর উপকার হইবে—এইধারণা মূলক যে-কোনো একটা সামান্য জবাবেই সে সন্তুষ্ট হইবে।

"কি শীতে কি গ্রীষ্মে খুব গরম ও ভারী কাপড়-চোপড় গায়ে চাপা দিয়া শিশুকে ঘুম পাড়াইবেন না। শিশু-শরীরকে খুব বেশী রকম উত্তপ্ত করিলে, তাহার সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলিতে প্রবলতর বেগে রক্ত সঞ্চালিত হইতে থাকে; মাথা ঢাকিয়া শুইলে, মস্তিষ্কের প্রেম-প্রসূ মণ্ডলও রক্তধারায় পূর্ণ হইয়া যায়; কাযেই ইন্দ্রিয়গুলি অতি সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে। শিশু-দিগকে এক বিছানায় এক সঙ্গে না শুইতে দেওয়াই ভালো।

"হাঁ, তারপর শিশু হয়ত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কেন সে শরীরের কোনো বিশিষ্ট অংশে বেশী হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না?···যদি মা ইতঃপূর্বে শিশুকে তাহার 'কেমন করে' জন্মালুম'—এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন, তাহাহইলে তাহাকে স্বচ্ছন্দে খুলিয়া বলিতে পারেন যে, পরবর্ত্তী জীবনে যে বিশেষ কার্য্যের জন্য ঐ বিশিষ্ট স্থানটি ভগবান দিয়াছেন, এখন অপরিপক্ক অবস্থায় উহা বেশী নাড়াচাড়া করিলে, ঐ বিশেষ কার্য্য সাধনে সে অপারগ হইবে। যে বালক ইতঃপূর্বে যৌন বিষয়ক কোনো প্রাথমিক জ্ঞানই পায় নাই, তাহার এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি এই কয়টি কথা সোজা ভাষায় বলিতাম—

'তোমার শরীরের ঐ বিশেষ অংশটি বিশেষ কোনো কাযের জন্য পৃথক করা আছে; যেমন তোমার চোখের একটা বিশেষ কায আছে—দেখা, তোমার কণের যেমন একটা বিশেষ কায আছে—শোনা, তেমনি এই যন্ত্রেরও একটা বিশেষ কায আছে। বুঝ্‌লে? সে কায কি তা' বড় হ'লে জান্‌তে পার্‌বে এবং বড় না হ'লে সে কায সাধন করা যায় না। এই যেমন, এখন তুমি 'তৃতীয় ভাগ' পড়, কিন্তু বড় হলে তোমার বাবার মত কত মোটা মোটা ইংরাজী বই পড়্‌তে পার্‌বে।

'দুই বৎসর আগে তুমি পাড়ার মাঠে বেরিয়ে খেলা কর্‌তে পার্‌তে না; কিন্তু এখন পারো। সামনের বৎসরে তুমি হয় ত একলা বড় রাস্তা পার হ'তে পার্‌বে। তারপর একটু সেয়ানা হয়ে' হয় ত তুমি একলা কল্‌কাতার সহর ঘুরে আস্‌তে পার্‌বে। তেম্‌নি, এ যন্ত্রের কায কর্‌বার সময় তোমার এখনও আসে নি। এ জিনিসটি এখনও কাঁচা ও ছোট অবস্থায় আছে; এটি নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া কর্‌লে, এর পরে ভগবান যে মহৎ কাযের জন্য তোমার এটি তৈরী করেছেন, সে কাযটি সাধন কর্‌তে পার্‌বে না। ফুল গাছের কুঁড়ি নিয়ে যদি বেশী ঘাঁটা ঘাটি কর, তাহলে সে কুঁড়ি কি 'ফুল হয়ে' ফোটে, না তোমরা তার গন্ধ পাও?'

"মিষ্ট কথায় সদুপদেশ দানে না বুঝাইয়া, যদি তাহাকে প্রহার দেওয়া বা ধম্‌কানো যায় অথবা বলা যায় যে, এরূপ করিলে ইহার পর সে পাগল হইয়া যাইবে বা যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিয়া যাইবে,···ইত্যাদি তাহা হইলে তাহার কুফল ঐ কুঅভ্যাস অপেক্ষা বড় কম হইবে না। ইহাতে তাহার কচি মানস-পটে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, তাহার শারীরীক ও মানসিক স্বাভাবিকতার গতি রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।

"যদি ইন্দ্রিয় লইয়া নাড়াচাড়া করার অভ্যাস বালক গঠন করিয়া থাকে, তাহাহইলে এই ভর্ৎসনা ও ভীতি-প্রদর্শনের পর, সে ঐ ব্যাপারটি আরও গোপন করিয়া ফেলিবে; কারণ সে অভ্যাস ছাড়া তাহার পক্ষে সুসাধ্য নহে। এই রকম ছেলে নিজেকে একটু অস্বাভাবিক রকমের মনে করে, জগত হইতে যেন নিজেকে একটু পৃথক দেখিতে শিখে।

"সমস্ত প্রাণী-জগতের মধ্যে দেখিতে পাই যে, স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতার সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিতেছে—তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবার জন্য। এজন্য দেহ-মনের কোনো প্রকার বৈশিষ্ট্য বা কৃত্রিমতার পরিচয় পাইলে জগত তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরে; কাযেই জীবকে তাহার নিজের কৃত্রিমতাকে সংগোপনে হৃদয়ের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কাযেই, যে-ছেলেটি নিজেকে সৃষ্টিছাড়া বলিয়া মনে করে, সে অত্যন্ত ভাবুক হইয়া উঠে, জগত তাহার নিকট তিক্ত বিতৃষ্ণ বোধ হয়, বন্ধুজনকে ভয় করিয়া এড়াইয়া চলে; অথচ অন্তঃপ্রকৃতি তাহার এই অস্বাভাবিকতার জন্য প্রায়ই কষাঘাত করে। কাযেই তাহার এই মানসিক পরিবর্ত্তনে দেহেরও যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। তাহার বাঁচিবার সাধ অন্তর্হিত হয়, ক্ষুধা থাকে না, হজম-শক্তি যায়, জীর্ণদেহ, রক্তশূন্য হইয়া পড়ে; রুক্ষ-মেজাজ, খাম্‌খেয়ালী, নির্জনতা-প্রিয় হয়। জীবন বিড়ম্বনা বোধ হয়।

"অথবা, অহংকার বলিয়া যে জিনিসটি বালকের জীবসত্তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, অসময়ে অস্বাভাবিক অত্যাচারের অভ্যাস ঐ অহংজ্ঞানকে অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি

করিয়া দেয়। সে সর্বদাই নিজেকে অন্যাপেক্ষা মহত্তর মনে করে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে বা পড়িতে চাহে, তাহার অমার্জনীয় ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য সকলের নিকট অসহ্য হইয়া পড়ে। কখনও কখনও ধর্মের বাহ্যিক নিষ্ঠার প্রতিও সে আকৃষ্ট পড়ে। ক্ষণস্থায়ী উৎসাহ, অস্থির-চিত্ততা, সার্বজনীন অবিশ্বাস, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। ইহাতেও তাহার জীবন অতিষ্ট হইয়া উঠে।

'Why We Behave like Human Beings" নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর আমি বহু বালক, যুবক ও তাহাদের জননীর নিকট হইতে এ বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা-পূর্ণ পত্র পাইয়াছি। উত্তর দিতে গিয়া আমি এই কথাই বার বার লিখিয়াছি যে, অসময়ে অস্বাভাবিকতার আশ্রয় লওয়ায় যে সুখ আছে, সময়ে স্বাভাবিকভাবে স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলনে তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পাওয়া যায়। এই সুখ নিবিড়তর, দীর্ঘস্থায়ী, দেহ-প্রকৃতির অধিকতর অনুকূল এবং ইহার আস্বাদন ভুলিবার নহে।

"আর একটি কথা বলিয়া আমি চুপ করিব। এই যে বর্ত্তমান্ সময়ে যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে লোকের একটা অকপট আগ্রহ জন্মিয়াছে, ইহাতে আমি বড় খুশী হইয়াছি। ইহা একেবারে নিরর্থক নহে—ইহার প্রয়োজন আছে, এবং এই উৎসাহে রীতিমত সুবিবেচনার সহিত ইন্ধন যোগানো কর্ত্তব্য। দশ-বিশ বৎসর পূর্বে শত চেষ্টা করিয়াও যে জ্ঞানকে বালক বা তাহাদের পিতামাতার নিকট পঁহুছাইয়া দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল, এখন তাহা অতি সহজে সাময়িক পত্রের মারফতে বিতরণ করা যায়, এবং তাহাতে সুফলও ফলে। কেন? কারণ মানুষ এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছে যে, শত সাবধনতা সত্ত্বেও, হাজার ধর্মের কাহিনী শোনানো স্বত্ত্বেও, লক্ষ নীতি কথা শিখানো স্বত্ত্বেও তাঁহাদিগের সন্তানগণ অকালে অস্বাভাবিক উপায়ে যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করিতে শিখিতেছে। ইহা অভ্যাসে পরিণত হইবার পূর্বেই ইহার অনিষ্ঠকারিতা ও মহত্তর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে সজাগ করিয়া দেওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

"জীবন-বিজ্ঞান আমাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছে যে, অনন্ত বায়ুমণ্ডলে যে সকল প্রচণ্ড শক্তির উপাদান আছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী ঝঞ্ঝার উপাদান শিশু-মনে কার্য্য করে। তবুও এমন লোক আছে, যাহারা শিশুর এই উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাকে অন্ধ কুসংস্কার, দুষ্ট লোকাচার ও অসহনীয় গোঁড়ামির ধামা দিয়া চাপিয়া রাখিতে চাহে। এই সকল সন্তানের পিতা আমাদের করুণার পাত্র!"

শিশুর পরিচর্য্যা—রোগে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শিশুর দন্তোদ্গম কালে সাধারণতঃ নানা প্রকার রোগ দৃষ্ট হয়। আমাদের ধারণা, প্রকৃত যত্ন ও শিশুর পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারিলে শিশুর সাধারণতঃ কোন অসুখ করে না। পরিপুষ্টির অভাবই নানা প্রকার গোলোযোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। শিশুরোগে বিশেষজ্ঞ Sir. R. Martin এর মতে আহার ও পরিচ্ছদের বরাবর সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত এবং তাহাতেই দেহের অন্যান্য অঙ্গের পুষ্টির সহিত দন্তোদ্গমের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। ২০টীর মধ্যে ১৮টী শিশুর ক্ষেত্রে দুর্ব্বলতা ও যত্নের অভাবে রোগ দেখা যায় এবং সাধারণতঃ সভ্য মানব অপেক্ষা অসভ্য মানব শিশুর দন্তোদ্গমের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে।

শিশুদেহে পরিবর্ত্তন অতি শীঘ্র ঘটিয়া থাকে। বহির্জগতের আবহাওয়ার সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইবার জন্য এই চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। সেই কারণে দন্তোদ্গমের সময়ও যে শিশু-শরীর বাহ্যজগতের প্রভাব দ্বারা

মন্দভাবে চালিত হইতে পারে, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু দন্তোদ্গম কালে যে সকল পীড়ার আবির্ভাব হয়, তাহা অধিকাংশই দন্তোদ্গমের জন্য নহে।

যাহা হউক প্রচলিত মত মানিয়া লইলে দেখা যায়, দন্তোদ্গমকালে পেটের পীড়া, জ্বর-ভাব, চাঞ্চল্য প্রভৃতি লক্ষিত হয়। সাধারণ লোকের মনের মধ্যে ধারণা এই সময় পেটের পীড়া কোনরূপ ক্ষতি করে না, বা সামান্য যে সকল রোগ দৃষ্ট হয়, তাহার জন্য বিশেষ কোন চিন্তার কারণ নাই। সে ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত এবং তাহা মনের মধ্যে পোষণ করিতে নাই। শিশু-শরীরে পেটের পীড়া সকল সময়েই গুরুতর ব্যাধি বলিয়া ধারণা করিয়া রাখা মন্দ নহে, কারণ হঠাৎ কোন সময়ে কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে সে সম্বন্ধে কোনরূপ স্থির করিয়া বলা যায় না। দন্তোদ্গমকালে পেটের পীড়া হওয়া স্বাভাবিক ও মঙ্গলজনক, এই ধারণায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় না; ইহা অত্যন্ত অন্যায়। দেহের পরিবর্ত্তনের জন্য সামান্য কারণে ঠাণ্ডা লাগা, জ্বর ভাব, খাদ্যে অরুচি প্রভৃতি ঘটা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে। দন্তোদ্গমের সময় মাড়িতে এক প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেজন্য শিশু সামান্য চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া থাকে এবং নিকটস্থ দ্রব্যাদি কামড়াইবার জন্য ব্যস্ত হয়।

শিশুর পরিচর্য্যা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়াই এ সময়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। কালের উপযোগী পোষাক, পরিচ্ছদ হওয়া প্রয়োজন। ঠাণ্ডা লাগিতে দেওয়া ভাল নহে, অল্পেই সর্দ্দি প্রভৃতি দেখা দেয়। আহার সম্বন্ধে অতি মাত্রায় যত্ন লইতে হয়। শিশুর পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আহার লঘু হইবে। মাতৃদুগ্ধই এই কালের প্রধান আহার। যদি তাহা পরিমাণে অল্প হয়, তাহা হইলে গোদুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। খাঁটী গোদুগ্ধ দেওয়া কখনই উচিত নহে। জল মিশাইয়া জীর্ণ করিবার উপযোগী করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অজীর্ণ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে, ছাগী বা গর্দ্দভীর দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। যদি অত্যধিক মাত্রায় অজীর্ণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দুধে সামান্য পরিমাণ চুণের জল মিশাইয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। শিশু দুধ পান করিবার পর যখনই ডেলা ডেলা দুধ তুলে, তাহার দুধে চুণের জল মিশাইয়া ফল লক্ষ্য করা যাইতে পারে। শিশুর দন্তোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ভাল করিয়া সিদ্ধ ভাত দেওয়া যাইতে পারে। বর্ম্মা মুলুকে মায়েরা সিদ্ধ ভাত উত্তমরূপে নিজেরা চর্ব্বণ করিয়া শিশুর মুখে দেয়। মাতার মুখে যদি কোন অসুখ না থাকে, এবং স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়, তাহা হইলে এ প্রথা এক প্রকার মন্দ নহে।

শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, দন্তোদ্গমের সময় অবস্থা বুঝিয়া লঘু জোলাপ দেওয়া যাইতে পারে। কোষ্ঠ কাঠিন্য ঘটিলে স্বাভাবিক অবস্থাতেই নানা প্রকার রোগের আবির্ভাব হয়। দেহের পরিবর্ত্তনের সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিলে সে সম্ভাবনা অতি অল্প।

নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে দিবে না, আহার ও নিদ্রা নিয়মিত পরিমাণে চলিতে থাকিলে দেহ সুস্থ থাকিয়া সহজেই দন্তোদ্গমের পথ পরিষ্কার হয়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ শিশুদের হাতে চুষি-কাঠি থাকে, তাহা প্রকারান্তরে একটী উপকারী বস্তু। শিশুর দন্তোদ্গমের সময় কাঠি কামড়াইলে, মাড়িতে বাহির হইতে কাঠি ও ভিতর হইতে ধারাল দন্তের চাপ পায় ও দন্ত উদ্গত হইবার সুবিধা পায়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, চুষি কাঠি অযত্নে পড়িয়া থাকে এবং নানা রকমে দূষিত হয়। সেরূপ দ্রব্য ব্যবহার করিতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। প্রত্যেকবার হাতে দিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে, নচেৎ বাহিরের বিষ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করিতে পারে। শিশুকালে সদাসর্ব্বদা বাহিরের দূষিত দ্রব্য মুখে দেয় বলিয়া শিশুদের নানা প্রকার রোগ ঘটিবার সুযোগ হয় এবং অজ্ঞ লোকে উহাই দন্তোদ্গম-কালীন রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

শিশুর দাঁত উঠিতে বিশেষ কষ্ট হইলে ছুরি দিয়া মাড়িতে ক্ষত করিয়া দেওয়া ভাল। সাধারণের মধ্যে

ধারণা অন্যান্য অস্ত্রোপচারের ন্যায় মাড়ি কাটিয়া দিতে শিশু অত্যন্ত কষ্ট পায়, কিন্তু সে ধারণা ভুল। আর এক কথা; লোকে মনে করে মাড়ি কাটিয়া দিবার পর যদি ক্ষত সারিয়া যাইবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে দন্তোদ্গমের কালে মাড়ি অত্যন্ত শক্ত হইয়া উঠে ও বিশেষ কষ্ট দেয়। সে ধারণাও ভুল, কারণ প্রায়ই মাড়ি কাটিয়া দিবার এক বা দুই দিনের মধ্যে দাঁত উঠিয়া পড়ে, অথবা বরাবরই ভিতর হইতে দাঁতের চাপ পাইয়া, ক্ষত পূর্ণভাবে জুড়িয়া যাইবার অবসর পায় না, এবং দাঁত মাড়ি হইতে বাহির হইবার কোন অসুবিধা হয় না।

তড়কা শিশুদিগের একটী প্রধান রোগ। প্রায় দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। মস্তিষ্কের পীড়া বা মৃগী ছাড়া, রিকেট রোগগ্রস্থ বা দুর্ব্বল নাড়ীযুক্ত পিতামাতার সন্তান হইলেও এ রোগ হওয়া বিচিত্র নহে। প্রায় সকল সংসারেই শিশুদের মধ্যে তড়কা হইয়া থাকে; তাহার বিশেষ পরিচয় প্রয়োজন নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তড়কা আসিবার পূর্ব্বে শিশু নানারকম লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। মুখ বাঁকিয়া যায়, নিদ্রাকালে হঠাৎ উঠিয়া পড়ে, হাত বা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিতর দিকে বাঁকিয়া যায়; কখন বা হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়। দেহের রং ফ্যাকাসে হয়, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত হইয়া যায়। নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট উপস্থিত হয়, দেহ কঠিন হইয়া উঠে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বা কিছুক্ষণ পূর্ব্বলক্ষণ গুলি অল্পে অল্পে প্রকাশ করিবার পর রোগ আসিয়া দেখা দেয়। আক্রমণ গুরুতর হইলে রোগ শীঘ্রই দূর হয়, মৃদু আক্রমণে বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তড়কা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আকৃতি পূর্ব্বভাব ধারণ করে এবং শিশুর গভীর নিদ্রাগত হইয়া পড়ে।

তড়কা সাধারণতঃ বিশেষ বিপজ্জনক হয় না, কিন্তু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অধিক হইলে শিশুর মৃত্যু ঘটা অসম্ভব নহে। ইহাতে উপরোক্ত লক্ষণ সকল আরও তীব্রভাব ধারণ করে। তড়কা হইতে সচরাচর মৃত্যু না ঘটিলেও, শিশুর প্রকৃতি দেখিয়া রোগীর আত্মীয়েরা বিব্রত হইয়া পড়ে এবং নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি করে।

বহু রোগের ফল স্বরূপ তড়কা হইতে দেখা যায়। সংক্ষেপে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল। বিভিন্ন কারণে তড়কা হইলে পরিচর্য্যাও ভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত। তবে সাধারণের পক্ষে বুঝিবার অসুবিধা না হয়, সেই জন্য যতদূর সম্ভব সহজ করিয়া দেওয়া গেল।

১। দেহের অত্যধিক তাপ প্রযুক্ত তড়কা হইতে পারে। প্রচণ্ড জ্বরের সহিত এরূপ তড়কা সাধারণতঃ হইয়া থাকে। এই জাতীয় তড়কায় পূর্ব্ব লক্ষণ সকল বিশেষ প্রকাশ পায় না জ্বরই এক্ষেত্রে একমাত্র বিশেষ লক্ষণ। জ্বরের সহিত তড়কা হইবার পর, শিশুর হাম, নিউমোনিয়া, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি বিশেষ রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

২। মস্তিষ্কের রক্তশূন্যতা হেতু তড়কা হইতে দেখা যায়। শিশু বহুদিন রোগে ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ক্রমে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা হেতু তড়কার নানারূপ পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। উদরাময়ে ভুগিয়া শিশু নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, সদাই আচ্ছন্ন হইয়া থাকে অথচ সুনিদ্রা কখন হয় না। বিছানা বা কোল ছাড়িয়া উঠিতে চাহে না, মাথা তুলিয়া দেখিতে চাহে না। সময়ে সময়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠে এবং ধীরে ধীরে শব্দ কমিয়া গিয়া গোঙানিতে শেষ হয়। গোলমাল হইলে শিশু চমকাইয়া উঠিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ দেহ ঠাণ্ডা হয় এবং মস্তকের সম্মুখ ভাগের হাড় যদি শক্ত না হইয়া থাকে, সেই স্থানটী অধিকতর নীচু লক্ষিত হয়। এই সকল লক্ষণে তড়কার আগমন সূচিত করে।

৩। মস্তকে আঘাত প্রভৃতি লাগিয়া তড়কা হইয়া থাকে, বা পূর্ব্ব হইতে বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া এরূপ তড়কা হইতে দেখা যায়। আলোক সহ্য হয় না, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, মধ্যে মধ্যে মুখ লাল হইয়া উঠে, চক্ষু তারকা প্রসারিত হয় এবং বমন হইতে দেখা যায়।

৪। অবশেষে আমরা, সচরাচর সাধারণ যে তড়কা হয়, সেই কথা এই স্থানে বলিব। কোন প্রকার কারণ বুঝা যায় না, অথচ তড়কা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। দন্তোদ্গম হেতু শিশুদের তড়কা হয় বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। হঠাৎ ভয় পাইয়া বা মাতার নিদারুণ মনোকষ্ট ভয় বা উদ্বেগ হেতু শিশু শিশুর তড়কা হওয়া অসম্ভব নহে। কৃমি, আহারের অনিয়ম বা গুরু আহার দ্বারা তড়কার সৃষ্টি হয়। আমাদের মতে, শিশুর আহারের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নাড়ী উত্তেজক আহারে অপরিপুষ্ট শিশু-শরীরে কম্পন উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক।

তড়কায় শিশুর পরিচর্য্যার বিশেষ সুবিধা হইবার জন্য আমরা বিভাগগুলি বিস্তারিত ভাবে দিলাম।

জ্বর না থাকিলে প্রথম শ্রেণী ত্যাগ করা যাইতে পারে। যদি অধিক দিন রোগ ভোগ করিয়া থাকে এবং তাহা হইতে শিশু অতিমাত্রায় দুর্ব্বল হইয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দেওয়া যাইতে পারে, নচেৎ নহে। মস্তিষ্কের আঘাত হেতু যদি তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণ সকল প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেইরূপ পরিচর্য্যা হইয়া থাকে। বাকী সমস্ত গুলিই চতুর্থ শ্রেণীতে দেওয়া যাইতে পারে, এবং তাহা হইতে ধারণা করিয়া লইতে হইবে যে, কোন সামান্য কারণে ঐ রূপ ঘটিয়াছে, এবং তাহা শীঘ্রই দূর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

জ্বরের জন্য তড়কা ঘটিলে যতশীঘ্র সম্ভব গাত্রের তাপ দূর করা প্রয়োজন। ঠাণ্ডা জলে তোয়ালে প্রভৃতি ভিজাইয়া, সামান্য জল থাকিতে উহা দ্বারা গাত্র পুঁছাইয়া দিবে এবং অল্প পরেই (দুই মিনিট আন্দাজ) বেশ করিয়া শুক্‌না কাপড় দ্বারা পুঁছাইয়া দিবে। মস্তকে শীতল জল দিবে। গায়ের আবরণ দূর করিয়া দিবে, এবং প্রয়োজন হইলে শিশুর শরীরে শীতল জল ঢালিয়া দিবে। সহজেই গাত্রতাপ কমিয়া শিশু নিদ্রাগত হইয়া পড়িবে। ডাক্তারকে সংবাদ দিয়া বিশিষ্ট জ্বরের জন্য বিশিষ্ট চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে।

দ্বিতীয় কারণে তড়কা হইলে প্রায়ই বিপজ্জনক হইয়া থাকে। এরূপ রোগে পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। তড়কা হইলে দেহে সহ্য মত গরম জল দিয়া মস্তকে শীতল জল দিতে হইবে। ব্যস্ত হওয়া এক্ষেত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ। শিশুকে হঠাৎ নাড়া চাড়া করা বা এক কোল হইতে অন্য কোলে তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দেওয়া চলিবে না, অতি সন্তর্পণে ধরিয়া রাখা প্রয়োজন। শিশুকে বসাইতে চেষ্টা করা ভাল নহে, কোলে শয়নাবস্থায় রাখিয়া মাথা নীচু করিয়া রাখিবে। অল্প সুস্থভাব ধারণ করিলে গরম দুধ অল্পে অল্পে দেওয়া যাইতে পারে। শীতকালে শিশুকে গরম রাখিতে চেষ্টা করিবে। গ্রীষ্মকালেও শিশুর দেহে প্রচুর হাওয়া লাগা ভাল নহে। অল্পে অল্পে শিশুর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে পুনরায় যাহাতে তড়কা আসিতে না পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মস্তকের আঘাত প্রভৃতি কারণেও তড়কা ঘটিলে দেহে গরম ও মস্তকে ঠাণ্ডা জল বা সম্ভব হইলে বরফ দিবার ব্যবস্থা করিবে। সকল সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

তড়কা আর যে কারণেই হউক তড়কায় গরম জল দেহে ও মস্তকে ঠাণ্ডা জল বড়ই উপকারী। কোষ্ঠবদ্ধতার কারণে বা দন্তোদ্গমের ব্যাঘাত হইতে তড়কা হইলে, কারণ দূর করিয়া দিবে; যদি ছুরিকা দ্বারা মাড়ি কাটিয়া দিতে হয়, তাহা করানো নিতান্ত মন্দ নহে। শিশুর যাহাতে সুনিদ্রা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে, কোনরূপে তাহার অসুবিধা ঘটিতে দিবে না; কারণ শিশু ভাল করিয়া নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে আবার তড়কা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর যদি আত্মীয়েরা স্বস্তি অনুভব করিয়া শিশুকে আদর করিয়া তাহাকে হাসাইবার চেষ্টা করে, তাহা সমূহ ক্ষতিকারক। গুরু আহার দিবে না, কোষ্ঠকাঠিন্য হইতে দিবে না। তবে দ্বিতীয় কারণে তড়কা হইলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। অত্যধিক শীতল বা উত্তপ্ত বায়ু উভয়ই পরিত্যাজ্য। হঠাৎ তড়কা হইলে, যাহাতে শিশুর গালের মধ্যে কিছু না থাকে, তাহা লক্ষ্য করিবে, উহাতে বিপদের সম্ভাবনা।

কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বেই যদি তড়কা হয়, বিপদ দূর হইবার পর কারণ নির্ণয়ে যত্নবান হইতে হইবে এবং তাহা দূর হইলে পুনরায় তড়কা হইবার সম্ভাবনা দূর হইবে, নচেৎ নহে। অনুপযুক্ত আহার, অজীর্ণ, কৃমি, উদরে বায়ু, ভয় বা অন্যান্য সামান্য কারণে তড়কা হইলে ঐ সকল কারণ সহজেই দূর করা যায়, এবং তড়কা হইতে বিপদের এবং উদ্বেগের সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়।

যক্ষার সহিত যুদ্ধ।

রোগীর বাসগৃহের বা বারান্দার নিকট ধোঁয়া বা ধূলা অধিক মাত্রায় জমা হইবার সুবিধা থাকা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। ফুস্‌ফুসের যক্ষার রোগীর পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ুই সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু এবং ধোঁয়া ও ধূলা উভয়ই বায়ু দূষিত করিবার প্রধান উপাদান। শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ধোঁয়া বা ধূলা ফুস্‌ফুস্ পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিলে সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা—তদ্ব্যতিরেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট উৎপাদন ইহাদের দ্বারা অতি সহজেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুসের ক্ষত এইভাবে বৃদ্ধি পাইবার সুবিধা পায়। ধোঁয়া বা ধূলা বায়ু হইতে একেবারে দূর করা সম্ভব নহে, তবে উভয়কেই রোগীর বাসস্থানের সন্নিকট হইতে যত দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গলজনক; বিশেষতঃ ধোঁয়া দূরে রাখা বিশেষ কষ্টকর নহে। রান্নাঘরের অতি নিকটে রোগীর বাসের ব্যবস্থা না হওয়াই ভাল। যদি সেইখানেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বাসগৃহ অবস্থিত হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ ধূম নির্গত হইতে থাকে, ততক্ষণ রোগীকে স্থানান্তরে রাখা মন্দ নহে, তবে তাহাও রোগীর শারীরিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

ঘর ঝাঁট দিবার সময় রোগীকে নিরাপদ স্থানে রাখা বিধেয়, কারণ সমস্ত দিন রাত্রে রোগী যতটুকু সুস্থ হইবার সুবিধা পায়, তাহা ধূলা দ্বারা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; উপরন্তু অধিক মাত্রায় ক্ষতি হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যজনক কিছুই নহে।

বাটীর নর্দ্দামা রোগীর গৃহের নিকট না হওয়াই ভাল। বহু যত্ন সত্ত্বেও উহার দুর্গন্ধ বাহির হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং তাহাতে রোগীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। এই সকল ও অন্যান্য নানা কারণে রোগীর জন্য সহরতলী বা কোন স্বাস্থ্যকর পল্লীগ্রামে বাসস্থান নির্দ্দাচন করা যুক্তিযুক্ত। সহরের মধ্যে রোগীর সর্ব্বপ্রকার সুবিধাজনক স্থান পাওয়া অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অর্থশালী লোক দিগের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু বাঙ্গলার সাধারণ অধিবাসীর তুলনায় তাঁহারা কয়জন? সহরের মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে সুরম্য সৌধ রোগীর পক্ষে বাসের উপযোগী, উপরন্তু বিচক্ষণ চিকিৎসকের সাহায্য সদাসর্ব্বদা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ধূম বা ধূলির অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহরের মধ্যে সুকঠিন। তদ্ব্যতিরেকে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সহরের মধ্যে যক্ষা রোগীর বাসোপযোগী স্থান সংগ্রহ করা স্বপ্নাতীত। আজকাল পল্লীর স্বাস্থ্য সাধারণতঃ নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে, সেই কারণে পল্লী নির্ব্বাচনে বিশেষ বিচার-বুদ্ধির আবশ্যকতা আছে। সহরগুলির নানা সুবিধা আছে, তন্মধ্যে চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া ও প্রয়োজনমত ঔষধাদি ক্রয় অতি সত্বর সম্পাদিত হয়।

পরিচ্ছদ—রোগীর অন্যান্য সকল অবস্থা পরিদর্শনের সহিত তাহার পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। অপরিচ্ছন্ন পোষাক হইতে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহাতে রোগীর নানারূপ কষ্ট বৃদ্ধি পাইতে পারে। যক্ষার নিজের বীজ পোষাকে জমিয়া থাকিতে পারে, তাহাতে রোগী

সুস্থ হইবার পথে ভীষণ ব্যাঘাত হয়। এইরূপ পোষাক দ্বারা নূতন স্থান আক্রান্ত হওয়া বিচিত্র নহে।

রোগীর যথার্থ প্রয়োজনমত পোষাক হইলেই চলে। আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নাই। নানারূপ ঋতু ভেদে পোষাকের সামান্য তারতম্য হওয়া প্রয়োজন। শীতকালে গায়ের উপরের জামা পশম বা তুলা ও পশম মিশ্রিত হওয়া ভাল। শীতকালে রোগী অন্তরে অন্তরে কোনরূপ শীত বোধ না করিলেই চলিবে। শীত বোধ করিলে পোষাক আরও বাড়াইয়া দেওয়া বা গরম পোষাক দেওয়া যাইতে পারে।

ঋতু পরিবর্ত্তনকালে রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, অত্যন্ত শীত বা অত্যন্ত গ্রীষ্মে রোগীর কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তনকালে, তাহারা হঠাৎ ঠাণ্ডা প্রভৃতি লাগিয়া কষ্ট পায়। এক ঋতু অবসান হইয়া পরবর্ত্তী ঋতুর আগমনের পর পর্য্যন্ত পোষাক বদলাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে। শীতকালে, পরদিনে অধিক মাত্রায় ঠাণ্ডা পড়ার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া ভাল করিয়া গরম কাপড়ের বন্দোবস্ত রাখিতে হয়; কারণ অনিষ্ট একবার ঘটিয়া গেলে, তখন সাবধানতা অবলম্বনে বিশেষ লাভ নাই। গৃহের বাহিরে অবস্থানকালে নিকটেই গরম কম্বল প্রভৃতি রাখিয়া দেওয়া মঙ্গলজনক।

আমোদ প্রমোদ—সাধারণতঃ অধিক দিন রোগে ভুগিবার ফলে লোক খিটখিটে হয় এবং বিশেষ কোন আমোদ-প্রমোদে মন দিতে চাহে না, বিশেষতঃ রোগীর যখন সর্দ্দিভাব অত্যন্ত অধিক হয়, তখন বাহিরের কোন দিকেই মন দিতে ভাল লাগে না। কিন্তু মন কেবলমাত্র রোগের চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে পারে না, এবং মনকে সুস্থ রাখিবার জন্য তাহাকে অন্যমনস্ক রাখিতে চেষ্টা করাই মঙ্গলজনক। সামান্য পাঠ, সদালাপ (তর্ক করিতে করিতে উত্তেজিত হইতে দেওয়া অনুচিত) বুনন-কার্য্য, তাস, প্রভৃতি খেলাতে মন সংযোগ করিয়া রাখা মন্দ নহে। ক্লান্তি আসিতে দেওয়া ভাল নহে, সেই জন্য ক্লান্তি আসিবার পূর্ব্বে খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। রোগী-বিশেষে আমোদ প্রমোদের গুরুত্ব ও সময় নির্দ্ধারিত হওয়াই স্বাস্থ্যকর। একের খেলা, অপরের নিকট পরিশ্রম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। দেহ ও মস্তিষ্ক চালনার ফলে যদি জ্বর লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহা ত্যাগ করিতে হয়। দেহে বিশ্রাম ও মনে শান্তভাব, যক্ষা চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

মুখ-ধৌতি—রোগীর মুখ যাহাতে সদাসর্ব্বদা বেশ পরিষ্কার থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। কফের সহিত বহু লক্ষ যক্ষা-জীবাণু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, এবং দাঁতের ফাঁকে বা মুখের নানাস্থানে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকিতে পারে। এই কারণে মুখ খুব ভাল করিয়া ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বিশেষতঃ প্রত্যেকবার আহারের পূর্ব্বে কোন বিষনাশক দ্রব্যের দ্বারা ধৌত করিতে তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে।

কোষ্ঠ-শুদ্ধি—কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে সাধারণতঃ অনেক প্রকার রোগ আত্মপ্রকাশ করে। যক্ষা রোগ হইলে অন্যান্য রোগ উপদ্রব সৃষ্টি যাহাতে না করে, সেই জন্য কোষ্ঠ সাফ রাখিবার জন্য মনোযোগ দেওয়া বিধেয়। খাদ্য গ্রহণ করিয়া কেবলই বিশ্রাম করিতে হয় বলিয়া কোষ্ঠ সম্বন্ধে গোলযোগের উৎপত্তি হয়, এবং হজমের ব্যাঘাত ঘটে। সেই জন্য কোষ্ঠ সাফ হউক বা না হউক সপ্তাহে একবার করিয়া মৃদু জোলাপ লওয়া মন্দ নহে। যদি তাহাতে কোনরূপ অসুবিধা ঘটে, ডুস্ দিয়া সপ্তাহে ২।৩ বার দাস্ত করান প্রয়োজন।

জ্বর-তালিকা—রোগীকে অনেক সময় জ্বর সম্বন্ধে কোনরূপ লক্ষ্য না রাখিতে পরামর্শ দেওয়া হয়। সে কথা যে একেবারে অর্থহীন তাহা আমরা বলি না। তবে যেখানে গাত্র-তাপ প্রত্যহই অধিক হয়, তখন জ্বর লিখিয়া রাখা ভাল। একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলে কয়েক দিনের জ্বর ও তাহার কম বেশীর সময় নির্দ্ধারণ করা যায়, এই ভাবে জ্বর নক্সা দ্বারা লিখিয়া রাখা উচিত। রোগীকে সাধারণতঃ তাহার জ্বর সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল, কারণ যদি মানসিক দুর্ব্বলতা

রোগীকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা হইলে অনেক সময় সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। যদি রোগী নিজেই জ্বর জানিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহাকে যথাসম্ভব না জানিতে দেওয়াই ভাল, এবং উত্তাপ অধিক হইলে সতর্কতা সহকারে তাপমান যন্ত্রে জ্বর কমাইয়া দেখান যাইতে পারে। চিকিৎসকের নির্দ্দেশানুযায়ী জ্বর দেখিবার কাল স্থির করিয়া লইতে হইবে।

দৈনিক কার্য্যাবলী—রোগীর প্রত্যহই নিয়ম বশীভূত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করা বিধেয়। যে কার্য্যে মানুষ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহা সম্পাদন করিতে পরিশ্রম অত্যন্ত কম লাগে এবং অতি সহজেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

রোগের স্থিতিকালে পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য করা নিষিদ্ধ, তাহা বলা হইয়াছে। নিজের মনকে প্রফুল্ল রাখা এবং দেহের রোগ দূর করিবার শক্তিকে সাহায্য করাই, রোগীর প্রধান কার্য্য। যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা যেন নিজের মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে। সুস্থাবস্থায় যেমন নিজের ব্যবসা প্রভৃতির প্রতি যত্ন থাকে, অসুস্থাবস্থায় সেই যত্ন নিজের সারিয়া উঠিবার জন্য প্রয়োগ করিতে হয়।

রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে সদ্ভাব—যক্ষ্মা-চিকিৎসায় চিকিৎসকের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভাল-বাসার ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন। রোগী যে চিকিৎসককে পছন্দ করে না, যাঁহার উপর বিশ্বাস নাই, তাঁহাকে দিয়া চিকিৎসা করান ভুল। যক্ষ্মা রোগে প্রকৃতপক্ষে রোগীই তাহার রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকে, চিকিৎসক উপদেশ দেন মাত্র। চিকিৎসকের সঙ্গে সখ্যতা থাকিলে তবেই তাঁহার উপদেশ পালনে যত্ন প্রকাশ করে, নচেৎ রোগী সকল কথাই বিরক্তি সহকারে গ্রহণ করে এবং সময়ে সময়ে বিপক্ষতাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

যক্ষ্মা চিকিৎসায় চিকিৎসকের উপদেশ বা ঔষধ—রোগের কোন্ লক্ষণ কমাইবার জন্য প্রদত্ত হইল, তাহা রোগীকে একটু বুঝাইয়া দিলে অনেক সময় সুফল দর্শে। রোগী সদাই নিজের রোগের যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে এবং কোন বিশেষ রোগ-যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে জানিলে আনন্দের সহিত পালন করে।

রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীকে উপদেশ দিয়া সকল কথা বুঝাইয়া বলা মন্দ নহে; সে ফল বহুদিন পর্য্যন্ত থাকে, এবং রোগী নিজেই আরোগ্য লাভ করিবার জন্য বহুপ্রকার সাহায্য করিতে থাকে।

চিকিৎসা-কাল—চিকিৎসা-কাল কতদিন হওয়া উচিত তাহা স্থির করিবার কোন উপায় নাই। প্রত্যেকের জন্যই বিভিন্ন কাল হওয়া সম্ভব। রোগের গুরুত্ব এবং রোগীর নিজ হইতে রোগমুক্ত হইবার প্রচেষ্টা চিকিৎসা-কাল সংক্ষেপ করিতে সমর্থ, নচেৎ নহে।

চিকিৎসকের লক্ষ্য থাকে রোগের প্রসার বন্ধ করিবার দিকে; কারণ সচরাচর রোগ প্রকাশ করিবার পরই চিকিৎসকের সন্ধান হইয়া থাকে। রোগের বিস্তৃতি বন্ধ করিবার পর হইতে রোগীকে আবার তাহার জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে সুস্থ শরীরে ফিরাইয়া দিতে পারিলে, এবং সেই পরিশ্রম সহ্য করিবার শক্তি জন্মাইয়া দিতে পারিলেই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শেষ হইল বুঝিতে হইবে। রোগ পরীক্ষার পর চিকিৎসকের যদি এরূপ ধারণা হয় যে, রোগীর পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসা অসম্ভব, তাহা হইলে, চিকিৎসা-কাল অকারণ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই, সমস্ত রোগ-লক্ষণ দূর হইবার পর রোগীকে গুরু পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়া এবং সতর্কতা অবলম্বনের পথগুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে আপনার ভার লইতে বলাই শ্রেয়ঃ। বহুদিন চিকিৎসাধীনে থাকায়, অর্থব্যয় ও নানারূপ কঠোরতা অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হয়; অনর্থক তাহা বাড়াইয়া ফল নাই।

যে সকল রোগীর সবেমাত্র ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ক্ষেত্রে চিকিৎসার কাল প্রলম্বিত হওয়া আশ্চর্য্য-জনক নহে। এ সকল অবস্থায় অন্ততঃ ছয়মাস চিকিৎসা না হইলে রোগীর শারীরিক অবস্থার পূর্ণ উন্নতি আশা

করা যায় না। ক্ষতের পার্শ্বে নূতন মাংস উৎপত্তি ঘটিয়া ক্ষত সারে, অথবা বাহির হইতে গজাইয়া ক্ষত একরূপ ঢাকিয়া ফেলে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এ সকল ক্ষত প্রায়ই সারিতে চাহে না, যদিই বা সারে অতি ধীরে ধীরে কার্য্য অগ্রসর হয়। সাধারণতঃ এক বৎসরকাল সময় ছাড়িয়া রাখিয়া পরে নিজ কার্য্যে মন দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি রোগ-লক্ষণ সকল বিশেষ গুরুতরভাবে ধারণ করে, দুই বা তিন বৎসর কাল চিকিৎসা ও দেহের কর্ম্মশক্তি লাভ করিবার জন্য স্বতন্ত্র রাখা মন্দ নহে। নিজে সুস্থ থাকিবার চেষ্টার ফলে কালে রোগ জয় করা সম্ভবপর হয়।

রোগের ফল স্বরূপ দেহের অন্যান্য অংশও দুর্ব্বল হয়, এবং নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরাগমনের সময় নানারূপ ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে। সুস্থ শরীরে পুনরায় কর্ম্মভার গ্রহণ করার পর অসুস্থ হইয়া না পড়িলে, রোগ দূর হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগী পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভে প্রায়ই সক্ষম হয় না; এ কথা নিশ্চিৎ করিয়া বলা যায়। রোগ-প্রবণতা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, সেই কারণে সর্ব্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকা এবং সামান্য পরিবর্ত্তনে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন।

অসুস্থ অবস্থা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া একেবারে গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইলে শীঘ্র শরীর অপটু হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা, কাযে কাযেই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আসিতে হইলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া উচিত। ইহা একটী ভীষণ পরীক্ষা বলিয়া মনে রাখিতে হইবে এবং কোন মন্দ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইলে আর অগ্রসর না হইয়া, বিশ্রামের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে।

ব্যায়াম—ফুসফুসের যক্ষ্মার চিকিৎসায় সুফল দর্শিলে কিছুদিন পরে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। বহুদিন একভাবে থাকার ফলে শরীরের অন্যান্য অংশের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় এবং ফুসফুসেরও পরিশ্রম করিবার শক্তি হ্রাস পায়। যখন ক্ষত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন কোন প্রকার পরিশ্রমই করা উচিত নহে, কিন্তু ক্ষত বিস্তৃতি একেবারে বন্ধ হইবার পর ফুসফুসের কার্য্য-পরিচালনা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য সামান্য পরিমাণে ব্যায়াম করা প্রয়োজন। বিশ্রামের কতকাল পরে এবং ফুসফুসের কিরূপ অবস্থায় ব্যায়াম আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা একটী গুরুতর চিন্তার বিষয় এবং ভূয়োদর্শন প্রয়োজন হয়। ব্যায়ামে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন হয়। হৃদপিণ্ডের কার্য্য দ্রুত হয় এবং রক্ত-চলাচল বৃদ্ধি পায়। ক্ষত বৃদ্ধি পাইবার কালে ইহা যেমন ক্ষতিকারক, উন্নতি লাভ করিবার সময় ইহা সেই পরিমাণে এই কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে।

সুস্থ শরীরে ব্যায়াম অতি প্রয়োজনীয়। দিনের কিছুকাল ব্যায়ামের জন্য নির্দ্ধারিত রাখিতে পারিলে, নানারূপ কাযের চাপেও দেহযন্ত্রখানি বেশ সচল রাখা যায়। ফুসফুসের যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীরও ব্যায়াম সেই পরিমাণেই প্রয়োজন। ব্যায়াম ধীরে ধীরে গ্রহণ করাই উচিৎ। কিছুকাল সর্ব্বপ্রকার গতিহীন অবস্থায় থাকিবার পর, নিজ প্রয়োজনে বাড়ীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান বা পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিবার পরিশ্রমই ব্যায়াম বলিয়া গৃহীত হওয়াই বিধি। এ সকলে যদি জ্বর লক্ষণ বা ক্লান্তি বোধ না হয়, তাহা হইলে ধীরে ধীরে পরিশ্রম-সিদ্ধ ব্যায়াম করা যাইতে পারে। গাড়ী প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া বেড়াইবার বন্দোবস্ত করা মন্দ নহে। গাড়ীর নাড়া যদি সহ্য হইয়া যায়, তাহা হইলে পাদচারণার দ্বারা শরীরকে নাড়া দেওয়া যাইতে পারে। পাদচারণা এতদবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যায়াম। প্রথমে পাঁচ বা সাত মিনিট কাল পাদচারণায় রোগী যদি পরিশ্রান্তি বোধ না করে, ক্রমশঃ সময় ও দূরত্ব বৃদ্ধি করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রথম প্রথম সমতল স্থান মনোনীত করাই যুক্তিযুক্ত। অসমতল স্থানে পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক হয়।

জ্বর, নাড়ীর দ্রুত গতি, দুর্ব্বলতা, বা রক্ত বমনের কিছুকাল পরেই পাদচারণা করা একেবারেই উচিত নহে। ধীরে ধীরে সমতল স্থানে দুর্ব্বলতা বোধ না

করা পর্য্যন্ত বেড়ান যাইতে পারে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হইলে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত।

পাদচারণা সহ্য হইয়া গেলে টেনিস্, ব্যাডমিনটন্ প্রভৃতি খেলা, কিছুকাল পরে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু অতি সতর্কতা সহকারে ধীরে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য এবং সামান্য বিপদের সম্ভাবনা থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সাঁতার, ফুটবল খেলা প্রভৃতি পরিশ্রম-সিদ্ধ ক্রীড়াতে রত হওয়া জীবনের কোন সময়েই আর উচিত নহে, কারণ ফুসফুসের উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে এবং ক্ষত পুনরাবির্ভাবের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

ফুসফুসের যক্ষ্মায় দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ প্রভৃতি ব্যায়াম না করাই মঙ্গলজনক। ফুসফুসের বিস্তৃতির সহিত ক্ষত স্থানে চাপ পড়ার সম্ভাবনা অত্যধিক; তদ্ব্যতিরেকে রুগ্ন দুর্ব্বল ফুসফুসে বাহির হইতে নূতন রোগ-বীজাণু প্রবেশ করিয়া নূতন অনর্থ ঘটান বিচিত্র নহে।

মর্দ্দন—দেহের নানা স্থান মর্দ্দনে রোগের চিকিৎসার সাহায্য করে না, একথা অতি সত্য। তবে যে সকল রোগীর সামান্য পরিশ্রমেও জ্বর লক্ষণ প্রভৃতি প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে দেহের মর্দ্দন উপকারী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মর্দ্দনে শরীরের রক্ত সঞ্চালনের সুবিধা হয়, এবং পেশীও সবল হয়। দুর্ব্বল শরীরে কষ্টদায়ক মর্দ্দন একেবারে নিষিদ্ধ। অতি সন্তর্পণে, রোগীর আরামপ্রদ মর্দ্দন বিশেষ উপকারক। বিশেষতঃ যে সকল রোগী অল্পে মোটা হইয়া পড়ে, অথচ পরিশ্রম করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ তাহাদের পক্ষে সন্তর্পণে মর্দ্দন অতিশয় শুভ। তলপেটে মর্দ্দন দ্বারা কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর হয়, এবং যে সকল যক্ষ্মারোগী সাধারণতঃ কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইতে কষ্ট পায়, তাহাদের পক্ষে মর্দ্দন সুফল আনয়ন করে। যে সকল রোগী অনিদ্রায় কষ্ট পায়, তাহাদের পক্ষে মর্দ্দন উপকারী এবং সচরাচর দেখা যায়, রোগীর মস্তক বা পৃষ্ঠদেশ মর্দ্দন কালে রোগী অচিরে নিদ্রাগত হয়। মর্দ্দন অতি ধীরে ধীরে এবং সহ্যমত হওয়া উচিত। বক্ষঃস্থলে মর্দ্দন করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ যদি কিছুকালের মধ্যে রক্ত বমন হইয়া থাকে। বক্ষঃস্থলের পেশীতে চাপ যাহাতে না পড়ে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পথ্য—যক্ষ্মারোগে রোগীর দেহক্ষয়ই বিশেষ লক্ষণ এবং গুরুত্ব উহারই উপর নির্ভর করে। ক্ষয় বন্ধ করাই যক্ষ্মার প্রধান চিকিৎসা। এই রোগে সাধারণতঃ রোগী হজম করিবার শক্তি হারায় বলিয়া রোগের বিপদও অত্যন্ত অধিক। দেহ-পুষ্টি আরম্ভ হইলে বুঝিতে হইবে রোগ অনেক পরিমাণে জয় হইয়াছে। রোগের বিষ দেহ-মধ্যে শোষিত হইয়া হজম-শক্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। রোগীর যাহাতে হজম-শক্তির বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন না হয়, অথচ দেহ-পুষ্টির সহায়তা করে, এরূপ আহারই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

হজম-শক্তির হ্রাস ঘটার কারণ নির্দ্ধারণে প্রথমে যত্নবান হইতে হয়, পরে আহারের মাত্রা বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে। তৎপূর্ব্বে কোন রূপে হজম শক্তিকে দুর্ব্বল করা উচিত নহে। ক্ষয় বন্ধ করাই প্রথম লক্ষ্য পরে আহারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দেহ-পুষ্টির দিকে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে।

রোগীকে অধিক মাত্রায় আহার গ্রহণের চেষ্টাই দেহ-পুষ্টির প্রধান উপায় নহে। রোগীর রুচি ও সহ্য করিবার শক্তি অনুযায়ী আহারের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও সাধারণ পুষ্টিকর আহারে বহু সময় দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দেহের ওজন বৃদ্ধি একটী শুভ লক্ষণ; কিন্তু কেবলমাত্র তাহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে, প্রকৃত রোগ অনেক দূরে অবস্থান করিয়া থাকে।

ফুসফুসের যক্ষ্মায় অনুরোধ, উপরোধ, শাসন প্রভৃতির দ্বারা বলপূর্ব্বক আহার করান আজকাল একরূপ বন্ধ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু এখনও অনেকের ধারণা আছে যে, অতিরিক্ত আহারে দেহের পুষ্টি অবশ্যম্ভাবী। যক্ষ্মার রোগীর উপযুক্ত খাদ্যই হয়ত খাইতে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, যথা—দুধ, মাখন, মুরগীর ডিম প্রভৃতি; কিন্তু আহারের পরিমাণের ফলে বদহজম, পেটফাঁপা, অম্ল

প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। সময়ে সময়ে পেটের পীড়া জন্মিবার পূর্ব্বে রোগীকে দেহের ওজন লাভ করিতে দেখা যায়, কিন্তু পেটের পীড়ার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সবই তিরোহিত হইয়া থাকে। এইরূপ আহারের ফলে দেহ কেবল মাংসল হইয়া পড়া বিচিত্র নহে এবং হৃদযন্ত্রখানি পেশী দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া, তাহার গাত্রে চর্ব্বি জন্মাইতে পারে এবং নূতন কষ্ট সৃষ্টি করিতে পারে।

আহারের পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময় হজম-শক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। যে খাদ্য শরীরের পুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় না, তাহা অন্ত্রের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইতে বাধ্য; তাহাতে পরিপাক-যন্ত্রের—তথা সমগ্র দেহের পরিশ্রম বৃদ্ধি পায়, এবং সময়ে সময়ে অন্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত হয়। রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর খাদ্য নির্ব্বাচন নির্ভর করে। একজনের পক্ষে যাহা রুচিকর, অপর লোকের নিকট তাহা বিরক্তিকর হইতে পারে। যাহার অবস্থার গুণে নানারূপ ভাল খাওয়ার অভ্যাস আছে, তাহার জন্য খাদ্য নির্বাচনেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। সাধারণ রোগীর ক্ষেত্রে **Protein, Carbohydrate, Fats and salts**-যুক্ত আহারই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। কোন্ রোগীর পক্ষে কত মাত্রায় প্রোটীন, কার্ব্বোহাই-ড্রেট প্রভৃতি প্রয়োজন, তাহা নির্দ্ধারিত ভাবে বলা অসম্ভব। রোগীর শারীরিক অবস্থা ও আর্থিক অবস্থার উপর সকলই নির্ভর করে।

দিনে তিনবার পথ্য গ্রহণই রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; তাহার অধিক আহারের আমরা কোন প্রয়োজন দেখি না। যদি হজম-শক্তির ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে আহারের মাত্রা কমাইয়া দিয়া অল্প সময় অন্তর অধিক বারে দিবার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। রোগীর ক্ষুধাই আহারের পরিমাণ নির্দ্ধারণের যন্ত্র হওয়া উচিত। যদি রোগী ক্ষুধার তাড়নায় আহারের জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে, এবং হজম-শক্তি অব্যাহত রাখে, তাহা হইলে তাহার শরীরে আহারের প্রয়োজন আছে,—বুঝিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল রোগী কিছুই আহার করিতে চাহে না, খাদ্য দ্রব্য সম্মুখে লইয়া গেলে বমনের লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাদের লইয়া চিকিৎসকের বিপদের অন্ত নাই। এই সকল ভূয়োদর্শন ও রোগীর মানসিক অবস্থা বুঝিবার ক্ষমতা রাখা একান্ত প্রয়োজন। এ সকল রোগীকে বলপূর্ব্বক কিছু খাওয়াইবার চেষ্টা করা একান্ত অনুচিত। বিশ্রাম এ ক্ষেত্রে প্রধান ঔষধ এবং সাধারণতঃ দেখা যায়, পূর্ণ বিশ্রামের পর রোগীর এ অবস্থা দূর হইয়া গিয়াছে। তাহাতেও যদি বিশেষ উপকার লাভ করা না যায়, তাহা হইলে পথ্য বারে বারে বদল করিয়া মুখরোচক (অথচ অপকারক নহে—এমন) খাদ্য নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। খাদ্য-নির্ণয় ব্যাপারে রন্ধন-নিপুণ লোক বা স্ত্রীলোক চিকিৎসকের সমান প্রয়োজনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অন্ত্রের যক্ষ্মায় নানারূপ খাদ্য লইয়া মুখরোচক খাদ্য নির্ণয় করিতে যাওয়া মহা বিপজ্জনক। মাত্র কয়েকটী পথ্যের মধ্যে তালিকা নিবদ্ধ রাখিতে হয়। কাযে কাযেই পথ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, অন্ত্রের যক্ষ্মায় ভূয়োদর্শন, চিকিৎসার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

আমিষ-(Protein) প্রধান খাদ্য।—উদ্ভিজভোজী জীব অপেক্ষা মাংসাশী জীবের যক্ষ্মা কম পরিমাণে হয় বলিয়া যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে মাংসাহার বা আমিষ-প্রধান আহার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কিন্তু মিশ্রিত পথ্যে ফল সমান দর্শে বলিয়া আমাদের ধারণা। দেহের পুষ্টির জন্য যে পরিমাণ প্রোটীন প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তাহা মাংস ডিম্ব, দুগ্ধ, কড়াই, সীম, বরবটী, ছানা প্রভৃতি হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু আমিষ খাদ্য অধিক পরিমাণে রোগীর গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে; যদি জীর্ণ না হয়, তাহা হইলে অন্ত্র-মধ্যে পচিয়া নানারূপ ক্ষতিকারক লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারে।

স্নেহজাতীয় খাদ্য (Fats)—যক্ষ্মা-রোগীর খাদ্যে চর্ব্বি (স্নেহ) জাতীয় অংশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এগুলি ঘৃত, মাখন, মাছ, মাংস এবং কোন কোন উদ্ভিজ্জ আহার হইতে পাওয়া যাইতে পারে। অনেক রোগীর স্নেহ-বহুল দ্রব্যে বিশেষ বিরাগ দৃষ্টি গোচর হয়, এবং তাহাদের আহারের তালিকায় এই জাতীয় খাদ্য রাখার বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় চর্ব্বিজাতীয় আহারে বিশেষ গোলোযোগের সম্ভাবনা। সর্ব্বপ্রকার পথ্যের ন্যায়, ইহাও রোগীর সহ্যমত অল্প দিতে হইবে।

শালি বা শর্করাজাতীয় খাদ্য—আমিষ ও স্নেহের ন্যায় ইহারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। ময়দা, আটা, কচু, আলু, কলাই, রুটী, শর্করা প্রভৃতি হইতে ইহার অভাব দূর হয়। কোন কোন রোগী মিষ্ট খাইতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করে, বিশেষতঃ মিশ্রী খাইবার জন্য ব্যগ্র হয়। আহারের পর সামান্য পরিমাণে খাইলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, কিন্তু অন্য সময়ে খাওয়ায় অম্ল, উদরাময় প্রভৃতি ঘটাইতে পারে। সহ্য করিবার শক্তি-মত শর্করাজাতীয় আহার রোগীর পক্ষে মঙ্গলজনক।

লবণ জাতীয়—টাট্‌কা ফল ও উদ্ভিজ্জ আহার হইতে শরীরের পক্ষে লবণের অভাব মিটিতে পারে। দাইল হইতেও প্রয়োজন মত পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। ব্যবহারিকভাবে দেখা গিয়াছে, ইহাও খাদ্য তালিকার একটী প্রয়োজনীয় অংশ।

ভাইটামিন—ভাইটামিন সম্বন্ধে জ্ঞান দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং দেখা যাইতেছে যে, ইহার অভাবে দেহের পুষ্টি এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং দেহকে অতি মাত্রায় সংক্রামক ও অন্যান্য রোগ-প্রবণ করিয়া ফেলে। শস্যের এবং ফলের উপরের ঢাকা ছালে, উদ্ভিদ, ডিম্ব ও অফুটন্ত দুধ এবং yeast (কোন জিনিষের গাঁজিয়া বা মাতিয়া ওঠার অবস্থা) এই সকলের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ রোগীর পক্ষে ভাইটামিনের অভাব ঘটিলে, অসিদ্ধ (কাঁচা) দুধ ও টাট্‌কা ফলমূল হইতে সে অভাব দূর হইতে পারে।

তরল পদার্থ—প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত। তবে আহারের সহিত যত কম পরিমাণে হয় ততই মঙ্গল। জ্বর অবস্থায় অধিক মাত্রায় জলপান করা প্রয়োজন; ইহাতে দেহের বিষ নানা প্রকারে বাহিরে যাইবার সুবিধা করিয়া দেয়। কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে এবং রোগীও বেশ পছন্দ করে। কিন্তু এই জল ঈষদুষ্ণ বা ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা করা হইলেই ভালো হয়।

জল-হাওয়া—যক্ষ্মার চিকিৎসায় জলহাওয়া খুব অধিক মাত্রায় কায করে এবং বহুদিন হইতে একথা সকলে মানিয়া আসিতেছেন; তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সুফল লাভ করা যায় বলিয়া সে মত এখনও প্রবল আছে। ফুসফুসের যক্ষ্মায় বিশুদ্ধ বায়ু একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং সেই কারণেই বায়ু পরিবর্ত্তনের কথা চলিয়া আসিতেছে। নানা রকম অবস্থায়, পরিবর্ত্তনের স্থানও বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজন।

স্থান নির্ব্বাচনে বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। রোগীর পছন্দ মত হওয়া একদিকে যেমন প্রয়োজনীয়, অপর দিকে স্থানে তাপ, বর্ষা, বায়ুর চাপ ও গতি, সূর্য্যের কিরণ প্রভৃতির বিষয় অনুসন্ধান করিতে হয়। দেশের সাধারণ স্বাস্থ্যের বিষয় জ্ঞান আমাদের লোক-মুখে চলিয়া আসিতেছে এবং এ পর্য্যন্ত এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা বিনিয়োগ করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, অমুক দেশই কোন বিশেষ রোগীর পক্ষে উপযোগী।

বায়ু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বহু ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ইহার একটী বিশেষ কারণ। সকল স্থানেরই বিশুদ্ধ বায়ু বিশেষ মঙ্গলজনক এবং তৎসহিত বলকারক খাদ্য এবং নিয়মিত জীবন-যাপনের একটী বিশেষ ফল আছে। বায়ু পরিবর্ত্তন সকল ফল গুলির অন্ততঃ পক্ষে দশ ভাগের এক ভাগ কায করে। একই স্থানে বহুদিন আবদ্ধ থাকিবার পর বা চিরপরিচিত কর্ম্মস্থল হইতে দূরে কোন নূতন স্থানের দৃশ্যাবলীও মনের উপর যথেষ্ট কায করে

এবং রোগীর মনে আশার সঞ্চার করিয়া, রোগ প্রশমনের যথেষ্ট সহায়তা করে।

লোকালয় হইতে দূরে এবং সমুদ্রতীর হইতে অন্ততঃ এক হাজার ফুট উচ্চে কোন স্থান নির্ব্বাচিত করাই শ্রেয়ঃ। সে সকল স্থলে বায়ু দূষিত হইবার সম্ভাবনা কম, এবং অপেক্ষাকৃত তরল ও বিশুদ্ধবায়ু ফুসফুসের মধ্যে যাতায়াতে বিশেষ কোন পরিশ্রম বোধ হয় না।

এরূপ স্থলে একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। লোকালয় হইতে দূরে অবস্থান কালে রোগীর পথ্যের কোন অসুবিধা যেন না হয়। কেবল মাত্র বিশুদ্ধ বায়ু যে রোগ দূর করিতে সক্ষম নহে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। রোগী যদি কোন প্রকারে স্বাস্থ্যের অবনতির লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে স্থানে রাখা বিশেষ লাভজনক নহে।

চিকিৎসা-গৃহে ও স্বাস্থ্যনিবাসে—যক্ষ্মা রোগে একটী প্রধান সমস্যা, চিকিৎসা কোথায় হওয়া শ্রেয়ঃ—গৃহে না স্বাস্থ্যনিবাসে। প্রত্যেকটীর স্বপক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে, আমরা মাত্র কয়েকটীর উল্লেখ করিব।

অবস্থার গতিকে এবং কতকটা রোগীর ও আত্মীয়ের মানসিক অবস্থার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ফুসফুসের যক্ষ্মার চিকিৎসা গৃহে হওয়াই প্রয়োজন। উপযুক্ত সেবা করিবার লোক পাওয়া যাইলে চিকিৎসা গৃহে হওয়া মন্দ নহে। যদি আত্মীয়দের সহিত কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা যায়, তাহা হইলে আত্মীয় হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহাদের সেবা লাভ করিয়া সুফল লাভ করা সম্ভব। অনেক সময় স্নেহের লোকের পরামর্শ চিকিৎসকের উপদেশ অপেক্ষা আদরণীয় হয়, এবং নির্ব্বিচারে পালিত হয়।

যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়গুলিতে রোগীকে স্থানান্তরিত করিবার অবশ্যই কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমতঃ গৃহে-যে সকল অপরের স্বাস্থ্যের হানিকর কার্য্য রোগী দ্বারা ঘটা সম্ভব, সেগুলি দূর হয়; এবং রোগীর আত্মীয়েরা, কতক পরিমাণে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। রোগের সংক্রামণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটা পরম শান্তি আছে।

তদ্ব্যতিরেকে স্বাস্থ্যনিবাসগুলিতে রোগ-চিকিৎসার কতকগুলি বিশেষ বন্দোবস্ত ও কার্য্যকুশলতা আছে, তাহা কোন গৃহে কখনও সম্ভব নহে, এবং ইহাতে নিজের পুরাতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে স্থান পরিবর্ত্তনের সুফলও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

একই রকমের নানা অবস্থার রোগীর মধ্যে থাকিয়া আশার কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ-লাভ ঘটা একটী কম লাভের ব্যাপার নহে। সকলেই রোগমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং তাহাদের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া, চিকিৎসককে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করা, সাধারণ ঘটনা হইয়া পড়ে। তাহাতে রোগমুক্তির অতিশয় সুবিধা হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, রোগীর মধ্যে থাকিয়া নিজ জীবনে হতাশ হইয়া পড়াই স্বাভাবিক, কিন্তু ভূয়োদর্শন দ্বারা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ফুসফুস্ ও হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত রোগে রোগী জীবন সম্বন্ধে প্রায়ই হতাশ হয় না, এবং সদাই উন্নতিলাভ করিতেছে, এইরূপ মনে করে। যাহারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে, স্বাস্থ্যনিবাসে তাহাদের যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া হয় না; কাযেই যে-সকল রোগী রোগমুক্ত হইবার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহারা নিজেদের মধ্যেই আলাপ করিবার সুবিধা পাইয়া থাকে।

একটী বিধিবদ্ধ নিয়মের বশীভূত থাকার কত সুবিধা তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্বাস্থ্য-নিবাসে সাধারণতঃ সকল ব্যাপারই বাঁধা নিয়মের বশীভূত এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রোগীকে সেই শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু অভ্যাস-বশে শেষে স্বাস্থ্য-নিবাসের নিয়মগুলি অতি সহজ সরল বলিয়াই মনে হয়, এবং দেখা যায়, রোগীকে গৃহে যে সকল নিয়ম পালন করান অতিশয় কষ্টদায়ক বলিয়া মনে হইত স্বাস্থ্য-নিবাসে সেই সকল কার্য্য অতি শৃঙ্খলার সহিত বিনাকষ্টে সম্পাদিত হইতেছে।

স্বাস্থ্য-নিবাসে রোগ সম্বন্ধে ও পালনীয় নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞান অতি শীঘ্র ও বিনা আয়াসে রোগী লাভ করে।

কোন্‌গুলি ত্যাজ্য ও কোন্‌গুলি হিতকারী, এ সম্বন্ধে ধারণা রোগী শয্যা আশ্রয় করিয়াই লাভ করে, তাহার জন্য অন্য সময় বা পরিশ্রম ব্যয় করিতে হয় না। এই জ্ঞান লাভের জন্যও রোগীকে কিছুদিন স্বাস্থ্য-নিবাসে রাখা মন্দ নহে। একবার নিয়ম মানিয়া চলিতে অভ্যাস হইয়া গেলে, এবং রোগের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটী ধারণা করিয়া লইতে পারিলে, রোগী সেই সকল কার্য্য ঠিক সেই-সেই ভাবে সম্পাদিত হইবার জন্য নিজ হইতেই আগ্রহ প্রকাশ করিবে।

রোগীকে গৃহ হইতে স্বাস্থ্য-নিবাসে স্থানান্তরিত করিবার কাল-নির্ণয় একটী সমস্যার ব্যাপার। যদি রোগীর অবস্থার গতিকে, তাহাকে শয্যা হইতে নাড়াচাড়া করায় কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কোন ক্রমেই স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করা বিহিত নহে। জ্বর-অবস্থায় নাড়াচাড়া করা নিষিদ্ধ, এবং স্বাস্থ্য-নিবাসে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিবার ব্যবস্থার ফলে জ্বর দূর হইতে পারে, তখন যথোচিত ব্যবস্থা করাই মঙ্গল। রক্ত উঠিবার পর দুই সপ্তাহের মধ্যে কোন রূপেই বিছানা ত্যাগ করা বিধেয় নহে। সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে হইবে।

রোগের প্রথম অবস্থায় স্বাস্থ্য-নিবাসে আশ্রয় লাভ করা মন্দ নহে। সেই সময় হইতে সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিলে শীঘ্র রোগমুক্ত হইবার সম্ভাবনা। রোগীর অবস্থা, স্বাস্থ্য-নিবাসের দূরত্ব ও পথের সুবিধা-অসুবিধা, স্থানান্তরিত করিবার যান-বাহন প্রভৃতির অবস্থা—এইসকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রোগীকে স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মোটের উপর, রোগীর স্বাচ্ছন্দ ও রোগ বৃদ্ধি না হয়, এই দুই দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রতিষ্ঠান-পরিচয়

সরোজ-নলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতি

উদ্দেশ্য ও কার্য্য-বিবরণী

বঙ্গনারীগণের কল্যাণার্থে উৎসর্গীকৃত-প্রাণা পূণ্যবতী স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত এম, বি, ই মহাশয়ার স্মৃতি রক্ষার জন্য, তাঁহার আরব্ধ কর্ম্ম পরিচালন করিবার ভার এই সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত দুই বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন নগরে এবং পল্লীতে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই নারী-প্রতিষ্ঠান জাতির জীবনে নারীজাগরণের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছেন।

স্বাবলম্বনই উন্নতির মূল সোপান। তদনুসারে সরোজনলিনী দত্ত নারী-প্রতিষ্ঠান গ্রামে গ্রামে মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এযাবৎ বিভিন্ন জেলায় ১৫১টি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মেয়েরা সমিতির ভিতর দিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বাবলম্বন, পরস্পরের সাহায্যে স্বায়ত্ত-শাসন এবং সমাজ সেবার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

পল্লীগ্রামে সমিতির কার্য্য।

(১) সমাজ-সেবা—মহিলা-সমিতিগুলি গ্রামের নারীদের মধ্যে একটি সমাজ-সেবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়। সমিতির নিয়ম অনুসারে পরস্পর মেশামেশি, ভাব বিনিময় এবং আদান প্রদানের ফলে সকলের মধ্যে প্রকৃত আত্মীয়তা এবং মিলনের পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ও মিলনের প্রভাবে তাঁহারা অনেক কল্যাণমূলক কার্য্য করিতে পারিতেছেন।

(২) স্বাস্থ্যের উন্নতি—মহিলা-সমিতির প্রভাবে শিশুমাতা ও প্রসূতিদের জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। বহু স্থানে অশিক্ষিতা ধাইদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মহিলা-সমিতির মধ্য দিয়া যাহাতে মেয়েরা স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগ নিবারণের উপায়, রোগী-শুশ্রূষা প্রভৃতি শিখিতে পারেন, সে জন্য সমিতির সভায় আলোচনা, প্রবন্ধ-পাঠ হইয়া থাকে এবং কেন্দ্রীয় সমিতির নিযুক্ত প্রচারকগণ ম্যাজিক-লণ্ঠন সাহায্যে বক্তৃতা দিয়া ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান-লাভে সাহায্য করেন।

(৩) গৃহ-শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা—মহিলা-সমিতির ভিতর দিয়া গৃহ-শিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। গৃহ-শিল্প শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে অনেক পরিবারের আর্থিক কষ্টের লাঘব হইয়াছে। অনেক বিধবা ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ পরিবার এই উপায়ে জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। সেলাই, ছাঁটকাটের কাজ, চিকনের কাজ, জরির কাজ, বস্ত্রবয়ন, কার্পেট প্রস্তুত, লেস প্রস্তুত, তোয়ালে বোনা, পাপোষ, মোজা ও খেলনা প্রস্তুত, নানা প্রকার মনিহারি জিনিষ, জ্যাম, জেলি, চাট্‌নি প্রভৃতি গৃহ-শিক্ষা মহিলা সমিতিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৪) বালক-বালিকাগণের শিক্ষা—বালক-বালিকাগণের উপর্য্যুপরি শিক্ষা বিষয়ে যাহাতে জননী-গণের আগ্রহ জাগরিত হয়, সে বিষয়ে মহিলা সমিতিগুলি চেষ্টা করিয়া থাকেন। অনেক স্থানের মহিলা-সমিতি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিচালন করিতেছেন।

(৫) মহিলাদের শিক্ষা—মহিলা-সমিতিগুলি পরিণত বয়স্থা মেয়েদের উপযুক্তরূপ শিক্ষা, শিল্পের জন্য সাময়িক ও মাসিক পত্র পাঠ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগ নিবারণের উপায়, মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল এবং অন্যান্য জ্ঞান চর্চ্চার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সমিতির শিক্ষিতা মহিলাগণ অশিক্ষিতা মহিলাগণকে লেখা পড়া শিক্ষা দেন।

কেন্দ্রীয় সমিতির কার্য্য।

(১) কেন্দ্রীয় সমিতি কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অবৈতনিক নারী শিল্প-শিক্ষালয় পরিচালন করেন।

(২) শিল্প-শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান প্রচার করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি প্রচারক ও শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ করেন।

(৩) কেন্দ্রীয় সমিতি বঙ্গদেশে বিভিন্ন জেলায় ১৫১টি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে চালাইবার জন্য সাহায্য, উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া থাকেন।

(৪) কেন্দ্রীয় সমিতি "বঙ্গলক্ষ্মী" নামক একখানি মেয়েদের কল্যাণমূলক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।

আবেদন।

সমিতির সমস্ত বিভাগের কার্য্য পরিচালনের জন্য মাসিক প্রায় তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়। সমিতির একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ঠিক করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ২ লক্ষ টাকা তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা সর্ব্ব-সাধারণের নিকট আবেদন করিতেছি যে, এই জাতীয় উন্নতির কার্য্যে তাঁহার সমিতিকে যথাসাধ্য সাহায্য করুন। সমিতির কার্য্যালয়—৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। টাকা-কড়ি সমিতির কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য যে-কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-বিবরণী স্বাস্থ্য-সমাচারের দুই পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিয়া পাঠাইলে, তাহা সাদরে প্রকাশিত হইবে।

মুষ্টিযোগের ঝুলি।

[শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র-সংগৃহীত]

হাতের ঘাম নিবারণের উপায় ঃ—যাঁহাদের হাত অতিরিক্ত ঘামে, তাঁহারা যদি গরম জলে সামান্য ফটকিরি বা ভিনিগার মিশাইয়া সেই জলে মধ্যে মধ্যে হাত ধুইয়া ফেলেন ও তাহার উপর কিছু কাল ময়দা অথবা বোরিক এসিড পাউডার মাখাইয়া রাখেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

জিহ্বার ঘা নিবারণের উপায় ঃ—দাঁত মাজিবার বুরুসে একটু কর্পূর ছড়াইয়া দাঁত মাজিলে দাঁত পরিষ্কার হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা লাগিয়া জিহ্বায়ও ঘা হইতে পারে না।

হাঁচি থামাইবার উপায় ঃ—যখন হাঁচি কোন মতেই থামিতে চাহে না, তখন একটী ফুটন্ত গরম জল-ভরা পাত্রের উপরে নাক রাখিয়া সেই বাষ্প নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানিয়া লইলে হাঁচি থামিয়া যাইবে।

হেঁচ্‌কি থামাইবার উপায় ঃ—হিক্কা বা হেঁচ্‌কি উঠিতে থাকিলে, এক চাম্‌চে দানাদার চিনি ও ভিনিগার খাইলে তৎক্ষণাৎ ইহার উপশম হইবে ; যদি একবার প্রয়োগে একান্তই না থামে, তবে আর একবার ব্যবহার করিবেন।

হাত-পা ফাটার পরীক্ষিত ঔষধ ঃ—উনানের আগুনের উপরে একখণ্ড মাংস ঝলসাইয়া লইবার জন্য ধরিবেন ; দেখিবেন উহা হইতে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়িতে থাকিবে। সেই রস একটী পাত্রে রাখিয়া উহার সহিত সম পরিমাণ চিনি মিশাইয়া ফাট-ধরা স্থানে মালিস করিলে ফাটা অচিরে সারিয়া যাইবে।

অত্যধিক পরিশ্রম-জনিত ক্লান্তি নিবারণের উপায় ঃ—বেশী হাঁটিয়া, দৌড়াদৌড়ি করিয়া বা পরিশ্রমযুক্ত যে-কোন খেলার পর যদি বেশী হাঁপাইয়া বা ন্যাতাইয়া পড়েন, তাহা হইলে এক টব গরম জলে আধ পোয়া ভিনিগার মিশাইয়া স্নান করিয়া ফেলিবেন ; দেখিবেন আপনার শ্রান্তি ও ক্লান্তি এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যাইবে।

চোখের অঞ্জনীর পরীক্ষিত ঔষধ ঃ—(১) জলে কিছু লবণ মিশাইয়া সেই জল গরম করিয়া তদ্বারা অঞ্জনী ধুইয়া ফেলিলে অতি শীঘ্র তাহা মিলাইয়া যায়। (২) অল্প পরিমাণ ব্রাণ্ডির সহিত জল মিশাইয়াও চক্ষু ধুইতে পারেন, এটীও ভালো ঔষধ।

স্নায়ু-বেদনার ঔষধ ঃ—স্নায়ু-বেদনা (Neuralgia) রোগে, নিঃশ্বাসের দ্বারা নাকের ভিতর সূক্ষ্মচূর্ণিত লবণের নাশ লইলে বিশেষ উপকার হয়।

ফুস্‌কুড়ি ও ঘামাচীর ঔষধ ঃ—ফুস্‌কুড়ি, ঘামাচী প্রভৃতি ছোট-খাট চামড়ার রোগে যদি স্নানের জলে কিছু শুষ্ক "জই-চূর্ণ" মিশাইয়া স্নান করেন, তাহা হইলে দুই তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত মিলাইয়া যাইবে।

চক্ষু উঠার পরীক্ষিত ঔষধ ঃ—কয়েক ফোঁটা পাতি লেবুর রস দিয়া পতিলেবুর শিকড় বাটিয়া চক্ষুর উপরে ও নীচে প্রলেপ দিলে (যেন চক্ষের ভিতর না লাগে) দুই একদিনের মধ্যেই চক্ষু উঠা সারিয়া যায়।

দদ্রু রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ঃ—ধূপ, গন্ধক, সোহাগা ও ফটকিরি প্রত্যেকটী ১ তোলা পরিমাণ লইয়া উত্তমরূপে জল দ্বারা বাটিয়া দাদের উপর প্রলেপ দিলে, বহুদিনের পুরাতন দাদ পর্য্যন্ত ভালো হইয়া যায়।

দাঁতের গোড়া ফুলিয়া বেদনার পরীক্ষিত ঔষধ ঃ—দাঁতের গোড়া ফুলিয়া বেদনা হইলে, নারিকেলের কাঁচামূল ছটাক পরিমাণ ও সামান্য ফটকিরি খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া, ঐ ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা গার কুল্লি করিলে ২।১ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

আগুনে পোড়ার অন্যান্য প্রতিকার ঃ—(১) হঠাৎ শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ সেইখানে যদি লঙ্কা গাছের পাতার রস দেওয়া যায়, তবে জ্বালা যন্ত্রণা তখনিই থামিয়া যায় এবং ফোস্কা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পরীক্ষিত।

(২) দেহের কোন স্থান পুড়িয়া যাইলে সমান ভাগে মসিনার তৈল ও চূণের জল মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

(৩) উষ্ণ জল বা বাষ্পের দ্বারা শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া যাইলে Bicarbonate of Sodaর সহিত অল্প জল মিশাইয়া মলমের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া দগ্ধ স্থানে প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীর ভারবোধের প্রতিকার ঃ—মাথায় ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীর ভার হইলে একটী বাটিতে খানিকটা গরম জল লইয়া তাহাতে এক টুকরা কর্পূর ফেলিয়া ঐ বাটির উপর খানিকক্ষণ মুখ রাখিয়া দিবেন অর্থাৎ যাহাতে ঐ জলের বাষ্প আপনার মুখে লাগে ; দেখিবেন অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার শরীর কত হালকা হইয়া গিয়াছে।

শুয়া পোকার পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ ঃ—(১) শুয়াপোকা লাগিলে শরীরের সেই স্থানে ২।৩ বার তেলাকুচা পাতার রস মাখাইলে চুলকানি ও ফুলা তৎক্ষণাৎ সারিয়া যায়। (২) কেন্দুড়ে পাতার রস বা কেঁদ্‌রা শাকের রস শুয়াপোকা লাগিলে সেইস্থানে ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে আশু উপকার হয়, এমন কি শুয়াপোকা লাগা-জনিত ক্ষত পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়া যায়।

বৃশ্চিক দংশনের ঔষধ ঃ—(১) বৃশ্চিক (যে কোন প্রকার, মায় কাঁকড়া বিছা) দংশন করিলে সেই স্থানে "শশাপাতার রস" প্রয়োগ করিলে সমস্ত যন্ত্রনার তৎক্ষণাৎ উপশম হইয়া যায়। পরীক্ষিত। (২) কাঁকড়া বিছা দংশন করিলে সেইস্থানে "মধু"র প্রলেপ দিবা মাত্রই সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য হইয়া যায়। (৩) বোলতা, ভিমরুল, বৃশ্চিক প্রভৃতির দংশনে অনেক সময়ে "সীরাপ" (যাহা গ্রীষ্মকালে পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়) প্রয়োগের যন্ত্রনা নিবারণ হয়।

শিশু ও বালকদিগের কাণপাকা রোগের ঔষধ ঃ—শিশু ও বালকদের কাণপাকিয়া পূঁয নির্গত হইলে কাণের মধ্যে ২।৩ বার সীরাপ (যাহা পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়) প্রয়োগ করিলে আশু উপকার দর্শে।

মশক নিবারণের উপায় ঃ—ত্রিফলা, অর্জ্জুন পুষ্প (অভাবে ছাল), শিরীষ পুষ্প (অভাবে ছাল), গালা, ধুনা, গুগগুল ও সরিষা সম পরিমাণ এবং ভেলা ও বিড়ঙ্গ কিঞ্চিৎ বেশী পরিমাণ (দ্বিগুণ হইলেই যথেষ্ট) একত্রে কুটিয়া কিঞ্চিৎ আগুণ করিয়া ধুনা দিবার ন্যায় জ্বালাইলে সেই স্থানে মশা বা মাছি থাকিতে পারিবে না। পরীক্ষিত !

ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইবার সম্ভাবনা হইতে মুক্তিলাভ ঃ—শীতের সকালে প্রত্যহ সামান্য লবণ-মিশ্রিত জলে গামছা ডুবাইয়া গলা হইতে বুক পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি মাজিয়া লইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

গলায় মাছের কাঁটা আটকানোর প্রতিকার ঃ—গলার ভিতরে মাছের কাঁটা আটকাইয়া যাইলে তৎক্ষণাৎ এক টুকরা লেবু খাইয়া ফেলিলেই তাহার প্রতিকার হইবে।

দুগ্ধ রক্ষা করিবার উপায় ঃ—(১) ১ সের দুধে ২০ গ্রেণ Bicarbonate of Soda মিশাইয়া দিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দুধ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। (২) বোরিক এসিডের জলে দুধের পাত্র ধৌত করিয়া লইয়া তাহাতে দুধ রাখিলে সহজে নষ্ট হইবার ভয় থাকে না।

দুগ্ধ পুড়িয়া যাওয়ার প্রতিকার ঃ—দুধ যদি অল্প পুড়িয়া বা ধরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ উনান্ হইতে কড়া নামাইয়া ঠাণ্ডা জলের মধ্যে কানা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া

দুধের সঙ্গে এক টিপ লবণ মিশাইয়া দিবেন। দেখিবেন দুধের পোড়া স্বাদ আর থাকিবে না।

ছেঁড়া দুধের গুণ ঃ—ছেঁড়া দুধ মাখিলে মুখ, গলা প্রভৃতির ছোট ছোট দাগ উঠিয়া যায়, ফাটা ও চামড়ার কর্কশতা দূর হয়, গাত্রের রং পরিষ্কার হয় এবং রৌদ্র-দগ্ধ প্রভৃতির বিবর্ণতা দূর হইয়া মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

পেঁয়াজ ছাড়াইবার কৌশল ঃ—যদি শিকড়ের দিক হইতে পেঁয়াজের ছাল ছাড়ানো যায়, তাহাহইলে চক্ষুতে জল আসিবে না।

শিক্ষাভাবে সর্ব্বনাশ!

শিক্ষার অভাবে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পল্লীগ্রামে দুষ্ট লোকে অভাবগ্রস্ত পল্লীবাসীদের ভয় দেখাইয়া কিরূপে অর্থ আদায় করে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলায় অনেক স্থানে এবার অত্যন্ত কলেরা দেখা দিয়াছে। শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভ হইতে এ যাবৎ রোগের প্রকোপ সমভাবে চলিতেছে। গ্রামের লোকেরা আতঙ্কে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেছে। কে কাহাকে দেখে তাহার ঠিক নাই। অনেক স্থলে মৃতদেহের সৎকার পর্য্যন্ত হইতেছে না। ফলে রোগ আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। পত্র-লেখক রোগ বৃদ্ধির একটী গুরুতর কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। সহসা তাহাতে বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। তিনি বলেন, 'ফকির' 'গণৎকার' প্রভৃতি শ্রেণীর একদল লোক কলেরা-চিকিৎসক সাজিয়া গ্রামের লোকদের ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিতেছে। তাহারা গ্রামবাসীদের বলে যে, কলেরা রোগ তাহাদের আজ্ঞাবহ, আমাদের আদেশে চলো। যাহারা তাহাদিগকে টাকা দিবে, তাহাদের গ্রামে কলেরা হইবে না। যাহারা টাকা দিবে না, ফকিরেরা তাহাদের গ্রামে কলেরা চালনা করিবে। আর বাস্তবিকও তাহারা গ্রামবাসীদের ভীতি প্রদর্শন ও তাহাদের শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য কলেরা চালনা করিয়া থাকে; তবে তাহা মন্ত্রতন্ত্রের জোরে নহে—স্বাভাবিক উপায়েই করিয়া থাকে। পত্র-লেখক বলেন, ফকিরেরা কলেরা প্রপীড়িত স্থান হইতে কলেরার বীজ সংগ্রহ করিয়া দূরবর্ত্তী কোন গ্রামের জলাশয়ে উহা নিক্ষেপ করে; এবং গ্রামবাসীদের ভয় দেখায় যে, তোমাদের গ্রামে কলেরা চালান করিয়াছি। দুই এক দিন পরে গ্রামে কলেরা আরম্ভ হইয়া তাহাদের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করে। ফলে গ্রামবাসীরা টাকা দিতে পথ পায় না। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় শুনা গিয়াছিল, জার্ম্মানেরা নানা রোগের বীজ জলাশয়ে নিক্ষেপ করিয়া শত্রু নিপাত করিত; কিন্তু ধরা পড়িলে শত্রু হস্তে প্রহার-লাঞ্ছিত করিয়া প্রাণে মরিত। আমাদের দেশের গ্রামবাসীরা সে উপায় জানে না। ইহার প্রতিকারের উপায় একমাত্র শিক্ষার বিস্তার।

ভি-পি-ফেরৎদাতাদের নির্ঘণ্ট!

(আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

যাঁহারা এবারকার স্বাস্থ্য-সমাচারের বৈশাখ সংখ্যা গ্রহণ করিয়া মূল্য দেন্ নাই এবং জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় সংখ্যা ভি,-পি, পূর্ব্বাহ্নে কোনো সংবাদ না দিয়া, নিতান্ত অন্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে ফেরৎ দিয়া এই দরিদ্র সংঘকে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছেন তাঁহাদিগের বাকী কয়েকজনের নাম-ধাম নিম্নে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল। গ্রাহকগণকে ও সমব্যবসায়ীদিগকে এই সকল অকরুণ মহোদয়গণের নাম কিছুদিন স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।...

ডাক্তার শ্রীযুত সুরেন্দ্রলাল গোস্বামী ; পোঃ আঃ হেমনগর ; মৈমনসিংহ। অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ; প্লীডার্স রোড ; দার্জিলিং। ডাক্তার এস, সি, সেন ; ওয়া ঔষধালয় ; পেগু ; বর্ম্মা। ইন্দ্র নারায়ণ রায় ; রাজমহল। গোপাল চন্দ্র পালিত, প্লীডার ; উলুবেড়িয়া ; হাওড়া। ডাক্তার ভূপেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী ; রামগড়হাট ; পোঃ আঃ ফলতা, ২৪ পরগনা। হরেন্দ্র নাথ দাস, জমীদার ; লক্ষ্মীপুর ; পোঃ আঃ দালালবাজার ; নোয়াখালী। হেড্ মাষ্টার, আলুগ্রাম মধ্য ইংরাজী স্কুল ; পোঃ আঃ শীজগ্রাম ; মুরশিদাবাদ। এস, এল, দত্ত ; ৭৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রোহিণী কুমার দে ; গ্রাম শ্রীরামদী ; পোঃ আঃ পুরানবাজার ; ত্রিপুরা। সম্পাদক, ভোলা লাইব্রেরী ; ভোলা ; বরিশাল। উপেন্দ্র মোহন পণ্ডিত ; গ্রাম রাজাপুর ; পোঃ সাহাতলী ; ত্রিপুরা। নিতাই চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; পোঃ বেলমুড়ী ; হুগলী। নাজিমুন্নিসা বিবি ; কেয়ার অফ্ এ হেওয়া, বি, এ ; ৭২।১ তালতলা লেন ; কলিকাতা। হেড্ মাষ্টার, কলিজিয়েট স্কুল ; মেদিনীপুর। হরিপদ রায় ; গ্রাম ভদ্রাসন ; পোঃ বন্দর ; ঢাকা। সম্পাদক, শান্তি সেবক-সঙ্ঘ ; মুকলী শান্তি আশ্রম ; পোঃ বেরুনিয়া, মৈমনসিংহ। মহেশ চন্দ্র দাস ; মাহিষ্য হোষ্টেল ; সুনামগঞ্জ ; শ্রীহট্ট। গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; রামির দিঘির উত্তর ; কুমিল্লা, ত্রিপুরা। অবনী মোহন দাস ; পোঃ বসুলপুর ; গ্রাম সাহাপুই ; বর্দ্ধমান। ডাক্তার শশাভূষণ মাইতি ; গ্রাম, যোগীখোপ ; পোঃ কাগছিয়া ; মেদিনীপুর। শৈলেশ চন্দ্র কর, উকিল ; মৌলভি বাজার ; শ্রীহট্ট। প্রফুল্ল কুমার সেন ; গরিব ঔষধালয় ; পোঃ ডোমার, রঙ্গপুর। জাবাদ আলী ; নাগেরগাঁও ; পোঃ চটল ; মৈমনসিংহ। ডাক্তার আফতা-বুদ্দিন সরদার ; জেয়নপুর ইলিশিয়াম ঔষধালয় ; পোঃ মহাদেবপুর ; রাজসাহী। দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র রক্ষিত ; পোঃ বোয়ালিয়া, মিরজাপুর বাজার, ভায়া জয়দেবপুর ; ঢাকা। সুরেশ চন্দ্র মিত্র ; পোঃ নাকালিয়া ; পাবনা। সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসায়িটি ; পোঃ কামায়ুট, রেঙ্গুন। সন্তোষ চন্দ্র ভুঁইয়া ; গ্রাম পৌনা, পোঃ গোপালচক ; মেদিনীপুর। ডাক্তার সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ; পোঃ কুমারুলী ; মৈমনসিংহ। মুন্সী আবদুল গফুর মিয়া ; গ্রাম আজমোতা ; পোঃ নগরবান্দা, রঙ্গপুর ; বিহারী লাল বার ; গ্রাম চকগরুপোতা ; পোঃ মনিয়া ; মেদিনীপুর। সম্পাদক, তরুণ সঙ্ঘ ; গ্রাম বিটরা ; পোষ্ট সাচর ; ত্রিপুরা। যতীন্দ্র চন্দ্র নন্দী ; পোঃ কিশোরগঞ্জ ; মৈমনসিংহ। রমণীমোহন ধর ; কামঠানা ফরেষ্ট অফিস, পোঃ চারোয়া ; ত্রিপুরা। প্রভাকর মণ্ডল ; কেয়ার অফ, কেশরগঞ্জ পাঁচওয়াই দোকান ; পোঃ কালীপাহাড় ; বর্দ্ধমান। হলধর ঘোষাল, সহকারী শিক্ষক ; বরানগর ভিক্টোরিয়া এইচ্ ই স্কুল ; বরানগর ; ২৪ পরগণা। এন্ রায়, জমীদার ; ইষ্ট এণ্ড হাউস্ ; ওয়ারী ঢাকা। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল চৌধুরী : কেয়ার অফ সম্পাদক, শান্তি বিতরণী, গ্রাম ও পোঃ আনওয়ারা, চট্টগ্রাম।

বসন্ত মোহন মজুমদার ; পোঃ ধরমটুল, নওগং, আসাম। হেড মাষ্টার ; সাকপুরা এইচ, ই, স্কুল ; পোঃ বোয়ালখালী ; চট্টগ্রাম। হেড মাষ্টার, শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনিষ্টিটীয়ুট, শ্রীরামপুর ; হুগলী। বীরেন্দ্রকুমার রায় বর্ম্মণ, সম্পাদক, কমন রুম, কলেজ হিন্দু হোষ্টেল নং ১, শ্রীহট্ট। মনসা কুমার দে কবিরত্ন ; চক্রশলা ; পোঃ অলিরহাট ; চট্টগ্রাম। শৈলেশ চন্দ্র বড় ভুঁইয়া ; সম্পাদক, কাচার সমাজ সেবক সঙ্ঘ ; পোঃ সোনাইমুখ ; কাচার। কবিরাজ যজ্ঞেশ্বর মোহন লোধ ; কেয়ার অফ বাবু ঈশ্বর চন্দ্র লোধ ; পোঃ বাবুরহাট ; গ্রাম তরপুরচণ্ডী ; ত্রিপুরা। মৌলভী আব্দুল বারী ; পোঃ বাসাইল ; মৈমনসিংহ। পি, এল্ বরুয়া ; পোঃ তাউই, পেগু, বর্ম্মা। এস্ কে মিত্র ; গ্রাম, দেওয়ানজীপাড়া ; পোঃ ঘনীয়ার পাড় ; ত্রিপুরা। ডাক্তার এন্, জী, মুখোপাধ্যায় ; ফরাক্কাবাদ। গুরুপদ মিত্র ; গ্রাম যোগলা ; পোঃ কেচুয়াদুবী ; যশোহর। কিরণ চন্দ্র লাহিড়ী ; ১৩ নং রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট ; উত্তরপাড়া। হেমচন্দ্র সেন ; গ্রাম শিশুহাটী ; পোঃ গোপাল বাগান ; জলপাইগুড়ী। মহিম চন্দ্র দে ; কাড়ুবীচেরা ; শ্রীহট্ট। ডাক্তার বিপিন বিহারী মণ্ডল ; গ্রাম কালীমিখালী ; পোঃ বিষ্ণুপুর ; ২৪ পরগণা। সূর্য্যময়ী জানা ; হেড মাষ্টার, বালুগ্রাম এম্, ই স্কুল ; পোঃ বালুকুদ ; কটক। শ্রীমতী বসন্তবালা দেবী ; কেয়ার অফ, বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ, মোক্তার ; বগুড়া। ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার ; লাইব্রেরীয়ান, হাপানীয়া নিমাই স্মৃতি পাঠাগার, পোঃ ডুবলিয়া ; পাবনা। গিরীশ চন্দ্র ; হেড মাষ্টার ; এম্, এন্, ইনিষ্টিটীয়ুট ; গোপালগঞ্জ ; ফরিদপুর। কাশীমুদ্দিন আহাম্মদ ; কেয়ার অফ, ডাক্তার আজীমুদ্দিন আহাম্মদ ; গ্রাম বিনটেয়ার ; পোঃ বিরোল ; দিনাজপুর। হেমনাথ ফুকান ; আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ; পোঃ শেলেঙ্গা ঘাট, শিবসাগর ; আসাম। কে, এস্, বরুয়া ; কম্পাউণ্ডার, মেরিন হাঁসপাতাল ; পোঃ মোমিক ; বর্মা। সম্পাদক, কর্ণমধু ক্লাব ; পোঃ করিম গঞ্জ ; শ্রীহট্ট। শ্রীমতী কনকলতা দেবী ; কেয়ার অফ বাবু মোহিনী মোহন রায় ; গ্রাম বকুরবাড়ী ; পোঃ ঘনীয়ার চর ; ত্রিপুরা। রমণী রঞ্জন দত্ত ; গ্রাম হাবিলাসপুর ; পোঃ বোয়াল্‌খালী ; চট্টগ্রাম। নন্দলাল সাহা ; গাজার দোকান ; পোঃ নবীনগর ; ত্রিপুরা। ডাক্তার আর, কে সরকার ; পোঃ চাঁপানলা ; নওগাঁ। সুরেন্দ্র নাথ সাহা, পোঃ কুয়ারপুর ফরিদপুর। ইন্দ্র চন্দ্র আমিন ; গ্রাম নাগেরহাট ; পোঃ কুকুটিয়া, ঢাকা। জিতেন্দ্র লাল নাগ ; গ্রাম পারিও ; কৈলোয়ার, পাটনা। শ্রীমতী সুধালতা দেবী ; কেয়ার অফ, বাবু সুবোধ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জমীদার ; পোঃ রুদ্রাকর ; ফরিদপুর। নবীন চন্দ্র ভৌমিক ; গ্রাম জয়নগর ; পোঃ বারুরাবাজার ; ত্রিপুরা। নগেন্দ্রনাথ মুখার্জী ; ধানবাদ, ই, আই, রেলওয়ে। সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; ৬ হাড়কাটা লেন ; কলিকাতা। লাইব্রেরীয়ান বর্দ্ধমান রাজ কলেজ ; বর্দ্ধমান। শ্রীমন্ত সাহা ; লোহাগড়, নতুনবাড়ী, যশোহর। মহম্মদ শরিয়ৎউল্লা দালাল ; পোঃ কলারোয়া ; খুলনা। কবিরাজ কৃপাচরণ দত্ত ; পোঃ ডাঙ্গাবাজার ; ঢাকা। জে, এম্, রায় ; ১৬৩।১ মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট ; কলিকাতা। দীননাথ পাকড়াশী ; এস্ ডি ও'র অফিস ; কাঁথী ; মেদিনীপুর। হরিপদ ঘটক ; কেয়ার অফ বাবু এম্, সি ঘটক ; কাঞ্চন রোড, ঘাষীপাড়া ; দিনাজপুর। কবিরাজ রামকৃষ্ণ কবিরত্ন ; ৮৩ দশাশ্বমেধঘাট রোড ; বেনারস সিটী। সুধাংশু মোহন দেব ; পোঃ ফুলছড়ী ; রঙ্গপুর।

ভ্রম-সংশোধন—গত আশ্বিনে শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ (গ্রাহক নং ৫৫৫) মহাশয়ের নাম ভ্রমক্রমে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি বার্ষিক চাঁদা দিয়াছেন।

—:০:—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৬শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৩৪ সাল | ৯ম সংখ্যা

বাঙ্গলার মেয়েদের স্বাস্থ্য *

[ডাক্তার শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ, এম্-বি, বি-সি (ক্যান্টাব)]

আজকে আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদের সমক্ষে—মায়েদের কাছে কিছু বল্‌বার জন্য আহুত হয়েছি। আমাদের দেশে মায়েদের ও মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিবেদন কর্‌তে চাই। আগেকার ঠাকুরমা দিদিমার মত এখনকার মেয়েদের স্বাস্থ্য নাই ; ২০ বৎসর গবেষণা করে যা দেখ্‌ছি, তাতে বোঝা যায়—উন্নতি না হয়ে অবনতির মাত্রা বেড়ে চলেছে, দারিদ্র্য বেড়ে গেছে—সব গরীব হয়ে পড়েছে, ভালরকম খেতে পায় না, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পরিবারের স্ত্রীলোকদের পুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া বড়ই কম জোটে ; সেইজন্য তাদের শরীর অত ভেঙ্গে পড়েছে।

রোগ মুক্ত হওয়ার অবস্থা আর স্বাস্থ্য এক জিনিস নয়। সংসারের কাজ সমাধান কর্ত্তে হলে—মনোবৃত্তির ও উন্নতি সাধন কর্‌তে হবে ; বিদ্যা-বুদ্ধি-বিবেচনা ও সাধারণ জ্ঞান বাড়বে, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পুষ্টি হবে। দেহ মন দুই ভাল থাক্‌লে তবেই তাকে ভাল স্বাস্থ্য বল্‌ব।

এখন হয়েছে রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য চেষ্টা ও কোন গতিকে দিন কাটানো। কিন্তু সে চেষ্টা সকল সময়েই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অনুমোদিত হয় না। তার উপর অনেক সময় আমাদের উপেক্ষায় ও সামান্য সাধারণ জ্ঞানের অভাবে, ছোট ছোট রোগ-বীজাণু নানা উপায়ে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, আর আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি তাদের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করে ; কাজেই এর ফলে সব সময় আমরা রোগাক্রান্ত না হয়ে পড়্‌লেও হীনবল ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য হয়ে পড়ি।

* গত ২১শে নভেম্বর তারিখে নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট-গৃহে ২৯ নং ওয়ার্ড-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার মূলাংশ। শ্রীযুগেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

বলবান না হ'লে কোন কাজ করতে পারা যায় না, ভুগ্‌তেই দিন কেটে যায়। খাদ্যে যদি ভেজাল মিশ্রিত থাকে বা তা যদি অপর্য্যাপ্ত হয়, তা'হলে শরীরেরও পুষ্টি হয় না, মনেরও বিকাশ হয় না। আমরা ছেলেবেলায় ইস্কুলে রোজ ৩।৪ মাইল হেঁটে যাওয়া-আসা করেছি; কিন্তু এখন ১৬।১৭ বৎসরের ছেলেদের এক মাইল যেতে হ'লেই tram, motor bu এর দরকার হয়ে পড়ে। এতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, শরীরে যতটা শক্তি থাকা দরকার, তা আমাদের ছেলেদের ভিতর থেকে সুস্পষ্ট কমে যাচ্ছে। স্কুলের ছেলেরা প্রায় ক্লাসে এসে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে ভাই, আজ এলি কিসে করে'? অর্থাৎ যান-বাহনাদিতে school-এ-না-আসা-ব্যাপারটা তারা যেন রীতিমত বিস্ময়ের চোখে দেখে। এ কি কম লজ্জার কথা!

আমি ছেলেবেলায় হরিদ্বারে ছিলাম। সেখানে খুব খাঁটি দুধ আর গঙ্গার পরিষ্কার জল খেতাম, আর সুযোগ পেলে পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়িয়ে বেড়াতাম। তারপর লক্ষ্ণৌএ গোমতীর ও প্রয়াগে পবিত্র গঙ্গা-যমুনার জলে ও পশ্চিমের সুনির্ম্মল হাওয়ায় আমার শরীর তৈরী হয়েছিল। তাতে এখনও বেশ শক্তি রয়েছে, আরও ১০।২০ বৎসর বেশ যাবে বলে' মনে হয়। তাই বল্‌ছি, বাল্যকাল থেকেই ভাল বিশুদ্ধ খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রেখে শরীরে শক্তি আছে কি না দেখতে হবে। এক বাড়ীতে রোগ হল, ২।৪ জন ভুগ্‌ল আর ২।১ জন মারা গেল। তারা ছেলেবেলায় ভাল খাওয়া-দাওয়া করে' রোগের সঙ্গে লড়াই কর্‌বার উপযুক্তরূপ শক্তি অর্জ্জন করে নি; তাই যুজ্‌তে পারলে না—মরে' গেল।

আজকাল দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ১৭।১৮ বৎসরের ছেলে-মেয়ে হঠাৎ রাত্রে অসুখে পড়্‌ল, তার পরদিন সকালে সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেল। এরও কারণ ঐ—ছেলেবেলায় পুষ্টিকর খাবারের অভাব; নয়ত ২।৪ বৎসর আগে ভারি অসুখে ভুগেছিল, বাহিরে রোগ না থাক্‌লেও, ভেতরে সেই রোগের ২।৪টি বীজাণু লুকিয়ে ছিল; তাতেই তার রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি কম হ'য়ে গিয়েছিল, এত কম যে রোগ ধর্‌বামাত্র তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র যুজ্‌তে না পেরে মারা পড়্‌ল।

আমরা চেষ্টা কর্‌লে এই রকম রোগ ভোগ নিবারণ কর্‌তে এবং খুব সম্ভবতঃ এইরূপ হঠাৎ মৃত্যুর দিনটি পর্য্যন্ত পেছিয়ে দিতে পারি। আজকাল দেখ্‌তে পাওয়া যায়, পরীক্ষায় পাস কর্‌বার জন্য ছেলে বেলা থেকে ছেলেদের কত শক্তি ক্ষয় হ'য়ে যায়, তারা নানারকম রোগে অভিভূত হয়ে পড়ে। তারপর পরীক্ষায় পাস করে' ভালরূপ চাকরীর সংস্থান করতে না পেরে হয়ত দরিদ্রতা, দুশ্চিন্তা ও হতাশাকে জীবনের নিত্য সঙ্গী করে তোলে। কাজেই শক্তির সঞ্চার না হয়ে কেবল ক্ষয় হ'তে থাক্‌লে বাঁচা কি ক'রে সম্ভবপর হয়?

এ জগতে ভাল ক'রে বাঁচ্‌তে হ'লে মানুষ হবার মত এবং মানুষ কর্‌বার মত আমাদের সর্ব্ব প্রথমে জ্ঞানলাভ কর্‌তে হবে। আগে পল্লীগ্রামে বেশী লোক বাস করত; বর্ত্তমানে সহরে লোকাধিক্য ক্রমশঃ বেড়ে চল্লেও শতকরা প্রায় ৮৮ জন লোক এখনও গ্রামেই বসবাস করে; কেউ চাষ-আবাদ করে, কেউ মাল চালান দেয়, তালুকদারি করে বা যে কোরেই হ'ক তারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় এরা কোনও রকমে করে' নিতে পারেন বটে; কিন্তু বাঁচার মন্ত্র এদের নিকট একেবারে অজ্ঞাত। সেই জন্যই পল্লীতে এত রোগ ভোগ, এত অকাল মৃত্যু। সহরেও যাঁরা পুঁথিগত বিদ্যার্জ্জন করে' ও তিন চারিটা পাস করে' বড় চাকরীতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের কাছেও ঐ বাঁচার মন্ত্র সমানভাবে অজ্ঞাত। মানুষ হবার ও মানুষ কর্‌বার সুযোগ ও সুবিধা পেতে হ'লে আমাদের ভাল করে' এই বাঁচার মন্ত্রটি শিখ্‌তে হবে। তা না হ'লে জাতি-হিসাবে আমাদের উন্নতির আশা ত নেই, পরন্তু ধ্বংস অনিবার্য্য।

ছেলেদের প্রথম বর্ণ পরিচয় ও ভাষাজ্ঞান যেমন মায়ের কাছ থেকে ও মায়ের মুখ থেকে হয়, তেমনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানটি তাদের মায়ের মারফৎই দিতে হবে। কাজেই এখন আমাদের প্রথম এবং

প্রধান কর্ত্তব্য—বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রচার করা। সেকালে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে বাড়ীতে ঠাকুরমা-পিশিমার কাছ থেকে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ কর্‌ত; তারপর শ্বশুর-বাড়ী গিয়েও শাশুড়ি, দিদি-শাশুড়ি ও পাড়ার অন্যান্য প্রবীণাদের কাছ থেকে অনেক শিখ্‌ত। সকলে এক সংসারে মিলে মিশে থাক্‌ত, সংসারের সকল অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানেরও অনেক সুবিধা হত। কিন্তু আজ কাল সব বদ্‌লে গেছে। অনেককেই স্বামী নিয়ে একলা সহরে কিংবা বিদেশে থেকে সংসার কর্‌তে হয়; কাজেই সেই রকম অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভ করবার আর সুবিধা ঘটে না। তাই বলি, এখন মায়েদের নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের উদ্যোগে সাংসারিক জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌তে হবে; তা না হলে ছেলেপিলে মানুষ করাই যাবে না। মা ঠিক্ হ'লে তবে সংসার ঠিকভাবে চল্‌বে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজ কাল—কি সহরে কি পল্লীতে, শিশু-মৃত্যুর হার বৎসর বৎসর বেড়ে চলেচে। মায়েরা যদি প্রকৃত জ্ঞান লাভ না করেন, তা হলে তাঁদের শিশুদের প্রতি যত্ন ও সেবা উপযুক্ত রূপ হবে না; ফলে এই শিশু মৃত্যুর হার ক্রমশঃ এত বেড়ে যাবে যে, একটা পাড়া ঘুর্‌লেও একটি জীবিত শিশুর মুখ দেখ্‌তে পাওয়া দুর্ঘট হবে।

এখনও গ্রামে সব টাটকা শাক্-সবজি পাওয়া যায়, অনেক জায়গায় দুধ-ঘি-ও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু সহরে তরি-তরকারি সব বাসি, তার সার ভাগ সব বেরিয়ে গেছে। ফল কত দিনের পুরাণো—গাছ পাকানো, তার ভিতর পুষ্টিকর জিনিষ কিছুই নাই। হয়ত সস্তায় পাওয়া গেল, তাই লোকে দ্বিধাশূন্য হয়ে কিনে নিজেদের কাজে লাগিয়ে দিল। তারপর অন্যান্য খাবার জিনিষে—ঘি, দুধে পর্য্যন্ত ভেল ও ভেজাল নির্ব্বিবাদে চলেছে। ফলে আমরা নানা রকম রোগ-প্রবণ হ'য়ে পড়্‌ছি। ভগবানের দেওয়া প্রচুর ও বিনামূল্যের আলো বাতাস—যা মানুষের প্রাণ-ধারণের প্রধান উপকরণ, সহরে বাস করে' সেই দুটীও আমরা ভাল করে' উপভোগ কর্‌তে পাই না; যদি বা পাই দূষিত, দুর্ম্মূল্য ও পরের ধার-করা (Electric-light & fan)।

পাড়াগাঁয়ে এখনও এ সুবিধাটা অব্যাহত আছে; বিশুদ্ধ আলো বাতাস পাওয়া যায়, খাদ্যেও ভেজালের মাত্রা অনেক কম, বাসস্থানেরও এত ঘেঁসাঘেঁসি নেই। ফলে সেখানে ক্ষয় রোগেরও (Tuberculosis) ততটা বাড়াবাড়ি নেই।

যক্ষ্মায় পুরুষের চেয়ে মেয়েরা বেশী মরে। এর মধ্যে আবার যারা পর্দ্দানসীন, তাদের মৃত্যু-সংখ্যা আরও বেশী। পাড়াগাঁয়ে খড়ের চালের ঘরে শুয়ে স্ত্রীলোকেরা বেশ বিশুদ্ধ বায়ু পান; তার উপর ঘাটে জল আন্‌তে, কাপড় কাচ্‌তে, স্নান কর্‌তে অথবা পাড়ায় বেড়াতে যেতে এবং ঢেঁকিতে ধান ভান্‌তে বা জাঁতা ঘুরাতে তাঁদের বেশ একটু ব্যায়াম হয়। এতে সহরের মেয়েদের চেয়ে স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে, যক্ষ্মার মত অনেক মারাত্মক ব্যায়রামের হাত থেকে তাঁরা নিষ্কৃতি পান।

আজ কালকার ধনী লোকেরা সহরে থেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকেদের সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌ছেন। একে ছোট বাড়ী, এক একটি কুঠুরিতে কোনও রকমে ৪।৫ টি প্রাণী কায়-ক্লেশে মাথা গুজে থাকে; তার উপর বাড়ীর সাম্‌নে, পিছনে বা পাশে ৩।৪ তোলা বাড়ী তুল্লে গরীব প্রতিবাসীদের বাড়ীতে ভগবানের স্নেহের দান—ঐ আলো-বাতাস যাওয়ার পথটুকু একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর একলার সুখের জন্য ২০।২৫ বা ৫০টী প্রতিবাসীর অনিষ্ট হচ্ছে, তাতে তাঁর ভ্রুক্ষেপও নেই। মদগর্ব্বী বড় লোক এটাও বোঝেন না যে, তাঁর ঐরূপ বাড়ী করার জন্য প্রতিবাসীদের বাড়ীতে যে রোদ-হাওয়া যাওয়ার পথ বন্ধ হ'ল, তার ফলে তাদের নানা রকম সংক্রামক ব্যাধি হবে, আর ঐ ব্যাধির বীজ তাঁর বাড়ীতেও সদর্পে এসে ঢুক্‌বে। ভগবান যে এক দিন এই ধনগর্ব্বের বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নেবেন, তাঁর সে অমোঘ দণ্ডের হাত কেউ

এড়াতে পার্‌বে না—সে কথা ত্রিতলবাসী বাবু একবারও ভেবে দেখেন না।

সহরে থেকে মেয়েরা যাতে একটু ফাঁকা জায়গায় মাঝে মাঝে বেড়াতে পারেন, প্রত্যেক গৃহস্বামীর সে বিষয়ে দৃষ্টি থাকা দরকার। এজন্য Ladies' Park, গড়ের মাঠ প্রভৃতি আছে; (আরও Ladies' Park তৈরী করার জন্য আন্দোলন হওয়া দরকার) তা না হ'লে পাড়ায় পাড়ায় একটু বেড়াতে যাবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিৎ। তা ছাড়া প্রত্যহ বৈকালে ছাদের উপর কিছুক্ষণ পাইচারি করাও মন্দ অভ্যাস নয়। তা হ'লে মেয়েরা একটু বিশুদ্ধ বায়ু পেতে পারেন ও তার ফলে তাদের স্বাস্থ্যেরও অনেকটা উন্নতি হবে।

এই বার খাবার কথা কিছু বল্‌ব। সাদা ময়দা ও সরু চালে কিছু সার পদার্থ নেই—এটা জেনে রাখ্‌তে হবে। মোটা চাল ও লাল আটা খেলে অনেকটা সার পদার্থ পেটে যায়, শরীরেও শক্তির সঞ্চার হয় ও এবং বেরি বেরির মত কোনও অভাব-জনিত পীড়াও (deficiency disease) উপস্থিত হয় না।

পশ্চিমে দেশের লোকেরা আমাদের ছাই-ভস্ম-ভরা মাকাল ফল খাইয়ে, সব সার জিনিষগুলি নিজেদের দেশে জাহাজ বোঝাই করে' পাঠিয়ে দেন্। আমরা খাই সাদা ধবধবে পরিষ্কার, আর তাঁরা নিয়ে যান চোকা আর ভূষি—যা আমরা ফেলে দিই; নয়ত বড় জোর জানওয়ারকে খেতে দিই। তাঁরা কিন্তু ঘোড়াকে খাওয়াব বলে' নিয়ে গিয়ে নিজেরা উদরসাৎ করেন। আমরা সাদা চিনি, সস্তার ঘি ও ছোব্‌ড়ার মোহে মজে' নানা রং-করা খাবার খেয়ে রোগে ভুগে মরি। মোটা চাল আপনারা খেতে আরম্ভ করুন, ফল-ফুলারি বাড়ীতে যাতে টাট্‌কা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন, ও রঙ্গিন অসার জিনিষের মায়া ত্যাগ করে' শুদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য খেতে শিখুন্, দেখ্‌বেন অনেক রোগ নিবারিত হবে।

মায়েরা যদি বাঁচ্‌তে চান সব, আর ছেলেদের বাঁচাতে চান্, তা হলে জীবনের এই বিকৃত ধারাকে বদল কর্‌তে হবে—কুঅভ্যাসগুলিকে ত্যাগ কর্‌তে হবে। আগে লোকে ৭০।৮০ বৎসর অবধি বাঁচ্‌ত ও জীবন-ভোর রোগের মুখ খুব কমই দেখ্‌তে পেত। আজকাল পুরুষেরা ৫০ হলেই বুড়, আর মেয়েরা ৪০এর আগেই ঠাকুরমার মতন অথর্ব্ব হয়ে পড়েন।

আজকাল সহরে যে সব বাড়ী তৈরী হচ্ছে, সে সবগুলিকে এক একটি Electricএর বাক্স বল্লেই চলে। বাড়ীর দোর-জানলা খুল্‌লে বাহিরের আলো আসে না, দিনের বেলায় বিজলী বাতি না জ্বালালে দুই হাত দূরের লোক দেখা যায় না। আমি College Street-Marketএর ভিতর দেখেছি, বেলা ১০টার পর অনেক দোকানে বিজলী বাতি জ্বল্‌ছে, অথচ বাইরে রোদ খট্ খট্ করছে। এসব হচ্ছে বিলাতি কায়দা, তাদের নকল করা—ধার করা। সে দেশে ১২ মাসের মধ্যে ৯ মাসই এক রকম সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, বরফ আর কন্‌কনে বাতাসের ছড়াছড়ি। কাজেই সে দেশের ঘর-দোর সব ঐ রকম করে' তৈরী কর্‌তে হয়। তাই বলে কি আমাদেরও ঐ রকম কর্‌তে হবে? ২০ বৎসর আগে বিলাতে দেখেছিলাম, ইস্কুল ঘরের ছাদ এমন কায়দায় তৈরী করা যে, যখন ইচ্ছে সেটিকে খোলা ও বন্ধ করা যায়। সকালে ছাদ খুলে দিয়ে মুক্ত রোদ-বাতাসে ছেলে-মেয়েদের পড়ানো হচ্ছে আবার রাত্রে তুষার-পাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছাদ রীতিমত বন্ধ করে' দেওয়া হয়েছে। এ দেখেও কি আমাদের জ্ঞান হয় না? আমরা ত বিলাতের ঠিকঠাক্ নকল করি না, বিকৃত নকলই করে' থাকি। বিলাত একটু মিঠা রৌদ্র ও একটু ফাঁকা হাওয়া পাবার জন্য কি চেষ্টা ও কি কৌশলই না কর্‌ছে? আর আমাদের দেশে অপর্য্যাপ্ত রোদ বাতাস, আমরা ইচ্ছা করে' তাদের আট্‌কে রেখেছি!

এ দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য যা দেখ্‌ছি, তাতে প্রায় সব ভেঙ্গে গেছে বল্লেই হয়। নানা রকম মসলা না দিয়ে, দেড় ঘণ্টা ধরে' সিদ্ধ না করে' বা জব্ জবে তেলে এক ঘণ্টা ধরে না ভেজে আমরা কোন তরকারিই খাই না।

কিন্তু যাদের নকল করে' মরি, তারা যে সব আধসিদ্ধ করে' roast করে' খায়, তাতে সহজে হজম হয়। বিলাত ও আমেরিকায় কিসে জাতির স্বাস্থ্য ভাল হবে তার জন্য বিরাট ও বিধিবদ্ধ চেষ্টা চল্‌ছে। খাওয়ার আড়ম্বর তারা ভুল্‌তে শিখেছে। যেখানে যা সস্তা পাচ্ছে দেশে চালান করে' নিয়ে গিয়ে, তার সার ভাগটুকু নিজেদের জন্য বাহির করে' ছোব্‌ড়া রং করে' প্যাক্ করে' আবার সেই দেশে বিক্রয় করে' বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন কর্‌ছে। কেবল মসলা দিয়ে খেলে পুষ্টি হয় না। পুড়িয়ে, ঝল্‌সে, সিদ্ধ করে' সাদাসিধাভাবে খেতে হবে।

কি লজ্জার কথা, আগে যারা ভাল ঘিয়ের ব্যবসা কর্‌ত, এখন তারা পয়সার লোভে ঘিয়ের ভিতর যদৃচ্ছা ভেজাল পুরে দেশের লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌ছে। ঘিয়ের বদলে "ভেজিটেবল প্রডাক্ট্‌স্" "কোকোজেম্" ইত্যাদি ৩০৲ টাকা ৩৫৲ টাকা মন দামে বিদেশ থেকে কিনে এনে, বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের যোগ্য প্রতিভূ বলে চালাচ্ছে। এতে এক দিকে নিজের জাতির সর্ব্বনাশ ডেকে আন্‌ছে আর এক দিকে প্রতি বৎসর লাখ লাখ টাকা বিদেশের তহবিলে জমা দিচ্ছে।

আমার বিলাত যাবার পূর্ব্বে কল্‌কাতায় নেস্‌লির টিনের দুধের খুব প্রচলন দেখেছিলাম; প্রত্যেক ঘরে ঘরেই এই জিনিষ ব্যবহার হত। সন্ধান নিয়ে জান্‌তে পার্‌লাম, খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না। আমাকে যে গোয়ালা দুধ দিত, একদিন দুধ খারাপ হওয়ায় তাকে বল্লুম—এ রকম দুধ কেন দেও, এ দুধ ভাল নয়। গোয়ালা বিনীতভাবে তখনি উত্তর দিলে—"আমি ত তোমায় দুধ জাল দিয়ে দিই নাই বাবু; ভাল জাল দিলে দুধও ভাল থাক্‌ত। অনেক সময় দুধ অনেক দেরীতে জাল্ দেওয়া হয়, তাছাড়া পাত্রের দোষে ও ময়লা হাতে দুধ ঘাঁটার জন্য নষ্ট হয়ে' যায়। আমার দুধের দোষ নয় বাবু, যে তোমায় দুধ গরম করে' দেয় তার দোষ।" হাজার দুধ যাঁরা খান্, তাঁরা ইচ্ছে করেই দুধের সঙ্গে ভেজাল ও পানা-পুকুরের জল খান্; এর চেয়ে একেবারে দুধ না খাওয়া ভাল। নচেৎ বেশী দাম দিয়ে অল্প পরিমাণ দুধ খাওয়া ভাল ও তাকে বীজাণুনির্ম্মুক্ত অবস্থায় ব্যবহার করা মঙ্গল।

আমরা নিজের লক্ষ্মী নিজের পায়ে ঠেলে ফেলেছি। আমাদের মায়েদের ও মেয়েদের স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ে বেশী অজ্ঞানতা—বেশী উদাসীনতা—বেশী অবহেলা, সে জন্য তাঁরাই বেশী কষ্ট পান; তার উপর এই সব ভেজাল তেল-ঘি-দুধ খেয়ে শরীর একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই ভেজিটেব্‌ল্ প্রডাক্টে কি থাকে? নির্গন্ধ পেট্রলের তেল, সরিষার তেল, নারিকেল তেল, মৌয়ার তেল, ও চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ। বাঙ্গালী সরিষার তেল খায়—তাই এর মধ্যে সরিষার তেল, মাদ্রাজীর নারিকেল তেল ব্যবহার করে—তাই নারিকেল তেল, পশ্চিমেরা মৌয়া তেল ভালবাসে—তাই মৌয়া তেলের ভাঁজ দিয়ে ভারতবর্ষে সকল প্রদেশবাসীর রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে এই মনোহর বিষ তৈরী করে' বাজারে চালানো হচ্ছে। চর্ব্বিজাতীয় যে পদার্থের কথা বল্লুম, তা প্রায়ই শূকরের চর্ব্বি। এতে আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস বজায় থাকুক বা নাই থাকুক, সামান্য পরিমাণ এই নকল ঘিয়ে মিশ্রিত থাকায় তবুও যৎসামান্য শরীরের বল রক্ষা হয়। কিন্তু জমান পেট্রলে লিভার একেবারে বিগ্‌ড়ে যায়, বেরি বেরি, মূত্ররোধ, শূলবেদনা ও নানা রকম পেটের রোগ আনে; এক কথায়, কিছুদিনের মধ্যে শরীর একেবারে বিফল করে ছেড়ে দেয়। বেশ দেখা যাচ্ছে, ওরা ভাল সারবান জিনিষগুলি আমাদের চোখের আড়ালে নিয়ে গিয়ে, খালি মোম্ খাইয়ে দেহের মধ্যে শ্মশানের বাতি জালিয়ে দিচ্ছে। এ রকম খেয়ে স্বাস্থ্য ক'দিন অটুট থাক্‌বে আর আমরা বাঁচ বই বা ক'দিন?

তাই বলি, আমাদের মোটা খাওয়া-দাওয়া এখন কিছুদিন চালাতে হবে; ভেজাল যাতে আছে সন্দেহ হবে, তা যত বড় পুষ্টিকর জিনিস বলে প্রচারিত হোক না কেন, সর্পবৎ এড়াতে হবে। কিছু না হয় নুন দিয়ে ভাতের ফেন খেলেও শরীরে অনেক বল সঞ্চয় হবে। ফেন বিলাতে একটা বিশিষ্ট রকমের খাদ্য,

যা হোটেলে, রেষ্টুরেণ্টে সুপের মত মুখরোচক করে' বিক্রীত হয়। এ রকম করে' যদি আমরা দেশের জিনিস খাই, তাহ'লে আমাদের স্বাস্থ্য ত ভাল থাকবেই, উপরন্তু লাখ লাখ লাখ টাকা বিদেশে পাঠাতে হবে না।

জাতির স্বাস্থ্যের ভার অনেকটা মেয়েদের হাতে ন্যস্ত। মা সকল, তাই বল্‌ছি, আপনারা সকলে আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করুন—ভাতে-ভাত খাব সেও ভাল, কিন্তু ঐ সকল ভেজাল তেল-ঘি আর বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেব না। পয়সার লোভে ও বিদেশী দালালের কুপরামর্শে যারা ভেজাল বিক্রয় করে' ভেজালের কৃপায় সেণ্ট্রাল এভিনিউতে গগন-চুম্বি-প্রাসাদ তৈরী কর্‌ছে, তারা এটুকু ভেবে দেখে না যে, ঐ ভেজাল তাদের ছেলে-মেয়ে-জামাই-বৌ ইত্যাদির পেটে গিয়ে তাদেরও সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌ছে; তাদের বাড়ীতেও নিত্য রোগ ও অকাল মৃত্যু লেগেই আছে। নিজে বেঁচে জাতকে বাঁচাতে হবে, এ সত্য টুকুর মর্য্যাদা এই অন্ধ,অর্থ-পিশাচগণ রাখ্‌তে পারে না।

এইবার মেয়েদের ভিতর প্রচলিত ২।১টি কদভ্যাসের কথা আপনাদের বল্‌ব। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—দোক্তা। এ সম্বন্ধে ২।১ কথা বলে' আপনাদের প্রাণে আঘাত দেব, ক্ষমা কর্‌বেন। চুরুটের চেয়ে পাণে যে দোক্তা খায়-সে শরীরের আরও বেশী অপকার করে। কাঁচা দোক্তার বিষ অত্যন্ত উগ্র; এত উগ্র যে, অনেক সময়ে সাপ বা বিছে কাম্‌ড়ালে দোক্তার জল দিলে সেরে যায়। এই দোক্তার বিষ পেটের ভিতর গিয়ে অনেক রোগকে ডেকে আনে। এতে চোখ খারাপ হয়ে যায়, অরুচি ও ক্ষুধামান্দ্য হয়, কার্য্যে অবসাদ আসে, দাঁত নষ্ট হয়, বুক ধড়ফড়ানি, মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গ আসে, এমন কি স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় ও জরায়ু-সংক্রান্ত নানারকম ব্যাধি দেখা দিতে পারে। ২০ বৎসর পূর্ব্বের কথা বল্‌ছি, একটী যুবতী দোক্তা খেয়ে খেয়ে—নিজের মাতৃত্ব হারিয়ে ফেলেছিল, শেষে অনেক সাধনা করেও ছেলে হবার আশা নেই দেখে আত্মহত্যা করলে। দোক্তায় ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য খুব বেশী রকম খারাপ হয়ে যায়। যাঁরা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দোক্তা খাওয়ার অভ্যাস রাখেন, তাঁদের গর্ভস্থ ভ্রূণ ভালরকম পরিপুষ্ট হ'তে পারে না, বিকল বিকৃত ভগ্নদেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, অনেক সময় মৃত প্রসূত হয়। পাণ খাওয়া এর চাইতে ভাল; তবে সুপারী যেন বেশী না থাকে ও মোটা মোটা করে' কাটা না হয়, চূণ-খয়ের জোয়ান-মৌরী অল্প দিয়ে ২।৪ টা পাণ খাওয়া মন্দ নয়। জর্দ্দা, দোক্তা, সূর্ত্তির ব্যবসায়ীরা আজকাল নানারকম বিজ্ঞাপন. বিনামূল্যের নমুনা, উপহারের প্রলোভন ইত্যাদি দেখিয়ে এই সকল বিষ খাওয়ার অভ্যাস অল্পে অল্পে বড়িয়ে দিচ্ছে। অনেক দরিদ্র পরিবারে ছেলেমেয়েরা পেট ভরে' দুধ খেতে পায় না বা গৃহস্বামীদের পাতে একটু ঘিয়ের ছিটে পড়ে না, অথচ গৃহিনীরা সেই কষ্টলব্ধ অর্থ থেকে কিছু কিছু পাণ দোক্তার জন্য অনর্থক খরচ করেন।

নেশার ফল যে কত ভয়ানক, তা একটি ঘটনা বলে' আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। বছর দশেকের কথা। আমার পরিচিত এক জমিদার, এক সাহেব ও আমার প্রায় এক সময়েই কলেরা হয়। জমিদার খুব বেশী রকমের নেশা কর্‌ত, তার উপর অনিয়মে অসময়ে ভেজাল জিনিষ-পত্র খেয়ে শরীরে তেমন শক্তি ছিল না—লিভার খারাপ ছিল; রোগের সঙ্গে যুঝতে না পেরে সেই সময়েই মারা গেল। সাহেব যদিও মদ খেত, তবুও নিয়ম মত ভাল খাওয়া-দাওয়ার দরুণ তার শরীরে তবুও একটু বল ছিল; তাই সে যাত্রা বেঁচে উঠে সে দশ বৎসর পরে মরেছিল। আর আমি এখনও বেঁচে আছি, কারণ জীবনে কখনও নেশা করি নাই ও ছেলে বেলায় পুষ্টিকর আহার ও ভাল জলবায়ু জুটে ছিল বলে'।

আপনারা সকলেই জানেন, নেশাখোরের কোন শক্ত ব্যায়রাম হ'লে তাকে বাঁচান প্রায় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে বলে, টিকে দিয়ে লোক মরে যায়। কিন্তু এটা ঠিক কথা নয়। নেশাখোরের বা যাদের আগে কোন ভারী অসুখ করেছিল, তাদের টিকে শীঘ্র ওঠে না।

দেহের ভিতরটা নেশার বা পূর্ব্ব ব্যাধির বিষে ফোঁপরা করে' দেওয়ার দরুণ ভিতরের ঐ বিষ বাহিরের এই টিকার বীজকে সহজে প্রবেশ কর্‌তে দিতে চায় না, তাই ঠিক উঠে না। না উঠ্‌লে আবার দিতে হবে। প্রত্যেক ৩।৪ বৎসর অন্তর টিকে দিলে ভাল হয়।

করজোরে আপনাদের কাছে অনুরোধ কর্‌ছি—দোক্তা ছাড়ুন। ছোট মেয়েদের পেটে কোনও রকমে ওই বিষ যেন না যায়। তাহ'লে ওদের লিভার একেবারে খারাপ করে দেবে। ভগবানের দেওয়া আলো-বাতাস, বাগানের টাটকা শাক-সবজী, শুদ্ধ ঘি-দুধ পুষ্টিকর আহার যাদের ভাগ্যে জোটে না, দোক্তার বিষ তাদের দেহ কোনও মতে বরদাস্ত কর্‌তে পারবে না। এ সব খেয়ে আর দরিদ্রতাকে ডেকে আনবেন না। দোক্তা খাওয়ার ফলে রোগ হ'লে ডাক্তার, ঔষধ, নার্স প্রভৃতির খরচার জন্য গৃহস্বামীকে উদ্ব্যস্ত হতে হয়, অনেক সময় ঋণ করতে হয়; তার উপর দুশ্চিন্তা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও নানা অসুবিধা ত ঘটেই। পর্য্যবেক্ষণ করে' জানা গেছে, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যায়রাম প্রায় দোক্তা খাবার দোষে হয়।

আপনাদের আবার বল্‌ছি, নিয়মিত পরিশ্রম করার অভ্যাস রাখুন, খাওয়া-দাওয়ার আড়ম্বর ও ভেজাল বর্জ্জন করুন. জর্দ্দা দোক্তা প্রভৃতি খাওয়ার কুঅভ্যাস ত্যাগ করুন; বিনামূল্যের আলো-বাতাস প্রাণ ভরে' উপভোগ করুন, ভাল করে' তেল মেখে স্নান করার অভ্যাস করুন ও ছেলে পিলেদের করান্। আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় ঠাকুরমা রোজ গায়ে সরিষার তেল মালিস করে' তেতালার ছাদে রৌদ্রে শুইয়ে রেখে আস্‌তেন; তাতে মশা-মাছি কিছু কাম্‌ড়াত না, শরীরও "গাঁট্টা-গোঁট্টা" হ'ত। অনেকে বলতে পারেন—তেতলা পাব কোথায়? তেতলা না পান, একটু ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিয়ে, ছেলেদের বেশ করে' তেল মাখিয়ে, রোদ-হাওয়ায় ফেলে রেখে দেবেন, কেবল মাথাটা ঢেকে মধ্যে ছায়ায় রেখে দেবেন।

আরও দুই একটা ভারি খারাপ অভ্যাস আমাদের মেয়েদের আছে—এই যেমন, অনিয়মে অসময়ে খাওয়া-দাওয়া আর বিলাতী ফেসানে ছেলে পিলেদের ফুড্ খাওয়ানো। বিলাতী বণিকগণ ঐ সুস্বাদু অসার "ফুড" খাইয়ে, দুধের বাছাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে দিয়ে কত না পয়সা এই গরীব দেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার মতে, এ সব বিলাতী ফুড্ ফেলে দিয়ে লেবুর রস দিয়ে ফেন্ খেলে অনেক কায হয়। এই সব ফুডে আইন্ বাঁচাবার জন্যে মাটা-তোলা দুধের শুষ্ক চূর্ণ প্রভৃতি সামান্য পুষ্টিকর দ্রব্য দিয়ে, বাদবাকী রাসায়নিক দ্রব্যাদি, dextrine, নিকৃষ্ট চিনি আদি মিশিয়ে, ভাল শিশিতে পুরে' জবর গোছের নাম দিয়ে আমাদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চার আনা পয়সা খরচ করে' তারা আমাদের কাছ থেকে প্রতি শিশিতে দুই টাকা আড়াই টাকা করে' আদায় করে।

আজকাল শোনা যায়, মেয়েদের ভালো ঘুম হয় না। এর প্রধান কারণ, একে বিশুদ্ধ রোদ-হাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, ভেজাল খাওয়া, তার উপর বেলা একটা-দুইটায় বা রাত্রি বারোটায় অথবা যখন ইচ্ছা তখন খাওয়া-দাওয়া করা। সাহেবরা খাবার সময় ঘড়ি ধরে' খায়। ভালো ঘুম না হ'লে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। আমার মতে, কুড়ি বৎসরের বা তার কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের বেশী ঘুমুতে দেওয়া উচিত। বুড়োদের স্বভাবতঃই ঘুম কম হয়; কর্ত্তা-গিন্নী রাত্রি ৪টার সময় উঠে ছেলেদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবেন—সেটা ভাল নয়। কমবয়সীদের অবশ্য সকালে উঠা অভ্যাস থাকা ভালো, কিন্তু প্রত্যহ সাত আট ঘণ্টা ঘুমুতে দিতে হবে। বিশেষতঃ বাটীর চাকর-চাকরাণী ও ঝি-বউ—যারা সংসারের পরিশ্রমে নিত্য ক্লান্ত হয়, তাদের অকাতর ঘুমকে কখনও ভাঙ্‌তে যাবেন না, এদের ঘুমের প্রয়োজন যথেষ্ট। আর বাড়ীর কর্ত্তাদের উচিত—সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে মেয়েদের ছুটি করে' দেওয়া, নচেৎ তাদের সকাল সকাল আগে খেয়ে নেবার স্বাধীনতা দেওয়া। মেয়েদের দেহ পুরুষেরই মত রক্ত-মাংসে গড়া, অনিয়মে তাদেরও শরীর ভাঙ্গে।

আপনাদের নিকট আজ এই পর্য্যন্ত বলেই বিদায়

নিলুম। আপনাদের নিকট আমি করযোড়ে আবার নিবেদন করি, নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি একটু নজর রাখবেন, গৃহের মঙ্গল ও শিশুর ভবিষ্যৎ আপনাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

আমার স্বাস্থ্য-সমাচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম্-বি।]

আমার স্বাস্থ্যতত্ত্ব-গুরু ডাক্তার সিম্‌সন্ কলিকাতার প্রথম অনন্যকর্ম্মা হেল্‌থ্ অফিসার। ইঃতপূর্ব্বে ১৮৬৪ সাল হইতে ১৮৮৬ সালের মে মাস পর্য্যন্ত ডাক্তার টনেরি, মেক্রে, পেন্, মেক্লাওড্, ওব্রায়েন্ এবং সণ্ডার্স্ এই ছয় জন সার্জ্জন, তাঁহাদের হাতিয়ার প্রভৃতি বিশ্রামাগারে রাখিয়া অবসরক্রমে ছয় লক্ষ নগরবাসীর স্বাস্থ্য-সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য বেতন-প্রাপ্ত হইতেন। তখন বাকাই ছিলেন ঈশ্বর। অস্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের বর্ণনারই বাহুল্য ছিল উন্নতি-বিধান-ব্যবস্থায় তেমন পারিপাট্য ছিল না। নন্দরাম সেন গলির মলবাহিনী নর্দ্দামা, মল ও মলকীটপূর্ণ পুষ্করিণী, ঐ পুষ্করিণীতে স্নান, মুখ-ধোয়া, বাসন মাজা, কুলকুচি প্রভৃতির যে বীভৎস দৃশ্য সার্জ্জন্-মেজর পেন্ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়াছিল এবং শ্বেতাঙ্গিণীগণ বোধ হয় মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন! কিন্তু এই সমুদয় দৃশ্য দূর করিবার জন্য যে একটা রীতিমত কর্ম্মীসংঘ গঠন করা আবশ্যক, সে বিষয় আলোচনা করিবার কোন চেষ্টা হইয়াছিল কি না, তদানীন্তন স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীদের বিবরণীতে তাঁহার কোন আভাস পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্য-বিভাগ সংগঠন করিবার প্রথম চেষ্টা ডাক্তার সিম্‌সনই করিয়াছিলেন। তিনিই একটা ময়লা বিভাগ (Nuisance department) সৃষ্টি করিয়া পোর্ট হেল্‌থ-অফিসার ডাক্তার ব্যাঙ্কস্‌কে (Dr. Banks) প্রধান অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীদের যে বাক্-বাহুল্য রোগ ছিল, তাঁহাকেও সেই রোগ পাইয়া বসিল। তিনি কলিকাতার বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন—আফ্রিকার অতি কদর্য্য গ্রাম অপেক্ষা কলিকাতা সহর নোংরা; টাক্‌শালের (mint) সমস্ত টাকা ঢালিয়া দিলেও এই নগরের সংস্কার অসম্ভব।

আমরা সে কথায় ভড়্‌কাইব কেন? প্রত্যেক পল্লীর (ward) মধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রত্যেক বাড়ীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছিলাম—কি কি উপায়ে পল্লীর উন্নতি হইতে পারে। সূর্য্যরশ্মির অভেদ্য গলিতে, পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত মলকুণ্ডের পার্শ্বে, রাস্তার নিম্নস্থিত নর্দ্দামা হইতে উত্থিত বিষাক্ত গ্রাসের মধ্যে এবং সংক্রামক রোগবহুল কদর্য্য বস্তিতে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছি। অদম্য উৎসাহের পুরস্কার স্বরূপই হউক কিম্বা যে কারণেই হউক, বিধাতা রোগ তড়াইবার একটা শক্তি দেহে দিয়াছিলেন, যাহাকে ইংরাজীতে বলে—Power of Resistance। অনেক সময় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু রোগ ভোগ করি নাই।

একটী অপরিষ্কার ক্ষুদ্র গলিতে একদিন প্রবেশ করিয়াছি। এক দোতালার জানালা দিয়া কে একজন একটা মল-লিপ্ত কাগজের পুঁটুলি আমার মাথায় ফেলিয়া দিল। চাপরাসী সাহেব চোক রাঙ্গাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সবুর করো, কা সমন হোবে।" উপর হইতে মধুর কণ্ঠে ঘোষিত হইল "না গো, এমন কিছু নয়, কচি ছেলের গু ফেলেছি।" আমি হাসিতে হাসিতে সরিয়া পড়িলাম। জন-সেবা পুরস্কার স্বরূপ এই প্রকার ফুল-চন্দন সময় সময় পাইতে হয়। চাপরাসী সাহেব বাড়ীতে আসিয়া অন্দর মহলে নালিশ করিলেন—"এইসা মেহেনৎ করনেসে বাবুবি মর্ যায়েগা, আউর হাম লোককো বি জান্ যায়েগা।"

সিম্‌সন্ সাহেব নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে বন্ধুভাবে ভাল বাসিতেন; কিন্তু কড়ায়-ক্রান্তিতে কাজ আদায় করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতেন, যেহেতু আমার উপর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। কলিকাতায় স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অবস্থা পরিদর্শনের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৬ সালে কতিপয় ডিপুটী স্যানিটারী কমিশানরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ডাক্তার ডিয়ার (অবশেষে সার্জ্জন জেনারেল) অতিরিক্ত উৎসাহী ছিলেন। কিছু না বলিয়াই লোকের বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেন, লগুড়াঘাতে ধাক্কা মারিয়া পাইখানার দরজা খুলিয়া দেখিতেন। আমি ভাবিলাম, "এরা ত একবৃক্ষ সমারুঢ়া নানা পক্ষিবিহঙ্গমা, প্রভাতে দশদিগ যান্তি, কাকস্য পরিবেদনা।'·· অবশেষ পল্লী পরিদর্শন করিতে গিয়া আমাকেই ভুগিতে হইবে।" একদিন প্রভাতে এক গাড়োয়ানের গো-শালা দেখাইয়া দিলাম; সেখানে অনেকগুলি ভীষণ ষাঁড় বাঁধা ছিল। যাই ডিয়ার সাহেব প্রবেশ করিয়াছেন, একটা দুর্দ্দান্ত ষাঁড় দড়ী ছিড়িয়া সিং খাড়া করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। সাহস অপেক্ষা সতর্কতা অধিকতর সঙ্গত মনে করিয়া তিনি পৈতৃক প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। তৎপর তিনি আর এরকম ভাবে লোককে উৎখাৎ করিতেন না।

পূর্ব্বাহ্নে বাহিরের কাজ সারিয়া দ্বিপ্রহরে আফিসে গিয়া সিমসন সাহেবের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হইয়াছে। স্বাস্থ্য-বিবরণ লেখা সম্বন্ধে তিনি কেরানীদিগকে বিশ্বাস করিতেন না।

আফিসের তিনটী ওয়ার্ডের কাজ ছাড়া আমাদের উপর আরও অনেক কাজের ভার পড়িত। শ্মশানে ও গোরস্থানে গিয়া রোগ সম্বন্ধে তদারক করিতে হইত। "সব রেজিষ্ট্রার" ও "মুন্সী"গণ অবৈধ উপায়ে অনেক রোজগার করিতেন। তাঁহাদের উপর কড়া নজর

রাখিবার জন্য অসময়ে উপস্থিত হইতাম। এই জন্য তাহাদের শত্রুতা উপার্জ্জন করিতে হইয়াছে। একদিন মানিকতলা গোরস্থান পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম, একটী সাত দিনের ছেলেকে গোর দিতে গর্ত্তে নামাইয়াছে, কিন্তু তার পা এক একবার নড়িতেছে। দেখিয়াই আমি তাহাকে ঘরের ভিতর নিয়া কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রণালী অবলম্বন করিবামাত্র দেখিলাম—কিছুক্ষণ পরে শিশুটি নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। তাহার পেটে ১০৮ টি আঁচড়। তাহাকে "জমুয়া" ভূতে পাইয়াছে বলিয়া পেটের উপর চিংড়ী মাছের দাঁড়ার ১০৮টী আঁচড় দেওয়া হইয়াছিল, এবং ভূত তাহাকে কোলে টানিয়াছে মনে করিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া, ঘরের এককোণে রাখিয়া দিয়াছিল। প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা ঐ অবস্থায় রাখিয়া ছেলেকে গোর দিতে আসিয়াছে। ছেলের বাপ যখন দেখিল "মরা" ছেলে বাঁচিয়া উঠিয়াছে, 'দানোয় পেয়েছে" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল; আমরা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে পাকড়াও করিলাম এবং ছেলে শুদ্ধ তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলাম।

বাজারে গিয়া পচা জিনিস ফেলিয়া দিবার হুকুমও ছিল। গাড়ী গাড়ী পচা মাছ ফেলিয়া কত লোকের শত্রু হইয়াছি। একদিন সকালবেলা পচা মাছ ফেলিয়া সংক্রামক বিষলিপ্ত দ্রব্যাদি পোড়াইয়া এবং অন্যান্য কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছি। এমন সময় একজন আত্মীয় তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রীকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সেই সময় ডাক্তার সিম্‌সন্ আমাদিগকে অবসর সময়ে চিকিৎসা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ডাক্তার কেদার নাথ দাস তখন সবে মাত্র উত্তীর্ণ হইয়া, চিকিৎসা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং দয়া করিয়া আমাকে অস্ত্র-চিকিৎসায় সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আত্মীয়ার প্রসব-কার্য্য সমাধা করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। এদিকে আমার স্ত্রী মনে করিলেন, কার্য্য উপলক্ষে আমি যে সমুদয় শত্রু সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের দ্বারা আহত হইয়া কোথাও পড়িয়া আছি। থানায় খবর গেল। আমার শ্যালক৺রায় বাহাদুর বিনোদ

বিহারী গুপ্ত চারিদিকে চর পাঠাইলেন। ইতোমধ্যে আমি ধীরে ধীরে আসিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিলাম।

আর একদিন বড় বাজারে টীকার ব্যবস্থা করিতে গিয়াছি। মাড়োওয়ারীরা টীকা দিতে চাহে না।

সার কৈলাস চন্দ্র বসু টীকার বীজকে "শীতলাচন্দন" নামে অভিহিত করিয়াও মাড়োয়াড়ী মহলে টীকার অধিক প্রচলন করিতে পারেন নাই। একদিন একটী দ্বাদশবর্ষীয় সুন্দর ছেলেকে ধরিয়া দেখিলাম, তাহার টীকা হয় নাই। টীকা দিবার কথা বলাতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তাহার পিতাকে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিছুতেই শুনিলেন না। কিছুদিন পর তাঁহার ঐ একমাত্র বালক যখন বসন্তরোগে মারা গেল, আমি অনুসন্ধান করিতে গেলাম। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিলেন—"ডাক্তার সাব, কাল আপ আইয়ে, পান্ শো আদমী টীকা লেগা।" হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছি। তখন বেলা এগারটা। বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট এবং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের মোড়ে আমার গাড়ী আসিতেই এক জন পরিচিত লোক ইসারায় বলিলেন, "শীঘ্র পালান্"। গাড়োয়ান দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইয়া যখন আমাকে নিয়া বাড়ী আসিল, শুনিলাম কৈলাস বাবু আমার অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, আমাকে নাকি শত্রুরা জখম করিয়াছে।

১৮৯৮ সাল। কলিকাতায় প্লেগ দেখা গিয়াছে। নানা প্রকার সরকারী বিধি-ব্যবস্থার গুজব উঠিয়াছে। একটী গুজব এই, প্লেগাক্রান্ত হইলেই, পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক, মিউনিসিপ্যালিটীর লোক তাহাকে ধরিয়া হাসপাতালে পাঠাইবে। মিউনিসিপ্যালিটীর লোক কোট-প্যাণ্ট পরিত। সুতরাং কোট প্যাণ্ট্ দেখিলেই সাধারণ লোকের আতঙ্ক হইত। আমি যে সময় বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়াছি, ইহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই একজন খৃষ্টিয়ান ভদ্রলোক কোট-প্যাণ্ট্ পরিয়া সাইকেল চড়িয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিলেন। কয়েকটী লোক তাহাকে মিউনিসিপ্যালিটীর প্লেগ-ধরা সাহেব মনে করিয়া বিষম প্রহার করিয়াছিল এবং সাইকেল চূর্ণমার করিয়া দিয়াছিল। আমাকে সতর্ক করিবার ঐ কারণ।

কৈলাস বাবু যখন শুনিলেন, মিউসিসিপ্যালিটীর লোককে প্রহার করিয়াছে, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বন্দুক হাতে করিলেন এবং আমায় কল্পিত শত্রুর উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না, কারণ তিনি বন্দুকের ব্যবহার জানিতেন না। অবশেষে যখন জানিতে পারিলেন আমি সুস্থ দেহে বর্ত্তমান আছি, তখন নিশ্চিন্ত হইলেন।

মাণিকতলায় প্লেগ-হাসপাতাল খোলা হইল। আমাকে বলা হইল, যোড়াবাগানের মাড়োওয়ারী মহলে প্লেগে কেহ আক্রান্ত হইলেই আফিসে খবর দিতে, এবং প্লেগাক্রান্ত ইঁদুর ধরিয়া লেবরেটরীতে পাঠাইতে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত তখন আনালিষ্ট ও ব্যাক্‌টিরিওলজিষ্ট ছিলেন। তাঁহার নিকট অনেক পুরানো ডাক্তার (যাঁহারা এখন নামজাদা হইয়াছেন) বীজাণুতত্ত্বে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি ডাক্তার সিম্‌সন কর্ত্তৃক বোম্বাই সহরে প্রেরিত হইয়া তথাকার প্লেগ-রোগীর রক্তে প্লেগ-জীবাণু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সমুদয় ইঁদুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন—তাহাদের রক্তে প্লেগ্-জীবাণু আছে কি না। মাড়োয়ারীরা জানিত ঐ ইঁদুরগুলিকে মারিয়া ফেলা হইবে। সুতরাং তাহাদের বাড়ীতে গিয়া ইঁদুর ধরা নির্বিঘ্ন ব্যাপার ছিল না। ইঁদুরের প্রাণের পরিবর্ত্তে মানুষের প্রাণ লইতে তাহারা পশ্চাৎপদ হইত না। তবে আমি তাহাদের জীবন-বিধাতা কৈলাস বাবুর বন্ধু বলিয়া তাহাদের নিকট পরিচিত ছিলাম, এই আমার একমাত্র ভরসা ছিল।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া কয়েক-জন প্লেগের ডাক্তার আসিলেন। তাঁহারা সাহেব, প্রাণের ভয় অত্যন্ত বেশী; পকেটে রিহ্বল্‌বার থাকিত। তাঁহাদের সঙ্গে সহরের দুই তিন জন গণ্যমান্য ব্যক্তিও থাকিতেন। আমার হুদ্দোয় যে ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ৺চারুচন্দ্র মিত্র এবং ৺নিমাইচরণ বসু। উভয়ের পকেটেও রিহ্বল্‌বার থাকিত। চারু বাবু মাঝে মাঝে অস্ত্রটী বাহির করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া বলিতেন, কোন রাস্কেল যদি কোন প্রকার গোলমাল করিতে আসে, তাহার প্রতি এই ব্যবস্থা।

আমাকে একা গিয়াও কাজ করিতে হইত, কিন্তু বন্দুক সঙ্গে থাকিত না। ভরসা একমাত্র বিধাতা। প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়া দোতালা কি তেতালার উপর একখানা ঘর হাসপাতালে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা হইত; বাড়ীতে কেহ প্লেগগ্রস্ত হইলে তাহাকে হাসপাতালে না নিয়া ঐ ঘরেই রাখা হইবে—গৃহস্থকে এই প্রকার আশ্বাস দেওয়া হইত। হাসপাতালে যাইবার এত আতঙ্ক হইয়াছিল, প্রভাতে প্লেগ আফিসে গার্হস্থ্য-হাসপাতাল-প্রয়াসী দলের বেজায় ভিড় হইত। আমার বেশ মনে আছে, স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ীতে হাসপাতাল করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ডাক্তার সাহেব যদি মঞ্জুর না করেন, এই তাঁহার আশঙ্কা ছিল।

প্লেগের টীকার সময় আরও বিপদ। কুক সাহেব তখন হেল্‌থ-অফিসার ছিলেন। তিনি টীকা দিতে আসিবার সময় বিহ্বলভার সঙ্গে রাখিতেন। আমি সর্ব্বদাই নিরস্ত্র থাকিতাম। ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ বাড়ীতে কয়েকজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ও অনেক মহিলা বাস করিতেন। ঐ বাড়ীর চলিত নাম ছিল "অবলা-ব্যারাক"। আমি প্লেগের টীকা এই অঞ্চলে প্রচলিত করিবার জন্য কুক সাহেবকে ঐ বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। টীকা চলিতে লাগিল। বাড়ীর দরজায় লোকে লোকারণ্য। কুক সাহেব ভীত হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিলেন, "আমি লোকটী নিরীহ, কিন্তু কেহ আক্রমণ করিলে নিরীহ থাকিব না।" আমি নিরস্ত্র হইয়াই বাহিরে আসিলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে কুক সাহেব আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

ভয় কি ক্লান্তি কাহাকে বলে জানিতাম না। এত কাজ করিয়াও অবসরকালে কিঞ্চিত গবেষণা করিতাম। অধ্যাপক হাফকীনের অনুরোধে ওলাউঠার বীজাণু সম্বন্ধে গবেষণার ভার লইয়াছিলাম। ব্যাপার গুরুতর। একদিকে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক কানিংহাম, মহাপণ্ডিত; তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড় করান হইল অজ্ঞ সুন্দরীমোহন দাসকে—কানিংহামের তুলনায় বালক মাত্র!

শিশুর পরিচর্য্যা—রোগে।

শিশুর আহার ও পরিচর্য্যার দিকে লক্ষ্য না রাখিলে নানারূপ রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যথোপযুক্ত আহারের অভাবে কেবলমাত্র যে শিশুর দেহের পরিপুষ্টির অভাব ঘটে তাহাই নহে, দেহ-ক্ষয়, পরিপাক-শক্তির ব্যতিক্রম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শিশুর আহারের দিকে লক্ষ্য রাখার সহিত বিশুদ্ধ বায়ু-সেবনের যাহাতে কোন ব্যাঘাত না হয়, সে বিষয়ে মনোযোগী হইলে, অন্ততঃ রিকেট (Rickets) নামক রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সাধারণতঃ দুঃস্থ পরিবারে রিকেট রোগ দেখা যায়, কিন্তু অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা এরোগ হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, সে কথা কখনই সত্য নহে। সহরের মধ্যে বিশেষতঃ ঘন বসতিযুক্ত স্থান রিকেটের আবাস স্থল বলা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ ছয় মাসের পর হইতে দুই বৎসরের মধ্যে রিকেটের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে ঘটা অসম্ভব একথা স্থিরনিশ্চয়রূপে বলা যায় না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, রিকেট একবার আরম্ভ হইলে বহুদিন পর্য্যন্ত রোগীকে কষ্ট দিতে থাকে, এবং দুই বৎসরের পরও শিশু রোগ ভোগ করিতে থাকে।

আমাদের ধারণা, ছয় মাস পর্য্যন্ত একমাত্র মাতৃদুগ্ধই শিশুর দেহ ধারণের সকল উপকরণ সরবরাহ করে বলিয়া তৎপূর্ব্বে শিশুদিগের রিকেট হইতে দেখা যায় না। মাতৃদুগ্ধ কম বা বন্ধ করিবার কাল হইতে শিশু-দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া যায়, বিশেষতঃ পরিপাক-শক্তির ব্যতিক্রম ঘটে ও তাহা বহুদিন যাবত একভাবে চলিতে থাকে; সেই সঙ্গে সঙ্গে রিকেট-রোগ আপন জাল বিস্তার করিতে থাকে। পরিপাক-যন্ত্রের ব্যাঘাত ঘটার জন্য শিশু বহুবার তরল, দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ করে, এবং সচরাচর উহা সবুজবর্ণের হইয়া থাকে। মানসিক অশান্তি দৈহিক অশান্তির সহিত বরাবরই সদ্ভাব রাখিয়া থাকে, এক্ষেত্রেও তাহা লক্ষিত হয়। শিশু সদাসর্ব্বদা অশান্তি অনুভব করে। কোন প্রকারে স্থির থাকিতে পারে না এবং মানসিক অবস্থাও খিট্‌খিটে হইয়া থাকে। দেহের মাংসক্ষয় হেতু জীর্ণ শরীরে হাত লাগিলে বেদনা অনুভব করে, সেইজন্য গাত্রস্পর্শ করিতে গেলে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুস্থ শরীরের লক্ষণ সকল একে একে লোপ পাইতে থাকে, এবং গাত্রত্বকের মসৃণতা ও স্বাস্থ্য-চিহ্ন দূর হইয়া বিবর্ণ আকার ধারণ করে। চর্ম্ম লোল হইতে থাকে, মুখ শ্রীহীন হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে শিশুর সুনিদ্রা হয় না, এবং ক্ষণে ক্ষণে কপালে ও মস্তকে ঘর্ম্ম বিন্দু দেখা দেয়। শয্যায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। কাঁথা, বালিশ প্রভৃতি ছড়াইয়া ফেলিয়া হাত ও জানুর উপর ভর করিয়া শয়ন করিয়া থাকে। রাত্রে উদরের মধ্যে বায়ু জমিয়া নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি করে। দেহের পরিমাণে মাথা বড় হয় এবং তলপেট ঝুলিয়া পড়ে এবং শিশুর আকৃতি বিশ্রী হইয়া যায়। দন্তোদ্গমে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটে এবং ব্রহ্মতালু কিছুতেই কঠিন না হইয়া দুই বৎসর বয়সের পরও কোমল থাকে। দেহের অস্থির গঠনে বিকৃতি দেখা যায়; বিশেষতঃ হাত ও পায়ের লম্বা হাড়গুলি বাঁকিয়া গিয়া থাকে, এবং পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করে না; নানারূপ আকার ধারণ করে। হাত ও পায়ের তালু ঈষৎ ফোলা বলিয়া মনে হয়, এবং পাঁজরার পাশে ছোট ছোট ফুলা দেখা যায়। বয়সের বৃদ্ধির সহিত আকারের আরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, এবং হাড়ের বিকৃতি আরও পরিস্ফুট হওয়া সম্ভব। পঞ্জরের অস্থিগুলির পরিপুষ্টি না হওয়াতে বক্ষঃস্থলের আকার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। মাতাপিতার আদরের সামগ্রীকে দাঁড় করাইবার বাসনা সকল মাতাপিতারই হইয়া থাকে, শিশুকে এতদবস্থায় দাঁড় করাইবার চেষ্টা করাইতে তাঁহারা বিশেষ ভুল করিয়া থাকেন, কারণ তাহাতে দুর্ব্বল পদাস্থির উপর চাপ পড়াতে বাঁকিয়া যাইতে পারে।

রিকেট হইতে বিশেষ কোন বিপদের সম্ভাবনা না থাকিলেও উপসর্গগুলি বিষম অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। ফুস্‌ফুসের রোগ, উদরাময়, তড়কা, মস্তকে জল সঞ্চার প্রভৃতি রোগের আক্রমণ হইতে শিশুর মৃত্যু ঘটা অতিশয় স্বাভাবিক। রিকেটের অবস্থান কালে কখনও একটী কখনও অপরটী প্রবল ভাব ধারণ করিয়া থাকে এবং সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা দূর না করিতে পারিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

রিকেট রোগে শিশুর পরিচর্য্যা একটী প্রধান ঔষধ। প্রথমেই রোগের কারণ নির্দ্ধারণে মনঃসংযোগ করিতে হয়। কি আহার করে, কত বার আহার করে, তাহা জানিয়া লইতে হইবে। বাস-গৃহখানির অবস্থা দেখিতে হইবে—তাহাতে বায়ু চলাচলের কিরূপ ব্যবস্থা আছে, সেই দিক অধিক মাত্রায় দৃষ্টি রাখিবে। আচ্ছাদন দেহের অভাব পূর্ণ করে কি না তাহা একটী অতি জ্ঞাতব্য বিষয়। শিশু-দেহের আচ্ছাদন তাহার উপযুক্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, তাহা আমরা বলিয়াছি। যে শিশু ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না, তাহার জন্য নিজের অভাব অনুযায়ী গাত্রাবরণের ব্যবস্থা করিবে। শিশু গৃহের বাহিরে খোলা যায়গায় যায় কি না দরিদ্র কুটীরে গিয়া রোগের সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রয়োজনা- নুযায়ী আলো ও বাতাসযুক্তগৃহ ও উপযুক্ত আচ্ছাদন সংগ্রহ করিয়া উঠা অতিশয় কঠিন ব্যাপার; উপযুক্ত আহার জোটান ততোধিক সমস্যা। কিন্তু তাহা বলিয়া রোগের প্রকোপ বিস্তার হইতে দেওয়া চলে না।

সাবধানতা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলে, অল্পে অল্পে রোগ দূর করা যায়। উপযুক্ত আহার মাত্রেই যে মূল্যবান বস্তু, তাহা আমরা বলি না। রোগের অনুযায়ী সহজপাচ্য পথ্য এবং আরও বিশেষ ভাবে নিয়মিত সময়ে দেওয়া হইলে, অনেক সময় শীঘ্র সুফল ফলিতে দেখা যায়। রোগের কারণ নির্ণয়ে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শিশু হয়ত দুই বৎসর পর্য্যন্ত স্তন্য পান করিতেছে। যে খাদ্য শিশু অবস্থায় স্বাস্থ্যকর, অজ্ঞ মাতারা না বুঝিয়া তাহাই বহুদিন পান করাইতে থাকে। কিন্তু সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া উচিত যে, ৯।১০ মাস পরে মাতৃ-দুগ্ধের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা পানে শরীরের ক্ষতি করে। এভাবে স্তন্যপান করিতে কদাচিৎ দিবে না; যে শিশু স্তন্যপান করে, কঠোরতা অবলম্বন করিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দিবে।

শিক্ষার অভাব দেশে রোগ-বিস্তারের সহায়তা করিতেছে। রিকেটের কারণ অনুসন্ধান কালে প্রায়ই এরূপ দেখা যায় যে, মাতা যখন যাহা নিজে আহার করিয়া থাকেন, শিশু কদভ্যাস বশতঃ হাত পাতিয়া যাচ্ঞা করে, এবং নির্ব্বিকার ভাবে মাতা নিজ আহারের অংশ শিশুকে খাইতে দিয়া থাকেন। মাতা যাহা জীর্ণ করিতে পারেন, শিশুর পক্ষে তাহা একান্ত অসম্ভব, কাযেই রোগ দেখা দেয়। রিকেট হইবার পর পর্য্যন্ত এই ঘটনা চলিতে থাকিলে তাহা মারাত্মক বলিতে হইবে। এই বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। মাতার উপর কঠোর আদেশ দিতে হইবে, নিয়মিত পথ্য ব্যতিরেকে যাহাতে শিশু কোনরূপে নিষ্প্রয়োজনে কোন-রূপ আহার না পায়। (শিশুর আহার সম্বন্ধে শিশু-পালন পুস্তক দ্রষ্টব্য) উপযুক্ত বায়ু সেবনের অসুবিধা ঘটিলে যতদূর সম্ভব শিশুকে গৃহের বাহিরে রৌদ্র-আলোক-বায়ুযুক্ত স্থানে রাখিবে। পরিচ্ছদ ও আহারের সুবন্দোবস্ত করিবার পর তাহার পেটের অবস্থার দিকে মনোযোগী হইবে। পরিপাক-শক্তির ব্যতিক্রম, বমি, উদরাময় প্রভৃতি আছে কিনা, তাহা লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইবে।

আহারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় বা উদর সংক্রান্ত রোগের উন্নতি হইতে দেখা যায়। তাহাতে বিশেষ কোন ফল না হইলে ভাল করিয়া এক-খানি ফ্লানেল বা গরম কাপড় দ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া দিবে। পেটের উপর সদাসর্ব্বদা গরম পাওয়াতে যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়, ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। উদর সংক্রান্ত বহুবিধ পীড়ায় এই ব্যবস্থা পালনীয়, আমরা তাহা পরে লিপিবদ্ধ করিব। একখানি ফ্লানেল বরাবর রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। পরিচ্ছন্নতা একটী অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। শিশু শরীরে-ময়লা জমিয়া ক্লেদ নির্গমণের ব্যাঘাত না করে, বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। রিকেট রোগে শিশু বহুবার দুর্গন্ধযুক্ত তরল দাস্ত করে, তাহাতে বিছানা ও পোষাক ময়লা হয়। সেই সকল পরিষ্কার রাখিবে। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োজন হইতে পারে বা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা আমাদের এলাকার বাহিরে। যাহা হউক, পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আহারের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করিতে হইবে, এবং ক্রমশঃ সহজ পাচ্য পুষ্টিকর আহার দিবে। আহারের মাত্রা একেবারে বৃদ্ধি করিয়া দিলে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা। এই অবস্থায় Cod Liver oil ১০ হইতে ২০ ফোঁটা মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে।

দাঁত উঠিতে বিলম্ব হওয়া অতিশয় স্বাভাবিক দেহের পুষ্টির সহিত দন্তোদ্গমের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা দ্বারা ফল পাওয়া সম্ভব। লেখকের বাটীতে এইরূপ একটী রোগী ছিল, এখন অবশ্য সে বেশ সুস্থ ও সবল আছে, এবং তাহাকে দেখিলে কোনরূপে চিনিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার অসুখের সময় একজন বিশেষজ্ঞের কথামত বাজার হইতে ছাগলের "টেংরি" (পায়ের হাড়) ক্রয় করিয়া আনিয়া আগুণে পোড়াইতে দেওয়া হইত। হাড় পুড়িয়া লাল হইলে সেই জ্বলন্ত অঙ্গার আন্দাজ এক সের জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইত, এবং শিশুকে যতবার জল দেওয়া

প্রয়োজন বোধ হইত, সেই জল পান করিতে দেওয়া হইত। ইহাতে বিশেষ ফল লাভ হইয়াছিল। প্রত্যহ নূতন জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাহাড়িয়াদের মধ্যে এই ঔষধ খুব প্রচলিত আছে। ইহাতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা না থাকায় স্বচ্ছন্দে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

শিশু দাঁড়াইবার মতন সবল হইলে তাহাকে নিজ চেষ্টায় দাঁড়াইতে দেওয়া উচিত নয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রথম তাহাকে দাঁড়াইতে সাহায্য করিতে হইবে, নচেৎ পায়ের হাড় বাঁকিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং পরে তাহা দূর করা বড়ই কষ্টকর।

দেহ পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সহনযোগ্যে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিবে; তাহাতে শরীরে শীঘ্র শক্তি সঞ্চয় হইতে থাকে এবং শিশু রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

সর্দ্দি ও কাসি শিশুদের শীতকালের একটী প্রধান অসুখ; অন্য সময়ে ইহা দেখা যায় না, তাহা নহে, তবে শীতের প্রারম্ভে সচরাচর প্রায় সকল শিশু এমন কি বালক-বালিকাদেরও সর্দ্দি কাসি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সর্দ্দি কাসি নিজে কোন রোগ নহে অপর রোগের লক্ষণ মাত্র। আমরা যথা স্থানে তাহার আলোচনা করিব। আপাততঃ শিশুদের শীতের সর্দ্দি-কাসি সম্বন্ধে সামান্য দু এককথা বলিব।

বাঙ্গালা দেশে বর্ষা বন্ধ হওয়ার পর হইতে গরমের ভাব থাকে, এবং লোকে শিশুকে গ্রীষ্ম কালেরই মতন কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে না। সকল সময়েই দেহ অনাবৃত থাকে, সময় সময় প্রাতে বা সন্ধ্যায় সামান্য পোষাক পরাইয়া দেওয়া হয়। পরে শীতের আগমনে মাতারা কোন বিশেষ যত্ন লয়েন না, ফলে শিশুর দেহ মধ্যে শ্বাসনালী প্রভৃতি স্থানে সর্দ্দি জীবাণু শক্তি সঞ্চয় করিবার সুবিধা পায়। শরীর যদি উত্তমরূপে আচ্ছাদিত থাকে, এবং কোনরূপে দুর্ব্বল না হয়, সর্দ্দি বিশেষ উপদ্রব করিতে পারে না। অপরের দেহ হইতে সর্দ্দির জীবাণু শিশু-শরীরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। যাহাদের সর্দ্দিকাসি হইয়াছে, তাহাদের নিকট শিশুকে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। দেহ অনাবৃত অবস্থায় থাকিয়া ঠাণ্ডা প্রভৃতি লাগিয়াও সর্দ্দি কাসির সৃষ্টি করিতে পারে। সাবধানতা অবলম্বন করাই শিশুকে সর্দ্দি কাসির উপদ্রব হইতে রক্ষা করার প্রধান অস্ত্র।

সর্দ্দি কাসি হইলে শিশুকে উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে রোগ আর বৃদ্ধি লাভ করিতে না পারে। তাহা বলিয়া একই পোষাক বরাবর রাখা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। প্রয়োজন মত গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করিবে। গলার নিকট গরম কাপড় রাখা মন্দ নহে, কিন্তু সর্দ্দি কাসিতে শিশুরা প্রায়ই দুধ তুলিয়া ফেলে, সেইজন্য তাহা অপরিষ্কার হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, এবং, তাহা পরিষ্কার রাখিবার বন্দোবস্ত করিবে। তাহা না হইলে উহা হইতে রোগের জীবাণু মুখ বা নাসিকা দ্বারা দেহ মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করা সম্ভব, এবং রোগ শীঘ্র দূর করা কঠিন হইয়া পড়িবে।

সর্দ্দি কাসি হইলে রোগীকে আর ঠাণ্ডা লাগিতে দিবে না, কিন্তু সেই কারণে গৃহ একেবারে বায়ুশূন্য করিয়া দেওয়া অন্যায়। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে করা যাইবে। সর্দ্দি কাসিতে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে এইরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া দিবারাত্র ঘরের জানালা খুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। দেহের উপর দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া যাইতে দেওয়া উচিত নহে। গৃহ-মধ্যে বহু লোক থাকা হেতু গৃহের বায়ু নষ্ট হইয়া থাকে, সেকারণে সম্ভব হইলে বিশেষ কষ্টদায়ক সর্দ্দিকাসি রোগে, রোগীকে লইয়া স্বতন্ত্র ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করাই যুক্তি সঙ্গত। বিশেষ সাবধানতার সহিত শিশুকে লইয়া বাহিরে বেড়ান শিশুর পক্ষে সর্দ্দি রোগেও বিশেষ উপযোগী।

সাধারণতঃ রোগী গরমে স্বস্তি অনুভব করে; কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, সর্দ্দি রোগে গৃহ-মধ্যে বায়ুর উত্তাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাসিরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। সামান্য লক্ষ্য করিলে এ তথ্য জানিতে পারা যায়, এবং শিশুর সুবিধা মত ঠাণ্ডা বা গরম বায়ুতে থাকিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সর্দ্দিতে নাসিকা বন্ধ হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক এবং তাহাতে শিশুর নিশ্বাস লইবার পক্ষে বিশেষ কষ্ট হয়; ইহা স্ব স্ব অভিজ্ঞতা হইতে সকলেরই জানা আছে; এবং ইহার প্রতিষেধও সকলের নিশ্চয় জানা আছে। ইহা আর কিছুই নহে নাসিকা মধ্যে সরিষার তৈল দিয়া লওয়া। শিশু শ্বাস দ্বারা টানিয়া লইতে পারে না। একটা কাঠির মাথায় তুলা জড়াইয়া, সেই তুলা ২।৩ ফোঁটা তৈলে ভিজাইয়া নাসিকার ভিতর বুলাইয়া লওয়া ভাল। নাসা-গহ্বর তৈলাক্তমর্দ্দন থাকায় সর্দ্দি আটকাইয়া থাকিতে পারে না; গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যায়। ইহা সকলেরই জানা আছে, সেই জন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু লেখা বাহুল্য। সর্দ্দিতে নাক আটকাইয়া গেলে বা অত্যধিক কাসি হইলে শিশুকে মাথার দিকে একটু উঁচু করিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিবে, তাহাতে অনেক স্বস্তি অনুভব করিবে। যথা সম্ভব চিৎ হইয়া শয়ন করিতে দিবে না। সর্দ্দির সময় চিৎ হইয়া শয়ন করিলে, এবং নাসা বন্ধ থাকিলে স্বভাবতঃই শিশু "হাঁ" করিয়া নিশ্বাস লয়; তাহাতে গলার ভিতর পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায় ও শিশু অত্যন্ত কষ্ট পায়। বয়স্ক লোকে নিজের সুবিধা-মত ব্যবস্থা করিতে পারে. শিশুর ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বতন্ত্র।

সর্দ্দি হইলে শিশুরা কাসিতে কাসিতে প্রায়ই বমি করে ও সর্দ্দি তুলিয়া ফেলে। ইহা বেশ সুলক্ষণ। কিন্তু সর্দ্দি তুলিয়া ফেলার ফলে দেখা যায়, দুগ্ধ প্রভৃতি পান বা কিছু আহার করিবার পরে, কাসিতে কাসিতে তুলিয়া ফেলে; ইহাতে শিশু শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এতদবস্থায় শিশুর আহারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়াইতে যাইবে না। সর্দ্দি কাসিতে গলনালীর ভিতর শ্লেষ্মা জাতীয়-দ্রব্য জমে ও নলীর স্থানে স্থানে প্রদাহ হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগিলে প্রায়ই কাসি অধিক হইয়া থাকে। সে কারণে শিশুকে তরল কোন দ্রব্য পান করাইবার সময় ঈষদুষ্ণ করিয়া লইবে, এবং একই সময় অধিক পরিমাণে দিতে চেষ্টা করিবে না। শিশু কাসিবার উদ্রেক করিলে তখনকার মত বন্ধ রাখা যাইতে পারে। এইভাবে শিশুর শক্তি রক্ষা করিতে হয়।

শিশু কোনরূপে সর্দ্দি তুলিতে পারিলে তাহার আর গিলিয়া ফেলিতে দিবে না। অতি শিশুর পক্ষে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাহারা কথা বলিতে ও বুঝিতে পারে, তাহা-দিগকে ভাষায় ও আকারে ইঙ্গিতে, কিভাবে সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দিয়া, সর্দ্দি তুলিয়া ফেলা শিখাইয়া দিবে। অবশ্য যে সর্দ্দি উঠিয়া যায় তাহা অন্ত্রের মধ্যে গিয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়, কোন বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

শিশুর সর্দ্দিতে মৃদু জোলাপ বিশেষ উপকারী। বেলপাতার রস প্রভৃতি যে সকল জোলাপ গৃহস্থের নিকট প্রচলিত আছে তাহাতেই উপকারের সম্ভাবনা। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে সর্দ্দির প্রকোপ মৃদু হইতে বাধ্য। এবিষয়ে কোনরূপে অবহেলা করা উচিত নহে।

সহ্যমত গরম জলে নিয়মমত স্নান করান ভাল। দেহে জল লাগিয়া না থাকিলে কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। গায়ে একেবারে শীতল জল দেওয়া বিধি নহে। অন্ততঃ গায়ের উত্তাপের মত জলের উত্তাপ হওয়া প্রয়োজন। ঐ জলে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়া লইতে পারিলে সর্দ্দি কাসিতে উপকার হয়। সর্দ্দি কাসিতে বিশেষ কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তাহাকে অধিক বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া উচিত নহে। ইহা হইতে শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত গুরুতর পীড়ার আবির্ভাব হওয়া অস্বাভাবিক নহে। পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বনে সকল রোগের ন্যায় এ রোগেও বহু উপকার দর্শে।

গৃহস্থকে একটী কথা বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। অতি প্রবল কাসি যে প্রবল রোগের লক্ষণ তাহা নহে। গলনালীর অংশবিশেষে প্রদাহ হেতু কাসির বেগ নির্ভর করে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে কাসির বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবার কথা যেন ভুল না হয়।

সর্দ্দির পরিমাণ, কাসির বেগ, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের আবির্ভাব হইলে বুঝিতে হইবে, রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগ ক্রমে দেখা দিতে পারে। সে সকল বিষয় পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

ঔষধার্থ নীলাঞ্জন *।

(Therap uti s of Antimony.)

[ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস]

উৎপত্তি ঃ—পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষতঃ বার্ণিয়ো প্রভৃতি অঞ্চলে অতি অল্প পরিমাণে অবিমিশ্রিত নীলাঞ্জন বা এন্‌টিমনি পাওয়া যায়। ইহা খনিজ এবং ধাতব পদার্থ। ইহা খনির মধ্যে অম্লজান-(Oxygen)এর সহিত শ্বেত নীলাঞ্জনরূপে (White Antimony) কখন বা গন্ধকের (Sulpner) সহিত মিশ্রিতভাবে ধুসর নীলাঞ্জন (gray Antimony) রূপে বিরাজ করে। এই শোষোক্ত গন্ধক মিশ্রিত নীলাঞ্জন হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঔষধার্থ নীলাঞ্জন পৃথক করিয়া লওয়া হয়।

গন্ধক-মিশ্রিত নীলাঞ্জন হইতে নীলাঞ্জন পৃথক করিবার সংক্ষিপ্ত প্রণালী ঃ—গন্ধক-মিশ্রিত খনিজ নীলাঞ্জনকে প্রথমে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একটী সীসক নির্ম্মিত সরায় কিম্বা পাত্রের Plumboys crucible) উপর কতকগুলি লৌহ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিতে হয়। যতই মিশ্রিত নীলাঞ্জন গলিতে থাকে, উহার গন্ধক অংশ ততই লৌহ চূর্ণের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত হইয়া আইরণ সালফাইড (Iron Sulphide) নামে একটী পদার্থের সৃষ্টি করে। তখন মূল নীলাঞ্জন ধাতু পৃথক হইয়া পড়ে।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব ঃ—মূল ধাতু দেখিতে উজ্জ্বল, ঈষৎ নীলাভ, শ্বেতবর্ণ এবং দানাকর। ইহা ৪৫০ ডিগ্রী উত্তাপে গলিত হয় এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৬·৭ হইতে ৬·৮ পর্য্যন্ত।

মানব দেহে এন্টিমনির গুণাগুণ যাহা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার দ্বারায় স্থির করিয়াছেন, মূলতঃ তাহারই ফলাফল বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে।

ইতিবৃত্ত ঃ—ঔষধার্থ এন্টিমনির ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। তখন উহা ঔষধের মধ্যে ব্যবহার করা যায়—এই পর্য্যন্ত ধারণা চিকিৎসকদের ছিল; কিন্তু কোন্ বিশেষ ব্যাধিতে যে কিরূপভাবে ইহার অব্যর্থ ফলপ্রদ ক্রিয়া আছে, তাহা কেহই জানিতেন না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এড্রেনডি মিন্‌সিট (Adrainde Mynsicht) টার্টার এমিটিক (Tartar Emitic) নামক এন্টিমনি-ঘটিত লবণ প্রস্তুত করেন, এবং ক্রমান্বয়ে এন্টিমনির অন্যান্য লবণ (Salt)-গুলিও প্রস্তুত হয়। কিন্তু তখনকার দিনে যে-সে রোগে এন্টিমনির অপব্যবহার করায় বহু সংখ্যক রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এমন কি প্লেগাক্রান্ত এবং বিবিধ প্রকার সংক্রামক (Infectious) রোগগ্রস্ত রোগীকেও এন্টমনি ব্যবহার করানোয় বহু-সংখ্যক রোগী কাল-কবলিত হয়। অতঃপর বাধ্য হইয়া আইন দ্বারা ঔষধার্থ এন্টিমনির প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ডাক্তার কাশ্‌নি-(Dr. Cushny) তাঁহার পরীক্ষাগারে ট্রিপানোসাম্

* বিশেষভাবে পল্লী-চিকিৎসক ও মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া ইহা লিখিত।

(Trypanosomes) আক্রান্ত কতকগুলি মানবেতর জীব-দেহে এন্টিমনি প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সুফল পান। তৎপরে তিনি উক্ত জীবাণু-আক্রান্ত যে-কোন রোগীকে এন্টিমনি প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ইহার পর দেখা গিয়াছে যে, ট্রিপানোসাম ব্যতীত অন্যান্য ২।১টী পরাঙ্গপুষ্ট জীবাণু-(Parasites) সংক্রান্ত রোগীতে ইহার প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আর্সেনিক (Arsenic), বিস্‌মাথ (Bismuth), এন্টিমনি (Antimony)-ঘটিত ঔষধসকল ১—২০০,০০০ তরলীভূত হইয়াও ট্রিপানোসাম জাতীয় জীবাণু ধ্বংস করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

[এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে, উক্তবিধ জীবাণু স্লিপিং সিকনেস্ বা Sleeping Sickness নামক ব্যাধির জন্য দায়ী। এই ব্যাধিতে রোগীর জ্বর হয়, জ্বরের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকে না। রোগীর দেহে এক প্রকার গুঁটী (Rash) বাহির হয়। রোগীর গণ্ডমালা ফুলিয়া উঠে। রোগী নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর থাকে এবং পরিশেষে নিদ্রিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।]

যদিও প্রোটোজোয়ার (Protozoa)-উপর এন্টিমনির কোনও প্রত্যক্ষ ধ্বংশকারী শক্তি নাই, তথাপি উক্ত জাতীয় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত রোগীকেও অনেক ক্ষেত্রে এন্টিমনি প্রদানে সুফল পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ কাশ্‌নি দেখাইয়াছেন, ১—৫০০,০০০ গুণ তরলীভূত হইয়াও ইহা শোণিত মধ্যস্থিত ট্রিপানোসাম ধ্বংশ করিতে সক্ষম। আধুনিক যুগে চিকিৎসকগণের বিচারে কুইনাইনের যেরূপ ম্যালেরিয়া-জীবাণু ধ্বংসের বিশিষ্ট শক্তি (Specification) আছে, এন্টিমনিরও সেইরূপ ট্রিপানোসাম জাতীয় বীজাণু ধ্বংসের অব্যর্থ ক্ষমতা আছে।

মানব-শরীরে ইহার ক্রিয়া।

বাহ্যিক প্রয়োগ—বাহ্যিক প্রয়োগে এন্টিমনি-ঘটিত ঔষধসকল চর্ম্মের স্থানিক উগ্রতাসাধক। চর্ম্মের উপর ঘর্ষণ করিলে চর্ম্মের প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং চুলকানির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটী বাহির হয়, উহার অভ্যন্তরে জলের মত একরূপ পদার্থ থাকে ও উহা পরিণামে পূঁযের আকার ধারণ করে।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ

অন্নবহানালীর উপর ক্রিয়া—(Alimentary canal) এন্টিমনি-ঘটিত ঔষধসকল সেবনে মুখ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত, এমন কি অন্ত্রের মধ্য পর্য্যন্ত, উষ্ণতা অনুভূত হয়, এবং উক্ত নালীর প্রবল উগ্রতা সাধিত হয়। অতি অল্প মাত্রায় কোন কোন রোগীর ক্ষুধা-মান্দ্য এবং বিবমিষা উপস্থিত হয়। ২।৩ গ্রেণ মাত্রা সেবনে অত্যন্ত বমন হয় এবং জলবৎ ভেদ, উদরের কামড়ানি এবং কুন্থনাধিক্য হয়। এন্টিমনি পাকস্থলীতে অম্লরসের সহিত এবং অন্ত্র-মধ্যে ক্ষার রসের সহিত মিশিয়া উহাদের ক্রিমি-গতি (Peristaltic movement) অত্যন্ত বৃদ্ধি করে।

রক্তসঞ্চালন যন্ত্র ঃ—দ্রবনীয় এন্টিমনি-সল্ট সকল শোষিত হইয়া রক্তের সহিত হৃৎপিণ্ডে গমন করে। ইহা হৃৎপিণ্ডের পক্ষে প্রবল অবসাদক। ইহা হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীসমূহকে শক্তিহীন করিয়া ফেলে এবং ইহার নিয়মিত গতিকে অনিয়মিত করে। এন্টিমনি-সল্ট-সকল শোণিতের শ্বেত-কণিকা ধ্বংশ করে; এবং ধামনিক সঞ্চাপের (arterial pressure) হ্রাস করে। উহা প্রধানতঃ ত্রিবিধ উপায়ে সাধিত হয় ঃ—১। হৃৎ-পিণ্ডের অবসাদ আনয়ন করিয়া, ২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনিগুলিকে সম্প্রসারণ এবং শিথিল করিয়া, ৩। জলবৎ ভেদ-বমন ইত্যাদি করাইয়া।

শ্বাস-প্রশ্বাস।—এন্টিমনির দ্বারা বমন ইত্যাদি হইলে প্রথমতঃ ঈষৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরক্ষণেই উহার গতি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং অবসাদ-গ্রস্ত হয়। শ্বাস অল্পকাল-স্থায়ী, নিশ্বাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; কখনও কখনও প্রাণদা নাড়ীর (Vagus nerve) অবসাদ হেতু শ্বাস-কষ্ট হইয়া থাকে। এন্টিমনি ফুসফুসের মধ্যে গিয়া তত্রত্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ উপস্থিত করে;

ফুসফুসে রক্তাধিক্য হয়। কখনও কখনও রক্তাধিক্য হেতু শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি করে, এবং কখনও কখনও শ্লেষ্মা নির্গত হয়। কখনও কখনও ফুসফুসের রক্তাধিক্য বশতঃ শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয়। রক্ত হইতে শোষিত হইয়া এণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধসকল ক্রমশঃ পেশী-সমূহের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং ক্রমশঃ যকৃত, প্লীহা ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে; কাহারও কাহারও মতে এণ্টিমনি যকৃতে গিয়া পিত্ত নিঃসরণ করায়।

নাড়ীর উপর (nerves)।—নাড়ীসমূহের উপর এণ্টিমনি অবসাদক। অধিক মাত্রায় সংজ্ঞাবহা (Sensory), চেষ্টাবহা (Motor) নাড়ীসমূহ এবং সুষুম্না কাণ্ডের বা মেরুবিক নাড়ীরজ্জুর (spinal cord) প্রবল অবসাদ আনয়ন করে। মানসিক দৌর্ব্বল্য, কর্ম্ম-বিমুখতা, গা ম্যাজ ম্যাজ করা, শারীরিক শক্তিহীনতা ইহার অন্যবিধ লক্ষণ। ডাঃ চোপ্‌রা (Dr. Chopra) পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এণ্টিমনির অরগ্যানিক-সল্ট—ইউরিয়া ষ্টিবামিন (Urea Stibamine), সোডিয়ম এণ্টিমনি (Sodium Antimony), ভন হিডেন ৪৭১ ও ৬৯৩ (Von hyden), এমাইনো ষ্টিবুরিয়া (Amino-stiburea), গ্লুকোসাইড্ ষ্টিবুরিয়া (Glucoscide stiburea) প্রভৃতি সকলেই একদিকে অল্পাধিক পরিমাণে হৃৎপিণ্ড, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং ধামনিক সঞ্চাপের অবসাদ আনয়ন করে, এবং অন্যদিকে ফুসফুসের রক্তসঞ্চাপের (Pulmonary blood pressure) বৃদ্ধি করে, প্লীহার আয়তনের (Splenic volumeএর) এবং অন্নবহা-নালী ও বৃক্কদ্বয়ের আয়তনের হ্রাস করায়।

দৈহিক উত্তাপ—রক্ত-সঞ্চালনের অবসাদ হেতু এবং উত্তাপ উৎপাদন ক্রিয়ার হ্রাস হেতু দৈহিক উত্তাপের যথেষ্ট হ্রাস হয়। রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়, এবং রোগী হিমাঙ্গ হইয়া পড়ে।

নির্গমনের পথ।—এণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধসকল মানব-দেহে তাহাদের ক্রিয়া প্রকাশের পর, দেহ হইতে ঘর্ম্ম, থুথু, কাস, পোঁটা, মল ও মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। প্রায় মোট ঔষধের ½ অংশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়।

এণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধসকলকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। **ইন্‌অরগ্যানিক কমপাউণ্ডস্ (Inorganic-Compounds)।**—যথা, এণ্টিমনি সালফিউরেটাম্ (Antimony sulphuratum), এণ্টিমনি অক্সাইড (Antimony oxide) প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই; সুতরাং ইহাদের বিষয় আলোচনা এস্থলে নিষ্ফল। ডাঃ ব্রহ্মচারী মেটালোন (Metalone) নামক এণ্টিমনির সূক্ষ্মতম গুঁড়া শিরার ভিতর অন্তঃক্ষেপ (Injection) করিয়া অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ইহার বিষয় তিনি তাঁহার পুস্তকে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

২। **অরগ্যানিক কমপাউণ্ডস্ (Organic Compounds)।**—যথা টার্টার এমিটিক্—ইহাতে এণ্টিমনি শতকরা ৩৬·১৭ ভাগ; সোডিয়াম এণ্টিমনি টার্ট—শতকরা ৩৮·০১ ভাগ এণ্টিমনি; এমোনিয়ম এণ্টিমনি টার্ট (Ammonium Antimony tart) শতকরা ৩৬·৫ ভাগ এণ্টিমনি, লিথিয়াম এণ্টিমনি টার্ট (Lithium Antimony tart)—শতকরা ৩১·৩৬ ভাগ এণ্টিমনি; সোডিয়ম এসিটিল প্যারা-অ্যামাইনো ফিনিলষ্টিবিয়েট (Sodium acetyl para-amino-phenylstibiate)—৪০·০১ ভাগ এণ্টিমনি। যাহ-হউক, উল্লিখিত এণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে টার্টার এমিটিক্ এবং সোডিয়ম টার্ট এই দুইটী বেশীর ভাগ ব্যবহার হইয়া থাকে; এই দুটীর মধ্যেও আবার আধুনিক চিকিৎসকগণ সোডিয়ম টার্টকেই বেশী পছন্দ করেন। কারণ ইহার বিষ-ক্রিয়া টার্টার এমিটিক অপেক্ষা অনেক কম।

অরগ্যানিক কমপাউণ্ডস্ দুইভাগে বিভক্ত। যথা:—

(অ) অ্যালিফ্যাটিক কমপাউণ্ডস্ (Aliphatic Compounds) বর্ত্তমান চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। (আ) অ্যারোমেটিক কমপাউণ্ডস্ (Aromatic Comps.) যথা—হাইপার এসিড এণ্টিমনি ইউরেথেন্ (Hyperacid Antimony with urethrane) মাংসপেশীর মধ্যে অন্তঃক্ষেপ করিবার উপযোগী। ষ্টিবাসিটিন কিম্বা ষ্টিবেনিল (Stibacitin or Stybenyl) চিকিৎগণের হস্তে সুযশ অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ট্রাইফিনিল ষ্টিবাইন সালফাইড্ (Triphenyl Stibine Sulphide) অপর নাম সালফো-ফোরাম্ (Sulpho-foram)—সোরাইএসিস্ (Psoriasis), একজিমা (Eczema) প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগে উপকারী; লুয়ারগোল (Luargol) প্রভৃতি, শ্লিপিং সিক্‌নেস্, উপদংশ (Syphilis) প্রভৃতি রোগেও উহা সুফলপ্রদ। ডাঃ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ইউরিয়া ষ্টিবামিন, ভনহিডেন এমাইনো ষ্টিবিউরিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে চিকিৎসকগণ ইউরিয়া ষ্টিবামিন এবং ভন্‌হিডেন ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছেন। ডন্‌হিডেন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি কম। তবে ইউরিয়া ষ্টিবামিন কালাজ্বরে ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত সুফল পাইয়াছি। আমাদের মত অন্যান্য চিকিৎসকগণও শত মুখে ইহার প্রশংসা করেন।

কালাজ্বরে এণ্টিমনি-ঘটিত এরোমেটিক কম্পাউণ্ডস্-এর মধ্যে ইউরিয়া ষ্টিবামিনেরই আরোগ্যকারী ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক দেখিয়াছি। কাহারও কাহারও মুখে ভন হিডেনেরও সুখ্যাতি শুনিয়াছি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইহাদের মূল্যাধিক্য বশতঃ পল্লীগ্রামের দরিদ্র রোগীগণ এই চিকিৎসার ব্যয়-ভার বহন করিতে পারে না।

বিভিন্ন ব্যাধিতে ব্যবহার

বর্ত্তমান যুগে যে সকল ব্যাধিতে এণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধসকল ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

রোগীকে বমন করাইবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে টার্টার এমিটিক ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইহার ক্রিয়া অত্যন্ত বিলম্বে হয়, অপিচ ইহা অন্ত্রের প্রদাহ আনয়ন করে এবং রোগীকে হিমাঙ্গ করিয়া অবসাদগ্রস্ত করে বলিয়া অধুনা চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। কফ্ নিঃসরণ করিবার ক্ষমতা এবং জ্বর ত্যাগ করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া কেহ কেহ ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), নিউমোনিয়া (Pneumonia), প্রভৃতি রোগে ভাইনাম এণ্টিমনি (Vinum Antimony) প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঃ নিজার (Dr. Neisser) টার্টার এমিটিক এবং এণ্টিলিউটিন্ (Antileutin) চর্ম্মের উপরিস্থ উপদংশ-ক্ষতে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। কিন্তু এণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধসকলের উপদংশ-রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা—আর্সেনিক, পারদ এবং বিসমাথ ঘটিত ঔষধের তুলনায় অনেক কম। পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে, ম্যালেরিয়া-জীবাণুর উপর এণ্টিমনির কোনও ক্রিয়া নাই। কাহারও কাহারও মতে, কুষ্ঠ-ব্যাধি যখন ফুসফুস্ আক্রমণ করে, তখন এণ্টিমনি চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়।

গোদ্ বা শ্লীপদ (Filariasis)—কেহ কেহ উক্ত ব্যাধিতে এণ্টিমনি ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ চোপরা ও ডাঃ নেপিয়র বলেন, উক্ত ব্যাধিতে এণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধসকল সাময়িক উপকার দর্শায় মাত্র।

শ্লিপিং সিকনেস্ (Sleeping sickness)—ভারতবর্ষে এই ব্যাধির আবির্ভাব আজ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া না গেলেও ডাঃ চোপরা ইষ্ট আফ্রিকাতে এটক্সিল (Atoxyl) এবং টার্টার এমিটিক অন্তঃক্ষেপ করিয়া অনেক কেস আরোগ্য করিয়াছেন।

বিল্‌হারজিয়াসিস (Bilharziasis)—এই ব্যাধিও ভারতবর্ষে দেখা যায় না। ডাঃ ক্রিষ্টোফর (Dr. Christopher) টার্টার এমিটিক অন্তঃক্ষেপ করিয়া অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

ওরিয়েণ্টাল সোর (Oriental sore), ফ্রণ্টিয়ার সোর (Frontier sore), দিল্লী বয়েল (Delhi boil), লাহোর সোর (Lahore sore), বাগদাদ বয়েল (Bagdad boil) প্রভৃতি ক্ষত বা

কোটক ভারতের উত্তর প্রান্তস্থিত দেশসমূহে অত্যন্ত দেখা যায়। এক কিম্বা দুই পারসেণ্ট টার্টার এমিটিক্ মলমরূপে ব্যবহার করিয়া উক্ত রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু টার্টার এমিটিক্ দুই পারসেণ্ট সলিউসন শিরার ভিতর অন্তঃক্ষেপ করিয়া আরও অধিক সুফল পাওয়া গিয়াছে। নাগা-সোর (Naga sore), কাছার-সোর (Kachhar sore)—লিস্‌মেনিয়া-বীজাণু (Leishmania) হইতে উৎপন্ন না হইলেও টার্টার এমিটিক মলমে এবং শিরার ভিতর অন্তঃক্ষেপে সুফল পাওয়া গিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়।

কালাজ্বর (Kala-azar)

১৯২৪ সালের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায়, একা বঙ্গদেশে যাহারা হাঁসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অন্যান্য চিকিৎসা-কেন্দ্রে কালাজ্বরের চিকিৎসার্থ আসিয়াছিল, এরূপ রোগীর সংখ্যা ১,৩৯,০৮৫। উক্ত বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে আরও জানা যায়, কালাজ্বরে বার্ষিক মৃত্যুহার অন্ততঃপক্ষে ৫০,০০০ হাজার। ১৯২৩ সালে ডাক্তার নেপিয়রের হিসাব মত দেখা যায়, বাঙ্গালায় ৪,৬০,০০,০০০ লোকের মধ্যে নিম্নতন সংখ্যা ১৫,১৮,০০০ হইতে উর্দ্ধ সংখ্যা ২৬,৬৮,০০০ কালাজ্বর রোগী।

লিস্‌ম্যান-ডোনোভান বডি (Leishman-Donovan body) নামক সূক্ষ্মতম জীবাণু কালাজ্বরের উৎপত্তির জন্য দায়ী। উক্ত জীবাণু ধ্বংস করিতে বর্ত্তমানে এণ্টিমনির ন্যায় দ্বিতীয় ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। কালাজ্বর চিকিৎসায় এণ্টিমনি ব্যবহার হইবার পূর্ব্বে প্রায় শতকরা ৯৫টী রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে এণ্টিমনির চিকিৎসায় শতকরা ৯৫টী রোগী নিরোগ হইতেছে। এণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধ কালাজ্বরের সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। যে সকল মহাত্মা আমাদের দেশে কালাজ্বরে-এণ্টিমনি চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ভারতবাসী মাত্রেই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এণ্টিমনি-ঘটিত সল্ট্‌সবলের মধ্যে টার্টার এমিটিক এবং সোডিয়ম টার্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং অল্প মূল্যের ঔষধের মধ্যে ইহাদের আরোগ্যকারী ক্ষমতাও অধিক।

মাত্রা।—পূর্ণ বয়স্ক রোগীর পক্ষে দুই পারসেণ্ট সলিউসন অর্দ্ধ সি, সি, অথবা এক সি, সি, হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধ মাত্রা পাঁচ সি, সি, পর্য্যন্ত ইনজেক্‌সন দিবেন। প্রতি ইনজেক্‌সনের মাত্রা পরবর্ত্তী ইন্‌জেক্‌সনে অর্দ্ধ সি, সি, করিয়া বৃদ্ধি করিবেন এবং সপ্তাহে অন্ততঃ ২টী করিয়া ইনজেক্‌সন দিবেন, অবশ্য যদি কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়। কেহ কেহ এক দিন অন্তর একদিন একটী করিয়া ইন্‌জেকসন দিয়া থাকেন; কিন্তু সকল সময়ে ইহা নিরাপদ ও যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা ১½ সি, সি, হইতে আরম্ভ করিয়া, উর্দ্ধতম পাঁচ সি, সি, পর্য্যন্ত ইনজেকসন দিয়া কোন অসুবিধা অনুভব করি নাই। তবে বাধ্য হইয়া কয়েকটী রোগীকে আমাদের ৭ সি, সি; পর্য্যন্ত ইনজেক্‌সন দিতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে একজন ব্যতীত আর কাহারও কোনও অসুবিধা হয় নাই। তথাপি একটা নিয়ম করিতে গেলে বলিতে হয়, ৫ সি, সি,র উপর ইনজেক্‌সন না দেওয়াই ভাল।

আমরা সপ্তাহে দুইটী ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ারই পক্ষপাতী। পূর্ণ বয়স্ক রোগী অপেক্ষা শিশুগণ এণ্টিমনি বেশী সহ্য করিতে পারে। ২ হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুকে নিম্নতম ½ সি. সি, হইতে উর্দ্ধতম ২½ সি, সি, এমন কি ৪ সি, সি, পর্য্যন্ত ইনজেকসন দিতে পারা যায়। কিন্তু আমরা ২½ সি, সি, হইতে ৩½ সি, সি,র উপর কখনও যাই নাই; বিশেষতঃ দুই বৎসরের শিশুকে ২ সি, সি,র উপর কখনও ইনজেক্‌সন দিতে সাহস করি নাই। ডাক্তার ব্রহ্মচারী ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুকে ২½ সি, সি, র উপর ইনজেক্‌সন দিতে নিষেধ করেন; এবং তিনি ৫ হইতে ১০ বৎসর শিশুকে ৩½ সি, সি, উর্দ্ধতম মাত্রা ইনজেকসন দিতে উপদেশ দেন। শিশুগণের মাত্রা পরবর্ত্তী ইনজেকসনে ½ সি, সি, করিয়া ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা যায়। এণ্টিমনি-ইনজেকসন্-চিকিৎসাকালে যদি নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে

পরবর্ত্তী ইনজেকসন ½ সি, সি, মাত্রা কমাইয়া আনিবেন, না হয় যতদিন পর্য্যন্ত প্রতিবন্ধক দূরীভূত না হয়, ততদিন ইন্‌জেক্‌সন্ বাধ্য হইয়া বন্ধ রাখিবেন। নচেৎ অনেক সময় হিত করিতে গিয়া অহিত হইয়া পড়ে।

ইঞ্জেক্‌সনের প্রতিবন্ধকসকল।—সাধারণতঃ দেখা যায়, এণ্টিমনি ইন্‌জেক্‌সনের পর রোগীর জ্বর বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু পর পর কয়েকটী ইন্‌জেক্‌সনের পর জ্বর কমিয়া আসে। ডাঃ ব্রহ্মচারী বলেন, এই জ্বর আর কিছুই নহে, ইহা শরীর-অভ্যন্তরে এণ্টিমনির দ্বারা ব্যাধির জীবাণুর ধ্বংসের জন্যই ঘটিয়া থাকে। ডাঃ চোপ্‌রা এবং ডাঃ নেপিয়র বলেন, ইহা প্রোটিন্-শক্ (Protein shock)।

যে কারণেই হউক, এণ্টিমনি ইন্‌জেক্‌সনের পর জ্বর যদি একাদিক্রমে বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস না পায়, তাহা হইলে ঔষধের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি না করিয়া পরবর্ত্তী ইন্‌জেকসনের মাত্রা কমাইয়া আনিবেন। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্, যক্ষ্মা (Tuberculisis)আক্রান্ত-রোগীকে এণ্টিমনি ইন্‌জেক্‌সন দিবেন না। অত্যধিক রক্তহীনতা বশতঃ হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা আনয়ন করিলে এবং যে কোন কারণেই হউক যদি হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক সম্প্রসারণ (dilatation) থাকে, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় রোগীর ইন্‌জেক্‌সন্ সাবধানের সহিত দিবেন। বৃক্কদ্বয়ের (Kydneys) ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য থাকিলে, উক্ত প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিবেন। উদরাময়, আমাশয়, প্রভৃতি দেখা দিলে আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত চিকিৎসা বন্ধ রাখিবেন।

এণ্টিমনি-প্রয়োগ-প্রকরণ

(১) বাহ্যিক প্রয়োগ।—(অ) মলমরূপে দুই পার্‌সেণ্ট টার্টার এমিটিক এবং সোডি বাইকার্ব্বনেট (Sodi-bicarbonate) ও বিশুদ্ধ ল্যানোলিন (Lanoline) মিশ্রিত করিয়া ওরিয়েণ্টাল সোর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

(আ) মেটালিক এণ্টিমনি কিম্বা এণ্টিমনি-সল্ট ৫ হইতে ১০ পারসেণ্ট পর্য্যন্ত ল্যানোলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া কালাজ্বর গ্রস্ত রোগীর প্লীহা ও যকৃতের উপর মালিশ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে এণ্টিমনি শোষিত হইতে পারে। কিন্তু মাত্র এইরূপ এণ্টিমনি-প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া কোন রোগীরই চিকিৎসা করা উচিত নয়। কারণ ইহার ফল আজ পর্য্যন্ত সন্তোষজনক বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। তবে যুগপৎ শিরার মধ্যে এণ্টিমনি সলিউসন প্রয়োগ এবং বাহ্যিক প্লীহা-যকৃতাদির উপর এণ্টিমনির মলম মালিস করিলে অনেক সময় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে ফল হইতে দেখা যায়, এবং খুব শক্ত প্লীহাও অল্প সময়ের মধ্যে নরম হইতে দেখা যায়।*

ক্রমশঃ।

* লেখক এণ্টিমনির বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন—রসাঞ্জন; কিন্তু সাধারণ ইংরাজী-বাংলা অভিধানে এই প্রতিশব্দ থাকিলেও ইহা অসঙ্গত বুঝিয়া আমরা তৎপরিবর্ত্তে 'নীলাঞ্জন' শব্দটি বসাইয়া দিয়াছিলাম। প্রবন্ধ-ছাপার শেষে অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পারিতেছি যে, খনিজ অবিশুদ্ধ এণ্টিমনিকে অর্থাৎ যে অবস্থায় তাহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে গন্ধক মিশ্রিত থাকে, সেই অবস্থায় তাহাকে নীলাঞ্জন বলা যাইতে পারে; কিন্তু মূল শুদ্ধ এণ্টিমনি ধাতুর সঠিক পরিভাষা হওয়া উচিত 'সৌবীরম্'। রসবিজ্ঞানবিৎ শ্রীযুত উমাপতি বাজপেয়ী মহাশয় এই পরিভাষা সমর্থন করেন। 'রসরত্ন-সমুচ্চয়' গ্রন্থে stibnite এর নাম 'সৌবীরাঞ্জন' দেওয়া হইয়াছে।—স্বা, স, সম্পাদক।

আগামী মাস হইতে সুবিখ্যাত ডাক্তার নরেন দাস মহাশয়ের 'জীবন-কল্যাণের' অবশিষ্টাংশ ধারাবাহিক-ভাবে পূর্ববৎ প্রকাশিত হইবে।

কাইজার এখনো একচ্ছত্র অধীশ্বর !

| শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু |

প্রবন্ধের শীর্ষদেশ পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই সকলে আমাকে পাগল ঠাহর করিবেন এবং রাঁচি মেণ্টাল্ হস্পিটালে প্রেরিত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন। কিন্তু কথাটা আপনারা যে দিক দিয়া গাঁজাখুরি গল্প বলিয়া মনে করিতেছেন, সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক দিয়া সেই কথাটিকে আমি নিছক্ সত্য বলিয়া প্রকাশ করিতে চাহিতেছি। পাগল যে, সে নিজেকে কিছুতেই পাগল বলিয়া বিশ্বাস করে না ; আমার কৈফিয়ৎ শুনিয়া আপনারাই বিচার করিয়া বলিবেন—আমি পাগলের মত কথা বলিয়াছি কি না ! পাঠকগণ, একটা কথা এখানে স্মরণ রাখিবেন,—আপনারা খবরের কাগজ পড়িতেছেন না, পড়িতেছেন স্বাস্থ্য-সমাচার—যাহার সহিত রাষ্ট্র--নীতির খুব কমই সম্পর্ক ! এখন অনুমান করিতে পারেন কি, কাইজার এখনো একচ্ছত্র অধীশ্বর কোন্ জায়গার ?—জার্মান সাম্রাজ্যের নহে, তদপেক্ষা মহত্তর দেহ-রাজ্যের তিনি রাজ-চক্রবর্ত্তী।

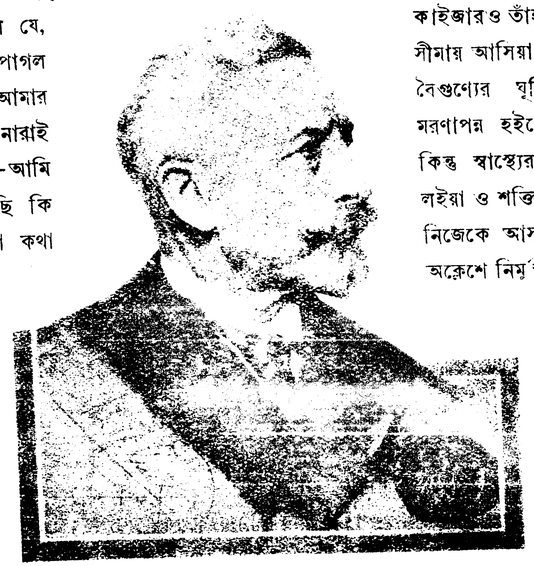

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে, ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ উইলিয়াম্ কাইজার, ভগ্ন দেহ ও অবসন্ন মন লইয়া হল্যাণ্ডে আসিয়া ডেরাডাণ্ডা বিছাইলেন। বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে পরাজয়ের কালিমা মাখিয়া, বিশাল্ সাম্রাজ্য হারাইয়া ও কোটি কোটি লোকের অভিসম্পাত কুড়াইয়া, কাইজারের দেহ-মনের যে তখন কি শোচনীয় দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা জগতের কোনো শক্তিশালী কবি বা দার্শনিকের বর্ণনা বা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই।

ইহা প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। ঘটনা-বিপর্য্যয়ের এই গুরুভারে হয় ত একজন সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হইয়া কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেন। কাইজারও তাঁহার ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের চরম সীমায় আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন, ভাগ্য-বৈগুণ্যের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া তিনিও মরণাপন্ন হইতে বসিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রতি যথাতিরিক্ত যত্ন লইয়া ও শক্তিচর্চায় মনোযোগী থাকিয়া, নিজেকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে অক্লেশে নির্ম্মুক্ত করিয়াছেন।

জন্ম হইতেই তাঁহার বাম হস্তটি পঙ্গু ছিল, কিন্তু এই পঙ্গুত্বের প্রতিবন্ধক তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে শরীর-চর্চায় সমধিক উৎসাহী হইতে শিক্ষা দিয়াছিল। তিনি গোড়া হইতে জীবনের সকল অভ্যাস ও আচরণে অত্যন্ত সংযত, এবং এমন একটি দিন বোধ হয় তাঁহার কাটে নাই—যেদিন তিনি কোনো-না-কোনো আকারের শারীরিক পরিশ্রম করিতে ভুল করিয়াছেন। এই শরীর রক্ষায় অনন্যচিত্ত হইয়াই তিনি তাঁহার নষ্টপ্রায় শক্তি ও স্ফূর্ত্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন।

আজ তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর। আমাদের দেশে ৬৮ বৎসর বাঁচা একটা বিস্ময়ের কথা। যাহারা বাঁচেন,

যাহারা ঘরের কোনে বসিয়া বুড়ো তোতার মত শুধু মাথা নাড়েন, নহে বড় জোর দাওয়ায় বসিয়া একটু পরচর্চা করেন বা হরিনামের মালা ঘুরান। পাশ্চাত্যে ৬৮ বৎসর বাঁচা মোটেই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে ; তাঁহারা ঘর ছাড়িয়া বাহিরেও বাহির হন, প্রত্যহ ২।৩ মাইল প্রাতভ্রমণও করেন, আবার প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেন। কিন্তু কাইজার শুধু তাহাই করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তাহারও অনেক কিছু বেশী করেন ; এবং তাহার ফলে, আজ তিনি বাংলার পঁচিশ বৎসরের চারি পাশ-করা চশমাধারী তথাকথিত তরুণের চেয়ে সবল, সুস্থ ও শক্তিমান্। কেবল মাথায় অধিকাংশ পাকা চুল তাঁহার বার্দ্ধক্য ও বিগত অশ্রুতপূর্ব্ব অগ্নি-পরীক্ষার সাক্ষ্য দিতেছে।

প্রথমা পত্নী-বিয়োগের পর তিনি প্রায় ৬৩ বৎসর বয়সে পুনরায়দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীও বিধবা, নাম প্রিন্সেস্ হার্মিন্ (Princess Hermine of Schoenaich Carolath), কাইজার অপেক্ষা তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসরের ছোট। প্রথম প্রথম একটু ছোটোখাটো গোলমাল হইলেও এই নব বিবাহিত জীবন বর্ত্তমানে বেশ উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক হইয়াছে।

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমেরিকার জর্জ সিল্‌ভেষ্টার ভাইরেক্ নামক এক ভদ্রলোক দ্বিতীয়বার কাইজারের জীবন-যাপন-প্রণালী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দৈনিক লাভ করিতে হল্যাণ্ডে গিয়াছিলেন্। আমেরিকার একখানি বিখ্যাত সুপ্রচারিত মাসিক-পত্রে মিঃ ভাইরেক তাঁহার এই অভিজ্ঞতা ও কাইজার-পরিবারের সহিত কথাবার্ত্তার একটা সংবেদন ছাপাইয়া দিয়াছেন। তাহাই মূলতঃ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।...

কাইজার বলিলেন, "শরীর-চর্চা মানুষ বিশেষের তুচ্ছ খেয়াল্ নয়, নাগরিক কর্ত্তব্য—সকলকেই পালন করিতে হইবে। সুখের বিষয়—আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি যে, ব্যায়াম-বিজ্ঞান বলিয়া জগতে একটা মূল্যবান্ তত্ত্ব আছে। আমরা বুঝিতে শিখিতেছি যে দেহকে যতক্ষণ শক্তিমান্ করা না যায়, মনকে ততক্ষণ সুস্থতার পথে আনা যায় না। এ জ্ঞান অবশ্য জগতে নতন নয়। রোমান্ ও গ্রীক্‌রাও এক কালে এ জ্ঞানের পুরা অধিকারী ছিল, কিন্তু তারপর তামসিক যুগের মানুষ ইহা ভুলিয়া গিয়াছিল। নবজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার নূতন করিয়া এ তত্ত্বকে আবিষ্কার করিতেছি।"

হল্যাণ্ডের ডূর্ণ নামক পল্লীতে নির্ব্বাসিত সম্রাটের অনাড়ম্বর গৃহ-পার্শ্বস্থ এক বাগানে স্বেচ্ছা-গৃহীত কাঠ চেরার পরিশ্রমের অবসরে কাইজার আমাকে এই কথাগুলি বলিলেন্। সিংহাসন-চ্যুতির পর হইতেই কাইজার এই ডূর্ণে বাস করিতেছেন্।

তাঁহার মুখখানি রৌদ্রে তাতিয়া পুড়িয়া গিয়াছিল। নীল চক্ষু নির্ম্মল, দৃষ্টি দৃঢ়-স্থির। কাইজার আগামী জানুয়ারী মাসে ৬৮ বৎসর পূর্ণ করিবেন ; অথচ তাঁহার হাব-ভাব কথাবার্ত্তায় বোধ হইতে লাগিল—বয়স-স্রোতের উজান্ বাহিয়া তিনি বহুদূর পিছাইয়া আসিয়াছেন।

আমরা এখানে বিগত মহাযুদ্ধের গুণাগুণ বা কাইজারের ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে বসি নাই। আমরা শুধু এমন একটি মানুষের শরীর-চর্চ্চা বিষয়ক অভিমত লইয়া নাড়াচাড়া করিব—যিনি নেপোলিয়ঁর পর সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রতিহত প্রতাপে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপের একটা বিশিষ্ট স্থান জুড়িয়া তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলেন এবং নিয়তির ওই কঠোর কুটিল ভ্রূভঙ্গের মধ্যেও যিনি এখনো দেহে অক্ষুন্ন ও মনে অবিষণ্ণ রহিয়াছেন !

৬৮ বৎসর বয়সে কাইজারের দৈহিক যোগ্যতা এত সমুজ্জ্বল এইজন্য যে, তাঁহাকে জীবন ভরিয়া নানা অপ্রত্যাশিত বিপদ-ক্লেশের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। প্রসবের সময় ডাক্তারের নির্ব্বুদ্ধিতায় তাঁহার বাম হস্তটি মুচ্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিয়া যায় ; তখন হইতেই হাতটি এক প্রকার পঙ্গু হইয়া আছে। তারপর রাজ-পরিবারের আওতায় লালিত-পালিত হইয়া ছেলেবেলা হইতে এমন বদ অভ্যাস হইয়া যায় যে, সামান্য একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই তাঁহার সর্দি হইত ;

এখনো পর্য্যন্ত তিনি এ অসুবিধাকে প্রতিহত করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, "আমার কাছে সামান্য সর্দ্দি একটা প্রকাণ্ড বিপদের আভাস!" কিন্তু তাই বলিয়া, তিনি বড় হইয়া নিয়মিত মুক্ত বাতাসে বেড়ানো বা কায়িক পরিশ্রম করা পরিত্যাগ করেন নাই।

একবার ডুর্ণে তাঁহার অতিথি হইয়া কিছুকাল থাকিবার সময়, তিনি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই আমার সহিত পুরা দুই ঘণ্টা ধরিয়া ভ্রমণ করিলেন। তিনি সবেমাত্র তখন দারুণ অন্ত্রশূলে ভুগিয়া সারিয়া উঠিয়াছেন. এ সময় বৃষ্টি মাথায় করিয়া বেড়াইয়া বেড়ানো স্বাস্থ্যসঙ্গত কি না—সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি মন্তব্য করিলেন, "আমি ত চিনির পুতুল নয় যে, দু'চার ফোঁটা বৃষ্টির জলে অমনি গলিয়া যাইব? বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে ঔষধের বোতল বুকে করিয়া বন্দী-জীবন যাপন করার চেয়ে, আমার মনে হয়, মুক্ত বাতাসে এইরূপ ভ্রমণ সর্দ্দির পক্ষে বেশী উপকারী।"

কাইজারের দক্ষিণ হস্ত অবশ্য তাঁহার বাম হস্ত অপেক্ষা অধিকতর পুষ্ট ও কার্য্যক্ষম। এই একটা হাতে তিনি বস্তুতঃ দুইটা হাতের কার্য্য করিতে পারেন্। এক হাত দিয়া তিনি চমৎকার দক্ষতার সহিত কাঠ চিরিতে ও কাটিতে, গাছের গোড়ায় জল দিতে, বন্দুক ধরিয়া শীকার করিতে, দাঁড় টানিতে, ঘোড়ায় চড়িয়া লাগাম ধরিতে ও টেনিস্ প্রভৃতি খেলিতে পারেন্।

"আচ্ছা, এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় মহারাজ বাহাদুর কেমন করিয়া ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা করিলেন্—বুঝিতে পারি না,"—একদিন এই কথা বলিতেই কাইজার উত্তর করিলেন্, "আমার প্রথম জীবনের স্মৃতি লইয়া আমি যে পুস্তকখানি লিখিতেছি, তাহাতে এই ঘোড়ায় চড়া শিক্ষার প্রথা বর্ণনা করিয়াছি। কম্পিত শিশু আমি—আমাকে তাহারা ঘোড়ার উপর বসাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে ঘোড়া চালাইয়া দিত; পড়ার ভয়ে আমি যতই কাঁদি না কেন, তাহারা ইহাতে কর্ণপাত করিত না। দুই হাত দিয়া লাগাম ভালো করিয়া ধরিতে না পারায়, আমি একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই ধপাস্ করিয়া পড়িয়া যাইতাম। বারে বারে পড়িতাম আর তাহারা বারে বারে মাটি হইতে তুলিয়া আমাকে ঘোড়ার উপর বসাইয়া দিত। তারপর প্রতিবারই পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে এক হাত দিয়া প্রাণপণে লাগাম ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম ও তৎসঙ্গে অতি কষ্টে বাম হাতটিকে যথাসাধ্য দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে লাগাইয়া দিতাম। এইরূপ করিয়া ঘোড় সওয়ারীতে নিপুণ হই।"

কাইজারের রক্তসম্পর্কীয় অন্যান্য রাজা বা রাজপুত্রদের ন্যায়, একখানি কর্মিষ্ঠ হাত লইয়াও কাইজার কখনো ঘোড়া হইতে 'পপাত ধরণীতলে' হন্ না।

সিজারের মাথা-জোড়া টাক্ ও নেপোলিয়েঁর জীবন-ব্যাপী বদহজম যেমন তাঁহাদের অমর জীবন-গাথার সহিত এক সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে, কাইজারের এই অক্ষম অথচ কর্মলিপ্সু বাম হস্তখানিও ইতিহাসে সেইরূপ একটা উপযুক্ত আসন লাভ করিবে। যতদিন কাইজার সম্রাট্ ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই হাতখানির বিষয় প্রকাশ্যে কাহারও সহিত আলোচনা করেন নাই (এবং কেহ আলোচনা করে—এরূপ পছন্দও করিতেন না)। এ বিষয়ে তিনি সর্ব প্রথম আমার সহিত এবং তাঁহার উল্লেখিত পুস্তকখানিতে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

কাইজার আমাকে একদিন বলিলেন, "একদল অতিরিক্ত মাংসপেশীসমন্বিত বিরাটবপু মানুষ জগতে যে নিষ্প্রয়োজন—এ সম্বন্ধে বার্নার্ড শ'য়ের সহিত আমি একমত। আমি সমস্ত শরীরের একটা সীমাবদ্ধ সুসঙ্গত সুঠাম পরিপুষ্টির প্রতি আস্থা রাখি। কতকগুলো পেশাদারী পালোয়ান্ এক জায়গায় জড়ো হইয়া কুস্তি করিয়া, গুরুভার উত্তোলন করিয়া বা মুষ্ঠিযুদ্ধের বাজী লড়িয়া নিমেষের মধ্যে জগতের রেকর্ড্ ছাপাইয়া যাইতেছে—সে দৃশ্য দেখার চেয়ে, দশ হাজার স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকা কতকগুলি যত্ন-সিদ্ধ ব্যায়াম-প্রক্রিয়া নিয়মিত অভ্যাস করিতেছে—সেই দৃশ্য উপভোগ করাই অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

"ইয়োরোপের ইতিহাস-বিখ্যাত রাজন্যবর্গের মধ্যে

আমিই প্রথম এই মত্ পোষণ করি না। মহাবীর আলেখ্‌সুন্দরের পিতা, ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ্ এই সকল পেশাদার পালোয়ান্দের দেখিয়া বলিতেন—"ইহারা কী কাযে লাগে? আমি ত ইহাদের দ্বারা কোন কায করাইতে পারি না। আমি ইহাদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করিতে পারি না, কারণ ইহারা আক্রমণ বা প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য দ্রুত পা চালাইয়া হাঁটিতে অথবা দৌড়াইতে পর্য্যন্ত পারে না। একমাত্র ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দিয়া ইহাদের কাযে লাগানো যাইতে পারে।' আমি অবশ্য ফিলিপের মত এরূপ উৎকট 'বিরুদ্ধবাদী নহি, তথাপি, গামঞ্জস্য মণ্ডিত তৎপর দেহের পরিবর্ত্তে প্রয়োজনাতিরিক্ত পেশীবহুল জড়বৎ-শরীর গঠনের এই প্রয়াসের জন্য বিশেষ দুঃখিত।

"জার্মান্ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যে-কোনো বদ্‌নাম তোলা হউক্ না কেন, এ দেশের তথাকথিত সার্বজনীন্ জনপ্রিয়তার সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিতর্ক যাহাই দেখানো হউক না কেন, আমাদের যুবশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান্‌গুলি প্রধানতঃ ব্যায়াম-চর্চার মধ্য দিয়া অদ্ভুত উন্নতি লাভের সুযোগ দিয়াছে। দৈহিক শক্তি-চর্চার সহিত নৈতিক শক্তি-চর্চাও এই সকল স্থলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। যদি এখনও জার্মানী পূর্বকার মত সৈন্যবাহিনী রাখিবার স্বাধীনতা পায় এবং যদি উহার পরিচালনায় আমার কোনো হাত থাকে, তাহা হইলে ব্যায়ামের উপর আমি অধিকতর জোর দিব এবং সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক দেশবাসীকে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে শরীর-চর্চায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিব।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু সম্রাট্, সৈন্য-শিক্ষা শুধু পুরুষ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন?"

কাইজার উত্তর করিলেন, "স্ত্রীলোকদিগের শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি ভবিষ্যতে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইবে। গত যুদ্ধে আমরা এই শিক্ষা হাড়ে হাড়ে পাইয়াছি যে, যুদ্ধ বাধিলে দেশের অনেক শারীরিক শ্রম-সাধ্য কর্মের ভার স্ত্রীলোকদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক—প্রত্যেক জাতিই সমানভাবে শান্তি ও বিগ্রহে ভালোভাবে কর্ম করিবার শক্তি লইয়া সজ্জিত থাকিবে। প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের কখনও যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা হইবে না সত্য, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে পুরুষের উপযুক্তরূপ সাহায্য করিবার জন্য, পুরুষের মতই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধ্যতামূলক ব্যায়াম-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।"...

কাইজারের পারিবারিক বৈদ্য আমাকে বলিলেন, "দ্বিতীয় উইলিয়াম্ কেন-যে এক শত বৎসর বাঁচিবেন না—তাহার কোনো উপযুক্তরূপ কারণ খুঁজিয়া পাই না। তিনি প্রত্যেক দিবসের কোন্ সময়টুকু নিজের কায করিবেন, কোনটুকুতে বিশ্রাম লইবেন, কোনটুকু ব্যায়ামে নিয়োজিত করিবেন, তাহা চুল চিরিয়া ভাগ করা আছে। এমন দিন তাঁহার খুব কমই যায়, যে-দিন তিনি কোনো-না-কোনোরূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যায়াম না করেন।"...

তাঁহারা দ্বিতীয়া পত্নী এম্‌প্রেস্ হারমিনের মত কাইজার কখনও বাইসিকেলে চড়িয়া প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হন না; সকালে পদব্রজে বেড়াইতে কোনদিন তাঁহার ভুল হয় না। এই ডুর্ণ গ্রামের এলাকার মধ্যে তিনি যে ঠিক্ বন্দীভাবে কাল যাপন করিতেছেন—তাহা নহে, তবে তাঁহার অদৃষ্ট তাঁহাকে যেখানে আনিয়া ফেলিয়াছে, সেইখানকার গণ্ডীর মধ্যেই তিনি সন্তুষ্টির সহিত আপনার কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন; কদাচ-কখনো তিনি পল্লীর বাহিরে হাঁটিয়া বা মটর হাঁকাইয়া বেড়াইতে যান্।"

কাইজার একজন জার্মান্ দার্শনিকের একটা মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "Alles ginge besser wenn man mehr ginge, অর্থাৎ মানুষের শরীর আরো ভালো চলিত যদি সে ভালো করিয়া হাঁটার অভ্যাস রাখিত। আমি রৌদ্রালোকে যত খুসী বেড়াই ও বসি। আপনি বোধ হয় আমার সূর্য্যঘড়ীর গায়ে কি লেখা আছে লক্ষ্য করিয়াছেন—sine sole sileo অর্থাৎ সূর্য্য বিনা আমি নীরব। আমিও

এখনো পর্য্যন্ত তিনি এ অসুবিধাকে প্রতিহত করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, "আমার কাছে সামান্য সর্দ্দি একটা প্রকাণ্ড বিপদের আভাস!" কিন্তু তাই বলিয়া, তিনি বড় হইয়া নিয়মিত মুক্ত বাতাসে বেড়ানো বা কায়িক পরিশ্রম করা পরিত্যাগ করেন নাই।

একবার দুর্ণে তাঁহার অতিথি হইয়া কিছুকাল থাকিবার সময়, তিনি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই আমার সহিত পুরা দুই ঘণ্টা ধরিয়া ভ্রমণ করিলেন। তিনি সবেমাত্র তখন দারুণ অসুখ হইতে ভুগিয়া সারিয়া উঠিয়াছেন. এ সময় বৃষ্টি মাথায় করিয়া বেড়াইয়া বেড়ানো স্বাস্থ্যসঙ্গত কি না—সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি মন্তব্য করিলেন. "আমি ত চিনির পুতুল নয় যে, দু'চার ফোঁটা বৃষ্টির জলে অমনি গলিয়া যাইব? বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে ঔষধের বোতল বুকে করিয়া বন্দী-জীবন যাপন করার চেয়ে, আমার মনে হয়, মুক্ত বাতাসে এইরূপ ভ্রমণ সর্দ্দির পক্ষে বেশী উপকারী।"

কাইজারের দক্ষিণ হস্ত অবশ্য তাঁহার বাম হস্ত অপেক্ষা অধিকতর পুষ্ট ও কার্য্যক্ষম। এই একটা হাতে তিনি বস্তুতঃ দুইটা হাতের কার্য্য করিতে পারেন্। এক হাত দিয়া তিনি চমৎকার দক্ষতার সহিত কাঠ চিরিতে ও কাটিতে, গাছের গোড়ায় জল দিতে, বন্দুক ধরিয়া শীকার করিতে, দাঁড় টানিতে, ঘোড়ায় চড়িয়া লাগাম ধরিতে ও টেনিস্ প্রভৃতি খেলিতে পারেন্।

"আচ্ছা, এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় মহারাজ বাহাদুর কেমন করিয়া ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা করিলেন্—বুঝিতে পারি না,"—একদিন এই কথা বলিতেই কাইজার উত্তর করিলেন্, "আমার প্রথম জীবনের স্মৃতি লইয়া আমি যে পুস্তকখানি লিখিতেছি, তাহাতে এই ঘোড়ায় চড়া শিক্ষার প্রথা বর্ণনা করিয়াছি। কম্পিত শিশু আমি—আমাকে তাহারা ঘোড়ার উপর বসাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে ঘোড়া চালাইয়া দিত; পড়ার ভয়ে আমি যতই কাঁদি না কেন, তাহারা ইহাতে কর্ণপাত করিত না। দুই হাত দিয়া লাগাম ভালো করিয়া ধরিতে না পারায়, আমি একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই ধপাস্ করিয়া পড়িয়া যাইতাম। বারে বারে পড়িতাম আর তাহারা বারে বারে মাটি হইতে তুলিয়া আমাকে ঘোড়ার উপর বসাইয়া দিত। তারপর প্রতিবারই পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে এক হাত দিয়া প্রাণপণে লাগাম ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম ও তৎসঙ্গে অতি কষ্টে বাম হাতটিকে যথাসাধ্য দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে লাগাইয়া দিতাম। এইরূপ করিয়া ঘোড় সওয়ারীতে নিপুণ হই।"

কাইজারের রক্তসম্পর্কীয় অন্যান্য রাজা বা রাজপুত্রদের ন্যায়, একখানি কর্মিষ্ঠ হাত লইয়াও কাইজার কখনো ঘোড়া হইতে 'পপাত ধরণীতলে' হন্ না।

সিজারের মাথা-জোড়া টাক্ ও নেপোলিয়েঁর জীবন-ব্যাপী বদহজম যেমন তাঁহাদের অমর জীবন-গাথার সহিত এক সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে, কাইজারের এই অক্ষম অথচ কর্মলিপ্সু বাম হস্তখানিও ইতিহাসে সেইরূপ একটা উপযুক্ত আসন লাভ করিবে। যতদিন কাইজার সম্রাট্ ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই হাতখানির বিষয় প্রকাশ্যে কাহারও সহিত আলোচনা করেন নাই (এবং কেহ আলোচনা করে—এরূপ পছন্দও করিতেন না)। এ বিষয়ে তিনি সর্ব প্রথম আমার সহিত এবং তাঁহার উল্লেখিত পুস্তকখানিতে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

কাইজার আমাকে একদিন বলিলেন, "একদল অতিরিক্ত মাংসপেশীসমন্বিত বিরাটবপু মানুষ জগতে যে নিষ্প্রয়োজন—এ সম্বন্ধে থার্নার্ড্ শ'য়ের সহিত আমি একমত। আমি সমস্ত শরীরের একটা সীমাবদ্ধ সুসঙ্গত সুঠাম পরিপুষ্টির প্রতি আস্থা রাখি। কতকগুলো পেশাদারী পালোয়ান্ এক জায়গায় জড়ো হইয়া কুস্তি করিয়া, গুরুভার উত্তোলন করিয়া বা মুষ্টিযুদ্ধের বাজী লড়িয়া নিমেষের মধ্যে জগতের রেকর্ড্ ছাপাইয়া যাইতেছে—সে দৃশ্য দেখার চেয়ে, দশ হাজার স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকা কতকগুলি যত্ন-সিদ্ধ ব্যায়াম-প্রক্রিয়া নিয়মিত অভ্যাস করিতেছে—সেই দৃশ্য উপভোগ করাই অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

"ইয়োরোপের ইতিহাস-বিখ্যাত রাজন্যবর্গের মধ্যে

আমিই প্রথম এই মত্ পোষণ করি না। মহাবীর আলেখ্সুন্দরের পিতা, ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ্ এই সকল পেশাদার পালোয়ান্দের দেখিয়া বলিতেন—"ইহারা কী কাযে লাগে? আমি ত ইহাদের দ্বারা কোন কায করাইতে পারি না। আমি ইহাদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করিতে পারি না, কারণ ইহারা আক্রমণ বা প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য দ্রুত পা চালাইয়া হাঁটিতে অথবা দৌড়াইতে পর্য্যন্ত পারে না। একমাত্র ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দিয়া ইহাদের কাযে লাগানো যাইতে পারে।' আমি অবশ্য ফিলিপের মত এরূপ উৎকট বিরুদ্ধবাদী নহি, তথাপি, সামঞ্জস্য মণ্ডিত তৎপর দেহের পরিবর্ত্তে প্রয়োজনাতিরিক্ত পেশীবহুল জড়বৎ-শরীর গঠনের এই প্রয়াসের জন্য বিশেষ দুঃখিত।

"জার্মান্ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যে-কোনো বদ্নাম তোলা হউক্ না কেন, এ দেশের তথাকথিত সার্বজনীন্ প্রিয়তার সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিতর্ক যাহাই দেখানো হউক না কেন, আমাদের যুদ্ধশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান্গুলি প্রধানতঃ ব্যায়াম-চর্চার মধ্য দিয়া অদ্ভুত উন্নতি লাভের সুযোগ দিয়াছে। দৈহিক শক্তি-চর্চার সহিত নৈতিক শক্তি-চর্চাও এই সকল স্থলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। যদি কখনও জার্মানী পূর্বকার মত সৈন্যবাহিনী রাখিবার স্বাধীনতা পায় এবং যদি উহার পরিচালনায় আমার কোনো হাত থাকে, তাহা হইলে ব্যায়ামের উপর আমি অধিকতর জোর দিব এবং সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক দেশবাসীকে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে শরীর-চর্চায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিব।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু সম্রাট্, সৈন্য-শিক্ষা শুধু পুরুষ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন?"

কাইজার উত্তর করিলেন, "স্ত্রীলোকদিগের শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি ভবিষ্যতে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইবে। গত যুদ্ধে আমরা এই শিক্ষা হাড়ে হাড়ে পাইয়াছি যে, যুদ্ধ বাধিলে দেশের অনেক শারীরিক শ্রম-সাধ্য কর্মের ভার স্ত্রীলোকদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক—প্রত্যেক জাতিই সমানভাবে শান্তি ও বিগ্রহে ভালোভাবে কর্ম করিবার শক্তি লইয়া সজ্জিত থাকিবে। প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের কখনও যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা হইবে না সত্য, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে পুরুষের উপযুক্তরূপ সাহায্য করিবার জন্য, পুরুষের মতই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধ্যতামূলক ব্যায়াম-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।"···

কাইজারের পারিবারিক বৈদ্য আমাকে বলিলেন, "দ্বিতীয় উইলিয়াম্ কেন-যে এক শত বৎসর বাঁচিবেন না—তাহার কোনো উপযুক্তরূপ কারণ খুঁজিয়া পাই না। তিনি প্রত্যেক দিবসের কোন্ সময়টুকু নিজের কায করিবেন, কোন্টুকুতে বিশ্রাম লইবেন, কোন্টুকু ব্যায়ামে নিয়োজিত করিবেন, তাহা চুল চিরিয়া ভাগ করা আছে। এমন দিন তাঁহার খুব কমই যায়, যে-দিন তিনি কোনো-না-কোনোরূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যায়াম না করেন।"···

তাঁহারা দ্বিতীয়া পত্নী এম্প্রেস্ হারমিনের মত কাইজার কখনও বাইসিকেলে চড়িয়া প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হন না; সকালে পদব্রজে বেড়াইতে কোনদিন তাঁহার ভুল হয় না। এই দুর্ণ গ্রামের এলাকার মধ্যে তিনি যে ঠিক্ বন্দীভাবে কাল যাপন করিতেছেন—তাহা নহে, তবে তাঁহার অদৃষ্ট তাঁহাকে যেখানে আনিয়া ফেলিয়াছে, সেইখানকার গণ্ডীর মধ্যেই তিনি সন্তুষ্টির সহিত আপনার কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন; কদাচ-কখনো তিনি পল্লীর বাহিরে হাঁটিয়া বা মটর হাঁকাইয়া বেড়াইতে যান্।"

কাইজার একজন জার্মান্ দার্শনিকের একটা মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "Alles ginge besser wenn man mehr ginge, অর্থাৎ মানুষের শরীর আরো ভালো চলিত যদি সে ভালো করিয়া হাঁটার অভ্যাস রাখিত। আমি রৌদ্রালোকে যত খুসী বেড়াই ও বসি। আপনি বোধ হয় আমার সূর্য্যঘড়ীর গায়ে কি লেখা আছে লক্ষ্য করিয়াছেন—sine sole sileo অর্থাৎ সূর্য্য বিনা আমি নীরব। আমিও

সূর্য্য-ঘড়ীর মত তপনাভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ি। আমি সূর্য্যের আরোগ্যকর গুণে বিশ্বাস রাখি—আমি সূর্য্যালোকে নিত্য স্নান পছন্দ করি।"—এই বলিয়া কাইজার সোজাসুজি মার্ত্তণ্ডের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন্। তাঁহার পূর্ব পুরুষ ফ্রেডারিক দি গ্রেট্‌ও এইরূপ হাতের আড়াল না দিয়া সরাসরি সূর্য্যের দিক অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। কাইজারের ঐ গুণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের রক্ত হইতে আহরণ করা।

আমার প্রশ্নের উত্তরে কাইজার বলিতে লাগিলেন, "চিরদিন আমি খুব অনাড়ম্বরভাবে আমার জীবন যাপন করিয়াছি। যাঁহারা সিংহাসনে উপবেশন করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যুদ্ধের পূর্বে আমার প্রতিদিনের কার্য্য-তালিকা নিম্নলিখিতরূপ নির্দিষ্ট ছিল।···গ্রীষ্মকালে আমি প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া সাতটা হইতে নয়টার মধ্যে ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুতগতিতে বেড়াইয়া বেড়াইতাম। নয়টার সময় আসিয়া বাগানের মধ্যে প্রাতরাশ খাইতাম। দশটা হইতে একটা পর্য্যন্ত আফিসে বসিয়া আমি বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীদের সহিত কার্য্য করিতাম, ক্যাবিনেটের কর্ত্তাদের সহিত পরামর্শ করিতাম, রাজ্য-সংক্রান্ত রিপোর্ট গ্রহণ করিতাম ও লিখিত আদেশসমূহ সহি করিতাম। বেলা একটার সময় ঘরের মধ্যেই আমি সামান্য জলযোগ করিতাম। তারপর ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম করিতাম। বৈকাল বেলা আমি টেনিস খেলিতাম, কখনো বা ঘোড়ায় চড়িতাম, কখনো বা জল-বিহার করিতাম। তারপর সন্ধ্যা হইতে আবার সাম্রাজ্যের হিসাব নিকাশ লইতাম। ঐ সময় ঘরের বাহিরে বসিয়া চা পান করিতাম। রাত্রি আট্‌টার সময় বাগানের মধ্যেই ডিনারের আয়োজন হইত। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় শয্যা গ্রহণ করিতাম।"

"শীতকালে আমি নয়টার সময় প্রাতরাশে বসিতাম; এবং তারপর সাড়ে নয়টা হইতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিতাম। তারপর রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতাম। দুইটা হইতে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত আবার বাগানের মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইতাম, নচেৎ ঘরের মধ্যে টেনিস্ খেলিতাম; খেলিবার জন্য একটা বড় রকমের হল বিশেষভাবে তৈয়ারী করা হইয়াছিল। সাড়ে তিনটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম, তারপর চা-পান। তারপর রাত্রি আটটার সময় ডিনার পর্য্যন্ত আবার বৈষয়িক কর্ম। ডিনার সারিয়া বল-নাচে, থিয়েটারে ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম; ইহার মাঝে রাজনৈতিক বৈঠক বা সম্মেলনও হইত।

নিজ খাদ্যদ্রব্যের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া সম্রাট কহিতে লাগিলেন, "কি নিজের বাড়ীতে, কি অন্যত্র—নিমন্ত্রণ বাড়ীতে, আমি সাদাসিধা রান্না সব চেয়ে বেশী পছন্দ করি। আমি জীবনে কখনো আমেরিকা যাইবার সঙ্কল্প করি নাই—এইজন্য যে, আমি আপনাদের দেশের ডিনারকে ডরাই। আমার ছোট ভাই জন বেচারী আপনাদের উদার আতিথেয়তার গুণে মারা পড়িয়াছিল। সম্রাট্ থাকা কালীন্ আমার প্রাতরাশ ছিল এক কাপ চা, টোষ্ট্, এক টুক্‌রা মাছ বা কাট্‌লেট্; কখনও রুচি বদলের জন্য সামান্য একটু পাখীর মাংস বা চপ্ খাইতাম। গো-মাংস আমি পারতপক্ষে এড়াইয়া চলিতাম, ইহাতে বাত ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয়। প্রাতরাশে বেশীর ভাগ ফল খাইতাম।

"মধ্যাহ্ন-ভোজনে একটু মাছ, তরকারী, একটা রোষ্ট্ ও ফল প্রধান আহার্য্য ছিল। আর তৎসঙ্গে হয়ত পুডিং বা আইস্‌ক্রীম্ থাকিত।

"রাত্রের ডিনার আমার নামে মাত্র ছিল। প্রায়শঃ আমি সামান্য পরিমাণে ঠাণ্ডা মুরগী বা শূকরের মাংস, অথবা গো-জিহ্বা খাইতাম। গৃহের বাহিরে কোনো আমীর-ওম্‌রাহের বাড়ীতে নিমন্ত্রন হইলে, গৃহকর্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি প্রত্যেক ডিস্ হইতে যৎসামান্য করিয়া মুখে দিতাম। বিকার-প্রাপ্ত রসনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিত্য নূতন ভোজ্যসামগ্রীর উদ্ভাবন করাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি। আমি কখনো কাঁকড়া, চিংড়ি, চাট্‌নী, আচার, পিঠা প্রভৃতি স্পর্শ করি নাই।

আমার প্রধান আহার—প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন-ভোজনের টেবিলে মাংস অপেক্ষা ফলেরই প্রাচুর্য্য বেশী থাকিত। সন্ধ্যার সময় এক গ্লাস কমলালেবুর বা অন্য ফলের সরবৎ খাইতাম। আমি কখনও হুইস্কী, ককটেল্ বা মিশ্রিত সুরা সেবন করি নাই; তবে বিশেষ আমোদ বা ছুটির দিনে এক গ্লাস করিয়া শ্যাম্পেন্ বা ক্লারেট্ পান করিতাম। কোনো পানীয়ের সঙ্গে আমি কখনো বরফ ব্যবহার করি না।···

"যুদ্ধের সময় আমার ও আমার পার্শ্বচরদিগের খাবার জিনিস্ কম করিয়া দিয়াছিলাম। মাত্র এক পদ করিয়া রাঁধা জিনিস্ আমরা প্রত্যেক লাঞ্চ্ ও ডিনারের সময় পাইতাম। এক একদিন সুপ্ পান করিতাম, রবিবারে মাত্র পুডিংয়ের ব্যবস্থা থাকিত। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের ধারে পুরাপুরি সৈন্যদের খাদ্য ভোজন করিতাম। সকল রকম মশালাদার উচ্চাঙ্গের খাদ্য বর্জিত হইয়াছিল। খুব বড় রকমের বিজয়লাভের সংবাদ না পাইলে আমরা কেহই শ্যাম্পেন্ খাইতাম না।"

"যুদ্ধ-কালে আমাকে ৩১,০০০ মাইল ভ্রমণ করিতে হইয়াছে; বেশীর ভাগ অবশ্য মোটরে ও ট্রেণে, তথাপি যখনই সুযোগ পাইয়াছি—ঘোড়ায় চড়িয়াছি ও হাঁটিয়াছি। নিবিড়তম যুদ্ধের সময় যখন আমার আদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া সেনাপতিগণ বিভিন্ন লীলাভূমিতে উৎকণ্ঠ আগ্রহে প্রতীক্ষমান্, তখন গভীরতম দুশ্চিন্তা ও কঠোরতম কর্ত্তব্যের বোঝাকে এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া, ঘোড়া হাঁকাইয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম। কিছুক্ষণের জন্য বাগানে গিয়া গাছ কাটিতাম, করাৎ ধরিতাম, গাছের যত্ন লইতাম। বৈকালে বহুদূর পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে হাঁটিয়া বেড়াইতাম। এইরূপে শরীরের যত্ন লইয়াছি বলিয়াই যুদ্ধের উত্তেজনা ও গুরু দায়ীত্বের নিপীড়ন আমার শারীরিক ও মানসিক সাম্যভাবের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে নাই।"

এখনো এখানে—ডুর্ণে, কাইজার স্বাস্থ্যসঙ্গত জীবন যাপন করার যথেষ্ট সুযোগ পান্। সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আট্‌টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় তিনি প্রার্থনা করেন; প্রত্যহ বাইবেলের অন্ততঃ একটি অধ্যায় অধ্যয়ন করেন। রবিবার দিন নিজ এলাকার ক্ষুদ্র গীর্জায় ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা দেন্, নচেৎ কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া শুনান্। পূর্বের মত নয়টার সময়ই তাঁহার প্রাতরাশের ব্যবস্থা বাঁধা আছে। সাড়ে নয়টা হইতে তিনি কুড়াল, কোদাল বা করাৎ হস্তে জঙ্গলে প্রবেশ করেন।

অনেক সময় আমি বিস্মিত নেত্রে দেখিয়াছি, কাইজার অশ্রান্ত উৎসাহে নিজের কায়িক শ্রমের কার্য্য নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাইতেছেন, অথচ তাঁহাপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ভদ্রলোক এই সব কায খানিকক্ষণ করিতেই হাঁপাইয়া বসিয়া পড়েন্। কাইজার নিজ হস্তে শত শত ফুল ও ফলের চারা বসাইয়াছেন। গ্রীষ্মকালে দশ সের ওজনের জলের ঝারি লইয়া গাছে গাছে জল-সিঞ্চন করেন্। এই সকল কাযে অবশ্য তাঁহার বাগানের মালী ও দুইটি ভদ্রলোক সাহায্য করেন।

কাইজার বলিলেন, "এইরূপ করিয়া আমরা কয়েকজনে মিলিয়া এক একদিনে সাতশ' আটশ' ঝারি করিয়া জল ঢালি। ইহা বেশ চমৎকার ব্যায়াম; এতে আপনার বেশীগুলোকে 'জড়-ভরত' করিয়া রাখে না, শরীরে বাত আশ্রয় করিতে দেয় না। যুদ্ধের শেষে যখন আমি হল্যাণ্ডে পঁহুছিয়া প্রথমে কিছুদিন কাউণ্ট্ বেন্টিঙ্কের অতিথিরূপে য়্যামারঞ্জেন্ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন আমার একমাত্র পার্শ্বরক্ষক হার ভন্ ইল্‌জিম্যান্‌কে (Herr Von Ilsemann) সঙ্গে লইয়া নিজের হাতে সতেরো হাজার পাইনের গোড়া কাটিয়া ফেলিয়াছি।

"ডুর্ণে আমার নিজের জমিদারীর মধ্যে, আমি এতাবৎ প্রায় ৩০০০ পাইন্, ওক্, বার্চ ও বীচ গাছের গোড়া কাটিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমি আমার জনৈকা প্রতিবেশী মিসেস্ ব্লাইণ্ড্যাষ্টিনের বাগানখানি হাতে পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছি। অবশ্য যথেচ্ছভাবে খেয়ালমত আমরা গাছ কাটিয়া যাই না,

বন-বিস্তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বৃক্ষাদি কর্ত্তন করি।

"সকালে গাছ কাটিয়া, কাষ্ঠ চিরিয়া, গাছে জল দিয়া বা ফুলগাছের মাথা ছাঁটিয়া গৃহে ফিরিয়া, আমি নানা দেশের সংবাদ-পত্র পাঠ করি ও বৈদেশিক কাগজসমূহের বাছা বাছা প্রবন্ধাদি পাঠ করি। অবসর সময়ে আমি যথেষ্ট পরিমাণে লেখাপড়ার কায করি এবং ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব কারুকার্য্য-বিদ্যা প্রভৃতি যে-সকল বিশেষ জ্ঞানের প্রতি আমি অনুরাগী, তৎসম্বন্ধে গবেষণা করি।

"আমার বড় ইচ্ছা করে যে, প্রত্যেক মানুষ তাহার বাড়ীর চারিপাশে একটি বাগান্ রাখুক্ এবং নিজে তাহার কারকিৎ করুক্। ইহাপেক্ষা অভিপ্রেত ব্যায়াম আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহারা পল্লীতে বাস করে না, যাহাদের একটি বাগান্ বা একটি ঘোড়া নাই, তাহারা যেন প্রত্যহ কিছুক্ষণ করিয়া শরীরের পেশীগুলির জড়ত্ব-বিনাশক কোনো ব্যায়ামের প্রতি দৃষ্টি রাখে।...

"সকল শিক্ষার সেরা শিক্ষা এখন হইতেছে—মন ও দেহের যুগপৎ উৎকর্ষ সাধনের একটা চৌথস্ জ্ঞান-প্রচার। বর্ত্তমান্ সভ্যতা আমাদের জীবন-নদীতে অহরহঃ যে অপরিহার্য্য বিষের স্রোত মিশাইয়া দিতেছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে একটা প্রতিষেধক বিষঘ্ন চাই। সেই বিষঘ্ন দাওয়াই হইল—দৈহিক বীর্য্য ও মানসিক স্থৈর্য্য সামঞ্জস্যের সঙ্গে সঞ্চয় করা!"

সম্পাদকের ডাকবাক্স

আয়ুর্ব্বেদের অধঃপতন কেন?

মহাশয়,

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।...

চিকিৎসা বিষয়ে দুইটা বিভাগ। ১মতঃ শারীরিক বিধান অবগত হইয়া তাহা রক্ষা করার উপায় নির্দ্ধারণ করা চিকিৎসকের কার্য্য। এই বিষয় অভিজ্ঞ হইতে শিক্ষার উপরে কিছু যোগবলেরও প্রয়োজন। ২য়তঃ বহুবিধ দ্রব্য (ঔষধ) দ্বারায় চিকিৎসা হইয়া থাকে; সেই ঔষধ প্রস্তুত করা ও তাহার ক্রমোন্নতি সাধন করা এই বিজ্ঞানের কার্য্য। যোগবল ও বিজ্ঞানালোচন না থাকাই আয়ুর্ব্বেদের অধঃপতন কারণ। বর্ত্তমান যুগে দেখা যাইতেছে, আয়ুর্ব্বেদীগণ বংশ পরম্পরায় যাহা শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সেইভাবেই কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, তাহার ভুল-ভ্রান্তির কোন আলোচনা করেন না। এবং এক জনার উপরই চিকিৎসা ও সহস্র সহস্র প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করার ভার ন্যস্ত থাকিলে, তাহা কখনই ঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না। প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষাও কেবলমাত্র ব্যাকরণের সূত্রবৎ সংক্ষিপ্ত, দুর্বোধ্য ও দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকের ব্যখ্যার প্রয়াস ও আবৃত্তি প্রভৃতিতেই সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই নিজকে হিন্দু কেমিষ্টাদি নানা উপাধিতে পরিচিত করিয়া আয়ুর্ব্বেদ ঔষধের কারবার খুলিয়াছেন; তাঁহারাও ঐরূপ শিক্ষালব্ধ কবিরাজগণ দ্বারা ঔষধ

তৈয়ার করাইয়া থাকেন। মাত্র অর্থ উপার্জ্জন ভিন্ন উন্নতির চেষ্টা ও আলোচনা কাহারও নাই। আয়ুর্ব্বেদকে সজীব রাখিতে হইলে, সর্ব্বসাধারণের ঐকান্তিক স্বার্থশূন্য চেষ্টার প্রয়োজন; কেবল ব্যবসায়ীদের প্রতারণাপূর্ণ কথায় ভুলিয়া থাকা উচিত নয়। কত কোটি কোটি টাকার ঔষধ বিদেশ হইতে আসিয়া আমাদের রোগ নিবারণ করিতেছে; এবং বর্ত্তমানে বাজারে আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠ পারদ-সংস্কার জার্ম্মনীর মকরধ্বজের প্রভাব দেখিয়াও আমাদের জ্ঞানের সঞ্চার হওয়া উচিত নয় কি? প্রত্যেক বিষয়েরই পরীক্ষা আছে। যাহার স্বরূপ নাই, যথা—সঙ্গীতের রাগ রাগিণী ইত্যাদি, তাহাও অভিজ্ঞগণ শ্রুতি-দ্বারায় পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যাহার স্বরূপ আছে তাহার পরীক্ষা করা সহজে সম্ভব। পরীক্ষা আরম্ভ করিলেই ব্যবসায়ীগণের জ্ঞানের সঞ্চার হইবে।

ভগবানের সৃষ্ট দ্রব্য মধ্যে ঔষধের শ্রেষ্ঠ পারদ। এই পারদ-সংস্কার মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যুর আসন্নকাল পর্য্যন্ত সকল অবস্থায় সকল সময় সর্ব্বব্যাধি-নাশক ও জরাব্যাধি-নিবারক। কাজেই অন্য বহুবিধ ঔষধের আলোচনা না করিয়া কেবল মাত্র এক পারদ-সংস্কার দ্বারাই চিকিৎসা চলিতে পারে। পারদকে বহু আকারে পরিণত করিয়া আয়ুর্ব্বেদ, ডাক্তারি, হেকিমি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। পারদ উপযুক্ত সংস্কৃত হইলে অমৃততুল্য, নচেৎ মহাবিষ। পারদকে কেবলমাত্র আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠ রস সিন্দূর ও স্বর্ণ যোগে স্বর্ণ সিন্দূর আকারে পরিণত করিলেই চলিতে পারে, বহু প্রকরণের প্রয়োজন করে না। পারদ সংস্কার বিভিন্ন রোগে অনুপান যোগেই ব্যবহার বিধেয়; ইহা যে-অনুপানের সহিত ব্যবহার করা যায়, তাহার ক্রিয়া বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেয় ও নিজ ক্রিয়া মধুরভাবে প্রকাশ করে। রোগের লক্ষণানুযায়ী অনুপান ঠিক নির্ব্বাচিত হইলে সকল প্রকার লক্ষণেই সমান উপকারী। জ্বরের প্রথম সময় হইতে নিয়মিত ব্যবহার করাইলে, নিমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত প্রভৃতির আক্রমণ হইতে পারে না ও অন্য কোন রোগই প্রবল ভাব ধারণ করিতে পারে না। রোগাক্রান্ত হইলে পরও একমাত্র ইহার দ্বারাই নিশ্চয় সারিবে।

রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর, মকরধ্বজ কি?—পারদের সম গন্ধক সংমিশ্রণে উপযুক্ত রকম রূপান্তরিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ হয়, তাহারই নাম কজ্জলী (পারদ হইতে অল্প মাত্রায় গন্ধক দিলে রীতিমত মিশ্রিত হয় না)। ঐ কজ্জলী অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে বহু ঔষধ তৈয়ার হয়; তাহা বিশেষ ফল-দায়ক, কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবহার করা নিরাপদ নহে। অগ্নি-সংযোগে পাক হইলে তাহা ভস্ম বলা যায় এবং তাহা সর্ব্বরোগ-নাশক ও চিরকাল ব্যবহার করিলেও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। (হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও আমলাসা গন্ধকই শ্রেষ্ঠ।) ঐ কজ্জলী বোতলে ভরিয়া বালুকা-যন্ত্রে পাক করিলেই গন্ধক জলিয়া চক্‌চকে দানা অবস্থায় বোতলের গল-দেশে জমিয়া থাকে, তাহা ভাঙ্গিলেই রক্ত বর্ণ হয়; তাহারই নাম রসসিন্দুর। পারদের সহ স্বর্ণ মিশ্রিত করিয়া সম গন্ধক সহযোগে কজ্জলী করিয়া ঐরূপ পাক করিলেই স্বর্ণ সহ থাকিয়াই স্বর্ণসিন্দুর হয়। তাহাই প্রাচীন শাস্ত্র-কর্ত্তার মত ও প্রকৃত গুণশালী।

পরবর্ত্তিগণ প্রকৃত তত্ত্ব হারাইয়া ভ্রান্তভাবে এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন এবং কেহ কেহ স্বার্থ সিদ্ধি ও কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য আসলকে ঢাকিয়া নকলকে শ্রেষ্ঠ বলিতে যাইয়া নানা রকম মকরধ্বজাদি করিয়াছেন ও স্বর্ণ স্পর্শ করাইয়াই (স্বর্ণ আদৌ নাই) **স্বর্ণ-ঘটীত** বলিতেছেন। স্বর্ণ বোতলের নীচে পৃথক্ পড়িয়া থাকিবে, অথচ তাহার রাসায়নিক ক্রিয়া হইবে—ইহা কোন্ শাস্ত্রের কথা, এবং বেশী গন্ধক সহ জ্বালে ও বার বার জ্বালে কিরূপ স্বতন্ত্র ভাবান্তর হয়, তাহার পরীক্ষা কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন কি? এই সকলও মূলে ঐরূপ পারদ-গন্ধকের রসায়নিক সংযোগে এক পৃথক নূতন নামকরণ মাত্র। সোনা অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত না থাকিলে সকলই রসসিন্দুরের সমান।

দ্বিগুণ গন্ধক সহ জ্বালে মকরধ্বজ ও ছয়গুণ গন্ধক সহ জ্বালে ষড়্‌গুণ মকরধ্বজ, আটগুণ গন্ধক সহ জ্বালে সিদ্ধ মকরধ্বজ ইত্যাদি হয়। স্বর্ণ যে নীচে পড়িয়া থাকে—

তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হয় না কেন, তাহা সাধারণ বৈদ্য-গণের চিন্তাতীত বলিয়া সে বিষয়ে আলোচনা না করিয়া, তাঁহারা মনঃকল্পিতভাবে বলিয়া থাকেন যে, স্বর্ণের রাসায়নিক ক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে কজ্জলীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। যাহা অক্ষুণ্ণভাবেই শিশির তলায় পড়িয়া থাকে, তাহার রাসায়নিক সংযোগের কথা বলা জ্ঞানবানের পরিচয় নহে। পারদ সমপরিমাণ গন্ধক সহ জাল দিলে জলিয়া যে পরিমাণ থাকে, শত গুণ গন্ধক দিলেও ঐ পরিমাণ থাকিবে, কাজেই ছয়গুণ আটগুণ গন্ধক বেশী দেওয়া এবং গলিয়া মিশ্রিত না হইলে স্বর্ণ দেওয়া আর না দেওয়া সমান কথা। কেহ কেহ বিভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া থাকেন, যথা—কেহ পারদ ছয় গুণ গন্ধক সহ একত্র দিয়া জাল দেন; কেহ কেহ হিঙ্গুলকে দ্বিগুণ গন্ধকসহ জাল দিয়া ক্রমে দুইবার রসসিন্দুর করিয়া তাহা পোড়াইয়া পারদ বাহির করিয়া, স্বর্ণ ও দ্বিগুণ গন্ধক সহ কজ্জলী করিয়া জাল দিয়া ষড়গুণ করিয়া থাকেন। পোড়াইয়া পারদ বাহির করিলে বিশুদ্ধ পারদ ভিন্ন তার পূর্ব্ব ক্রিয়া কিছু থাকিতে পারে না, তাহা বুঝা উচিত।

সিদ্ধ মকরধ্বজ করিতে জারিত স্বর্ণ দ্বারায় করাও বিধি, (স্বর্ণ প্রকৃত জারিত হইলে পারদ সহ মিশ্রিত হয় না); পারদের অর্দ্ধেক স্বর্ণ ও দ্বিগুণ গন্ধক সহ জাল দিয়া নিচের স্বর্ণ ইত্যাদি সমেত ক্রমান্বয়ে চারিবার জাল দিয়া থাকে। প্রতিবার স্বর্ণ নিচেই পড়িয়া থাকে, কাজেই বেশী স্বর্ণ দিবার কোন তাৎপর্য্য নাই। স্বর্ণ খাইদ-শূন্য হইয়া বিশুদ্ধ হইলে পরে তাহাকে সহস্র সহস্র বার অন্য কিছু সহ পোড়াইলেও ক্ষয় ইত্যাদি হয় না। সেইরূপ পারদ বার বার রসসিন্দুর করিয়া পোড়াইয়া পুনঃ পারদ করিলে বিশুদ্ধ পারদ ভিন্ন অতিরিক্ত কিছু হয় না। এবং গন্ধক সহ জালে একবার সংস্কার হইলে পর পুনঃ পুনঃ তাহাকে গন্ধক সহ জালে অধিক কিছু হইতে পারে না ও তাহার রূপেরও কোন ব্যতিক্রম হয় না।

স্বর্ণ-টুক্‌রা পারদে দিলেই ধরিয়া লয় বটে; কিন্তু যদি তথাকথিত রাসায়নিক ক্রিয়াই মাত্র দরকার হইত, তবে ভালরূপ খল করিয়া মিশ্রিত করার বিধি শাস্ত্রে থাকিত না। কোন দ্রব্য অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষয় হইয়া নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অন্য দ্রব্য-সঙ্গে মিশ্রিত হইলে এবং দুইটা দ্রব্য একত্র মিশ্রিত হইয়া ভিন্ন গুণাবিশিষ্ট একটা দ্রব্য হইলে ও উভয়কে আর পৃথক করা না গেলে, কেমিক্যাল মিকশ্চার বা প্রকৃত রাসায়নিক মিশ্রণ বলা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বর্ণ ক্রমে ক্ষয় হইয়া মিশ্রিত হয় না এবং সোনা গন্ধকাদি দ্রব্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে অন্য দ্রব্য হইতে পৃথক করা যায় বলিয়া কেমিক্যাল মিকশ্চার হয় না, কেবলমাত্র মেকানিক্যাল মিকশ্চার হয়। প্রকৃত সোনাই গুণশালী; এজন্য স্বর্ণভস্ম করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

স্বর্ণকে—পারদ ও গন্ধক সংযোগে সরার মধ্যে বদ্ধ করিয়া গজপুটে বার বার পোড়াইয়া দোষ-ক্রিয়া দূর করিয়া ভস্ম আকারে পরিণত করিয়াই ব্যবহার-বিধি। প্রকৃত স্বর্ণভস্ম ওজনে হালকা, আয়তনে বেশী, ছাইয়ের মত বিবর্ণ সূক্ষ্মচূর্ণ হইবে, পারদের সঙ্গে মর্দ্দন করিলেও মিশ্রিত হইবে না। ঐ ভস্মকে সোহাগা ও অল্প সোহারা সহ খল দ্বারায় মাড়িয়া কড়া তাপে গলাইলে পুনরায় সোনার প্রকাশ হইবে। রসসিন্দূরাদি সহ স্বর্ণভস্ম মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে প্রকৃত ফলদায়ক হইবে।

কিন্তু এইরূপ বিধিতে প্রবঞ্চক অর্থলিপ্সু কবিরাজ-গণ সাধারণতঃ মকরধ্বজাদি তৈয়ারী না করায়, বহু ব্যাধিতে বহু ক্ষেত্রে সত্বর উপকার দর্শায় না; কাযেই সাধারণ লোক আয়ুর্ব্বেদের উপর আস্থাহীন হইয়া পড়েন। শাস্ত্রীয় বিধিমত ঔষধাদি প্রস্তুত না করিলে ও অর্থলিপ্সা অপেক্ষা লোক-হিতৈষিণাকে মহত্তর না ভাবিলে আয়ুর্ব্বেদের যশঃসূর্য্য-রসাতলে ডুবিয়া যাইবে।···ইতি—

শ্রীলালমোহন রায়, ঢাকা।

ডাঃ বেণ্ট লীর আদা-ছোলা-প্রীতি—

গত ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর তারিখে নারিকেল-ডাঙ্গা ২৮ নং ওয়ার্ড-স্বাস্থ্য-সমিতির উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এই স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী স্থাপিত হয় স্যার গুরুদাস ইন্‌ষ্টিট্যুট্ গৃহে ও উহার দ্বার-উদ্ঘাটন করেন—সরকারী স্বাস্থ্য-পরিচালক মাননীয় ডাক্তার চার্লস, এ, বেণ্ট্‌লী সাহেব। উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউটের তিনখানি সুপ্রশস্ত কক্ষে বহুবিধ চার্ট, চিত্র, মডেল, উপদেশ-বাণী ইত্যাদি সুসজ্জিত করিয়া দিয়া, স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত পাঁচদিন যাবৎ প্রত্যহই বিশেষজ্ঞদ্বারা স্বাস্থ্য ও শক্তি বিষয়ক বক্তৃতা, ছায়াচিত্র, পুলিন দাস মহাশয়ের লাঠিখেলা প্রভৃতির আয়োজন ছিল। বস্তুতঃ ১ নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর পর বোধ হয় নারিকেলডাঙ্গা এইরূপ দ্বিতীয় অনুষ্ঠান করিলেন এবং কৃতকার্য্যতার সহিত। আশা করি, ইঁহাদের সদৃষ্টান্ত অন্যান্য ওয়ার্ড-স্বাস্থ্য-সমিতি কর্ত্তৃক অনুসৃত হইবে। এই অনুষ্ঠানের জন্য স্যার গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণ এবং বিশেষভাবে স্বাস্থ্য-সমিতির সভাপতি, স্যার গুরুদাসের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেক্রেটারী শ্রীযুত গৌরীমোহন মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যাহাহউক, এখানে ডাঃ বেণ্ট্‌লীর প্রদর্শনী-উদ্ঘাটনী বক্তৃতার দুই একটা পংক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, পাঠকগণের তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অপুষ্টিকর ও বিকৃত খাদ্য-প্রণালীই ছিল ডাঃ বেণ্ট্‌লীর সেদিনকার প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিরূপ ভাবে চায়ের দোকানের, মাংসের হোটেলের, ময়রার দোকানের বীজাণু-দুষ্ট, বাসি ও বিষাক্ত খাবার খাইয়া আমরা শরীর নষ্ট করিতেছি···কি ভাবে কলেছাঁটা ধব্‌ধবে চাউল—সাদা ময়দা—ভেজাল তেল-ঘি খাইয়া আমরা জীবনী-শক্তি হারাইতে বসিয়াছি, কি ভাবে আমাদের ধনী শ্রেণীরা অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া গুরুপাক ও লম্বাচৌড়া খানা উদরসাৎ করিয়া ব্যাধির বন্যাকে ডাকিয়া আনিতেছেন, তৎসম্বন্ধে মনোজ্ঞভাষায় সুযুক্তির সহিত ডাক্তার সাহেব বর্ণনা করেন।

তাহার উপর তিনি বলেন, "এই যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সুপরিশ্রুত চিনি আমাদের দেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মন আসে ও আমরা নির্ব্বিবাদে তাহার সদ্ব্যবহার করি, ইহাতে আমাদের শরীরের খুব কম উপকারই সাধন করে; এমন কি ইহা পরিপাক করাও খুব সহজসাধ্য নহে, অনেক সময় পেটের মধ্যে গিয়া fermented হয়। গুড়ের চেয়ে সহজপাচ্য, সুস্বাদু, উপকারী মিষ্ট দ্রব্য আর জগতে নাই। এ দেশে চা-পান করা খুব স্বাস্থ্য-সঙ্গত প্রথা নহে বটে; কিন্তু চায়ের সহিত সাদা চিনি খাওয়া আরও অনিষ্টকর প্রথা। তারউপর একটু আদা ও একটু ছোলায় আমাদের শরীরের যে উপকার সাধন করে, বাজারে বসমস্ত খাবারের দোকান আমাদের পেটে গেলেও সে উপকার করিতে পারে না—বরং অপকার করে। পৃথিবীতে যত কিছু জলযোগের ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গলার আদরণীয় আদা, ছোলা ও গুড়ের ন্যায় এমন সম্পূর্ণ-সুন্দর খাদ্য আর কিছু নাই। ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামীন্ থাকে—বিশেষভাবে কল-বাহির করা ছোলার (germinating gram) মধ্যে। আমি নিজে এই জলখাবার ব্যবহার করি।"···

যে সকল বাবুরা ছোলাকে শুধু ঘোড়ার খাদ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের বোধ হয় ডাঃ বেণ্ট্‌লীর এই উক্তি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কার্য্য করিবে। ময়রার দোকানের কচুড়ী-জিলাপী, উড়িয়ার দোকানের বেগুনী-ফুলারী ও বাড়ীতে তৈয়ারী মোহনভোগ-পরোটার চেয়ে যে ছোলা-আদা-গুড়ের স্থান অনেক উচ্চে, তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না। আহারে-ব্যবহারে-আচারে বিচারে আমাদের সাদার প্রতি মোহ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। তাই এই শ্বেতকায় স্বাস্থ্য-কর্ত্তার মুখে সাদা

খাদ্যের নিন্দার নজীর অধিকতর হৃদ্য ও বিশ্বাস্য হইতে পারে বলিয়া, এই পুরাণো বিষয়টির একটু বিশদ আলোচনা করা গেল।

হাসপাতালের ফী রহিত—

পরলোকগত মাননীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ ঔষধ-পত্রাদির মূল্য বৃদ্ধি এবং সাধারণতঃ সরকারী ব্যয়-বৃদ্ধির অজুহাতে সাধারণ দাতব্য হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার্থ আগত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে একটা 'ফী' আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। বাহিরের এবং ঘরের [অর্থাৎ outdoor এবং indoor] সর্ব্ব-প্রকার রোগীর নিকট হইতেই এই ব্যবস্থা অনুসারে 'ফী' আদায় হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি শুনিয়া সুখী হইলাম, নূতন মন্ত্রী স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র এই 'ফী' উঠাইয়া দিয়াছেন। এদেশে সাধারণতঃ লোকে সাধ্যপক্ষে হাসপাতালের সংস্রবে আসিতে চায় না—এ বিষয়ে তাহাদের কেমন একটা বদ্ধমূল সংস্কার আছে। তবে নিতান্ত দরিদ্র লোকে নিরুপায় হইয়াই হাসপাতালে চিকিৎসার্থ যাইয়া থাকে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ সেই অতি দরিদ্র অসহায় লোকদের নিকট হইতেই ফী আদায়ের হুকুম দিয়াছিলেন—সাধারণের প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন নাই। অবশ্য পরে একটা ধারা আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, পাত্র বিশেষে এই ফী কম করা বা মকুব করা যাইবে। কিন্তু কয়েক বৎসর ফী আদায় করিয়া দেখা গেল, ফী বাবদে যাহা আদায় হয়, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য, তাহাতে বিশেষ কোনই সুবিধা হয় না। অতএব এই ফীয়ের দায় হইতে দরিদ্র রোগীদের নিষ্কৃতি দেওয়াই শ্রেয়ঃ। কাজেই ফী উঠিয়া গেল। ভালই হইল। বিলম্বেও যে কর্ত্তৃপক্ষের সুবুদ্ধি হইয়াছে, ইহাও মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

হাসপাতালের সাহায্য-দিবস।—

গত তিন বৎসর ধরিয়া হাসপাতালগুলির সাহায্য-কল্পে বৎসরের একটা বিশেষ দিনে জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করা হইতেছে। এই ব্যবস্থায় চাঁদা কিছু কিছু আদায় হইয়া থাকে, এবং সকল হাসপাতালই কিছু না কিছু সাহায্য পায়; এবং তাহাতে তাহাদের কিছু কিছু উপকারও হয়। এই ব্যবস্থা আমাদের ভাল বলিয়াই বোধ হয়। অন্ততঃ দরিদ্র রোগীদের নিকট হইতে ফী আদায় করা অপেক্ষা সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করা যে বহুগুণে শ্রেয়ঃ তাহা বলাই বাহুল্য। এ দেশের সাধারণ হাসপাতালগুলি প্রায়শঃ সাধারণের অর্থ-সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেক ধনী ব্যক্তি হাসপাতাল পরিচালনের জন্য মধ্যে মধ্যে মোটা রকম অর্থদানও করিয়া থাকেন। এই হেতু হাসপাতালের সাহায্যের জন্য জনাসাধারণের চাঁদার উপর নির্ভর করা বেশ সুযুক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে আমরা হাসপাতাল-দিবসের সমর্থন করি; এবং জনসাধারণকেও অনুরোধ করি, তাঁহারা যথাসাধ্য অর্থদান করিয়া এই দিনটীকে সার্থক করুন।

ভারতে কুষ্ঠাশ্রম ;—

সমাজ-সেবার সূত্রে ভারতীয় কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য যে কয়েকটি সেবাশ্রম আছে, তন্মধ্যে Mission to Lepers-প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমগুলিকেই প্রধান বলিতে হইবে। সম্প্রতি এই মিশনের আশ্রিত ভারতীয় সেবাশ্রমগুলির ৫৩শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ এই রিপোর্টের নামকরণ করিয়াছেন—Rays of Hope. নামকরণ ঠিকই হইয়াছে। ১৯২৭ আদের ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙ্গলার ভুতপূর্ব্ব লাট লর্ড লীটন বাঁকুড়ায় "কিশোরীলাল জাটিয়া হোম্‌স্‌" নামক একটী নূতন কুষ্ঠাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কার্য্যাবলীর মধ্যে ইহা একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মিশনের প্রতিষ্ঠিত ও সাহায্যকৃত আশ্রম-গুলিতে বহু কুষ্ঠরোগী আশ্রয়-প্রাপ্ত ও চিকিৎসিত হইতেছে।…এই মিশন-সেবাশ্রম ছাড়া আরও দুই একটী সরকারী ও বেসরকারী আশ্রম ভারতে আছে। কিন্তু সমগ্র ভারতীয় কুষ্ঠ রোগীদের সংখ্যানুপাতে আশ্রমের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। এ দিকে সমাজের একটা বড় রকমের কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

স্বাস্থ্য সমাচার

"শরীমদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্‌"

১৬শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৩৪ সাল { ১০ম সংখ্যা

অজীর্ণ রোগে স্বায়ত্ত চিকিৎসা।

[শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, এম্‌-বি, বিদ্যাভূষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১। ম্যালেরিয়া ও আর্দ্র বায়ু। বাঙ্গলা দেশের বারআনা লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে জর্জ্জরিত, অর্দ্ধেক অজীর্ণ রোগে জীর্ণ, এবং সমগ্র দেশ আর্দ্র বায়ু ও ম্যালেরিয়ার সূক্ষ্ম শক্তির প্রভাবে অভিভূত। যাঁহারা বাহ্যদৃষ্টিতে ভালই আছেন, তাঁহাদের শরীরও এই সূক্ষ্ম বিষের প্রভাবে দুর্ব্বল, কৃশ, শ্রমবিমুখ হয়। বাঙ্গলার গৃহ-পালিত পশুগুলিও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গো-মহিষাদি অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল, অল্প-ভোজী ও দীর্ঘশ্রম সহ্য করিতে অক্ষম। এই বিষের গৌণফল বশতঃ বাঙ্গালার লোকের পরিপাক-শক্তি সহজেই কম হইবে, পাকযন্ত্রসমূহ পীড়িত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি!* নব্বই বৎসর পূর্ব্বে যখন দেশে ম্যালেরিয়া ছিল না, তখন পরিপাক-শক্তির অভাবও ছিল না। কিন্তু স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে যখন রেল পথ ও প্রাদেশিক পথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার নিম্ন ও আর্দ্রভূমি আরও অধিক আর্দ্র হইয়া উঠিল, জঙ্গল বাড়িল, খানা-ডোবার সংখ্যা ও মশককুলের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখনই নদীয়ার বীরনগর ও যশোহরের গদখালিতে মহামারী আরম্ভ হইল, সমগ্র দেশ ধীরে ধীরে ম্যালেরিয়ার বিষে পরিপূর্ণ হইল,

* বারাণসীতে একদিন এক হিন্দুস্থানীর বিবাহে বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিলাম। বিবাহ সভায় শতাধিক হৃষ্টপুষ্ট বরযাত্রী বসিয়াছেন। দেখিলাম তাঁহাদের একজনেরও ম্যালেরিয়া বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নাই। আমরা "দুর্ব্বল ক্ষীণ, তাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম।

বাঙ্গালীর পরিপাক-শক্তিও কমিয়া গেল। এখন আর রেল পথ এবং জেলা বোর্ডের পথ উঠান সম্ভব নহে। এখন অন্য উপায়ে ম্যালেরিয়া তাড়াইতে হইবে। তাই ১৮৬৪ সালে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে, তাই ১৮৮৬ সালে জেলা ও লোকাল বোর্ড আরম্ভ হইয়াছে। তাই বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়া তাড়াইবার নানা চেষ্টা হইতেছে। ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণ উভয়ই কিন্তু সাধ্য রোগ। পানামা ও ইতালীর ন্যায় বাঙ্গলা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইতে হইলে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। সৌভাগ্য ক্রমে অজীর্ণ রোগ অত্যন্ত কঠিন না হইলে রোগী স্বীয় চেষ্টাতেই রোগ দূর করিতে সমর্থ হয়েন।

২। বয়স। দুই তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর পরিপাক শক্তি এত অধিক থাকে যে, অনেক দুগ্ধ-পোষ্য বালক বালিকা দুই সের উত্তম দুগ্ধ দিবা-রাত্রিতে পরিপাক করিতে পারে। এই বয়সে অজীর্ণ রোগ সহজে হয় না। তবে যদি শিশু কাঁদিলেই "ক্ষুধায় কাঁদিতেছে" ভাবিয়া স্তন্য পান করান হয়, বা দুগ্ধ খাওয়ান হয়, তাহা হইলে সেটা শিশুর দোষ নহে, মাতার দোষে ঐরূপ শিশু অজীর্ণ রোগে দুঃখ পায়। দাঁত উঠার পর হইতে দশ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অজীর্ণ রোগ অধিক হয়। এই সময়ে বালক-বালিকাগণের চর্ব্বণ-শক্তি ও ক্ষুধা যথেষ্ট হয়; কিন্তু খাদ্য ও কুখাদ্য বিচারের ক্ষমতা থাকে না বলিয়া তাহারা অসময়ে, অযথা পরিমাণে বা দুষ্পাচ্য খাদ্য খায়। পেটের জ্বালায় মাতাকে বিরক্ত করিয়া তাহারা অধিক খাইয়া ফেলে। দেখাইয়া, না দেখাইয়া, ভাই-ভগ্নীদিগের নিকট ভিক্ষা বা দস্যু-বৃত্তি করিয়া অধিক খাইয়া অজীর্ণ রোগে দুঃখ পায়। আমার এক বন্ধু বলিতেন যে, তাঁহার গৃহে জিলাপির ঠোঙ্গা রাখিয়া গৃহস্থ অসাবধান হইলে, কিয়ৎক্ষণ পরে জিলাপিগুলি ছোট হইয়া যাইত। তাঁহার ৭ম ও ৯ম বর্ষ বয়স্ক দুইটী চতুর পুত্র যে ঐ চৌর্য্য কার্য্য করিত তাহা স্বামী স্ত্রী উভয়ে বুঝিতে পারিয়া হাসিতেন। বার বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিপাক-শক্তি অতি উত্তম থাকে, ও দেহ বাড়িতে থাকে। ত্রিশ বৎসরের পর হইতে যতই দুর্ভাবনার ভার পুরুষের মস্তকে পড়িতে থাকে, ততই পরিপাক-শক্তি একটু একটু কমিতে থাকে। আর দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাগণের গৃহস্থালীর পরিশ্রম ও দুর্ভাবনা বশতঃ, বিশেষতঃ দুই তিন বৎসর অন্তর এক একটী সন্তান প্রসব করাতে, অজীর্ণ রোগ পাকা হইয়া বসিতে থাকে। কেহ কেহ সূতিকা রোগগ্রস্তা হন। পরিশেষে ৫০ বৎসর বয়সের পর সকল সুস্থ নর-নারীর পরিপাক-শক্তি স্বতঃই কমিয়া আইসে। খাদ্যের মাত্রা ও গুণ সম্বন্ধে এখন হইতে সাবধান না হইলে সুস্থ দেহ বা দীর্ঘজীবন লাভের উপায় নাই। ৬০-৬৫ বৎসর বয়সের পর দ্বিতীয় বাল্যকাল আসে, কিন্তু পরিপাক-শক্তি উল্টা পথে চলে। বয়স যত বাড়ে হজম তত কম হয়। পরিশেষে ৮০ বা ৯০ বৎসর বয়সে আমরা এই মাটির দেহ মাতা বসুন্ধরাকে ফিরাইয়া দিয়া এধাম হইতে চলিয়া যাই—সুজীর্ণ বা অজীর্ণের সম্পর্ক রাখি না। কদাচিৎ কেহ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত এখানে থাকেন।

৩। হৃষ্ট ও বিমর্ষ মন। মনে সুখ থাকিলে বেশ হজম হয়, বিমর্ষ হইলে হয় না। কৃত্রিম সুখোৎপাদনের জন্য পূর্ব্বে সম্রাট ও রাজগণ নিজ নিজ সভায় বিদূষক, ভাঁড়, গায়ক, নর্ত্তকী, উপস্থিত-বক্তা, কবি ও সঙ্গীত-বিশারদ রাখিতেন। আহারের সময় কেহ কেহ গান বাজনা শুনিতেন, কেহ কেহ কৌতুকাবহ গল্প শুনিতেন। এখনও অনেক দেশে এ প্রথা আছে। সকলেই জানেন সহসা একটা দুঃসংবাদ পাইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়, যতদিন দুর্ভাবনা থাকে ততদিন অরুচি ও মন্দাগ্নিতে দুঃখ দেয়। আবার সুসংবাদ আসিলেই আহারে প্রবৃত্তি হয়। মনের সুখের ন্যায় হজমি ঔষধ আর নাই; দুশ্চিন্তার ন্যায় অরুচিকরও আর কিছুই নাই।

৪। অভ্যাস। যাঁহারা ধনী ও অলস, তাঁহারা

গুরুপাক দ্রব্য ভোজন ও আলস্য বশতঃ সর্ব্বদাই অজীর্ণ রোগে দুঃখ পান, কিন্তু শ্রমজীবীর সে দুঃখ নাই। সঙ্গতি-পন্ন হিন্দু ও মুসলমান মহিলাগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া তাস খেলিয়া ও নভেল পড়িয়া সময় অতিবাহিত করেন বলিয়া প্রায় সকলেই অম্লরোগে দুঃখ পান। অনেকে অপরাহ্নে অম্ল বমন করেন। কিন্তু তাঁহাদের দাসীরা বিলক্ষণ খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে। শ্রমজীবী শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের প্রায়ই এ রোগ দেখা যায় না। চরিত্র-হীন, উচ্ছৃঙ্খল ধনী যুবক স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সকল অগ্রাহ্য করিয়া অজীর্ণ ও যকৃৎরোগে ভুগিয়া অল্প বয়সেই ভবলীলা সাঙ্গ করেন; কিন্তু সচ্চরিত্র, শ্রমশীল দরিদ্র যুবক স্বাস্থ্য উত্তমরূপে রক্ষা করিতে পারে।

৫। বৃত্তি বা পেশা। যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহাদের পরিপাক-শক্তি উত্তম। কিন্তু বিদ্যার্থীগণ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া এই রোগের সৃষ্টি করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের জন্য যে স্তূপাকার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, সেইগুলির সারাংশ যখন বিদ্যার্থীর মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করে, পরিপাক-শক্তি তখন ত্রাহি ত্রাহি শব্দে পলায়ন করে। সুতরাং তাঁহারা যখন বড় বড় ডিগ্রি লইয়া কলেজ হইতে বাহির হন্, তখন দেখা যায় যে, তাঁহাদের শরীরের বহু স্থান বিশেষতঃ দর্শন ও পরিপাক-শক্তি ভাঙ্গিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে অকাল-বৃদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। মসিজীবী কেরাণী যখন ৯টার পর ভোজন করিয়া ১০টার সময় লিখিতে বসেন, তখন যে কেবল তাঁহার প্রভুর হিসাবই লেখেন তাহা নহে। তাঁহার নিজের অদৃষ্টও যেন স্বহস্তে লিখেন "আমি অজীর্ণ রোগী ও স্বল্পায়ু হইবার জন্যই এই অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিতেছি।" যে রক্তের এ সময়ে পাকস্থলী প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়া হজম কার্য্যের সাহায্য করা উচিত ছিল, তিনি বল পূর্ব্বক তাহাকে মস্তিষ্কে প্রেরণ করিয়া প্রভুর উপকার ও নিজের অপকার করিতেছেন, তাহা মনে রাখেন না। জজ-মহামতি উচ্চ বিচারাসনে বসিয়া যখন উভয় পক্ষের উকিল ব্যারিষ্টারের বাক্-যুদ্ধ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সেই ব্যামিশ্র বাক্যাবলির ভিতর হইতে সত্য টানিয়া বাহির করিবার জন্য মস্তিষ্ককে অতি মাত্রায় পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলেন, তখন ধীরে ধীরে অজীর্ণ রোগ বা তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বহুমূত্র রোগ আসিয়া তাঁহার দেহ অধিকার করে। রাজনীতি-বিশারদগণ, কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক, সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদক, সওদাগর বা ব্যবসায়ীগণ, যে কেহ দীর্ঘকাল এক স্থানে বসিয়া চিন্তা বা লেখা-পড়ার কায করেন, তিনিই এই রোগে আক্রান্ত হন। কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের ন্যায় বড় সহরে আপিস্ ও কারখানায় যে সকল লোক দিনের বেলায় কায করিয়া রাত্রিতে পল্লীগ্রামে গিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকেই এই রোগে দুঃখ পান। কলিকাতা হইতে উত্তরে কৃষ্ণনগর, দক্ষিণে ডায়মণ্ডহার্ব্বার, পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা, এবং পশ্চিমে বর্দ্ধমান বা কোলাঘাট পর্য্যন্ত যত লোক প্রত্যহ রেলপথে আসিয়া কলিকাতায় চাকরি করেন, তাঁহাদের অজীর্ণ রোগ না হওয়াই আশ্চর্য্য। ইহাঁরা প্রাতঃকালে উঠিয়া যদি গৃহ কার্য্য দেখিবার জন্য একটু সময় ব্যয় করেন, তাহা হইলে অনেকের এত তাড়াতাড়ি ভোজন করিতে হয় যে, তাহা দেখিলে বাঙ্গালীর জীবন কত দুঃখময় তাহা বুঝা যায়। তাহার পর যদি বেশ পরিবর্ত্তন করিবার সময় না থাকে, তাহা হইলে রেলগাড়িতে বসিয়া সেই কার্য্য করিবার আশায় বস্ত্রগুলি কাঁধে ফেলিয়া ষ্টেশন অভিমুখে দৌড়িতে থাকেন। সেখানে গিয়া যদি দেখেন যে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা হইলে পাছে সদর দরজা দিয়া প্লাটফরমে পঁহুছিতে গেলে গাড়ি ছাড়িয়া দেয়, এই ভয়ে তারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া গিয়া দৌড়িয়া ট্রেণ ধরেন। তারের কাঁটা বিঁধিয়া যদি রক্তপাত হয় তাহাও গ্রাহ্য করিবার সময় থাকে না। ট্রেণে বসিয়া অনেকক্ষণ হাঁপাইয়া তবে বেশ পরিবর্ত্তন করেন। তাহার পর ট্রেণ চলিতে থাকিলে শরীর এত দুলিতে থাকে, যে, পাকস্থলীর দ্রাবক রসও নিঃসৃত হইবার

সুবিধা পায় না। সুতরাং তাঁহারা অনেকেই অজীর্ণ রোগী হয়েন। দুইয়ের একটী উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহারা উপকার পাইতে পারেন—১ম, এখন যে সময়ে আহার করেন তাহা অপেক্ষা ১ঘণ্টা পূর্ব্বে আহার করা; ২য় কলিকাতায় বাস করা।

৬। উত্তরাধিকার। গর্ভিনী পুরাতন অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হইলে অনেক সময়ে তাঁহার সন্তানগণও এই রোগ প্রাপ্ত হয়। এই কারণে একই পরিবারে ভাই ভগিনী অজীর্ণের রোগী হয়। পিতার এ রোগ থাকিলে সন্তানের এ রোগ হইতেও পারে নাও হইতে পারে; কিন্তু মাতামহী এই রোগগ্রস্তা হইলে মাতা ও তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ ইহার অধিকারী হইতে পারে।

৭। তাড়াতাড়ি ভোজন। চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণে আহারের সুখ; তন্মধ্যে গলাধঃকরণেই অধিক সুখ। যাঁহারা কেবল গলাধঃকরণের সুখ চাহেন, অথবা বাধ্য হইয়া শীঘ্র ভোজন করেন তাঁহারা এই রোগে দুঃখ পান। দুর্ভাগ্য ক্রমে বাঙ্গালীর অধিকাংশ খাদ্যই এত কোমল, যে, অতি শীঘ্র গলাধঃকৃত হয়। সুতরাং অজীর্ণও আমাদের চিরসঙ্গী। এক এক সময়ে মনে হয় যে বাঙ্গালীর খাদ্য যেরূপ কোমল তাহাতে আমাদের অনেকের দাঁত না থাকিলেও চলে।

৮। অতি-ভোজন। বাল্য কালে অনেকেই পড়িয়াছেন—"অতি-ভোজনং রোগ মূলং আয়ুক্ষয় করণম্"। কিন্তু দেখা যায় যে, এক এক জন লোক অতি-ভোজন করিয়াও পীড়িত হয় না। দুইজন খ্যাত-নামা বাঙ্গালী সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিয়াও পীড়িত হ'ন নাই। একজন রাজা রামমোহন রায়। ইনি এক বন্ধুর বাড়ী গিয়া তাঁহার নারিকেল গাছ দেখিয়া নারিকেল খাইতে চাহিলেন। একটী নারিকেল আনা হইল, দেখিয়া বলিলেন "উহাতে আমার কি হইবে, এক কাঁদি নারিকেল আনো"। অপর ব্যক্তি সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ইঁহারা দুইজনেই অসাধারণ পরিশ্রমী ছিলেন। একজন হিন্দুগণকে বেদান্ত-বর্ণিত নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা শিখাইবার জন্য অতিশয় পরিশ্রম করিতেন; অপর ব্যক্তি ভারতের দাসত্ব দূর করিবার জন্য ৫০ বৎসর কাল অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা অধিক ভোজন করিয়াও পরিপাক করিতে পারিতেন। আর এই জন্যই ভারতের সর্ব্বস্থানীয় শ্রবজীবিগণ ভদ্রলোকদের অপেক্ষা অধিক ভোজন করিয়াও পরিপাক করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রম-বিমুখ, তাঁহারা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন বা অধিক ভোজন করিলে, নিশ্চয়ই অজীর্ণ রোগে ভুগিবেন। এই রূপ লোককে দীর্ঘজীবী হইতে আমি কখন দেখি নাই। যদিও অধিক ভোজন কিছুদিন তাঁহাদের সহ্য হয় বটে, কিন্তু এমন একদিন নিশ্চয়ই আসে যে, পরিপাকের যন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। বাঙ্গলায় একটী প্রবচন আছে "বেশী খাবি তো কম খা, কম খাবি তো বেশী খা।" ইহার অর্থ এই যে যদি অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিয়া অনেক খাইতে চাও, তবে রোজ রোজ কম করিয়া খাইও; আর যদি এক এক বারে অনেক খাও, তাহা হইলে পীড়িত হইয়া পড়িবে, শীঘ্রই মৃত্যু হইবে, সুতরাং সারা জীবনের আহারও কম হইবে। আমার এক এক সময়ে বোধ হয় যে বিধাতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাজার কত মোণ চাউল, দাইল প্রভৃতি দিয়া বলিয়া দেন "অনেন প্রসবিষ্যধ্বং"—ইহার সুব্যবহার করিলেই তোমরা উন্নতি (দীর্ঘ জীবন) লাভ করিবে। আমরা যদি সুব্যবহার না করি, অতি-ভোজন করিয়া অল্প দিনেই উহা শেষ করি, তবে বৃদ্ধ বয়সের পূর্ব্বেই 'অন্ন উঠিয়া' যাইবে এবং এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

৯। অতি বিলম্বে বা অতি অল্প কাল পরে ভোজন। যদি সুস্থ ব্যক্তি একবার আহারের পর ১০।১২ ঘণ্টা প্রত্যহ উপবাসী থাকেন, তাহা হইলে কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার এই রোগ হইবে। রাত্রিতে জাগরণ করিয়া থাকিলে শরীরের ক্ষয় কম হয়, সুতরাং রাত্রিকালে এরূপ উপবাসে ক্ষতি হয় না; কিন্তু সুস্থ ব্যক্তিদিগের বেলায় প্রত্যহ এরূপ করিলে নিশ্চয়ই

এই রোগ আসিবে। পক্ষান্তরে দিনের মধ্যে অনেক বার অক্ষুধায় খাইলেও অজীর্ণ হইবে; অনেক বাঙ্গালী বেলা নয়টায় ভোজন করিয়া, তাহার পর সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া, গভীর রাত্রে ভোজন করিয়া এই রোগগ্রস্ত হন।

১০। খাদ্যে পুষ্টিকর পদার্থের অভাব। আমাদের শরীর যে সকল পদার্থে গঠিত, খাদ্য দ্রব্যের সেই সকল উপাদান আছে বলিয়াই আহার করিয়া আমরা প্রতিদিন দেহ ক্ষয় নিবারণ করি। কিন্তু যদি খাদ্যে কোন কোন উপাদানের অভাব অনেক দিন ধরিয়া হয়, তাহা হইলে তজ্জনিত বিবিধ অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। যথা শিশুর ১ বা ২ বৎসর বয়সেই যদি মাতা গর্ভিনী হয়েন, তাহা হইলে ঐ শিশু মাতৃ দুগ্ধে বঞ্চিত হইয়া এবং কৃত্রিম খাদ্য খাইয়া উদরাময় গ্রহণী প্রভৃতি অজীর্ণ রোগে দুঃখ পায়। টাট্‌কা শাক-সবজি ও উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অভাবে জাহাজের খালাসিদের মুখে ক্ষত, দাঁতের গোড়া ফোলা, দাঁতের গোড়ায় রক্ত পড়া, আহারে অরুচি উদরাময় রক্তামাশয় প্রভৃতি হয়। ইহাকে "স্কার্ভি" রোগ বলে। প্রচুর পরিমাণে পাতিলেবুর রস এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্য ব্যবহারে এখন এই প্রকারের অজীর্ণ রোগ খুব কম হয়। অতি উত্তমরূপ ছাঁটা বালাম বা অন্যান্য সিদ্ধ চাউলের অন্নের ফেন বা মাড় ফেলিয়া দিয়া খাওয়াতে বাঙ্গালা দেশের বিস্তর ভদ্রলোক অরুচি হাত পা ফুলা, উদরাময় প্রভৃতিতে দুঃখ পান। ইহাকেই "বেরি বেরি" বলে। বাঙ্গলার মজুরগণ যেরূপ লাল ও মোটা চাউলের অন্ন, ফেনের সহিত ভোজন করেন, সেইরূপ অন্ন ভোজন করিলে আর এ রোগ হয় না।

১১। অপক্ক শুষ্ক ভেজাল খাদ্য।—"তামসিক" ভোজন। কাঁচা বা শুষ্ক উদ্ভিদ, অতি-পক্ক বা পচা ফল ও ভেজাল খাদ্য খাইলে এই রোগ নিশ্চয়ই হইবে। ভেজাল আটা ও ময়দা খাইয়া বাঙ্গলার ভদ্রলোকগণ এই রোগে কষ্ট পান। কিন্তু এই উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাজার হইতে গম কিনিয়া ভাঙ্গাইয়া যে উৎকৃষ্ট আটা পাওয়া যায়, তাহা খাইয়া এ দেশের বাঙ্গালীরাও সুস্থ থাকেন। বাঙ্গলা দেশে চেষ্টা করিলে ইহার প্রবর্ত্তন হইতে পারে। ঘৃত ও তৈলের ভেজাল আইন করিয়া বন্ধ না করিলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও পরিপাক-শক্তি কখন ভাল হইবে না। গোরু ও ছাগল পুষিবার কষ্ট যতই হউক, যাঁহারা অজীর্ণ রোগে ভোগেন, তাঁহারা উত্তম দুগ্ধ এই রূপে স্বায়ত্ত ধীন করাও অজীর্ণ রোগের স্বায়ত্ত চিকিৎসার অঙ্গ বলিয়া জানিবেন। বাঙ্গলা দেশের অনেক সঙ্গতিপন্ন লোকও এইরূপ "তামসিক" খাদ্য আহার করিতে বাধ্য হয়।

১২। অতি-শীতল বা অত্যুষ্ণ খাদ্য। যাঁহারা প্রত্যহ বরফ-জল বা বরফ ও সোডা ওয়াটার সেবন করেন অজীর্ণ রোগ তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী। কেবল এই কারণেই মার্কিণের ন্যায় সুসভ্য দেশে অজীর্ণ রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এই কারণে বাঙ্গালার দরিদ্র গৃহস্থ-ঘরে ও উড়িষ্যায় পান্তা ভাত খাইয়া বহু লোক অজীর্ণ রোগ ভোগ করেন। পান্তা বা "পকাড়" ভাতে যে অম্ল জন্মায় তাহা তাহার আমানিতে দেখা যায়। উহাতে অনেকেই অম্ল রোগগ্রস্ত হয়েন। পক্ষান্তরে আপিসে যাইবার তাড়াতাড়িতে অত্যন্ত উষ্ণ অন্ন, দুগ্ধ, চা প্রভৃতি ভোজনে ও পানেও এই রোগ উৎপন্ন হয়। খাদ্য পেয় পদার্থ নাতিশীতোষ্ণ হইলেই স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

১৩। অত্যন্ত জল পান। আমাদের এই উষ্ণ-প্রধান দেশে, বিশেষতঃ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিক জল পান করিবার প্রবৃত্তি অনেকেরই হয়। জলের ন্যায় নির্দ্দোষ পদার্থেও যে এই রোগ হয়, তাহা হয় ত অনেকে জানেন না। অধিক জলপানে পাকস্থলী শীতল হইয়া পড়ে। উহার দ্রাবক রস ভালরূপ নিঃসৃত হয় না। যাহা হয় তাহা অতিশয় জল মিশান হয় বলিয়া খাদ্যদ্রব্য পাক করিতে পারে না। এই কারণেই আহারের সঙ্গে জল পান করিয়া অনেকে অজীর্ণ রোগে ভোগেন। তাঁহারা যদি আহারের ১ বা ১॥ ঘণ্টা পূর্ব্বে এক গেলাশ জলপান করিয়া লয়েন, তাহা হইলে আর আহারের সময় তৃষ্ণা হয় না, অজীর্ণ রোগেও ভুগিতে হয় না।

১৪। দুষ্পাচ্য খাদ্য। গল্‌দা চিংড়ি, অধিক সিদ্ধ

ডিম্ব, কাঁচা শশা পিঁয়াজ, মূলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কাঁকড়া, মাংস প্রভৃতি খাইয়া অনেকে এই রোগগ্রস্ত হয়েন। খুব অল্প মাত্রায় খাইলে প্রায়ই অপকার হয় না।

১৫। মাদক দ্রব্য ব্যবহার। মাতালের অজীর্ণ রোগ অনেক সময়ে প্রাণ সংশয় করে। গাঁজা, চরস, অহিফেন প্রভৃতিতেও ক্ষুধা নষ্ট করে। অধিক তামাক বা সিগারেট খাওয়াতে অজীর্ণ ও হৃৎপিণ্ডের রোগ জন্মে। সিদ্ধিতে প্রথমে ক্ষুধা বৃদ্ধি, পরে নষ্ট করে। চা খাওয়ার কথা পরে বলিব। যিনি সত্তর বৎসর কাল প্রত্যহ খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ করিতে চাহেন, তিনি যেন এ সকল পরিত্যাগ করেন।

১৬। বিভিন্ন রোগ। ম্যালেরিয়ার কথা প্রথমেই বলিয়াছি। যক্ষ্মাকাশ, বাত, হৃৎপিণ্ডের রোগ, যকৃতের রোগ, শোথ প্রভৃতিতেও অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়।

১৭। গর্ভ। গর্ভিনীয় মন্দাগ্নি এবং অজীর্ণ ও অরুচিকে জিহ্বার উন্মাদ রোগ বলা যায়। গর্ভিনী উৎকৃষ্ট খাদ্য অপছন্দ করে; কিন্তু খড়িমাটী, শ্লেট ভাঙ্গা, উনানের মাটী প্রভৃতি খাইতে চাহে। তিন মাস গর্ভের পর যদি আপনা আপনি আরোগ্য না হয় তবে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

১৮। দেশের জল-বায়ু। অতিশয় শীত-প্রধান দেশে পরিপাক-শক্তি উত্তম। ভারতের প্রান্ত-সীমার অধিবাসিগণ ভূরি ভোজন করিয়াও জীর্ণ করে। রুষিয়া আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকের স্বাস্থ্য উত্তম। কিন্তু উষ্ণ ও আর্দ্র আসাম, বাঙ্গলা, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে এই রোগ অত্যন্ত অধিক। বাঙ্গলায় এই রোগ অত্যন্ত অধিক বলিয়াই যে যত পুরাতন ও সরু চাউল খান তিনি তত 'ভদ্র লোক' বলিয়া গণ্য। কিন্তু ৩।৪টী বাঙ্গালী ভদ্রলোক উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কমিসেরিএটে চাকরি করিবার সময় আফগান-প্রান্ত-সন্নিহিত প্রদেশীয় জনৈক ধনীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজনাসনে বসিয়া দেখিলেন, প্রত্যেকের জন্য তিন সের আটার রুটী ও চারি পাঁচ সের মাংস ভোজন করিতে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা ভয়বিহ্বল চক্ষে দর্শন ও ক্ষুব্ধ চিত্তে বাঙ্গালী মাত্রায় ভোজন করিয়া উঠার পর, গৃহস্বামিনী আসিয়া স্বীয় ভর্ত্তাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তুমি কি আমাকে অপমান করিবার জন্য কয়েকটী চিড়িয়া (পাখী) নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছ? আমার সমস্ত রান্নাটাই বৃথা হইল'!!"

(ক্রমশঃ)

জীবন-কল্যাণ।

[লেখক—ডাঃ শ্রীনরেন্দ্র কুমার দাস—M. B., M. C. P. S. (C. P. S.), M. D. (Bio), M. D. (H), M. R. I. P. H. (Eng'), ভিষগরত্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৮। গাঁজা চরশ ও সিদ্ধি (ভাং)।

ইংরাজীতে ইহাকে ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা বা ইণ্ডিয়ান্ হেম্প্ বলা হয়। ক্যানাবিস্ সেটাইভা নামক স্ত্রী-বৃক্ষের মঞ্জরিত ও ফল-সংযুক্ত শাখাগ্র শুষ্কীকৃত করিয়া ব্যবহৃত হয়। গাঁজা, চরশ ও সিদ্ধি একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গাঁজা—ক্যানেবিস্ সেটাইভা নামক স্ত্রী-বৃক্ষের মঞ্জরিত ও ফলিত শাখাগ্র শুষ্ক করতঃ গাঁজা প্রস্তুত হয়। ইহাকেই গাঁজার জটা কহে। এক একটী জটাতে তরুণ পত্র ও কয়েকটী পাকা ফলও থাকে। জটাগুলি প্রায় ২ ইঞ্চি দীর্ঘ, সবুজাভ ধূসর বর্ণের হয়। গন্ধ বিশেষ উগ্র এবং স্বাদ তিক্ত। তামাকের মত কলিকায় করিয়া ইহার ধূম পান করা হয়।

সিদ্ধি বা ভাং—ক্যানাবিস্ সেটাইভা নামক বৃক্ষের পত্র, তরুণ শাখা ইত্যাদি শুষ্ক করতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহাকেই সিদ্ধি বা ভাং বলে। উত্তরবঙ্গে এক প্রকার সিদ্ধি বা ভাঙের গাছ হয়, তাহার কোনও জটা হয় না; অর্থাৎ তাহা হইতে গাঁজা প্রস্তুত হয় না। ইহার পত্র ও পল্লব শুষ্ক করতঃ সিদ্ধি বা ভাং রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার শুষ্ক পত্র পিষিয়া সরবৎ ও কচুরী ইত্যাদিতে নেশা করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গাঁজা ও সিদ্ধির গাছ একই। সিদ্ধির কেবলমাত্র স্ত্রী-বৃক্ষেরই জটা হয় এবং এই জটাই গাঁজা।

চরশ—সিদ্ধি গাছের পত্র, তরুণ শাখা এবং জটা চাঁচিয়া এক প্রকার ধূণা বা রেজিন্ বাহির করা হয়; ইহাকেই চরশ বলে। এই চরশেরও গাঁজার ন্যায় ধূম পান করা হয়।

ক্রিয়া—এই তিনটী ঔষধের ক্রিয়াই একই রূপের। ইহারা মস্তিষ্কের উত্তেজক, অবসাদক, মাদক ও কামোদ্দীপক। ইহাদের উত্তেজক ক্রিয়া রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্রের উপর প্রকাশ পাইলেও, বিশেষভাবে ইহারা মস্তিষ্ককেই আশ্রয় করে। গাঁজা ও চরশের ধূমপান অথবা সিদ্ধি মিশ্রিত আহার্য্য গ্রহণে সত্বরই স্ফূর্ত্তি ও মৃদু-মাদকতা উপস্থিত হয়। মন প্রফুল্ল হয়, মন মধ্যে সন্তোষ ও আনন্দ বিরাজ করে। সামান্য কারণেই সিদ্ধি, গাঁজা বা চরশ-সেবী ব্যক্তি হাসিতে থাকে। মনোমধ্যে নূতন নূতন কল্পনা এত সত্বর উদিত ও অস্তমিত হয় যে, পলকে দণ্ড বলিয়া অনুমিত হয়। সাধারণতঃ যে সকল কল্পনা মনোমধ্যে উদিত হয়, সে সকল সত্বরই তাহারা ভুলিয়া যায়। আবার কোন কোন সময়ে নেশা ছুটিয়া গেলেও সেই সকল কল্পনার স্মৃতি রহিয়া যায়। মত্ত ব্যক্তি হস্ত-পদ ভার বোধ করে, সর্ব্বাঙ্গীন স্পর্শ ও বোধ-শক্তির হ্রাস হয় ও পরে ক্রমশঃ যত মাদকতা বৃদ্ধি পায়, ততই চৈতন্যের হ্রাস লক্ষিত হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল হয়, কিছু সময় পরে সুখকর স্বপ্নময় নিদ্রা উপস্থিত হয়। ইহা কামোদ্দীপকও বটে। গাঁজা, সিদ্ধি বা চরশ সেবনের পরই এই সকল নেশা-সেবীরা কাম-পীড়িত হয়। ইহাতে সাময়িক কামোদ্দীপনা হইলেও অদূর-ভবিষ্যতে এই সকল নেশা-সেবীদের ধ্বজভঙ্গ পীড়া, রতিশক্তিহীনতা ইত্যাদি হইতে দেখা যায়।

অস্মদ্দেশে অনেকেই গাঁজা, সিদ্ধি বা চরশ ব্যবহার করিয়া থাকে; বিশেষতঃ মজুর, কুলী, রিক্‌শাওয়ালা ইত্যাদি শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এই সকল নেশার আধিক্য দেখা যায়। এই সমস্ত মাদক সেবনে শীঘ্রই মত্ততা উপস্থিত হয়। নেশাখোর বাচালতা প্রকাশ করে, গান ও চীৎকার করিতে থাকে, অকারণ অত্যন্ত হাস্য করিতে থাকে, অধিক পরিমাণে আহার করিতে চায়—অনেক সময়ে করিয়াও থাকে। এইরূপ করিতে করিতে শেষে ঘুমাইয়া পড়ে। নিদ্রাভঙ্গের পর জিহ্বা এবং সমুদায় শরীর শুষ্ক বোধ হয়। বিশেষ পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এই সকল মাদক-দ্রব্য মস্তিষ্কের উপর বিশেষভাবে কার্য্য করে। এই সকল মাদক সেবনে নাড়ীর স্পন্দন প্রথমতঃ দ্রুত ও পরে মন্দ-গতি হয়; সময়-সময় ইহার বিপরীতও হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে এই তিনটীই অতি প্রসিদ্ধ মাদক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মজুর শ্রেণীর লোক, যাহারা আমাদের দেশের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তাহাদের মধ্যেই এই মাদকত্রয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসীদের তো ইহারা একচেটিয়া নেশা। যে সাধু গাঁজা ও সিদ্ধি খায় না, সে সাধু—সাধুই নহে। এই শ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসীদের সন্ধ্যাকালীন আখ্‌ড়াতেই 'গঞ্জিকা' সমধিক আদরের সহিত চেলা, শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রসাদ রূপে সেবিত হয়। বাবা বিশ্বনাথ দেবাদিদেব মহাদেব গাঁজায় দম্ দিয়া ভোঁ হইয়া পড়িয়া থাকেন এবং বিশ্বজননী মা ভগবতী প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধুস্তুর-মিশ্রিত উপাদেয় সিদ্ধির সরবৎ প্রস্তুত করিয়া মহাদেবকে পান করিতে দেন। অতএব ভক্ত যাহারা তাহারা উল্লিখিত গাঁজা ও ভাং সেবনে বিরত থাকিলে চলিবে কেন? উহারা যদি মন্দ জিনিষ হয়, তাহা হইলে দেবতা সেবন করেন কেন? এই সকল মনগড়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সাধুবাবারাই আরও অধিক পরিমাণে এই গাঁজা, সিদ্ধি ও চরশের "প্রোপাগাণ্ডা-ওয়ার্ক" করিয়া

বেড়াইতেছেন। ইহারাই আবার ধর্ম্মপ্রাণ, গৃহত্যাগী, নরশ্রেষ্ঠ, সাধু ও সন্ন্যাসী নামে পরিচিত। লোকে গাঁজা বা চরশের ধূমপান করে এবং সিদ্ধির সরবৎ, কচুরী, বরফী ও রাব্‌ড়ী সহযোগে কুল্‌পী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া খায়। দুগ্ধ, ঘৃত ও চিনির সহিত সিদ্ধির এক প্রকার খণ্ড প্রস্তুত হয়—তাহাকে চলিত কথায় "মাজুম্" বলা হয়। তাহাও কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকে।

কলিকাতা সহরে সিদ্ধির কুল্‌পী বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে সাংকেতিক ভাষায় "কানো" বা "বয়া" বলা হয়। নেশাখোররা কুল্‌পী বিক্রেতাদের নিকট "কানো" চাহিলেই উহারা বুঝিতে পারিবে যে ক্রেতা নেশাখোর এবং "সিদ্ধির কুল্‌পী" চাহিতেছে। এই কুল্‌পী খাইলে সিদ্ধির যে সকল ক্রিয়া তাহা তো প্রকাশ পায়ই; পরন্তু সময় সময় উদরাময় ও আমাশয় রোগও উপস্থিত হইয়া থাকে। চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে সিদ্ধি, গাঁজা ও চরশ অধিক পরিমাণে, দীর্ঘকাল সেবন করিলে—ক্ষুধার লোপ, দৌর্ব্বল্য, খিট্‌খিটে মেজাজ, হস্ত পদের কম্পন, বিবেচনা ও বিচার-শক্তির লোপ ও পরিশেষে উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। গাঁজার ধূমপান করিবার অনতিকাল বিলম্বেই উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া গাঁজাখোররা ইহাকে তাহাদের ভাষায় "তুরিয়ানন্দ" (ত্বরিতানন্দ?) বলিয়া থাকে। গাঁজখোরদের চক্ষু সর্ব্বদাই আরক্তিম থাকে, দেহ শীর্ণ হয়, অস্থি পঞ্জর দেখা যায়, গাল্ তুব্‌ড়িয়া যায়।

গাঁজা, ভাং, চরশ ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণে সেবনে বাতব্যাধি, পক্ষাঘাত, যক্ষ্মা ইত্যাদি ভীষণ ব্যাধিও হইতে পারে। ইহাতে মানসিক বৃত্তি সকল নিস্তেজ ও হীন-ভাবাপন্ন হয়, আত্ম-সম্মান জ্ঞান একেবারেই লোপ পায়। স্বভাব অত্যন্ত উগ্র হয় এবং স্ত্রী, পরিবার পরিজন, বন্ধু বান্ধব, গুরুজন প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদাই কলহ করিয়া থাকে। যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা দরকার, তাহা করে না। দীর্ঘকাল ক্রমাগত এই সকল নেশা ব্যবহারে উন্মাদ রোগ উপস্থিত হইতে পারে। অনেক চিকিৎসক বলেন যে, আমাদের দেশে অতিরিক্ত গাঁজা সেবনই অধিকাংশ উন্মাদ রোগের মূল কারণ।

ঢাকার উন্মাদ-হাঁসপাতালের এক বৎসরের রিপোর্টে ডাঃ সিম্পসন্ লিখিয়াছিলেন যে ঐ বৎসর ২৯৬ জন উন্মাদ রোগীর মধ্যে ১৪৩ জনের—শতকরা ৪৮.৩১ জনেরই—রোগের কারণ গাঁজা সেবন। পর বৎসরের রিপোর্টে জানা যায় যে, ৩২২ জন রোগীর মধ্যে ১৬৬ জন রোগীই (শতকরা ৫০ জন) অপরিমিত গাঁজা সেবন জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে ঐ সকল মাদকের প্রসার যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, লোকের স্বভাবও ততই অধিক উগ্র ও খিট্‌খিটে হইতেছে, উন্মাদ্ রোগীর সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতেছে।

শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা গাঁজা ও চরশকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও ভাং বা সিদ্ধিকে যে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন—তাহা প্রায়ই দেখা যায়। ব্রত পার্ব্বণ উপলক্ষে সিদ্ধিটা ধর্ম্ম-কর্ম্মের একটী অঙ্গের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ফলে ইহা অনেক শিক্ষিত পরিবারে বিশেষতঃ স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে "পার্ম্মানেণ্ট্ সেট্‌লমেণ্ট" বা স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

অনেকের কুসংস্কার আছে যে "সিদ্ধি" বাস্তবিকই সিদ্ধিদায়ক—কাযেই পরিবারস্থ যুবকেরা উহা সেবন করিতে থাকিলে কোনও আপত্তি প্রকাশ করেন না। ফলে যুবকেরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। যে সকল যুবক সিদ্ধি পানে একবার আসক্ত হয়, তাহাদিগকে তাহা হইতে বিরত করাও কষ্টকর। সিদ্ধি সেবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বড়ই শক্ত। সুতরাং যুবকেরা যাহাতে ইহাতে অভ্যস্ত হইতে না পারে তৎপ্রতি অভি-ভাবকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পাশ্চাত্য ভিষকবর্গের মতাবলী ও ডাক্তার করের "ভৈষজ্যতত্ত্ব" নামক পুস্তক পাঠে গাঁজা, সিদ্ধি ও চরশের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানা যায়, যে, ইহা মনুষ্য দেহের একটী শত্রু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরায় ন্যায় স্বাস্থ্য তিল তিল করিয়া নষ্ট

করিয়া দেয়। ইহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

পল্লীগ্রামের বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায়, "গাঁজা খেলে পাঞ্জা বাড়ে; সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে; মদ খেলে লক্ষ্মী ছাড়া হয়"—এই প্রবাদ-বাণী শুনিয়াই তরলমতি বালকেরা সিদ্ধিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। নিম্নে আমার জানা একটী ঘটনা বলিতেছি—

একটী স্কুলের ছাত্রের বুদ্ধি বড়ই মোটা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে প্রত্যহই 'বোকা' বলিয়া বকাবকি করিতেন। একদিন দেখা গেল যে, ছাত্রটী পুরাদমে সিদ্ধির সরবৎ খাইয়া ভোঁ হইয়া স্কুলে আসিয়াছে এবং কিছুক্ষণ পরেই যখন তাহার বেশ নেশা হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে ক্লাসে নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে আসিলে, সে বুকে তাল ঠুকিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে "চ্যালেঞ্জ" করিল। ইতি মধ্যে একটী ছাত্র বলিয়া ফেলিল, "পণ্ডিত মহাশয় ও সিদ্ধির সরবৎ খাইয়াছে।" যাহা হউক তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পরদিন সে স্কুলে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"পণ্ডিত মহাশয়! আপনি রোজই আমাকে বলেন—তুই বড় বোকা; তোর মাথায় গোবর ভরা আছে। সেদিন, জ্যেঠামণি বল্‌ছিলেন যে সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, গাঁজা খেলে পাঞ্জা বাড়ে; আর মদ খেলে লক্ষ্মী ছাড়া হয়। তাইতে তো কাল শিবুদের বাড়ী গিয়ে খুব এক গেলাস সিদ্ধির সরবৎ খেলাম; কিন্তু কই এতে তো পণ্ডিত মশাই! আমার বুদ্ধি আরও বেশী ক'রে নষ্ট হয়ে গেছিলো।" এই রকম করেই সিদ্ধি, গাঁজা, চরশ ইত্যাদি আমাদের সমাজে এতটা আধিপত্য করিয়া চলিয়াছে।

সমাজের যারা মেরুদণ্ড—পরিশ্রমী—শ্রমিক দল যাহারা ভবিষ্যতের আশা—সমাজের যুবক যাহারা—তাহাদের মধ্যেই এই গাঁজা, ভাং ও চরশ একাধিপত্য করায় তাহাদের স্বাস্থ্য, উদ্যম, শক্তি, সামর্থ্য ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। যে দেশের রক্তে স্বাস্থ্য-প্রবাহ নাই, যে দেশের স্নায়ুতে শক্তি ও সামর্থ্য নাই—সে দেশের মঙ্গল কোথায়? এই সকল সামান্য নেশার ঘোর যাহারা কাটাইতে পারে নাই, তাহারা কিরূপে স্বাধীন চিন্তা করিবে? তবু স্বরাজ স্বরাজ করিয়া ফাঁকা গলায় চীৎকার করিলে চলিবে কেন? স্বাস্থ্যচর্চ্চা ভুলিয়া শুধু বাজে চেঁচা-মেচি করিয়া লাভ কি?

আমাদের দেশে প্রত্যেক ব্যবসারই পতন আছে, কোনও ব্যবসাই ভাল চলিবে না। কিন্তু এই গাঁজা-ভাং চরশ, মদ ইত্যাদি নেশার ব্যবসার কখনও পতন নাই। ইহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। দিন দিন এই ব্যবসার উন্নতিই হইতেছে। এই ব্যবসাগুলি আমাদের দেশে যত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এত বোধ হয় আর কোনও দেশেই করে নাই। গাঁজা, ভাং, চরশ ইত্যাদি ঘৃণ্য নেশা আর কোনও দেশেই নাই। ইহা হইতেই আমরা আমাদের উন্নতি বুঝিতে পারি।

ভারতবাসী জাগ! উঠ! নেশা করিয়া ভোঁ হইয়া থাকিলে চলিবে না! নেশা ছাড়! শক্তি ও স্বাস্থ্যচর্চ্চা কর। তাহ'লে যদি অন্য দশটা দেশের সঙ্গে সমস্তরে দাঁড়াতে পার। নইলে শুধু শুধু লম্ফে ঝম্পে কিবা ফলম্। যাহারা নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন লইতে বা স্বীয় শক্তি রক্ষা করিতে জানে না, তাহারা কিরূপে দেশ-মাতৃকার সেবা করিবে? তাই বলিতেছিলাম, ভাই-সব, জাগ; নেশার মোহ কাটাও, শক্তি ও স্বাস্থ্যের চর্চ্চা কর!!

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য।

[দীন সেবক।

স্বাস্থ্যের মৌলিক অর্থ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা। শরীরটী যাহাতে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তাহা সম্পাদন করাই স্বাস্থ্যরক্ষা। যথার্থ স্বাস্থ্যরক্ষা কেবল শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা নয়।

শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে মনেরও স্বাস্থ্য বা সুস্থতা সম্পাদন করিতে হইবে, এবং মনের প্রকৃত স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে আত্মাও যাহাতে সুস্থ থাকে তাহা করিতে হইবে। কারণ শরীর মন এবং আত্মা তিনটীই পরস্পরের সহিত অতি নিগূঢ় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এবং এই তিন উপাদানে মানব জীবন গঠিত।

প্রধানতঃ আহার, পান, স্নান, বায়ুসেবন, ব্যায়াম ও বিশ্রাম বা নিদ্রার দ্বারা শরীর রক্ষা হয়। যে আহার পান করিলে শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা রক্ষা হয়, সেইরূপ আহার পান করা বিধেয়। শরীর যখন যেরূপ আহার পান চায়, তাই তাহাকে দিতে হইবে। তাহার অর্থ ইহা নয় যে, যাহা মুখরোচক, যাহা খাইতে ভাল লাগে তাহাই আহার ও পান করিতে হইবে। শরীরের উপাদান অনুরূপ আহার পানের ব্যবস্থা করাই শরীরের স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায়। এতৎ সম্বন্ধে অসাবধানেই শরীরের অবস্থা নষ্ট হয়। নিয়মিতরূপে আহার পান স্নান, ব্যায়াম ও বায়ুসেবন করিলে এবং যথোচিত ভাবে নিদ্রা যাইলে আকস্মিক কোন দুর্ব্বিপাক ব্যতীত— শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই।

আহার পান সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ও নিয়মিত হওয়া উচিত। শরীরের পরিপাক-শক্তি অনুসারে যেন আহার পান করা হয়। তেমনি বিশুদ্ধ জলে স্নান, বিশুদ্ধ জল পান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে হইবে। নিয়মিত অঙ্গচালনা দ্বারা ব্যায়াম বা নিয়মিত ভ্রমণ করা আবশ্যক। শয়ন করিয়া বিশ্রাম বা নিদ্রা, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী। রাত্রে অন্ততঃ ছয় সাত ঘণ্টা যাহাতে সুনিদ্রা হয় তাহা করিতে হইবে।

শরীর কেবল মানব-জীবনের গ্রহাধার মাত্র। মনই মানুষের মনুষ্যত্ব। অতএব মনও স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত না হইলে যথার্থ স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। মন যদি বিকৃত হয় তাহা হইলেও শরীর সম্পূর্ণভাবে সুস্থ থাকে না। তাই মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইহার প্রকৃতি অনুরূপ আহার পান দিতে হইবে, ব্যায়াম বিশ্রামও নিয়মিতভাবে করিতে হইবে। সৎশিক্ষা, সৎচিন্তা, সদালোচনা দ্বারা মনের পরিপুষ্টি সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাই মনের আহার পান। কুচিন্তা, অসদ্বিষয়ের আলোচনা দ্বারা মনের অসুস্থতা বা বিকার উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

সৎপুস্তক পাঠ, সৎকর্ম্ম সাধন, সৎ সঙ্গে বাস, বিজ্ঞান শিক্ষা ও আলোচনা, দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন ও বহু বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় এবং চিন্তালব্ধ বিষয় সকল লিপিবদ্ধ করাতে মনের উৎকর্ষতা লাভ হয় ও বা স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হয়।

যে পুস্তক পাঠে মনে কুভাবের উদয় হয় বা কুচিন্তার উদ্রেক হয়, কিম্বা অসার কল্পনার বৃদ্ধি হয়, তাহা কখন পাঠ করা উচিত নয়। অতিরিক্ত নভেল বা অসার অশ্লীল পুস্তক পাঠে মন বিকৃত হয়।

সৎচিন্তা দ্বারা মনের উৎকর্ষতা লাভ হয়। সুতরাং পুস্তক সকল কেবল পাঠ করিলেই হয় না। পুস্তক পাঠ করিয়া তাহাতে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সুচিন্তিত বিষয় সকল যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আত্মস্থ করিতে হইবে এবং যাহাতে মন সেইরূপ উচ্চচিন্তা করিতে সমর্থ হয় এবং তদ্দ্বারা আত্মার পরিপুষ্টি সাধন হয়, তাহাই করিতে হইবে।

মনের স্ফুর্ত্তি বৃদ্ধিতে শরীরেরও সুস্থতা বৃদ্ধি হয়। বাস্তবিকই মনের উপর শরীরের সুস্থতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। মনেতেই স্বর্গ, মনেতেই নরক। মন সুস্থ থাকিলেই, মনের বলে অসুস্থ শরীরেও সুস্থতা লাভ হয়। মন ভার হইলে, মন বিকৃত হইলে, মন শোকার্ত্ত থাকিলে, সুস্থ শরীরেও অসুস্থতা আসিয়া থাকে। অতএব মন যাহাতে সবল ও সুস্থ থাকে তাহার জন্য সর্ব্বদা কৃতসংকল্প হইবে।

মন এক দিকে যেমন শরীরের উপর আধিপত্য করে, আর একদিকে আত্মারও সুস্থতা সাধনে সহায়তা করে। আত্মাই মনের মানবত্ব। আত্মা শরীর ও মনের অভ্যন্তরে বাস করে। প্রাণরক্ষা হইলে যেমন শরীর ও মন রক্ষা হয়, তেমনি আত্মার প্রভাবেই শরীর মনের সুস্থতা রক্ষিত হইয়া থাকে।

শরীরের মধ্যে রক্ত ও প্রাণবায়ু যেমন, আত্মাও তেমনি শরীর মনের গ্রহাধার হইয়া অবস্থান করিতেছে।

এই আত্মার পরিপোষণ করাতেই মানব-জীবনের প্রকৃত স্বাস্থ্যরক্ষা করা হয়। কারণ, আত্মার সবলতা ও সুস্থতাতেই মানব-জীবনের সর্ব্ব শরীরের সুস্থতা সম্পাদন হয়। মাথায় জল দিলে যেমন সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়, তেমনি আত্মার রক্ষা হইলে দেহ-মন পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করে।

আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারিলে শরীর মন ত সুস্থ হইবেই, তদ্ব্যতীত মানব দীর্ঘজীবী হইবে।

আত্মার অন্নপান আত্মচিন্তা, আত্মজ্ঞান। আত্মচিন্তার দ্বারা আত্মার আত্মা যিনি সেই চিন্তামণিকে চিনিতে জানিতে পারা যায়। তাঁহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন যাপন করিতে পারা যায়, এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সাধন করিতে পারা যায়।

শরীরের স্বাস্থ্য কেমন করিয়া রক্ষা হয়, মনের স্বাস্থ্য কেমন করিয়া বৃদ্ধি হয় এবং তদ্ব্যতীত পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি, জগৎ প্রভৃতি যাহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা কেমনে সম্যকরূপে পালন করিতে হয় তাহা আত্মজ্ঞানে উপলব্ধ করিয়া আমরা করিতে পারি।

ঈশ্বর আমাদের জীবনের জীবন এবং জ্ঞানের নিয়ন্তা হইয়া স্বয়ং আমাদের আত্মার কল্যাণ সাধনে সহায়তা করিবার জন্য বিদ্যমান; তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরে অবস্থান করিয়া জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য পালনে প্রতিদিন সমর্থ করেন। আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক প্রতিদিন তাঁহার মানস পূজা করিলেই তাহার পরিচালনা অনুভব করিতে পারে। ব্যায়াম দ্বারা যেমন শরীর সবল হয়, মানস পূজা দ্বারা তেমনি আত্মা ধর্ম্ম বলে ঈশ্বর বলে সবল হয়। আত্মারবলেই মনের বল এবং তদ্দ্বারা শরীরও সবল ও সর্ব্বদা সুস্থ থাকে।

ঔষধার্থে রসাঞ্জন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[ডাঃ নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস]

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ—চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন নিউমোনিয়া আক্রান্ত কোন রোগীই এণ্টিমনি সেবনে বিশেষ ফল পায় নাই।

(**Intramuscular Injection**)

মাংসপেশীর মধ্যে অন্তঃক্ষেপ।

সাধারণতঃ • এন্টিমনি ঘটিত সকল ইন্ট্রামাস্কুলার ইনজেক্সনের অনুপযুক্ত। এ যাবৎ বাজারে ইন্ট্রামাস্কুলার প্রয়োগের জন্য যতগুলি এন্টিমনি-ঘটিত ঔষধ বাহির হইয়াছে, আমরা প্রায় সকল গুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহাদিগকে ইনজেক্সন দিবার পর প্রায় সকল রোগী ইনজেক্সন স্থানে ভীষণ বেদনা অনুভব করিয়াছে। মার্টিনডেলের ইনজেক্সন

অকসাইড (Martindale Injection oxide of Antimony) হাইপার এসিড্ এণ্টিমনি উইথ ইউরেথ্রেন, এণ্টিমনি উইথ এলবুলিন এণ্ড ক্রিয়োক্যাম্ফর (Antimony with albioln and creocampher) ডাঃ মেপিয়ার-নির্দ্দিষ্ট স্কেল এণ্টিমনি (Scale Antimony) কোনটাই ইন্‌জেক্‌সনের পর রোগীকে বেদনাহীন রাখিতে সমর্থ হয় নাই। বিশেষতঃ সময়ে সময়ে ইনট্রামাস্‌কুলার ইন্‌জেক্‌সনের পর রোগীর এত অধিক যন্ত্রণা হয় যে, রোগী সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত শয্যাশায়ী থাকে। এতৎব্যতীত ইনট্রামাস্‌কুলার ইন্‌জেক্‌সনের পর রোগীর উক্ত স্থানে নিম্নলিখিত অবস্থা ঘটিতে পারে। ইন্‌জেক্‌সন স্থানের চতুঃপার্শ্ব ফুলিয়া উঠে এবং রক্তাধিক্য হয়। মাংসপেশী সমূহের মধ্যে রক্তস্রাব হয়। অসাবধানতাবশতঃ ইন্‌জেক্‌সনের ফলে স্থানটী বিষাক্ত হইয়া স্ফোটকের আকার ধারণ করে এবং তাহার ভিতর পূঁয জন্মিতে পারে, এবং স্নায়ু সমূহের স্থানিক মৃত্যু ঘটে।

আরও একটী কথা। ইনট্রামাস্‌কুলার ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া যদিও ইনট্রাভিনাস ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহা হইলেও তুলনায় শিরার ভিতর ঔষধ প্রয়োগের ফলে রোগীর শীঘ্র শীঘ্র উপকার হয়; এবং ইহা অধিকতর শক্তিশালী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একটী পঞ্চম বর্ষীয় কালাজ্বর রোগীকে কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক প্রায় ৪০-৪৫টী হাইপার এসিড্ ইউরেথ্রেন ইন্‌জেক্‌সন দেন; কিন্তু ইহাতে কোনও সুফল ফলে নাই। অধিকন্তু রোগী দিন দিন রক্তহীন, দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। চিকিৎসাকালের মধ্যে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ দেখা দেয়, রোগী একজ্বরে হইয়া থাকে এবং পরিশেষে রাতকানা হয়। কিন্তু ইহার পর ২৮টী ইনট্রাভেনাস ইন্‌জেক্‌সন দেওয়াতে উক্ত রোগী আরোগ্য লাভ করে। বিগত ৫ বৎসরের মধ্যে উক্ত রোগীর পুনরাক্রমণ শুনি নাই। অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অবশ্য একটী রোগীর সুফল দেখিয়া কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তথাপি আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতে পারি; এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকগণেরও এই মত। বিশেষ প্রতিবন্ধক, যাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, উপস্থিত না হইলে ইনট্রাভেনাস্ ইন্‌জেক্‌সন দেওয়াই প্রশস্ত।

পূর্ব্ববর্ণিত প্রতিবন্ধক ব্যতীত নিম্নলিখিত কারণেও অনেক সময় ইনট্রামাস্‌কুলার ইন্‌জেক্‌সন দিতে হয়।—

(১) রোগীর ভেন বা শিরা উপর হইতে খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে;

(২) অত্যন্ত শিশুরোগীর কোনও মতে শিরা খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে;

(৩) পুনঃ পুনঃ শিরার ভিতর ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও সন্তোষজনক ফল না পাইলে মাঝে মাঝে মাংসপেশীর মধ্যে অন্তঃক্ষেপ করিলে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়; এবং বেদনার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে প্লীহা কমিতে পারে।

৪। শিরার ভিতর ইন্‌জেক্‌সনে অনেক সময় অনেক রোগীর এমন বমন ও কাসি আরম্ভ হয় যে, সময়ে সময়ে বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়। এড্রেনাল ক্লোরাইড্ (Adrenalin chlorid) প্রভৃতি প্রয়োগেও ফল পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ইনট্রামাস্‌কুলার ইন্‌জেক্‌সন দিবার সংক্ষিপ্ত প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রথমে রোগীকে এক পাশ করিয়া অথবা উপুড় করিয়া শোয়াইয়া তাহার নিতম্ব প্রদেশস্থিত গ্লুটিয়াল (Gluteal) মাংসপেশী স্থানটিকে উত্তমরূপে সাবান দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন। অতঃপর স্থানটী শুষ্ক হইলে টিন্‌চার অব্ আইডিন (Tinct. of Iodine) অথবা এবসোলিউট এলকোহল (Absolute Alcohol) দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিবেন। অতঃপর পোষ্টিরিয়ার সুপিরিয়ার ইলিয়াক স্পাইন (Posterior-Superior Iliac Spine) হইতে ইস্‌কিয়াল টিউবারসিটি (Ischial Tuberosity) পর্য্যন্ত একটী কাল্পনিক রেখা তৈয়ারী করিয়া লইবেন। উক্ত রেখার মধ্য-বিন্দুতে ইন্‌জেক্‌সন দিবেন। ইন্‌জেক্‌সন দিবার কালে পিচকারীর ছুঁচ ঠিক লম্ব ভাবে মাংসপেশীর ভিতর প্রবেশ করান বিধি। ঔষধ

মাংসপেশীর ভিতর প্রবেশ করিলে ছুঁচটী তুলিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই রন্ধ্রটী বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা তিনটী আঙ্গুলের মধ্যে একটু তূলা লইয়া তদ্দ্বারা চাপিয়া ধরিবেন। এবং উক্ত স্থানের চতুঃপার্শ্ব ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিয়া দিবেন। অন্তঃপর বস্ত্রটি একটু বিশুদ্ধ তূলার সহিত টিন্‌চার বেনজয়িন কমপাউণ্ড (Tinct. Benzoin compound) অথবা কলোডিয়াম (Collodium) দিয়া বন্ধ করিয়া দিবেন। ইন্‌জেক্‌সন দিবার কালে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ছুঁচটী অস্থি স্পর্শ না করে; কিম্বা ত্বক-নিম্নস্থ পেশী কিম্বা বসার মধ্যে প্রবেশ না করে। এবং কোন বৃহৎ শিরা ধমনি কিম্বা নাড়ী বিদ্ধ না করে। একই স্থানে পুনঃ পুনঃ ইন্‌জেক্‌সন দিবেন না। ঔষধের বিশুদ্ধতা এবং যন্ত্রের জীবাণুশূন্যতা (Sterilisation) বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে উদাসীন হইবেন না। অনেক সময় এই সামান্য অসাবধানতার জন্য রোগী ভয়ানক কষ্ট পায়। যে কোনও ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হউক না কেন, ইন্‌জেক্‌সন দিবার পর রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিবেন।

ইনট্রাভেনাস্ ইঞ্জেক্‌সন্।

(শিরার ভিতর অন্তঃক্ষেপে ঔষধ প্রয়োগ)

যত প্রকার উপায়ে এণ্টিমনি প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার মধ্যে শিরার ভিতর অন্তঃক্ষেপই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা এবং সুফলপ্রদ। নিয়মিত ভাবে ইন্‌জেক্‌সন দিতে পারিলে, ইহাতে অপরাপর এণ্টিমনি প্রয়োগ জনিত রোগীর যে সকল কষ্টের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কোনটীই হয় না। ইনট্রাভেনাস ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া খুব কঠিন কার্য্য নহে। পরন্তু অভ্যাস-সাপেক্ষ। নিম্নলিখিত উপায়ে ইনট্রাভেনাস ইন্‌জেক্‌সন দিতে হয়। রোগীকে চিৎ করাইয়া শোয়াইবেন, এবং দক্ষিণ কিম্বা বাম হস্তের কফোনী সন্ধি (Elbowjoint) হইতে ২ ইঞ্চি ঊর্দ্ধে বাহুকে একটি রবারের সরু নল দিয়া একটু আঁটিয়া বন্ধন করিবেন। এবং হস্তকে সম্প্রসারণ এবং সঙ্কোচন করিবেন। ইহার ফলে উক্ত সন্ধির উপরিস্থিত বেসালিক ভেন (Basilic vein) কিম্বা সেফালিক ভেন (Cephalic vein) ফুলিয়া দেখা দিবে। বলা বাহুল্য, ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার পূর্ব্বে উক্ত স্থানটী সাবান দিয়া ধুইয়া কোন এন্‌টিসেপ্‌টিক্ লোসন (Antisceptic lotion) দিয়া ধুইয়া ফেলিবেন। অতঃপর উক্ত শিরাদ্বয়ের মধ্যে যে কোন একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপ দিয়া ধরিয়া রাখিবেন। এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ঔষধ পূর্ণ পিচকারীটি লইয়া শিরার উপরিস্থিত চর্ম্ম ভেদ করতঃ শিরা মধ্যে অনুলম্বভাবে উহার সূচি প্রবেশ করাইবেন। শিরার উপরিস্থিত চর্ম্মকে সমতল করিয়া সূচটী এরূপভাবে ধরিবেন, যাহাতে একটী ৫০ ডিক্রী কোণ উৎপন্ন করে। অতঃপর ধীরে ধীরে শিরার উপরিস্থিত চর্ম্ম ভেদ করিয়া সূচি শিরার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিবেন। শিরার ভিতর সূচি প্রবেশ করিলেই তৎক্ষণাৎ শিরা হইতে সামান্য একটু রক্ত সিরিঞ্জের ভিতর আসিবে। অতঃপর বাহু-বেষ্টনি নলটী খুলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সিরিঞ্জের পিস্‌টনে (Piston) চাপ দিবেন। সমস্ত ঔষধ প্রয়োগের পর সূঁচ বাহির করিয়া লইয়া টিন্‌চার বেন্‌জয়েন কমপাউণ্ড অথবা কলোডিয়াম সহিত তূলা দিয়া রন্ধ্র বন্ধ করিবেন। অনেক সময়ে সূচ ঠিক শিরার মধ্য ভাগে প্রবেশ না করিয়া, উহা ভেদ করিয়া অপর পার্শ্বে বহির্দ্দেশে উপস্থিত হয়। আবার কখনও বা শিরা আদৌ বিদ্ধ না হইয়া ত্বক-নিম্নস্থ পেশীর মধ্যে অথবা বসার মধ্যে প্রবেশ করে। এই সমুদায় স্থলে ঔষধ প্রয়োগে উক্ত স্থানে ভীষণ প্রদাহ উপস্থিত হয়। সিরিঞ্জের পিস্‌টন ঠেলিবার পূর্ব্বে সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ঠিক শিরার ভিতর ঔষধ প্রয়োগ করাইবার সময় ঈষৎ চাপেই ঔষধ যাইবে। কিন্তু সূচের সংস্থিতি ঠিক না হইলে ঔষধ পেশীর মধ্যে যাইতে হাতের জোর লাগিবে। রোগীও যন্ত্রণার জন্য কাতর হইবে। খুব দ্রুত গতিতে ইন্‌জেক্‌সন দিবেন না।

এন্‌টিমনি ইন্‌জেক্‌সনের ক্রিয়া।

চিকিৎসার প্রারম্ভে ইন্‌জেক্‌সনের পর ৫ মিনিট

হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে (কোন কোন রোগীর পক্ষে তদপেক্ষা অধিক সময়ের মধ্যে) কম্প দিয়া জ্বর আসে। এই জ্বর ত্যাগ করাইবার জন্য অন্য কোনও ঔষধের প্রয়োজন হয় না। ইহা আপনা হইতেই ছাড়িয়া যায়। কিছু দিন ইন্‌জেক্‌সনের পর রোগীর আর জ্বর আসে না। বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ কমিয়া বক্ষ পঞ্জরের ভিতর স্বস্থানে চলিয়া যায়। রোগীর বর্ণ উজ্জ্বল হয়; রক্তহীনতা দূরীভূত হইয়া নূতন রক্ত উৎপন্ন হয়। এবং রোগী নবজীবন প্রাপ্ত হয়। এণ্টিমনি চিকিৎসার পর এমন দেখা গিয়াছে যে, চিকিৎসার শেষে রোগীর দৈহিক ওজন তাহার সুস্থ দেহের ওজন অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। উভয় বিধ রক্ত-কণিকার সমষ্টি এবং শোণিমা (Hemoglobin-index) বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এন্‌টিমনি ইন্‌জেক্‌সনের বিষ ক্রিয়া।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সোডিয়ম সল্ট অপেক্ষা টার্টার এমিটিক অধিকতর বিষাক্ত। এই জন্য বর্ত্তমানে সোডিয়ম সল্টই বেশী ব্যবহৃত হয়। এরোমেটিক কমপাউণ্ডগুলির আরোগ্যকারী ক্ষমতা সাধারণ সল্ট অপেক্ষা যদিও অধিক, তথাপি তাহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। এণ্টিমনিঘটিত ঔষধ সকল প্রয়োগে নিম্নলিখিত বিষ-ক্রিয়া উপস্থিত হইতে পারে—

১। কম্প দিয়া জ্বর। সময়ে সময়ে এই জ্বর ১০৫° হইতে ১০৭° ডিক্রী পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। দুই তিন দিন জ্বর ছাড়ে না। ইন্‌জেক্‌সনের এক ঘণ্টা কিম্বা ততোধিক সময়ের পর এরূপ জ্বর আসিতে পারে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ইন্‌জেক্‌সানের পর রোগীর যেরূপ জ্বর আসিত, এই বিষ ক্রিয়ার জ্বরে তদপেক্ষা অত্যধিক উত্তাপ দেখা যায়। ইহার সহিত কালাজ্বরের বা স্বাভাবিক জ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। বিষয়টী বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটী রোগীর ঘটনার বর্ণনা করা গেল। এই রোগী কোনও দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ক্রমান্বয়ে সাতটি ইন্‌জেক্‌সন লইবার পর তাহার অবস্থা এতদূর সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, রোগীর জীবন পর্য্যন্ত সংশয়াপন্ন হয়। রোগীর জ্বর চিকিৎসার পূর্ব্বে ইন্‌টারমিটেণ্ট (Intermittent) অর্থাৎ ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসিত; পরে তাহা একজ্বরে (Remittent) অবস্থায় দাঁড়াইল। শরীরের উত্তাপ ১০৪ ডিক্রী; অজ্ঞান অবস্থা। অথচ ডাকিলে সামান্য সাড়া দেয়। পুনরায় কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে নির্ব্বাক থাকে। প্রলাপ বকুনি, শিবনেত্র; মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠে। প্রস্রাবের পরিমাণ অতি অল্প। নাড়ীর গতি অতি ক্ষীণ। ইন্‌জেক্‌সন বন্ধ রাখিয়া লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসার ফলে ৭ দিন পরে রোগীর উপসর্গ দূর হয়।

২। ইন্‌জেক্‌সনের পর মুহূর্ত্তে রোগীর অত্যন্ত কাসি ও বমন হইতে পারে। সময়ে সময়ে কাসিতে কাসিতে এমন অবস্থা হয় সে রোগীর শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সব রোগীকে এড্রেনাল ক্লোরাইড্ জিহ্বা-নিম্নে অথবা ইন্‌জেক্‌সন দিয়া বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। আবার দুই একটী রোগীতে কোনও ফল হয় না। যে সকল রোগীর ইন্‌জেক্‌সনের পর বমন হয়, তাহাদের আহারের পর কখনও ইন্‌জেক্‌সন দিবেন না। সাধারণতঃ এণ্টিমনি ইন্‌জেক্‌সন আহারের পূর্ব্বে দেওয়া বিধি।

৩। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি প্রথমে খুব দ্রুত হইতে পারে। রোগী হাঁপাইতে থাকে; কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকে না।

৪। ইন্‌জেকসনের পর অনেক রোগী অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হইতে পারে।

৫। মাথার যন্ত্রণা। কয়েকটী রোগীকে অভিযোগ করিতে শুনিয়াছি যে, ইন্‌জেক্‌সনের পর মাথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়। একটী রোগীর আধকপালে (Hemicrania) হয় বলিয়াছে। উক্ত রোগী আরও বলে, তাহার চোখ যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

৬। কয়েকটী রোগীকে দেখিয়াছি, চিকিৎসা সমাপ্তে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া মাথার যন্ত্রণায় ভুগিতেছে। একটী রোগীর মৃগী রোগ হইতে দেখিয়াছি—কিন্তু কালাজ্বর

সারিয়া গিয়াছে। চিকিৎসার পূর্ব্বে উহার উক্ত রোগ ছিল না।

৭। চক্ষু দিয়া জল ঝরে। একটী রোগী বলিয়াছিল, ইন্‌জেক্‌সনের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পর দিন পর্য্যন্ত চোখ যেন ফাটিয়া বাহির হইতে থাকে। তৎপরে তাহা সারিয়া যায়।

৮। ইন্‌জেক্‌সনের পর দাঁত-কন্‌কনানি এবং সমস্ত মুখ লবণাক্ত হয়।

৯। কোন কোন রোগী ঔষধের একটী তীব্র গন্ধ অনুভব করেন। ইহার কারণ আমরা আজও খুঁজিয়া পাই নাই।

১০। ইন্‌জেক্‌সনের অনতি কাল মধ্যে গায়ে আমবাতের ন্যায় (urticaria) চাকা চাকা চুলকানি বাহির হয় এবং অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে।

১১। প্লীহাতে এবং যকৃতে বেদনার বৃদ্ধি।

১২। মূত্রকৃচ্ছ।

১৩। শ্বাসনালীর আক্ষেপ (spasm)।

১৪। আমাশয় এবং কোন রোগীর উদরাময়, জলবৎ ভেদ।

১৫। গ্রন্থীতে বেদনা। কোন কোন রোগী সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করে এবং এই বেদনা বহুক্ষণস্থায়ী হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ডাঃ চোপরা এবং ডাঃ নেপিয়ার কোডিন (Codein:) ব্যবহার করিতে বলেন।

১৬। নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কাইটিস্ হইতে পারে।

১৭। অনেক সময় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে।

১৮। কলিকাতা প্রত্যাগত দুইটী রোগীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ইন্‌জেক্‌সনের অব্যবহিত পরে তাহাদের পেটের মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করিত। এবং পর মুহূর্ত্তে বাধ্য হইয়া মলত্যাগ করিতে হইত।

১৯। কোন কোন রোগীর পক্ষাঘাত হইতে দেখা গিয়াছে। এরোমেটিক এণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধসকলও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আইনো ষ্টিবুরিয়া ইন্‌জেক্‌সন করিয়া কোন চিকিৎসক মহোদয়কে বাধ্য হইয়া রোগীর ট্রেকিওটমি (Trachcotomi) করিয়া রোগীর জীবন রক্ষা করিতে হয়। রোগীর ট্রেকিও বা প্রধান শ্বাসনালীর ক্রিকয়েড্ (Crecoid cartilage) নামক উপাস্থির নিম্ন হইতে ঠিক মধ্য রেখায় এক ইঞ্চি হইতে দেড় ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘস্থান অস্ত্রোপচার করিয়া পারকারের (Parkers) অথবা ডারহামের (Durham's) আবিষ্কৃত একটী ট্রেকিওটমি টিউব নামক একটী ধাতব নল উক্ত ছিদ্রে বসাইয়া দেওয়া হয়। সেই নলের ভিতর দিয়া রোগী শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। উক্ত বিধ অস্ত্রোপচারের নাম টেকিওটমি।

ইউরিয়াম ষ্টিবামিন। দ্বিতীয় দিন ইন্‌জেক্‌সন করিবার পর মুহূর্ত্তে আমার একটী রোগীর সমস্ত মাংসপেশীর ভয়ানকভাবে আক্ষেপ আরম্ভ হয়। রোগীর সমস্ত গাত্রে আমবাতের ন্যায় চাকা চাকা দাগ দেখা যায়। এবং উহা অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে। রোগীর শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম এবং হৃদ্‌পিণ্ডের ধড়ফড়ানি (Palpitation) আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মলত্যাগ হয়। রোগীর ওষ্ঠদ্বয় এবং নেত্রপল্লব ফুলিয়া উঠে। কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর রোগী সুস্থ হয়। আমার দ্বিতীয় রোগীর কথা। ইন্‌জেক্‌সনের পর রোগীর শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয়। প্লীহাতে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে যে, রোগী কোনমতে শুইতে কি বসিতে পারে না। প্রায় এক ঘণ্টা পরে রোগী সুস্থ হয়। তৃতীয় রোগী বার চৌদ্দটী দুই পারসেণ্ট সোডিয়ম টার্ট ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার পর রোগীর বিশেষ উপকার দেখা যায়। কিন্তু রোগীর অভিভাবকগণের অনুরোধ ক্রমে এবং পীড়াপীড়িতে ষ্টিবুরিয়া ইন্‌জেক্‌সন আরম্ভ করিতে হয়। দুই তিনটী ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার পরই রোগীর পুনরায় জ্বর হইতে আরম্ভ করে এবং সমস্ত শরীরে শোথ দেখা যায়। অতঃপর পুনরায় সোডি টার্ট ব্যবহার করায় রোগী উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এণ্টিমনি চিকিৎসায় এরূপ বিষ ক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও কালাজ্বর প্রভৃতি রোগে ইহা ছাড়া আমাদের গতি নাই, এবং সকল রোগীতেই যে এরূপ বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইবে, তাহারও কোন কথা

নাই। এণ্টিমনি চিকিৎসায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

১। দুই পারসেণ্ট সলিউসন ব্যবহারই অধুনা চলিত। সলিউসন্ টাট্‌কা হওয়া প্রয়োজন। ডাঃ ব্রহ্মচারী প্রমুখ চিকিৎসকগণ নর্ম্মাল স্যালাইনের (Normal Saline) সহিত সলিউসন প্রস্তুত করিতে উপদেশ দেন। ডাঃ নেপিয়র প্রভৃতি চিকিৎসকগণ স্যালাইনের প্রয়োজন বোধ করেন না। (২) বাজার চল্‌তি সলিউসন অনেক সময় বিষাক্ত হইয়া যায়। উহার মধ্যে একরূপ শ্বেতবর্ণের জমাট পদার্থ ভাসিতে দেখা যায়। উক্ত ঔষধ কখনও ব্যবহার করিবেন না। (৩) বিশ্বস্ত ফার্ম্মারে যথা মার্ক (Merck) এবং স্কেল (Scale) এণ্টিমনি বিশুদ্ধ। ইহাই ব্যবহার করা উচিত। অধিক দিনের পুরাতন অযত্ন রক্ষিত ছিপি খোলা শিশির ঔষধ ব্যবহার করিবেন না! এখন স্বতই পাঠকবর্গের মনে একটা কৌতূহল জন্মিতে পারে যে কতটা ইন্‌জেক্‌সন দিলে একটী রোগী নিরাময় হইতে পারে। অনেক সময় অনেক রোগীর অভিভাবক আমাদের এই একই প্রশ্ন করিয়াছেন। তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি, এ সম্বন্ধে কোনও বাঁধা-বাঁধি নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ বিগত ৮ বৎসর কালাজ্বর রোগীর চিকিৎসা করিয়া যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতেই মনে হয়, কোনও রোগীর পক্ষে এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না যে, "এতটা ইন্‌জেক্‌সনের পর এ রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।" ডাঃ নোলস্ (Dr. Knowles) বহুদিন পূর্ব্বে একবার অভিমত দিয়াছিলেন যে, এক পারসেণ্ট সলিউসন মোট দুই শিশি একটী রোগীকে কালাজ্বর জীবাণু শূন্য করিতে এবং রোগী নিরাময় করিতে সক্ষম! কিন্তু পরিশেষে কালাজ্বর বিশেষজ্ঞরা দেখিয়াছেন এ কথার উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায় না। এরূপ করিতে গিয়া অনেক রোগীর পুনরাক্রমণ (Relapse) দেখা গিয়াছে। ডাঃ নেপিয়ার বলেন একটী এক শত পাউণ্ড ওজনের রোগীকে মোট ৩ ড্রাম্ সোডিয়ম টার্ট ইন্‌জেক্‌সনে আরোগ্য করিতে পারা যায়। ঐ সঙ্গে রোগীর অন্যবিধ নিরাময় লক্ষণগুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়—যেখানে রোগীর বিজ্বর অবস্থা প্লীহা যকৃতাদির স্বাভাবিকত্ব প্রাপ্ত এবং রোগীর শ্বেত রক্ত-কণিকার সমষ্টি যদি প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে গণনায় ৬,০০০ উপর পাওয়া যায়।

আমরা নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখিয়া চিকিৎসা বন্ধ করি।

১। চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পর দুই তিন সপ্তাহ পরে রোগীর জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পরও অন্ততঃ দুই তিন মাস চিকিৎসা করিয়া থাকি।

২। বর্দ্ধিত প্লীহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাভাবিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান না করে।

৩। যতদিন পর্য্যন্ত রোগীর দৈহিক ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার লাবণ্য ও নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার না হয়।

৪। এবং সম্ভব হইলে রক্ত পরীক্ষা করাইয়া রোগীকে কালাজ্বর জীবাণু শূন্য না দেখি।

এইবার আমরা ইউরিয়া ষ্টিবামিন্ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইউরিয়া ষ্টিবামিন্ অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ইন্‌জেক্‌সনে রোগী আরোগ্য হয় বলিয়া সকল কালাজ্বর চিকিৎসকগণের অভিমত। আমরাও পূর্ব্বে সে কথার অবতারণা করিয়াছি। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, সোডিয়ম টার্ট এবং টার্টার এমিটিক্ ব্যবহারে রোগীর জ্বর বন্ধ হইতেছে না। কিন্তু ইউরিয়াম ষ্টিবামিন পাঁচ ছয়টী ইন্‌জেক্‌সনের পর উক্ত প্রকার রোগীর জ্বর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিদেশ প্রত্যাগত একটী রোগী কোনও বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট একুশটী সোডিয়ম টার্ট ইন্‌জেক্‌সন্ লইবার পর জ্বর ছাড়িল না দেখিয়া এবং অন্যবিধ উপসর্গের উপশম হইল না দেখিয়া তাহার আত্মীয় কর্ত্তৃক চিকিৎসার্থ আমাদের নিকট আনীত হয়। আমরা চারি পাঁচটী ইউরিয়া ষ্টিবামিন ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার পর উক্ত রোগীর জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর ১৪টী ইন্‌জেক্‌সন্ লইবার পর রোগী নিরাময় হইয়া চলিয়া যায়। দ্বিতীয় রোগী

সোডিয়ম এণ্টিমনি টার্ট ২৪টী ইন্‌জেকসন লইবার পর চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রাখিয়া রোগী চলিয়া যায়। একমাস ভাল থাকিবার পর রোগীর পুনরাক্রমণ হয়; এবার কিন্তু রোগীর দিনে ও রাত্রে ৫।৬ বার করিয়া জ্বর আসিতে লাগিল (কোনও দিন ৫ বার কোনও দিন ৬ বার)। এবার ·০৫ গ্রাম্ ইউরিয়া ষ্টিবামিন ইন্‌জেকসন দেওয়ার পর দিনই রোগীর জ্বর ছাড়িয়া যায়; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ক্রমান্বয়ে ১০।১২টী ইন্‌জেক্‌সন্ হইবার পর উন্নতির লক্ষণ দেখা দেওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্বের ন্যায় চিকিৎসা সমাপন হইবার পূর্ব্বে রোগী চলিয়া যায়। প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইবার ভয়ে অন্যান্য রোগীর আলোচনায় বিরত থাকিলাম।

ডাঃ সর্ট (Dr. Short) ডাঃ নেপিয়ার ডাঃ ডডস প্রাইম্ (Dr. Dodds Prime) ডাঃ ফ্রস্‌টার (Dr. Froster) ডাঃ কাপুর (Dr. Kapur) ডাঃ সেন প্রভৃতি কালাজ্বর বিশেষজ্ঞগণ সকলেই ইহার একবাক্যে প্রশংসা করেন। আমরা দেখিয়াছি, সোডিয়ম টার্ট ইন্‌জেক্‌সন্ কোনও রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করে, কিন্তু উহার পর উক্ত রোগীকে ইউরিয়া ষ্টিবামিন ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়ায় সে উক্ত উপসর্গ পুনরায় অনুভব করিতে পারে নাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, সোডিয়ম টার্ট, টার্টার এমিটিক্ প্রভৃতি ব্যাপারে রোগীর অসহনতা (Intolereric) দেখা দিয়াছে, কিন্তু সেই সব রোগী ইউরিয়া ষ্টিবামিন্ বেশ সহ্য করিয়াছে। ডাঃ নেপিয়ার প্রভৃতি কালাজ্বর বিশেষজ্ঞরা ইউরিয়া ষ্টিবামিনের ন্যায় ভন হিডেন ও সুখ্যাতি করেন।

এই প্রবন্ধ প্রণয়নে আমি ডাঃ চোপরা লিখিত থিরাপিউসিস্ অব্ এণ্টিমনি (Therapusis of Antimony) নামক প্রবন্ধ ডাঃ ব্রহ্মচারী লিখিত কালাজ্বর এবং ইহার চিকিৎসা প্রণালী (Kala-azar and its treatment) নামক পুস্তক এবং ইণ্ডিয়ান্ মেডিক্যাল গেজেটের (Indian Medical Gazette) কতিপয় প্রবন্ধের সাহায্য লইয়াছি।

শোকে সান্ত্বনা।

[শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল]

বকরূপী ধর্ম্ম যখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এ জগতে সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য কি?" তখন তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।"

অর্থাৎ জীবগণ অহরহঃই যম-মন্দিরে গমন করিতেছে; কিন্তু ইহা দেখিয়াও তবু যাহারা বাঁচিয়া থাকিতেছে তাহারা যে মনে করিতেছে 'আমরা বুঝি চিরকালই বাঁচিয়া থাকিব,' ইহার চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি?

মরণ বিশ্বের নিয়ম। এ জগতের কোন জিনিষই চিরদিনের জন্য নহে। জীবন হইলেই মৃত্যু আছে। আবহমানকালব্যাপী বিশ্বসৃষ্টির এ মহানিয়মের তিলমাত্র বাহিরে যাইবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কিন্তু তবু আমরা মৃত ব্যক্তির জন্য শোকে অধীর হই। কোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মৃত্যু হইলে শোকে দুঃখে একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ি; এবং সেই ব্যাকুলতার মাত্রা সময়ে সময়ে এত বৃদ্ধি পায় যে, তাহাতে কাহারও কাহারও জীবনই একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। শোকের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অজ্ঞতা প্রযুক্ত অনেকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়, উন্মাদ হয় এবং সময়

সময় আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া বসে। দুঃসহ শোকে, না হইতে পারে এমন রোগই নাই। স্ত্রীলোক বা সাধারণ লোকের পক্ষে ত ইহা স্বাভাবিকই; কিন্তু অনেক অনেক প্রবীণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত অধীর ও মুমূর্ষু হইয়া পড়েন। পুত্রের নির্ব্বাসনশোক অসহ্য হওয়াতে রাজা দশরথ মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। অথচ আমরা যদি তখন গুটিকতক কথা একটু স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখি, একটিবারমাত্র ভালরূপে বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের শোক দুঃখের মাত্রা অনেকটা লাঘব হইতে পারে। কিন্তু ইহা বড়ই কঠিন কথা। উপদেশ দান ও উপদেশ পালন এ দুয়ের মধ্যে বহু-ব্যবধান। শোকাতুর ব্যক্তি মহাজ্ঞানী হইলেও তখন তিনি সকলই ভুলিয়া যান। কোন জ্ঞান কোন পাণ্ডিত্য তখন বারেকের জন্যও তাঁহার মনে উদিত হয় না। বাস্তবিক শোকের কোন সান্ত্বনা নাই। সেই পরম শান্তিময় সর্ব্বনিয়ন্তা ভিন্ন শোকের ব্যথা কেউ জুড়াইয়া দিতে পারে না। শোকের সময় নিজ বিবেক-বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া ত কঠিন ব্যাপার হয়ই; পরন্তু অন্য লোকে যদি তাঁহাকে সেই সব জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাও মনের মধ্যে স্থান পাইতে চায় না! কিন্তু তথাপি সকলকেই সেই চেষ্টা করিতে হয়। আমরাও সেইভাবে বিষয়টীর আলোচনা করিব যাহাতে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা একটু ভাবিয়া দেখিলে, যত বড় শোকই হউক, আমাদিগকে বিচলিত ও মুহ্যমান করিতে না পারে।

১। বাস্তবিক পক্ষে মৃত্যু কি? মৃত্যু জীবনেরই অপর একটা দিক ব্যতীত কিছুই নহে। যেমন আঁধার ব্যতীত আলোর অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে না, দুঃখ না থাকিলে সুখ কাহাকে বলে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, সেইরূপ মৃত্যু না থাকিলে জীবন বা বাঁচিয়া থাকার অনুভূতিও কিছুমাত্র হইতে পারে না। এইজন্যই জীবন হইলেই মৃত্যু আছে এবং মৃত্যুর পরও আবার জীবন অবশ্যম্ভাবী মনে করা যাইতে পারে। সুখ দুঃখ, আলো আঁধার ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্ম্মী দুইটী দুইটা জিনিষ যদি সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান বিশ্বপ্রকৃতির মঙ্গল সাধনার্থই বিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জীবন ও মৃত্যু এই দুটি জিনিষও তিনি সেই হিসাবেই পাশাপাশি অবস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং এই কথাটী একটু স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও শোকে অধীর হন না, মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন।

২। তার পর মানুষের দেহই মরে; কিন্তু প্রকৃত মানুষ বা আত্মা ত কখনও মরে না। এই জড়দেহ সেই আত্মার ছায়ামাত্র—একটা আশ্রয়স্থান। জড়দেহ ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর ও সারহীন; আর আত্মা শাশ্বত, অক্ষয় ও অমূল্য! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্ত, অক্ষয়, পরমাত্মারূপী ভগবানেরই এক অংশ এই আত্মা জড়দেহ আশ্রয় করিয়া এই পৃথিবীতে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন রূপে বিকশিত হইয়া থাকে ও বিভিন্ন কাজ করিয়া থাকে। এক মূর্ত্তিও এক স্থানের কাজ যখন ফুরায় তখন অন্য মূর্ত্তি ও অন্য স্থান পরিগ্রহ করে। আমরা যেমন একখানি পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য একখানি নূতন বস্ত্র পরিধান করি, আত্মাও তেমনি জীর্ণ ও অনুপযুক্ত দেহ ত্যাগ করিয়া যথাসময়ে উপযুক্ত সুস্থ দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং আমার আমিত্বরূপী এই আত্মার প্রকৃতপক্ষে কোন মৃত্যু নাই; ইহা চির অবিকৃতভাবে আবার জন্মিবে, আবার কাজ করিবে; সুতরাং ইহার জন্য দুঃখ কি?

৩। আজ আমি যাহার জন্য শোক করিতেছি; দুদিন বাদে আমাকেই সেই পথের পথিক হইতে হইবে। মৃত্যুর হাত আমরা কেহই এড়াইতে পারিব না। দুদিন আগে কিংবা দুদিন পরে—এই টুকুমাত্র তফাৎ। এমন কি হয় ত এই মুহূর্ত্তেই আমার সেই শেষ সময় উপস্থিত হইতে পারে। মৃত্যুর হাত জগতে কেহই কখন এড়াইতে পারেন নাই। যীশু, বুদ্ধ, চৈতন্য ইত্যাদি মহাপুরুষেরাও পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অজর অমর কেহই নহেন। প্রকৃতির চির অবশ্যম্ভাবী নিয়মাধীনে এই জীবন মরণের খেল

পরিচালিত হইতেছে। জরা মৃত্যুশূন্য কোন একটি জীবনের কথা কল্পনা করিতে গেলে এইরূপ জীবন অবশেষে বিশেষ বিড়ম্বনার বিষয় অথবা জীবনের ভোগ-স্বাদহীন একরূপ বিশ্রী ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতে পারে কি না তাহাও দার্শনিকভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার জিনিষ। এই সকল চিন্তা করিয়া দেখিলে মৃত্যুশোক আমাদিগকে কেন অভিভূত করিবে? বরং আমরা হাসিমুখেই সেজন্য প্রস্তুত থাকিব।

৪। এ জগতে সকল অবস্থাতে আমরা সকলেই সেই অনন্তশক্তি জগন্মাতার কোলে আছি। বিশ্ব-সৃষ্টির প্রত্যেক অণুপরমাণুর তাঁহা হইতেই উদ্ভব, তাঁহার মধ্যেই বিকাশ এবং তাঁহাতেই ধ্বংস বা লয়প্রাপ্তি। এ জগতে একটী অণুপরমাণুরও ধ্বংস নাই। মৃত্যু বা ধ্বংস যাহাকে বলে তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেক অবস্থাতে সেই দয়াময়ী মায়ের কোলেতেই রহিয়াছি। জনমের পূর্ব্বে ছিলাম, এখনও আছি, মরণের পরেও থাকিব। সুতরাং যাহার জন্য শোক করি সেও যেখানেই থাক্ সর্ব্বাবস্থাতেই জগন্মাতার কোলেই রহিয়াছে। তাহার জন্য দুঃখ কি? আমাদের দৃষ্টি, জ্ঞান, শক্তি সকলই সীমাবদ্ধ; অসীম অনন্তের সত্তা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি না। তাই এই পৃথিবীর চোখে সামান্য দৃষ্টিতে যাহার মৃত্যুর জন্য শোক করি, তাহাকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না এইটুকু যা পার্থক্য। নতুবা আমরা সর্ব্বাবস্থাতে একই মায়ের কোলে আছি।

৫। এ জগতে সবই পরিবর্ত্তনশীল। বিবর্ত্তনবাদ অনুযায়ী এই বিশ্বজগৎ নিত্যপরিবর্ত্তনশীল। কোন একটা জিনিষ এক নিমেষের জন্যও অবিকৃতভাবে থাকে না। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। মৃত্যু যেরূপ এই দেহের ধ্বংস বা রূপান্তর প্রাপ্তি, সেইরূপ রূপান্তরপ্রাপ্তি প্রতিনিয়ত আমাদের দেহে হইতেছে; সুতরাং সেই হিসাবে সর্ব্বদাই আমাদের মৃত্যু হইতেছে। মাতৃক্রোড়ে যে "আমি" ছিলাম সে "আমি" এখন নাই; কৈশোরে যে "আমি" ছিলাম যৌবনে তাহা নাই; আবার যৌবনে যাহা ছিলাম প্রৌঢ়ে বার্দ্ধক্যে তাহার কিছুই নাই। এমন কি কল্যকার "আমি" আজ নাই; এই মুহূর্ত্তের "আমি"ও পর মুহূর্ত্তে থাকিব না। সুতরাং মৃত্যু আমরা কাহাকে বলি? শোকই বা কিসের নিমিত্ত?

৬। আমাদের মানসিক ধর্ম্ম ও সময়ের রহস্য এই যে আজ হউক কাল হউক অতি বড় শোকও আমরা কেমন করিয়া ভুলিয়া যাই। যে সর্ব্বশক্তিমান্ শোকের কঠোর আঘাত দেন, তিনিই আবার সময়ে শান্তির প্রলেপ দিয়া সকল ব্যথা মুছাইয়া দিয়া থাকেন। শোকের যেন আর চিহ্ন মাত্রও থাকে না। পুত্র শোকাতুরা মাতা, যিনি অসহনীয় শোকাবেগে প্রথম দিন আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন, তিনিও আবার দুদিন বাদেই হাসিমুখে পাড়া প্রতিবেশীদের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন এবং সকল কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন। স্বামীহারা নিরাশ্রয়া স্ত্রীও সময়ে পতি-বিয়োগ দুঃখ সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া যান; যত বড় গুরুতর শোকই হউক সময়ে কিছুই তাহার থাকে না। সুতরাং দুদিন বাদে যাহা আপনা হইতেই ভুলিতে হইবে, এখন তাহার জন্য এত অধীর হই কেন?

৭। এ সংসারে যাহার জন্য আমরা শোক করি, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া একটু গভীরভাবে বুঝিতে গেলে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহার সহিত আমাদের সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগ বিলাসের স্বার্থ জড়িত আছে; এবং এই স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটিতেছে বলিয়াই তাহার শোকে আমরা অধীর হই। পিতা শিশু-পুত্র শোকে অধীর হন। পুত্র সময়ে উপযুক্ত হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইবে, তাঁহার বৃদ্ধকালের সেই শেষ আশা ভরসা ভাঙ্গিয়া গেল। স্ত্রী স্বামী-শোকে অধীরা হন; তাঁহার সারাজীবনের যথা-সর্ব্বস্বের অবসান হইল,—আর পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিলেও জীবন্মৃতই থাকিতে হইবে। পুত্র পিতামাতার শোকে অস্থির হয়; তাহার স্নেহপূর্ণ আশ্রয়স্থল জনমের মত হারাইতে হইল, যাহা এ জীবনে আর কোথাও

মিলিবে না। এই আমাদের ভালবাসা, ইহাই আমাদের শোকের কারণ! সুতরাং যে শোক আমাদের হীন স্বার্থসম্ভুত, যে শোকের সহিত আমাদের পার্থিব ভোগ বিলাসেরই একটা প্রধান সম্বন্ধ সে শোকের মূল্য কি? তাহার সঙ্গে প্রকৃত ভালবাসারই বা কি সম্বন্ধ আছে?

৮। আমরা আর একটী জিনিষ জ্ঞান দ্বারা সবিশেষ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব; বিশেষ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিব যে এই পৃথিবীতে আমি একা,—সেই প্রকৃতিরূপিণী জগন্মাতার অংশ, মায়ের সন্তান আমি একা আসিয়াছি একা যাইব,—নিজের কর্ম্ম নিজে করিব এবং নিজে তাহার ফলভোগ করিব,—ইহার সঙ্গে পৃথিবীর আর কিছুরই কোন সম্বন্ধ নাই। এ সংসারে প্রত্যেক জিনিষই, প্রতি ফলাফলই পূর্ব্বসিদ্ধ (Predestined)। পিতামাতা পুত্র পরিবার ভাইবন্ধু ইত্যাদি যাহা পাইতেছি, যে জিনিষটী ভাল যে জিনিষটী মন্দ পাইতেছি, রাজৈশ্বর্য্য বা দীন ভিখারীর অবস্থা, এ সকলই আমার স্বোপার্জ্জিত বা নিজ কর্ম্মফল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন কাজ করিয়াছি অর্থাৎ ভবিতব্য কর্ত্তৃক যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, ঠিক তেমনি পাইয়াছি, তেমনি পাইব। যাহা পাইবার তাহা পাইবই, যাহা আমার কর্ম্মফল নহে, বা যাহা আমার প্রাক্তনে নাই, তাহা কিছুতেই পাইব না। সুতরাং এইভাবে আমি এবং আমার কর্ম্মই সার ও একমাত্র জিনিষ! প্রাণপণে সেই কর্ম্মযোগই সাধন করিব। এই কর্ম্মযোগ সাধনে ও কর্ম্মফল দর্শনে ক্রমে মনে স্বতঃই এই জ্ঞান উপস্থিত হইবে যে, এ সংসারে আমার ভাল মন্দের জন্য অপর কেহই দায়ী নহেন, আমিই মাত্র দায়ী। সুতরাং শোক দুঃখ অভাবজনিত অনেক আক্ষেপই তখন হ্রাস হইয়া যাইবে। বৃথা আসক্তি বা মায়ার মোহ তখন কাহারও জন্য থাকিবে না।

৯। আমাদের প্রিয় ও ভাল জিনিষটী হারাইলে আমরা দুঃখে অধীর হই যে, এমন জিনিষটী হারাইল। কিন্তু বাস্তবিক যদি, ভালই হবে, আমাকে শান্তিই দিবে তবে যাইবে কেন? সুতরাং কেন তার জন্য দুঃখ করি? যে গিয়াছে সে তাহার কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিল—এ পৃথিবীর কর্ম্ম ফুরাইয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ কর্ম্ম হয় ত সে কত জন্ম করিয়াছে ও কত জন্ম করিবে। মাঝখানে আমার কর্ম্মের সহিত কারণ-পরম্পরায় বা জন্মান্তরসূত্র হিসাবে কোনরূপ সংযোগ ছিল; তাই দুদিনের জন্য তাহার সহিত আমার এই সম্বন্ধ হইয়াছিল। এ জন্মের কর্ম্মমুক্ত হইয়া সে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গিয়াছে; আমিও আবার এইরূপ দুদিন আগে বা দুদিন পরে নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া নিয়তি-নির্দ্ধারিত স্থানে চলিয়া যাইব।

১০। অনেক সময়ে আমরা এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করি—আমার অমুক আত্মীয়টী অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইল; অমুক বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটী মনের দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞানতা ভিন্ন কিছুই নহে। জগতের প্রত্যেক প্রাণীই ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে মরে। কোন জীবই বিধি-নির্দ্দিষ্ট কালের মুহূর্ত্ত মাত্র পূর্ব্বে বা পরে যায় না। এমন কি গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়েই গাছ হইতে পড়িয়া থাকে। মানুষ যতই কেন না চেষ্টা করুক—জড়-বিজ্ঞানের যতই কেন না উন্নতি সাধিত হউক, জনম মরণের নিয়তি যাহা বিধাতা কর্ত্তৃক কঠোর ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কাহারও খণ্ডন করিবার সাধ্য নাই। এক দিন সেই নির্দ্দিষ্ট সময় সকলেরই আসিবেই আসিবে। ভগবান ও ভবিতব্যের উপর এই স্থির বিশ্বাস ও দৃঢ়জ্ঞান থাকিলে আর কোন দুঃখই আমাদের থাকিবে না।

১১। অত্যন্ত ভালবাসার ব্যক্তির শোকে মনে বড়ই আঘাত লাগে—মনে হয় কেমন ক'রে কি সাধনা দ্বারা তাকে আবার পাওয়া যায়। এ বিশ্বজগতের রহস্য এবং সেই অনন্তশক্তির খেলা বুঝা মানুষের সাধ্যাতীত! তাই জ্ঞানবিশ্বাসে এবং শাস্ত্রপ্রমাণে এই মনে হয় যে, যাহার জন্য আজীবন প্রাণের ব্যাকুলতা থাকে,—প্রাণের যে অতিপ্রিয় ও আকর্ষণের জিনিষ হয়, তাহাকে আবার পাওয়া যায়। এই জীবন, এই আত্মা এবং এই পৃথিবীই শেষ নহে; কোথায় কি ভাবে

আমাদের জীবনের ঘটনাবলীর যোগাযোগ আছে, কোন্ জন্মে কত দিনেই বা এ জীবনের পূর্ণতার সময় উপস্থিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং মৃত্যুর পর হয় ত এমন কোন জগৎ থাকিতে পারে, যেখানে আমরা আমাদের প্রিয় ব্যক্তির সহিত পূর্ণানন্দে মিলিত হইতে পারিব। তবে এই পৃথিবীতে যতদিন থাকিব, ততদিন সেইভাবে, সেই সাধনায় মনপ্রাণের ব্যাকুলতা লইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং ইহাই যদি সত্য বিশ্বাস হয়, তবে আর অতি প্রিয়তম ব্যক্তির শোকে আমরা কেন কাতর হইব? যে আমার অতিপ্রিয় সে যেখানে যে জগতেই থাকুক, আমারই অপেক্ষায় থাকিবে এবং আমিও সেইরূপ ব্যাকুলতার সহিত তাহার ভালবাসা প্রাণে স্থির ভাবে বজায় রাখিলে একদিন নিশ্চই তাহার সহিত মিলিত হইব।

১২। অবশেষে একটি কথা আমরা সর্ব্বতোভাবে স্মরণ রাখিব যে শোকের একমাত্র সান্ত্বনা যদি কিছু থাকে, তবে তাহা ভগবানে সম্পূর্ণভাবে আত্ম সমর্পণ! শোকের সময় যে অশ্রুবিন্দু সকল, যে হাহাকার ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতিত হইবে, তাহা যেন সেই জগৎ-মাতার শ্রীচরণোদ্দেশেই পতিত হয়। যেন মনে হয়, প্রভো! তুমিই দিয়াছিলে তুমিই নিয়েছ; যাহাকে দিয়াছিলে সেও তোমারই এবং আমিও ত তোমারই—আমাকেও ত তুমিই পাঠাইয়াছ; সুতরাং সকলের কর্ত্তব্য, সকলের মূলই ত তুমি! শোক যদি করিতে হয় ত এই ভাবেই করিব। দুঃখে অভিমানে যে অশ্রু পতিত হইবে, তাহা তাঁহারই উদ্দেশে পতিত হইবে; তাঁহাকেই আরও শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিব। মনে মনে বলিব 'ইচ্ছাময় তোমারই খেলা সব—দেখি তোমার মনে আরও কি আছে—দেখি তুমি কতদিন কাঁদাইতে পার। আমি ত তোমারই অংশ দেখি আমর ব্যথা তোমার প্রাণে বাজে কি না। এই ভাবে শোক করিতে পারিলে শোকের ভিতর দুঃখের মাত্রা বিশেষ কিছু উপলব্ধি হইবে না, এক অব্যক্ত অনুপম শক্তি প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতে পারিব; ভগবানের মহিমা ও ভগবদ্ভক্তিতে সমগ্র হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে; এবং এইরূপে ক্রমে আমরা ভগবানের দিকে অগ্রসর হইব।

শিশুর পরিচর্য্যা—রোগে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় আমরা শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার কথার আলোচনা করিয়াছি। শিশুদের মধ্যে শ্বাসযন্ত্রের পীড়া অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক; এবং শিশুরা নিজে সাবধান হইতে পারে না বলিয়া একবার অসুস্থ হইলে সচরাচর বহুদিন পর্য্যন্ত তাহারা কষ্ট পায়; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটা অসম্ভব নহে।

সামান্য সর্দ্দি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বাসযন্ত্রের নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। আমরা একে একে তাহার আলোচনা করিব।

শ্বাসযন্ত্রে ঠাণ্ডা লাগা হেতু তাহার স্ফীতি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঠাণ্ডা লাগিবার প্রধান হেতু অসাবধানতা বা গরম হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডায় লইয়া যাওয়া। কোন বিশেষ রোগের আক্রমণের সূচনা স্বরূপ শ্বাসযন্ত্রের পীড়া হইতে দেখা যায়। শিশুদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে দৃষ্ট না হইলেও, যক্ষ্মারোগের লক্ষণরূপে স্বরভঙ্গ উপস্থিত

হইয়া থাকে। কোনরূপে স্বরভঙ্গ দূর করিতে না পারিলে, তাহার মূলে কোনরূপ গোলযোগ আছে, এরূপ মনে করা খুব অস্বাভাবিক নহে। স্বরনালী স্ফীত হইয়া স্বরভঙ্গের সহিত গাত্রতাপ আনয়ন করিতে পারে, কাসি হয়, এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের পথরোধ করিয়া শ্বাস কষ্ট উপস্থিত করিতে পারে।

সাধারণতঃ স্বর-যন্ত্রের পীড়াতে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু অন্য রোগের পূর্ব্ব-লক্ষণ স্বরূপ হইলে বিপদ ঘটিতে পারে। অনেক সময় সামান্য স্বরভঙ্গ হইয়া কয়েক দিন থাকে; তার পর তাহা অন্তর্হিত হয়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে বিপদ অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে। নিশ্বাসের কষ্টের সহিত শিশু চঞ্চল হয়, তাহার মুখ আরক্তিম হয় এবং দেখা যায়, রোগ গুরুতর আকার ধারণ করিলে, ভীষণ কাসির সহিত বমন হইয়া থাকে। ওষ্ঠ নীলবর্ণ হয় ও চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ রাত্রিকালেই রোগের গুরুতর লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কোন কারণে অত্যধিক চীৎকার করা হেতু স্বরভঙ্গ হওয়া বিচিত্র নহে। কেবল উহাই একমাত্র কারণ হইলে, শিশু যাহাতে আর চীৎকার না করে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। চীৎকারের কারণ দূর হইলে শিশুর স্বাভাবিক স্বর ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে। উহাতে কোন রূপ চিন্তার কারণ নাই।

অন্য বিশেষ কারণে স্বরযন্ত্রের রোগ হইলে প্রথমেই ঠাণ্ডা প্রভৃতি যাহাতে আর না লাগিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে। ঠাণ্ডা লাগার পুনরায় সম্ভাবনা থাকিলে রোগ দূর হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প; উপরন্তু রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। রোগীর শয়ন-গৃহের দিকে মনোযোগী হওয়া রোগ দূর করিবার আর একটী বিশেষ উপায়। গৃহের তাপ ঈষদুষ্ণ হওয়া ভাল; কিন্তু যাহাতে দরজা জানালা বন্ধ থাকা হেতু গৃহের বায়ু অত্যধিক তাপযুক্ত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। তাপের পরিবর্ত্তন যত অল্প হয় ততই মঙ্গলজনক। ঘন ঘন পরিবর্ত্তন রোগীর পক্ষে হানিকর, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। বাহিরের বায়ুর সহিত সংযোগ রাখার ব্যতিক্রম ঘটিতে দিবে না। ফ্লানেল জড়াইয়া রাখিলে বেশ আরাম হয় ও রোগের উপশম ঘটে। শিশু যাহাতে নাক মুখ ঢাকা দিয়া না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে এবং শ্বাস কষ্ট হইলে বালিশ দিয়া মাথা উঁচু করিয়া শয়ন করাইবে। বিছানা প্রস্রাব দ্বারা ভিজিয়া থাকিতে দিবে না; সদাই শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। রোগ গুরুতর ভাব ধারণ করিলে শিশুকে বিছানা হইতে উঠাইয়া বেশী নাড়া চাড়া করিবে না। এই রোগে যথাসম্ভব কথা বন্ধ করিয়া রাখা ভাল। লঘু ও তরল পথ্য স্বরভঙ্গ রোগীর পক্ষে উপকারী। শীতল দ্রব্য আহার পরিত্যাজ্য।

ব্রঙ্কাইটীস (Bronchitis) শিশুদের মধ্যে প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। শ্বাস-নালিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উপস্থিত হইয়া এই রোগ উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে। Bronchi (ব্রোম নলিকা) দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী ফুস্‌ফুসে (Lungs) প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ও উহারই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের স্ফীতি অধিক মাত্রায় কষ্টদায়ক ও বিপজ্জনক।

সামান্য ঠাণ্ডা লাগার লক্ষণ হইতেই ব্রঙ্কাইটীসের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। শিশু চঞ্চল হয় ও শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার লক্ষণ স্বরূপ শিশু কেবলই স্তন্য পানের জন্য ব্যস্ত হয়। ক্ষুধা-মান্দ্য ঘটে। কাসি আরম্ভ হয় ও প্রথমে অল্প ও পরে অধিক পরিমাণে কফ উঠিতে থাকে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত সর্দ্দির শব্দ শ্রবণগোচর হয়। কফ প্রথমে সাদা, পাতলা ও বায়ুযুক্ত হয়, পরে অত্যন্ত গাঢ় হইয়া যায়। জ্বর ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। যতদিন সর্দ্দি প্রবল থাকে, ততদিন গাত্রের উত্তাপ না কমিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জ্বর বিচ্ছেদ রোগীর উন্নতি সূচিত করে। খাদ্য দ্রব্য বমন করিয়া ফেলাতে ও খাদ্যে অরুচি থাকাতে রোগী শীঘ্র বলহীন হইয়া পড়ে এবং কাসিতে কাসিতে বমি করিবার সময় ও নিদ্রাকালে তাহার নাসিকা কপাল ও মস্তিষ্কে ঘর্ম্ম-বিন্দু দেখা যায়। ইহা হইতে রোগের গুরুত্ব কতকটা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

স্বরযন্ত্রের পীড়ার ন্যায় শ্বাসযন্ত্রের পীড়াতেও সর্দ্দির উপদ্রব হইতে শিশুকে রক্ষা করা একটী প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত; এবং শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত অন্যান্য পীড়াতেও এই সাবধানতা অবলম্বনীয়। রোগী যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বিশুদ্ধ বায়ু সদাসর্ব্বদা পায় সেই ব্যবস্থা করিবে, কারণ সর্দ্দি দ্বারা নাসিকার ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটাতেই রোগের উৎপত্তি। কাযেই বায়ুর অভাবে রোগীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সদাসর্ব্বদা বায়ু সঞ্চালনের সুব্যবস্থা করিলেও যাহাতে গৃহের তাপ পরিবর্ত্তন না ঘটে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

দেহের তাপ রোগ উপশম বা বৃদ্ধির মানযন্ত্র স্বরূপ আমরা তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নিয়মিত সময় অন্তর তাপমানযন্ত্র দ্বারা তাপ লইয়া লিখিয়া রাখিবে, এবং তাহা হইতেই গৃহস্থ ও চিকিৎসক রোগের গতি নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন। নাড়ী ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বেগ গণনা করিয়া রাখিতে পারিলে সুবিধা হইয়া থাকে।

শিশু যে ভাবে শয়ন করিয়া স্বস্তি অনুভব করে, সেই ভাবেই রাখা কর্ত্তব্য। কোনরূপ বেশী মাত্রায় নাড়াচড়া করিতে দিবে না; বিশেষতঃ যে সকল শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের জন্য অধিক মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। কোন কোন শিশু, মাথা উঁচু করিয়া বসাইয়া রাখিলে রোগীর কষ্ট হইয়া থাকে; কারণ নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের সুবিধা হয়, ও সর্দ্দি একস্থলে জমা হইতে পায় না। রাত্রির মাঝে সর্দ্দি উঠিয়া যাওয়া শিশুর পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ দেহ মধ্যে একসঙ্গে কতক পরিমাণ কফ জমিয়া যাওয়াতে শিশুর যন্ত্রণা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে একাদিক্রমে অধিকক্ষণ ঘুমাইতে দেওয়া ভাল নহে।

শিশুর গাত্র সদাসর্ব্বদা উত্তমরূপে আবৃত থাকার নিতান্ত প্রয়োজন। বুকের চারিদিকে তুলা বা গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। কিন্তু পোষাক বা তুলার বাঁধন যেন আঁট না হয়; কারণ তাহাতে শিশুর শ্বাসকষ্টের উপর অতিরিক্ত যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতে পারে।

প্রথম প্রথম শিশুর দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গমনের সুবিধার জন্য ঈষদুষ্ণ জলে গা মুছাইয়া দেওয়া মন্দ নহে। কিন্তু জ্বর ও সর্দ্দি বৃদ্ধির সঙ্গে তাহা অনিষ্টকর বোধ হইতে পারে।

বমি করিয়া ফেলে বলিয়া শিশু দুর্ব্বল হয়, তাহা বলা হইয়াছে। শিশুর বলরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিবে। স্বরযন্ত্রের পীড়ার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও তরল খাদ্য ব্যতীত অন্য খাদ্য দিবে না। যাহাতে বলরক্ষা হয় সেইরূপ খাদ্য দিবে। দুগ্ধ, বার্লি, বেদানার রস, ঘোল প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে। দুর্ব্বলতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে সামান্য পরিমাণে উত্তেজক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ব্রঙ্কাইটিস রোগে মাঝে মাঝে কাসি হওয়া শিশুর পক্ষে সুলক্ষণ।

রোগীর ঘরের তাপ একই ভাবের থাকা উচিত তাহা বলা হইয়াছে। মাঝে মাঝে সেই ঘরের মধ্যে গরম জলের বাষ্প দেওয়া মঙ্গলজনক; কিন্তু ঘরের মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া এরূপ করিবে না। গৃহের বাহিরে কেটলিতে জল গরম করিয়া, সেই কেটলির নলে একটী রবারের নল দিয়া ঘরের মধ্যে বাষ্প দেওয়া উচিত।

ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ দূর হইলেই বিপদ দূর হইল এইরূপ মনে করিবে না। যে শিশুর একবার এই রোগ হয়, তাহার পক্ষে বারে বারে আক্রান্ত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। রোগের সময় যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, রোগমুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেও পূর্ব্বের ন্যায় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে অতি সত্বর শ্বাসনালীর স্ফীতি উপস্থিত হইয়া পুনরায় কষ্ট দেয়।

সকল প্রকার সর্দ্দি সংক্রান্ত রোগে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে রোগ প্রবলভাব ধারণ করিবার সুবিধা পাইয়া থাকে।

শিশুর বিছানার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। বিছানা হইতে যেন ঠাণ্ডা না লাগে। আজকাল মধ্যবিত্ত ঘরেও শিশুর বিছানায় অয়েল ক্লথ (oil cloth) পাতা রীতি হইয়াছে। সর্দ্দিকাশি রোগমুক্ত শিশুকে কেবল oil clothএর উপর শায়িতাবস্থায় রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। উপরে কাঁথা পাতায় যেন ভুল না হয়।

জরা-প্রতিষেধ।

[শ্রীচন্দ্রধর সাহা]

(১)

দীর্ঘ জীবন লাভের পক্ষে আমাদের চিন্তার প্রভাব অতীব প্রবল। চিন্তাধারা যে খাতে প্রবাহিত হইবে, তাহার স্পৃষ্ট ভূমির আবর্জ্জনা ও কলুষরাশি চিন্তা স্রোতে মিশিয়া যাইবেই যাইবে। আবার তদ্রূপ যদি পঙ্কিল খাতে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত না হইয়া পবিত্র ও সাত্বিক বিষয়ে চিন্তা পরিচালিত হইতে পারে, তবে চিন্তা-কারীর মনে কদাপি কলুষিত ও অপবিত্রভাব প্রবেশ করিতে পারিবে না। সুতরাং চিন্তা প্রবাহকে আমরা সদাই অনাবিল, নির্ম্মল প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত রাখিতে প্রাণগত যত্ন রাখিলে কিছুতেই আমাদের মনে নিরাশা, উদ্বেগ বা অবসাদ প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। তাহাতে আমাদের সেই প্রফুল্লতার মধ্যে যুগপৎ দেহ মনের স্বাস্থ্য একত্র পরিরক্ষিত ও অটুট থাকিবে। ডাক্তার হুকার বলেন "চিন্তা একটী অতি শ্রেষ্ঠ শক্তি। বর্ত্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাকে "জরা" র আবাহন, অথবা উহার প্রতিষেধের জন্য ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে পারি।"

বয়সের সীমা নির্দ্দেশ অসম্ভব। তবে যদি মানুষ প্রকৃতির অভিপ্রায় নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করতঃ তাহার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির পক্ষে হিতাহিত নির্দ্ধারণ করিয়া আহার, বিহার, নিদ্রা, ব্যায়াম প্রভৃতি শরীর চেষ্টা ও সৎ প্রসঙ্গ, ঈশ্বরালোচনায় জীবনের প্রতিকূল মুহূর্ত্ত সমূহকে নিযুক্ত রাখিয়া জীবন যাপন করিতে অভ্যাস করে, আর যাহা কিছু নিজ জীবনের পক্ষে শ্রেয়ঃ ও শুভ, কেবল তাহাই অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে, তবে আপনার আয়ুঃসীমার একটা অস্পষ্ট ধারণা মনোমধ্যে পোষণ করিতে সমর্থ হইতে পারে। তাই বলিয়া আমি আশী বা নব্বই বৎসর জীবিত থাকিব বা একশত বৎসর অজর অবস্থায় ধরাতলে সশরীরে জীবন ধারণ করিতে পারিব, এরূপ একটী ভবিষ্যদ্বাণী নিতান্তই হাস্যকর। বরং তাহার আবার একটা বিপরীত ফলই সম্ভব হয়। তাই ডাক্তার হুকার বলেন, "এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, কোনরূপ দৈবদুর্ঘটনা না ঘটিলে, 'আমি তিরেনব্বই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব।' উপসংহার কালে, প্রশ্ন আহ্বান করিলে জনৈক সুচতুর বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এইরূপে মৃত্যুর একটী নির্দ্দিষ্ট কাল নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়া কি আমি মৃত্যুকালে আত্মিক আত্মহত্যার জ অপরাধী হইতেছি না? এটী অতি সমীচীন প্রশ্ন, এ আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, এরূপ অ মানের মধ্যে খুবই অধিক শক্তি বর্ত্তমান। আমাদের মনকে এরূপ কোন "ইঙ্গিত" করিয়া তদ্রূ আমাদের বয়সের সীমা নির্দ্দেশ করা হইবে না বাস্তবিকই কতিপয় বংশাগত প্রভাব, কোন কো অতীত রোগাক্রমণ, আমার এতাবৎকালের অভ্য কঠোর জীবন প্রণালী ও জীবনের বহু পরিমিত ও দায়িত্বভার সম্বন্ধে ঐ সময়ে আমি অতীব মূর্খের ন্য চিন্তা করিতেছিলাম। কিন্তু বস্তুতঃ এ সমস্তই অন্ত বা ভ্রান্ত। আমি এখন বুঝিতেছি, যদি আমরা জী ধারণের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট বিধির অভ্যাস করি থাকি, তবে এই আপাতদৃষ্ট প্রতিকূল শক্তিসমূহে কোনটীই কার্য্যকরী হইতে পারিবে না।"

অধ্যয়ন, চিন্তা ও ধ্যান যোগে মনকে সর্ব্বদা জাগ্র ও কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিতে না পারিলে, অ মানব জমি পতিত রাখিয়া আবাদ না করিলে, তাহা শরীরের উৎসাহ উদ্যম হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও সেই জমিতে সোণা না ফলিয়া কণ্টক ও বিষবৃক্ষরাশি উৎপন্ন হইয়া আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক জীবনসমূহকে কণ্টক বিদ্ধ ও কলুষিত করিবে। "অধিকন্তু দেখিবে যেন তোমার মন সর্ব্বদাই সুদৃঢ় থাকে; যত কিছু ইহার দ্বারা করাইবার উপযুক্ত, তাহা করাইয়া লইবে এবং যাহা কখনও ধারণা কর নাই, তাহাই সম্ভব হইবে। যদি একবার মস্তিষ্ককে অকর্ষিত অর্থাৎ পতিত রাখ, অমনি শারীরিক উদ্যমেরও হ্রাস হইবে। অতএব অধ্যয়ন কর, ঠিক সম্যকরূপে মনকে নিয়ত জাগ্রত ও কর্ম্মনিরত রাখ। আমাদের কোন কোন বিচারক অথবা অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লক্ষ্য রাখ, কেমন করিয়া তাঁহারা কঠোর কর্ম্মের মধ্যেও তাঁহাদের যুবাজনোচিত কর্ম্মশীলতা রক্ষা করিতেছেন। অথচ তাঁহারা তাঁহাদের অধিকাংশ সময়ই আইন আদালত প্রভৃতির দূষিত বায়ুতে ক্ষেপন করিয়া থাকেন। যদি তোমার জীবন কালের আধিক্য সত্ত্বেও নিজকে তরুণ রাখিতে চাও, তবে কদাপি মনকে নির্বীর্য্য হইতে দিবে না। যদি দৈবাৎ তুমি অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া থাক, তবে তাহা পুনর্গ্রহণ কর।"

"আমি যখন আমার চিকিৎসা বিদ্যায় এম-ডি (M. D.) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন সেটীকে জীবনের অসময় বলা যাইতে পারে। প্রতিদিন আমাকে কঠিন পরিশ্রমে বহু ঘণ্টাকাল অধ্যয়ন করিতে হইত। আমার তদানীন্তন প্রাদেশিক বাসস্থান হইতে ছুটিয়া লণ্ডনে গিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট বিভাগের কাজ করিতে হইত। ভেষজ, শস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই তাহাদের সহস্র প্রকার খুটীনাটী সমেত নূতন করিয়া শিখিতে হইত, এবং সে সকলের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত ব্যবসায় চালাইতে হইত। তখনকার সেই কঠিন অধ্যয়নে আমার মাথা ঘুরিত, এবং প্রথমতঃ ইহাতে আমার জঘন্য শিরঃপীড়া আসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাতে আমার মনকে আবার অধিকতর মানসিক পরিশ্রমের ভিতরে আনিয়া ফেলিয়া পরিণামে আমার বহু হিতসাধন করিয়াছিল। অতএব, পাঠক দেখ, আমি নিজে যাহা করি নাই, তাহা তোমাকে করিতে বলিতেছি না। আমি ঠিক সেইখানে আছি।"

যদি বার্দ্ধক্যেও যুবা থাকিতে চাও, তবে যৌবন-সুলভ মানসিক ও দৈহিক ব্যায়াম প্রভৃতির অনুশীলনে সতত হৃষ্টচিত্তে আত্মনিয়োগ করিবে। বৃদ্ধ হইয়াছি, আর কতদিন বাঁচিব? এখন কোনরূপে বাকি দিন কয়টা আলস্যে ও আরামে গৃহের বদ্ধ বায়ুতে দেহকে রক্ষা করিয়া, ততোধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয় মন্দিরের সকল প্রশস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া কেবল বিশ্রাম নিদ্রা ও গল্প স্বল্পের আবর্জ্জনা লইয়া দিন রাত্রি অর্জ্জিত অর্থে অথবা পুত্র পৌত্রের কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপপ্রয়োগে দিন-পাত করিলে দীর্ঘায়ু হওয়ার আশা তো একবারেই দুরাশা। বরং তখন যদি সুনিয়মিত স্বল্পাহার, উপযুক্ত ব্যায়াম ও সুনিদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে সুস্থ ও সুপটু দেহ-মন লইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আত্মবশে থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে চাও, তবে শুন, ডাক্তার হুকার কি বলেন,—"যদি তোমার কোন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন না থাকে, তবে আর কিছু করিবে। একটী বিদেশী ভাষা শিক্ষা কর। অনেকেই তাহা বৃদ্ধ বয়সেও করিয়াছে, এবং তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যেরও উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে।"

"আমাদের অধিক সংখক মৌলিক বিজ্ঞানানুশীলন-কারীই সাধারণতঃ দীর্ঘজীবী ও শ্রেষ্ঠতম রোগমুক্ত লোক।" Bulwer Lytton.

নিত নূতন রূপে জীবন-দেবতার পূজার্চ্চনা করিয়া হৃষ্ট চিত্তে পবিত্রভাবে গার্হস্থ্য জীবন যাপন, সাধ্যমত প্রতিবেশীবর্গের সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে সরল ও অকপট হৃদয়ে যোগদান করতঃ মানুষের উচ্চ অধিকার সমূহের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারে প্রস্তুত ও প্রবৃত্ত থাকিতে পারিলে অধিক বয়সেও ভগ্ন দেহ লইয়াও সুস্থ চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারা যায়।

দীর্ঘজীবী হইয়া অবিকৃত মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যাপারে নিয়ত সচেষ্ট না থাকিলে দেহ মন নীরোগ ও

জরা-বিমুক্ত থাকিতে পারে না। সে জন্য শারীরিক নিয়ম পালন অর্থাৎ আহার পান, নিদ্রা, বিশ্রাম, স্নান, ব্যায়াম প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিদিন অভ্যাস করা একদিকে যেরূপ অত্যাবশ্যক, পক্ষান্তরে, প্রীতিপ্রফুল্ল মানসিক অবস্থা ধর্ম্ম, নীতি, সত্যনিষ্ঠা অপরা ও পরাবিদ্যার অনুশীলন, ও ধ্যান ধারণা প্রভৃতি দ্বারা অন্তরে বাহিরে হৃদয়ের দেবতার সত্তা উপলব্ধি দ্বারা মানবের দুর্লভ অধিকারের সদ্ব্যবহার করিয়া হৃদয় মনকে চির নির্ম্মল ও পবিত্র ভাবে সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে সত্য ও ন্যায়, দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তির পরিচালন দ্বারা দুঃখীর দুঃখ দূর, শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলকে ভ্রাতৃভাবে সৎপথে পরিচালন চেষ্টা ও সেই সকল সদনুষ্ঠানের ফলে আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিতে করিতে মনকে নিরাশা অবদান ও ক্লৈব্যের দুঃখ হইতে বিনির্ম্মুক্ত রাগিয়া হৃষ্টতা রক্ষার চেষ্টা সর্ব্বদা করিতে হইবে। এই বিষয়ে "How not to grow old" (Dr. Hooker) কি বলেন শুনুন, "হর্ষোৎফুল্লতা একটী সুমহৎ পুষ্টিকর বস্তু। বলিতে গেলে ইহা একটী বহু-ব্যবহৃত উক্তি। তুমি বলিতে পার, যখন ভয়াবহ শোকের ব্যাপারসমূহ তোমার জীবনের পথে দুরন্ত কুকুরের ন্যায় তোমার পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তখন তুমি উৎফুল্ল ও নিঃশঙ্কচিত্তে থাকিতে পার না। আমি বলি তুমি তাহা পার। মনকে এ বিষয়ে সতর্কভাবে দীক্ষিত করিতে হইবে। অথবা ইহা মনের সতর্ক শিক্ষা দীক্ষার বিষয়ীভূত। গৃহের নিম্নতলে উত্তমর্ণের পরোয়ানাধারী রাজকর্ম্মচারী, উপর তলে যমজ সন্তানের জন্ম-ঋণের পরোয়ানা তোমাকে পরিশোধ করিতেই হইবে। কিন্তু সে জন্য তখন তোমার হাতে কিছুই নাই। ভীত হইও না, শান্ত ও অচঞ্চল থাক, শেষ পর্য্যন্ত বিপদের সঙ্গে লড়িতে থাক, আশা পাইবে। পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত দেখিয়া যদি অধীর ও বিচলিত হও, দেখিতে পাইবে, তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছ, এবং পূর্ব্ববৎ সকল বিষয়ে যথাযথরূপে সুযোগ লাভের সম্যক্ অযোগ্য হইতেছ।"

"অতএব মনের শান্ত ভাবের অনুশীলনে ব্রতী হও, প্রবৃত্তিসমূহ অচঞ্চল রাখিতে চেষ্টা কর, তাহা নিজের পক্ষে হিতপ্রসূ ও তোমার পারিপার্শ্বিক লোকের পক্ষে আনন্দজনক দৃষ্টান্ত হইবে।"

তদনন্তর বলিতেছেন :—"আমার একজন বৃদ্ধ বন্ধু—তদানীন্তন কালের একজন পরম প্রসিদ্ধ পরমার্থতত্ত্ববিৎ—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হর্ষোৎফুল্ল লোকদের মধ্যে যিনি অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন,—তিনি নব্বই বৎসর সুখে জীবিত ছিলেন, তিনি সকলকেই নিয়ত প্রীতিপূর্ণ অভ্যর্থনা দান করিতেন; নিয়তই তাঁহার চক্ষের দৃষ্টিতে এক আহ্লাদ-পূর্ণ কটাক্ষ বিদ্যমান ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডলের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ও হাস্যমণ্ডিত ছিল। যদিও আবশ্যক সময়ে তিনি অন্যায়ের প্রতি কিয়ৎপরিমাণ সাধুচিত ঘৃণা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, তথাপি, আমি কদাপি তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখি নাই।

"তুমি মধ্য বয়সে পদার্পণ করিয়াছ বলিয়াই যে মানসিক শ্রম তোমার পক্ষে সময়োচিত নহে, সেরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দূরে পলায়ন করিও না। প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক কতিপয় উৎকৃষ্ট সাধনাই তথাকথিত "বৃদ্ধ" কর্ত্তৃক সুসিদ্ধ হইয়াছে। ভাবিয়া দেখ, দৈহিক ও মানসিক শ্রমের কার্য্যে গ্ল্যাডষ্টোন কি করিয়া গিয়াছেন। বিসমার্ক, ডারুইন, মলট্‌কে, নিউটন, স্যার আইজাক্ পিটম্যান, জেনারল বুথ্, জন্ ওয়েলী, আর্‌ল রসেল, ভর্ব্বেয়ার, হর্সেল, হিউগো, ক্যাণ্ট ও অন্যান্য মহাত্মারা কি করিয়াছেন! সিসিরো একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে, "বৃদ্ধবয়স" দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার সঙ্গী হইতে পারে না। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বয়সের জন্য অবশ্যই মস্তিষ্কের ক্ষীণতা আসিবেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার রোগই দেখা দিবে। এ কথা বিশ্বাস করিও না।

"ফণ্টেনেলি এক শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার সহজ সচ্ছল মনোবৃত্তি এবং অবিকৃত সংস্বভাবের জন্যই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।"

অতএব আনন্দ, শান্তভাব ও আশ্বস্ততার অনুশীলন কর। অপরাজেয় শান্তভাব অবলম্বন কর। নিশ্চিত জানিবে, নিয়ত শান্তস্বভাব মানুষ, নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তিই বলবান্ লোক, বলবান্ চরিত্রবিশিষ্ট। তাঁহার কাছে অযথা শক্তিক্ষয় বা অপচয় নাই, শক্তির অপব্যয় নাই, ক্ষমতার বিচ্যুতি নাই। সে ব্যক্তি ক্ষয়ের পরিবর্ত্তে শক্তি সংরক্ষণে নিরত। আমি এতদ্বিষয়ে যাহা কিছু বলিলাম, তাহা সত্ত্বেও তুমি ভাবিতে পার যে, বিপদ আপদের মধ্যে শান্তভাব অবলম্বনের কথা মূর্খতা। তদুত্তরে আমি বলিতেছি যে, তাহা সম্যক্‌রূপে সম্ভব, যদি তুমি সেরূপ করিতে শিক্ষিত হইয়া থাক। কিন্তু সেই সুখের অবস্থা আনয়নের জন্য কঠোর ও অবিরাম মানসিক শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন। স্মরণ রাখিও যে, যিনি ক্ষণে ক্ষণে ধৈর্য্যচ্যুত হন, তিনি সেই সঙ্গে জীবনীশক্তিরও ক্ষয় সাধন করেন। অস্থির ব্যক্তি, উদ্বিগ্ন লোক, যে জানে না, কেমন করিয়া শান্ত ও সুস্থ অচঞ্চল থাকিতে হইবে, বলিতে গেলে তাহার সময় খণ্ডিত ও অপব্যয়িত হয় বলিলেই ঠিক হয়। তোমার শক্তিকে সংরক্ষিত কর, তাহাতে তোমাকে স্বস্থানে দণ্ডায়মান রাখিবে। মনের ভার-কেন্দ্রের সমতা রক্ষা কর। সর্ব্ব-প্রযত্নে তোমার অস্তিত্বের বিধি নিয়মিত কর।

মনের এরূপ অবস্থায় কোন প্রকারেই হৃদয়হীনতা সূচিত হয় না। এরূপ করিলে আমাদের মনের এমন অবস্থা আসিবে যে, আমাদের জীবন সমস্যার স্পষ্টতর সমাধান চিন্তার সামর্থ্য জন্মিবে, দুরূহ বিষয়ের সমাধান ত্বরিত ও সহজ হইবে, যুক্তি বুদ্ধি ফলপ্রদ হইবে। অধিকতর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সমস্ত দুঃখ বিপদের হাত এড়াইতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যদি ব্যতিব্যস্ত হও বা বিক্ষিপ্তচিত্ত হও, মনের কর্ত্তব্য বিমূঢ়তা নিশ্চিত আসিবে। তাহাতে শক্তিক্ষয় ঘটিবে এবং এক কথায় বলিতে কি, তুমি তোমার জীবনের অন্ততঃ কতকগুলি দিনকে নিজেই খণ্ডিত করিয়া ফেলিবে। অধিকন্তু খুব সম্ভব, তোমার স্নায়ু সমূহকে বিপর্য্যস্ত করিবে, এবং তোমার সম্মুখস্থ কর্ত্তব্য সম্পাদনে তোমাকে অক্ষম, অযোগ্য করিয়া ফেলিবে। প্রকৃত পক্ষে, এরূপ লোক অতি অল্পই দেখা যায়, যাহারা বিনা প্রয়োজনে তাহাদের জীবনকে নিজ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে দেয় না। কেমন করিয়া সম্যক্ ও সমুচিত বিশ্রাম লাভ করিতে হইবে, সেটী জানাও একটী মহৎ বিষয়। কেমন করিয়া আরাম লাভ করিতে বা সকল কাজ হইতে অবসর লইয়া বিশ্রামের পূর্ণ উপকারিতা লাভ করিতে পারা যায় তাহাও একটী তদ্রূপ বৃহৎ প্রয়োজনীয় বিষয়।

"অতএব, যাহাতে আমরা সতত ও সর্ব্বাবস্থায়, কবিবর লংফেলোর উপদেশানুসরণ পূর্ব্বক ধীর, শান্ত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সমাহিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারি, তাহাই করিতে হইবে।

"যদি তোমরা তরুণ ভাব রক্ষার জন্য অকপট আগ্রহান্বিত হও, তবে আমি পুনরায় তোমাদিগকে আশ্বস্ত থাকিবার পরামর্শই দিতে চাই,—হই না কেন তাহাতে আমি পুনরুক্তি দোষে অপরাধী। জরা ও বার্দ্ধক্যকে দূরে রাখিবার পক্ষে এটী কার্য্যতঃ একটী মূল্যবান ব্যবস্থা। তোমার মনের মধ্যে উত্তমরূপে মুদ্রিত করিয়া রাখিবে যে, প্রতি মেঘখণ্ডের সঙ্গেই একটী একটি রজতরেখা (silver lining) বিদ্যমান। অতএব মেঘের জন্য নহে, ঐ রেখাটীর জন্যই অনুসন্ধিৎসু হও।

"বিপত্তির সম্মুখীন হইবে, কিন্তু ইহার সম্মুখে যাইতে পুরুষকার ও আশার সঙ্গে অগ্রসর হইবে। তাহারই ন্যায় হইবে, যিনি নিয়ত বক্ষ বিস্তার করিয়া অগ্রসর হন, আকাশের মেঘ ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা করেন না, সত্যের পরাজয়, অসত্যের জয় যিনি কখনও দুঃস্বপ্ন দেখেন না, যাহার বিশ্বাস যে উত্থানের জন্যই পতন, যাহারা জানে আরও ভাল করিয়া দাঁড়াইবার জন্যই বিফলতা আসে ও জাগিবার জন্যই ঘুমাইতে হয়।

"তোমার হর্ষোজ্জ্বল আশাপূর্ণ প্রকৃতি কিছুতেই শীঘ্র দমিবে না অথবা সহজে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে না। তোমার ঐ হতভাগ্য নিরাশাক্লিষ্ট বন্ধু, যে বলে, যাহা কিছু বর্ত্তমান, সকলই মন্দ, আর সততই জীবনে ছায়ারই অনুসন্ধান করিয়া থাকে, সেই অচিরে জরাগ্রস্ত ও

লোলচর্ম্ম হইয়া থাকে এবং নিজের ও অপরের নিকট সম্পূর্ণ একটী দুঃখের চিত্র হইয়া দাঁড়ায়।

"নবতিপর শিল্পী ক্যালো (Mc. Callow) সম্প্রতি আমাকে বলিয়াছেন যে, প্রফুল্ল প্রকৃতির সত্যতার ফল স্বরূপই তাঁহার উত্তম স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন। এই অবিরাম আনন্দ ও প্রফুল্লতার জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে থাকিলেই আমাদের দেহেও শোণিতপ্রবাহ অধিকতর মুক্ত ও দ্রুত গতিতে চালিত হইবে, এবং তদ্দ্বারাই অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তি বহু পরিমাণে আমরা প্রাপ্ত হইব। তোমার চতুর্দ্দিকের কর্ম্মশীলতার সঙ্গে যোগ দাও, অপরের জীবনের মধ্যে প্রবেশ কর, আনন্দজনক প্রকৃতির অনুশীলন কর, একটু একটু দুঃখ কষ্ট সহজ করিয়া লইতে, অথচ কিছু কিছু ব্যথা উপশম করিতে, তীব্র ইচ্ছার অনুশীলন কর; তাহা হইলে শুধু তোমার নিজের নহে, অপর সকলেরও সুখ উৎপাদন করিতে পারিবে। অধিকন্তু তাহাতে তোমার জীবনের দিন-গুলির সংখ্যা বৃদ্ধিরও কিছু কিছু সাহায্য হইবে।

"পক্ষান্তরে, তোমার হৃদয়কে অস্থিতে পূর্ণ হইতে দাও; কেবল নিজেকে লইয়াই থাক; বলিতে থাক, তুমি অতি বৃদ্ধ কিরূপে ঐটী করিবে, সেটী করিবে। তাহা হইলে তুমি নিঃসন্দেহ মন, দেহ ও আত্মা সম্বন্ধে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে।

যদি দেখ, এখন তুমি ষাট বা সত্তর বৎসরে পৌঁছিয়াছ বলিয়া নিজেকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে এবং সম্ভবতঃ সেজন্য তোমার নিজের সম্বন্ধে এতাধিক সতর্ক হইবে যে, তাহাতেই তুমি রোগগ্রস্ত হইবে। যখন সাহস করিয়া বাহির হইবে সম্ভবতঃ তখনই তোমার সর্দ্দি হইবে। যেহেতু তুমি নিজেকে অত্যধিক আরাম দিয়াছ। তখন তুমি অধিকতর বৃদ্ধ, অধিকতর দুর্ভাগ্য ও ততোধিক লোকবিদ্বেষী হইয়া পড়িবে।

"তুমি শুনিয়াছ লোকে বলে, হাস্যকর ও মোটা হও। আমি বলি, হাসো ও যুবা হও। যে কোন জীবনে কিছু আমোদ আনিবে। যে ব্যক্তির হাস্য রসের জ্ঞানাভাব সে গভীর কৃপাপাত্র। তাহার ভিতরে কিছু না কিছু গলদ আছে। অতএব সময়ে সময়ে হাসিখুসি করিতে হইবে। তাহাতে লজ্জা বোধ করিবে না। তাহাতে তোমাকে তরুণ রাখিতেই সাহায্য পাইবে।

"যে সকল অভিনেত্রীর অভিনেয় তালিকা সম্পূর্ণ বিয়োগান্ত বিষয়ে পূর্ণ, তাহাদের অপেক্ষা প্রসিদ্ধ হাস্য-রসাত্মক নাট্যাভিনেত্রীদের যৌবন বহু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। বিয়োগান্ত নাট্যের অভিনেতৃদের দীর্ঘ-জীবনসমূহ দুঃখের জরাগ্রস্ত জীবন বলিলেই হয়। হাস্যরসাত্মক লক্ষণের ঊর্দ্ধগামী রেখা সমূহ চিরযৌবন ও আশ্বস্ততার রেখার নামান্তর মাত্র। প্রকাশ্য স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ লোকের চরিত্র লক্ষণ প্রত্যেক চলন-ক্ষম ব্যক্তিই অধ্যয়ন করিতে সমর্থ। হাস্যের দ্বারা লব্ধ শারীরিক হিত অতীব ত্বরিত, হাস্য করিবামাত্র শোণিত প্রবাহ বর্দ্ধিত করিয়া তোলে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ায় উত্তেজনা আনে, এবং তাহার ফলস্বরূপ শরীরের সমস্ত ক্রিয়ারই সমৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে।

তাই বলিয়া মাঝে মাঝে হাস্যোদ্দীপনার জন্য আমাদিগকে হাস্যরসিক অভিনেতা সাজিতে হইবে না। বাস্তব জীবনেই মাত্র বহুল হাস্যরসাত্মকের ন্যায় বিয়োগান্ত নাটক বিদ্যমান। যখনই উহা আমাদের সম্মুখস্থ হইবে, তখনই আমাদের তাহাতে যোগ দিতে হইবে।

প্রতিষ্ঠান-পরিচয়।

নারী স্বাস্থ্য বিদ্যালয়।

ভূমিকা।

দুস্থ দরিদ্র নারীর চিকিৎসা, এবং যে শিক্ষা পাইলে আমাদের দেশের নারীগণ তাহাদের দুঃখিনী ভগ্নিদের সেবা ও শুশ্রূষা কল্পে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন তাহাদের মধ্যে সেই শিক্ষার বিস্তার অতীব প্রয়োজনীয় জানিয়া, দেশবন্ধু-স্মৃতি-ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ, অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে এই মুখ্য উদ্দেশ্যটি সফলতা লাভ করে, তৎবিষয়ে যত্নবান হইয়া, যে ভবনে দেশবন্ধু বাস করিতেন, তথায় চিত্তরঞ্জন-সেবা-সদন নামক একটি অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই সেবা-সদন নারীদিগের জন্য হাসপাতাল ভিন্ন আর কিছুই নয়। চিকিৎসার জন্য এখানে উচ্চ নীচ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব শ্রেণীর মহিলারা আগমন করিতেছেন। দেশে অন্যান্য হাসপাতালও আছে বটে, কিন্তু নানা কারণ বশতঃ সেই সকল স্থানে চিকিৎসার জন্য নারীদিগকে পাঠাইতে অনেকেই অনিচ্ছুক। ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে আমাদের দেশে নারী ও শিশু-মৃত্যুর হার উত্তরোত্তর ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই আজ দেড় বৎসর হইল দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ সেবাসদন স্থাপন করিয়াছেন। তথায় রোগিণীগণ নিজের বাড়ীর মত যত্ন ও শুশ্রূষা পাইতেছেন। যেরূপ যত্ন ও আগ্রহের সহিত এই সেবাসদনে মেয়েদের চিকিৎসা হইতেছে, তাহাতে, হাসপাতালে নারীজাতির চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে একটা কুসংস্কার ছিল, তাহা দূরীভূত হইতেছে। তাই আজ বহু ভদ্রমহিলা চিকিৎসার জন্য সেবাসদনে আগমন করিতেছেন। হাসপাতালের বহিঃচিকিৎসা বিভাগে অনেক রোগিণী প্রতিদিন প্রাতঃকালে বহুদূর হইতে আসিয়া থাকেন ও বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হন।

সেবাসদনের কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে বটে, কিন্তু অর্থাভাবে ইহার কার্য্যক্ষেত্র প্রসার লাভ করিতেছে না; এবং অদূর ভবিষ্যতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। বাংলার প্রতি গৃহে, সেবাসদনের যাহা আদর্শ, সেই আদর্শের প্রতি প্রীতি ও সেবার অবেগ জাগাইয়া তুলিতে হইলে, রোগীর চিকিৎসা ভিন্ন আরও কিছু করা দরকার। তাই ভারতের প্রতি গৃহই এই আদর্শে পরিচালিত। এই আদর্শকে প্রকৃত পন্থায় চালনা করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনই সেবাসদনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কুসংস্কার এবং সুশিক্ষার অভাবই এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান অন্তরায়। সেবা-সদনের কর্ত্তৃপক্ষ তাই স্থির করিয়াছেন, সেবা-সদনের সংলগ্ন এমন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যেখানে দেশের নারীগণ শুশ্রূষা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

বঙ্গদেশের সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য, শরীর-পালন-নীতি এবং রোগীর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে প্রথমতঃ বাংলার বিবাহিতা নারীগণ এবং সন্তানের মাতাদিগকে স্বাস্থ্য বিষয়ে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে, যাঁহাতে শুধু তাঁহাদের নয়, অপরাপর লোকেরও উপকার হয়। দ্বিতীয়তঃ এমন একটি সুদক্ষ শুশ্রূষা-কারিণীর দল গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহারা বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলাতে যাইয়া স্বাস্থ্য এবং সেবা সমিতির কার্য্যে সাহায্য করিতে পারিবেন এবং বঙ্গদেশের রমণীগণের

মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান বিস্তার ও তাঁহাদের রোগের উপশম করিতে পারিবেন।

কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে—

হাসপাতালে হাতে কলমে শিক্ষা ভিন্ন স্কুলে চারিটি স্তরের শিক্ষা দেওয়া হইবে। সেবা ও শুশ্রূষাকারিণীর শিক্ষা উচ্চতর এবং প্রাথমিক শিক্ষা। বলা বাহুল্য সমস্ত শিক্ষাই অবৈতনিক। **শুশ্রূষা সম্বন্ধে উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষা**—এই শিক্ষা বিভাগে শিক্ষালাভ করিতে হইলে ইংরাজি এবং বাংলা এই উভয় ভাষাতেই জ্ঞান থাকা দরকার। এক বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে ছাত্রীরা ইচ্ছা করিলে ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটির সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

শুশ্রূষা সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা—ইহার জন্য শুধু বাংলা ভাষায় জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট। এক বৎসর দুই মাসে শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। এই শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্রীরা শুশ্রূষাকারিণী এবং ধাত্রীর কার্য্যে পারদর্শিতার সার্টিফিকেট পাইবার জন্য ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটির অধীনে পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা—ইহার জন্য ইংরাজি ও বাংলা এই উভয় ভাষাতেই অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। ছয় মাসে শিক্ষা সমাপন হইবে। প্রাথমিক সাহায্য দান এবং প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। অবশ্য এই স্তরের শিক্ষা যাঁহারা সহর বা মফঃস্বলের সাধারণ স্বাস্থ্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহাদেরই প্রয়োজনীয়। শিক্ষা শেষ হইলে সেবা সদনের কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট দিবার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা—এই বিষয়ে শিক্ষার জন্যে বাংলা ভাষায় কিছু জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট। তিনমাসে শিক্ষা সমাপন হইবে। উচ্চতর বিভাগে যে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে ইহাতেও সেই সেই বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা শেষ হইলে সার্টিফিকেট দিবার জন্য পরীক্ষা লওয়া হইবে।

দিবাভাগে শিক্ষার বন্দোবস্ত—কলিকাতাবাসী ভদ্রমহিলা এবং মফঃস্বল হইতে আগত যে সকল ভদ্রমহিলা কলিকাতায় আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্যে দিবাভাগে কয়েকটি ক্লাসের বন্দোবস্ত করা যাইবে। উহাতে সাধারণতঃ বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু যাঁহারা শুশ্রূষা ও ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শী হইতে চান তাঁহাদের জন্য হাসপাতালে হাতে কলমে শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। পরন্তু যে সকল ভদ্রমহিলা অল্প দিন মাত্র পড়িয়া প্রাথমিক সাহায্য দান, গৃহ শুশ্রূষা ও পথ্যাদি সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে চাহেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্যও বন্দোবস্তের ত্রুটি হইবে না।

স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদিগের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। সাধারণতঃ আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, গৃহ পরিচর্য্যা, প্রাথমিক শুশ্রূষা এবং পথ্যাদির নিয়মাবলী ইত্যাদি স্বাস্থ্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য জিনিষগুলি সম্বন্ধে কোনরূপ শিক্ষা না পাইয়াই স্কুল বা কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইহার ফল অশুভকর। তাই সেবা-সদনের কর্তৃপক্ষ স্কুল এবং কলেজের ছাত্রীদিগের জন্য কতকগুলি ক্লাসের ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে তাঁহারা শরীর পালন এবং শুশ্রূষা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। অবশ্য স্কুল এবং কলেজের কর্তৃপক্ষদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সুবিধাজনক সময়ে এই শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইবে।

যাতায়াতের ব্যবস্থা—উপযুক্ত সংখ্যক আবেদন পাইলে ও স্কুলের ছাত্রীদিগের জন্য যাতায়াতের বিশেষ বন্দোবস্ত করা যাইবে।

ছাত্রীদিগের থাকিবার আবাস বা হোষ্টেল—যে সমস্ত ছাত্রী মফঃস্বল হইতে পড়িতে আসিবেন এবং যাঁহাদের কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পড়া অসম্ভব, এরূপ শ্রেণীর ছাত্রীদিগের বাসস্থানের জন্য সেবাসদনের ঠিক সম্মুখে একটি অট্টালিকা ক্রয় করা হইয়াছে। তাহাতে থাকা ও ধোপা খরচ ইত্যাদি বাবদ প্রতি ছাত্রীকে মাসিক মোট ২৫৲ টাকা হিসাবে দিতে হইবে।

বেতন—একমাত্র হোষ্টেলে থাকিবার খরচ ভিন্ন ছাত্রীগণকে অন্য কোন খরচ বহন করিতে হইবে না। সমস্ত শিক্ষাই এখানে অবৈতনিক।

সামাজিক মেলামেশার ব্যবস্থা—সেবা-সদনের কর্তৃপক্ষগণের বিশ্বাস, পরস্পর মেলামেশার ভিতর দিয়া নারী-শিক্ষার প্রসার কেবল সম্ভবপর নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। সেবা সদনের কর্তৃপক্ষের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মিলন ও মিশ্রণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে শিক্ষা বিস্তার সহজে সম্পন্ন হয়। তাই এই স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ এবং কলিকাতাবাসী ভদ্র মহিলারা যাহাতে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় এবং মেলামেশা করিতে পারেন তজ্জন্য বন্দোবস্ত করা হইবে।

বক্তৃতা এবং শিক্ষামণ্ডলী—বিবাহিতা মহিলা-বর্গ এবং বালিকাদিগের জন্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নানাবিধ হিতকর বিষয়ে বক্তৃতার বন্দোবস্ত সেবাসদন হইতে করা হইবে। সেবাসদনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক; নানা বিষয়ের আলোচনার জন্যও শিক্ষা-মণ্ডলী গঠন করা হইবে। তাহাতে মহিলারা নানাবিধ হিতকর বিষয়ের আলোচনা করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন।

সমাজের হিতসাধন—প্রয়োজন অনুভব করিলেই যে সকল ভদ্রমহিলা জনসেবাব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের জন্য সমাজ-সেবার বন্দোবস্ত করা হইবে।

চিঠি পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীলতিকা বসু
চিত্তরঞ্জন সেবা সদন।
১৪৮নং রসারোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

কংগ্রেসে স্বাস্থ্যকথা—

চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে বোধ হয় এই প্রথমবার কংগ্রেসের সভাপতি রাজনীতি-চর্চ্চার সহিত, তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে গুরু গম্ভীর ভাবে জাতীয় স্বাস্থ্যের কথার আলোচনা করিলেন। কংগ্রেস নিজেকে ন্যাশন্যাল নেশন বা ভারতীয় জাতির প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছেন; অথচ, এত দিন ধরিয়া কংগ্রেস কেবল শুষ্ক ও ব্যর্থ রাজনীতির ফাঁকা আওয়াজ করিয়াই নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। দেশবাসীর শিক্ষা দীক্ষা, দেশব্যাপী অন্নসমস্যা, সাধারণ অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, আর্থিক দুরবস্থা এ সকল অতি তুচ্ছ ব্যাপার! কংগ্রেসের আসরে ইহাদের স্থান নাই! চাই শুধু

রাজনীতিক অধিকার—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন,—স্বরাজ—স্বাধীনতা। আমরা পনেরো, ষোল বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি—রোগজীর্ণ, দুর্ব্বল জাতির পক্ষে রাজনীতিক অধিকার হজম করা শক্ত। দেশের লোকের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে, যাহা রাজনীতিক অধিকার লাভের পূর্ব্বেই আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। সকল বিষয় জড়াইয়া আমরা অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই ত আজ আমরা পরাধীন! প্রথমে আমাদিগকে আবার সকল বিষয়ে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তবে আমরা রাজনীতিক অধিকার—স্বাধীনতা পাইবার দাবী করিতে পারিব। অথবা, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, তখন স্বাধীনতা বা স্বরাজ আপনিই আমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে—ভিক্ষা করিয়া বা দাবী করিয়া উহা লাভ করিতে হইবে না। যদি সত্যের মর্য্যাদা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে—স্বরাজ লাভের জন্য, কিম্বা উহা আমাদের হস্তগত হইলে তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রথমে আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করার অর্থ—যে যে বিষয়ে আমরা অযোগ্য সেই বিষয়ে আমাদিগকে যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। এবং সেই সকল বিষয়ের মধ্যে একটা—আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা। মোট কথা, ভিক্ষা করিয়াই হউক বা দাবী করিয়াই হউক স্বরাজ লাভ আমাদের সর্ব্বপ্রথম কাম্য নয়; আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাম্য হওয়া উচিত—যোগ্যতা লাভ। তারপর যখন স্বরাজ বিনা ভিক্ষায় বিনা দাবীতে আমাদের হস্তগত হইবে, তখন তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আমাদের কার্য্য ক্ষেত্র বাহিরে—ইংরেজের দরবারে ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া গিয়া দাঁড়ানো নয়;—আমাদের কার্য্য ক্ষেত্র ভিতরে—জাতির মধ্যে, দেশের মধ্যে। আমাদিগকে বহির্মুখীনতা ছাড়িয়া অন্তর্মুখীন হইতে হইবে। তাহার সূচনা হইয়া রহিল মান্দ্রাজের কংগ্রেসে—সভাপতি ডাক্তার আনসারির অভিভাষণে। এখন এই অভিভাষণে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক রোগ নিবারণ ব্যবস্থা—

জাতি সঙ্ঘের অন্তর্গত স্বাস্থ্যবিভাগের জনকয়েক সদস্য ভারতের অবস্থা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। দিল্লীনগরে মহাসমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা হয়। এবং কনফারেন্স অব লীগ অব নেশন্স ইণ্টারচেঞ্জ অব হেল্‌থ অফিসার্স নামক একটী বৈঠকও হইয়াছিল। মাননীয় সার মোহাম্মদ হবিবুল্লা এই বৈঠকের সভাপতিরূপে একটী বক্তৃতাও করেন। সংক্রামক রোগ যাহাতে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া না পড়ে'—জাতিসঙ্ঘের স্বাস্থ্য বিভাগ তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য নিযুক্ত। তাঁহাদের ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যও তাই। যে সকল রোগ সংক্রামক নয়, যাহা ভারতেরই নিজস্ব, যে সকল রোগের ভারত হইতে বিলাত যাত্রার কোন সম্ভাবনা নাই, সে সকল রোগ নিবারণের কোন ব্যবস্থা জাতি সঙ্ঘের স্বাস্থ্যবিভাগ করিতে প্রস্তুত কি না তাহা বলা যায় না। স্যার মোহাম্মদ হবিবুল্লার বক্তৃতায় অনেক আশার বাণী আছে। তিনি বলিয়াছেন, সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে ভারতে চেষ্টার কোনই ত্রুটি নাই; ভারতের আর্থিক সাধ্যমত মৌলিক গবেষণা ও অনুসন্ধান চলিতেছে; এবং তাহার ফল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাও হইতেছে। সে গবেষণা কিরূপ, তাহার ফলাফলই বা কি, কোথায় তাহাদের প্রয়োগ হইতেছে, তাহা কিন্তু সাধারণের অজ্ঞাত। সে বিষয়ে একটু খোলাখুলি ব্যাখ্যা হইলে জনসাধারণের মনে সন্তোষ জন্মিত, লীগের প্রতিনিধিরাও বোধ হয় অপেক্ষাকৃত অধিক আশ্বস্ত হইতে পারিতেন।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৬শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল { ১১শ সংখ্যা

জাতীয় স্বাস্থ্য

[ডাক্তার এম, এ, আনসারি]

সাম্প্রদায়িক মিলন ও রাজনীতিক দলসমূহের সম্মিলন আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজন বলিয়া আমি সেই সকল সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। যাঁহারা ভারতের কল্যাণকামী, আর একটি বিষয় বিশেষ ভাবে তাঁহাদের আলোচ্য। কেহ কেহ বলিতে পারেন, জাতির স্বাস্থ্যের বিষয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচ্য হইতে পারে না। বোধ হয় সেই জন্যই জাতীয় স্বাস্থ্য কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। কিন্তু স্বয়ং শাসিত জাতির ভবিষ্যতের সহিত ইহার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, আমার মনে হয়, কংগ্রেসের আর এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়, গত ৫০ বৎসরের মধ্যে দেশবাসীর স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের যুবকদিগের স্বাস্থ্যের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পুরুষের যুবকদিগের স্বাস্থ্যের তুলনা করিলেই অবনতি সপ্রকাশ হইবে। গত দুই পুরুষের লোকেরা হয় ত ধূর্ত্ততায় হীন ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যক্ষমতা, সহ্য করিবার ক্ষমতা, সাহস ও রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা অধিক ছিল। অন্যান্য দেশের লোকের সহিত আমাদের দেশের লোকের স্বাস্থ্যের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

উষ্ণপ্রধান দেশে বৎসরের অধিকাংশ কালে উত্তাপের আধিক্য হেতু লোক সহজে শ্রান্তি বোধ করে, অথচ শীতপ্রধান দেশে শ্রমিকদিগকে যতক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়, ভারতবর্ষে তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক সময় শ্রমে রত থাকিতে হয়। বিশ্রাম সময়ের স্বল্পতা হেতু তাহাদের শ্রমজনিত ক্ষতি পূর্ণ হয় না এবং ফলে আয়ুষ্কাল অল্প হয় ও কার্য্যক্ষমতা কমিয়া যায়।

আমাদের সামাজিক প্রথার ত্রুটি এতই সর্ব্বজনবিদিত

যে, তাহার অধিক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। সামাজিক কাজের কর্ম্মী মাত্রেই অবগত আছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিবাহের "ঘরের" সঙ্কীর্ণতা—এ সকলে জাতির অনিষ্ট ঘটিতেছে। আমাদের সামাজিক নিয়মের স্থিতিস্থাপকতার অভাব পরিবারের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ক্ষুণ্ণ করে এবং সন্তানদিগের উপর তাহাদের অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তৃত হয়। প্রকৃতি প্রতিশোধ লইতে কখনও দ্বিধাবোধ করে না। আমরা যদি যৌননীতি লঙ্ঘন করি, তবে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। এ দেশের লোকের চার ভাগের এক ভাগ কৃষিক্ষেত্রে বা কলকারখানায় কাজ করে। তাহাদের পক্ষে জীবনরক্ষা করাই দুঃসাধ্য। তাহাদের পরিশ্রম অত্যধিক, পারিশ্রমিক অত্যল্প। আহারে বেশে ও বাসে তাহারা দুর্দ্দশা ভোগ করে। কাজেই তাহাদের রোগনিবারণ ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহারা সংক্রামক রোগে সহজেই আক্রান্ত হয়। বিসূচিকা, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষয় করে।

পানাসক্তি।—ক্রমবর্দ্ধনশীল মদ্যপানাসক্তি জাতির স্বাস্থ্য ও সমগ্র সমাজ নষ্ট করিতেছে। মুসলমানের পক্ষে মদ্যপান নিষিদ্ধ, হিন্দুর পক্ষে পাপ। যাঁহারা মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, সরকার যদি তাঁহাদের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ ও সাহায্যদান করিতেন, তবে এ পাপ দ্রুত ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারিত না। কিন্তু সরকার তাহা না করিয়া কর্ম্মীদিগকে দণ্ড দিয়াছেন এবং বহু যুবক অহিংস ভাবে মদ্যের দোকানে পাহারা দিয়া লোককে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছে। সরকার লোককে রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার স্বাধীনতা প্রদানে বিরত থাকিয়া মদ্যপানে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আইনের অস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতবাসী অবশ্যই বলিতে পারে, কেহ মাতাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কেহ বা ইচ্ছা করিয়া মদ্যপান করে, কাহাকেও কাহাকেও মাতাল হইতে বাধ্য করা হয়। জাতির স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হউক, অপরাধ বর্দ্ধিত হউক, শ্রমিকের কার্য্যক্ষমতা নষ্ট হউক, তাহাদের সন্তানরা অনাহারে থাকুক, তথাপি মদ্যপান নিবারিত হইতে পারে না; কেন না, তাহাতে সরকারের আয় কমিয়া যাইবে। এমন আশাও কি আমরা করিতে পারি না, আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্যসাধনের জন্য উপায় করিয়া সরকার এ বিষয়ে লোকমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন?

মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থাও বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ। তাঁহাদের আয় সীমাবদ্ধ এবং ব্যয়বহুল সহরে তাঁহাদিগকে যে ভাবে বাস করিতে হয়, তাহাতে তাঁহাদিগকে কষ্টভোগ করিতে হয়। এই যে কোনরূপে জীবনধারণ এবং সেই জন্য আবশ্যক খাদ্যের অভাব ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বহু লোকের বাস, ইহাতেই তাঁহারা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সহরে ও পল্লী-গ্রামে শিশুমৃত্যুর ও প্রসবকালে প্রসূতির মৃত্যুর সংখ্যা দেখিলে শঙ্কিত হইতে হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুব্যবস্থার অভাবে এই শোচনীয় অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা ভাল করিতে হইবে। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে আমরা প্রতিষেধস'ধ্য ব্যাধি ক্রমে উচ্ছিন্ন করিতে পারিব।

স্বাস্থ্যের সহিত জনগণের শিক্ষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে স্বাস্থ্য সংস্কারের প্রবর্ত্তন সহজসাধ্য হইবে না। আমাদের মিউনি-সিপ্যালিটি ও স্থানীয় বোর্ডসমূহ ক্ষমতার সংকীর্ণতা সত্ত্বেও দেশের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির অনেক উপায় করিতে পারেন।

শরীরচর্চ্চায় আমাদের ঔদাস্য একান্তই পরিতাপের বিষয়। যাঁহাদের অর্থ ও অবসর আছে। আমাদের সমাজের সেরূপ লোকও এ বিষয়ে অবহিত নহেন। সম্ভবত জাতিকে অস্ত্রহীন এবং দেশের যুবকদিগের পক্ষে সামরিক নেতৃত্বের উপযোগী সাধনা রহিত করাতেই এরূপ ঘটিয়াছে। লোককে তাহাদের গৃহরক্ষার জন্যও পরমুখাপেক্ষী করা হইয়াছে, আখড়া উঠিয়া গিয়াছে

এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আত্মসম্মানের মেরুদণ্ড—আত্ম শক্তিতে প্রত্যয় নষ্ট হইয়াছে। যখনই জাতিকে ক্লীবে পরিণত করিবার কারণ এই নিরস্ত্রীকরণ দূর করিতে বলা হয় যখনই বলা হয়, জাতিকে আত্মরক্ষণক্ষম করা হউক, তখনই সরকার শঙ্কায় শিহরিয়া উঠেন। লোক অস্ত্র পাইলেই যে শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে, এ ধারণা ভ্রান্ত। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যসমূহে অস্ত্র আইন নাই; কিন্তু বৃটিশশাসিত ভারতে যত শান্তিভঙ্গ হয়, সে সকল রাজ্যে তত হয় না; আর, এই বৃটিশশাসিত ভারতেই সরকার প্রজার ব্যবহারযোগ্য যষ্টীরও দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ব্যায়ামচর্চ্চার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও জাতির স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা ব্যয়সাপেক্ষ। ব্যক্তিগত চেষ্টায় এ কাজ হইতে পারে না। রাজস্বের কতকাংশ এই জাতিগঠন কার্য্যে ব্যয় করা প্রয়োজন। দেশ-রক্ষার নামে এ দেশে রাজস্বের শতকরা ৬০ ভাগ সামরিক বিভাগে ব্যয় হয়। কিন্তু জাতি যখন ক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য হইয়া পড়ে, তখন দেশরক্ষার কথাই উঠিতে পারে না। দুর্গ-নির্ম্মাণ এবং সমর-সরঞ্জামের আমদানীতেই দেশরক্ষা হয় না। অর্থব্যয় করিলে পরিখা খনিত করা যায়; কিন্তু মানুষ না পাইলে কাহারা তাহাতে যুদ্ধ করিবে? দেশের স্বাস্থ্যসমস্যার সমাধানই দেশ-রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।*

* রাষ্ট্রীয় মহাসম্মিলনের মান্দ্রাজ অধিবেশনের (১৯২৭, ডিসেম্বর) সভাপতির অভিভাষণের সার সংগ্রহ।

দেবতার বর।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ)

লোকমুখে, সাহিত্যে দেবতার বর দেওয়ার সংবাদ চলিয়া আসিতেছে। দেবতায় বর দিয়াছেন কি না, সে বিষয় আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, তবে আমরা বলিব মানুষই নিজেকে বর দিতে সক্ষম যদি সেই সাধনা থাকে। যদি এই "ঘোর কলিকালে" কোন দেবতা প্রসন্ন হইয়া বরই দিতে চাহেন, তাহা হইলে চাহিবার দ্রব্যসম্ভারের তালিকা অবশ্যই অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। এক কথা যদি বলা যায় যে, যাহা করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহাই করিব, এই বর চাই, আমি বলি সে বর দেবতায় দিবেন না, কারণ বহুবার এই জাতীয় বর দিয়া দেবতাগণ লড়াই করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, কখনও এ-দেবতার কূট বুদ্ধি, কখন ও-দেবতার বিশেষ শক্তি লইয়া কোন রকমে দেবরাজ্যের দখল বজায় রাখিয়া আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের নামটী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। উহার পরে কোন একটি বিশেষ কাম্য বস্তুর নাম উল্লেখ করিতে গেলে বড়ই গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। প্রথমেই কি মনে আসে না যে আমার প্রচুর অর্থ চাই? অর্থ থাকিলেই ত ইচ্ছামত সকল সুখই ভোগ করা যাইতে পারে, মর্ত্ত্যে স্বর্গ সৃষ্টির সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয়, গৃহস্থের পক্ষে নিছক প্রয়োজ্য না হইলেও, সন্ন্যাসী শঙ্কর যখন বলিয়াছেন "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" তখন তাহাতে কতকটা সত্য আছে; কিন্তু তাহা হইলেও তাহাতে যে "সুখলেশের" কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা বলা অতিশয় কঠোর সমস্যার কথা। তবে তারই পরের কথা "পুত্রাদপি" (অন্যে পরে কা কথা) "ধনভাজাং" যে "ভীতি" র কারণ আছে, আজ সে কথা মানিয়া লইবার মত। এ ত গেল বহিঃশত্রুর কথা। যদি ভোগ করিবার শক্তি লোপ পায়, তাহা হইলে কেবলমাত্র "ভীতি" নয়, নিতান্ত ক্ষোভের কারণ হইয়া পড়ে। অতুল ধনের অধিকারী হইয়া দেহের ক্ষুধা মিটাইবার নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করিলেও যদি ভোগ করিবার শক্তি

না থাকে তাহা হইলে সকলই অসার। মনের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য অন্য সাধনার প্রয়োজন। সে ক্ষুধা মিটিলে পার্থিব আর কোন বস্তুরই প্রয়োজন হয় না।

অর্থ কামনার কথাই প্রথম মনে আসে; কারণ দুনিয়ায় সকলেই অর্থের জন্য ঘুরিয়া মরিতেছে। বাহিরের যশঃ, মান, বজায় থাকে, ঘরের শক্তির ব্যতিক্রম ঘটে না, (অন্ততঃ আর্থিক দিকটা ধরিলে) গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, জমি জমা, দাস দাসী, আত্মীয় পরিজন, আহার বিহার কিছুরই অভাব থাকে না। কিন্তু সব জিনিষের মূলই এই সকল ভোগ করিবার শক্তি।

এখন অর্থের কথা ছাড়িয়া দিলে আর বাকী যাহা বর চাহিবার থাকিবে, তাহা বহু সংখ্যক হইতে বাধ্য। যদি আজ হইতে তাহার তালিকা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করা যায় তাহা কবে শেষ করা যাইবে, তাহা ভাবিবার কথা।

বহিরিন্দ্রেয়ের অনুভূতিযোগ্য বস্তুর মধ্যে অর্থের পরই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত বস্তুর মধ্যে লোকে কত কি চাহিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা কঠিন। অমরত্ব যাচ্ঞা করিবার মত বস্তু নহে। কেবল মাত্র অমরত্ব লাভ করিলে বিড়ম্বনাই অধিক; আধি, ব্যাধি, শোক, তাপ, জরা, আসিয়া দেখা দিবে। শান্তি যদি মাগিয়া লইতে হয়, তাহা সংসারী বাঙ্গালীর উপযুক্ত বস্তু নহে। বৈচিত্র্যময় জগতের মধ্যে নির্ভাজ শান্তি লাভ করিয়া বসিয়া থাকা, মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। শান্তিই যদি লাভ করিবার বাসনা হয়, সংসার ত্যাগ করিলে মন্দ হয় না। কর্ম্মপ্রেরণায় ছুটিয়া গেলে, শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তাহা রক্ষা করিতে হইলে, "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইয়া থাকিতে হয়। স্থাণুর শান্তির অভাব নাই। জড় অশান্তি জানে না। চিন্তাশক্তিহীন, কর্ম্মশক্তিহীনের শান্তি সম্ভব হয়। এখন শান্তি চাহিয়া বসিলে যদি কর্ম্মজীবনেও শান্তি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে বাঙ্গালী সে শান্তি লইয়া কি করিবে? দেবতাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া শান্তির নানা রূপের কথা ভাবিয়া স্থির করিতে হইবে। একটী মাত্র বরের অধিকারী হইয়া, এক কথায় কাম্য বস্তু স্থির করিয়া মগিয়া লইতে হইবে। এমন বর লইতে হইবে, যাহাতে জীবনের অন্যান্য সকল সুখই আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। বাঙ্গালী "শান্তি" লাভ করিয়া বসিয়া আছে, জীবন সংগ্রামের সামান্য অংশের ভার লইতে সরিয়া পড়ে। তাই আজ "বাঙ্গালায় প্রাণী নাই, প্রাণী দেহে প্রাণ নাই, চিন্তাহীন, শক্তিহীন, সাধাহ্লাদ দার্ঢ্য হীন জীবন সঙ্গীত হীন, নরনারী বঙ্গে।"

ইহার পরেও কি তুমি কি বলিবে আমাকে 'শান্তি' দাও। এখন "শোষণে-শূন্য কমলা-ভাণ্ডার, গৃহে গৃহে মর্ম্মভেদী হাহাকার" "অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর" বস্ত্রাভাবে দেহ জর জর, রোগে তনু কঙ্কালসার, আর তুমি বলিবে শান্তি! সাধনা থাকিলে মনের শান্তি সকল অভাবের মধ্যেও থাকে, কাযেই তাহার জন্য দেবতাকে ব্যস্ত করিবার প্রয়োজন নাই। আবার বলি শান্তি এখন থাক "এবার যে তোর কায করা চাই স্বপ্ন দেখার সময় যে নাই"। রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্যরূপে বিপদ যতই ঘনীভূত হইবে, "যতই জোরে (তাহারা) গর্জ্জাবে, তন্দ্রা ততই ছুটাইয়া দিতে হইবে।" তবে এস বাঙ্গালী, জীবন সংগ্রামে, জগৎ সংগ্রামে অংশ লইবার জন্য প্রস্তুত হও; এস "কে আছ বিপদে না করি দৃক্‌পাত, মৃত্যু, নির্য্যাতন, দৈব বজ্রাঘাত" উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হও। "সম্মান শৌর্য্যে, পৌরুষ বীর্য্যে" নিজেকে মণ্ডিত কর।

বাঙ্গালী তবে আজ কি চাহিবে? যদিই দেবতার দর্শন মিলে তবে ত বাঙ্গালীকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, দেবতা অদৃশ্য হওয়ার ভিতর আপনার ভিক্ষা জানাইয়া দেওয়া। বাঙ্গালী তুমি অটুট স্বাস্থ্য কামনা কর, দেখিবে সবই তোমার করতলগত হইবে। ধন, জন, যশঃ, মান সবই তোমার সহচর হইবে। দেবতার বরে স্বাস্থ্য লাভ করিলে "অর্থই" যদি থাকে তোমার অনর্থ ঘটিবে না; তাহাতে দেবতার বরের অমর্য্যাদা হইবে। গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া (accident) দুর্ঘটনা হইতে পারিবে না, দেবতার

বরে তোমার স্বাস্থ্য লাভ হইয়াছে, সে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতেই হইবে। আহার বিহারে রোগ আসিতে পারিবে না, তাহা দেবতার দেওয়া স্বাস্থ্যের প্রতিকূল।

তবে আমরা এখানেই বলিয়া রাখি, স্বাস্থ্যের নামে যে "বকলমা" দিয়াছে, তাহার স্বাস্থ্য রাখিবার জন্য সকল দিক আপনা হইতেই রক্ষা করিতে হইবে। শরীরের উপর কোন অত্যাচারই তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। অনিয়মিত সকল প্রকার ভোগই স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। গিরিশচন্দ্র যখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নামে "বকলমা" দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, আপন রুচি অনুযায়ী কর্ম্ম করিবার অনুমতি পান, তখন আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু ফলে, তাঁহার প্রত্যেক কাযেই বাধা পাইতে লাগিলেন। তিনি ভাবেন তাঁহার পাপ ঠাকুরকে অর্শাইবে। কাযেই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সংযত হইয়া থাকিতে হইত। স্বাস্থ্যের নামে যে ঐ ভাবে "বকলমা" দিবে, সে ঐ ভাবে স্বাস্থ্য রক্ষায় মনোযোগী হইবে। উহাই দেবতার বর; দেবতার বর থাক আর নাই থাক স্বাস্থ্যরক্ষার বর্ম্ম তাহাকে সাবধানী করিবেই করিবে।

বাঙ্গালী, তোমাকে "জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন" লাভ করিবার জন্য "সাগর ছেঁচিয়া মরুগিরি দলিয়া" যাইতে হইবে। তোমাকে বলিতে হইবে 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"; "কর্ম্মে মহান" হইতে হইবে, "গর্ব্বে মহান্" হইবে, তোমার দিকে জগতের লক্ষ্য টানিয়া আনিতে হইবে। তোমার চাই "নিশ্চল নির্বীর্য্য বাহুতে" শক্তি সঞ্চয় করা, "কর্ম্মকীর্ত্তিহীন" জীবনকে কীর্ত্তি-মহিমা মণ্ডিত করা। তোমার স্বাস্থ্য চাই, শক্তি চাই, বিশাল মনের আধাররূপ কর্ম্মক্ষম দেহ চাই। বাঙ্গালার ঋষি বলিয়াছেন "স্বকর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত" হইতে হইলে তোমাকে "সিন্ধুনীরে" 'ভূধর শিখরে" যাইতে হইবে। "গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন" করিয়া দেখিয়া "বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা" ধরিতে হইবে। সে বজ্রশিখা কে ধরিবে? তোমার এই ক্ষীণ অপটু দেহ? তোমার পরমায়ুমাত্র ২৩ বৎসর। তোমার নিদ্রার কাল আছে, অর্দ্ধেকের উপর, বাকী তোমার সবই রোগ। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দুর্ব্বল বাহু তাহা ধারণে কখনই সক্ষম নহে। চশমা-পরিহিত ক্ষীণদৃষ্টি "বজ্রশিখা" দেখিয়া অন্ধ হইয়া যাইবে। তোমার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শিরা উপশিরা কুলিশ-কঠিন হওয়া চাই। তোমায় জগতের নিমন্ত্রণে বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি করিতে হইবে, "খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়" করিতে হইবে। "ভ্রূকুটির সনে গর্জ্জনই মিশুক, আর "রক্ত রক্ত সনে" মিশিয়া স্রোত বহিয়াই যাউক, "জয় গৌরব" জিনিয়া আনিয়া মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। "গত গৌরব, হৃত আসন" ছিনাইয়া আনিতে হইবে, "লাজে নত মস্তক' হইয়া আছে, সেখানে "যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধুলি আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক" সেই "উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি" দাঁড়াইতে হইবে। তোমাদের সে লজ্জা দূর করিতে হইবে। বাঙ্গালার "মহিমা ও স্মৃতির বর্ম্মে" নিজেকে ঢাকিয়া "শির উচ্চ করিয়া" চলিয়া যাইতে হইবে। বলিতে হইবে "টল্‌বো না'ক ঝঞ্ঝা ঝড়ে দুঃখ শোকের খর্পরে, তুলবো ললাট তোমার বলে সকল বাধা জয় করে।" "নর সমাজ মাঝ" হইতে "তাহার সকল গ্লানি দূর ক রতে হইবে।"

বলহীনের লাঞ্ছনাই সার। শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে অনাদর চারিদিকে। স্বাস্থ্যহীন রোগীর বলই বা কোথায়, সাহসই বা কোথায়? রোগীর পক্ষে ব্যবস্থা "যজ্জীবতি তন্মরণং; যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ" বাঁচিয়া থাকা মৃত্যুর সমান, মরিলে তবে শান্তি। স্বাস্থ্য লাভ কর, জীবনটাকে জীবনের ন্যায় উপভোগ কর। স্বাস্থ্যের অভাবে অপরের উপর সদাই নির্ভর করিতে হয়, সামান্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া থাকে; অপরে কায করিয়া দিলে তবে তাহা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। তাই বাঙ্গালী দেবতার নিকট অটুট স্বাস্থ্য চাও, স্বাস্থ্যের সহচর সব আপনা হইতেই আসিবে। এখন "ক্ষীতকায় অপমান, অক্ষমের বক্ষঃ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পরিহাস লক্ষ মুখ দিয়া; বেদনারে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার"। বল বাঙ্গালী কবির

ভাষায় বল "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই আলো চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।" দেবতাকে স্বাস্থ্যের নিবেদন জানাইলে সকলগুলিই তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসাবে তোমার নিকট আসিতে বাধ্য। একের অভাবে অপরের অভাব ঘটিবে। এক বরে তোমার সকল আশা পূর্ণ হইবে।

হে বাঙ্গালী, এ বর তোমাকে কে দিবে? আমরা বলিয়াছি মানুষই মানুষকে বর দিতে সক্ষম। দেবতার বর এখন দুষ্প্রাপ্য বস্তু, কিন্তু তুমিই তোমাকে স্বাস্থ্যের বর দিতে পার। স্বাস্থ্যের সকল নিয়ম পালন করিলে, স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নবান্ হইলে ব্যায়াম, আহার, নিদ্রা নিয়মিত হইলে তোমার অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য লাভের কোন প্রতিবন্ধক নাই। দেবতা দেখা দেন ভাল, না দিলেও স্বাস্থ্যকামীর বরলাভের অভাব ঘটিবে না। অটুট স্বাস্থ্য-লাভের সাধনা থাকিলে, সিদ্ধির অভাব কোথায়? স্বাস্থ্যলাভের পর তার নামে "বকলমা" দিয়া যাও, তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট করে কে? অটুট স্বাস্থ্যের বরলাভ করা যেমন কঠিন ব্যাপার নহে, তাহাকে রক্ষা করায় তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম লাগে না। স্বাস্থ্য সাধনায় অভ্যস্ত হইয়া গেলে তখন দিনের সকল কার্য্যের মধ্যে স্বাস্থ্য-রক্ষার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিয়মগুলি পালন করা কঠিন বোধ হয় না। তাই বলি বাঙ্গালী তোমাকে এ বর নিজেই দিতে হইবে।

মনুষ্যত্বের সাধনা।

এতদ্দেশে অধুনা অনেক ব্যক্তি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ব্যবসা করিতেছেন। সাধারণতঃ রোগী দেখিতে আহূত হইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া 'ফী' লইয়া চলিয়া আসিলেই তাঁহারা আপন আপন কর্ত্তব্যের অবসান হইল বিবেচনা করেন। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁহারা বিনা 'ফী'তেও রোগী দেখিয়া থাকেন; এবং যাঁহাদের নিজেদের ডিসপেন্সারী আছে, তাঁহারা দয়ালু হৃদয় হইলে হয় ত কোন কোন দরিদ্র দুস্থ রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধও প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই হইল চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যলিপি।

এক সময়ে এই প্রকার অবস্থা হয় ত যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত; এখন আর তাহা হইতে পারিতেছে না। এখন 'ফী'য়ের বিনিময়ে রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেই চিকিৎসকের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করা হইল বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীর বয়স যত বাড়িতেছে, লোকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত বৃদ্ধি পাইতেছে—মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য বুদ্ধি ততই প্রখর হইতেছে। ইহার নাম মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বই মানবের বিশিষ্টতা। মানব মাত্রেরই মনুষ্যত্বের সাধনা করা কর্ত্তব্য। সে সাধনার একমাত্র লক্ষ্য—লোকহিত সাধন। সকল শ্রেণীর লোকেরই এই মনুষ্যত্বের সাধনা করার অধিকার আছে, এবং তাহা কর্ত্তব্যও বটে। মানুষকে যেখানে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে হয় সে সকল স্থলে কোনরূপ বাছ-বিচার চলে না, পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিচারে লোকহিত সাধনই যথার্থ মনুষ্যত্ব। মামলা-মোকর্দ্দমা বাধিলে ফী লইয়া একপক্ষকে সাহায্য করা উকীলের পক্ষে ব্যবসায়গত কর্ত্তব্য পালন মাত্র। কিন্তু মামলা-মোকর্দ্দমা যাহাতে না বাধে তাহার উপায় অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে মনুষ্যত্বের সাধনা। সেইরূপ রোগীর চিকিৎসা করিয়া তাহাকে নিরাময় করায় চিকিৎসকের ব্যবসায়গত কর্ত্তব্য পালন হইলেও তাহাতে সম্যক প্রকারে মনুষ্যত্বের সাধনা হয় না। রোগ নিবারণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা (Preventive medicine) চিকিৎসকের পক্ষে প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনা। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানসম্মত

সভ্যতার যুগে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। এখন তাঁহার কেবল ব্যবসা লইয়া থাকিলে চলিতেছে না; আরও কিছু করা আবশ্যক হইতেছে—রোগ যাহাতে না হইতে পারে তাহার উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের কাজ নহে। একজন বা দুইজন চিকিৎসক এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করিতে পারেন না। দেশের অধিকাংশ চিকিৎসকের সমবেত প্রচেষ্টা আবশ্যক; নচেৎ কোন স্থায়ী সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

সভ্যদেশ মাত্রেই একটী Public Health Service আছে। সাধারণতঃ এটী একটী সরকারী প্রতিষ্ঠান। তবে কতকগুলি চিকিৎসক মিলিয়া দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান ও তৎপ্রতিকার কল্পে জনসাধারণকে উপদেশ প্রদানের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গঠনও অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়, এবং এরূপ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অভাবও দেখা যায় না।

সরকারী হউক, বেসরকারী হউক, এই সকল প্রতিষ্ঠান চিকিৎসক মণ্ডলী লইয়া গঠিত, এবং সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা ইহাদের উদ্দেশ্য। সাধারণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্য নিযুক্ত বা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন কালে এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকার কালে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শত শত বৎসর ধরিয়া শত সহস্র ব্যক্তির অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী তাঁহারা নিজেদের পরিশ্রম লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সংযোগ করিয়া চিকিৎসক সম্প্রদায়ের জ্ঞান-ভাণ্ডারের আয়তন বর্দ্ধিত করিতেছেন। আর এই জ্ঞানরাশির ফলভোগী—দেশের জনসাধারণ—তথা মানব-সমাজ।

চিকিৎসক ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তি বিশেষের চিকিৎসা করেন, পাবলিক হেল্‌থ্ সার্ব্বিশ সমষ্টিগত ভাবে জাতির রোগ নির্ণয় করিয়া থাকেন। উভয়ের কার্য্যের মধ্যে সাদৃশ্যও যেমন আছে, বৈষম্যও তদ্রূপই আছে। কোন লোক অসুস্থ হইয়া নিজ গৃহে চিকিৎসককে আহ্বান করিলে বা পরামর্শের জন্য চিকিৎসকের আবাসে গমন করিলে চিকিৎসক রোগীর দেহ পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। সেই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ও চিকিৎসকের অন্যান্য উপদেশ পালন করিয়া রোগী পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিল, ব্যাপার এইখানে চুকিয়া গেল। কিন্তু জাতির পীড়িত হওয়া একটু স্বতন্ত্র ধরণের ব্যাপার। জাতির লোক-সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, কিম্বা কোটী কোটী। সকলেই একেবারে অসুস্থ হয় না। ইহাদের মধ্যে কতক লোক একই সময়ে পীড়িত হইতে পারে, কিন্তু অবশিষ্ট বহু সংখ্যক লোক ঠিক পীড়িত না হইলেও তাহাদের রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এ ক্ষেত্রে, যাহারা পীড়িত হইয়াছে, জনে জনে তাহাদের চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করিলেই কার্য্য শেষ হইল না; যাহারা সুস্থ রহিয়াছে, তাহারা যাহাতে রোগাক্রান্ত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। সেটী পাব্‌লিক হেল্‌থ্ সার্ব্বিশের কাজ। এই খানেই ব্যক্তিগত ভাবে চিকিৎসকের সহিত সমষ্টিগত ভাবে চিকিৎসক মণ্ডলীর বা পাব্‌লিক হেল্‌থ্ সার্ব্বিশের পার্থক্য।

ব্যক্তি বিশেষের চিকিৎসার ভার লইয়াছেন চিকিৎসক। তিনি একজন ব্যক্তি মাত্র; ব্যক্তিগত ভাবে চিকিৎসাই তাঁহার পক্ষে আবশ্যক। কিন্তু জাতিগত ভাবে রোগ প্রতিষেধের ব্যবস্থার ভার চিকিৎসক-মণ্ডলীর হাতে না লইয়া উপায়ান্তর নাই। তাহার কারণ, ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে বা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অভ্যস্ত নহেন। তা ছাড়া, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইহা ব্যক্তি বিশেষের কাজও নয়; চিকিৎসক মণ্ডলীর সমবেত চেষ্টা ভিন্ন প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করাও কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। আবার এই চিকিৎসক মণ্ডলীর কার্য্যও সরকারের তত্ত্বাবধানে এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক।

সাধারণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের দ্বারাই সাধারণ চিকিৎসক-মণ্ডলী (Public Health Organisations) গঠিত। মণ্ডলী যে প্রণালীতে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাহার ভিত্তি চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের অর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত। চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের ব্যবসায় পরিচালন কালে যাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং সেই পর্য্যবেক্ষণের ফলাফলের যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইতে কোন স্থানবিশেষে বা সম্প্রদায় বিশেষে সংক্রামক রোগাদির অস্তিত্ব, প্রভাব ও প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া মণ্ডলী তাহা নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা যে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন মণ্ডলী তাহার যথোচিত সদ্ব্যবহার করেন না। মণ্ডলী নিজেকে এতটা উচ্চ-পদস্থ ভাবিয়া থাকেন যে, চিকিৎসা ব্যবসায়ীর অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করা হীনতাসূচক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সরকারী তত্ত্বাবধানে সমবেত ভাবে কার্য্য করিবার পক্ষে মণ্ডলীর অবাধ স্বাধীনতা নাই, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। তবে সেই সীমা এখনও বহু দূরে অবস্থিত; তথায় পৌঁছিতে এখনও বিস্তর বিলম্ব আছে। সমবেত ভাবে জাতির মধ্যে রোগের বিস্তৃতি নিবারণ কল্পে অনেক কিছুই করিবার আছে। এখন যে সকল চিকিৎসক চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সম্মিলিত করিয়া যদি রোগ প্রতিষেধক কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার ফল যে মানবজাতির পক্ষে পরম কল্যাণজনক হইতে পারে তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। এই সকল চিকিৎসক প্রত্যহ শত শত পরিবারে শত শত ব্যক্তির চিকিৎসার্থ গমন করিয়া থাকেন। ফলে নিত্য তাঁহাদিগকে লক্ষ লক্ষ লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়। তাঁহারা যদি রোগীর চিকিৎসা ব্যতীত সুস্থকায় লোকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি, তাহাদের মধ্যে রোগের বিস্তৃতি নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যে আন্তরিক ভাবে সহায়তা করেন, তাহা হইলে প্রতিষেধমূলক চিকিৎসা অতি দ্রুত ব্যাপকভাবে সফলতালাভ করিতে পারে।

প্রতিষেধক চিকিৎসার প্রবর্ত্তন কল্পে ব্যক্তিগত ভাবে বা সমবেত ভাবে চেষ্টা যে একেবারেই হইতেছে না, তাহাও নয়; তবে তাহার পরিমাণ অতি সামান্য ও নগণ্য। এ বিষয়ে অনেক কিছু করিবার আছে। কেবল চিকিৎসক নয়, এ বিষয়ে জনসাধারণেরও সহযোগিতা করা দরকার। সমবেত ভাবে জাতির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবাদ কেবল মাত্র একটী উপায়ে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া কোন চিকিৎসক কোন পরিবারে গমন করিলে সেই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা যদি নিজেদের ও ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান, এবং সে সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ চিকিৎসকের নিকট প্রকাশ করেন, তবে সেই চিকিৎসক মণ্ডলীর নিকট সেই সকল বিবরণ রিপোর্ট করিতে পারেন। এরূপ বহু সংখ্যক বিবরণ সংগৃহীত হইলে মণ্ডলী তাহা হইতে জাতির স্বাস্থ্যের আভাষ পাইতে পারেন। স্বাস্থ্য-মণ্ডলীগুলি সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের ও স্ব স্ব পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত করিতে চেষ্টা যে না করেন, তাহা নয়। পুস্তিকা প্রচার, বিজ্ঞাপন প্রচার, লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা, স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, 'রেডিও ব্রড কাষ্ট' প্রভৃতি নানা উপায় এই উদ্দেশ্যে অবলম্বিত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে নিত্য যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাও নানা উপায়ে জনসাধারণের গোচর করিবার চেষ্টা করা হয়। এ সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও কার্য্য তেমন সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে না। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে চিকিৎসক সম্প্রদায়ই কেবল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় চিকিৎসাবিদ্যালয়ে তিনি কেবল রোগ নিরাময় করিবার প্রণালী সম্বন্ধেই শিক্ষালাভ করেন; স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। অথচ,

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে জনসাধারণকে উপদেশ দিবার পক্ষে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর আর কেহই নাই। তাঁহাকে যদি স্বাস্থ্যরক্ষার বিদ্যা শিক্ষা দিয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে জাতির স্বাস্থ্য অচিরে প্রভূত উন্নতি লাভ করিতে পারে।

কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায়ীকে ইহাতে প্রবৃত্ত করিবার উপায় কি? কিসের লোভে তাঁহারা এই অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে সম্মত হইবেন? লোকে সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলে সে এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার মূল্য স্বরূপ ফী বাবদ চিকিৎসককে অর্থ দান করিয়া থাকে; এবং সেই অর্থ প্রাপ্তির আশা থাকাতেই চিকিৎসক স্বীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু লোককে সুস্থ থাকার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ায় চিকিৎসকের কি স্বার্থ আছে? এই প্রশ্নগুলি প্রথমেই মনে উদয় হয়; এবং ইহাদের একটা সদুত্তর স্থির করিতে পারিলেই আমাদের বক্তব্যও বিলক্ষণ সহজ হইয়া যায়।

উপায় অবশ্যই আছে; এবং একাধিক উপায়ই আছে। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আরও নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃতও হইতে পারে। আপাততঃ দুই একটা উপায়ের কথা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথম উপায়—মনুষ্যত্বের উন্মেষ। গোড়াতেই আমরা ইহার আভাষ দিয়া রাখিয়াছি। মানবজাতির সেবা-ব্রত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। চিকিৎসক মনুষ্যত্বের সাধনা করিবেন। তিনি মনে করিবেন, মানব-সমাজকে সুস্থ থাকার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া এবং সুস্থ থাকিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তিনি মানবধর্ম্ম পালন করিতেছেন—মনুষ্যত্বের সাধনা করিতেছেন। চিকিৎসকের নিকট মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া অনেক কার্য্য করিতে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। তাহা বৃথা হয় নাই; মনুষ্যত্বের আহ্বান চিকিৎসক কর্ত্তৃক কখনও উপেক্ষিত হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, আর্থিক লাভ। জনসাধারণকে স্বাস্থ্য রক্ষার উপদেশ দিতে গেলে চিকিৎসককে নিতান্ত ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে হইবে না; আর্থিক লাভের দিক দিয়া তাঁহাকে হতাশ হইতে হইবে না, তাঁহার অতিরিক্ত পরিশ্রম একেবারে বৃথা যাইবে না। তাঁহার আর্থিক উন্নতিও নিশ্চয়ই হইবে। রোগ হইতে মুক্তি লাভের জন্য রোগী যেমন অর্থব্যয় করিতে কাতর হয় না, রোগে যাহাতে আক্রান্ত হইতে না হয় সেই উপায় জানিবার জন্যও সেইরূপ সে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইবে না।

তৃতীয় উপায়টা চিকিৎসকের পক্ষে লোভের বস্তু না হইলেও, তাঁহার পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে বটে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে লোকেরও চক্ষু ফুটিতেছে। তাহাদের মতিগতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইতেছে। আগেকার মত কেবল রোগের চিকিৎসা করাইয়াই তাহারা আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না। তাহারা যাহাতে আদৌ রোগে আক্রান্ত না হয়, সেই জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থার দাবী তাহারাই অচিরে করিতে আরম্ভ করিবে, এমন লক্ষণ সকল বেশ স্পষ্ট দেখা দিতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সুযোগ সত্ত্বেও চিকিৎসক তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে তাঁহাকে রোগীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। তখন চিকিৎসক যদি বলেন, আমি কেবল রোগীর অমুক রোগের চিকিৎসার্থ আহূত হইয়াছিলাম, পারিবারিক খাদ্য তালিকার সমালোচনার জন্য নহে—রোগী তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না।

এ সকল কথা কেবল কল্পনা মাত্র নহে। উন্নতিশীল দেশসমূহে কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, চিকিৎসককে রোগের চিকিৎসা করা ছাড়া রোগ নিবারণের ব্যবস্থাও দিতে হইতেছে। আবার এমন দেশও আছে যেখানে চিকিৎসক স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ দেওয়ার জন্য কেবল নৈতিক হিসাবে নয়, আইনতও দায়ী।

এখন কথা এই, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-রক্ষার সম্বন্ধে উপদেশ দিবার মত উদ্যোগ আয়োজন চিকিৎসক সম্প্রদায়ের আছে কি না? সত্য কথা বলিতে

কি, তাহা থাকা সম্ভব নয়। কারণ চিকিৎসক সম্প্রদায় এ যাবৎ এ বিষয়ে কোন কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহারা তাহার উদ্‌যোগ আয়োজনও করিয়া রাখেন নাই। কলেজে এ সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই তাঁহারা পান নাই। তবে ইচ্ছা করিলে যে তাঁহারা এ বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান-লাভ ও উদ্যোগ আয়োজন করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, চিকিৎসক চিরদিন শিক্ষার্থী। মেডিক্যাল কলেজের উপাধি পরীক্ষা পাশ করিলেই তাঁহার শিক্ষা শেষ হয় না। তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায় একটা বিরাট শিক্ষাক্ষেত্র—কলেজের অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে প্রশস্ত শিক্ষাক্ষেত্র। কলেজের পুঁথি-গত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের রোগী পরিচর্য্যা, এবং শবব্যবচ্ছেদাগারে শরীর-স্থান সম্বন্ধে ব্যবহারিক শিক্ষালাভের সুযোগ অল্প ও সীমাবদ্ধ। কলেজ হইতে বাহির হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তিনি নানা শ্রেণীর রোগীর সংস্রবে আসিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন; এবং তাঁহার সহযোগী চিকিৎসকগণের সহিত তাঁহাদের লব্ধ অভিজ্ঞতার আদান প্রদানও চলিয়া থাকে। অনেক চিকিৎসক ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিষেধক চিকিৎসা প্রণালীর আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া এতৎসংক্রান্ত উদ্যোগ আয়োজন করিয়া রাখিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় কথা—এদিকে চিকিৎসা ব্যবসায়ীর কার্য্য-ক্ষেত্রের সীমা কোথায়? কারণ, সরকারী চিকিৎসক-মণ্ডলীরও এ বিষয়ে কতকটা দায়িত্ব আছে, তাঁহাদেরও কার্য্যক্ষেত্র আছে। চিকিৎসা ব্যবসায়ীর কার্য্যক্ষেত্রের সীমা সেইখানে যেখান হইতে সরকারী মণ্ডলীর কার্য্য-ক্ষেত্র আরম্ভ হইয়াছে। আইন অনুযায়ী যে সকল কার্য্যের ভার মণ্ডলীর উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা করিতে বাধ্য এবং করিয়াও থাকেন। যাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, বেসরকারী চিকিৎসক অবশ্য ততদূর অগ্রসর হইবার অধিকারী নহেন। পারিবারিক চিকিৎসক রোগীর বাড়ীতে চিকিৎসার্থ গমন পূর্ব্বক রোগীর বাড়ীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। কোন অস্বাস্থ্যকর লক্ষণ দেখিলে তৎপ্রতি গৃহস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। তাছাড়া তিনি পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির শরীর ও মনের অবস্থা, আচার ব্যবহার, অভ্যাস, প্রভৃতিরও খোঁজ খবর লইবেন। আর যে সকল ক্রটি বিচ্যুতির সহিত আইনের সংস্রব আছে, তাহা সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের গোচর করিবেন।

দেশের চিকিৎসক সম্প্রদায়ের সমবেত অভিজ্ঞতার ফল সে একটা প্রচণ্ড শক্তি। কেবল সুপ্রয়োগ ও সুব্যবহারের অভাবে তাহার অপচয় ঘটিতেছে, তাহা মানব সমাজের কোন উপকারে আসিতেছে না। যাহা হউক, যাহা অতীত হইয়াছে, তাহা অবশ্য নষ্ট হইয়াই গিয়াছে। অতঃপর এই শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে হইবে—তদ্দ্বারা মানব সমাজের যতটা উপকার হয়, তাহা সাধন করিতেই হইবে। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের তত্ত্বাবধানে ও সহায়তায় এই শক্তির যথোচিত ব্যবহার হইলে মনুষ্য-সমাজ যে কতটা উপকৃত হইবে, তাহার কল্পনাও করা যায় না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা এখন যে ভাবে কাজ করিতেছেন, রোগ নিবারণের জন্য কি উপায়ে তাঁহারা তদপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারেন? সেজন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। ঘোড়া হইলে চাবুকের অভাব হইবে না। চিকিৎসক সম্প্রদায়ের হৃদয়ে মানব-হিতৈষণার সদিচ্ছা জাগাইয়া তুলিতে পারিলে কর্ম্মপদ্ধতি আপনি বাহির হইতে থাকিবে। কতকগুলি দৃষ্টান্ত এইখানেই দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। চিকিৎসক প্রথমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান উপদেশ পালন করিবার চেষ্টা করিবেন। সেই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন উপদেশ এই যে চিকিৎসক রোগের চিকিৎসা করিবেন না—চিকিৎসা করিবেন রোগীর। তাহা হইলে তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে রোগীর দেহ সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন। তাহার ফলে, চিকিৎসক যে রোগের চিকিৎসার্থ আহূত হইয়াছেন, তাহা ছাড়াও আরও অনেক গুপ্ত পীড়া অথবা পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ আবিষ্কার করিতে পারিবে না। কেবল দেহ পরীক্ষা নয়—গোটা মানুষটাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহার আচার ব্যবহার, অভ্যাস, মানসিক অবস্থা, সুখ দুঃখ, বিরক্তি ও তাহার কারণ এবং তৎপ্রতিকারার্থ সে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে এই সমস্তই চিকিৎসকের পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইবে। প্রত্যেক চিকিৎসকই যে রোগীর মানসিক অবস্থা বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন, ইহা অবশ্য আশা করা যায় না। তবে চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে পরস্পরের সহিত একটা বিশ্বাসের সম্বন্ধ ঘটিলে রোগী এমন অনেক কথা চিকিৎসকের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে, যদ্দ্বারা চিকিৎসক তাহার মানসিক অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইবেন। মানসিক চিকিৎসায় সফলতা লাভের পক্ষে তাহা ভিত্তির কার্য্য করিবে।

ইহা গেল রোগীর ব্যক্তিগত ব্যবস্থা। তাহার পর রোগীর পরিবারবর্গ আছেন। তাঁহাদের মধ্যেও চিকিৎসকের সুবিশাল কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে। পুরা-কালে অনেক চিকিৎসক বহু পরিবারের পারিবারিক চিকিৎসক (family physician) রূপে কার্য্য করিতেন। সেই সকল চিকিৎসক প্রায়ই রোগীর পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির নাড়ী নক্ষত্র, ধাত প্রভৃতি সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিতেন। এখন পারি-বারিক চিকিৎসক নিয়োগ প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় চিকিৎসকের কার্য্যক্ষেত্র যেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে, রোগীর ও তাহার পরিবারবর্গের ধাত প্রভৃতি জানা না থাকায়, সুচিকিৎসাও তদ্রূপ ব্যাহত হইয়াছে। পারিবারিক চিকিৎসক অনেক সময়ে সাধারণ কথাবার্ত্তা হইতে রোগীর পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যের অবস্থার ইঙ্গিত পাইয়া রোগের আক্রমণের পূর্ব্বেই তাহা নিবারণের ব্যবস্থা করিবার সুযোগ পাইতে পারিতেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় চিকিৎসক সে সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়াছেন। সেই জন্য পূর্ব্বাহ্নে রোগ প্রতিষেধের ব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কোন বয়স্ক লোকের পীড়ায় চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া পারিবারিক চিকিৎসক ছেলেমেয়েদের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার খবর পাইতেন এবং তাহার প্রতিকারের সম্বন্ধেও উপদেশ দিতে পারিতেন। তদ্রূপ, কোন শিশুর চিকিৎসার্থ আহূত হইলেও তিনি অপর কোন শিশুর বা বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ক্ষুণ্ণ অবস্থার পরিচয় পাইতে পারিতেন, এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা করাও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত না। রোগ নিবারণ যদি চিকিৎসার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে গোড়া হইতে সাবধান হইতে পারিলে যতটা সুফল লাভের আশা করা যায়—রোগ প্রবল হইবার পর সহস্র চেষ্টাতেও ততটা সুফলের আশা করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায়, রোগ দুরারোগ্য হইবার পর চিকিৎসক আহূত হন। সে স্থলে রোগীর মৃত্যু হইলে চিকিৎসক বৃথা অপযশের ভাগী হন, এবং একটী মানবজীবন বৃথা নষ্ট হয়। সময় মত চিকিৎসা হইলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা পাইতে পারে। এই সকল স্থলে সাধারণতঃ রোগীর বা তাহার পরিবারের লোকদের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া চিকিৎসক অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করেন। রোগী বা তাহার পরিবারবর্গ চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই; তাহারা ত রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞ হইবেই; এবং সেই জন্যই না তাহারা কৃতবিদ্য চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকে! তাহারা নিজেরা যদি রোগের গতিবিধি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকিত, তাহা হইলে নিজেরাই ত চিকিৎসাও করিতে পারিত—চিকিৎসককে আহ্বান করিবে কেন? চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য রোগের সকল সংবাদ রাখা, এবং পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান হওয়া—যাহাতে লোকে রোগাক্রান্ত না হয়; অথবা আক্রান্ত হইলেও, রোগ প্রবল হইবার পূর্ব্বেই চিকিৎসা করিয়া নিরাময় হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, রোগীর অপেক্ষা চিকিৎসকের দায়িত্বই অধিক, এবং তাঁহারই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

যুবক বঙ্গের পরিণাম

[কবিরাজ শ্রীশিবশঙ্কর সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী]।

বাঙ্গালী আজ তালপাতার সিপাহী। বাঙ্গালার দিকে আজ সত্যকার অনুভূতি লইয়া চাহিয়া দেখিলে দেখিবেন, নানাবিধ রোগ আজ বাংলার যুবকের উপরে মনের হর্ষে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। বাঙ্গালী আজ স্বাস্থ্যহীন, বিষাদের জীবন্ত মূর্ত্তি। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আজ চিতাভস্ম পরিপূর্ণ শ্মশানভূমি। তাই আজ যাহারা ছোট ছোট সোনার পুতলি—ভবিষ্যতের আশা ভরসা তাদের মানুষের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে কেতাবের বোঝা বগলে চাপাইয়া ডিগ্রির মায়া কাটাইয়া অভিভাবকদের দেখিতে হইবে, কিসে তাদের সোনার বাদুরা স্বাস্থ্যবান হয়।

আমাদের এই দুগ্ধপোষ্য শিশুদের স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ কি জানেন? সঙ্গ দোষে ইঁচড়ে পাকা বা আমাদের প্রাণ যে শুক্র তাহার পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি বা পরিপক্ক হওয়ার পূর্ব্বেই অস্বাভাবিক উপায়ে তাহার অপব্যয় করা। এ বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে জানি অনেকেই আমাকে জাহান্নমে যাইতে আশীর্ব্বাদ করিবেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আপনার ছেলেদের সরস্বতীর বরপুত্র করা যেমন আপনার কর্ত্তব্য, তারা যাতে স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন পূর্ব্বক রোগ নিবারণ করিয়া দীর্ঘ যৌবন ও প্রস্তরবৎ দৃঢ় দেহ লইয়া অজরার মধ্য দিয়া অপ্রতিহত গতিতে আপনার জীবন যাপন করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে তাহা কি আপনার ঈপ্সিত বস্তু নহে? আজ যে ছেলের গোলাপি গণ্ডের উজ্জ্বল সুষমা দেখিয়া এবং সমুদায় মুখাবরণে কমনীয় পবিত্রতার স্নিগ্ধ প্রভাব দর্শনে আপনি মোহিত হইতেছেন, কাল যখন দেখিবেন তার গণ্ডের পদ্মরাগ তুল্য আভা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, সমুদায় মুখে কেমন একটা অন্ধকারের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে, তার চেহারা নিরানন্দের ছবি, চাহনি নিরাশার অভিব্যক্তি, তখন কি আপনার প্রাণ একটুও বিচলিত হইবে না? অনেক অভিভাবকই তাদের বংশধরগণের কু-অভ্যাসের বিষয় অবগত আছেন; কিন্তু এরূপ অশ্লীল বিষয় কিরূপে তাদের শ্রুতিগোচর করাইবেন, লোকে শুনিলেই বা কি বলিবে, নিজের ছেলেই বা কি মনে করিবে, ইহা ছাড়া নিজের সম্মানেরও যথেষ্ট লাঘব হইবে, ইত্যাদি সাত পাঁচ ভাবিয়া তাঁহারা নিষ্ক্রিয় ভাবে নিজের ফরাসের উপর ফরশীর নল টানিতেছেন। আমার মনে হয়, ছেলেদের পুঁথিগত বিদ্যায় বিদ্যার ঐরাবত তৈয়ার করা অপেক্ষা মানবধর্ম্মের "ক" "খ" শিক্ষা দেওয়াও অভিভাবকদের অল্প কর্ত্তব্য নহে। এই শিক্ষার অভাবে আমাদের সুকুমারমতি শিশুগণ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বেই অজ্ঞতার দুয়ারে আত্ম-বিক্রয় করিয়া, আত্মশক্তির যথেচ্ছ অবমাননা করে; এবং পরিণামে যৌবনের আগমনে জীবনটা যেন একটা বিদ্রূপের মত বোধ হয়। সে বুকভরা জমাট দীর্ঘশ্বাস লইয়া উন্মত্ত মৃগের নাভিস্থিত মৃগনাভি অন্বেষণে কিসের এবং কাহার আস্বাদে উদাসীনের ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়, তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না। পরিশেষে জীবনের বোঝা বহিতে অক্ষম হইয়া সে জীবন্মৃত অবস্থায় সর্ব্বদাই এক অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাল কাটাইতে থাকে। এ সম্বন্ধে আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক সিলভেনাস ষ্টল (Sylvanus S all D. D) বলেন—The most fruitful source of self-pollution is ignorance. If parents were faithful in the discharge of their duties to their children in this respect, the evil would be generally corrected. The silence of most parents is both foolish and culpable. ইহার মর্ম্মার্থ :—অজ্ঞতাই অবৈধ বিন্দুপাতের জনক। এই বিষয়ে যদি প্রত্যেক পিতামাতা তাহাদের সন্তানের প্রতি স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহা হইলেই ছেলেদের এই কু-অভ্যাস সংশোধিত হইতে পারে। এই বিষয়ে জনক জননীর নির্ব্বাক থাকা মূর্খতা এবং ছেলেদের অধঃপাতে প্রেরণের সহায়ক।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলেন "মরণং বিন্দু পাতেন, জীবনং বিন্দু ধারণাৎ"। বিন্দুপাতই মৃত্যু। সেই বিন্দুপাত যদি হস্তমৈথুনাদি অস্বাভাবিক উপায়ে সাধন করা যায়, তাহার পরিণাম কিরূপ অচিন্তনীয় ভীষণ। শুক্রই জীবন—ইহা সমুদায় রস এবং ধাতুর সার। দুগ্ধে যেমন ঘৃত অন্তর্নিহিত আছে, ইক্ষু রসে যেমন চিনি অব্যক্তভাবে সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া থাকে, শুক্রও সেইরূপ আমাদের সমুদায় দেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে। সামান্য মথনেই যেরূপ দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শৈশবে সামান্য উত্তেজনায় যথেষ্ট পরিমাণ শুক্র আমাদের দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া সারশূন্য খোল পড়িয়া থাকে। কাজেই যৌবনের প্রারম্ভে যখন সদ্যপ্রস্ফুটিত একটী নূতন ফুল অনন্ত আশা এবং আকাঙ্ক্ষার ডালি লইয়া তাহার চরণে অর্ঘ্য দিতে উপস্থিত হয়, তখন দুদিন যাইতে না যাইতেই তাহার হিমাচলের ন্যায় অবিচলিত বিশ্বাসে কঠোর কুঠারাঘাত পতিত হইতে থাকে। তখন তাহার ভবিষ্যৎ জীবনও স্বপ্নময়—কেবলই স্বপ্নময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এদিকে নূতন কুসুমটিকে যখন আমরা জীবন-সঙ্গিনী করিতে প্রয়াস পাই—যখন সেই আদরের কুসুমটীকে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করিতে ব্যগ্র হই, তখন অতি পীড়নে যেমন ইক্ষু হইতে রস নির্গত হইতে চাহে না, সেইরূপ আমরাও দেখিতে পাই যে, আমাদের রস পূর্ব্বাহ্ণে প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—আমরা "শৈশবে করিয়া ব্যয়" যৌবনে কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং নূতনকে অভিনন্দিত করিবার উপযোগী উপাদান আমাদের ভাণ্ডারে বিশেষ কিছুই নাই। এ অবস্থাও কাহারও কাহারও বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অবশেষে ধ্বজভঙ্গরূপ মহাব্যাধিতে নিজেকে এবং আর একটী প্রাণীকে সারা জীবনের জন্য নৈরাশ্যের তপ্তশ্বাস বুকের ভিতর চাপিয়া রাখিতে হয়। এই তপ্তশ্বাস অন্তর্ধূমায়িত হইয়া কখন কখন এরূপ ভীষণ প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত করে যাহা লিপিবদ্ধ করিতে কলম আপনিই থামিয়া যায়। তাঁহারা হয় তো এক দিন দেশের উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিত, তাহারাই আজ এই কু-অভ্যাসের পরিণামে উন্মাদ হইয়াছে; কেহ বা নৈতিক হিসাবে আত্মহত্যা করিয়া বসিয়া আছে। এই কু-অভ্যাসের পরিণামে আমাদের চিত্ত দুর্ব্বল অব্যবস্থিত, ধমনী বিকল এবং মাংসপেশী শিথিল হয়। অন্তরাগ্নির অনুদ্দীপন, প্রভাব, বর্ণ ও স্বরের বিকৃতি, শরীর অসংহত এবং ইন্দ্রিয় সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই কু-অভ্যাস পরিপুষ্টির প্রথম এবং সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ হইতেছে মাথাধরা; সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় কাজে অনুৎসাহ। বালক যখন ইন্দ্রিয়-সেবনে আর একটু অভ্যস্ত হইল, তখন দেখিবেন, সে তাহার লেখাপড়ায় চিত্ত স্থির রাখিতে পারিতেছে না। যে দুদিন পূর্ব্বে তোতাপাখীর ন্যায় মুখস্থ করিতে পারিত, আজ তাহার কিছুই মনে থাকিতে চাহে না। শিক্ষক পঁচিশবার পড়া বুঝাইয়া দিলেও তাহার বোধ শক্তিতে যেন কুলায় না। কোন পুস্তকই দীর্ঘকাল মনোনিবেশ করিয়া সে পাঠ করিতে পারে না এবং কোন কার্য্যেই ধৈর্য্য রাখিতে পারে না। এইখানেই শেষ নয়। ক্রমাগত কদর্য্য অভ্যাসের ফলে পাকস্থলী নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে পরিপাক শক্তি একেবারে লোপ পায়। এই সময়ে তাহার চক্ষু নিষ্প্রভ, দৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন, ও নৈরাশ্য-বিজড়িত এবং সমুদায় মুখাবয়বে যেন কি এক অভাবনীয় কালিমার ছায়া বিরাজ করিতে থাকে। চিত্ত এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, সাহস এবং ভালমন্দ বিচারের শক্তি ধীরে অতি ধীরে তাহাদের অন্তর হইতে কোন এক অজানা রাজ্যে তিরোহিত হয়। এখনও সময় আছে; অবিমৃষ্য-কারী বালক এখনও ফিরিয়া চাও—এখনও সময় আছে

এখনও যদি উপেক্ষা কর তবে কোষ্ঠকাঠিন্য, হজমশক্তি লোপ, পরিণামে শূল, কোমরে বেদনা, হৃদরোগ, ধ্বজভঙ্গ, এমন কি উন্মাদ রোগ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া তোমার জীবনকে নিষ্পেশিত করিয়া একটী জড়পিণ্ডের ন্যায় তোমাকে সংসারের এক কোণে ঠেলিয়া রাখিতে পারে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ডাক্তার জে, এ, ব্রাউন তাঁহার চিকিৎসাকালীন অভিজ্ঞতা হইতে কি লিখিয়াছেন শুন—

"These results of masturbation I have seen in my own practice—involuntary emissions prostration of strength, paralysis of the limbs, Hysteria, Epilepsy, strange nervous affections, Dyspepsia, Hypochondria, Spinal disease, pain and weakness in the back and limbs, Costiveness and in fine, the long and dismal array of gastric, enteric nervous and spinal affections, which are so complicated and difficult to manage."

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশের অভিভাবকগণ অবৈধ বিন্দুপাতের উপরিউক্ত পরিণাম জ্ঞাত হইয়াও যে কোন কারণেই হউক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক বোধ করেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এ বিষয়ের প্রতিকারার্থে একদল লোক, বিশেষতঃ চিকিৎসক সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। শ্রীমতী আলিস লি মোক্ (Mrs. Alice Lee Moque) তিনটী সন্তানের মা হইয়া যাহা লিখিতেছেন তাহার মর্ম্ম এই :—* * * নির্ব্বাক, ভণ্ড লজ্জা এবং জানি না কোন্ অজ্ঞেয় সম্মোহনমন্ত্রে মূক হইয়া আমরা কত লক্ষ লক্ষ শিশুর ইহকাল পরকালের অন্তরায় হইতেছি। সুতরাং আমার শিশুকেই অবৈধ বিন্দুপাতরূপ (Masturbation) মহাপাপের কবল হইতে রক্ষা করিবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয় কপাটে সর্ব্বদাই আঘাত করিত। আমার বড় ছেলেটী যখন ষোল বৎসরে পা দিল, তখন এই মহাপাপের হাত হইতে তাহাকে সতর্ক করিতে যাইয়া দেখি, সে বহু পূর্ব্বেই এই কু-অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছে। অপর দু'টীকে সাবধান করার যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম। তখন আমার দ্বিতীয়টীর বয়স তেরো। কিন্তু হায়, অদৃষ্টের কি পরিহাস! তাহাকে উপদেশ দিতে যাইয়া দেখি, যৌবনের হাওয়া গায়ে লাগিবার পূর্ব্বেই সেও এই কুৎসিত অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়াছে। আমি হতাশ হইয়া আমার কোলজোড়া ধন অঞ্চলের নিধি দশ বৎসরের দুধের বাছার নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু, উঃ কি ভীষণ, সেও যে এই মহা রাক্ষসীর হাত এড়াইতে পারে নাই।

এই ত গেল পাশ্চাত্য দেশের চিত্র। যে দেশে ভোগ এবং লালসাই সভ্যতার নিদর্শন, যে দেশে প্রফুল্লচিত্তা বিলাসিতার নগ্নমূর্ত্তি প্রমদা মধুকরের অবাধ মনোরম গুঞ্জনে গুঞ্জরিত, যে দেশে পুরুষ এবং নরনারীর মিলন যৌন-আসক্তিরই অভিব্যক্তি—একটী চুক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়, যে দেশে আহার-বিহার চলা-ফেরা সমুদায়ই আসুরিক এবং সংযমবর্জ্জিত, তাহাদের বংশধরগণের এ প্রবৃত্তি হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু হায়, ব্রহ্মচর্য্যের লীলাভূমি, সংযম ও সাধনার পবিত্র তীর্থ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের পুণ্যভূমি ভারতে তথা বাংলায় এ কালসাপ কোন্ অজ্ঞাত পথে ধীরে ধীরে তাহার কলিজায় প্রবেশ করিয়া এখন বন্যার স্রোতের ন্যায় আমাদের ভবিষ্যতের নয়নতারা সোনার যাদুদিগকে কোন্ মহা অন্ধকারে ভাসাইয়া লইতেছে! হায়, এ স্রোত প্রতিরোধ করার কি কোনই উপায় নাই? একবার ভাবিয়া দেখুন যে দেশে ভীম, অর্জ্জুনের ন্যায় বীরের জন্ম, সে দেশের ছেলেদের আজ বীরের কাহিনী বলিতে হইলে নেপোলিয়ান নেলসনের জীবন-বৃত্তান্তই বলিতে হয়। আমাদের দেশে যে বীর জন্মিতে পারে, ইহা তাদের স্বপ্নাতীত বলিয়া বোধ হয়—ভীম, অর্জ্জুনের কথা তাদের নিকট উপকথা মাত্র।

এক্ষণে, এই কু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে আমাদের যে রণ-সজ্জা সজ্জিত করা উচিত এ কথা বোধ হয় কেহ

অস্বীকার করিবেন না। এ সম্বন্ধে কিরূপে দেশবাসীর প্রস্তুত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে Bernarr Macfadden বলেন—In the name of decency, of humanity, of common kindness, I bid you, parents and guardians and teachers, if you have one atom of truth, of honor, of love in your hearts, warn your boys—and your girls, too—of the frightful evil in question (masturbation) so that they may learn to hate and shun it.

আমিও Mr. Macfadden এর সহিত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সমস্বরে বলি, আমাদের অভিভাবকদের আর ঘুমাইবার সময় নাই। তাঁহাদের এ ব্যাধির প্রতিকারের জন্য গাত্রোত্থান করিতে হইবেই। কিন্তু ইহার উপায় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীদিগের সহিত সকল বিষয়ে আমি একমত হইতে পারি না। আমার মতে, যাহাতে শিশুদের ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয় তাহার জন্যই আমাদের সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহার একমাত্র উপায় সর্ব্ব বিষয়ে আত্ম-সংযমী হওয়ার শিক্ষা দান। এই আত্ম-সংযমী সন্তান প্রস্তুত করার উপায় কি? উপায়—ধর্ম্ম শিক্ষা।

বাস্তবিকই ধর্ম্ম-বর্জ্জিত শিক্ষা শিক্ষাই নহে। ইহা শিক্ষার দোহাই দিয়া কতকগুলি অত্যাচারী এবং দেশ-দ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল যুবক তৈরী করা মাত্র। ইহারা আহারে-বিহারে দৈনন্দিন সর্ব্ববিধ কার্য্যে নানারূপে সংযমহীন হইয়া দৈহিক এবং মানসিক অবনতির সোপানে যেরূপ দ্রুত অবতরণ করিতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে এ জাতের অস্তিত্ব থাকিবে কি না কে বলিতে পারে? এই মেরুদণ্ডহীন যুবকবৃন্দ বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। আমাদের বংশধরদের মানুষ তৈয়ার করিতে হইলে অন্যান্য শিক্ষার ভিতর দিয়া ধর্ম্মশিক্ষা এবং ধর্ম্মালোচনায় আর উপেক্ষা করা উচিত নহে। মিশনারি বোর্ডিংএ থাকিলে যেমন জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই বাইবেল পড়িতে হয়, সেইরূপ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে যে সমুদায় কলেজ হোষ্টেল আছে, তাহাতে হিন্দু ছেলেদের গীতা, ব্যায়াম প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং মুসলমান ছাত্রদের কোরান সরিফ প্রভৃতি পাঠের ব্যবস্থা নাই কেন? কিন্তু মাথা থাকিলে তো মাথা ব্যথা? আবার, আমাদের ছেলেবেলায় মা, দিদিমা, প্রভৃতি প্রাচীনাদের নিকট সান্ধ্য আহার সমাপনান্তে উপকথা শুনার মধ্য দিয়া যে সমুদায় ধর্ম্মনীতি এবং সদুপদেশ অনন্য চিত্তে শ্রবণ করিয়াছি, আজকালকার মা লক্ষ্মীদের তো সে সমুদায় গল্প বলিতে শোনা যায় না। আমাদের মা লক্ষ্মীরা যে আজ কাল শিক্ষিতা। সুতরাং কাশীদাসী, কৃত্তিবাসী গুলিখোরী গল্প তারা জানিবে কোথা হইতে? কিন্তু জানবেন, "Old fools" দের দ্বারস্থ হইতে হইবে, আবার শিশুদের হাতে ধর্ম্ম-নীতি পুস্তক দিতে হইবে আবার মেয়েদের আদর্শ শিক্ষা দিতে হইবে, তাদের বিদ্যাটা Dressএ আবদ্ধ না রাখিয়া তাদের আদর্শ জননী করিয়া গড়িতে হইবে। তবেই 'ঘরে ঘরে বেদগান শুনা যাইবে। জাতির প্রাণে শক্তি আসিবে, তা দেখিয়া আমাদের সন্তানগণ সংযত হইয়া আদর্শ যুবক হইতে পারিবে।

দ্বিতীয়তঃ আজ যে আকাঙ্খা ও অভ্যাস জীবনকে চুম্বকের ন্যায় চুষিয়া অন্তঃসারশূন্য করিয়া বিষাদের ফটো হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত করিয়াছে, আজ যে আকাঙ্খা সৌন্দর্য্যে পূর্ণচন্দ্ররূপে আমার অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ-পূর্ব্বক আমাকে জরাগ্রস্ত ও নিঃশেষ করিয়া পরিত্যক্ত প্রেতিকের মত পথের কাঙ্গাল করিয়াছে, আজ যে আমাকে অনন্ত বিষাদ সলিলে ডুবাইয়া দিয়াছে, ইচ্ছা করিলে কালই—নিজের আকাঙ্ক্ষাকে একটু সংযত করিতে পারিলে—উপরিউক্ত কু-অভ্যাস ও তাহার পরিণাম দুঃখ দৈন্য নিরাশাকে ভ্রূভঙ্গীতে উপেক্ষা করিয়া জীবনকে আবার মঙ্গলময়, আনন্দময় ও উজ্জ্বলময় করিতে পারি। এই আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করার মূল আমাদের মন। আমরা যদি মনের দাস না হইয়া মনকে আমাদের দাস করিতে পারি, তবে কু-অভ্যাস ত্যাগ করিতে বা তাহার বিষময় ফলের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার যৌবনকে বরণ করিয়া লইতে বেশী

সময়ের আবশ্যক হয় না। যৌবনকে আঁকড়াইয়া রাখা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম-জীবনের সার্থকতা, আর জরাই জীবনের পাপ। মনই যখন সমুদয় পাপ-পুণ্যের আধার তখন কি করিয়া মনকে নিজের দাস করিয়া রাখা যায়? ইহার একটি প্রকৃষ্ট উপায় মনকে সর্ব্বদাই নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় কোন না কোন কাজে ব্যস্ত রাখা। যদি তোমার মনে কোন কু-আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তবে তখনই যদি 'মা' "মা" বলিয়া ডাকা যায়, বা কায়মনোবাক্যে ইষ্ট দেবতাকে ডাকা যায়, তবে কি সেখানে কোন পাপ তিষ্ঠিতে পারে? ইহা বলা যত সহজ কার্য্যে পরিণত করা অবশ্য তত সহজ নয় সত্য, কিন্তু অভ্যাসের নিকট অনেক অসাধ্যও অতি সহজ সাধ্য হয়। সুতরাং ইচ্ছা অভ্যাস এবং মনঃসংযম এই তিনটী এই বিকট রোগের উপযুক্ত ঔষধ। আত্ম-জয়ের অধিকার জন্মিলে সেখানে কোন পাপ, দুঃখ, দৈন্য, নিরাশা থাকিতে পারে না। যাহারা আত্মজয়ী তাহারা যৌবনকে চির অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তাহারা দীর্ঘজীবী হয়, তাহারা অমৃতের উৎস হয়।

তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিতে হইবে। শয্যা ত্যাগ করিয়া নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের পর কিছুকাল গীতা প্রভৃতি পাঠ এবং ভগবান সমীপে প্রার্থনা ও তৎপর প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হওয়া উচিত। ভ্রমণ শেষ হইলে কিছুকাল বিশ্রামের পর সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা জলে স্নান, আর্দ্র গামছা দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক বেশ করিয়া শরীরের লোমকূপগুলি পরিষ্কার করিতে হইবে। তৎপর শুষ্ক গামছা দ্বারা পুনরায় শরীর মুছিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, আমাদের বসন ভূষণ সম্বন্ধেও সতর্ক হইতে হইবে। আমরা বিলাতি ঢংএ সজ্জিত হইতে যাইয়া একেবারে ভুলিয়া যাই যে, এটা বিলাত নয়, এটা বাংলা। এখানে ভোরের বেলায় বরফের তুষার পতিত হয় না বরং সূর্য্যদেবের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে গরমে আমাদের ত্রাহি মধুসূদন বলিতে হয়। এখানে মোজা, কোট, প্যাণ্ট, প্রভৃতি গরম এবং আঁটা পোষাকে আমাদের কি যে অনিষ্ট করিতেছে, তাহা বিশদভাবে লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যক। এই বিদেশী পোষাক ভঙ্গিতে যাইয়া কতজন যে রসাতলে যাইতে বসিয়াছে এবং স্বাস্থ্যটীকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। খালি গায়ে থাকিতে পারিলেই সব চেয়ে ভাল, নতুবা যত কম পোষাকের ব্যবহার হয় ততই মঙ্গল। আর মাঝে মাঝে মুক্ত বায়ু সেবনে যথেষ্ট উপকার দর্শে।

পঞ্চমতঃ, আমাদের মিতাহারী হইতে হইবে। পিঁয়াজ, রসুন, চা প্রভৃতি উষ্ণ বীর্য্যশালী আহার ত্যাগ অবশ্যই করণীয়। দিবসে দুইবারের অধিক আহার করা উচিত নয়। প্রথমবার দ্বিপ্রহরে এবং দ্বিতীয়বার সন্ধ্যার পরই আহার করা উচিত। রাত্রের আহারের অন্ততঃ ৩.৪ ঘণ্টা পর শয়ন করিতে পারিলে ভাল হয়। আহারের সময় আহার্য্য সামগ্রী উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করা বিধেয়। আহারের সময় জলপান না করিয়া আহারের অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পরে যথেষ্ট পরিমাণ জলপান বিধেয়। জল পিপাসা না পাইলেও ৩।৫ দিন ঐরূপ ভাবে জলপান করিলেই অভ্যাসে পরিণত হয়।

ষষ্ঠতঃ, ঘুম না পাইলে শয্যায় যাইবে না। শয্যায় দীর্ঘকাল এ-পাশ ও-পাশ করিলে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য আসিতে পারে। সময়মত নিদ্রা না পাইলে কিছুকাল বেড়াইয়া আসিবে। ইহাতে শরীর যখন অবসন্ন হইয়া পড়িবে তখন শয্যায় যাইয়াই নিদ্রা যাইবে। ইহাতেও যদি নিদ্রা না আসে এবং মাথা গরম বোধ হয়, তবে শীতল জলে বেশ করিয়া হস্তপদ এবং মুখ প্রক্ষালন করিয়া শয্যায় যাইবে এবং মনে মনে "মা" "মা" বলিয়া ডাকিবে বা কোন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে। শয়ন ঘরের কক্ষে যাহাতে প্রচুর পরিমাণ বায়ু সঞ্চালন হইতে পারে, তজ্জন্য জানালা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখিবে।

উপরিউক্ত নিয়মগুলি পালন করিতে পারিলে আমার বিশ্বাস অতি অল্প সময়েই আমরা অবৈধ বিন্দুপাতরূপ ভীষণ তাড়কা রাক্ষসীর কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারি। আবারও বলি এই সমস্ত উপায়ই ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার এবং নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইবার প্রকৃষ্ট অস্ত্র।

মহাব্যাধি বা কুষ্ঠ।

[ডাক্তার—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্- এম্-এস্।]

ব্যারাম সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির ঔদাসীন্য।

যে ব্যারামের নাম শুনিলে, লোকে ঘৃণায় শিহরিয়া উঠে—এ সেই ব্যাধি। যে ব্যাধি সন্তানের দেহে হইলে মাতাও মনে-প্রাণে নিজ সন্তানের সঙ্গ ত্যাগের কামনা করেন—এ সেই ব্যাধি। যে ব্যাধি কাহাকেও ধরিলে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে, এ সেই ব্যাধি—ব্যাধির শ্রেষ্ঠ—মহাব্যাধি।

অধিকাংশ ব্যারামগ্রস্তকে সেবা করিতে ও সুস্থ করিতে, সকলে না হউক, বহুলোক অগ্রসর হয়; কিন্তু ক্ষয়কাশগ্রস্ত ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীকে সকলেই দূরে রাখিতে চায়, এবং কেহ কেহ মনে মনে তাহাদিগের ধ্বংসও কামনা করে,—কেন না ঐ রোগ দুরারোগ্য বা অসাধ্য এবং ঐ রোগীরা তাহাদিগের বাসস্থান, ব্যবহারের জিনিষপত্র সমস্তই ঐ রোগদুষ্ট করিয়া ঐ ব্যারামের জীবন্ত আড়ৎরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, যতদিন বাঁচে, ততদিনই চতুর্দ্দিকে ঐ ব্যারামের বীজ ছড়াইতে থাকে।

কুষ্ঠ যাহাকে ধরে, অতি সহজেই তাহার অঙ্গবিকৃতি ঘটায়—সময়ে সময়ে ভয়াবহ আকারে সমস্ত মানুষটাকেই পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে! এমনভাবে দেহের বিকৃতি ঘটায় যে স্ত্রী স্বামীকে দেখিয়া ভয় পায়!

যে ব্যাধি দুঃসাধ্য, যে ব্যাধি মানুষের আকৃতি পর্য্যন্ত বিকৃত করে, যে ব্যাধি সহজেই চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হয়—এক কথায়, সকল রকমেই যে ব্যাধি ভয়ঙ্কর, তাহা যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তির হয়, সে যে সুধু মর্ম্মে মরিয়া যায় তাহা নহে, সে অশেষ প্রকারে তাহার ব্যারাম গোপন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পায়। আরো দুর্ভাগ্যের কথা, অপর ব্যারামের ন্যায়, এই ব্যারামের প্রথমাবস্থাতেই ইহা সহজ-সাধ্য;—তখন সামান্য চেষ্টা করিলেই, এই ব্যারামকে নির্দ্দোষরূপে সারান যায়। কিন্তু, প্রথমাবস্থাতে অনেকে এ ব্যারামকে চিনিতে পারে না বলিয়া, না জানিয়া কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করে; এবং রোগী স্বেচ্ছায় বা অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম হিসাবে, সমাজে অবাধে ভ্রমণ করে! কাযেই, যে সময়ে রোগী না জানিয়া সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে, যে সময়ে তাহার রোগকে সে ব্যক্তি বা অনেক সাধারণ চিকিৎসকও ধরিতে পারেন না, অথচ যে সময়ে এই ভীষণ রোগকে সামান্য চেষ্টায় সমূলে বিনাশ করা সম্ভবপর—সেই অমূল্য সময় হেলায় নষ্ট হইয়া, ভবিষ্যতের অনিষ্ট পাতের সূচনা করিয়া থাকে।

ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও ক্ষোভের কথা—আমাদিগের মানসিক অবস্থার শোচনীয় মৃতকল্প অসাড়তা! জাতি হিসাবে আমরা এক সঙ্গে ভাবনা ও মনন করিতে ভুলিয়া গিয়াছি; এবং ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকেই মনকে অদৃষ্টবাদিতা ও স্বার্থপরতার জাঁতাকলে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিয়াছি। অথচ, বর্ত্তমান জগতে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত, এক সমাজ অপর সমাজের সহিত, এক দেশ অপর সকল দেশের সঙ্গে এরূপ অঙ্গাঙ্গী ভাবে ঘনিষ্ঠরূপে বিজড়িত, যে একের সুখে বা দুঃখে অপর সকলেই সুখী বা দুঃখী হইতে বাধ্য। অথচ আমাদের "গা তাতে না," আমরা এ সকল আদান প্রদান ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহ, নিস্পন্দ ও নিঃসাড়।

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আজ হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্ম তাহার আচার-বিচারের মধ্যে নিহিত। আজ ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণকে স্পর্শ তো করেনই না, তাহার ছায়া মাড়াইতেও ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু যদি কোন গ্রামের কোনও মেথর বা ডোমের ঘরে ওলাউঠা বা ইচ্ছাবসন্ত রোগ দেখা দেয়, তখন যদি সেই গ্রামের সকলেই সেই মেথর বা ডোমের ছেলেটির আরোগ্য লাভে সচেষ্ট না হন, তাহা হইলে, সেই আচার-নিষ্ঠার দণ্ড স্বরূপ, সেই হৃদয়হীন অস্পৃশ্যতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, ঘরে ঘরে ওলাউঠা ও বসন্ত ব্যাধি ছাইয়া পড়ে—গোঁড়ামীর অনেক মাশুল আদায় করিয়া তবে ব্যারাম শান্ত হয়। আজ আর বর্ত্তমান যুগে 'আমি'-সর্ব্বস্ব হইয়া কাহারও থাকিবার যো নাই; একের দুঃখে অপরকে অবহিত হইতেই হইবে—নতুবা দুঃখের চরম সীমায় পড়িতে হইবে।

এই সোণার বাঙ্গালা যে সর্ব্বপ্রকার ব্যারামের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে—বাঙ্গালায় যে ব্যারাম প্রবেশ করে সেই ব্যারামই যে বাঙ্গালার অনুকুল জল-হাওয়ায় বাড়িয়া যায়—তাহার মূলে বাঙ্গালা দেশের হাজা-মজা নদী থাকিলেও, বাঙ্গালীর অদূরদর্শিতা তাহার জন্য কম দায়ী নহে। হিন্দু বাঙ্গালী যদি সকলেরই সঙ্গে এক নাড়ীতে বাঁধা বলিয়া আপনাকে কার্য্যতঃ অনুভব করে, তবে আজ বাঙ্গালায় আবার সোণা ফলে। বাঙ্গালী যদি কথামালার "উদর ও অন্যান্য অবয়বের" রূপকথাটি বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে যদি বোঝে যে জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে ব্যারামী মাত্রই সকলের সহানুভূতি ও সতর্ক দৃষ্টির উপযুক্ত পাত্র এবং যাহারই ব্যারাম হউক, ব্যারামের অঙ্কুরেই তাহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য সমগ্র সমাজেরই অবহিত হওয়া চাই—তাহা হইলে আজ বাঙ্গালা দেশের চেহারা বদলাইয়া যায়। যেমন কোথাও সামান্য গলিত শব থাকিলে তাহার দুর্গন্ধ হইতে চতুর্দ্দিকের বায়ু দূষিত হয়, তেমনি যে কোনও ব্যারাম হউক না কেন, ব্যারামী মাত্রেই ব্যারামের বিষ ছড়াইবার আড্ডা—এ কথাটি আমরা ভুলিয়া যাই কেন?

শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন—বহু ভদ্র সন্তান, বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আজ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া, ব্যারামকে গোপন করিয়া—সমাজে, আফিসে, পথে ঘাটে অবাধে বিচরণ করিতেছেন এবং সমাজকে বিপন্ন করিতেছেন। মনে করিবেন না যে, সামান্য দু দশটা যা ভিখারী দেখেন, কুষ্ঠ সুধু তাহাদেরই মধ্যে আছে; তাহা নয়—এই কলিকাতার বহু পল্লীতে প্রচ্ছন্নভাবে অনেক ভদ্র সন্তানও কুষ্ঠগ্রস্ত থাকিয়া বিচরণ করিতেছেন। আর ভদ্র সন্তানই হউন আর তথাকথিত "ছোটলোকই" হউক, ব্যারাম ছড়াইবার বিষয়ে, উভয়েই তুল্য মূল্য। এ কথা যতদিন আমরা প্রত্যেকে না বুঝিতেছি ততদিন আমাদিগের ভদ্রস্থতা নাই।

আজ তাই যাহাতে অসাড় মৃতকল্প সমাজে কিঞ্চিৎ চেতনাও জাগাইতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে কুষ্ঠব্যাধি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিব।

কুষ্ঠ রোগের কারণ কি?

কবিরাজী শাস্ত্র মতে, বিরুদ্ধ ভোজন (এক সঙ্গে দুধ ও মাছ বা মাংস ভক্ষণ), মলমূত্রাদির বেগধারণ, অপরিমিত ভোজনানন্তর ব্যায়াম, অতিশয় আতপ-ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত হইবার পরেই শীতল জল পান, দিবানিদ্রা, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, অম্ল, মাসকলাই মূলা, পিষ্টান্ন, তিল, দুগ্ধ ও গুড়ের অতি সেবন প্রভৃতি নানা কারণে কুষ্ঠ রোগ হয়। কি কবিরাজী, কি এলোপ্যাথি, কোনও শাস্ত্র গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গো-মাংস ভক্ষণে কুষ্ঠ হয় এ কথা স্বীকার করেন নাই। পাশ্চাত্য এলোপ্যাথি মত, অর্দ্ধপচা মাছ ভক্ষণই ইহার কারণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কারণ দেখা গিয়াছে যে, সমুদ্র ও নদীর কুলে যাহাদের বাস, এবং যাহারা মাছের—বিশেষ করিয়া "শুঁটকি" মাছের—ব্যবসায় করে, প্রায়শঃ তাহাদেরই মধ্যে এই ব্যারামের আধিক্য লক্ষিত হয়। এমন দেখা গিয়াছে যে—যে দেশে মাছের ব্যবসায় ছিল না এবং কুষ্ঠ

রোগীও ছিল না, তেমন স্থলে উক্ত ব্যবসায়ের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্যারামও দেখা দিয়াছে। যে মাছ একেবারে পচিয়া গিয়াছে বা যে মাছ ভাল আছে তাহা ভক্ষণে প্রত্যবায় নাই; কিন্তু যে মাছ মাত্র পচিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যেখানে সেই মাছ কম পরিমাণে লবণ সংযোগে ব্যবহৃত হয় সেখানেই কুষ্ঠ হয় বলিয়া জোনাথান্ হাচিন্সন্ বলেন। তাঁহার মতে, তাজা মাছ ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবণ ব্যবহার-কারীদের মধ্যে এ ব্যারাম লক্ষিত হয় না—বিপরীত অবস্থাগত লোকদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু হাচিন্সন সাহেবের এ কথা সকলে মানেন না। কেহ কেহ বলেন রজকদিগের মধ্যে এ ব্যারাম প্রবল।

অতীব প্রাচীন কাল হইতেই এ ব্যারামের উল্লেখ দেখা যায় এবং বহু শত বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যারামের যেরূপ গতি বা প্রকৃতি ছিল, আশ্চর্য্যের বিষয়, এখনো তাহা সবই ঠিক্ ঠিক্ তেমনি আছে। এ ব্যারাম পূর্ব্বে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় দেশেই ছিল; শীত-প্রধান দেশে, ইহা প্রায়শঃ দরিদ্রদিগকেই আক্রমণ করিত এবং ক্রমশঃ এই রোগ আপনা আপনিই লোপ পাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে, উহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ধনী, দরিদ্র, ইতর ভদ্র সকলেরই মধ্যে লক্ষিত হয়। শীতপ্রধান দেশসমূহ হইতে এ ব্যারাম আপনিই তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে হয় নাই। কোন বয়স বা জাতি বিশেষ যে ইহার লক্ষ্যস্থল, তাহা বলা যায় না। সত্য কথা বলিতে কি, কুষ্ঠরোগ কেন যে হয়, তাহা বলা যায় না। তবে এইটুকু আন্দাজ হয় যে, পরস্পর স্পর্শ হইতে যত না হউক, খাদ্য দ্রব্যের সাহায্যে ইহার বিষ দেহে নীত হয়।

এ ব্যারাম কি কুলগত? ইহার উত্তরে বলা যায়,—না। যদি কুষ্ঠগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানকে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই, স্থানান্তরিত করা যায়, তবে সে সন্তান আজীবন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইতে পায় না। ক্ষয়কাশের বেলাতেও ঠিক্ এই কথা খাটে। বস্তুতঃ, ক্ষয়কাশ ও কুষ্ঠরোগ, অনেক বিষয়ে যেন সহোদর ভ্রাতার ন্যায় সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন।

তবে কুষ্ঠরোগের কারণ কি? কুষ্ঠরোগের আসল কারণ একটি জীবাণু—হ্যান্সেনের ব্যাসিলাস্। কোনও কোনও মনীষীর মতে এমন বলা যায় না যে, এই জীবাণুকে না পাইলে কুষ্ঠ বলা যায় না। অর্থাৎ, আমরা হ্যান্সেনের কথা মানিয়া লইলাম মাত্র; যেহেতু, তাঁহার জীবাণুকে রীতিমত করিয়া চাষ (cultivate) করাও সম্ভবপর হয় নাই; এবং উক্ত জীবাণু কোনও প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া, তদ্দেহে ঐ ব্যারাম উৎপাদন করাও সম্ভবপর হয় নাই। অতএব, কি করিয়া যে রুগ্ন ব্যক্তির দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে ঐ ব্যারাম নীত হয়, তাহা আমরা ঠিক্ করিয়া বলিতে অপারগ। যেহেতু, বার বার দেখা গিয়াছে যে, স্বামীর হইলেও স্ত্রীর এ ব্যারাম হয় নাই; অথচ, এক মায়ের দ্বারা লালিত সব ছেলেগুলিরই এ ব্যারাম হইয়াছে। এই জন্য সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে যে,—

(১) হ্যান্সেনের জীবাণু ব্যতীত আরো কিছু কারণ থাকা অসম্ভব নয়;

(২) খুব সম্ভব, খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গেই কুষ্ঠরোগের জীবাণু সুস্থ দেহে নীত হয়। এই জন্য কুষ্ঠরোগীর স্পৃষ্ট কাঁচা বা রন্ধন করা খাদ্য ভক্ষণে প্রত্যবায় আছে।

(৩) কাহারো মতে নাসিকার শ্লেষ্মার সঙ্গে এই ব্যারাম দেহে নীত হয়।

এইবার এ ব্যারামের লক্ষণ সম্বন্ধে দু'চার কথা আলোচনা করিব। জীবাণুঘটিত ব্যারাম মাত্রেই জীবাণু-সংস্পর্শমাত্রই আরম্ভ হয় না; দেহে জীবাণুজ বিষ উপ্ত হইতে কিছু সময় লাগে। সেই সময়টিকে ইংরাজীতে "ইন্কিউবেসন্" (প্রচ্ছন্নাবস্থা) বলে। কুষ্ঠের পক্ষে, এই প্রচ্ছন্নাবস্থা দুই মাস হইতে দুই বৎসর ব্যাপী। অর্থাৎ, কুষ্ঠরোগের বিষ সুস্থদেহীর দেহে অন্ততঃ দুই বৎসর কাল প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, তবে প্রকট হয়।

কুষ্ঠরোগের লক্ষণকে মোটামুটি দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; প্রথমটি—"নডুলার্" বা "টিউবার্কুলার্"—

অর্থাৎ, পিণ্ডাকৃতি চর্ম্মরোগ। দ্বিতীয়টি—স্নায়ুঘটিত কুষ্ঠ বা অসাড় (অ্যানিস্থেটিক্) কুষ্ঠ। আমরা এই দুই প্রকারকে স্বতন্ত্র করিয়া বর্ণনা করিব।

চর্ম্ম-ঘটিত কুষ্ঠব্যাধি।

চর্ম্মরোগ (নডুলার লেপ্রাসী)।—মুখমণ্ডল (গণ্ডদেশ, কর্ণের কোমলাংশ, ভ্রূ, চিবুক, কপাল, নাসা, ললাট), হস্তের পশ্চাৎভাগ—এক কথায়, সাধারণতঃ, যে যে অংশে রৌদ্র ও বাতাস লাগে, এমন অনাবৃত স্থানেই, এ ব্যারাম প্রথমে দেখা দেয়। লাল বা মৃগচর্ম্মের মত রং, অথবা পোড়া পোড়া রং, এই রকম রং লইয়া, চর্ম্মের উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমবাতের মত চ্যাপ্টা ঢিপি দেখা দেয়। সেগুলি মুসুর ডাইলের মত, অত ক্ষুদ্র অথবা যেমন ইচ্ছা বড় আকৃতির হইতে পারে। ঐ বিকৃতবর্ণ স্থান বা ঢিপিগুলি কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া, আপনা-আপনি অদৃশ্য হইতে পারে; অথবা, বরাবরের মত থাকিয়া যাইতে পারে। যদি কতকগুলি দাগ বা ঢিপি অদৃশ্য হয়, তবে আরো কতকগুলি দাগ বা ঢিপি দেখা দেয়। সময়ে-সময়ে, ঐ দাগী বা ঢিপিযুক্ত যায়গাগুলি দদ্রুর আকার ধারণ করে—মধ্যস্থলে কিছু নাই, আশ-পাশ উঁচু এবং রক্তবর্ণ। সময়ে সময়ে হাত ও পায়ের অথবা অন্যত্রর চর্ম্ম মসৃণ হয়। যেমন আকারই ধারণ করুক, এই স্থানগুলি অসাড় হয় না—অন্ততঃ প্রথমাবস্থাতে কোন দিনই অসাড় হয় না। এবং লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সাধারণতঃ, দেহের উভয়াংশেই তুল্যরূপে এই দাগ বা ঢিপিগুলি ছড়াইয়া পড়ে, এই সঙ্গে ভ্রূ এবং মুখমণ্ডলের লোমগুলি খসিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু মাথার ঐ ব্যাধির আক্রমণ ক্বচিৎ দেখা যায়, কাযেই মাথার চুল প্রায়ই ঠিক থাকে। এইভাবে কিছুদিন থাকার ফলে আটটি লক্ষণ লক্ষিত হয়; যথা—(১) ক্রমশঃ রোগী দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়ে—যদিও তাহার নিত্যকর্ম্ম করিবার সামর্থ্য সহজে যায় না; (২) চর্ম্মে ঐভাবে যে প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে, চর্ম্ম যেন ফুলিয়া বাড়িয়া যায়—কাযেই, মুখ বা দুষ্ট স্থানগুলি দেখিতে ভীষণাকৃতি হয়; (৩) চর্ম্মের প্রদাহ হওয়ার ফলে, দুষ্ট স্থানের মধ্যস্থলের স্নায়ুগুলির নাশ হয়, কাযেই সেখানকার বোধশক্তি লুপ্ত হয়—স্পর্শবোধ, উত্তাপবোধ ও বেদনাবোধ আদৌ থাকে না—কাযেই সেস্থান দগ্ধ হইলেও রোগী বুঝিতে পারে না। (৪) চর্ম্ম যে পরিমাণে উগ্রতালাভ করে, তাহার বিপরীত অনুপাতে স্নায়ুগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ যাহার চর্ম্ম খুব মোটা হয়, তাহার স্থানীয় বোধ শক্তির হ্রাস তেমন ব্যাপক বা ভীষণ ভাবে হয় না। (৫) কুষ্ঠব্যাধির গতি অত্যন্ত মন্দ হইলেও, এ ব্যারাম এক দিনেরও জন্য স্থগিত থাকে না—হয় বাড়িয়া যায়, নতুবা কমিয়া আসে। (৬) এই ব্যাধি আক্রমণ করিলেই যে মানুষের আকৃতি ভীষণ হয় এমন ভাবিবার হেতু নাই। (৭) এই চর্ম্ম-প্রদাহ যতই বাড়ে, ততই চর্ম্মটি মোটা হয়—এবং খাঁজ ও ভাঁজ উহাতে দেখা দেয়; অর্থাৎ যে ব্যক্তির চর্ম্ম স্থূলতা ও বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বুঝিতে হইবে সে তাহার ব্যাধি বহুদিনের। (৮) চর্ম্ম যেখানে স্থূল হয়, সেখানে আপনা হইতে অথবা সামান্য আঘাতের ফলে, ক্ষত সৃষ্টি হয়। চর্ম্মঘটিত কুষ্ঠে হাত পা কুড়াইয়া আসে না। বরং স্থূল ও বিবৃদ্ধ হয়।

চর্ম্মের প্রদাহ হওয়ার ফলে নিকটবর্ত্তী লসিকা গ্রন্থিগুলি (লিম্‌ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড) বড় হয়।

যেমন চর্ম্মে এই ব্যারামের প্রকোপ লক্ষিত হয়, তেমনি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিও ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় না। নাসাভ্যন্তরে, মুখাভ্যন্তরে, শ্বাসনালীতে (ল্যারিংস্ ও ফ্যারিংসে)—এ সকল স্থানেই অল্প বিস্তর প্রদাহ ও ক্ষত হইতে পারে; এবং শ্বাসনালীর প্রদাহ হওয়ার ফলে, স্বর-বিকৃতি ঘটে, এমন কি স্বরবন্ধ হইয়া যায়। নাসাভ্যন্তরে ক্ষত ও প্রদাহ হওয়ার ফলে, সময়ে অসময়ে, উহা হইতে রক্তস্রাবও হয়।

চর্ম্মে যেমন প্রদাহ হয়, তেমনি চক্ষুর্দ্বয়েও প্রদাহ হইয়া থাকে; ক্রমশঃ এই প্রদাহ সমস্ত চক্ষু দুইটিকে নষ্ট করিয়া দেয়।

স্নায়ু-ঘটিত কুষ্ঠব্যাধি।

"কুষ্ঠ" শব্দের অর্থ, যে ব্যারামে হাত-পা কুড়াইয়া

আসে। এই দ্বিতীয় রকমের কুষ্ঠে প্রকৃতই তাহা হয়।

চর্ম্মঘটিত ব্যাধি অপেক্ষা স্নায়ু-ঘটিত কুষ্ঠের অবস্থা (ইন্‌কিউবেসন্ পিরিয়ড্) কিঞ্চিৎ দীর্ঘকালব্যাপী; এবং এই প্রকার ব্যাধির প্রকোপও মৃদু। এই জাতীয় কুষ্ঠকে "স্পর্শ-বোধ-শূন্য কুষ্ঠ" বা "অ্যানিস্থেটিক্ লেপ্রাসি" বলে, "নার্ভলেপ্রাসি" বা স্নায়বিক কুষ্ঠ বলে এবং গলিতকুষ্ঠ বা মিউটিলেটিং লেপ্রাসি বলে। এই জাতীয় কুষ্ঠরোগীই আইনের আমলে আসে।

এই ব্যারামের সূত্রপাতে,—মুখ, পাছা ও পৃষ্ঠদেশে শ্বেত বা লাল দাগ দেখা দেয়। এবং যেখানে যেখানে দাগ ধরে, প্রায় সেখানকার দাগ মুছিয়া যায় না—স্থায়ীভাবেই থাকে। এই দাগ জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্থানে স্পর্শবোধ, কষ্টানুভূতি ও উত্তাপবোধ শক্তির লোপ পায়। এবং সে যায়গাগুলিতে কণ্ডুয়ন বর্ত্তমান থাকিতে পারে। লক্ষ্য করিবেন যে, চর্ম্মঘটিত ও স্নায়ুঘটিত উভয় জাতীয় কুষ্ঠেই চর্ম্মে সর্ব্ব প্রথম দাগ বা চ্যাপ্টা ব্রণের মত বিবর্ণ স্থলসমূহ লক্ষিত হয়। কিন্তু চর্ম্ম-ঘটিত কুষ্ঠে চুলকানি থাকে না, তাহারা সাদা রঙের হয় না, তাহাদের বোধ-শক্তি অনেক দিন বাদে লোপ পায়; এবং তাহাদের মধ্যে কতক দাগ মুছিয়া যায়; আবার তৎস্থানে কতক দাগ নূতন করিয়া হয়। কিন্তু স্নায়ু-ঘটিত কুষ্ঠে প্রথম হইতেই স্পর্শবোধ শক্তি লোপ পায় এবং ইহারা মিলাইয়া যায় না। সাধারণতঃ শূল বেদনা না থাকিলেও, স্নায়ু-ঘটিত কোনও কোনও কুষ্ঠ রোগীর হাতে, বাহুতে ও মুখে যেখানে সেখানে শূলবেদনা অনুভূত হয়।

এই ব্যারামে, দুষ্ট স্নায়ুটি মোটা হয়; এই মোটা হওয়া প্রদাহের ফল। এই মোটা হওয়ার একটু বিশেষত্ব আছে; সাধারণভাবে সব স্নায়ুটাই ফুলিলে, তাহাকে কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ বলা অনুচিত। যে স্নায়ুর উপরে মটর কলাইএর মত, অথবা মাত্র কতকটা স্থানে গুলি-পিঠের মত উচ্চতা অনুভূত হয়, সেই স্নায়ুটিই কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত মনে করিতে হইবে। সাধারণতঃ কনুইয়ের পশ্চাতে স্থিত "অল্‌নার" নামীয় স্নায়ুটিই এই ভাবে আক্রান্ত হয়।

স্নায়ুরাই মাংসপেশীর পুষ্টিসাধনে রত থাকায়, স্নায়বিক কুষ্ঠ পীড়ায় মাংসপেশীর পুষ্টির অভাব হইবার কথা—এবং কার্য্যেও তাহা হইয়া থাকে। হাতের, পায়ের, মুখের—নানা স্থানের মাংসপেশীর পুষ্টির অভাব ঘটায়, তত্রস্থ মাংসগুলি শুকাইয়া যায়: "ছিনা পড়িয়া যায়") এবং সেই সেই মাংসপেশীর কার্য্যের বৈলক্ষণ্যও ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই, স্নায়ুঘটিত কুষ্ঠ রোগে রোগীর হাত "কুড়াইয়া আসে"—অর্দ্ধ-মুষ্টিবদ্ধ হইয়া যায়, চলনের ভঙ্গী অস্বাভাবিক হয়, মুখের আকৃতির বিকার ঘটে, পুরাপুরি চক্ষু মুদ্রিত করিবার ক্ষমতাও লোপ পায়।

মাংসপেশীর পুষ্টির অভাবের সঙ্গে অপরাপর তন্তুরও তদ্রূপ দুর্গতি ঘটে; কাযেই আঙ্গুল খসিয়া আপনিই পড়িয়া যাইতে পারে, অথবা ক্ষত হওয়ার ফলে খসিয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ আঙ্গুল বা অপর গ্রন্থি (যেমন হাতের কব্জি বা মণিবন্ধ) খসিয়া যাইবার সময়ে, তত্রস্থ অস্থিতেও ক্ষত হয়; এই অস্থি-ক্ষত যন্ত্রণাদায়ক এবং অস্থি ক্ষত হইলে প্রদাহ, পূঁয-স্রাব প্রভৃতি উপসর্গও উপস্থিত হইতে পারে। এই সঙ্গে "পাদ-স্ফুটের" কথা বলার প্রয়োজন। হাতের বা পায়ের তলায় ক্ষত হইয়া তত্রস্থ অস্থিতেও ক্ষত ধরিতে পারে; এই রূপ কুষ্ঠরোগজনিত ক্ষতকে হস্ত ও পাদস্ফুট কহে; এইগুলি সাধারণতঃ যন্ত্রণাদায়ক নহে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে বিষম যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। ইহাদিগকে ইংরাজীতে 'পার্ফোরেটিং আল্‌সার" বলে।

চর্ম্মঘটিত কুষ্ঠে চর্ম্মেই এই রোগের জীবাণুকে পাওয়া যায়; স্নায়ু-ঘটিত কুষ্ঠে স্নায়ুতে ইহারা থাকে। অধিকাংশ সময়ে, রোগীর শেষ অবস্থায় চর্ম্ম ও স্নায়ু উভয় স্থলই আক্রান্ত হয়।

চর্ম্ম ঘটিত কুষ্ঠ প্রায় সারে না; কিন্তু স্নায়বিক কুষ্ঠ কখনো কখনো সারিয়া যায়; ইহা এত দীর্ঘস্থায়ী যে তাহার মধ্যে রোগী অন্য ব্যারামেও মারা পড়িতে পারে।

কুষ্ঠ রোগ ঘটিত জ্বর।

এই ব্যাধির প্রথমে ও অন্তে জ্বর দেখা যায়—সমস্ত ক্ষণ জ্বর থাকে না। প্রথম প্রথম আক্রমণের মুখে কাহারো কাহারো জ্বর হয়। কিন্তু রোগীর পরমায়ু শেষ হইয়া আসিলে, নিত্যই ৯৭° ডিগ্রি জ্বর নামে ও ১০২° — ১০৪° পর্য্যন্ত জ্বর ভোগ হয়। জ্বর ত্যাগের সঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্মস্রাব হয় এবং রোগী রোগা ও দুর্ব্বল হইতে থাকে।

কুষ্ঠ রোগ জানিবার উপায় কি ?

দুইটি মুখ্য ও এগারটি গৌণ লক্ষণ দ্বারা কুষ্ঠরোগের অস্তিত্ব অবধারিত হইতে পারে। সেগুলি এই এই :—

প্রধান লক্ষণদ্বয় ঃ—

(১) হান্‌সেনের লেপ্রা ব্যাসিলাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করা।—এই জীবাণুগুলি দুষ্ট স্থানের চর্ম্মের উপরিভাগে থাকে না। দুষ্ট স্থানের চামড়াটিকে সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া তাহার রসাল নিম্নাংশের রসে এই জীবাণুদিগের জন্য অনুসন্ধান করিতে হয়। ইহারা থাকিলে কুষ্ঠরোগের আক্রমণ অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হয়। দুই একজনের এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়।

(২) রোগীর চক্ষুর্দ্বয় বাঁধিয়া দিয়া, একটু কাগজ পাকাইয়া, তদ্দারা রোগীর সমগ্র দেহের স্পর্শবোধ শক্তি পরীক্ষা করিয়া যদি জানিতে পারা যায় যে, তাহার দেহের যায়গায় যায়গায় স্পর্শবোধ শক্তি নাই, তবে তাহাও কুষ্ঠজ্ঞাপক।

অপ্রধান একাদশ লক্ষণ ঃ—

(১) গভীর প্রদেশে বেদনা বোধ-শক্তির হ্রাস।—হয় ত চর্ম্মে স্পর্শ বোধ শক্তি আছে,—কিন্তু, সূচিকা বিদ্ধ করিলে, বেদনা অনুভূত হয় না।

(২) শীতাতপ বোধ-শক্তির হ্রাস।—ইহা স্নায়ুঘটিত কুষ্ঠের প্রথমাবস্থার লক্ষণ।

(৩) যায়গায় যায়গায় স্পর্শ বোধ শক্তির প্রাবল্য।

(৪) ধবল বা শ্বেতীর আবির্ভাব।—এই ধবলতা সম্পূর্ণ হয় না; আংশিক ও ক্ষীণ ভাবে দেখা দেয়।

(৫) যায়গায় যায়গায় লাল দাগ হওয়া।

(৬) আল্‌নার, (কনুইয়ের পিছনে), পেরো-নিয়াল্ (পায়ের সম্মুখ ভাগে, গ্রেট অরিকুলার (গলার সম্মুখদিকের দুপাশে), রেডিয়াল্ (হাতের), ও একষ্টার্ণাল্ স্যাফিনাস্ (পায়ের সম্মুখ ভাগে)—এই স্নায়ুগুলির স্ফীতি হওয়া।

(৭) চর্ম্মে যায়গায় যায়গায় স্ফীতি ঘটা এবং মসৃণ হইয়া যাওয়া—এবং সেখানকার লোমগুলি যেন লোম-কূপের মধ্যে পাকাইয়া বসিয়া যায়।

(৮) চামড়ার যায়গায়-যায়গায় একেবারে শুকনা দেখান—অর্থাৎ তাহাদিগের আশেপাশে ঘর্ম্ম হইলেও সেই যায়গাগুলিতে আদৌ ঘাম হয় না।

(৯) নাসিকাভ্যন্তরে প্রদাহ—সেখানে শ্লেষ্মা স্রাব ঘটে না, অথচ ক্ষত থাকে এবং সময়ে সময়ে রক্তস্রাবও ঘটিয়া থাকে।

(১০) যেখানে অনেকের কুষ্ঠরোগ হইতে থাকে এমন দেশে যখন তখন জ্বর ও গায়ে বেদনা হইলে, কুষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা বুঝিতে হইবে।

(১১) স্পর্শ বোধ শূন্য স্থানে স্বতঃ ফোস্কা উঠা বা ক্ষত হওয়া।

নিদান।

চর্ম্মঘটিত কুষ্ঠের স্ফীত স্থানে, অসংখ্য জীবাণু "(হান্‌সেনের লেপ্রা ব্যাসিলাস্)" লক্ষিত হয়—সেগুলি তন্তুকোষের ভিতরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। অস্থিক্ষতে, জীবাণু তাদৃশ ভাবে পাওয়া যায় না। স্নায়ুঘটিত কুষ্ঠেও, স্নায়ুতে তেমন বেশী জীবাণু থাকে না; এবং জ্বর প্রবল না থাকিলে, রক্তেও তত বেশী জীবাণুকে পাওয়া যায় না।

অনেকের ধারণা আছে যে, এই ব্যারামের প্রথমা-বস্থায় নাসিকাভ্যন্তর হইতে শ্লেষ্মা লইয়া পরীক্ষা করিলে এই ব্যারামের নির্ণয়ে সাহায্য করে; সে ধারণা ভ্রান্তি-মূলক। ওয়াসার্‌ম্যান্ রিয়্যাক্‌সান্ ও টিউবারকুলিন্

রিয়্যাক্‌সান্ উভয় পক্ষেই কুষ্ঠরোগী "পাজটিভ" দলে পড়ে।

[এই সূত্রে দুইটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; (১) ধবল বা শ্বেতী (লিউকোডার্ম্মা) বরং উপদংশের পরিচায়ক তবু কুষ্ঠের পরিচায়ক নহে। (২) ক্ষয়কাশ ও কুষ্ঠ—জীবাণুর দিক হইতে দেখিলে—একই গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।]

চিকিৎসা।

(১) রোগীদিগকে স্বতন্ত্র করা প্রয়োজন। সাধারণ কুষ্ঠাশ্রমগুলি জেলের নামান্তর মাত্র বলিয়া কি আশ্রমবাসী কি স্বাধীন বিচরণকারী কুষ্ঠরোগীরা কষ্টে ও ভয়ে জীবন যাপন করে। এই অবস্থায় বাস তাহাদের আরোগ্যের পরিপন্থী। এজন্য, তাহাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলয়ে অপর লোকজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা ও ভাল খাদ্যদ্রব্য দেওয়া প্রয়োজন। নিত্য স্নানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেখানে তাহাদের কায কর্ম্ম, আরাম বিরাম, ক্রীড়া কৌতুকেরও ব্যবস্থা রাখা চাই। সহর হইতে দূরে কোনও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রম করিয়া তাহাদিগকে রাখা উচিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কুষ্ঠ আরোগ্য হইতে চাহে না বলিয়া সামান্য শীত-প্রধান দেশেই তাহাদের আশ্রম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন প্রদেশে, খোলা যায়গায় আশ্রম করিতে হয়, যাহাতে তাহারা অবাধে আপনার গণ্ডীর ভিতরে বিচরণ করিতে পারে।

(২) ঔষধ হিসাবে, অপরিষ্কৃত চালমুগরার তৈল ৫ ফোঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১ আউন্স করিয়া দিনে ২ বার খাওয়ান যাইতে পারে। কিন্তু এই তৈল অতীব দুর্গন্ধযুক্ত ও বমনোদ্রেককারী। সকলের ইহা সহ্য হয় না।

ফিলিপাইন দ্বীপে, ১ সি, সি, পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ঔষধটি সূচিকা সাহায্যে মাংসপেশীর মধ্যে দেওয়া হয় (১ সি, সি, অথবা ১ কিউবিক সেন্টিমিটার = ১৭ মিনিম) :—

Rc. চাউলমুগরার তৈল	২ আউন্স
কর্পূর তৈল	ঐ
রিসর্‌সীন্	৯০ গ্রেণ।

অগ্নির উত্তাপে উহাকে মিশাইয়া ছাঁকিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। সময়ে সময়ে এই ঔষধ প্রয়োগের ফলে ফুস্‌ফুসের মধ্যে রক্ত দলা বাঁধিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

সার লিওনার্ড রজার্স "সোডিয়াম্ গাইনো কার্ডেট্" নামক একটি ঔষধ প্রস্তুত করান। তাঁহারই প্রস্তুত "সোডিয়াম্ হিড্‌নোকার্পেট," ও "সোডিয়াম সয়েট্"—এই তিনটি ঔষধ এই কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধত্রয়ই শতকরা ৩% এই হিসাবে দ্রব অবস্থায় তৈয়ারী পাওয়া যায়।

এই ঔষধ—প্রথমতঃ ১ গ্রেণ হইতে অধস্ত্বাচিক পথে "ইনফিল্‌ট্রেসন্" উপায়ে, সপ্তাহে ২।৩ বার ইন্‌জেক্‌ট্ করিতে হয়। প্রত্যেকবারে ½ হইতে ½ গ্রেণ করিয়া বাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত—যতদিন না ২½ গ্রেণ প্রতি মাত্রায় প্রযুক্ত হয়।

তৎপরে—শিরাভ্যন্তরে প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হয়—সপ্তাহে ১ বা ২ বার করিয়া। আরম্ভ করিতে হইবে ৩ মিনিম্ লইয়া (=১/২০ গ্রেণ), প্রত্যেকবারে বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। ৩ মিনিম করিয়া, যতক্ষণ না ৪ সি সি (=২ গ্রেণ) পর্য্যন্ত উঠে। সোডিয়াম হিড্‌নোকার্ডেট ও গাইনোকার্ডেটের কথাই বলিলাম। সয়েটের প্রয়োগ ও প্রায় একই রকম।

যে যে দিন ইন্‌জেক্‌সন্ হয় না, সেই সেই দিন মুখে সোডিয়াম গাইনোকার্ডেটের ২ গ্রেণ ট্যাবলেট্ বা চাক্তি খাওয়ান উচিত। ২ গ্রেণ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪০ গ্রেণ প্রত্যহ খাওয়ানর ব্যবস্থা করা উচিত।

সম্প্রতি হনোলুলুর ম্যাকডোনাল্ড সাহেব আইওডিন সহ "চালমুগরার এথিল্-এষ্টার" প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ঔষধ মাংসপেশীর মধ্যে সূচিকা সাহায্যে প্রয়োগ করিতে হয়—সপ্তাহে ১ দিন। আরম্ভ করিতে হয় ১ সি সি, সমাপ্তি হয় ৫ সি সি'তে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে "একঘেয়ে" ঔষধের চেয়ে সময়ে সময়ে ঔষধ বদল করা ভাল। অর্থাৎ কয়েকদিন হিড্‌নোকার্পেট, আবার কয়েক দিন সয়েট্।

এই ঔষধগুলিই "লেপ্রল," "মুগ্রল" প্রভৃতি ছদ্ম নামে বাজারে বিক্রীত হয়!

এ ব্যারামে সিরাম বা ভ্যাকসীনে কোন কাঁয হয়না।

(২) সাধারণ ভাবে যে যে অবস্থায় অস্ত্রোপচার করিলে সুফল পাওয়া যায়, কুষ্ঠরোগে তৎতৎ অবস্থায় সমান ভাবেই—এমন কি বেশী সুফল পাওয়া যায়। এই জন্য আবশ্যক হইলেই কুষ্ঠ রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা কর্ত্তব্য।

(৩) স্থানীয় প্রয়োগ—চর্ম্মের যে যে স্থান পুরু হয় তাহাদিগকে ফিন্‌সেন্-রে, এক্স-রে বা রেডিয়াম রশ্মির সাহায্যে ট্রাইক্লোর-অ্যাসেটিক্ অ্যাসিড, কার্ব্বণ ডাই-অক্সাইড স্নো, ক্রোমিক অ্যাসিড প্রভৃতির সাহায্যে ধ্বংস করা কর্ত্তব্য। আবশ্যক হইলে, কয়েক বিন্দু ½% কার্ব্বলিক লোসনও অধস্তাচিক উপায়ে তাহাদিগের মধ্যে দেওয়া উচিত।

সাধারণ ভাবে ঘা-ফোড়া ধুইবার জন্য যে যে ঔষধ ব্যবহৃত হয় কুষ্ঠরোগীর ঘা'তেও তাহা প্রযোজ্য। তবে যে ঘা সারিতেছে না, তাহাতে বালসাম্ পেরু, যেখানে অতি মাত্রায় গ্র্যানুলেসন হয় সেখানে একটু তুঁতে বা সিল্‌ভার্ নাইট্রেট, এবং যেখানে উগ্রতার শান্তি আনিতে হইবে, সেখানে ফেনোলেটেড্ জিঙ্ক মলম প্রযোজ্য।

যাহাতে অন্যান্য ব্যারাম না ধরে, নিত্য কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এমন করা কুষ্ঠ-রোগীর পক্ষে সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। নিত্য যথা সময়ে পরিমিত আহার করা, টাট্‌কা এবং পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া, এ বং রীতিমত ব্যায়াম করা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কত কুষ্ঠরোগী আছে ?

বলা বাহুল্য যে সেন্‌সাস্ বা আদমসুমারিতে সব তথ্য ঠিক পাওয়া যায় না; নিতান্ত স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে যাহারা কুষ্ঠরোগে ভুগিতেছে তাহারা ব্যতীত অপর কোনও কুষ্ঠরোগী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধরা দিতে আসে না; এবং যাহাদের দেহে কুষ্ঠ রোগ ধরিয়াছে মাত্র এবং যাহারা সেই ব্যাধির আক্রমণ বুঝিতে পারে না—এই দুই প্রকারের বহু সংখ্যক কুষ্ঠরোগীকে আদমসুমারীর খতিয়ানে ধরা হয় নাই। যাহা হউক, গত আদম সুমারীর হিসাব—

সমগ্র ভারতবর্ষে ২০০,০০০
,, বঙ্গদেশে ১৮,০০০
,, কলিকাতায় ১,০০০
} কুষ্ঠরোগী আছে।

কলিকাতার রাজার বাজার, মেছুয়া বাজার, রাধা বাজার, কালিঘাট প্রভৃতি অঞ্চলেই অধিকাংশ কুষ্ঠ রোগী থাকে।

কুষ্ঠ কি ছোঁয়াচে ?

১৮৯০—৯১ সালে "লেপ্রাসি কমিসন" বসে; সেই কমিসনে বিলাতী ও এ দেশীয় চিকিৎসকগণের মতামত লওয়া হয়। সেই কমিসনের মতে, অপর ছোঁয়াচে ব্যারামের মত অত সহজে কুষ্ঠ ছোঁয়াচে নয়। এবং কমিসনের এই মত স্যার জেম্‌স্ প্যাজেট, স্যার ডাইস্ ডাক্‌ওয়ার্থ, স্যার এণ্ড্রু ক্লার্ক, স্যার জোসেফ্ ফেরার এবং জোনাথান্ হাচিন্সন্ প্রভৃতি মহারথীরা অনুমোদন করেন। স্যার লিওনার্ড রজার্স কিন্তু উক্ত মতাবলম্বী নন। ১৮৯৫ সালের ২৩ এ মার্চ্চ তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে প্রকাণ্ড এক মতামত প্রকাশ করেন—তাঁহারা কুষ্ঠকে ছোঁয়াচে ব্যারাম বলিয়া মনে করেন না। বর্ত্তমান যুগে কেহ কেহ রজার্সের দলে, কেহ পূর্ব্ব পক্ষে। পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে যে কুষ্ঠ রোগের জীবাণু বা ক্ষতের রস প্রবিষ্ট করাইয়া কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় নাই। অথচ এ কথা সকলেই বলেন যে কুষ্ঠরোগীর স্পৃষ্ট কি তৈয়ারী কোনও খাদ্য দ্রব্য খাওয়া নিরাপদ নহে।

কুষ্ঠাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা আছে ?

এ পর্য্যন্ত কেহই যখন অভ্রান্ত ভাবে কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে চরম কথা বলিতে পারেন নাই, তখন এই রোগীকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখাই উচিত। তদ্ব্যতীত, কুষ্ঠরোগীরা সকলেরই দ্বারা ঘৃণিত—এই কারণেও তাহারা স্বতন্ত্র

থাকিতে পাইলে কতকটা মনের স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারে। বর্ত্তমান আইনে (ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৮৯৮ সালের ৩ আইন) বলা আছে যে, যে ব্যক্তির গলিতকুষ্ঠ হইয়াছে, তাহার কোনও বাসস্থান না থাকিলে, তাহাকে জোর্ করিয়া কুষ্ঠাশ্রমে রাখিতে পারা যায়; কিন্তু, তাহার ক্ষত শুকাইয়া গেলে, আর তাহাকে আটক রাখা যায় না। যে কারণেই হউক, কুষ্ঠাশ্রমের আবশ্যকতা আছে। তবে বর্ত্তমানে, কুষ্ঠাশ্রমগুলি হয় জেল সদৃশ, নতুবা ক্ষুদ্র হাসপাতাল মাত্র। সে ভাবে কুষ্ঠাশ্রম করা ভুল।

কোথায় কুষ্ঠাশ্রম আছে।

দেওঘর (সাঁওতাল পরগণায়) ৺ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার স্থাপিত "রাজলক্ষ্মী কুষ্ঠাশ্রম" ছিল। বর্ত্তমানে উহার সম্বন্ধে কোনও সংবাদ নাই। রাণীগঞ্জেও একটি কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় আছে। বাঁকুড়া জেলায় "ওয়েসলিয়ান্ মিশান হোম" নামক একটি সুবিখ্যাত কুষ্ঠ হাসপাতাল আছে।

এতদ্ব্যতীত, আলমোড়ায় আলমোড়া লেপার হোম, বিহার ও উড়িষ্যার পুরুলিয়ায় একটি কুষ্ঠাশ্রম, কটকে একটি লেপার হোম, এবং মধ্য প্রদেশ মান্দ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে এক একটি অথবা একাধিক কুষ্ঠাশ্রম আছে। কলিকাতায়—যে যে স্থানে কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় আছে, তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) কলিকাতা ট্রপিকাল স্কুলে—মঙ্গল ও শুক্রবারে বেলা ১১ হইতে ৩টা পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় (আউট্ ডোর্ চিকিৎসা)।

(২) ইটালী গোবরাতে—১৫০ রোগীর থাকিয়া চিকিৎসা পাইবার ব্যবস্থা আছে।

(৩) ২৫৯ অপার সার্কুলার রোডে—

সোমবার ৭৷৷০ হইতে ৮৷৷০ প্রাতে
বুধবার ৪ ,, ৫ বৈকালে
বৃহস্পতি ৪ ,, ৫ ,,
শনিবারে ৭৷৷ ,, ৮৷৷ প্রাতে
} চিকিৎসা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

(৪) কালিঘাটে ৩০ নং মহিম হালদার ষ্ট্রীটে—

সোমবার প্রাতে ৭৷৷ হইতে ৮৷৷
বৃহস্পতিবার বৈকালে ৪—৫
} চিকিৎসা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

উপরে, চিকিৎসার স্থান, বার ও সময় যুক্ত তালিকা দিবার কারণ এই যে, এই গোপনীয় ব্যারামে ভুক্ত-ভোগীরা স্বয়ংই চেষ্টা করিয়া আরোগ্য লাভের সুযোগ পাইবেন। কুষ্ঠ রোগীদের অপর সাধারণ ব্যারাম হইলেও, ভয়ে বা লজ্জায় তাহারা তাহার চিকিৎসা করাইতে পারে না; এবং অনেক হৃদয়হীন চিকিৎসকও তাহাদিগকে আমল দিতে চান না। বলা বাহুল্য, উক্ত চিকিৎসা-স্থানগুলি মুখ্যতঃ কুষ্ঠ চিকিৎসার স্থান হইলেও সেখানে অপর সাধারণ ব্যারামের চিকিৎসাও হইয়া থাকে। যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্ত তাঁহাদিগকে দুইটি কথা বলিতে চাই; প্রথমতঃ, এই ব্যারাম খুব গোড়া হইতে চিকিৎসিত হইলে বড়ই সুফল ফলে—কাযেই এই ব্যারাম ধরিলেই চিকিৎসা করান উচিত। এবং দ্বিতীয়তঃ প্রায়ই দেখা যায় যে গরীবরা ক্ষত শুকাইলে আর চিকিৎসা করাইতে আসে না—সেটিও মস্ত ভুল; কারণ ক্ষত শুকাইলেই ব্যারামের মূল গেল না।

আত্মানং সততং রক্ষেৎ

মানুষ সর্ব্বসময়ে একই রকমের কায করিতে করিতে ক্রমশঃ অভ্যাসের বশে আপনার কর্ম্ম করিয়া যায়, বিশেষ পরিশ্রম অনুভব করে না। অভ্যাস ক্রমে স্বভাবে পরিণত হয়। প্রকৃতি এই বিষয়ে মানুষের অনুকূলেই কায করিয়া থাকে, নচেৎ মানুষের শক্তিতে তাহার দৈনন্দিন কার্য্য সমাধা করিয়া উঠা কঠিন ব্যাপার হইত।

নিত্যসাধ্য কার্য্যগুলির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ছাড়াও নানা প্রকারের কায আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, যাহা সমাধা করিবার জন্য বিশেষ শক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, সামান্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইলে সহজেই ক্লান্তি, অবসাদ আসিয়া পড়ে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে—দেহের ভাণ্ডারে প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তির অভাব। মানুষের দেহযন্ত্রখানি ছাড়া মানুষ যাহা কিছুকালের জন্যও স্থায়ী করিবার জন্য যে সকল জিনিষ সৃষ্টি করে, তাহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়। ব্যবসা ক্ষেত্রে যে মূলধন নিত্য প্রয়োজনে আসে, দূরদর্শী ব্যবসায়ী তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কে অনেক টাকা রিজার্ভ বা সঞ্চয় স্বরূপ জমা রাখিয়া দেয়। ব্যবসায়ের প্রসারের সঙ্গে, বা কোন অদৃষ্ট পূর্ব্ব কারণে সামান্য মাত্রায় অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে যদি তাহার জন্য ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, বা ব্যবসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে অপরাপর বন্ধু ব্যবসায়ীরা তাহাকে মূর্খ বলিয়াই উপহাস করিবে। সেতু নির্ম্মাণের কালে, নির্ম্মাতা, সেতুর যতখানি ভার বহন করার সাধারণতঃ প্রয়োজন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ত করেই; উপরন্তু, কোন কালে যত অধিক ভার পুলের উপর আসিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সেনানী কখনই এক সময়ে সকল সেনা ও অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত করেন না। তাহাতে বিপদেরই সম্ভাবনা অধিক। কিছুকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিলে ফল গুরুতর হইবার সম্ভাবনা। এই ভাবে, জীবনের সকল কার্য্যেই ভবিষ্যৎ কালের জন্য বা বিশেষ প্রয়োজন হইলে ব্যবহার যোগ্য সঞ্চিত বস্তু রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

কিন্তু দেখা যায় মানুষ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনের জন্য সঞ্চিত মূলধন কিছু রাখে না। মানুষের জীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের গুরুভার অল্পে অল্পে নামিয়া আসে। অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়া মানুষ শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। যন্ত্র যদি চলিতে সমর্থ হয়, কোন গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অন্যান্য সকল যন্ত্রের ন্যায় মনুষ্য দেহেরও ক্ষয় বিনাশ আছে। কাযেই তাহার যত্ন লওয়া মানুষের একান্ত কর্ত্তব্য। যাহা অর্থে মেলে সামর্থ্যে মেলে তাহার জন্য যে যত্ন লওয়া হয়,—দেহের জন্য, যাহা একবার নষ্ট হইয়া গেলে আর পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার জন্য সেরূপ যত্ন লইতে দেখা যায় না।

এই যন্ত্রখানি ঠিক রাখিতে হইলে অত্যন্ত সাবধানতার প্রয়োজন। এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্তির ভাণ্ডারে কিছু জমা দিয়া রাখিতে হয়, যাহাতে প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত পরিশ্রমে দেহ খানি না ভাঙ্গিয়া পড়ে। একবার দুইবার ব্যাঙ্ক হইতে জমার অধিক টাকা লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ব্যাঙ্ক বারে বারে টাকা দিবে না।

এক সময়ে শূন্য ভাণ্ডার হইতে টাকা তুলিতে গেলে নিশ্চয়ই বিপত্তি উপস্থিত হইবে। কাযে কাযেই সময় থাকিতে হয় নূতন টাকা জমা দিতে হয় নতুবা, খরচ কমাইয়া জমার ভাণ্ডার ঠিক রাখিতে হয়।

যন্ত্র চলিতে চলিতে অচল হইবার লক্ষণ সকল প্রকাশ করে। প্রথম প্রথম মাথা ধরা, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি ঘটিতে থাকে। সাবধানী লোকে তখন হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে। ক্লান্তি হইতে বোঝা যায়, শক্তির অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে। পরিশ্রম যদি সমান ভাবেই চলিতে থাকে, তাহা হইলে দেহের ক্ষয় সাধিত হয়, এবং দেহ যন্ত্র শীঘ্রই বিকল হইয়া পড়ে। যদি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেই হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া লইলে কার্য্যহানি ঘটে ও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।

যদি সামান্য অসুস্থতা উপলক্ষে সাবধানতা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে গুরুতর বিপদ হইতে সহজে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। পরিশ্রমজনিত রোগের চিকিৎসাই বিশ্রাম। দেহকে মনকে বিশ্রাম দিতে পারিলে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যজনক বস্তু নহে। সাধারণতঃ দেখা যায়, সামান্য অসুস্থতার লক্ষণগুলি উপেক্ষা করিয়া চলা হয়। যতদিন উপেক্ষা করিয়া চলে, ততদিন, কর্ত্তব্যানুরোধেই হউক বা যে কারণেই হউক, ঠেলিয়া দূরে রাখিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহা কোনরূপেই ঘটিতে দেওয়া উচিত নহে। এই অবস্থা কাটিয়া গেলে তখন লোকে পেটেণ্ট ঔষধের আশ্রয় লয়। মাথাধরা, অনিদ্রা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি কারণের জন্য অজস্র ঔষধ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। দিনকয়েক তাহারই উপর নির্ভর করিয়া চলিতে থাকে; কিন্তু তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই দেখা দেয়। যে কারণে লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে থাকে, সেই রোগের চিকিৎসা অনুরূপ। কাযেই চিকিৎসায় কোন ফল দেখা যায় না; অথচ শরীর ক্রমেই অশক্ত হইয়া পড়িতে থাকে। রোগের মূল কারণের চিকিৎসা না করিয়া কেবল লক্ষণগুলির চিকিৎসা করা হইলে, তাহাকে চিকিৎসা না বলিয়া কুচিকিৎসা বলিলেও অন্যায় হয় না।

এই অবস্থায় একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, হঠাৎ যদি রোগ গুরুতর ভাব ধারণ করিয়া শয্যাশায়ী করিয়া ফেলে, তাহা হইলে, যে কার্য্যের জন্য এই পরিশ্রম করা, সে কার্য্যের দশা কি হইবে? যেখানে সপ্তাহ, পক্ষ বা মাস কাল বিশ্রামে পূর্ব্ব শক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে হয়ত বহুকাল, কোন কোন ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য কর্ম্মশক্তি অন্তর্হিত হইতে পারে। যে কাজের জন্য এই অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইতে হয়, তাহা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে বা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা এই সম্পর্কে স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। প্রয়োজনের সময় বিশ্রাম বলিয়া কোন কথা তিনি মনের মধ্যেও উঠিতে দেন নাই। ফলে অমূল্য জীবন অকালে হারাইলেন। অতবড় একটা প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি বিলুপ্ত হইল। ইহাতে দেশের ক্ষতি হইল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

রোগ আসিবার পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে অল্প যত্নে যাহা দূর করা যাইত তাহা রোগ প্রবল হইলে আর সম্ভবপর নহে। বহু সময় নষ্ট হয়। অর্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহার পরিমাণও অধিক। যে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য লোক জীবন বিপন্ন করিয়া ফেলে সেই অর্থই চিকিৎসার ও পরিচর্য্যার খরচায় নষ্ট হইয়া যায়। সামান্য বিশ্রাম ও কর্ম্ম হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া যে অর্থ সামান্য কয়েক দিন পরে উপার্জ্জন করিবার সুবিধা ঘটিত, তাহার বহুগুণ অধিক অর্থ যে নষ্ট হয়, কেবলমাত্র তাহাই নহে, উপার্জ্জন করিবার শক্তি বহুদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া থাকে।

সময় থাকিতে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের কায্য। যখন যন্ত্র চলিতে চলিতে নানাপ্রকার শব্দ করিতে থাকে, তখন বুঝিতে হয় যে, কল বিকল হইয়া পড়িয়াছে। চালক তখনই সাবধান হইয়া তাহার কারণ দূর করে। পরিশ্রমজনিত রোগ দেখা দেওয়া মাত্রেই যে কার্য্য

বন্ধ করা উচিত তাহা নহে, এ অবস্থা আসিবার পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কয়েকদিন পরিশ্রমের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া লওয়াই বিধি। কেবলমাত্র কর্ম্ম বিরতি হইলেই হইবে না, মনকে গুরুতর চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। দেহ ও মনের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে একের পরিশ্রমে অপরকে শান্তি দেওয়া অত্যন্ত সুকঠিন। প্রত্যহই দিনের সকল কার্য্যের মধ্যেই দেহ মনকে বিশ্রাম দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যদি তাহা সম্ভব না হয়, সপ্তাহের শেষে কর্ম্মক্লান্ত শরীরকে কোন প্রকারেই জোর করিয়া কর্ম্মে রত করা উচিত নহে।

বিশ্রামের অবশ্য ধারা আছে এবং লোক বিশেষে বিশ্রামের সময় ও প্রকার বিভিন্ন হইয়া থাকে। যাহা হউক একই রকম পরিশ্রম হইতে মনকে অন্য প্রকারে নিযুক্ত করিলেও অনেক সময় বিশ্রামের কায করে। একই কায অনেকক্ষণ করিতে করিতে ক্লান্তি আসিয়া পড়ে, কিন্তু পরিবর্ত্তন এক উপভোগের বস্তু, কাযেই প্রয়োজন হইলে এক গুরু কায হইতে অন্য কাযে লাগিলেও আরাম বোধ হইয়া থাকে। যেখানে বসিয়া অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতে হয়, সে স্থান বদলান মঙ্গলজনক। যাহাদের গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কায করিতে হয়, তাঁহাদের সময় ও সুযোগ খুঁজিয়া লইয়া বাহিরের হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইলে প্রভূত উপকার হইয়া থাকে। জীবনের দৈনন্দিন নানা কাযের মধ্যে কিছুক্ষণ সময় বিশ্রাম লওয়া ক্ষতি বলিয়া মনে করিতে নাই। তাহার যথেষ্ট মূল্য আছে।

যাহাদের গভীর মানসিক পরিশ্রম সদাসর্ব্বদা করিতে হয় তাহাদের বিদেশে পরিভ্রমণের জন্য যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কর্ম্মক্লান্ত জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রের নিকটে বসিয়া থাকিলেও চিন্তা-শক্তি কায করিতে থাকে। তাহাতে বিশ্রামের ফল পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না।

নিদ্রা মানুষের একটী প্রয়োজনীয় বস্তু। জাগরণের ন্যায় নিদ্রাও বিশেষ উপকারী। আমাদের মতে কোন অংশেই কম উপকারী নহে। নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে থাকিলে বুঝিতে হইবে শরীরে রোগ উপস্থিত হইয়াছে। নিদ্রার যাহাতে কোনরূপে ব্যাঘাত না ঘটে সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রত্যহ কিছুক্ষণের জন্য ব্যায়াম শরীরের পক্ষে মঙ্গলকর। যাহাদের সময় সাপেক্ষ ব্যায়াম করিবার সুবিধার অভাব, তাহাদের প্রত্যহ কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যুষে পাদচারণা একান্ত প্রয়োজন। বহিঃভ্রমণের কালে দীর্ঘশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করাতে দেহ ও মন প্রফুল্ল থাকে, ফুসফুস সবল হয় ও রোগ জীবাণু দূর করিবার সুবিধা পায়।

পরিশ্রমের উপযুক্ত আহার যে প্রয়োজন সে কথা বলাই বাহুল্য। যদি যন্ত্রকে সজোরে বহুক্ষণ চলিতে হয়, তাহার নতন ইন্ধন যোগাইতে হয়; নচেৎ সে বিকল হইয়া যায়, বা ইচ্ছানত ফল পাওয়া যায় না। শরীর দৃঢ় ও মন কর্ম্মক্ষম রাখিবার জন্য উপযুক্ত আহারের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হয়। যথা সময়ে খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়; নচেৎ আহার অনেক পরিমাণে বিফল হইয়া যায়। যাহার যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয় আহার্য্যের গুণের দিকে তাহাকে সেই ভাবে লক্ষ্য করিতে হয়। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের জন্য আহারের তারতম্য আছে। এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মনের প্রফুল্লতা কর্ম্মশক্তি অব্যাহত রাখিবার একটী বিশেষ অঙ্গ। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কর্ম্মে আনন্দ আছে তাহাতে বহুক্ষণ সময় নিয়োগ করিলেও ক্লান্তি আসিতে বিলম্ব লাগে। সকল কর্ম্মের মাপে মনের প্রফুল্লতা নষ্ট করিতে নাই।

দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে মনে মনে ভাবিতে হইবে, যে কার্য্য আপাততঃ সম্পন্ন করিতেছি, তাহা অপেক্ষা গুরুভার কর্ম্ম ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে পারে। তাহার জন্য আমার শক্তির প্রয়োজন। যে কার্য্যের জন্য আমি জীবন বিপন্ন করিতেছি, আমার অবর্ত্তমানে তাহার ক্ষতি হইবে, হয়ত তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। কাযেই নিজেকে বাঁচাইয়া আমাকে কর্ম্ম-সম্পাদনে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বাস্থ্য শক্তি সামর্থ্য কেবল দিনের কর্ম্ম শেষ করিবার জন্য নহে, যে কোন ভার আসিলে উন্নত মস্তকে সমাধা করিতে পারিব, তাহাই হইবে প্রতিজ্ঞা। এবং সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য শক্তির ভাণ্ডারে জমা দিয়া রাখিতে হইবে।

অনন্ত যৌবন

দেহে পুরাতন গ্রন্থির স্থানে নূতন গ্রন্থি বসাইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মানবকে যৌবন ফিরাইয়া দিতে চাহে। এই কয়েক বৎসরে বহু পুরুষ ও নারী দেহে অস্ত্রোপচার করাইয়াছে কিন্তু ফল খুব আশাপ্রদ নহে।

আমাদের মতে, দেহে যৌবন অটুট রাখিতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নাই। দেহস্থিত যন্ত্রখানি চলিতে চলিতে নানা প্রকার বিষ উৎপন্ন হয়। দেহের যথার্থ প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্ধন যোগাইতে পারিলে এই বিষ উৎপাদন বন্ধ করা যাইতে পারে। দেহমধ্যে বিষের ক্রিয়া বন্ধ থাকিলে দেহের ক্ষয় অতি সামান্য মাত্রায় হইয়া থাকে; তাহাতে জরা, বার্দ্ধক্য আসিতে বিলম্ব হয় ও শক্তি অব্যাহত থাকে, ইহাই যৌবনের নামান্তর মাত্র।

দেহের বিষ উৎপন্ন বন্ধ রাখা, তাহা নাশ করা বা নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়ার শক্তিই যৌবন—অভাব, বার্দ্ধক্য। যে যন্ত্রগুলি এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করে বিশেষ ভাবে তাহাদের যত্ন লওয়াই যৌবন রক্ষার বিশেষ অঙ্গ। যতক্ষণ উপযুক্ত ইন্ধন পূর্ণমাত্রায় পায় ততক্ষণ অগ্নি তাহার ধূম নাশ করিয়া অঙ্গার না রাখিয়া ভস্মে পরিণত করে এবং সেই অগ্নিরই শক্তি অধিক। দেহ যন্ত্র চালিত করিতে হইলেও একই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

লিভার (যকৃৎ) ও কিডনী (বৃক) দেহের বিষ নাশ কার্য্যের প্রধান যন্ত্র। যকৃৎ বিষ নাশ করে ও ক্ষার জাতীয় অপ্রয়োজনীয় বস্তু দূর করে এবং বৃক অপ্রয়োজনীয় অম্ল জাতীয় বস্তু দূর করিয়া এমোনিয়া নামক ক্ষার দিয়া দেহ মধ্যে উৎপন্ন বিষ নাশ করে। ইহাদের কার্য্য হইতে প্রতিবন্ধক দূর করিতে পারিলে বার্দ্ধক্য ঠেলিয়া রাখা অসম্ভব নহে।

যকৃৎ ও বৃককে যন্ত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞতা হইতে স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে, যদি এই যন্ত্রগুলির উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ইহারা স্বচ্ছন্দে ১৫০ বৎসর চলিতে পারে। কিন্তু মানুষ একটু স্বাদের লোভে নানা প্রকার ক্ষতিকর বস্তু চাপাইয়া দিয়া ইহাদের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায়, এবং মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করে।

প্রকৃতির অনুকূল নিয়ম পালন, প্রকৃতির প্রয়োজনীয় আহার গ্রহণ, প্রকৃতির মধ্যে আপনার দেহখানি ঢালিয়া দেওয়া ইহাতেই জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

ক্লান্তির পর বিশ্রাম যৌবন আনয়ন করে, পরিশ্রমের পর দেশ ভ্রমণ শক্তি দেয়, ক্ষুধার পর আহার যন্ত্রকে কর্ম্মক্ষম করে, রৌদ্র বায়ু শরীর সকল দৃঢ় করে, ইহাই যৌবনের পথ। মনের প্রফুল্লতা ক্ষয় স্থগিত করে, শান্তি জীবন দীর্ঘ করে—যৌবন রক্ষা করিতে হইলে দেহের উপর কোন অত্যাচার করিতে নাই। আহারে, বিহারে, কর্ম্মে চিন্তায় স্মরণ রাখিতে হয়, এই মনুষ্য দেহই দেড় শত বৎসর কর্ম্মক্ষম থাকে। তাহার পরও যাহাদের যৌবনের প্রয়োজন, তাহারা তাহা পরপারে লাভ করিবে।

আসামে চিকিৎসক সম্মিলন।—

নিখিল ভারতীয় চিকিৎসক সমাজের আসাম শাখার সর্ব্বপ্রথম বার্ষিক অধিবেশন এই সে দিন ডিব্রুগড় নগরে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিনয় হোয়াইট মেডিক্যাল স্কুলের প্রাঙ্গণে অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আসাম প্রদেশের চিকিৎসক সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে উক্ত প্রদেশের চিকিৎসকগণের অভাব অভিযোগের কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, অপর সকল বিভাগেই নিম্নপদস্থ ব্যক্তিরা যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে উচ্চপদে উন্নীত হইবার আশা করিতে পারেন। কিন্তু আসামের সব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদের প্রাদেশিক বা ভারত গবর্মেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগে উন্নীত হইবার সুযোগ নাই—ইহা বড় দুঃখের কথা। মূল সভার সভাপতি মহাশয় বলিলেন, সভায় যে সকল অভাব অভিযোগের কথার আলোচনা হইল, তন্মধ্যে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। সভায় কয়েকটি চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধও পঠিত হইয়াছিল। আসামের ন্যায় অনুন্নত প্রদেশে এরূপ সভার উপযোগিতা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা যে অধিক, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা এরূপ সভার সমর্থন করি। তবে একবারেই যেন ইহার পরমায়ু শেষ না হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, সমিতির সম্পাদক মহাশয় তাঁহার রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বহু বৎসর ব্যাপী চেষ্টার ফলে, অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তবে এ বৎসর এই বার্ষিক অধিবেশনের বন্দোবস্ত করিতে পারা গিয়াছে। আমরা বলি, ইহাতে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। এরূপ অধিবেশনের উপকারিতা আছেই, এবং তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, বৎসর বৎসর সভার অধিবেশন করিতে সকলেই উৎসাহিত ও উদ্যোগী হইয়া উঠিবেন।

মফস্বলে কলেরা—

পল্লী অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ হ্রাসের বিশেষ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, পল্লী গ্রাম অঞ্চলে কলেরাক্রান্ত স্থান সমূহে ফকিরগণের অবাধ প্রভুত্ব এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার অজ্ঞতা প্রভৃতিও অল্প দায়ী নহে। সাধারণ পল্লীবাসীরা এখনও বিশ্বাস করে যে, কলেরা ভূতে পাওয়ার ফল। অতএব কলেরা নিবারণের জন্য তাহারা রোজা ও ফকিরদের সাহায্যে মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, ঝাড়ফুক করাইয়া থাকে—চিকিৎসক প্রায় ডাকে না। কোন চিকিৎসক স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ইন্‌জেকসান বা অন্যবিধ চিকিৎসা করিতে চাহিলে চিকিৎসককে গ্রামবাসীরা প্রায় আমল দেয় না। অতএব চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, পর্য্যাপ্ত ঔষধের বন্দোবস্ত করিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেই মফস্বল অঞ্চল হইতে কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির প্রতিকার করা সম্ভবপর হইবে না। সর্ব্বাগ্রে পল্লীবাসীদের অজ্ঞতা দূর করা আবশ্যক; ইহাতেও অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কারণ, ফকিরগণ কলেরা ভূত তাড়াইবার ওজর করিয়া অজ্ঞ গ্রামবাসীদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় তাহারা বাধা দিবেই। এবং গ্রামবাসীদের উপর তাহাদের অসামান্য প্রভাব থাকায় অনেক স্থলে তাহাদের বাধা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। এই সকল হৃদয়হীন ফকিরদের কেরামতি সম্বন্ধে এমন কথাও শুনা যায় যে, অর্থলাভের আশায় তাহারা কলেরা রোগীর পরিত্যক্ত দূষিত বীজ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চালান করিয়া থাকে। এ কথা সত্য হইলে, এবং প্রমাণ পাওয়া গেলে কঠোর হস্তে ইহা দমন করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কয়েকজন এরূপ মন্দ লোককে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলে কতকটা সুফল প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে।

ক্যান্সার চিকিৎসালয়।—

কর্কট রোগ যেমন ভীষণ তদ্রূপ দুশ্চিকিৎস্য। এই রোগের কারণ ও নিদান সম্বন্ধে প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্র এখনও নিতান্ত শিশু; কিন্তু প্রতীচ্য জগতের চেষ্টার বিরাম নাই। ক্যান্সার সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ইয়োরা-মেরিকায় কত যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। মার্কিন যুক্ত রাজ্য এ বিষয়ে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। তথায় ধনী ব্যক্তিরা ক্যান্সার রোগের সম্বন্ধে গবেষণাগার স্থাপন এবং চিকিৎসকগণকে উৎসাহ প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন। ইয়োরোপও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। ফ্রান্স দেশে ইতঃপূর্ব্বেই দুইটি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছিল; সম্প্রতি আরও একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই সেদিন রু ক্রয় সেণ্ট সাইমন নামক স্থানে মহাসমারোহে তৃতীয় ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গেল! এখানে নার্সদিগকে শিক্ষাদান পূর্ব্বক ক্যান্সার রোগীকে শুশ্রূষা করিবার জন্য প্রস্তুত করা হইবে। অপর দুইটি ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট যথাক্রমে কুরি ইনষ্টিটিউটে এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনে স্থাপিত। এই দুইটি গবেষণাগার বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ও ছাত্রগণের জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত। তৃতীয় ইনষ্টিটিউটের উদ্বোধন উৎসবে ডাক্তার প্রাউষ্ট উল্লেখ করেন যে, ক্যান্সার রোগে প্রতি বৎসর ৫০০০০ লোক মারা পড়ে। ফ্রান্সে এই রোগে বার্ষিক মৃত্যু-সংখ্যা ৪০,০০০ এবং কেবল প্যারী নগরীতেই প্রতি বৎসর ৩০০০ লোক মরে। মৃত্যু সংখ্যার এরূপ আধিক্যের কারণ, ডাক্তার প্রাউষ্ট অনুমান করেন যে, লোকে সময় থাকিতে ইহার চিকিৎসা করায় না—রোগ দুরারোগ্য হইবার পর ডাক্তারের বাড়ী ছুটে। তখন ডাক্তার আর কি করিবেন—রোগ শিবেরও অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। গোড়ায় চিকিৎসা আরম্ভ হইলে ক্যান্সার রোগ আরোগ্য হইতে পারে। সে যাহা হউক, রোগের চিকিৎসা ও রোগ আরোগ্য করিবার জন্য প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ তাঁহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ভারতে ক্যান্সার রোগের পরিমাণ অল্প নহে। এ দেশেও ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ সংগ্রহ করিয়া ইহার সুচিকিৎসার জন্য ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

কুষ্ঠ রোগের প্রতিকার—

বিলাতে "মিশন টু লেপার্স" নামে একটি সমিতি আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যে কুষ্ঠ রোগ নিবারণ তাহার লক্ষ্য। সে দিন ভারত সচিবের কর্ম্মশালায় ভাইকাউণ্ট চেমস্‌ফোর্ডের নেতৃত্বে এই সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। সরকারী আদম সুমারীতে কিম্বা বার্ষিক স্বাস্থ্য বিবরণীতে কুষ্ঠ রোগীর যে সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাহা নির্ভুল বলিয়া মনে করা যায় না। নানা কারণে, বিশেষতঃ লজ্জা বশতঃ, লোকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলেও তাহা সহজে প্রকাশ করিতে চাহে না। এ দেশে কুষ্ঠ অতি ঘৃণিত রোগ, এবং কুষ্ঠরোগী ঘৃণার্হ বলিয়া বিবেচিত হয়। হিন্দুরা সাধারণতঃ বিবেচনা করেন, কুষ্ঠ রোগ মহাপাপের ফল। কাজেই কুষ্ঠ রোগ স্বীকার করিয়া লোকে মহাপাপী বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করে না। সেইজন্য সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সরকারী বিবরণে প্রকাশিত সংখ্যা অপেক্ষা প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশী। বিলাতী কুষ্ঠ মিশনের সভা অনুমান করেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যে পাঁচ হইতে দশ লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। আফ্রিকার নাইগেরিয়া প্রদেশে এক কোটী আশী লক্ষ লোকের মধ্যে নব্বুই লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। রোগ মাত্রেরই প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা হইলে তাহা আরোগ্য হইবার অনেকটা আশা ও সম্ভাবনা থাকে। রোগ পুরাতন হইয়া গেলে সে সম্ভাবনা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কুষ্ঠ রোগও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে। আমাদের বিবেচনায়, জনসাধারণ কুষ্ঠরোগীকে ঘৃণা করিতে বিরত হইলে, রোগীর লজ্জার কারণও অন্তর্হিত হইবে। তখন লোকে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইলেও রোগ গোপন করিবার চেষ্টা করিবে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে, রোগও নিরাময় হইবে। কুষ্ঠরোগ

যেরূপে সুস্থদেহে সংক্রামিত হয়, তাহা বিবেচনা করিলে কুষ্ঠরোগী মাত্রকেই মহাপাপী বলিয়া মনে করিবার কারণ থাকে না। তখন সহজেই বুঝা যায় যে, মহাপাপের অনুষ্ঠান না করিয়াও নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ লোকও কুষ্ঠ রোগক্রান্ত হইতে পারে। কুষ্ঠ রোগ নিবারণ করিতে হইলে যেমন সময়ে সুচিকিৎসার দরকার, তদ্রূপ লোকমতও গঠন করা দরকার, যাহাতে লোকে কুষ্ঠরোগীকে ঘৃণা না করে।

সম্পাদকের ডাকবাক্স

প্রশ্ন নং ১।—উষা পান কখন করিতে হয় এবং কি পরিমাণ জলপান করা উচিত? ইহার উপকারিতা কি কি, এবং অপকারিতাও কিছু আছে কি না?

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
গ্রাহক নং ২৩০৫

উত্তর নং ১।—উষা পান প্রাতঃকালে করিলেই চলে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে বেলা ৪টা নাগাত জলপান করাকে উষাপান বলা যায়। দেড় পোয়া হইতে অর্দ্ধসের জল এককালীন পান করা যাইতে পারে। উষা পান দ্বারা পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ ক্লেদ ও ময়লা সকল ধুইয়া যাইবে। শোষিত হইয়া এই জল রক্তের সহিত মিলিত হইয়া মূত্ররূপে বাহির হইয়া থাকে এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ অনেক ময়লা পরিষ্কার করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ এবং বাত, পাথরি প্রভৃতি রোগের উপকার হয়—সকল ঋতুতেই উষাপান করা যায়।

প্রশ্ন নং ২।—পল্লীগ্রামে যেখানে কলের জল পাওয়া যায় না, সেখানে সব সময় জল গরম করিয়া খাইলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় কি না? সারা জীবন যদি জল গরম করিয়া খাওয়া যায়, তাহাতে কি ক্ষতি হয়। অনেকে বলেন যে, নিয়ত গরম জল খাইলে অজীর্ণ রোগ হয়। ইহা কি সত্য? জলের সঙ্গে কি কি পদার্থ মিশ্রিত থাকে, এবং জল গরম করিলে উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি নষ্ট হয়? স্বাস্থ্যের পক্ষে গরম কিম্বা ঠাণ্ডা জল উপকারী?

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ।
গ্রাহক নং ৫৫৫

উত্তর নং ২।—জল গরম করিয়া খাইলে শরীরের কোন অপকার হয় না। অধিকন্তু গরম করা জল ব্যবহারে জল দ্বারা বাহিত (cholera, diarrhoea) রোগসকল দেহে প্রবেশ করিতে পারে না; যেহেতু জল গরম করিলে রোগ জীবাণু ধ্বংস হইয়া যায়। সারাজীবন গরম জল খাইলে কোন ক্ষতি নাই। গরম জল অজীর্ণ রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা কোনরূপ রোগ তৈয়ারি হয় না। তবে আহারের সহিত অত্যধিক গরম জল খাইলে পাচক রস ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় অজীর্ণ রোগ হইতে পারে। সেই জন্য আহারের ২।৩ ঘণ্টা পরে জল খাওয়া বিধেয়।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৬শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৩৪ সাল | ১২শ সংখ্যা

ভারতে ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে সার রোনাল্ড রসের অবদান। ম্যালেরিয়ার ইতিহাসে তাঁহার নাম সুবর্ণ অক্ষরে নিত্য অক্ষয় ভাবে চিরমুদ্রিত থাকিবে। ম্যালেরিয়ার বীজাণু আবিষ্কার ও ম্যালেরিয়ার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া তিনি মানব সমাজের যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বঙ্গদেশে, তথা, সমগ্র ভারতে আজ ম্যালেরিয়ার ন্যায় মানবের প্রবল শত্রু আর নাই। প্রতি বৎসর কত লক্ষ লোক যে একমাত্র ম্যালেরিয়া জ্বরে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, ভারতের স্বাস্থ্যের বার্ষিক বিবরণীতে প্রতি বৎসরই তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিতেছে। সেই বিবরণ লোমহর্ষণ, চমকপ্রদ, আতঙ্কজনক। ম্যালেরিয়ার ন্যায় দেশব্যাপী প্রাদুর্ভাব অপর কোন সংক্রামক রোগের দেখা যায় না।

স্যার রোণাল্ড রসের কর্ম্ম জীবনের আরম্ভ এই ভারতবর্ষে। যৎকালে তিনি সার্জ্জন মেজর পদবীতে সরকারী চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে তিনি ম্যালেরিয়ার কারণ, বাহন, গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সেই গবেষণার ফলে ম্যালেরিয়ার বীজাণুর (parasite) আবিষ্কার, তাহার বাহন নির্ণয় এবং প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ হয়। ম্যালেরিয়ার বিষ কিরূপে রুগ্ন মানব-দেহ হইতে মশকের মধ্যবর্ত্তিতায় সুস্থ মানব দেহে সংক্রামিত হয় এই অমূল্য তথ্য স্যার রোণাল্ড রসের গবেষণার ফলেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লাভেরান (Laveran) সর্ব্বপ্রথম ম্যালেরিয়ার জীবাণু (parasite) আবিষ্কার করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কিং অনুমান করেন যে, খুব সম্ভবতঃ মশকেরাই ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহনের কার্য্য করে। অতি প্রাচীনকালে রোমানরাও সন্দেহ করিতেন যে,

মশকেরা ম্যালেরিয়ার বিষ বহন করে। সেইজন্য ম্যালেরিয়ার আক্রমণ নিবারণের উদ্দেশ্যে রোমানরা মশারি ব্যবহার করিতেন। রোমানরা সম্ভবতঃ গ্রীকদের নিকট হইতে এই তত্ত্বটি শিক্ষা করেন। গ্রীকরা সম্ভবতঃ মিশরবাসীদের নিকট হইতে ইহা অবগত হইয়াছিলেন। হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র-গ্রন্থ-প্রণেতারা যথা সুশ্রুত প্রভৃতি পরোক্ষভাবে অনুমান করিতেন যে, মশকের সহিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধ আছে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সার্জ্জন মেজর রস যখন দীর্ঘ কালের জন্য ফার্লো বিদায় লইয়া বিলাতে গমন করেন, তখন ডাক্তার ম্যানসন মেজর রসকে বলেন যে, খুব সম্ভব মশকেরা ম্যালেরিয়ার বীজাণু বাহক। এই তথ্য সংগ্রহ করিয়া মেজর রস ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে তিনি সেই চিরস্মরণীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হন, যাহার ফলে মানব-সমাজ আজ তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। প্রথমে তিনি কিউলেক্স ও ইডেস নামক দুই শ্রেণীর মশক সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন এবং পরীক্ষার ফলে Zygote বা সঞ্চরণশীল ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের কীটাণু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। দুই বৎসর ব্যাপী পরীক্ষার ফলে রস এনোফেলিস মশকের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। এই জাতীয় মশকের পাখায় ডোরা দাগ আছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রস ম্যালেরিয়া-বীজ-দুষ্ট এনোফেলাইন মশকের দেহাভ্যন্তরে ম্যালেরিয়ার oocyst প্রাপ্ত হন। আরও দুই চারিবার পরীক্ষার পর এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া তিনি তাঁহার আবিষ্কারের বিবরণ প্রকাশের জন্য বৃটিশ মেডিক্যাল জর্ণালে প্রেরণ করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের জর্ণালে এই বিবরণ প্রকাশিত হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে রস কলিকাতায় আসিয়া নূতন করিয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ইতোমধ্যে ডাক্তার ম্যাকক্যালাম এক কাজ করিয়াছিলেন। যে প্যারাসাইটের দরুণ পারাবতের দেহে ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহার চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক নাম Hæmoproteus columbæ। এই পারাবত-জ্বরের প্যারাসাইটের জীবনাবর্ত্ত ম্যাকক্যালামের পরীক্ষার ফলে নির্দ্ধারিত হয়। ম্যাকক্যালাম উপরন্তু ম্যালেরিয়াল oocystএরও প্রকৃতি নির্ণয় করেন। তাঁহার আবিক্রিয়ার অনুসরণ করিয়া রস উহার সমশ্রেণীর (Plasmodium præcox) প্যারাসাইট বা পক্ষীজাতির ম্যালেরিয়া বীজাণু লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন; এবং তাহাদের ক্রম-পরিণতি, জীবনাবর্ত্ত প্রভৃতি নির্দ্ধারিত করেন। সেই বৎসরের জুন মাসে রস কিউলেক্স মশকের দেহজাত ম্যালেরিয়ার বীজাণু লইয়া সুস্থ পক্ষীদেহে ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপাদনে সমর্থ হইলেন। ক্রমে পরীক্ষা করিতে করিতে রস ম্যালেরিয়ার বীজাণুর জীবনকালের আরম্ভ হইতে তাহার বংশবৃদ্ধি এবং লয় পর্য্যন্ত সমগ্র অবস্থার বিবরণ আবিষ্কার করিলেন। এখন কেবল তাঁহার আবিক্রিয়ার ফলাফল মানব-দেহে পরীক্ষা করিয়া সমর্থন করা বাকী রহিল। আর মানব-দেহে যে ম্যালেরিয়া-বীজাণু জ্বর উৎপাদন করে, এনোফিলিস মশকের দেহে তাহা কিরূপে পরিণতি লাভ করে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক হইল।

ইতোমধ্যে ইটালীর চিকিৎসকেরা ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা রসের আবিষ্কৃত (prôte soma) লইয়া পরীক্ষা করিয়া এনোফেলিস মশকের দেহজাত ম্যালেরিয়ার বীজ হইতে মানব-দেহে জ্বর উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রস এনোফেলিস মশকের দেহে ম্যালেরিয়া বীজাণুর সমগ্র রূপান্তর ক্রিয়া পরিদর্শন পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন। কোচ এবং ড্যানিয়েলস প্রভৃতি চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ রসের পরীক্ষার সফলতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। রসের পরীক্ষার সম্পূর্ণ বিবরণ এবং তাঁহার অপূর্ব্ব আবিষ্কার বৃত্তান্ত তৎপ্রণীত মেমোয়ার্স নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রসের এই আবিষ্কারের

ফলে স্থির হইয়াছে যে, মানব ম্যালেরিয়ার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিতে পারে, এবং সর্ব্বাবস্থায় ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ। এ সম্বন্ধে এক্ষণে কাহারও মনে সন্দেহের লেশ মাত্র অবশিষ্ট নাই। তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য আবিক্রিয়ার ফলাফল বহু স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে; এবং তদ্দ্বারা ঐ স্থানের অধিবাসীরা মহোপকার লাভ করিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষ, যেখানে সর্ব্বাগ্রে এই সকল আবিষ্কারের সূচনা হয়, যে ভারতবর্ষ এই আবিক্রিয়ার উৎপত্তিস্থল—সেই ভারতবর্ষই ইহার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। হয়ত ভারতের সে সুযোগ নাই; হয়ত ভারতের অর্থ নাই; যে কারণেই হউক, ভারতের আবিষ্কৃত মানব সমাজের মহোপকারী তথ্যের দ্বারা ভারত কোন উপকার লাভ করিতে পারিল না। যেখানে অর্থ ও কর্ম্মীর অসদ্ভাব নাই, সেই স্থানেই ম্যালেরিয়া প্রশমিত হইতেছে। কোন কোন স্থান একেবারে ম্যালেরিয়া শূন্য হইয়াছে। রসের আবিষ্কৃত উপায়ে পানামা খাল, ইসমাইলিয়া, সুয়েজ খাল সাইপ্রাস, মরিসাস প্রভৃতি স্থান হইতে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে।

এক্ষণে নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, এনোফেলিস মশক ম্যালেরিয়ার বীজের বাহক; ম্যালেরিয়ার বীজ-দুষ্ট এনোফিলেস মশক দংশন করিলে লোকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এই সকল আবিষ্কৃত তথ্য সম্বন্ধে আর কোন অনিশ্চয়তা নাই বটে, কিন্তু, ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই; তাহা এখনও পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এনোফেলিস, কিউলেক্স এবং ইডেস শ্রেণীর মশকের জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। তাহাদের বংশবৃদ্ধির প্রণালী এবং জীবন যাপন প্রণালী—কিছুই জানিতে বাকী নাই। তদ্ব্যতীত নানা শ্রেণীর মশকের সম্যক পরিচয় গৃহীত হইয়াছে। তাহাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালী এবং অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সকল মশক ম্যালেরিয়ার বীজের বাহক, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। কোথায় তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাহারা কোথায় বাস করে, এবং কেমন করিয়া তাহারা ম্যালেরিয়া রুগ্ন লোকের দেহ হইতে ম্যালেরিয়া বিষ সংগ্রহ করিয়া সুস্থ দেহে সংক্রামিত করে, তাহাও স্থির হইয়াছে। কেমন করিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হয়, ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের চিকিৎসা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে নিরাময় করিতে হয়, সে সম্বন্ধেও গবেষণা হইয়াছে। ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয় প্রণালীর এতখানি উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, প্রকৃত ম্যালেরিয়া নির্ণয়ে এখন আর কোন সন্দেহ জন্মে না; ম্যালেরিয়ার লক্ষণযুক্ত অন্য জ্বরের সহিত প্রকৃত ম্যালেরিয়ার পার্থক্যও নির্ভুল রূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

ইদানীং ভারত গবর্মেণ্ট ম্যালেরিয়ার প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বোর্ড, ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়, ভারতীয় চা-কর সমিতি, এবং অন্যান্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় চিন্তা করিতেছেন। ভারতের সমর বিভাগ জেলা ও লোক্যাল বোর্ড, এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটি সমূহও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। সংবাদপত্রাদিতে আন্দোলন আলোচনার ফলে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে একটা জনমতও জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায়, দেশের আপামর সাধারণ ভারতের সর্ব্বপ্রধান স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন।

এখন অবশ্য ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা গিয়াছে; কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে অনেক তথ্য এখনও জানিতে বাকী রহিয়াছে। ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে এখনও অনেক গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের আবশ্যকতা আছে। এবং এই তদন্ত কার্য্য অবিশ্রান্ত ভাবে চালাইতে হইবে। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে এখনও অনেক প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে

ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট কিরূপে রোগের লক্ষণ উৎপাদন করে, তাহা এখনও আমাদের জানা নাই। অনেক ম্যালেরিয়াভিজ্ঞ ব্যক্তি অনেক রকম মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের কোনটাই নিশ্চিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। মনুষ্য-দেহে ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট কি ভাবে অবস্থিতি করে—রক্তকণিকাগুলির বহির্গাত্রে অথবা অভ্যন্তরে—কোথায় তাহারা থাকে, তাহাও আমরা এখনও জানি না। আর ম্যালেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হইবার পর মানুষ কেমন করিয়া তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে, এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। এ পর্য্যন্ত কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা এখন জানিতে পারিয়াছি যে, এনোফেলিস নামক এক জাতীয় মশক মানুষের দেহে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট চালান করিয়া দেয়। কিন্তু এই বিশেষ জাতীয় মশকের জীবনৈতিহাসের অনেক কথা এখনও আমাদের জানিতে বাকী রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া, এই জাতীয় মশকের সন্তানোৎপাদনের প্রণালী, কোন্ স্থলে তাহারা ডিম্ব প্রসব করে, এবং জল কিরূপ অবস্থায় থাকিলে তাহাদের ডিম্ব প্রসবে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়,—এ সকল কথা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। মশকের ডিম্ব নানা উপায়ে বিনষ্ট করা যাইতে পারে। যদি আমরা জানিতে পারি যে, ডিম্ব ফুটিয়া বাহির হইবার পর মশকের কীড়া কোন্ বস্তু ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, পুষ্টিলাভ করে এবং বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে জলে সেই বস্তুর অভাব ঘটাইয়া, মশকগুলিকে তাহাদের খাদ্যে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে পারি। অথবা যদি আমরা জানিতে পারি কোন্ জাতীয় কীট বা জন্তু মশক-শাবকের স্বাভাবিক শত্রু, তাহা হইলে তাহার চাষ করিয়া তাহাদিগকে মশক শাবকের বিরুদ্ধে বিনিয়োগ করিতে পারি। মশক-শাবকেরা কোন্ রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হয় জানিতে পারিলে, তাহাদের দেহে সেই রোগ উৎপাদনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। আরও জানা দরকার—সেই রোগ নিরাপদে, অর্থাৎ মানুষের কোন বিপদ না ঘটাইয়া উৎপাদন করা যায় কি না। এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। এই সকল সমস্যার নিরাকরণের উপায় সমূহের আলোচনা ও পরীক্ষা পূর্ব্বক নিশ্চিত ভাবে তাহাদের সমাধান করিবার জন্য বিজ্ঞানের নানা বিভাগে বহু সংখ্যক অনুসন্ধানকারী আবশ্যক।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপযোগী উপায় আবিষ্কার করা বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার। অতএব, কিরূপে এই অর্থ সংস্থান হইবে, তাহাও একটা বড় রকমের সমস্যা বটে। আপাততঃ যে ভাবে কার্য্য চলিতেছে, তাহা অতিমাত্র ব্যয়সঙ্কুল। যে সকল স্থলে ম্যালেরিয়ার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করা গিয়াছে, সেই সকল স্থান প্রচুর অর্থব্যয়ের পর তবে ম্যালেরিয়াশূন্য হইতে পারিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ। ভারতের দারিদ্র্য প্রবাদ বাক্যে পরিণত। অথচ, গোটা ভারতবর্ষটা ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতে বসিয়াছে। এই সমগ্র ভারতবর্ষকে ম্যালেরিয়াশূন্য করিতে হইবে। সে যে কত বড় বিরাট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব ভারতবর্ষকে ম্যালেরিয়াশূন্য করিতে হইলে এমন একটা উপায় বাহির করা চাই, যাহাতে সস্তায় কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।

ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্য সর্ব্বত্র একই ভাবে চলিতে পারে না। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে অনুসন্ধানের প্রকারভেদ হওয়া আবশ্যক। উপযুক্তভাবে তালিম দেওয়া লোক নির্ব্বাচন করিয়া কিছু সময়ের জন্য স্থানীয় অবস্থা অধিগত ও তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহারা সম্যকরূপে অনুসন্ধান করিয়া সেই স্থানের জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগী কার্য্য তালিকা প্রস্তুত করিবেন। অতএব আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য

তদন্ত কার্য্যের জন্য কতকগুলি লোককে যথোচিত ভাবে তালিম দেওয়া। এই সকল লোকের বিশেষ ভাবে এই কার্য্যের যোগ্য হওয়া চাই—এ কার্য্যে তাঁহাদের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও আগ্রহ থাকা চাই। যে কোন ডাক্তারী ছাত্র বা চিকিৎসক হইলে চলিবে না। মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করিবার পর অনুসন্ধানকারী ছাত্র-চিকিৎসকরা কিছুকাল সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষানবীশী করিবেন। ম্যালেরিয়ার কারণ, প্রাদুর্ভাব ও নিবারণের উপায় তাঁহাদের প্রধান অধ্যয়নের বিষয় হইবে। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ এবং এনোফেলিস মশক সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে, সে সমস্তই তাঁহাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাদের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট অধ্যয়নের বিষয় স্যার রোণাল্ড রসের গ্রন্থাবলী দিয়া আরম্ভ হইবে। স্যার রোণাল্ড রসের 'মেমোয়ার্স', ও 'প্রিভেন্সন অব ম্যালেরিয়া' অতি উপাদেয় পাঠ্য গ্রন্থ। তৎপরে ষ্টীফেন্স ও ক্রিষ্টোফার প্রণীত দি 'প্র্যাক্‌টিক্যাল ষ্টাডি অব ম্যালেরিয়া', ক্যাপ্টেন ক্রফোর্ড ও ডাক্তার চালাম প্রণীত 'মস্‌কুইটো রিডাক্‌সান ও ম্যালেরিয়া প্রিভেন্সন' এবং অপরাপর গ্রন্থকারের গ্রন্থ সকল পড়া চাই।

এখন, ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে রিসার্চ্চ করিতে গেলে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ? ব্যাপারটা যেরূপ বিরাট, তাহাতে সহসা এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা যে কিরূপ বিরাট ও ব্যাপক, তাহার সম্যক ধারণা করা সহজ নহে—অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাহার ধারণা করিতে সমর্থ। ম্যালেরিয়া একা ভারতবর্ষে আবদ্ধ নহে; ইহা জগদ্ব্যাপী রোগ! হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি বৎসর সমগ্র পৃথিবীতে ২০০০০০০০ লোক একমাত্র ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কেবল মাত্র ভারতবর্ষে ১৩০০০০০ লোক ম্যালেরিয়ায় ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই লোক ধ্বংস ব্যতীত, আর্থিক ক্ষতিও বড় অল্প নহে। যাহারা দৈহিক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, এরূপ লোক মারা গেলে, কিম্বা রোগজীর্ণ অবস্থায় অকর্ম্মণ্য ভাবে গৃহে বসিয়া বসিয়া কেবল অন্নধ্বংস করিতে বাধ্য হইলে, তাহারা সুস্থ শরীরে যাহা উপার্জ্জন করিতে পারিত, তাহা ক্ষতি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। সমগ্র পৃথিবীতে এই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বড় সামান্য নহে; এবং বৎসরে ইহার পরিমাণ পাঁচ কিম্বা ছয় কোটী পাউণ্ড ধরিলে কিছু মাত্র অসঙ্গত হিসাব হয় না। ম্যালেরিয়া শরীরকে এমন ভাবে জীর্ণ করিয়া ফেলে যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা চির-জীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই সকল চিররুগ্ন ব্যক্তিরা অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা হারাইয়া সমাজের পক্ষে ভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, এবং পরোক্ষ ভাবে সমাজের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়া পড়ে। অতএব রিসার্চ্চের ফলে যদি ম্যালেরিয়া নিবারণের কোন সুফলপ্রদ উপায় আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য বড় অল্প হইবে না।

অন্যান্য রোগের পক্ষে যেমন, তদ্রূপ, দুই উপায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। যথা, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে নিরাময় করিয়া, এবং রোগের আক্রমণ নিবারণ করিয়া। ম্যালেরিয়ার বীজাণু যখন রোগীর রক্তে অবস্থিতি করে, তখন তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া রোগীকে নিরাময় করা যায়। অথবা, এনোফেলিস মশক ধ্বংস করিয়া রুগ্ন মানবের দেহ হইতে ম্যালেরিয়ার বিষ সুস্থ মানবের দেহে চালনা করা রোধ করিতে পারা যায়। এই উভয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট রিসার্চ্চ করিবার বিষয় রহিয়াছে। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা ও তাহার প্রতিরোধ সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমরা আজ পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাকে কোন মতেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ বলা যায় না; এবং এমনও মনে করা যায় না যে, যে জ্ঞান অর্জ্জন করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, আর কোন রিসার্চ্চের প্রয়োজন নাই।

অপরাপর রোগের বহু ঔষধ আছে। কতক রোগের হাজার হাজার ঔষধ আছে; কতক রোগের শত শত আছে। কিন্তু ম্যালেরিয়ার ঔষধ মাত্র একটি—সবেধন নীলমণি—কুইনাইন। কোন না কোন আকারে কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করিবার জন্য আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। কিন্তু কুইনাইনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। এদিকে ম্যালেরিয়া জগদ্ব্যাপী রোগ। সুতরাং ম্যালেরিয়ার রীতিমত চিকিৎসা করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন আবশ্যক। এত কুইনাইন পৃথিবীতে বোধ হয় উৎপন্নই হয় না। তদ্ব্যতীত সিঙ্কোনা বৃক্ষের ত্বক হইতে কুইনাইন নিষ্কাশন করা অতি ব্যয় সাধ্য ব্যাপার। যদি কোন অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে এবং অল্প ব্যয়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিতে পারা যায়, অথবা, বিশুদ্ধ কুইনাইনের পরিবর্ত্তে সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে যাহারা উচ্চ মূল্যে কুইনাইন ক্রয় করিতে অসমর্থ, সেরূপ লোকরাও কুইনাইন ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে। সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ ব্যবহৃত হইলেও কুইনাইন ব্যবহারের সমান ফলই পাওয়া যায়। কুইনাইনের মূল্যাধিক্য নিবন্ধন ভারতের গ্রাম্য ডিস্‌পেন্‌সারীগুলির কার্য্য ভালরূপ চলে না। যথেষ্ট অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কুইনাইন ক্রয় করিয়া তাহারা ভাণ্ডারে মজুত রাখিতে পারে না। অথচ, এদেশের পল্লীগ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়াই সর্ব্বপ্রধান রোগ; কাজেই কুইনাইনের প্রয়োজনও অত্যন্ত অধিক। বঙ্গদেশের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ম্যালেরিয়াই বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপক রোগ। গ্রাম্য ডিস্‌পেন্‌সারীতে সাধারণতঃ যাহারা চিকিৎসার্থ উপস্থিত হয়, তাহাদের শতকরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশীর ভাগ রোগীই ম্যালেরিয়া পীড়িত। বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে ডিস্‌পেন্‌সারীর সংখ্যা অধিক নহে; কাজেই তাহারা পরস্পর হইতে বহু দূরে দূরে অবস্থিত। হয় ত বিশ-পঁচিশখানি গ্রামের জন্য এক একটি করিয়া ডিস্‌পেন্‌সারী আছে কি না, সন্দেহ স্থল। এই সমুদায় গ্রাম্য ডিস্‌পেন্‌সারী প্রায়শঃ মিউনিসিপ্যালিটী বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সম্পত্তি। হয় একজন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, না হয় একজন সাব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের তত্ত্বাবধানে ডিস্‌পেন্‌সারীগুলি রক্ষিত। তাহাদের প্রধান কাজ—কিম্বা একমাত্র কাজ বলিলেও চলে—সমাগত বহুসংখ্যক রোগীকে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন মিকশ্চার সরবরাহ করা। রোগীদের মধ্যে অনেকে বহু ক্রোশ দূর হইতে কিঞ্চিৎ কুইনাইন্ মিকশ্চার পাইবার প্রত্যাশায় আসিয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করা তেমন কঠিন নহে; ইহাতে কোন বাধা বিঘ্নও নাই। ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয় করা সহজ ও নিশ্চিত। চিকিৎসার ফলও দ্রুত ও নিশ্চিত। তবে চিকিৎসাটা ঠিক মত হওয়া চাই। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এত সহজ চিকিৎসাও ঠিক মত হইয়া উঠে না। যদি রোগী শিশি লইয়া আসে, তবে সে তিন মাত্রা কুইনাইন মিক্‌শ্চার প্রাপ্ত হয়। যদি সে শিশি না লইয়া আসে,— এবং অনেকেই তাহাই করে, শুধু হাতে আসে,—তাহা হইলে সে মাত্র এক মাত্রা ঔষধ পায়; কারণ, ডিস্‌পেন্‌সারী হইতে রোগীকে শিশি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা নাই। এবং প্রত্যেক রোগীকে প্রত্যেকবার শিশি সরবরাহ করা সম্ভবপরও নহে। কারণ, তাহাতে ব্যয় অত্যন্ত অধিক পড়ে। যে দেশে দারিদ্র্য প্রবাদ বাক্যে পরিণত, যে দেশে কোন প্রকারে অতি কষ্টে সৃষ্টে সামান্য একটি ডিস্‌পেন্‌সারী স্থাপিত হয়, সেই গরীব দেশে রোগীকে ঔষধ দেওয়াই যথেষ্ট বলিতে হইবে। তাহার উপর শিশি সরবরাহের ব্যয় কে দিবে? অতএব, যে শিশি লইয়া আসে না, সে এক মাত্রার বেশী ঔষধ পাইবার আশা করিতে পারে না। যে একমাত্রা ঔষধ সে পায়, তাহা সে সেইখানেই তখনই সেবন করে। হয়ত একটা মেজার-গ্লাসে কিম্বা একটা শিশিতে করিয়া তাহাকে ঐ একমাত্রা ঔষধ দেওয়া হয়। সে ঔষধ সেবন করিয়া গ্লাসটি বা শিশিটি ধুইয়া ফেরৎ দেয়; এবং তাহাতেই অপর একজন রোগীকে একমাত্রা

ঔষধ দেওয়া হয়। সেও ঔষধ সেবন করিয়া পাত্র ফিরাইয়া দিলে তৃতীয় রোগী ঔষধ পায়; এবং এই ভাবে ঔষধ বিতরণ কার্য্য চলিয়া থাকে। সাধারণ নিয়মানুসারে অর্থাৎ ডিস্‌পেন্‌সারীর ফার্ম্মাকোপিয়ার বিধান মতে এক আউন্স জলে দশ গ্রেণ কুইনাইন মিশ্রিত করিবার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার অর্দ্ধেকও মিশ্রিত হয় কি না সন্দেহ। তাহার কারণ, যথেষ্ট কুইনাইনের অভাব; অথচ, রোগীর সংখ্যা প্রচুর। রোগীর সংখ্যার উপর কুইনাইনের মাত্রার পরিমাণ নির্ভর করে। রোগীর সংখ্যা যত বেশী হয়, কুইনাইনের পরিমাণও তদনুসারে কমিয়া থাকে। সুতরাং সময় সময় প্রতি আউন্স জলে কুইনাইনের মাত্রা যে পাঁচ গ্রেণেরও কম হইয়া থাকে তাহা বিচিত্র নহে। যে রোগী benign tertian type এর ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে তাহার অন্ততঃ উপর্য্যুপরি তিন দিন ধরিয়া প্রত্যহ ৩০ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন জল মিশ্রিত অবস্থায় সেবন করা কর্ত্তব্য। তবেই কিঞ্চিৎ ফল লাভের আশা করা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রোগী ইহার শতাংশ মাত্র সেবন করিতে পায়। গ্রাম্য ডিস্‌পেন্‌সারীতে চিকিৎসার্থ সমাগত প্রত্যেক ম্যালেরিয়া রোগীকে ৯০ গ্রেণ কুইনাইন সরবরাহ করা এ বাঙ্গলা দেশে আকাশ-কুসুমের অপেক্ষাও অসম্ভব ব্যাপার। বঙ্গের গ্রাম্য ডিস্‌পেনসারীতে এ কথা কল্পনা করিতেও কেহ সাহস করে না। বলা বাহুল্য, ইহার একমাত্র কারণ—অর্থাভাব। অতএব, চিকিৎসা সম্পূর্ণ হইবে, এমন কেহ আশা করিতে পারে না এবং চিকিৎসার ফলও সুতরাং সন্তোষজনক হয় না। প্রতি বৎসর এক একটি ডিস্‌পেন্‌সারীতে যে পরিমাণ কুইনাইন খরচ করা আবশ্যক হইতে পারে, সেই পরিমাণ কুইনাইন ক্রয় করিবার পক্ষে ডিস্‌পেন্‌সারীর বার্ষিক বরাদ্দ টাকা যথেষ্ট নহে। অতএব ডিস্‌পেন্‌সারীগুলিকে বাধ্য হইয়া একরূপ বিনা কুইনাইনেই ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা চালাইতে হয়; প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প মাত্রায় কুইনাইন দিয়া রোগীকে সন্তুষ্ট করিতে এবং নিজেদের সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সমস্ত বৎসর চালাইবার মত হিসাব করিয়া নির্দ্ধারিত মাত্রার অর্দ্ধেক অথবা তদপেক্ষাও অল্পপরিমাণ কুইনাইনের সহিত প্রচুর জল মিশাইয়া কুইনাইন মিক্সচার প্রস্তুত করিতে হয়। পূর্ণ-মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিতে গেলে সমস্ত বৎসর কুলায় না; বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই কুইনাইন ফুরাইয়া যায়; এবং অর্থাভাবে নূতন কুইনাইন সংগ্রহ করিবারও সামর্থ্য থাকে না। অল্প ব্যয়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিতে পারিলে কুইনাইনের মূল্য হ্রাস হইতে পারে; এবং বরাদ্দ টাকাতেই অধিক পরিমাণে কুইনাইন সংগৃহীত হইতে পারে। অথবা আর এক কাজও করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ কুইনাইনের অপেক্ষা সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজের মূল্য কম; অথচ ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় তাহা কুইনাইনের সমান ফলপ্রদ। কুইনাইনের পরিবর্ত্তে সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইলে, কুইনাইন সমস্যার সমাধান হইতে পারে। সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজের ম্যালেরিয়া নিবারণের শক্তি পরীক্ষা ও তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্মেণ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটির তদন্তের ফলে স্থির হয় যে ম্যালেরিয়া নিবারণে সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ কুইনাইনের সমান উপকারী। কুইনাইনের যখন এতই অভাব, তখন তৎপরিবর্ত্তে সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে জেসুইট সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সিঙ্কোনা-ত্বক সর্ব্ব প্রথম ইয়োরোপে প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপূর্ব্বে পেরু দেশের আদিম অধিবাসী "ইণ্ডিয়ান"রা সিঙ্কোনার ম্যালেরিয়া জ্বর নিবারণের শক্তি আবিষ্কার করিয়াছিল। সিঙ্কোনা বৃক্ষের ত্বকস্থিত নানা প্রকার ঈষৎ ক্ষার-ধর্ম্মী পদার্থ সকলের মধ্যে কুইনাইন অন্যতম। এই কুইনাইন বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিবার প্রথা বিলক্ষণ জটিল ও বহুব্যয়সাধ্য। কুইনাইন শোধন করিবার ব্যয় এত অধিক পড়ে যে, উহার এতাদৃশ উপকারিতা সত্ত্বেও উহা সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারে আসিতে পারিতেছে না। অথচ এই ব্যয় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

কুইনাইন প্রস্তুত করিবার ব্যয়াধিক্য বশতঃ যে সকল ওলন্দাজ সিঙ্কোনা গাছের চাষ করিয়া থাকে, তাহারা বহু বৎসর ধরিয়া কুইনাইন প্রস্তুত করিবার পরিমাণ সংযত করিয়া রাখিয়াছে। নচেৎ বাজারে মালের পরিমাণের আধিক্য ঘটিলে স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মূল্য হ্রাস হইতে বাধ্য; কিন্তু তাহাতে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার খরচা পোষাইবে না; পড়তা অপেক্ষা কম দরে মাল বিক্রয় করিতে হইলে লোকসান সহ্য করিতে হইবে। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া দরিদ্রের ব্যাধি এ কথা সকলেই জানেন। বাঙ্গলা দেশে ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রাদুর্ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বাঙ্গলার স্বাস্থ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ বেণ্টলী সাহেব পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালী জাতি স্বভাবতঃ দরিদ্র। তাহারা দুই বেলা পূর্ণাহার করিতে পায় না। সেইজন্য তাহাদের রোগ-প্রতিষেধের স্বাভাবিক শক্তি কমিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বাধা দিতে পারিতেছে না। সেইজন্যই বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব। অন্যান্য দেশের সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। যে দেশ যত দরিদ্র, সেই দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবও তত বেশী। ঠিক এই নিয়মে, কোন দেশে ম্যালেরিয়ার অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব দেখিলে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধের ন্যায়, সে দেশ যে অত্যন্ত দরিদ্র তাহাও স্বচ্ছন্দে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারা যায়। দরিদ্র দেশের দরিদ্র অধিবাসীরা, যাহারা দুইবেলা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, তাহারা এত অধিক মূল্যের ঔষধ সংগ্রহ কিরূপে করিবে? বিশেষতঃ, এক একজন ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীকে নিরাময় করিতে এই বহুমূল্য ঔষধ প্রচুর পরিমাণেই আবশ্যক হইয়া থাকে। অথচ, একবার আরাম হইবার পর, দ্বিতীয়বার যে সে পুনরায় ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইবে না, এ কথাও জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। বহু অর্থব্যয় করিয়া যথেষ্ট কুইনাইন সেবন করিলেও লোকের পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দূর হয় না। জাতি সঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিয়োজিত একটী সাবকমিটি কুইনাইনের মূল্য হ্রাস করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছেন। কমিটির চেষ্টায় কুইনাইন প্রস্তুত করিবার পড়তা যদি কম হয়, কুইনাইন যদি সস্তা হয়, সে ত ভাল কথাই। তবে কত দিনে তাহা হইবে, কিম্বা আদৌ তাহা হইবে কি না, সে কথা এখনও বলা যায় না। যত দিন তাহা না হয়, ততদিন কুইনাইনের সাধারণ সংস্করণ (popular edition)—সস্তার সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজের ব্যবহার চলুক; এবং রাজ সংস্করণ অর্থাৎ খোদ কুইনাইন ধনীদিগের জন্য থাকুক।

কুইনাইন এবং কুইনাইন ঘটিত অন্য নানা প্রকার ঔষধ ব্যতীত ম্যালেরিয়ার অপর কোন বিশ্বাসযোগ্য ঔষধ নাই—ইহাই প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিমত। আমরা অবশ্য এ মতে নির্ব্বিচারে সায় দিতে পারি না। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ কি না, কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার অপর কোন নির্ভরযোগ্য ঔষধ আছে কি না, সে সম্বন্ধে আমাদের মতামত আমরা পরে ব্যক্ত করিব। কিম্বা বর্ত্তমান প্রবন্ধ যদি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তবে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বারান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ আমরা শুধু এই কথাটি বলিয়া রাখিতেছি যে, ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়ার যে প্রস্তাব সম্প্রতি উত্থাপিত হইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যদি কোন দিন বাস্তব সত্যে পরিণত হয়, যদি কোনদিন ইণ্ডিয়ান অথবা বেঙ্গল ফার্ম্মাকোপিয়া যথার্থই গড়িয়া উঠে, তখন দেখা যাইবে যে, প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের ঐ মত নিছক সত্য নয়—ভারতের অক্ষয় ঔষধির ভাণ্ডারে এমন ঔষধ রহিয়াছে, যাহাকে নির্ব্বিবাদে ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; এবং তখন তদ্দ্বারা বিশ্ব-জগৎ নিশ্চয়ই উপকৃত হইবে। এখন আমরা যখন প্রতীচ্য প্রণালীতে ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তখন আমরা আমাদের আলোচনা প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি।

এখন বর্ত্তমান অবস্থায় চাই কি—প্রধান অভাব কি? চাই এমন কোন সস্তা অথচ শক্তিশালী ঔষধ যাহা ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত হইতে প্যারাসাইটগুলিকে নিঃশেষে বিদূরিত করিতে পারে। পেরুনিবাসী "ইণ্ডিয়ান"রা সিঙ্কোনা ত্বকের অদ্ভুত গুণ আবিষ্কার করিয়াছিল, সে আবিষ্কার দৈবক্রমে ঘটিয়াছিল। তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণার ফল নহে—তাহা প্রাক্-বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণাকারীদের প্রধান লক্ষ্য হইবে একটি, কি দুইটি কিম্বা ততোধিক এমন ঔষধ আবিষ্কার করা যাহা বিজ্ঞানসম্মত, নিশ্চিত এবং প্রকৃত ম্যালেরিয়া-নাশক ঔষধ হইবে। যদি গবেষণা সফল হয়—যদি ম্যালেরিয়ার কোন অব্যর্থ, ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কৃত হয়, তবে গবেষণার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহার সহস্রগুণ অর্থ আদায় হইয়া আসিবে। ঔষধ যাহাই হউক না কেন, তাহা অব্যর্থ ফলপ্রদ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্মত হইলেই যথেষ্ট হইবে। ঔষধটি যদি ফলপ্রদ হয় তবে তাহা সেরাম, ভ্যাক্সিন, জঙ্গলী গাছগাছড়া, রাসায়নিক ঔষধ কিম্বা আর যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না—সুফলপ্রদ যে কোন ঔষধই সমান আদরনীয় হইবে।

ম্যালেরিয়ার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। ম্যালেরিয়ার বাহক মশককুল ম্যালেরিয়া বিস্তারে ঠিক কি ভাবে কাজ করে, সে সম্বন্ধেও এখনও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে এখনও A maculipennis এবং A bifurcatus নামক দুই জাতীয় অতি বিপজ্জনক দাগী বদমায়েস ম্যালেরিয়া-বীজবাহক মশা অবাধে রাজত্ব করিতেছে, তথাপি ইংলণ্ড হইতে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত হইল কেন? পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান লেখক একদা বাঙ্গলার কোন ম্যালেরিয়া-পীড়িত গ্রামে গমন পূর্ব্বক চারি দিন বাস করিয়া আসিয়াছেন। তিন রাত্রি তথায় বাস করিয়াও এক দিনের জন্য তিনি মশক দংশন যাতনা সহ্য করেন নাই, মশাও দেখিতে পান নাই। তিনি মশারি খাটাইয়া শুইতে পারেন না—তাহাতে তাঁহার কেমন (বদ্ধ হাওয়ায় দরুণ) হাঁপ লাগে। গ্রামে মশা থাকিলে তিন রাত্রি চারি দিনের মধ্যে তিনি কোন না কোন সময়ে অন্ততঃ একবারও মশক দংশন যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হইতেন। অথচ, সে গ্রামে ভয়ানক ম্যালেরিয়া। গ্রামের অধিকাংশ লোকেই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত। দুই চারি দিনের জন্য সেই গ্রামে গেলেও নিস্তার নাই—ম্যালেরিয়া ধরিবেই। তবে সাবধান থাকিলে ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। সে গ্রামের পুকুরগুলির জল অত্যন্ত খারাপ। গ্রামের লোকদের বিশ্বাস—সেই সকল পুকুরের জলেই ম্যালেরিয়ার বিষ মিশ্রিত থাকে। পুকুরে স্নান করিলে, পুষ্করিণীর জল পান করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান লেখক কিন্তু সাবধানে থাকায় ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হন নাই। তিনি যে গৃহস্থের বাটীতে ঐ কয় দিন ছিলেন, সেই বাড়ীর লোকেরা পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ায় অনেক ভুগিয়াছেন। বাড়ীর যে সকল লোক কলিকাতায় বাস করেন, তাঁহারা দুই চারি দিনের জন্য গ্রামে নিজ বাটীতে গমন করিলেই ম্যালেরিয়া লইয়া আসিতেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহারা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছেন। পূর্ব্বে পুকুর ব্যতীত তাঁহাদের জল পাইবার অন্য কোন উপায় ছিল না। সম্প্রতি বাটীর প্রাঙ্গণে একটি গভীর ইন্দারা খনন করানো হইয়াছে। তাহার জল বেশ পরিষ্কার, নির্দ্দোষ। বাড়ীর লোকেরা এখন সেই ইন্দারার জল ব্যতীত পুকুরের জল ব্যবহার করেন না। কাজেই তাঁহাদের এখন আর ম্যালেরিয়াও হয় না। জল ভাল বলিয়া প্রতিবাসী গৃহস্থরাও তাঁহাদের সেই ইন্দারা হইতে পানীয় ও রন্ধনের জল লইয়া যান। লেখকও সেই জল ব্যবহার করিতেন; কাজেই তিনি নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা নিশ্চিত জানেন পুকুরের জলই ম্যালেরিয়ার বিষে পূর্ণ।

কোন কোন বড় পুকুরে এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ—পানা কিম্বা ঝাঁজি জন্মে। গ্রামের লোকেরা তাহার নাম দিয়াছেন ম্যালেরিয়া-পানা। সেই পুকুরটী অতি প্রকাণ্ড, তাহার জলও আপাত-দৃষ্টিতে বেশ পরিষ্কার: কিন্তু তাঁহারা তাহার জল স্পর্শ করিতেও সাহস করেন না। লেখক সেই জল কিঞ্চিৎ হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়া পানাও গোটাকতক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গ্রামের লোকেরা তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন; এবং ম্যালেরিয়ার ভয় দেখাইয়াছিলেন। মাছ ধরিবার জন্য জেলেরা পুকুরে নামিতে ভয় পায়—পাছে ম্যালেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়। গ্রামখানি বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান জেলা ম্যালেরিয়ার বিস্তৃত আড়ত। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের অবস্থাই এইরূপ। মশক ম্যালেরিয়ার বাহন হউক আর নাই হউক, ম্যালেরিয়া তৈয়ারীর কারখানা বাঙ্গালার গ্রাম্য পুকুরগুলি। মশারি খাটাইয়া নিদ্রা যাইলে মশক দংশনের জ্বালা হয়ত সহিতে হইবে না; কিন্তু তাহাতেই কি ম্যালেরিয়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে? ম্যালেরিয়া বিষের কারখানা—পুকুরের জল ব্যবহার না করিয়া ত তাহারা পারিবে না। আর, আমাদের বোধ হয়, গ্রামবাসীদের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত নহে। পুকুরই ম্যালেরিয়ার আকর; পুষ্করিণীজাত পানাই ম্যালেরিয়া-বীজাণুর আশ্রয় স্থল। মশক-বংশ ধ্বংস হউক, কুইনাইন সেবনও চলুক, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু উপায়ান্তর অবলম্বন করাও অপরিহার্য্য। পুষ্করিণীগুলির আশু সংস্কার সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য: নূতন পুষ্করিণী কাটাইয়া সুপেয় জলের সংস্থান করাও আবশ্যক। তা'ছাড়া, বর্ত্তমান পুষ্করিণীর জল যথাসম্ভব ব্যবহার না করাই উচিত। গভীর নলকূপ অথবা সুগভীর ইন্দারা খনন করাইয়া তাহার জল স্নান ও পানার্থ ব্যবহার করা উচিত। তাহা হইলে, কুইনাইনের অভাব সত্ত্বেও, নূতন সস্তা ঔষধ আবিষ্কৃত না হইলেও, ম্যালেরিয়াকে ভয় করিবার তাদৃশ কারণ থাকিবে না।

কিন্তু কেবল একমাত্র জলকেই, কিম্বা মশাকেই কেবল ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী করিলে চলিবে না—আমরাও করিতেছি না। আবহাওয়া, স্থানীয় অবস্থা, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, উত্তাপ, ভূমির উচ্চতা বা নিম্নতা ইত্যাদি নানা বিষয় স্বতন্ত্র বা সমবেতভাবে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া পীড়িত অবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারে। গবেষণাকারী কর্ম্মিগণকে এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সকল বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে হইবে। আর দেশের সর্ব্বত্র একই প্রণালীতে কার্য্য করিলে চলিবে না—বিভিন্ন স্থানের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রত্যেক স্থানের বিশেষত্ব অনুধাবন করিয়া সেই স্থানের উপযোগী বিশেষ প্রকার কার্য্য প্রণালী প্রস্তুত করিতে হইবে।

তারপর মশকের কথা। ধরিয়া লওয়া যাউক—মশকই ম্যালেরিয়ার জন্য একমাত্র দায়ী। যদি তাহা সত্যই হয়, তাহা হইলে মশক বংশ ধ্বংস করিবার উপায় কি? ইহাও একটা মস্ত বড় সমস্যা। সত্য কথা বলিতে কি—সম্পূর্ণরূপে মশক ধ্বংসের উপায় নাই বলিলেই হয়। পর্দ্দা, মশারি, সূক্ষ্ম তারের জাল, এবং মশক দূর করিবার সকল উপায়ই পরীক্ষা দেখা হইয়াছে—কোনটাই মশককে সম্যকরূপে আটকাইতে পারে না। ইহারা আকারে অতি ক্ষুদ্র জীব হইলেও অতিশয় ধূর্ত্ত। ইহাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়া দেখা হইয়াছে,—কিন্তু কোথা দিয়া যে তাহারা আসিয়া হাজির হয়, কিছুতেই জানা যায় না। উত্তমরূপে মশারি খাটাইয়া শয়ন করা গেল; সকালে উঠিয়া দেখা গেল, মশারির ভিতর অসংখ্য মশা। অন্য উপায়গুলিও এইরূপ নিষ্ফল।

ছোট ছোট ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ধূনা, গন্ধক ইত্যাদি পোড়ানো যাইতে পারে। হয়ত ইহাদের ধূমে বা গন্ধে মশকেরা তখনকার মত প্রস্থান করিবে বটে, কিন্তু ধূম-গন্ধ ঘর হইতে বিদূরিত হইলেই তাহারা যথাসময়ে আসিয়া হাজির হইবে। সুতরাং এই উপায়ও অনিশ্চিত। মশা ধরিয়া ধরিয়া মারা যায় বটে, কিন্তু সে আর কয়টা? বিশেষতঃ

পক্ষ-বিশিষ্ট প্রাণীকে ধরিয়া মারা বিলক্ষণ আয়াসসাধ্য ও তাহার ফলাফল অনিশ্চিত। ফাঁদ পাতিয়া মশা ধরা যায় না; এমন কোন ফাঁদ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃতও হয় নাই। মশকের কোন স্বাভাবিক শত্রু পাওয়া গেলে তাহাদিগকে মশক বধে নিয়োজিত করা যাইতে পারে।

মশা দমনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—তাহাদের শাবকগুলিকে ধ্বংস করা। মশকী জলে ডিম পাড়ে। সেই ডিম হইতে মশক-শাবক বাহির হয়। কুঁজা বা কলসীর জল দুই তিন দিন বদলানো না হইলে তাহাতে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র কীট কিল্‌বিল্ করিতে দেখা যায়। উহারাই মশক-শাবক। ইহারা অতি মাত্র চঞ্চল—এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে না। প্রথম অবস্থায় ইহাদের নাম larvae। একটু বড় হইলে ইহারা pupae নামে অভিহিত হয়। মশক-শাবকের পূর্ণ পরিণতি ঘটিলে তাহাদিগকে পক্ষহীন মশকের ন্যায় দেখায়। তখন তাহারা জলের উপরে স্থির ভাবে ভাসিতে থাকে ও বায়ু সেবন করে। কিছুকাল পরে তাহাদের পক্ষোদ্গম হইলে তাহারা মশা হইয়া উড়িয়া যায়। ইহারা যতক্ষণ জলের মধ্যে বাস করে, সেই সময়েই যা ইহাদিগকে ধ্বংস করা যায়।

স্রোতোহীন যে কোনরূপ জলেই মশকীরা ডিম প্রসব করিয়া থাকে। ডোবা, টিনের ক্যানেস্তারা, বাল্‌তি, খানা, নর্দ্দমা, খাত, পুকুর, ক্ষুদ্র জলাশয়,—কোন বাছ বিচার নাই—জল পাইলেই হইল। এই সকল জলাধারে সকল সময়ে জল না থাকিলেও বর্ষাকালে ইহাদের অধিকাংশেই জল থাকে। আর গৃহস্থের ব্যবহার্য্য জলপাত্রের জল দু'তিন দিন না বদলাইলেই তাহাতে মশারা ডিম পাড়িয়া রাখিয়া যায়। বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে অনেক অব্যবহার্য্য পরিত্যক্ত পাত্রেও বৃষ্টির জল জমিয়া থাকিয়া মশকের ডিম পাড়িবার সুবিধা করিয়া দেয়। ম্যালেরিয়া-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরামর্শ দেন যে, এই সকল জলাশয় হইতে জল বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। জল বাহির করিয়া দেওয়ার সুবিধা না হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক মশক-শাবক ধ্বংস করিতে হইবে। জলের উপর একস্তর কেরোসিন বা অন্য প্রকার তৈল ঢালিয়া দেওয়া যায়। ফলে তৈল ভেদ করিয়া বায়ু গ্রহণ করিতে না পারিয়া বাচ্চাগুলি মরিয়া যায়। জলাভূমি হইতে জল বাহির করিয়া দিতে পারিলে মশাদের ডিম পাড়িবার অসুবিধা হয়—সেটা একটা লাভ। দ্বিতীয়তঃ এই ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা—ইহাতে শস্যাদির চাষ বেশ ভালই হয়। সুতরাং জল বাহির করিবার খরচা ষোলআনা উসুল হইয়া বরং লাভই থাকিয়া যায়। আমেরিকার অনেক জলাভূমি কেবল চাষ বাসের জন্য জলশূন্য করা হইয়াছিল; ফলে সেই জমিতে শস্যও ভাল রকমই জন্মিয়াছিল; অধিকন্তু সেই প্রদেশে পূর্ব্বে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল; জমি উদ্ধারের পর ম্যালেরিয়াও কমিয়া যায় কিম্বা একেবারে অন্তর্হিত হয়। তবে সকল স্থলে জল বাহির করিবার সুবিধা না থাকায় তৈল প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু তৈল ব্যবহারের সাফল্য সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। কারণ, ইহা ব্যয়সাধ্য। সে টাকা অন্য কোন রকমে ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ তৈল যে জলের উপরিভাগে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া বায়ু রোধে সমর্থ হইবে, এ কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তৃতীয়তঃ তৈল প্রয়োগে যেমন মশকের বাচ্চাগুলি মরিয়া যাইবে, তদ্রূপ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীও বাঁচিবে না। অকারণ এরূপ জীব হত্যা অনর্থক ও অনাবশ্যক। যে সকল জলাশয়ের জল মানুষের কোন ব্যবহারে আসে না, অনেকে তাহাতে আর্সেনাইট অব কপার বা ঐরূপ বিষাক্ত অপর কোন রাসায়নিক পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া মশক-শাবক ধ্বংস করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। অর্থের যথেষ্ট সংস্থান থাকিলে এইরূপ মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে ইহার ফলাফল এখনও নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া-পীড়িত স্থানগুলিতে যেরূপ জলাভাব,

তাহাতে তৈল বা রাসায়নিক প্রয়োগ করিয়া কিম্বা জল বাহির করিয়া দিয়া দরিদ্র গ্রামবাসীদের জল ব্যবহারে বঞ্চিত করা সঙ্গত বিবেচনা করা যায় না।

মশক ধ্বংস করার সম্বন্ধে আমাদের একটা কথা মনে হয়। ঈশ্বরের সৃষ্ট একটা প্রাণীকে ঝাড়ে বংশে বিনষ্ট করা কতদূর সম্ভবপর বা সঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে আত্মরক্ষার্থ মাত্র আমরা এই কার্য্যটি করিতে পারি। বাঙ্গালা দেশের গ্রাম অঞ্চলে অনেক বড় বড় পুকুর আছে, অনেক ছোট ছোট ডোবা-খানাও আছে। বড় বড় পুষ্করিণীগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়। জলাভাবে তাহাদের অনেক-গুলি শুষ্কপ্রায়; আর অনেকগুলিতে পঙ্ক জমিয়া সে গুলি মজিয়া আসিয়াছে। এই পুষ্করিণীগুলির সংস্কার সাধন করাইয়া তাহাতে প্রচুর সুপেয় জল সংস্থান করিলে, এবং ছোট ছোট খানা. ডোবা বা নীচু জমি, যেখানে বর্ষায় জল জমে, অন্য সময়ে শুকাইয়া যায়, সেই সকল ক্ষুদ্র জলাশয় ভরাট করিয়া ফেলিলে যথেষ্ট অল্প খরচে কাজটি সম্পন্ন হইতে পারে। শুকাইয়া, যাওয়া পুকুরগুলি গভীর করিয়া খনন করাইতে, মজা পুকুরগুলির সংস্কার করিতে, এবং জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রয়োজন হইলে নূতন নূতন বড় পুষ্করিণী খনন করাইতে যে মাটী উঠিবে, তাহার দ্বারা ছোট ছোট ডোবাগুলি ভরাট করা চলিবে। মশারা ডিম পাড়িবার জন্য অবশ্যই জল খুঁজিবে। অন্য কোথাও জল না পাইয়া তাহারা বাধ্য হইয়া বড় বড় পুকুরগুলিতেই ডিম পাড়িবে। সেই সকল পুকুরে এমন মাছের চাষ করিতে হইবে, যাহারা মশার বাচ্ছা খায়। সাধারণতঃ মৎস্যেরা জৈব পদার্থ-ভোজী। অনেক মাছই জলের পোকা খাইয়া জীবন ধারণ করে। মশক-শাবক তাহাদের উৎকৃষ্ট খাদ্য। বাল্যকালে আমরা যখন লাল মাছ পুষিতাম, তখন চা ছাঁকিবার ঝাঁজরী দিয়া মশার বাচ্চা ধরিয়া ধরিয়া লাল মাছের টবে বা গামলায় ছাড়িয়া দিতাম। আর মাছগুলি ছুটিয়া আসিয়া টপাটপ করিয়া মশার কীড়া ধরিয়া খাইত। আমেরিকায় মশক-শাবক-ভোজী অনেক মৎস্যের সন্ধান মিলিয়াছে। Dr. Thurman B. Rice A.M., M. D. সম্প্রতি The Conquest of Disease নামে একখানি গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি এরূপ অনেকগুলি মৎস্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন; যথা, "Top minnows" "millions", stickle backs, sunfish, "barrigudo" এবং আরও অনেক মাছ। ইহারা মশার ডিম ও বাচ্চা খাইতে খুব ভালবাসে। আমরা অবশ্য এই সকল মাছের বাঙ্গলা নাম জানি না। জানিলেও তাহাতে আমাদের কোন সুবিধা হইত না। ও-সকল আমেরিকার মাছ এ দেশে মিলিবে না। তবে এ দেশে যে সকল মাছ জন্মে তাহারাও অবশ্য বৈষ্ণব নহে—অনেকেই পোকা মাকড় ইত্যাদি খায়। নিশ্চিত সিদ্ধান্তের জন্য কোন্ কোন্ মাছ মশার বাচ্চা খায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। টবে, বালতিতে, গামলায় জীইত মৎস্য পুষিয়া আমরা যে উপায়ে লাল মাছদের জন্য মশার বাচ্চা সরবরাহ করিতাম, সেইভাবে মশার বাচ্চা ইহাদিগের কাছে ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাইতে পারে, কোন্ কোন্ মাছ মশার বাচ্ছা খায়। মাছ নির্দ্ধারিত হইলে পুকুরগুলিতে সেই মাছ বেশী করিয়া চাষ করিতে হইবে। তাহা হইলে কতক পরিমাণে মশক ধ্বংস হওয়াই সম্ভব। খানা ডোবা ভরাট করা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেখানেও এইসব মাছের চাষ করা আবশ্যক হইতে পারে।

মাছ ছাড়া, মশার আরও অনেক শত্রু আছে। ঘরে যখন মশা বিচরণ করে, তখন একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, মশা ধরিয়া খাইবার জন্য টিকটিকি, মাকড়সা প্রভৃতি জীবগুলিও হাজির হইয়াছে। মাকড়সারা ত মশা ধরিবার জন্য বিরাট জাল পাতিয়া বসিয়া থাকে। সেই সকল জালে খুঁজিলে অনেক মশার দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তা ছাড়া চড়াই পাখী ও অন্যান্য পাখীও মশা ধরিয়া খায়। উক্ত মার্কিন ডাক্তার মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে মশাভুক্ কয়েকটি পক্ষীরও সন্ধান দিয়াছেন, যেমন, সোয়ালো পাপল মার্টিন, বাদুড় (যদিও ইহা ঠিক পক্ষী নয়), প্রভৃতি। তা'ছাড়া ড্রাগন ফ্লাই, হুইর্‌ল্ ই-জিগ্ বীট্‌ল্‌স্ ফ্রেস ওয়াটার হাইড্রাস, ও অন্যান্য কীট মশক বা মশার বাচ্ছা খায়। ব্যাঙ্, কোলাব্যাঙ্ গিরগিটিও মশার শত্রু। তবে এই সকল জীবের চাষ করিয়া কিরূপে মশক ধ্বংস করিতে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, তাহার উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। মোটের উপর চেষ্টা করিলে মশকদের যে কতক পরিমাণে দমন করা যায়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমি আর এক প্রকার উপায় মশায় বংশ নাশ করিয়া থাকি। আমি অব্যবহার্য্য পাত্রে বর্ষার জল জমিতে দিই, এবং তাহার উপর লক্ষ্য রাখি। দুই তিন দিন ধরিয়া জল জমিয়া থাকিলেই তাহাতে মশার বাচ্ছাদের কিলবিল করিতে দেখা যায়। তখন সেই জলে দুই চারি ফোঁটা ফেনাইল দিলেই বাচ্ছা গুলি মরিয়া যায়। তখন সেই জল ফেলিয়া দিয়া আবার জল ধরিতে দিই। সাধারণতঃ পাত্রগুলি জলশূন্য করিয়া রাখা অপেক্ষা এই উপায় আমায় অধিকতর সঙ্গত ও ফলপ্রদ বলিয়া মনে হয়। কারণ আমি যদি, যাহাতে বর্ষার জল না জমিতে পারে এমনভাবে পাত্রগুলিকে রাখিয়া দিই, তবে বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে মশারা আমার চক্ষুর অন্তরালে যে কোন স্থানে যে কোন উপায়ে জলের সন্ধান করিয়া লইয়া তাহাতে ডিম পাড়িবেই। তখন আমি তাহাদের সন্ধানও পাইব না, মারিতেও পারিব না। আর আমার প্রথায়, মশারা আমার চোখের সামনে এবং এক্তারের মধ্যে ডিম পাড়িবে, আমিও তাহাদের সমূলে ধ্বংস করিতে পারিব। মশকদের সন্তান সৃজননের শক্তি অবশ্য সীমাবদ্ধ। কয়েকবার ডিম্ব প্রসব করিবার পর তাহাদের সন্তান হওয়া স্বভাবতই বন্ধ হইবে; এবং যথাকালে ধাড়ী মশাদের আয়ুশেষ হইলে তাহারাও মরিয়া যাইবে। তখন মশক-সংখ্যা স্বভাবতই কমিয়া আসিবে। কিন্তু আমি একা করিলে বিশেষ কোন ফল ফলিবে না। প্রতিবাসীর বাড়ীতে যদি মশার বংশ বৃদ্ধির সুযোগ থাকে, তবে আমি একা আর কত বাধা দিব?

তার পর মশক বা তাহার বাচ্ছার দেহে রোগ উৎপাদন করিয়াও তাহাদের মারা যাইতে পারে। গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় শোনা গিয়াছিল জার্ম্মাণরা এই উপায়ে শত্রু নাশের চেষ্টা করিত। তাহারা শত্রুর ব্যবহার্য্য কূপের জলে কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি মারাত্মক রোগের cultured বীজাণু ছাড়িয়া দিত। এ সংবাদে অবশ্য আমাদের বিশ্বাস হয় না; তবে ম্যালেরিয়া-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা এই উপায়ে মশক বিনাশের পরামর্শ দিয়া থাকেন। সম্প্রতি fungus জাতীয় একপ্রকার রোগ উৎপাদন করিয়া মশকবংশ ধ্বংসের পরামর্শ হইতেছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

———

দিনের স্বাস্থ্য

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ।]

মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু স্বাস্থ্য। সেই স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য বা যাহার স্বাস্থ্য নাই তাহার পক্ষে স্বাস্থ্য লাভ করিবার জন্য কতটুকু মাত্র চেষ্টা করা হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইতে পারে কেন বাঙ্গালী আজ স্বাস্থ্যহীন। স্বাস্থ্য নাই, স্বাস্থ্য নাই, বলিয়া চীৎকার করা ছাড়া আমরা আর বেশী কিছু করি না; কারণ, অধিকাংশ লোকেই হয় ত মনে করে, স্বাস্থ্যের জন্য বোধ হয় অতিরিক্ত সময় ও অর্থব্যয় করিতে

এবং বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালীর পক্ষে সময় যে কি ভাবে নষ্ট হইয়া থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিবার কিছু নাই। কিন্তু তাহা হইলেও প্রণিধান করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দিনের সকল কার্য্যের মধ্যেই সুযোগ আসে। সেই সুযোগগুলি আর কিছুই নয়, স্বাস্থ্য-পালনের প্রচলিত নিয়মাবলী।

দেহের সকল ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই ব্যক্তির অভিব্যক্তি। স্বাস্থ্য আছে বা নাই তাহার প্রমাণ এই অভিব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। দেহের সকল ক্রিয়ারই স্বাস্থ্যানুযায়ী নিয়ম আছে। আহারে বিহারে, শয়নে, ভ্রমণে, পোষাক পরিচ্ছদে, কথাবার্ত্তায়, হাসি ক্রন্দনে এইভাবে সকল চলা ফেরার মধ্যেই স্বাস্থ্য নিহিত আছে। যে লোক দেহযন্ত্রখানি চালাইবার নিয়ম কানুন জানে, সেই স্বাস্থ্যের অধিকারী। সত্য কথা বলিতে কি, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা স্বাস্থ্যের 'বিষয় লইয়া চলিতেছি,—কেহ লক্ষ্য করে, অধিকাংশই করে না।

একে একে আমরা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, সামান্য সতর্কতা, সামান্য ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে আমরা অটুট স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারি। লোকে জানে না, এমন নহে ; জানিয়াও যে পালন করে না, তাহাতেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আইন ভঙ্গ হেতু দণ্ডিত হইয়া থাকে। সে দণ্ড হইতে অব্যাহতি কেহই পায় না। আদালতের বিচারে দোষ করিয়া খালাস পাওয়া যায়, এবং তাহা সচরাচর ঘটিতে দেখা যাইতেছে ; চর্ম্ম চক্ষে দেখিয়া ভগবানের বিচারে সন্দিহান হওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে ; কিন্তু স্বাস্থ্যের আইন না মানিলে প্রায়ই ফল হাতে হাতে ফলিয়া থাকে। বিষ পান করিয়া মরেন নাই এক নীলকণ্ঠ। তাহার পর আর সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই। অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই প্রহ্লাদ, সুধন্বা ; কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে। জানি না,—হয় ত ও সকল রূপকের কথা। "ঘোর কলি" আরম্ভ হওয়ার পর হইতে, দেহী জন্ম-মৃত্যুর মধ্যভাগে দেহ পতনের সকল আইনেরই বশীভূত।

মোটামুটি, মানুষের চেষ্টা—কিসে সে সুখে থাকে। মানব এই একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া ছুটিয়াছে, তাহাই তাহার আভিজাত্য, তাহাই তাহার ঘোষণা। লজ্জা নিবারণের জন্য আচ্ছাদনের জন্য বৃক্ষপত্র ও বল্কল, পশুলোম ও চর্ম্ম—ইহাই নরকে তাহার সঙ্গী হইতে স্বতন্ত্র করিতে থাকে। পৃথিবীর বক্ষে নগ্ন বা অর্দ্ধ উলঙ্গ মানবের অস্তিত্ব এখনও আছে। সেই পরিচ্ছদ এখন কত রকমে, কত ভাবে, দেশ বিদেশে রুচি অনুযায়ী চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। (তবে আশা হইতেছে যে, সুসভ্য শ্বেতচর্ম্মধারী জাতি সকল কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার পূর্ব্বপুরুষের পন্থা অনুসরণ করিবে।) এখন সেই পোষাক পরিহিত হয়—নিজেকে কত সুন্দর দেখাইবে, লোকে পোষাকের কত সুখ্যাতি করিবে, এবং হয়ত কেহ কেহ অনুকরণ করিবে এই আশায়। এই আশায় মানুষ পাগল হইতে চলিয়াছে। রুচিমত মানুষ যতই করিতে চায় করুক—আপত্তি নাই ; কিন্তু এই পোষাকই যে মৃত্যুর কারণ হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমাদের দিনের সকল কর্ম্মের মধ্যে আমরা আমাদের পোষাক পরিচ্ছদে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া কি স্বাস্থ্যবান্ হইতে পারি নাই? যাহা অতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তু তাহার দ্বারা অনিষ্ট হইতে দেওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

প্রথম কথা পোষাকের আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। যাহা হইলে দেহের অভাব মেটে তাহাই পোষাক হওয়া মঙ্গলজনক। ভগবান যে রূপ দিয়া পাঠাইয়া দেন, তাহা দেহের সৌন্দর্য্য। মানুষ যে ভাবে চরিত্র-গঠন করে, সমাজের কল্যাণ করে, তাহাই তাহার মনের সৌন্দর্য্য এবং কালক্রমে দেহের সৌন্দর্য্যের আদর বাড়াইয়া দেয়। চরিত্র-বল দ্বারা লোকের নিকট দেহের সৌন্দর্য্যের আদর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুন্দর দেখাইবে বলিয়া দেহকে পীড়িত করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। বিনা প্রয়োজনে অত্যন্ত ভারি পোষাক পরার ন্যায় প্রয়োজন থাকিতে পাতলা পোষাক পরা সেই পরিমাণে ক্ষতিকারক। প্রায়ই

দেখা যায়, শীতকালে আদ্ধি বা সিল্কের পোষাক পরিয়া লোক চলা-ফেরা করিতেছেন। যাঁহাদের তাহা সহ্য হয়, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র ; কিন্তু শীতে যদি দেহের কষ্ট হয়, তাহা করা কোন রকমেই বিধেয় নহে। আমি জানি না, শীতের পোষাক গরম কোট প্রভৃতিতে বুক খোলা কেন থাকে। যদি শীত নিবারণই অর্থ হয়, তাহা হইলে দেহের যে অংশ আবৃত থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন তাহা খোলা থাকা অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ ঐ অনাবৃত অংশকে তাপ দিবার জন্য স্বতন্ত্র বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

পোষাক অত্যধিক ভারি হইলে দেহের রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়া থাকে। দেহের আরামের জন্য পোষাক পরা। যদি তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, তবে তাহা ব্যবহার করা অনিষ্টকর। ঐ কারণেই খুব আঁট পোষাক পরিত্যজ্য। কিন্তু এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য যে যুবকদের মধ্যে অধিকাংশই খুব আঁট জামার ব্যবহার পছন্দ করিয়া থাকেন। প্রতি মুহূর্ত্তে দেহের সহিত লাগিয়া থাকিয়া তাহা যে আমাদের কত অনিষ্ট করিয়া থাকে, তাহা কি একবার ভাবিবার কথা নহে? সূতার বা তুলার পোষাক নরম বটে, কিন্তু তাহা যে দেহের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করিতে পারে সে বিষয়ে কাহাকেও বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন দেখা যায় না।

আমাদের ঘরের স্ত্রীলোকদিগের পোষাক প্রতিদিনই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। খুব আঁট পোষাক পরাই আজকালকার ফ্যাসান বা আবহাওয়ার অনুযায়ী। তদ্ব্যতিরেকে পোষাকে ব্যয় বাহুল্য এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহাতে গৃহস্থ বিব্রত। কি পুরুষ কি নারীর পোষাকের ব্যয়াধিক্যে যদি গৃহস্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, পরোক্ষভাবে তাহা স্বাস্থ্যের ঘোর প্রতিকূল। আয় অল্প হইলে পোষাকের ব্যয় আহারের উপরেই আক্রমণ করিয়া থাকে।

মোটামুটি পোষকের দ্বারা ক্ষতি বৃদ্ধি সম্বন্ধে এই এক দিক ছাড়া, দিনের ব্যবহারের মধ্যে দেহকে সুস্থ বা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিবার অন্য দিক আছে। পরিচ্ছন্নতার অভাব স্বাস্থ্যহানি ঘটাইবার একটী প্রধান অস্ত্র। যে বস্ত্র সর্ব্বদা দেহে লাগিয়া থাকে, তাহা যদি কোন রূপে দুষ্ট হয়, তাহা হইলে শরীর ভাল থাকা সম্ভব নহে। সাধারণ বাঙ্গালী বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা শুচিবায়ুগ্রস্ত বটে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা তাহাদের বিবেচনার মধ্যে আসে না। এ বিষয়ে আমাদের নারী অত্যধিক মাত্রায় দোষী।

শিশু পালনের জন্য এবং গৃহকর্ম্মাদিতে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকাতে তাঁহাদের বসন সর্ব্বদা ময়লাযুক্ত হইয়া পড়ে। অজ্ঞ মাতা সাধারণতঃ শিশুর সর্দ্দি কাপড়ের মধ্যে মুছিয়া রাখিয়া দেন। ইহা কেবল মাত্র দৈনন্দিন ঘটনা নহে, ইহা প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই ঘটিতেছে। তাঁহাদের জানা উচিত, সেই কাপড় বাড়ীর নর্দ্দমা হইতে কোন অংশেই শ্রেয়ঃ নহে। মাতা কেবল মাত্র যে নিজের স্বাস্থ্যই নষ্ট করেন, তাহা নহে ; সেই কাপড়ে শিশুকে লইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করেন। শিশুর কাঁথা, মল মূত্র যে রোগ-জীবাণু সৃষ্টির প্রকৃষ্ট স্থান, সে বিষয় কয়জন মাতা বোঝেন? এই কফ মোছা ব্যাপারে পুরুষ অনেক দোষ করিয়া থাকেন। সভ্যতার খাতিরে রুমাল ব্যবহার করিতে হয় ; কিন্তু সিকনি মোছাতে কেবলমাত্র যে রুমাল দূষিত হয় তাহা নহে ; হাত ও জামার পকেট ও পাছার কাপড় দূষিত হইয়া থাকে। রুমাল সাধারণতঃ কাচা হয় না। সিকনি শুষ্ক হইয়া যে তাহার অবস্থা কি হয়, তাহা ভাবিলে শঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে। শতকরা সত্তর আশীখানি ব্যবহৃত রুমাল নরককুণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা, প্রয়োজন হইলে ঐ রুমালে অফিসে টিফিনের সময় খাইবার জন্য আহার্য্য লুচি-তরকারী, খাবারের ঠোঙ্গা বাঁধিতে কেহ দ্বিধা বোধ করেন না। বল বাঙ্গালী, তোমার স্বাস্থ্য কিসে থাকিবে? এই অসুবিধার জন্যই বোধ হয় সাহেবরা আজ কাল তূলাজাত রুমালের পরিবর্ত্তে কাগজের রুমাল ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং ব্যবহৃত রুমালগুলি প্রত্যহ পোড়াইয়া ফেলেন।

মেয়েরা বসিবার স্থান বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করেন না। সচরাচর গৃহস্থের ঘরে, বসিবার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। তাঁহারা ঘরের দাওয়া প্রভৃতির উপর বসিয়া কাপড় চোপড় ময়লা করিয়া ফেলেন। ইহার উপর ধূলিধূসরিত শিশু যখন "মা" সম্বোধন করিয়া মাতৃক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই মায়ের প্রাণে আনন্দ হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে দেখা যায়, কোন সামান্য কারণেই কাপড় ছাড়িবার ব্যবস্থা আছে। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা মঙ্গলজনক কিন্তু তাহা কেবল স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত এবং শাস্ত্রানুসারে বস্ত্র পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যও তাহাই। পরিত্যক্ত বস্ত্রের পরিবর্ত্তে যে বস্ত্র পরিধান করা হয়, তাহা জীবাণুর আবাসস্থল বলিয়া স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে নারীর শিক্ষা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আসল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল শুচিবায়ুগ্রস্ত হইলে কোন লাভই নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকই মাতৃজাতিকে ও তাহার ক্রোড়ের শিশুকে স্বাস্থ্যবান্ করিবে ও সুন্দর দেখাইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, পাশ্চাত্যে বাহির পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টাই অধিক, প্রাচ্যে তাহার বিপরীত। ভিতর পরিষ্কার রাখিতে পারিলে তাহা অধিক মাত্রায় স্বাস্থ্যের অনুকূল। আমরা আজ কাল যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহাতে এই ভাব চলিয়া যাইতেছে। সাধারণতঃ আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি—ভিতরে যাহাই থাক, বাহিরটা চক্‌চকে রাখিতে হইবে। ফলে, আমাদের গেঞ্জি মেরজাই ফতুয়া প্রভৃতি যাহা ভিতরে থাকে, তাহা অতিরিক্ত মাত্রায় ময়লা হইয়া থাকে। প্রতিদিনই এই ঘটনা ঘটিতেছে—ইহাতে স্বাস্থ্যের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। দেহের উপরেই যে আচ্ছাদন থাকে, তাহা ঘাম, ময়লা প্রভৃতি দ্বারা দুষ্ট হয়, এবং তাহাই সমধিক ক্ষতিকারক। আমাদের সেইটী যাহাতে প্রত্যহ পরিষ্কার করা হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখাই দরকার।

লোকে ভদ্রতার খাতিরে চেষ্টা করিয়া থাকে—অপরে তাহার ভিতরের অপরিচ্ছন্নতা কি প্রকারে সহজে ধরিতে না পারে। এই অজুহাতে লোকে রং-করা পোষাক ব্যবহার করে। অর্থশাস্ত্রের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এ ব্যবস্থা মন্দ নহে; কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক দিয়া এই মনোভাব নিতান্ত ক্ষতিকারক। অপরের নিকট হইতে ময়লা ঢাকিতে গিয়া ফলে অপরিচ্ছন্নতা নিজের কাছে আর অনুভব হয় না। সাদা পোষাক হইলে ময়লা দূর করিবার যে চেষ্টা থাকিত, তাহা এক্ষেত্রে না থাকাতে সমূহ ক্ষতি করিয়া থাকে। খাকি রং বা কালো রঙ্গের পোষাক ময়লা হয় না, এ কথা কোন মূর্খেও বলিবে না। এই সম্পর্কে আর এক কথা বলা যাইতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে পোষাকের রং পছন্দ করিবার সময় কেবল সাদাই পছন্দ করা উচিত। সাদা রং কেবল যে দেহ গরম রাখে তাহা নহে, ইহা তাপ বিচ্ছুরণেও সমর্থ বলিয়া গ্রীষ্ম কালের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। তদ্ব্যতিরেকে, ময়লা হইলে সাদা রং শীঘ্র নজরে পড়ে। সেই কারণে সাবান প্রভৃতি দ্বারা ময়লা দূর করিবার চেষ্টা থাকে।

পরিচ্ছদে ময়লা জমিয়া থাকিলে চর্ম্মরোগ প্রভৃতির সৃষ্টি করে। এ কথা জানা নাই, এমন গৃহস্থ বোধ হয় আজ কাল খুব কমই আছেন। তাহা সত্ত্বেও এই অভ্যাস সর্ব্বস্থানে বর্ত্তমান। বাহিরের ময়লা সদাসর্ব্বদা দেহের সহিত লাগিয়া থাকার জন্য, যদি কোন ক্ষত থাকে, তাহা দূষিত হইয়া ভীষণ উপদ্রব সৃষ্টি করিতে পারে। পরিহিত পোষাক পরিচ্ছদ কাচিয়া পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পোষাক সকলকেই পরিধান করিয়া থাকিতে হয়। সেই পরিচ্ছদ যে আমাদের কত প্রকারে অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্য রক্ষার অঙ্গ বলিয়া পোষাক ব্যবহৃত হওয়াই বিধি। সামান্য সতর্কতা অবলম্বনে পোষাক পরিচ্ছদ হইতে রোগ সৃষ্টি বন্ধ করা যাইতে পারে। ইহা কঠিন ব্যাপার নহে। সম্ভবতঃ সকল কথা আমার লেখা হয় নাই। মোট কথা এই যে, গৃহস্থ যদি সজাগ থাকে, তাহা হইলে, পরিহিত পোষাক কি ভাবে পরিচ্ছন্ন রাখিয়া নিজের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ও বাটীর লোককে সুস্থ রাখিতে পারে তাহার নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। বারে বারে কাপড় ছাড়িলেই শুচিতা রক্ষা হইল না। সেই কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই শুচিতা। এই ভাবে দেখা যায়, আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই স্বাস্থ্যের উপায় সকল নিহিত আছে; এবং লক্ষ্য করিলে ও সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিলে সুস্থ থাকা যাইতে পারে। আমরা ক্রমশঃ সে বিষয়ের আলোচনা করিব।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

"সুস্থ দেহে সুস্থ মন, ইহা সামান্য কথা; কিন্তু এই সুখের অবস্থার পূর্ণ বিবরণ" এইভাবে জন্ লোকের (John Locke's) "শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি চিন্তা" নামক পুস্তকখানি (Some Thoughts Concerning Education) আরম্ভ হইয়াছে। চিত্তের নির্ব্বিকারতা সম্বন্ধে যতগুলি পুস্তক লেখা হইয়াছে, ইহা তাহাদের অন্যতম। তার পর প্রায় ২০ পৃষ্ঠা বস্ত্র-পরিধান, আর্দ্র পদ, শীতল জল, সন্তরণ, মুক্ত-বায়ু, আঁটিয়া ফিতা বাঁধা পথ্য, খাদ্য, তীব্র পানীয়, ফল, নিদ্রা, শয্যা প্রস্তুত, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, ঔষধ—এই সব বিষয় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। শারীরিক যত্নের সন্তোষজনক বিবরণ দিয়া লোকে (Locke) মানসিক শিক্ষার প্রতি মন দিয়াছেন। তাহাতে শুধু শরীরের প্রতি যত্ন লইবার কথা ছিল না—আরো শারীরিক পরিশ্রমের ভিতর দিয়া মানসিক শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। সে সব খাঁটি সত্য কথা। ইতিহাস যদি কিছু শিক্ষা দেয়, তাহা এই যে, কোনো জাতিই বালকদের স্বাস্থ্যে অবহেলা করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই।

মহতী অথচ ভীষণা উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড (England) গ্রীক ও রোমীয়দের (the Greeks and the Romans) ও জন্ লোকের (John Locke) শিক্ষা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিল। শরীরের ও মনের শিক্ষা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শিক্ষা ও পুস্তক পাঠ (Education and book-learning) প্রত্যর্থবাচক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা কিছু কষ্টসাধ্য। যন্ত্রের আবিষ্কার নিঃসন্দেহ ক্ষমতার কার্য্য; তাহাই হস্তকৌশলকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। ইংরাজি শিক্ষাতে ল্যাঙ্কেষ্টারের ও বেলের (Lancester and Bell) প্রভুত্বনীতির প্রচলন সমস্ত নীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও নৈরাশ্যবাদমূলক মিথ্যা মনো-বিজ্ঞানে (Psychology) প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলি প্রায় এক শতাব্দী কাল শিক্ষার উপর কু-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেগুলির কোনো কোনোটি এখনো প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে কি না তাহা তর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। প্রভুত্বনীতি শরীরকে অবহেলা করিত, তাহা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতেই একটি জাগ্রত জাতির উদভ্রান্ত পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। অন্য সকলের অপেক্ষা অধিকতর দয়ালু অতি অল্প আইন-প্রস্তুতকারীই কাণা, কালা (Blind and Deaf, 1893), বিকৃতভাবাপন্ন ও রুগ্নদের (১৮৯৯) (Defective and Epilleptic 1899) বিষয়ক আইন-বিধি পুস্তকে (Statute books) লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ড বুয়র যুদ্ধ (Boer War) পর্য্যন্ত ঐ অবস্থার গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। সৈন্য সংগ্রহকারীদের

প্রত্যাবর্ত্তন বালকবালিকাদের স্বাস্থ্যের প্রতি অযত্নের ফল দেখাইয়া দেয়—আর কিছু ইহা পারিত না। ইহা সত্য যে সেই অবধি লোকের শারীরিক মঙ্গলের জন্য ইংলণ্ড যে সম্পূর্ণ প্রয়াস পাইয়াছে, তাহাতে আর কোনো জাতি তাহার তুল্য হইতে পারে নাই। এখন সে বলে "সর্ব্বোপরি স্বাস্থ্য"।

জাতীয় স্বাস্থ্যতত্ত্বের উন্নতি

আসুন, আমরা এখন একবার গত তের বছরের স্বাস্থ্যের অবস্থার আলোচনা করিয়া দেখি। প্রথমে ও সর্ব্বাগ্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চিকিৎসাপরিদর্শনের জাতীয় নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক আইন (The great Education Act, of 1902) যে ফল প্রসব করিয়াছে তাহার দৃঢ়ভাবে প্রচলন ভিন্ন এরূপ সংস্কার অসম্ভব হইত। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম লণ্ডন-শিক্ষাবিধিতে (the Elementary, Education London,) Act, 1903) লণ্ডনকে এই জাতীয় নিয়মে পালনে বাধ্য করে। ঐ নিয়মানুসারে প্রথম কাজ Inter Departmental Committee on Physical Deteriorationএর নিয়োগ। ইহার তিন খণ্ড বিবরণী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। চিকিৎসক দ্বারা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পরিদর্শন ইহার একটা অঙ্গ ছিল। তাহার পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'Inter Departmental Committee on Medical Inspection, ও 'Feeding of School Children attending Public Elementary School's স্থাপিত হয়। নিম্নলিখিত কাজগুলি ইহাদের করিতে হইত—

"(ক) বর্ত্তমানে কি হইতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বিবরণ প্রকাশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ফল প্রকাশ; এবং (খ) বিদ্যালয়ের ছাত্রদের খাদ্য সরবরাহের প্রচলিত বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা ও উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্তের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ করা"। ঐ একই বৎসরে সমিতির বিবরণ প্রকাশ করা হয়। বিবরণদাতারা জানিতে পারেন যে, কার্য্যতঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শন কিছুই হইতেছে না। যদিও জানান হয় যে—লণ্ডন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, ব্রাডফোর্ড ১৮৯৩, ও হ্যানলি (Hanly) ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ে চিকিৎসক নিয়োগ করেন, তথাপি প্রচলিত অবস্থা সন্তোষজনক নহে। Mr. Birrell's Bill of 1906 তে চিকিৎসা পরিদর্শন সম্বন্ধে কথা ছিল। সেই Bill বিধিতে পরিণত হয় নাই। সর্ব্ববাদিসম্মত Education Administrative Provision Act of 1907 নামক আইনে ঐ একই রকমের বিধানের দ্বারা অসুবিধাটি দূর করা হয়। চিকিৎসা পরিদর্শন সম্বন্ধে ১৩, (১), (খ) ধারা নিম্নলিখিত প্রকারের —'বালক-বালিকাদের চিকিৎসা-পরিদর্শনের দেয় অর্থ ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে, অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের পরে যত শীঘ্র সম্ভব অথবা Board of Education আদেশ করিলেই সরবরাহ করিতে হইবে। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্রদের শারীরিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিবার জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত শিক্ষাসমিতি দ্বারা অনুমোদিত হইতে পারে সেরূপ বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা সমিতিকে দেওয়া গেল। উক্ত বিধি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কার্য্যে পরিণত হয় উহার অসম্পূর্ণতা নিবারণ করিবার জন্য ঐ একই বৎসরের আইনে (২৫—গ এবং ৫৮—খ ধারা) চিকিৎসা পরিদর্শনের কার্য্য সাহায্য প্রাপ্তির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইল।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন

কতকগুলি ব্যাখ্যাকারক আদেশ পত্রে (Explanatory circulars) চিকিৎসা পরিদর্শন প্রচলনের সুবিধা হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথম ৫৭৬ সংখ্যক আদেশ পত্র অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের চিকিৎসা পরিদর্শন সংক্রান্ত স্মারকলিপি (Memorandum on Medical Inspection of Children in Public Elementary Schools, 1907) স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের (Local Education Authorities)

চিকিৎসা পরিদর্শন সীমা ও উদ্দেশ্য ও সমিতি গঠনের (Organisation of Board) আদর্শ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছে। ৫৮২ সংখ্যক আদেশ পত্র (circular, 582), স্থানীয় শিক্ষা সমিতির প্রতি আজ্ঞা পত্র (Circular to Local Education Authorities), ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের চিকিৎসা পরিদর্শন তালিকা (Schedule of Medical Inspection, 1908) আরো স্থিরভাবে পরিচালনা করিয়াছে। ৫৯৬ সংখ্যক আদেশ পত্র (Circular, 596), ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-বিধির তৃতীয় খণ্ড (Part III of the Education Administration Provisions Act, 1907), অনুসারে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিচালন-বিধি (The Code of Regulations of Public Elementary Schools, 1908) ও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিধির ত্রয়োদশ ধারা (Section 13 of the Education Administrative Provision Act, 1907) হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি বিষয়ে পরবর্ত্তী সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল; যথা—(ক) বিদ্যালয়ের ডাক্তারের কার্য্য (School Medical officer); (খ) ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের বিধি অনুসারে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চিকিৎসা পরিদর্শনের উপায়; (গ) স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের (Local Education Authorities) শিক্ষাসমিতির নিকট (Board of Education) চিকিৎসা পরিদর্শনের বার্ষিক বিবরণী; এবং (ঘ) বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শারীরিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগের বন্দোবস্ত। ৭২৮ সংখ্যক আদেশ পত্রে (Circular, 728) অর্থাৎ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের চিকিৎসা পরিদর্শনের রিপোর্টে ১৯০৯ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়। এ সময়ে চিকিৎসা পরিদর্শন ও চিকিৎসার ব্যয় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের (Local Authorities) ডাক্তারের উপর চাপিয়া বসিল ও ব্যয় হ্রাসের জন্য সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা হইতে লাগিল। স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের ১৯০৯ অব্দের ডাক্তারি চিকিৎসার বিধি অনুসারে (Local Education Authorities Medical Treatment Act, 1901) চিকিৎসাধীন ছাত্রদের মাতাপিতার উপর ব্যয়ভার নিক্ষেপ করিতে গভর্ণমেণ্ট (Government) পরীক্ষাস্বরূপ চেষ্টা করেন, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারেন যে ঐ অবস্থা রক্ষার জন্য আরো প্রবল আয়োজনের দরকার। সেই জন্য শিক্ষা সমিতি (Board of Education) স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের (Local Education Authorities) নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে বাধ্য হন এবং এই সাহায্য দানের বিধি ৭৯২ সংখ্যক আদেশপত্রে (Circular, 792) সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। ১৯১২ অব্দের সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য England ও Walesএ কতকগুলি বিশেষ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য সাহায্যদান শিক্ষা-সমিতি (Board of Education) কতকগুলি বিধি অনুসারে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসর করিবেন। সাহায্য স্থির করিতে পরিদর্শন ও চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্বের, বিদ্যালয়ে রোগীদের খাদ্যের, মুক্তবায়ু, ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য উন্নতিকর নিয়মাবলীর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইয়াছিল। যে সকল বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের দায়িত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করেন তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্কল্প সাধনের উপযোগী ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ পাইতে পারেন।*

অন্য দুইখানি আদেশ পত্রের উল্লেখ করিতে বাকী আছে। ৮১৩ সংখ্যক আদেশপত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগী ছাত্রদের চিকিৎসা পরিদর্শন সংক্রান্ত বিবরণ (Records of Medical Inspection of children leaving School, 1913)। ইহার নামেই বুঝা যাইতেছে যে ইহাতে শুধু ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের কথাই আছে। ৮২৩ সংখ্যক আদেশপত্রে অর্থাৎ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের বিদ্যালয়ে

* যে সকল বিধি অনুসারে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রদের ডাক্তারী চিকিৎসা ও চিকিৎসা পরিদর্শনের এবং England Wales এবং কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রের ডাক্তারী চিকিৎসা ও যত্নের জন্য সাহায্য দান করা হয়, সে সকল বিধি শিক্ষাসমিতি প্রণয়ন করেন। Cd. ৭৮৫৬, ১৯১৫ দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা কার্য্য সম্পর্কীয় কার্য্যের জন্য সাহায্যদান পত্রে (Circular 823, Grants for work Connected with the School Medical Service, 1913) ছাত্রদের স্বাস্থ্য রক্ষা কার্য্যে আরো একটি উন্নতির চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে। এখন চিকিৎসা ও তদধীন চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কার্য্যের পরিবর্ত্তে চিকিৎসা পরিদর্শনের জন্য অর্থ-সাহায্য আসিতে পারে। এই আদেশের পূর্ব্বে সমিতি 'আগন্তুক' ও 'গমনোন্মুখদের' পরীক্ষাই লইতেন। সেই বৎসরে যাহারা বিদ্যালয় ত্যাগ করেন তাঁহারাই শেষোক্ত-দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ যখন পরিদর্শকের পরিদর্শনের সময়েও অধিকাংশ ছাত্রদের চলিয়া যাইবার জন্য অসুবিধা হইল তখন একটি নূতন সংজ্ঞা দেওয়া হইল; যথা "দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ষবয়স্ক সব ছাত্র ও দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে সব ছাত্রের পরীক্ষা লওয়া হয় নাই এমন ত্রয়োদশের উর্দ্ধবয়স্ক ছাত্র"। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ৮।৯ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের পরীক্ষা না লওয়ার জন্য ও সহজ সংশোধনীয় দোষ উপেক্ষিত হওয়াতে অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে।

এইরূপে ইহা প্রমাণিত হয় যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চিকিৎসা পরিদর্শনের কার্য্য খুব উৎসাহের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে। স্বেচ্ছায় আরম্ভ করা হইতে যতদিন না প্রতি বৎসরে সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক চতুর্থাংশের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হইতে পারে, ততদিন ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১,৮৩০,০০০ গুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অধিকন্তু বহু সংখ্যক মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকতা-প্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ঐ কার্য্যে ১,১৯১জন পরীক্ষকের প্রয়োজন হয়। তাহারা হয় সম্পূর্ণরূপে না হয় আংশিকভাবে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন (Local Education Authorities)।

দেশে একটা রব উঠিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পরিদর্শন জাতীয় বীমা বিধির (National Insurance Act) সংশ্রবে রাজ্যের ভবিষ্যৎ ব্যয় রক্ষার জন্য হইতেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর স্পষ্ট উপলব্ধ চিকিৎসা পরিদর্শনের ন্যায় জাতীয় ভার অর্পণ করা হইলে অসন্তোষের কারণ ছিল। কিন্তু সমিতির বর্দ্ধমান দানের সহিত ভারটি নিঃসন্দেহে চলিয়া যাইবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন বাধ্যতামূলক বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। সমস্ত নগরবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জাতীয় কার্য্যের শৃঙ্খলা বন্ধন করা কর্ত্তব্য। একপক্ষে শিক্ষার বয়সের উপস্থিতি ও শিক্ষা আরম্ভের সময়ের ব্যবধান এবং অন্যপক্ষে বিদ্যালয় পরিত্যাগের বয়স ও ১৬ বৎসর বয়স—এই সময় National Insurance কার্য্যোপযোগী হয়। ইহাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাওয়া উচিত। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্যের জন্য আরো ভাল সহকারিতা আবশ্যক। সহরে সহায়ক কর্ম্মচারী এবং শিশুতত্ত্বাবধান সমিতির মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কোনো কোনো ঘটনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়।

মুক্তবায়ুতে শিক্ষা।

স্বাস্থ্যরক্ষা আন্দোলনের আর একটা বড় কাজ—নির্ম্মল বায়ুর পুনরাদর। এই আন্দোলনের গতি তিনটি প্রধান পথে পরিচালিত হইতেছে—মুক্তবায়ু বিদ্যালয়ের আন্দোলন, ক্রীড়াভূমির আন্দোলন ও ক্ষয়-রোগীদের স্বাস্থ্যরক্ষা আন্দোলন। ইংল্যাণ্ড চিরকালই মুক্তবায়ুতে ক্রীড়ার হিসাবে বড়। কিন্তু সহরে ভূমির দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ এই ক্রীড়ার অস্তিত্বলোপ ঘটিল। সাধারণের পক্ষে গৃহনির্ম্মাণ বিধি (Building Regulations for Public) এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক বিদ্যালয়বিধি (Elementary Schools, 1914) অনুসারে বিদ্যালয়ের ক্রীড়াভূমি নিম্নলিখিত পরিমাণ হওয়া উচিত—যেখানে বাহিরে ক্রীড়া করিবার জন্য আর কোনো উপায় পাওয়া যায় না সেখানে (ক) ২০০ বালকের কম সংখ্যার জন্য প্রত্যেক স্বতন্ত্র ক্রীড়াভূমিতে ২,০০০ বর্গ ফীট জমি থাকিবে। তাহার অধিক (খ) প্রত্যেক বড় ছেলের জন্য ১০ বর্গ ফীট

(২) প্রত্যেক ছোট ছেলের জন্য ৬বর্গ ফীট জমি থাকিবে। (খ) ২০০ ও তদূর্দ্ধ বালকের জন্য প্রত্যেক স্বতন্ত্র ক্রীড়া-ভূমিতে (১) প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক বালকের জন্য ৩০ বর্গ ফীট, (২) প্রত্যেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের জন্য ১৬ বর্গ ফীট জমি থাকিবে।*

যেখানকার খেলিবার মাঠে নিয়মানুযায়ী ক্রীড়ার সন্তোষজনক উপায় আছে সেখানে উপর্য্যুক্ত পরিমাণ হ্রাস পাইবে—(ক) দুই শতের কম সংখ্যার প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১০ বর্গ ফীট, এবং ছোট বালকদের জন্য ৬ বর্গ ফীট; (খ) ২০০ ও তদূর্দ্ধ প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ২০ বর্গ ফীট, ছোট বালকদের জন্য ১৬ বর্গ ফীট। নিয়মানুযায়ী ক্রীড়াকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার পূর্ণ অংশরূপে নির্দ্দেশ করিয়া যে উৎসাহ সমিতি (Board) দিয়াছেন তাহা সুসময়ে আসিয়াছে। প্রাথমিক ছাত্রদের শারীরিক ব্যায়ামের প্রতিষ্ঠা, সন্তরণে উৎসাহপ্রদান এবং দীর্ঘ বিদ্যালয় ভ্রমণ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

১৯১৪ সালের মধ্যইংরাজি বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ-বিধি (Building Regulations for Secondary Schools 1914) তে শিক্ষাবিভাগ আরও সহজে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ক্রীড়াভূমিতে প্রত্যেক বালকের জন্য ৫০ বর্গ ফীট এবং ক্ষেত্রফল অন্যূন ৭৫০ বর্গ গজ হইবে। অধিকন্তু একটি খেলিবার মাঠ থাকিবে। শিক্ষাসচিব বলেন যে, যে বিদ্যালয়ে ১০০ জন ছাত্র আছে সেই বিদ্যালয়ে ২ একর ভূমিতে যথেষ্ট হইবে; অধিক সংখ্যকের ক্রীড়াভূমির জন্য আনুপাতিক পরিবর্দ্ধনের আবশ্যক হইবে।

মুক্তবায়ু বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলিতে গেলে অনেক কর্তৃপক্ষ তাহাতে মন্দ স্বাস্থ্য বালকদিগকে, বিশেষতঃ পূর্ব্বেই যাহারা যক্ষ্মারোগী (tuberculous) বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাদিগকে মুক্তবায়ু বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার পরামর্শ দেন। ইহার উপকার সহজে অনুমেয়; এবং এই কারণ দেখাইয়া বলা হইয়াছে যে, যদি এমন বিদ্যালয় রুগ্ন ছাত্রের পক্ষে উত্তম হয়, তাহা হইলে সুস্থ বালকের পক্ষে হইবে না কেন? ইহা বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণে নূতন ধরণের প্রবর্ত্তন করিল। তাহাতে ঋতু বিপর্য্যয়ের অবস্থা ব্যতীত অন্য সময় ঘরগুলি একদিকে বায়ু ও রৌদ্রের জন্য খোলা থাকে। পরিবর্ত্তন ঠিক পথেই হইয়াছে এবং ইহার উৎসাহ দেওয়া উচিত। মুক্তবায়ু বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য শিক্ষাসমিতি দিবা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বালকপ্রতি সাধারণ উপস্থিতিতে ৩ পাউণ্ড এবং বাসোপযোগী বিদ্যালয়ে ৮ পাউণ্ড করিয়া বৃত্তি দেন। এই অর্থ সর্ব্ব সমেত মোট ব্যয়ের অর্দ্ধেক এবং এক তৃতীয়াংশ।

যক্ষ্মারোগীদের (Tubercu'ous patients) স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে শিক্ষার সহিত সংবদ্ধ। সেগুলি National Insurance schemeএর অংশ; কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্র-স্বাস্থ্য পরিদর্শনের এবং রোগিদের আহারের সহিত সে সব সংযোগ করিবার জন্য প্রয়াস পাওয়া হইতেছে।

বিকৃত বালক-বালিকাদের যত্ন ও শিক্ষা

আধুনিক তৃতীয় শিক্ষা আন্দোলন—মানসিক বা শারীরিক নিয়মের বহির্ভূত বালক-বালিকাদের লইয়া। একপক্ষে ইহা সময়োচিত আন্দোলন। রাজ্যের মঙ্গল ভিন্ন আর কোনো কারণে ইহা করা হয় না।

বিকৃত ও রুগ্ন বালক-বালিকাদের জন্য (Delective and Epileptic Children) ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা বিধির পূর্ব্বে উল্লেখ (Elementary Education Act of 1899) করা হইয়াছে। সেই বিধি অনুসারে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স ১৪ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। (১) কতকগুলি বিদ্যালয়ে বিকৃত-মস্তিষ্কদের জন্য বিশেষ শ্রেণী স্থাপন করিতে; (২) বিশেষ শ্রেণী বা পরবর্ত্তী

* উইম্যান এণ্ড সন্স প্রকাশিত লণ্ডনের প্রধান চিকিৎসক সার জর্জ্জ নিউম্যান (Sir George Newman) M. D. মহাশয়ের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী দ্রষ্টব্য।

গৃহে তাহাদিগকে আহার দিতে; (৩) তাহাদের জন্য বিশেষ দিবা বা ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ অধিকার পাইলেন না, বাধ্যও হইলেন না। বিকৃত ও রুগ্ন বালক-বালিকাদের আহার ও বাসস্থানের সুবিধা বিস্তারের জন্য ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষাবিধি (Elementary Defective and Epileptic Children—Education act, 1899) সংশোধন করিবার জন্য ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা সংশোধন বিধি (Elementary Education Amendment Act, 1903) প্রণীত হয়। কিন্তু ইহা সূচনা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারে নাই। ফলে, মূর্খ, দুর্ব্বল, বিকৃত বালক ও দুর্ব্বলচেতাদের খাদ্য সম্বন্ধে সংবাদ দিতে এবং অনুরোধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে রয়াল কমিশন্ (Royal Commission) নিয়োগ করিতে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলা হইতে লাগিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে দুর্ব্বলচেতাদের যত্ন ও শাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশন (Royal Commission on the care and Control of the Feeble-minded) এই নাম দিলেন। কিন্তু ১৯০৮ পর্য্যন্ত ইহার বিখ্যাত ৮ খণ্ড (eight volume) বিবরণী (report) বাহির হয় নাই। অতিরিক্ত আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা হইল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মানসিক অভাববিধি পাশ (Mental Deficiency Act, 1913) তাহার ফল।*

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল এই আইন জারি করা হইল। ইহার প্রধান কার্য্য—(১) উপনিবেশ-সমূহে অতি হীন অবস্থার বালকবালিকাদের প্রতি যত্ন; (২) বহির্জগতে আরো উচ্চতার জন্য নেতৃত্ব; (৩) (২) র অন্তর্ভুক্ত বালক-বালিকা অপেক্ষা আর একস্তর উঁচু অথচ মানসিক বিকৃতাবস্থাপন্ন লোকের জন্য বহির্জগতে দৃষ্টিপাত।

যে সকল মানসিক বিকৃতাবস্থাপন্ন লোক উক্ত শ্রেণী নির্দ্দেশের অন্তর্ভুক্ত নহে তাহারা যতদিন শান্তি রক্ষককে (police) কষ্ট না দেয় ততদিন স্বাধীন থাকিতে অনুমতি পাইল। ঐ বিধি (১) বিশেষ বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে অনুপযুক্তনীয় বলিয়া স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবৃত হইলে ১৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক-বালিকাদের, (২) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ যে সকল বালককে ১৬ বৎসর বয়সে তাহাদের রক্ষা ও অপরের রক্ষা হেতু যত্ন ও শাসন করিবার প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন তাহাদের; (৩) যাহারা ফৌজদারী অপরাধ প্রবণতা অথবা ক্ষতিজনক প্রবৃত্তির সহিত চিরবিকৃতি দেখায়, তাহাদের, (৪) জীবনধারণের নির্দ্দিষ্ট উপায় না থাকায় অবজ্ঞাত বা পরিত্যক্ত যে কোনো বিকৃত-ভাবাপন্ন লোকের; (৫) ফৌজদারী দোষে দোষী, কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা অত্যন্ত মাতাল এইরূপ যে কোনো বিকৃতভাবাপন্ন লোকের; (৬) বিকৃত সন্তানের জন্ম দিবার সময় দরিদ্র বিধির (Poor Law) সাহায্য পায় এমন কোনো বিকৃতভাবাপন্নের সহায়তা করে।

বিকৃতভাবাপন্নেরা স্থাপিত নিয়মাবলীর একটিতে আবদ্ধ হইতে পারে—রাষ্ট্র, অথবা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত, বেসরকারী অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত—অথবা উপযুক্ত কর্তৃত্বের অধীন স্থাপিত হইতে পারে। শাসকসভা (Board of Control) নামে পরিচিত মুখ্য কর্তৃপক্ষ (Central Authority) ১৫ জন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দ্বারা গঠিত; স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (Local Authorities) কতকগুলি জেলার সম্মিলিত সভা। বিদ্যালয় চিকিৎসক ঐ বিধি অনুসারে সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং ইহার প্রাথমিক কার্য্য চালাইতে সমর্থ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বিকৃত অনাথদের জন্য বাসোপযোগী বিদ্যালয় সংস্থাপন ও সংরক্ষণ করিবার জন্য উৎসাহ দিতে সভা (Board) যে কোনো প্রকারের আয় হইতে ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ

* ডাক্তার টি, এন্, কিলিনাক্ (Dr. T. N. Kelynack) সম্পাদিত "Year Book of Open air schools and christian sanatoria." London.

বৃত্তি প্রদান করেন।* ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষাবিধি অনুসারে (Elementary Education—Defective and Epileptic children—Act, 1914) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিকৃতমনা বালকদের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। এতদনুসারে ও পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি অনুসারে রুগ্ন ছাত্রদের বার্ষিক বৃত্তি একজন দিবা স্কুলের ছাত্রের জন্য ৬ পাউণ্ড এবং একজন বোর্ডিং বিদ্যালয়ের ছাত্রের জন্য ১২ পাউণ্ড।

অন্ধ ও বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহিত পূর্ব্ববিধি অনুসারে আচরণ করা হয়; কিন্তু বৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছে ও এখন দিবা বিদ্যালয়ের ছাত্রের ৭ পাউণ্ড ও বোর্ডিং এ অবস্থিত ছাত্রের ১৩ পাউণ্ড বৃত্তি।

অতি দরিদ্র বালক-বালিকাদিগের আহার দান।

নব প্রবর্ত্তিত ছাত্র স্বাস্থ্য বিধির চতুর্থ দফায় দরিদ্র ছাত্রদের স্কুলের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বহুকাল ব্যাপী পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখাইয়াছেন, যে, যাহাদের দেহ অনাহারক্লিষ্ট তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া নিষ্ঠুরতার কার্য্য। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের খাদ্য সরবরাহ সম্বন্ধী শিক্ষা-বিধির (Education—Provisions of Meals Act, 1906), দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রতিকার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট (Government) যে ব্যবস্থা করেন তাহার ফলে মাত্র অর্দ্ধপেনী লইয়া দরিদ্র ছাত্রদের স্কুলে খাদ্য সরবরাহ করা হইত। তাহাতে বালক-বালিকাদের পিতামাতা সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেন না ও এই ব্যবস্থা তাঁহাদের অনুমোদিত ছিল। পরবর্ত্তী একটি বিধি, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা বিধির দ্বারা (খাদ্যদান) (Elementary Education—Provision of Meals—Act, 1914) তিন প্রকারে পূর্ব্ববিধির পরিবর্ত্তন করা হইল (ক) যখন বিদ্যালয় নিয়মিত ভাবে (normally) আরম্ভ করা হয় নাই, তখন ইহা খাদ্য সরবরাহকে আইনানুমোদিত করিল; (খ) ইহা অর্দ্ধপেনী পরিমাণ নির্দ্ধারিত সীমা রহিত করিল; (গ) ইহা খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ হইতে ব্যয়ের জন্য শিক্ষা সমিতির (Board of Education) অনুমোদন প্রাপ্তির আবশ্যকতা উঠাইয়া দিল। এখন নিয়মিত প্রথা অনুসরণ করিয়া উদ্দেশ্যানুসারে দক্ষতার সহিত কাজ করা হইলে সমিতি মোট ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ দেন।

বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের পূর্ব্বে বালক-বালিকার ব্যবস্থা।

স্বাস্থ্যরক্ষার পঞ্চম আন্দোলন স্কুলে যাইবার বয়সের পূর্ব্ববর্ত্তী বয়সের বালক-বালিকাদের সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চিকিৎসা পরিদর্শন শৈশবে ও বাল্যকালের প্রথমে লব্ধ অনেক প্রতিকারোপযোগী বিকৃতি ও ক্ষতি উঠাইয়া দিল। কেমন করিয়া শিশুদিগকে স্কুলে উপস্থিত করিতে পারা যায় তাহাই মীমাংসার বিষয় হইল। উপস্থিতির দুইটি পথ ছিল। প্রথমতঃ মাতৃ-বিদ্যালয় বলিয়া পরিচিত বিদ্যালয়ের বিস্তৃতি। এই বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ছাত্রদের স্বেচ্ছাধীন ছিল। মাতৃ-বিদ্যালয়ে শিশু ও ছোট বালক-বালিকাদের মাতারাই সযত্নে শিক্ষা ও উপদেশ দেন। (ক) নিয়মবদ্ধ শ্রেণী, (খ) গৃহ পরিদর্শন, (গ) শিশুদের সহিত পরামর্শ, মাতৃবিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত। চিকিৎসা ও ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধীয় পরামর্শের ও চিকিৎসার (যদি থাকে) স্থান প্রয়োজনানুসারে হওয়া উচিত। এরূপ বিদ্যালয়—এখন বিদ্যালয়ের চিকিৎসা কার্য্যের, স্বাস্থ্য-রক্ষা কর্তৃপক্ষের, শিশু রোগীর এবং এই প্রকার নূতন নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপনের সাহায্যকারী হইয়া পড়িয়াছে। এই কার্য্য শিক্ষা সমিতি (Board of Education) দ্বারা অনুমোদিত হইয়াছে। এই সমিতিই পূর্ণ ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ পরিমাণে বৃত্তি দেন। দিবা ভাগে সেবা গৃহের প্রতিষ্ঠা দ্বিতীয় পথ। এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিশুদের—সাধারণতঃ ৩ বৎসরের ন্যূন

* Dr. T. N. Kelynack সম্পাদিত, অধুনা Messrs Jhon Bull, Sons and Danielsson, Ltd., দ্বারা প্রকাশিত।

বয়স্কদের—তত্ত্বাবধান করে। গৃহে শিশুদের একপ যত্ন লওয়া যায় না।

শিশু রক্ষার অন্যান্য কার্য্য।

আরো কতকগুলি কার্য্যের উল্লেখ করিতে বাকী আছে। সেগুলি ঠিক স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত নহে, অথচ নিঃসন্দেহে সেই উদ্দেশ্যের উন্নতি সাধন করে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের বালক-বালিকাদের শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি (the Employment of Children Act, 1903) প্রকাশ করে যে, (ক) ১৪ বৎসরের নূন বয়স্ক বালক-বালিকারা অপরাহ্ণ ৯ ঘটিকা ও পূর্ব্বাহ্ণ ৬ ঘটিকার মধ্যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে না; (খ) ১১ বৎসরের নূন বয়স্ক বালক-বালিকারা পথে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবে না; (গ) কোনো বালক গুরু ভার উত্তোলন করিতে নিযুক্ত হইবে না; (ঘ) কোনো বালক তাহার শারীরিক অবস্থানুসারে তাহার শিক্ষা অথবা স্বাস্থ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এমন কোনো কার্য্যে নিযুক্ত হইবে না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বালক বালিকার প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রতিবিধান (Prevention of Cruelty to Children Act 1904) সাধারণ আমোদ প্রমোদ ইত্যাদিতে বালক বালিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করে, এবং পথে ফেরীওয়ালার ব্যবসায় অথবা ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক বালক দ্বারা বা ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালিকা দ্বারা পূর্ব্বাহ্ণ ৬ ঘটিকার মধ্যে কার্য্য সম্পাদনে নিষেধ করে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের বালক-বালিকা-বিধি (Children Act, 1908) বালক অপরাধীদের সংশোধক এবং পারিশ্রমিক বিদ্যালয়, অনাথ বালকবালিকা, আমোদ প্রমোদের স্থানে কর্ম্মে নিযুক্ত বালক বালিকাদের নিরাপদ এবং ক্ষতিজনক চর্ম্মরোগযুক্ত বালকবালিকাদিগকে পরিষ্কার করা ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা (কার্য্যনির্দ্দেশ) বিধি (Education—Choice of Employment—Act, 1910) কার্য্য নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বালক বালিকাদিগকে সংবাদ, পরামর্শ এবং সাহায্য দান স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য করে। সর্ব্বশেষে স্বেচ্ছা প্রণোদিত কার্য্য দ্বারা গৃহীত সর্ব্বপ্রয়োজনীয় কার্য্য যথা—বালক-বালিকার যত্ন সমিতি (Children's Care Committees)। ইহা এখন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারে। The guilds of Help, রুগ্ন বালক-বালিকাদের সাহায্য বিধি সমিতি (The Children's Invalid Act Association), বালক-বালিকাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিষেধের জন্য জাতীয় সমিতি (The National Society for the Prevention of Cruelty to Children) এবং এই প্রকার সমিতিগুলি উল্লেখযোগ্য।

ইহাই নূতন স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আন্দোলনের কয়েকটি অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পাঠকের মনে এই ধারণা হইবে যে, আন্দোলন বিদ্যালয়ে শিক্ষোপযোগী বয়স লইয়া আরম্ভ হইয়া যতদিন না কার্য্যতঃ সমস্ত জাতি তৎসংশ্লিষ্ট হইয়াছে ততদিন উন্নতি ও অবনতির দিকে পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু নিবারণের উপায় অপেক্ষা প্রতিকারের উপায় লইয়া আন্দোলন বেশী হইয়াছে। বালকের স্বাস্থ্য তাহার পিতামাতার ও আরো পূর্ব্ব পুরুষের উপর নির্ভর করিতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষা আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বলদিগকে সংশোধন করিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী উপায়ে ঐ শ্রেণীর সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে। ফলে দৌর্ব্বল্য আর বেশী দেখা যাইবে না। দুর্ব্বলচেতাদের সংখ্যা হ্রাসের জন্য পরীক্ষার উপায় করা হইয়াছে; কিন্তু জাতি কঠিন উপায় অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক।*

টরোণ্টে বিশ্ববিদ্যালয়
কানাডা।

* টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মানসিক ও শারীরিক জীবন' (Mental and Physical Life of School Children) নামক গ্রন্থ প্রণেতা 'পিটার্ স্যাণ্ডিফোর্ড, এম্-এ, পি-এইচ, ডি, (Peter Sandiford M. A. Ph D.) মহাশয় লিখিত ইংরাজি প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-হীনতার কারণ

সার উইলিয়ম উইলকক্স (Sir William Willcox) মিশর দেশে নীল নদের বাঁধ বাঁধিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহার চেষ্টার ফলে মিশরের অবস্থার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। বাঙ্গালা নদ-নদীতে ভরা, তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন, এবং এ দেশ কিরূপে স্বাস্থ্যহীন হইতে পারে, তাহা দেখিবার জন্য বাঙ্গালায় আসিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার মতে যেখানে নদনদী জলভার বহিয়া যায়, সে স্থানের স্বাস্থ্য কোন প্রকারে হীন হইতে পারে না। নীল যেখানে শাখা বিস্তার করিয়া সাগরে পড়িয়াছে সেখানে ম্যালেরিয়া নাই, কাযেই গঙ্গার ধারা যেখানে সমুদ্রে মিশিয়াছে, সেখানে ম্যালেরিয়া থাকা সম্ভব নহে। পাহাড় ধুইয়া দেশের সব আবর্জ্জনা দূর করিয়া নীল নদের কর্দ্দম মিশ্রিত জল শস্যের প্রাচুর্য্য, স্বাস্থ্যের অনুকূল দ্রব্যাদি বিলাইয়া বহিয়া যায়। আর হতভাগিনী বাঙ্গালা! সেই বাঙ্গালার বুকের উপর দিয়া গঙ্গা বহিয়া যায়; অথচ, বাঙ্গালা অনাহারে ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জীবন্মৃতা হইয়া আছে। দেশপর্য্যটনকারী যে কেহই মিশরে যান, সকলেই তাহাকে সর্ব্বদা নানাপ্রকার শস্যে মণ্ডিত দেখিয়াছেন। নীলের তটে চাষ-আবাদ হইয়া তাহাকে শোভা-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। দেশ শস্যে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালায় কত নদ-নদী; কিন্তু বাঙ্গালার এ দুর্দ্দশার কারণ কি?

যখন মিশরে পাহাড় হইতে ঢল নামিয়া নীল নদ ঘোলা জলে ভর্ত্তি হইয়া যায়, গঙ্গাতেও সেই সময় ঢল নামে—ঘোলা জল কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে আছাড়ি পিছাড়ি খাইয়া কাঁদিয়া বলে, "আমায় কাযে লাগা।" সে কথা বাঙ্গালায় শোনে কে, শক্তিই বা আছে কার? নীলের অবস্থা ভিন্নরূপ। ঢল নামার অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই লোকের জানা আছে। সেখানে লোকে বুদ্ধি পূর্ব্বক খাল, নালা কাটিয়া রাখিয়াছে; স্থানে স্থানে বাঁধ দ্বারা সেই খালের জল দেশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া লয় এবং ঘোলা জলে আপনাদের শস্য ক্ষেত্র ডুবাইয়া লয়। ফলে দেশের রোগ দূর ত হয়ই; উপরন্তু নব মৃত্তিকার সার ক্ষেত্রে জমিয়া যায়। জল সরিয়া যাইবার পরই চাষী বীজ ছড়াইয়া দেয়, শস্য আপনা হইতেই জন্মায়। এই নদী হইতে জল সেচ প্রথা বহু পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং মিশরবাসী প্রায়ই পূর্ব্বপ্রথা বজায় রাখিয়া সুফল লাভ করিতেছে। বাঙ্গালা এককালে স্বাস্থ্য ও শস্যে পূর্ণ ছিল। গঙ্গার পলি-মাটী দিয়া বাঙ্গালা দেশের সৃষ্টি হইয়াছে; গঙ্গার পলি মাটির দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বাঙ্গালা দেশ উর্ব্বরা ছিল, বাঙ্গালার মাটিতে সোণার ফসল ফলিত। কিন্তু বিদেশীর ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কার্য্যের ফলে আজ বাঙ্গালার দুর্দ্দশা। বাঙ্গালা নদ নদীর জল ব্যবহার করিতে ভুলিয়াছে। সে সকল উপায়ও অন্তর্হিত হইয়াছে, তাই আজ এই শোচনীয় পরিণাম।

এখানে বৎসরে ৫০ হইতে ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে; তাহাতে উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিবার মত বিশেষ কোন বস্তু নাই সত্য, কিন্তু সেই কালেই গঙ্গার বন্যা দেখা দেয়। উভয়ে মিলিত হইয়া প্রচুর জল বাঙ্গালার মধ্য দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। এ সুযোগ কোন প্রাচীন নরপতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে বাঙ্গালায় সেচ দ্বারা জল লইয়া যাইবার সুব্যবস্থা ছিল। বহু বৎসর এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, কাযেই

বাঙ্গালা "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বাঙ্গালার কবি গাহিয়াছিলেন—

"কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল
কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই দলতে হয় রে
দূর্ব্বা কোমল ;
কোথায় ফলে সোণার ফসল, সোণার
কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরই বাঙ্গালা রে !"

বাইবেল ও অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থে পাওয়া যায়, যে সেকালে অতিমানব সকল জন্ম গ্রহণ করিতেন, এবং মিশরে লোক, ব্যাবিলনে মেরোডাক ও বাঙ্গালায় ভগীরথ, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশের অবস্থা বুঝিয়া যে কার্য্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন, কোটী কোটী লোক বহু সহস্র বর্ষ ধরিয়া তাহার সুফল ভোগ করিতেছে।

রামায়ণে পাওয়া যায় যে ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করিয়া পশ্চাতে গঙ্গার প্রবাহ লইয়া আসিতেছিলেন। তিনি আহারের জন্য ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতেছিলেন। পদ্মাবতীর শঙ্খধ্বনি শ্রবণে ভুলক্রমে গঙ্গা উত্তরভাগে বহিয়া চলিয়া যান। হেনকালে ভগীরথের শঙ্খ নিনাদ গঙ্গা শুনিতে পাইয়া নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, এবং দক্ষিণভাগে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মানবজাতি যখন শিশু ছিল, তখন ইতিহাস এই ভাবেই তাহার কীর্ত্তি-কাহিনী গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। ভাগীরথী নাম ধরিয়া নদী বলিয়াই পরিচিত হউক বা ভৈরব, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি খাল বলিয়া পরিগৃহীত হউক, সকল নদনদী খাল সমান্তরালভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালার অসীম সৌভাগ্যের এবং বাঙ্গালার প্রতি ভগবানের অনন্ত করুণার পরিচায়ক।

যে স্থানেই ভাগীরথীর জল দুই কূল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই খানেই শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে, এবং বাঁধ বাঁধিয়া যে স্থানে গ্রামের মধ্যে জল প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, সেই স্থানেই যেন পঙ্গপালে শস্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। খাল দ্বারা যাতায়াতের সুবিধা হইতে পারে ; কিন্তু নদ-নদী জল বক্ষে করিয়া নিজ নিজ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে কূলের অধিবাসী-দিগের কোন সুবিধাই ঘটে না। পুরাকালে নদীর ঘোলা জল সার বহিয়া দেশ ভাসাইয়া দিয়াছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে লোকে বসতি করিয়াছে। আশে পাশে সোনার ক্ষেতে সোণার ধান ফলিয়াছে। প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে ; ফলে লোকে স্বচ্ছন্দে দেশে বাস করিয়া সভ্যতার দীপ জ্বালিয়া জগৎকে বিতরণ করিয়াছে। ভগীরথ ও তাঁহার সহচর ও অনুচর-বর্গের কথা স্মৃতিপটে উদিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা আপনিই আসিয়া পড়ে !

বর্ষার নদীর জল যে স্থানে গিয়াছে, সেইখানেই শস্য জন্মিয়াছে এবং যে স্থানে তাহা পৌছায় নাই, তাহার দুর্দ্দশা সহজেই অনুমিত হয়। বর্দ্ধমানের ম্যালেরিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু সেখানে উচ্চ তটযুক্ত ইডেন খাল বর্ত্তমান আছে। তাহাতে লোক বিশেষ লাভবান হয় নাই। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যখন বর্দ্ধমান প্লাবিত হইয়া বিপদ উপস্থিত করিয়াছিল, সেই এক বৎসর বর্দ্ধমান ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। দেশের মধ্যে জল প্রবেশের ব্যবস্থা করিতে হইলে তটের প্রয়োজন তাহা সত্য কথা ; কিন্তু সেই তট মধ্যে মধ্যে কাটিয়া দিয়া জল দ্বারা দেশ ভাসাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে উপকার হওয়া সুনিশ্চিত। বৃষ্টির জলের সহিত নদীর ঘোলা জল মিশিয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধিই করিবে।

মিশরের অবস্থার উন্নতির প্রধান কারণ—তাহার নদীর জলের সুব্যবহার। ম্যালেরিয়া সেখানে স্থান পায় না। কেবলমাত্র বর্ষার ঘোলা জল ব্যবহার করা হেতু নীলেরই তট-সন্নিহিত প্রদেশগুলির ম্যালেরিয়া-শূন্য হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে মিশরের সর্ব্বত্রই আজ ম্যালেরিয়াহীন। মিশর চাস করিতে জানে ; যে সকল বৃক্ষলতা আকাশ বাতাস হইতে নাইট্রোজেন লইয়া

মৃত্যুকালে মাতা ধরিত্রীকে দান করিয়া যায়, সেই সকল বৃক্ষাদির আবাদ করে। এই সকল চাষের ফসল লাভ করিয়া কেবলমাত্র মিশরবাসী নরনারী স্বাস্থ্যবান্ নহে ; এই সকল বৃক্ষলতা আহার করার জন্য তাহার পশুও সবল। কেবলমাত্র ঘোলা জল জমিকে যতটা উর্ব্বরা করে, এই বৃক্ষ সকল মৃত্যুকালে সেই সকল জমিকে আরও উর্ব্বরা করিয়া থাকে। দক্ষিণ ইংলণ্ডে প্রবাদ আছে যে, মেষপালের পদক্ষেপে সোণা ফলে। মিশরও সেই ভাবে বলে—গো-মহিষ চারণহেতু মিশরে সোণা ফলে। জমির সার নানাপ্রকারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রচুর আহারহেতু গো-মহিষাদি সবল ও পরিশ্রমী হয়, গাভীর অধিক দুগ্ধ হইয়া থাকে। মিশর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান চাষের দেশ। মিশর-বাসীরা ৫,৫০০,০০০ একর মাত্র জমি চাষ করে এবং তাহা হইতে বিনা কষ্টে ৩৮,০০০, ০০০ পাউণ্ড রাজস্ব দিয়া থাকে এবং তাহার পর ১৫,০০০,০০০ লোকের মুখে অন্নদান করে। প্রতি একর জমির জন্য বার্ষিক কর বিশ পাউণ্ড এবং জমির দাম একর প্রতি প্রায় চারিশত পাউণ্ড। কিন্তু মধ্য বাঙ্গালার অবস্থা কি ? ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে Bernier এই দেশের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া যান। তখনও বাঙ্গালায় আফগান ও মারাঠার যুদ্ধে দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় নাই। তাঁহার কথায় —"The knowledge I have acquired of Bengal in two visits inclines me to believe that it is richer than Egypt. It exports in abundance cottons and silk rice, sugar and butter. It produces amply, for its own consumption wheat, vegetables, grains, fowls, ducks and geese. It has immense herds of pigs and flocks of sheep and goats. Fish of every kind it has in profusion. From Rajmahal to the sea is an endless number of canals cut in by-gone ages from the Ganges by immense labour for navigation and irrig tion, while the Indian considers the Ganges water as the best in the world."

পর্য্যটক বারনিয়ারের মতে বাঙ্গালার কোন জিনিষেরই অভাব ত ছিলই না, উপরন্তু প্রাচুর্য্য ছিল। বহু আহার্য্য ও পরিচ্ছদ বিদেশে রপ্তানি করা চলিত। সর্ব্বাপেক্ষা তিনি গঙ্গা হইতে খাল কাটিবার প্রণালী দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। এই কথা তাঁহার পরবর্ত্তী পর্য্যটকেরাও সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সেই মধ্য-বাঙ্গালার স্থান আজ কোথায় ? আধুনিক বাঙ্গালাকে আজ ঠাকুরমার রূপকথার পরিত্যক্ত জনশূন্য রাজপুরী বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালার নদী মজিয়া যাওয়াই অবনতির প্রকৃত কারণ এবং সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বহুক্রোশব্যাপী নদী সকল অযত্নে পলি পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধে সরকারের পক্ষ হইতে তথ্য নির্দ্ধারণ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু তাহা প্রকৃত কায ত করেই নাই, উপরন্তু ভগবানের দোহাই পাড়িয়া নদী-নালা নষ্ট হইবার পরামর্শই দিয়াছে ; এবং বলিয়াছে, এই সকল নালার উদ্ধার কখনও সম্ভবপর নহে। সরকারের এ বিষয়ে অযত্নের কথা বলা হয়—কিন্তু এই কমিটীর সভ্যদের মতে তাহা করা নিতান্ত অন্যায়। এই সকল নালার উপর অর্থ ব্যয় করিয়া কোন লাভ নাই, করিলে তাহা অর্থের নিতান্তই অপব্যয়—এই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। মানুষের চেষ্টায় এই সকল নদ-নদীর উদ্ধার কখনও সম্ভব নহে। কিন্তু মিশরবাসী অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বসিয়া থাকে নাই। এ দেশের সরকার নিয়োজিত কমিটীর নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিয়া মিশরবাসী বসিয়া থাকিলে, এত দিনে সারা মিশর বিরাট বনানীতে পরিণত হইত। বর্ষার প্রচুর বারিপাত মধ্য-বাঙ্গালার অবস্থা কতক পরিমাণ সচ্ছল রাখিয়াছে ; কিন্তু তাহারও দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। ঐ সকল সমিতি নিজেদের মতের সমর্থনের জন্য ফারগুসন্ প্রভৃতি মনীষীদের উক্তি উদ্ধৃত করেন ; কিন্তু তাঁহারা ভাল

করিয়া দেখেন না, যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যুক্তি দিয়া নিজেদের মত প্রবল রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফারগুসনের মতেও নদী নালার জল দেশ মধ্যে প্রবাহিত হইতে না পাওয়ায় দেশের দুর্দ্দশা হইয়াছে।

বাঙ্গালার সর্ব্বনাশের কারণ বাঙ্গালীর চাষের বিষয়ে অজ্ঞতা ও বাঙ্গালায় পলি-মিশ্রিত ঘোলা জলের অভাব। যখন বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে ঘোলা জল প্রবেশ করিয়াছে, তখন নদীর জলের সহিত বর্ষার জলের সুবিধা পাইয়া চাষীরা বেশ ফসল লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের অজ্ঞতা বশতঃ এমন চাষ করিয়াছে যাহাতে প্রত্যেক চাষেই জমির উর্ব্বরা-শক্তি ক্ষয় পায়। যে চাষের দ্বারা বাতাস হইতে সার মৃত্তিকায় নিবদ্ধ হইতে পারে, এমন চাষ তাহারা করিতে শিখে নাই। কিন্তু তখন বন্যার জলে মৃত্তিকার ক্ষুধা প্রতি বৎসরই দূর হইত; এখন বন্যার জলের অভাবে, চাষীকে কেবল মাত্র বর্ষার জলের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু বর্ষার জলের এমন শক্তি নাই, যাহাতে তাহা বন্যার ঘোলা জলের অভাব দূর করিতে পারে। ফলে ক্ষেত্র সকল সারহীন হইয়া পড়িতেছে, চাষের অবস্থা অতি হীন হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে জীব-জন্তু মরিলে তাহা ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত হইত। সেই জীবদেহের ধ্বংসাবশেষে ভূমি উর্ব্বরতা শক্তি লাভ করিত। এখন ভাগাড় হইতে চতুর বণিকের প্রয়োজনে অস্থি-চর্ম্ম সংগৃহীত ও রূপান্তরিত হইয়া বিদেশের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। বাঙ্গালার ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাসের ইহাও একটা কারণ। কেবল মাত্র খড়ের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া হালের গরুর অবস্থা ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু এমন সব চাষ আছে যাহার দ্বারা গোজাতির আহার্য্য প্রস্তুত হইতে পারে ও সেই সময়েই জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ জমিতেই মাত্র একটা বা অধিক পক্ষে দুইটা চাষ হইয়া জমি পড়িয়া থাকে। নানা রকম আবর্জ্জনা ঘাসে জমি ভরিয়া উঠিতেছে। নদীর জল দেশ মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না বলিয়া, জমির রস ক্রমশঃই নিম্নে চলিয়া যাইতেছে, ফলে আম্র প্রভৃতি বৃক্ষের ফসল অতিশয় কম হইয়া যাইতেছে। এই সকল বৃক্ষের শিকড় মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে না; নদ-নদীর প্রচুর জল সহজেই পাওয়াতে তাহারা কখনই সে চেষ্টা করে নাই।

দেশ মধ্যে নদীর জলের সহিত প্রচুর মৎস্য প্রবেশ করিত, এবং নালা পুষ্করিণী সকল মৎস্যে ভরা থাকিত। ইহার জন্য বঙ্গবাসীকে স্বতন্ত্র অর্থব্যয় করিতে হইত না। সে দিন এখন নাই। যেখানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যাইত সেখানে মৎস্য পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুপেয় পানীয়ের বিশেষ অভাব। চাষীদের খাদ্যে সারবান্ বস্তু নাই, এবং ইহার উপর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে তাহাদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। ইহার এক মাত্র উপায়, বন্যার ঘোলা জল এবং বায়ু হইতে সারবাহী বৃক্ষ লতা রোপণ; আর এই দুইটী বস্তুই এখন তাহাদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর বঙ্গে সরকারকে শীঘ্রই বাষ্পচালিত হল চালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু তাহার উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

সত্য কথা চিরকালই আদরের এবং ইহাই বাঙ্গালার পক্ষে সত্য কথা। বাঙ্গালার আশাহীন হইবার কারণ নাই। বন্যার জল দেশ প্লাবিত করিয়া যাইতে পায় না বলিয়া বাঙ্গালায় স্বাস্থ্য নাই, সম্পদ নাই, শক্তি নাই। মিশরে বন্যার জলের অভাব ঘটিলে দেশবাসী ঘোর বিপৎপাত বলিয়া মনে করে।

মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে এই জলের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই বিপদ দূর করিতে হইলে কুলপাবিনী বন্যার দ্বারা দেশ ভাসাইয়া দিতে হইবে। ইহাই বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি। এই ভাবে মিশর রক্ষা পাইয়াছে। যেখানেই শ্যামল বৃক্ষরাজি দেশের শোভা বর্দ্ধন করে, সেখানে সকলেই জানে নদনদীর জলধারা পাইয়া বৃক্ষলতা আনন্দ, শক্তি লাভ করিয়া নব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। মধ্য বাঙ্গালায় প্রায় ৬,০০০,০০০ একর সুন্দর সমতল

ক্ষেত্র আছে। সেই জমি বন্যার প্রবাহ দ্বারা ধৌত করা আদৌ কঠিন ব্যাপার নহে। এবং চাষ আবাদ করিতে পারিলে, পারিশ্রমিক হিসাবে একর-প্রতি সত্তর পঁচাত্তর টাকা লাভ করা অতীব সহজসাধ্য। প্রায় ১,০০০,০০০ একর জমির উপর, আম, জাম, কলা প্রভৃতি বৃক্ষের সুন্দর বাগান আছে; সেই সব বৃক্ষ মূলে নদীর জল যদি স্পর্শ করে, এবং গ্রীষ্মে মৃত্তিকা হইতে রস পায়, তাহা হইলে এই সকল বৃক্ষের ফসল বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। এই দেশে বহু সহস্র মাইলব্যাপী খাল খনন করা আছে; এই সকল খাল দেশের অবস্থানুযায়ী ঢাল প্রদেশেই অবস্থিত ও সমস্ত দেশের লোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

পশ্চিম-বঙ্গের ন্যায় মধ্য-বাঙ্গালায়ও একই জাতের প্রায় ৮,০০০,০০০ লোক বাস করে। তাহারা কচুরিপানার উপদ্রব হইতে আপনাদিগের চাষের জমি রক্ষা করিবার জন্য সহিষ্ণুতার সহিত, সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। লোকের বুকে আশা ভরসা দিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহারা সকল প্রকার কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইবে।

ধীরে ধীরে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। উপস্থিত যে সকল উচ্চ বাঁধ আছে তাহা স্থানে স্থানে ছয় সাত হাত পরিমাণ ভেদ করিয়া গ্রামের ভিতর জল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জল-প্রবেশের পথগুলিতে যাহাতে জল প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই জন্য এইগুলির সঙ্গে কপাট রাখিতে হইবে; এবং কপাট খুলিয়া প্রয়োজন মত জল বাহির করিয়া লইয়া, কপাট বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। আপাততঃ দশ ফিট প্রস্থ ও দুই তিন ফিট গভীর করিয়া এক বা দেড় মাইল জল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতক্ষণ জলের প্রয়োজন থাকে, ততক্ষণ অবাধে জল প্রবেশ করিতে দিতে পারা যায়। কিন্তু বন্যা প্রবল হইলে কপাটের দ্বারা প্রবেশ পথের যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিলেই চলিবে। ঐ প্রবেশ-পথগুলিতে অধিক ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ চাষের সময় যদি সামান্য পরিমাণে জল প্রবেশ করিতে থাকে, তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই। এক বৎসরের পরীক্ষার ফলে সকল বিষয় বুঝিয়া লওয়া কঠিন ব্যাপার হইবে না। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়াতে এই জল-দুর্ভিক্ষজনিত বিপদ বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে। ঐ জেলা দুইটীর সমস্ত খাল পরিষ্কার করিয়া পূর্ব্ব কালের ন্যায় এ কালেও জলের ধারা ছুটাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পঁচিশ বা ত্রিশ জন এঞ্জিনিয়ার যদি এই কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, তাহারা খালের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া জল প্রবাহের অন্তরায় সহজেই দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। সমস্ত জাতির ইহাতে বিশেষ উপকারই হইবে। ইহাতেই মধ্যবাঙ্গালা পুনরুজ্জীবিত হইবে।

বাঙ্গালার সকল প্রধান খালগুলিই গঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছে। গত ৪০ বৎসর যদি এঞ্জিনিয়ার সকল খালের উৎপত্তি-স্থানগুলি সযত্নে রক্ষা করিত, তাহা হইলে এ রকম দুর্দ্দশা কখনই ঘটিত না। খালের মুখগুলি অযত্নে পড়িয়া থাকাতে তাহারা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া আসিতেছে। দুর্ব্বল খাল মূল নদীর কাদা বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না; কিন্তু অপেক্ষাকৃত লঘু বালুকা বা মৃত্তিকা-কণা বহনে তাহাদের কোনই ক্ষতি হয় না। যে সকল স্থান হইতে খাল কাটিয়া জল বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া হয় নদীর সেই সকল স্থান উত্তমরূপে পাথর প্রভৃতি দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। নচেৎ, জলের বেগে নদীর কূল ভাঙ্গিয়া জলে পতিত হওয়া স্বাভাবিক, এবং খালের মুখে ঐ মৃত্তিকা জমা হওয়াতে স্রোতের সহিত খালের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শীঘ্রই দুর্ব্বল খাল ভরাট করিয়া ফেলে। Alexander the Great বলিয়াছেন খালের উৎপত্তি স্থানগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এই কথাগুলি তিনি প্রাচীন ব্যাবিলনের জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থাকালে বলিয়া গিয়াছেন। সে আজ বহুদিনের কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার মত মনুষ্যগণ যাহা বলেন বা করেন তাহা চিরকালই সত্য। গড়াই বা বড়ার মত খাল গঙ্গার আপদ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কালে ইহাদেরই স্বতন্ত্র বেগবতী নদী হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাহাদের কূলগুলি উত্তমরূপে

পাথর দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং গড়াইয়ের উৎপত্তি স্থানে বৃহৎ বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে; মধ্যে মধ্যে জল প্রবেশের বেগ মন্দ করিয়া দিতে হইবে।

গঙ্গার জল প্রবাহ, তাহার কূলের অবস্থা ও তাহার কদ্দমাক্ত জল প্রবাহ বহিয়া লইয়া যাইবার শক্তি এতদিনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই তীর রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। যে স্থান বাঁধা আবশ্যক, সেই সকল স্থানে মাটী পোড়াইয়া ইট করিয়া অন্যান্য বস্তু দ্বারা পাহাড় বাঁধিয়া দেওয়া ভাল। গঙ্গার তীরে বহু মাইলব্যাপী স্থান নদীগর্ভে পড়িয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই স্থানগুলির উপর বহু পুরাতন বৃক্ষরাজি দৃষ্ট হয়। গঙ্গার ভাঙ্গনে তাহাদের নিস্তার নাই। নীলের উপরও এইরূপ উপদ্রব ঘটিত; কিন্তু আপাততঃ মানুষের চেষ্টায় তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নদীর বাঁকে বড় বড় জাহাজ কর্ত্তৃক তাড়িত জল ধাক্কা দিয়া পাহাড় ধ্বসাইয়া দেয়। এই সকল স্থানেই জাহাজ সকল তীর হইতে দূর পথ দিয়া চলিয়া যাইবে। জাহাজের পিছনের বড় চাকা এই সকল নদীর মধ্যে চলিতে দিতে নাই। গঙ্গার বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে যদি আরও কিছুদিন বড় জাহাজের অবাধ গতিবিধি চলিতে থাকে, তাহা হইলে পরে কোনরূপ প্রতিকার অসম্ভব; এবং শীঘ্রই কূলের সন্নীপবর্ত্তী দেশ সকলের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। নীলের উপর পর্য্যটনকারীগণ মিশরবাসীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন। নীলের স্রোতের প্রকোপে তীর ভাঙ্গিয়া পড়াই তাহার কারণ। কিন্তু গঙ্গা সেভাবে গ্রামের পর গ্রাম আত্মসাৎ করিয়া চলিয়াছে তাহাতে নীলের ভাঙ্গন গঙ্গার ভাঙ্গনের নিকট শার্দ্দূল গ্রাসের সহিত মশক দংশনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এরূপ দুর্দ্দশা পৃথিবীর কোথাও দৃষ্ট হয় না এবং যে কোন পর্য্যটনকারী কয়েক ঘণ্টা মাত্র গঙ্গা-বক্ষে বিচরণ করিলে এই বিষয় লক্ষ্য করিতে পারিবেন। বহু পুরাতন বৃক্ষ বাগান, বাগিচা, সৌধ, অট্টালিকা কয়েক বৎসরের মধ্যে নদী গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। এই সকল নদীর তীরে বালুকা, কঙ্কর, প্রস্তর প্রভৃতি মৃত্তিকার উপর ঢালিয়া দিতে পারিলেও বিশেষ উপকার হয়।

যদি তীর এই ভাবে রক্ষা করা যায়, এবং প্রয়োজন মত নদীর জল প্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহা হইলে দমকল স্থাপন করিয়া সারা বৎসরই অন্তত বিশ মাইল পরিমাণ ভূমিতে জল সেচন করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে যে সকল দমকল ব্যবহৃত হয়, তাহা স্বল্প মূল্যের ও বেশ কার্য্যকরী। এই ভাবে জল সরবরাহ করিবার শক্তি থাকিলে দেশের খানা, ডোবা, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়গুলির প্রভূত উপকারে আসিবে। আপাততঃ সেগুলি ম্যালেরিয়া সৃষ্টির আকর হইয়া আছে। এই সময় গঙ্গার বন্যার জল বহিয়া লইয়া যাইবার খালগুলি বিশেষ উপকারে আসিবে।

প্রতি বৎসরই গঙ্গার পূর্ণ প্লাবন প্রয়োজন হইবে। বরালের সাত মাইল তফাতে প্রকাণ্ড বাঁধ বাধিয়া এই কার্য্য সমাধা হইতে পারে। নদীর মধ্যভাগে আধা আধি লোহার স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া বাকী মৃত্তিকা দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। নদীয়ার এই বাঁধে ১৮০ টী ফাঁক থাকিবে, এবং প্রত্যেকটী প্রস্থে ২৫ ফিট হইবে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬৪৬০ ফিট থাকিবে। কপাটগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত হইবে। গঙ্গার জল এই সকল ফাঁক দিয়া বহু ধারায় পতিত হইবে, এবং পতনের গভীরতা ৬ হইতে ৭ ফিট মাত্র হইবে। তাহাতে ভিতরে কোন ক্ষতি করিবে না। ইহা নির্ম্মাণ করিতে আন্দাজ ১২,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ হইতে পারে। গঙ্গার শাখা-প্রশাখাগুলি এমন ভাবে অবস্থিত যে, এই একটী মাত্র বাঁধ দ্বারা মধ্য বাঙ্গালা ও ভাগীরথীর জল নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। দারুণ গ্রীষ্ম কালেও জলঙ্গি বা মাথাভাঙ্গাতে ১২ ফিট জল ধরিয়া রাখা চলিবে। গঙ্গার জলধারা প্রতি সেকেণ্ডে ৪০,০০০ কিউবিক ফিট জল বহিয়া লইয়া যায়। এই সকল খালের জন্য স্বতন্ত্র জলাধারের প্রয়োজন নাই।

এখন এই সকলের ব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। Sir Arthur Cotton যখন গোদাবরী

ও কৃষ্ণার দ্বারা সারা বৎসরের সেচের কথা মনে করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে অত জল নদীতে পড়িতে না দিয়া, সেই জলই অর্থরাশিতে পরিণত করা যাইতে পারে। গঙ্গা এত বৃহতী নদী না হইলে মধ্য-বাঙ্গালায় সেচের ব্যবস্থা বহুকাল পূর্ব্বেই করা যাইত। যদি খাল সকলকে নদী বলিয়া ফেলিয়া রাখা এবং অযত্নে ভরাট হইয়া যাইবার সুবিধা দেওয়া না হইত, তাহা হইলে মধ্য-বাঙ্গালা এরূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকিত না। প্রথমে খালগুলির পুনরুদ্ধার করিয়া পরে বাঁধ বাঁধিতে হইবে। এই ভাবে মধ্য-বাঙ্গালা তাহার পূর্ব্ব-গৌরবের দিনকেও অতিক্রম করিয়া যাইবে এবং ইহার মৃত্তিকার সারবত্তা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। মিশরবাসী আসুয়ান বাঁধের জন্য ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিয়াছে। জলাধারের জন্য আরও ৩,০০০,০০০ পাউণ্ড এখনও প্রয়োজন। মোট ৮,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিতে হইবে। গঙ্গাতে কোন জলাধারের প্রয়োজন নাই। মিশরবাসী ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড বাঁধের জন্য খরচ করিয়াছে, এই বৎসর ২,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিবে স্থির করিয়াছে এবং এই বাঁধ শেষ করিতে আরও ২,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিতে হইবে। তাহাদের ৬,০০০,০০০ একর জমির জন্য ১৭,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিতে হইবে। মধ্য-বাঙ্গালাতে একটী মাত্র বাঁধ দ্বারা উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। হুগলীর জন্য স্বতন্ত্র একটী বাঁধ প্রয়োজন হইলে মোট ১২,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ হইতে পারে। এমন বিশাল একটী কার্য্যের জন্য এ টাকা খুব বেশী নহে।

বাঙ্গালার চাষীদিগের মধ্যে কাহার কি পরিমাণ জমি আছে, তাহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বন্যার দ্বারা দেশ ভাসাইয়া জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিলে সকলেই তাহাতে উপকৃত হইবে। এখানে সেচের জন্য স্বতন্ত্র কর ধার্য্য করা যাইতে পারে। মিশরেও এই ব্যবস্থা দ্বারা লোকে উপকৃত হইয়াছে। মিশর সরকার শতকরা দুই টাকার অধিক কর ধার্য্য করে নাই, তাহাতেই তাহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, এবং ইহাতেই তাহারা দেশবাসীর লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেচের পাকা বন্দোবস্ত থাকাতে মিশরের জমির মূল্য শতকরা ৪০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এখনও সেই দরেই জমির ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে। মিশরে যে ভাবে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং সরকার যে পরিমাণ সাহায্য করিয়াছে, ভারত সরকারের নিকট এ প্রস্তাব লইয়া গেলে তাহা নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইত। ভারত সরকার ভারতবাসীর সহিত প্রায়ই কোন সম্পর্ক রাখেন না। এই দরিদ্র জাতির প্রতি যেন ভারত সরকারের কোনই দায়িত্ব, কোন কর্ত্তব্যই নাই, এই ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সরকারের অজ্ঞতার দোষে ভারতবাসী ক্লেশ ভোগ করিতেছে। দায়িত্ব গ্রহণে ভারত সরকার প্রায়ই পরাঙ্মুখ। একান্তই যদি দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, তাহা অতি সামান্য পরিমাণেই গ্রহণ করেন। এই কারণেই, ভারতবাসীর হিতার্থে, ভারতবাসীর বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে, এবং যে সকল স্থানে বসবাস নাই বা অধিক সংখ্যক লোক ফল ভোগ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত নহে, সেই সকল স্থলে বৃহৎ অরণ্যানী সকল কাটিয়া চাষের আবাদ সৃষ্টি করিতেছে। মিশরবাসী ও মিশর সরকার একই স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতেছে, এবং ফলে, মিশরবাসী ও মিশর সরকার উভয়েই বিশেষ লাভবান্ হইতেছে, ও দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভাগীরথীর অবস্থা অতিশয় সঙ্গীণ। ভাঙ্গন পড়িয়া স্থানে স্থানে ভরাট হইয়া উঠিতেছে। ভাগীরথীর উৎপত্তি স্থলে গঙ্গার ভাঙ্গন ভাগীরথীর অনেক স্থল ভরাট করিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে ভরাট হইয়া যাওয়াতে নদীর স্রোত যে দিকে সুবিধা পায়, সেই দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। নূতন ভাঙ্গনের স্থলগুলি অপেক্ষাকৃত গভীর বলিয়া সেই দিকেই জলে স্রোত প্রধাবিত হয়, তাহাতে পুনরায় ভাঙ্গন ঘটে। ইহা অতিশয় শঙ্কাজনক।

যতদিন না ভাগীরথীর কূল বাধিয়া রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে এবং গঙ্গার জল নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে, ততদিন ভাগীরথী ক্রমশই ভরাট হইয়া আসিবে। হুগলী অধিক মাত্রায় ভরাট হইলে জলঙ্গি ও মাথাভাঙ্গার বেগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে এবং এই দুইটী নদী কর্দ্দম আনিয়া হুগলী অধিক মাত্রায় ভরাট করিয়া তুলিবে। কলিকাতা Port Trust হুগলী লইয়াই ব্যস্ত। তাহারা তাহাদের সমস্ত সময় ও অর্থ হুগলীতেই ... করিতেছেন। তাঁহারা যদি গঙ্গা হইতে ... উৎপত্তি স্থলে সামান্য মনোযোগ দেন, তাহা হইলে হুগলী এখনও রক্ষা পাইতে পারে। ভাগীরথীর পার্শ্ব বাঁধিয়া দিয়া, নদীয়ার বাঁধ বাঁধিতে পারিলে, হুগলীতে যথেষ্ট জল পাওয়া যায়, এবং সারাবৎসর সেচ ... পারে, কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

(ক্রমশঃ ...

ডাক্তারদের ঔদাসীন্য—

কিছুদিন পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এ্যাসোসিয়েসনের গৃহে ইণ্ডিয়ান প্রভিনসিয়াল মেডিকেল সার্ব্বিসেস এ্যাসোসিয়েসনের জেনারেল এ্যাসেম্বলী সংক্রান্ত নবম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বাঙ্গালী সরকারী চাকুরে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের আরোপ করেন, যে, তাঁহারা রোগীর চিকিৎসার সময় যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাহার বিবরণ প্রকাশ করেন না। আর চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহাদের মৌলিক গবেষণা কার্য্য একেবারেই নগণ্য বলিলেই চলে। তবে দুই একজন সরকারী বাঙ্গালী ডাক্তার কিছু কিছু কাজ করিয়াছেন বটে। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় এত কম যে, সাধারণ ভাবে বাঙ্গলার প্রাদেশিক মেডিক্যাল সার্ব্বিসের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ তাহাতে খণ্ডিত হয় ... বাহাদুর ডাক্তার বসু এ বিষয়ে বাঙ্গালী সরকারদের উৎসাহের অভাব দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, সঙ্গে তিনি কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন, তাঁহারা গবেষণার সুযোগ বা উপরওয়ালাদের কাছ হইতে প্রাপ্ত হন না। এই শেষের কথাটি আমরা বলিয়া বোধ হয়। হাসপাতালে, ডিসপেন্সারীতে নিযুক্ত থাকেন—রোগীর সংখ্যার অনুপাতে ... সংখ্যা এত অল্প যে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ... গোছের কাজ করিতে হয়। তাঁহারা ... সময় পান না—গবেষণা করিবার সময় পাইবেন ... হইতে? ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। ... মনে হয়, সুবিধা ও উৎসাহ পাইলে তাঁহারা ... কিছু করিতে পারেন। তাঁহারা গবেষণায় ... অনিচ্ছুক বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

BLANK PAGE(S)

DOUBLE COLOUR PAGE